হরিদাসের গুপ্তকথা

(চার খণ্ডে অখণ্ড সংস্করণ)

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ

১৩০৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ

ভাদ্র-১৩৯৪

প্রকাশক ঃ

ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি মহাত্মাগান্ধী রোড,
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীতপন কুমার বারিক
অজন্তা প্রিণ্টার্স
৭বি. সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা-৯

প্রকাশকের নিবেদন

"......কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এরপরে এ বাড়ির উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইলো না; আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরোনো পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার বোধোদয় নয়, বাবার ভাংগা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য ত নয়, ওগুলো বদ্-ছেলের অ-পাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই কোরে নিতে হোলো আমার বাড়ির গোয়াল ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি।......"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৩৩৮)

প্রকাশক হিসেবে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪২-১৯১৬) এই গ্রন্থটি পড়বার পর ঠাকুমার যৌবনকালের আতর মেশানো পুরোনো বেনারসী শাড়ির গন্ধ পাই। অনেক দিন সেই আতরের গন্ধ আমার নাকে লেগেছিলো। গন্ধটা ফিকে হয়ে যাবার মুখেই নতুন করে মনে করিয়ে দিল বিমল করের 'বালিকা বধূ'-র ছায়াচিত্রের নায়ক-নায়িকারা। এর পর বইটি বহু খুঁজেছি। পরে সেই বইটি পড়ার সুযোগ করে দিলেন বংগীয়-সাহিত্য পরিষৎ-এর কর্মী সাহিত্যিক-গবেষক শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। বইটি পড়ে মনে হলো প্রায় পঞ্চাশখানি বইয়ের লেখক সেকালের স্বনামধন্য বহু বিতর্কিত সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্রের এই গ্রন্থটি—আজ যাঁরা সাহিত্যচর্চায় ব্যাপৃত, আধুনিক পাঠক-পাঠিকা, আমাদের মতো প্রকাশক—সকলেরই বইটি পড়া উচিত। যাচাই করে দেখে নেওয়া উচিত ১৩০৪ বংগাব্দে চলিত ভাষায় লেখা সমাজ-চিত্রের অপূর্ব ইতিহাস এই উপন্যাস থেকে আমরা কতটা এগোতে পেরেছি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় তাঁর 'নায়ক' পত্রিকায় ভুবনচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন: 'আলালের সময় হইতে যিনি বাঙ্গালার গদ্য-পদ্য লেখক, মাইকেলের সহচর, যাঁহার লিখিত পুস্তকরাশির সংখ্যা করা যায় না, যাঁহার পাঠকগণেরও সংখ্যা হয় না—সেই সরল, সোজা দেশী বাঙ্গালা গদ্যের লেখক ভুবনচন্দ্রের মতন অনুবাদক আর বাঙ্গালায় ছিল না—বোধহয় আর হইবে না।' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের সত্যতা প্রকৃতই 'হরিদাসের গুপ্তকথা' পাঠে উপলব্ধ হয়। পাঠকসমাজের হাতে তাই তুলে দিলাম বহু দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থটি। সকলের ভালো লাগলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

হরিদাসের গুপ্তকথা

প্রথম খণ্ড

অতি আশ্চর্য্য !

১৩১০ বঙ্গাব্দ

সূচনা

আমি কে?

আমি হরিদাস। বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই বাঙ্গলাদেশেই ছিলাম। সেই সময় আমার বাল্যজীবনের কতক কতক পরিচয় দিয়াছি। জন্মাবধি কত-দিন পর্য্যন্ত মাতাপিতা জানিতাম না, আপন বলিয়া কাহাকেও চিনিতাম না, নানা স্থানে বিচরণ করিয়া কত কষ্টই ভোগ করিয়াছিলাম, কত বিপদেই পড়িয়াছিলাম, তাহা মনে হইলে এখনও আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত জীবাত্মা শিহরিয়া উঠে। ভাগ্যক্রমে যদিও এখন আমি রাজা, তথাপি পূর্ব্বের অবস্থার সমস্ত কথাই আমার মনে আছে।

জীবনকাহিনীগুলি প্রণালীপূর্ব্বক বর্ণনা করিতে হইলে এতদ্দেশের প্রচলিত কথোপকথনের সহজ ভাষাই ব্যবহার করা ভাল; কেন না, সেই ভাষায় গল্পচ্ছলে লিখিয়া দিলে আপামর সাধারণ সকলেরই হৃদয়গ্রাহিণী হয়। এই আখ্যায়িকাতে সেই ভাষাই আমি অবলম্বন করিব। পূর্ব্বে একবার কতক কতক পরিচয় দিয়াছিলাম, বয়স তখন অল্প ছিল, আমার অনেক গুহ্যকথা তখন আমি ব্যক্ত করিতে পারি নাই, এইবার শেষের কথাগুলির সঙ্গে সেইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোলসা করিয়া বলিব। গোড়ার কথাগুলি না বলিলে আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকে, অতএব প্রয়োজনীয় ঘটনাবলীও সংক্ষেপে সংক্ষেপে ইহাতে লিপিবদ্ধ থাকিল। পাঠকমহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

প্রথম কল্প

পাঠশালা

শিশুকাল থেকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সক্রম পর্য্যন্ত আমি গুরুগৃহে ছিলেম। আমার গুরুদেবের বাসস্থান কোথায় ছিল, শিশুকালে ঠিক জানতে না পেরে, পূর্ব্বে আমি বোলেছিলেম সুবর্ণগ্রাম। কথাটা ভুল ছিল; দেশের ভূগোলে তখন আমার জ্ঞান ছিল না, এখন বুঝতে পেরেছি, সুবর্ণগ্রাম নয়, সপ্তগ্রাম। সুবর্ণগ্রাম ঢাকাজেলায়, আমি ঢাকাজেলায় ছিলেম না, হুগলীজেলায় ছিলেম, সে কথা আমার মনে আছে; হুগলীজেলাতে সপ্তগ্রাম অবস্থিত, চলিত-কথায় সাত গাঁ।

গুরুগৃহে আমি ছিলেম। কে আমি কাহার পুত্র, কি জাতি, কোথায় নিবাস, কিছুই আমি জানতেম না ; পৃথিবীতে আমার কেহ আপনার লোক ছিল কি না, সেটাও আমার জানা ছিল না ; জানা ছিল কেবল নামটী আমার হরিদাস। এ নামটী কে দিয়েছিল, সে কথাও আমি অবগত ছিলেম না। সমস্তই আমার চক্ষে অন্ধকারময় ছিল ; চক্ষেও অন্ধকার, মনেও অন্ধকার।

একটী কথা স্মরণ হয়। মাসে মাসে এক একখানা রেজিষ্টারীকরা বেনামী চিঠিতে আমার শিক্ষাগুরুর নামে কিছু কিছু টাকা আস্‌তো, কে পাঠাতো, আমি জানতেম না। গুরুদেবও কিছু আমাকে বোল্‌তেন না। শুনতে পেতেম, আমারই খরচপত্রের টাকা। এ তত্ত্বটাও ঘোর অন্ধকার।

পাঠশালেই আমার থাকা, পাঠশালেই আমার পড়াশুনা, পাঠশালেই আমার স্নানাহার, পাঠশালেই আমার খেলাধুলা, পাঠশালেই আমার শয়ন, পাঠশালেই আমার নিদ্রা, পাঠশালেই আমার সব। পাঠশালা ছাড়া আর কোন স্থান আমি জান্‌তেম না, চিনতেম না, দেখ্‌তেমও না, কোন স্থানে যেতেমও না।

পাঠশালে অনেকগুলি ছেলে লেখাপড়া শিক্ষা কোত্তো। প্রাচীন অধ্যাপক মহাশয়দিগের চতুষ্পাঠীর নিয়মে অনেকগুলি ছেলে আমাদের গুরুগৃহেই আহারাদি পেতো, দিবারাত্রিই সেইখানে থাক্‌তো। আমার সঙ্গে সব ছেলে-গুলির বেশ সদ্ভাব হয়েছিল।

আমরা সকলেই হিন্দু-সন্তান। পার্ব্বণে পার্ব্বণে বিদ্যালয়ের ছুটী হোতো, সকল ছেলে ঘরে যেতো, আমোদ কোরে তারা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইতো, আমি যেতেম না। কোথায় যাব ?—ঘর ছিল না, বাড়ী ছিল না, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী কেহই ছিল না। কোথায় যাব ? কার কাছে যাব ?—যেতেম না। মন যখন নিতান্ত উদাস হোতো, সেই সময় একাকী নির্জ্জনে বোসে নীরবে কেবল রোদন কোত্তেম আর নিশ্বাস ফেলতেম, চক্ষের জলে অঙ্গ-বস্ত্র ভেসে যেতো। বাস্তবিক আমার ঘর-বাড়ী ছিল কিনা, বাস্তবিক আমার আপনার লোক ছিল কিনা, ভগবান জানতেন ; মানুষের মধ্যে যদি কাহারো জানা সম্ভব থাক্‌তো, সেই সকল মানুষই সে খবর রাখ্‌তো ; আমি কিন্তু কোন খবর পেতেম না, কোন খবরই রাখ্‌তেম না ; কোন দিন কেহ আমাকে দেখ্‌তেও আসতো না। নিত্য নিত্য আমি ভাব্‌তেম, সৃষ্টিকর্ত্তার এত বড় সংসারে আমাকে আমার বল্‌বার কেহ নাই, নিসম্পর্কে সুধুই আমি একাকী।

আমার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, সেই সময় আমাদের আচার্য্যের মৃত্যু হয় ; পাঠশালাটী ভেঙে যায়। আমার গুরুপত্নী শোকে কাতরা, তাঁর একটি কন্যা ছিল, অবিবাহিতা কুমারী, পিতার বড় আদরিণী কন্যা, সেটী তো পিতার বিয়োগে প্রায় জ্ঞানহারা। আমিও শোকে আকুল।

কেবল শোক প্রকাশ কোরেই গুরুপত্নী নিশ্চিন্ত থাকতে পাত্তেন, এমন কথা বলা যায় না। আচার্য্যঠাকুর বহুশ্রমে যা কিছু উপার্জ্জন কোত্তেন, তাতেই শিষ্যপোষণ ও সংসারপালন হতো ; তিনি চোলে গিয়েছেন, উপার্জ্জন বন্ধ হয়েছে, সংসারে বড়ই কষ্ট। কিছুমাত্র সম্বল নাই। ডাকযোগে আমার খরচ-পত্রের টাকা আসবে, আশায় আশায় তবুও আমি সেই কষ্টের সংসারে আরো

তিন মাস থাক্‌লেম। রেজিষ্টারী চিঠি এক মাস এসেছিল, গৃহিণী ঠাকুরাণী স্বয়ং রসীদ দিয়ে সেই চিঠিখানি গ্রহণ কোরেছিলেন ; তার পরেই বন্ধ ; দুই মাস আর চিঠিও এলোনা, টাকাও পেঁছিল না। নিরুপায়।

আমি তখন কি করি ? গুরুপত্নী আমাকে বড়ই ভালবাস্‌তেন, এক এক-বার আমার মুখপানে চান, চক্ষে জল আসে, বসনাঞ্চলে চক্ষু ঢেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে সোরে যান। ক্রমাগতই এই ভাব। দিন দিন আরো কষ্টবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাতরতার বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় কল্প

উপায় কি ?

আরো দুই মাস কেটে গেল। গুরুপত্নী মুখ ফুটে আমাকে কিছু বোল্‌তে পারেন না, আমিও নিজের ভাগ্যফল নিজে কিছু জানতে পারি না, মন কিন্তু সর্ব্বদাই অস্থির। যাঁর আশ্রয়ে থাকা, তাঁর অবস্থা প্রতিকূল, তিনি তাঁর নিজের আর কন্যাটীর ভরণ-পোষণেই অক্ষম, তার উপর আমি যদি আর বেশীদিন গলগ্রহ হয়ে থাকি, যে-ই দিক, যে-ই পাঠাক, ডাকে আমার টাকা আসতো, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি এই বিধবার গলগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহি। পাঁচ মাস! এই পাঁচ মাসের মধ্যে কেবল প্রথম মাসের চিঠিখানি এসেছিল, আর এলো না। কারণ কি ?--যে পাঠাতো সে লোক হয় তো মোরে গেছে কিম্বা হয় তো আমি মোরে গেছি, সেইটাই ভেবে নিয়েছে, কিম্বা হয় তো আমি এখন বড় হয়েছি, শরীর খাটিয়ে দিনগুজরাণ কোত্তে পারি, এখন আর কেন দিবে, তাই ভেবেই বন্ধ কোরেছে। যা-ই হোক্‌, উপায় তো কিছুই দেখ্‌ছি না।

নিত্য নিত্য এই সব কথা আমি ভাবি, আরো কত কি ভাবি, ভেবে কিন্তু কূলকিনারা কিছুই পাই না। যেখানে আমাদের পাঠশালাটী ছিল, ঠিক তারই পশ্চিমদিকে একটী বৃদ্ধ বকুলফুলের গাছ। একদিন বৈকালে সেই বকুলতলায় বোসে আমি আপন অদৃষ্ট ভাবনা কোচ্ছি, দুই চক্ষু দিয়ে জলধারা গড়াচ্ছে, হৃদয়সাগরে চিন্তা-তরঙ্গ তোলপাড় কোচ্ছে, মাথাটী হেঁট কোরে আমি বোসে আছি, হঠাৎ একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখি, সম্মুখে গুরুপত্নী।

চঞ্চল হস্তে চক্ষের জল মার্জ্জন কোরে শশব্যস্তে আমি উঠে দাঁড়ালেম। মনের দুঃখে আমি কাঁদি। গুরুপত্নীকে সেটা জান্‌তে দিব না, আমার চক্ষের জল তাঁকে দেখতে দিব না, তিনি আমার মা, তিনি আমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করেন, প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন, তাঁর প্রাণে আমি ব্যথা দিব না, ইহাই আমার সংকল্প। অসাবধানে আজ আমার চক্ষের জল তিনি দেখ্‌তে পেলেন, তাই ভেবে চিত্ত আমার অত্যন্ত কাতর হলো, আড়ে আড়ে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, ঠাকু-রাণীর চক্ষেও জলধারা। অঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন কোরে স্তম্ভিতস্বরে তিনি আমাকে আদেশ কোল্লেন, "হরিদাস ! বোসো।"

আমি বোস্‌লেম। ঠাকুরাণীও ধীরে ধীরে আমার সম্মুখভাগে উপবেশন কোল্লেন। তখনো তাঁর চক্ষু-দুটী সজল। আমি মনে কোল্লেম, স্নেহবশেই স্নেহবতী আমার দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন কোচ্ছেন। বাস্তবিক কোন মেঘে কিরূপ বর্ষণ হয়. সেটা অনুমান করা সাধারণ মানুষের অসাধ্য, বিশেষতঃ আমার মত বালকের পক্ষে।

নীরবে গুরুপত্নীর মুখপানে চেয়ে আমি বোসে আছি, তিনিও সজল-নয়নে আমার মুখপানে চেয়ে আছেন. দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর চক্ষু-দুটী জল-শূন্য হয়ে এলো, হস্ত দ্বারা শুষ্কনেত্র পরিমার্জ্জন কোরে রুদ্ধস্বরে থেমে থেমে তিনি আমাকে বোল্লেন, "হরিদাস বাছা ! দেখতেই তো পাচ্চো, সংসার অচল। লোকজন সব জবাব দিয়েছি, আসবাবপত্র তৈজসপত্র সমস্তই বিক্রয় কোরেছি, খাজনার দায়ে টোলবাড়ীখানিও নীলাম হয়ে যায়, উপায় কি ? তোমার কি হবে ? আহা ! অনেক দিন ছিলে, অনেক দিন আছ, সন্তানের মত মায়া বোসেছে, কি কোরে তোমাকে আমি—"

এই পর্য্যন্ত বোলেই ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি দুই হস্তে চক্ষুদুটী ঢাকা দিলেন, তাঁর নাসায় ঘন ঘন বড় বড় নিশ্বাস পোড়্‌তে লাগ্‌লো। আমি দেখ্‌-লেম, প্রবল ঝড় ! এ ঝড়ের পরিণাম কি হবে, আমার ভাগ্যচক্র কোন্‌ পথে ঘুরে যাবে, ভেবে চিন্তে কিছুই ঠিক কোরে উঠ্‌তে পাল্লেম না।

চক্ষু থেকে হাত নামিয়ে জড়িতস্বরে গুরুপত্নী আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "হরিদাস ! তাই তো ! উপায় কি হয় ? কি কোরে চালাব ? তোমাকে বিদায় দিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করি ! তোমার জন্যই আমার বেশী ভাবনা। তুমি কোথায় যাবে ?

আর আমি ধৈর্য্য রাখতে পাল্লেম না ; ক্ষুদ্র বালকের মত উচ্চকণ্ঠে রোদন কোরে করুণস্বরে বোল্লেম, "যাব ?- কোথায় যাব ? কোন জায়গা আমি চিনি ? কাহাকে আমি জানি ? জন্মাবধি এই আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েছি, এই আশ্রম-টীই জানি। আপনি আমাকে পরিত্যাগ কোল্লে আমি কোথায় গিয়ে কার কাছে দাঁড়াব ? কে আমাকে আশ্রয় দিবে ? দোহাই আপনার, পায়ে ধরি, আপনি আমাকে পরিত্যাগ কোরবেন না। আমি আর আপনার গলগ্রহ হব না, এই বয়সে যতদূর পারি, পরিশ্রম কোরে, কোন লোকের কাছে চাক্‌রী কোরে আপ-নার সংসারে যথাশক্তি সাহায্য কোরবো, আপনি আমাকে বিদায় কোরে দিবেন না।"

গম্ভীরবদনে ঠাকুরাণী বোল্লেন, "উপায় নাই হরিদাস, উপায় নাই ! আমার কাছে তোমার আর থাকা হোতে পারে না ; কি কোরে হবে ? আমি এখানকার সব বিলিব্যবস্থা কোরে মেয়েটী নিয়ে এক মাসের মধ্যেই কাশী চোলে যাব, তখন তুমি আর কার কাছে থাক্‌বে ? চাক্‌রীর কথা বোল্‌ছিলে, আমিও সেই কথা বোল্‌ছি। তোমার জন্য আমি একটী বেশ চাক্‌রী যোগাড় কোরেছি। বেশ লোক ; যার কাছে তুমি থাক্‌বে, তোমার সেই মনিবটী বেশ লোক। খাটুনীও বেশী হবে না, আপনার পুঁথি পড়্‌বার সময়ও পাবে, সেখানকার সকলেই

তোমাকে ভালবাসবে, যত্ন কোর্‌বে, আদর কোর্‌বে, বেশ থাক্‌বে ; কোন কষ্ট হবে না। সেই লোকটীকে আমি—"

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো ! চক্ষে যেন ধাঁধাঁ লাগতে লাগলো ; মাথা ঘুরে গেল। বিস্তর মিনতি কোরে, গুরুপত্নীর চরণে ধোরে কতবার দয়া ভিক্ষা কোল্লেম, কিছুই ফল হলো না। যতই আমি কাঁদি, ততই তিনি কঠিন হন! আমার প্রতি তার দয়া ছিল, স্নেহ ছিল, ইহাই আমি জানতেম ; ছিলও সত্য, কিন্তু ক্ষণেকের মধ্যে সব যেন কর্পূর হয়ে উবে গেল ! ক্রমাগত কেঁদে কেঁদে আমি নির্ব্বাক হয়ে পোড়লেম, গৃহিণীর বাক্‌পটুতা চতুর্গুণ হয়ে বেড়ে উঠ্‌লো !

আপন মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কত কথাই তিনি বোলতে লাগলেন, আমার কাণ আর সে দিকে থাক্‌লো না। থাক্‌লেই বা কি হোতো ? একটু পূর্ব্বে যে সব কথা আমি শুনেছি, তাতেই আমার ধড়ের মন যেন ঝড়ের সঙ্গে উড়ে গেছে, মন উড়ে গেলে কাণ তখন আর কোন কার্য্যেই লাগে না ; আওয়াজগুলা কেবল কাণের ভিতর ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো ; আমি নির্ব্বাক্।

টোলবাড়ীর সম্মুখদরজাটা তখন খোলা ছিল। যে বকুলতলায় আমরা ছিলেম, সেখান থেকে সে বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত বেশ দেখা যায়। সে দিকে গুরুপত্নীর চক্ষু ছিল না, চক্ষু ছিল আমার দিকে, দৈবাৎ একবার আমার চক্ষু সেই দিকে ঘূর্ণিত হলো। দেখলেম, একটা লোক একখানা ঘর থেকে বেরিয়ে, উঠান পার হোয়ে, আমাদের দিকে চাইতে চাইতে আর একখানা ঘরে প্রবেশ কোল্লে। দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠ্‌লো। এম্নি ভয়ানক চেহারা !

লোকটা দীর্ঘাকার ; মুখখানা গোল, মাথাটা ন্যাড়া, হাত-দুখানা ছোট ছোট, পা-দুখানা খুব লম্বা, বুকখানা সরু, পেটটা খুব মোটা, চল্‌তী বয়ানে নাদাপেটা ; বর্ণ ঘনশ্যাম, বয়স আন্দাজ ৪৫।৪৬ বৎসর। পরিধান চওড়া কস্তাপেড়ে ধোপদাস্ত ধুতী ;—ধুতী বলাও চলে, শাড়ী বোল্লেও ভুল হয় না।—গা আদুড়।

তাকে আমি দেখ্‌লেম। সে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে গেল, আমি তাকে দেখ্‌তে পেলেম কি না, সেটা সে জানতে পাল্লে কি না, তা আমি জানি না,—বোল্‌তেও পারি না। অন্য ঘরে প্রবেশ কোরেই সে লোক অদেখা হলো। গুরুপত্নী অনেকক্ষণ আমাকে নিরুত্তর দেখে, আপন বক্তব্য সমাপ্ত কোরে, উঠে দাঁড়িয়ে, অল্প উচ্চস্বরে ধীরে ধীরে আমাকে বোল্লেন, "হরিদাস ! বোসো। তোমার সঙ্গে আরো আমার অনেক কথা আছে ; যাতে কোরে তোমার ভাল হয়, সে ব্যবস্থা আমি অবশ্যই কর্‌বো ; অব্যবস্থায় তোমারে আমি অকালে ভাসিয়ে দিব না, সেটা তুমি বেশ জেনো।—বোসো, কোথাও যেয়ো না ; এখান থেকে উঠো না ; শীঘ্রই আমি ফিরে আসচি।"

গুরুপত্নী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেন, তাঁর আদেশমত আমি সেই বৃক্ষতলেই বোসে থাক্‌লেম। অন্তরসাগরে কত তরঙ্গ প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো, আমার অন্তরাত্মাই তা অনুভব কোল্লে।

আচার্য্যের বাড়ীখানি দু-মহল। সদর-মহলে পাঠশালা ছিল, অন্দর-মহলে তাঁরা বাস কোত্তেন। এখন আর পাঠশালা নাই, কিন্তু অন্দরের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। সদর-মহলের নাম টোলবাড়ী। সেই বাড়ীতেই আমি থাক্‌তেম, অন্যান্য ছাত্রেরাও থাক্‌তো, এখন তারা নাই, এখন আমি একাকীই সেই টোলমহলের অধিবাসী। গুরুপত্নী ঠাকুরাণী সেই মহলেই প্রবেশ কোল্লেন, দ্বার বন্ধ কোল্লেন না, ভেজিয়ে রেখে গেলেন।

আকাশে তখনও সূর্য্য ছিলেন। অল্প অল্প বেলা ছিল। ঠাকুরাণী ঘরে গেলেন, আমি তরুতলে বোসে বোসে ভূতভবিষ্যতের দুঃখের ভাবনা ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। জন্মাবধি ঘর ছিল না, তবু একটু আশ্রয় ছিল ;—এইবার তাও যায়! গুরু-পত্নী দয়াবতী ছিলেন, এখন হোচ্ছেন মায়াবতী! আর আমি এ আশ্রমে আশ্রয় পাব না! কোথায় যাব? কার হব? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? উপায় কি?

তৃতীয় কল্প

পরামর্শ

সন্ধ্যা হলো। পল্লীগ্রামের সন্ধ্যাকাল। সহরের সন্ধ্যাকালের ন্যায় রাজ-মার্গগুলি আলোর মণ্ডিত হয় না, জনকোলাহল বাড়ে না, ঢোলকতবলা বাজে না, স্বরলহরী উঠে না, পাহারার আঁটা-আঁটি হয় না, চোর-গাঁটকাটা ঘোরে না, গাড়ী-ঘোড়াও ছোটে না, এ প্রকার কিছুই হয় না,—পল্লীগ্রামের সন্ধ্যাকালে অন্ধকার হয়, নক্ষত্র উঠে, শেয়াল ডাকে, সকলে ঘরে যায়, ঘরে ঘরে সন্ধ্যা জ্বালে, ভক্তগৃহে শঙ্খধ্বনি হয়, দুই একটী দেবগৃহে আরতির সময় শঙ্খঘণ্টা বাজে, পল্লী নিস্তব্ধ হয়, প্রকৃতি নিদ্রা যান, পাখীরা আলয় অন্বেষণ করে, পশুরা খোয়াড়ে গহ্বরে আশ্রয় লয়, এই সকল লইয়াই পল্লীগ্রামের সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যাকালে আমি হুগলীজেলার সপ্তগ্রামের এক বকুলতলায়। আমার ভাগ্য-ক্রমে সে দিন শুক্লপক্ষের দশমী তিথি ছিল, আকাশে চন্দ্রোদয় হলো,—দিব্য জ্যোৎস্না। বকুলপল্লব ভেদ কোরে চন্দ্রদেব আমার অঙ্গে অল্প অল্প শীতল কিরণ বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন, আমি আকাশপানে চাইলেম ; চন্দ্রদেবকে দর্শন কোল্লেম। আকাশ আমি দেখ্‌বো, চন্দ্রদেবকেও দেখ্‌বো, আবার সন্ধ্যাকাল আসবে, কিন্তু সপ্তগ্রামের এই আকাশ, এই চন্দ্র আর আমি দেখ্‌তে পাব না! গুরুঠাকুরাণীর যে প্রকার ভাব, তাতে কোরে এই রাত্রেই হয় তো আমাকে সপ্ত-গ্রাম-ছাড়া হোতে হবে! যে লোকটাকে বাড়ীর ভিতর দেখ্‌লেম, ঐ লোকটার হাতেই হয় তো আমার ভাগ্যচক্রের নূতন ঘূর্ণন আরম্ভ হবে! আশাভরসার বিসর্জ্জন হয়ে যাবে। কি যে হবে, কিছুই তখন ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। আগাগোড়া অনেক ভাব্‌লেম, মীমাংসা পেলেম না।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড। গুরুপত্নী ফিরে এলেন না। একা আমি এতক্ষণ বৃক্ষতলে বোসে তাঁর আজ্ঞা পালন কোচ্চি, এটা হয় তো তিনি ভুলে গেছেন।

রাত্রি অন্ধকার থাক্‌লে আমার ভয় হোতো, জ্যোৎস্নাটুকু সহায় আছে বোলে ততটা ভয় আসছে না, এক-রকমে আছি ভাল। হঠাৎ একদিক্‌ থেকে তিনটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্য শৃগাল আমার সম্মুখ দিয়ে ভোঁ ভোঁ কোরে নক্ষত্রবেগে ছুটে গেল।

এ সংসারে দুঃসময়ে আপন মুখে সুখের কথা বোল্‌তে নাই। ভাল আছি বোল্‌তে বোল্‌তেই সম্মুখ দিয়ে শেয়াল ছুটে গেল !—শেয়াল ছুটে গেল, পাছে আবার বাঘ ছুটে যায়, সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি উঠে, টোলমহলের দরজার কাছে ছুটে গেলেম। ঠাকুরাণীর নিদেশ-নির্ব্বন্ধ বিস্মৃত হোলেম। আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক কোরে, বাড়ীর ভিতর এদিক্‌ ওদিক্‌ উঁকি মেরে দেখ্‌লেম, উত্তরদিকের ঘরে প্রদীপ জ্বেলছে ; দ্বার আবৃত আছে ; জানালার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে ; দুটী লোক বেশ ডেকে ডেকে কথা কোচ্ছেন। —কে সেই দুটী লোক, একবার দেখেই তৎক্ষণাৎ নিঃসন্দেহে আমি তা বুঝতে পাল্লেম।

প্রাঙ্গণ পার হয়ে ইতিপূর্ব্বে যে লোকটী উত্তরের ঘরে প্রবেশ কোরেছিল, সেই একটী আর দ্বিতীয়টী আমার স্নেহময়ী গুরুঠাকুরাণী। কি তাঁদের কথা, সেটুকু বুঝে নিতেও আমার বিলম্ব হলো না। আমারি অদৃষ্ট ফলকের অক্ষরগুলির রূপভাগ করাই তাঁদের কার্য্য ;—তারি উপায় নির্দ্ধারণ করা তাঁদের পরামর্শ।

ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে বাড়ীর ভিতর আমি প্রবেশ কোল্লেম। যে ঘরে তাদের পরামর্শ হোচ্ছিল, সেই ঘরের পশ্চিম গায়ে একখানা পরচালা ; তার ভিতর পাঁচ রকম বাজেজিনিস থাক্‌তো , এক এক সময় সে জায়গাটা খালী পোড়ে থাক্‌তো। সেখানে দাঁড়ালে ঘরের ভিতরের কথাবার্ত্তা বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট শুনা যেতো। আমার সেটা জানা ছিল, চুপি চুপি সেই পরচালা ঘরেই আমি প্রবেশ কোল্লেম ; একটী কোণ ঘেঁষে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়ালেম।

ঘরে দর্ম্মার বেড়া। একদিকে আমি, একদিকে তাঁরা দুজন। ব্যবধান একখানি পাত্‌লা দর্ম্মা মাত্র। কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট আমার কাণে আসতে লাগ্‌লো। গোপনে দাঁড়িয়ে অন্য লোকের কথোপকথন শ্রবণ করা সেই আমার নূতন ;—সেই আমার প্রথম কেন তেমন গর্হিত কার্য্যে আমার মতি হয়েছিল, আবশ্যকবোধে তাও এইখানে বোলে রাখি। আমি নিশ্চয় জেনেছিলেন, তাঁরা বলাবলি কোচ্ছিলেন আমারি কথা। কোন অপরিচিত লোকের কাছে আমার উপকারিণী গুরুপত্নী আমার চরিত্রচর্য্যার পরিচয় দিচ্ছেন, এমনটী যদি বুঝ্‌তে পাত্তেম, তা হোলে ঐ ভাবে লুকিয়ে শুনবার প্রয়োজন হোতো না। সে রকম প্রবৃত্তিও আসতো না ; কিন্তু যখন জেনেছিলেম, আমাকে নিরাশ্রয় কোরে অকূলে ভাসিয়ে দেওয়াই গুরুপত্নীর ইচ্ছা,—সুদৃঢ় পণ, সেই ইচ্ছা ও সেই পণ পূর্ণ করবার উদ্দেশেই যখন ঐ লোকটীকে এনেছেন, তখন আর গুপ্তশ্রোতা না হয়ে মনকে স্থির রাখ্‌তে পাল্লেম না ;—কাজেই ঐ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্তি।

কথা কইতে কইতে হঠাৎ দুজনেই একবার থেমে গেলেন। একটু পরেই আবার হাস্যের কলরব উঠ্‌লো। ভাল কোরে গলা শাণিয়ে লোকটা তখন নূতন

রকম কথা তুল্লে। দর্জ্জার গায়ে নিঃশব্দে আমি কাণ পেতে থাকলেম। লোক বল্লে "চেহারাটা আছে ভাল ; চেহারার চটোকে বুঝা যায়, বুদ্ধিটাও ভাল, বেশ মোটাসোটাও আছে, কিন্তু খাটে না, খাট্‌তে পারে না, তোমার মুখে এই কথাটা শুনে আমার কেমন কেমন বোধ হোচ্ছে : রোগমাখা মাংসপিণ্ড নিয়ে আমি কি কোর্‌বো ?"

ঠাকুরাণী বোল্লেন, "খাট্‌তে পারে না, এমন কথা আমি বলি নাই, তবে কি জান, কর্ত্তার আদর পেয়ে ও কেমন একরকম নাই পেয়ে গিয়েছে ; কর্ত্তার আদরে আমারও আদর পেয়েছিল, কাজে কাজেই কুড়ে বোনে গেছে ; খাটালেই খাট্‌বে,—ঘাড়ের উপর চাপ পোড়্‌লে সকলকেই খাটুনী অভ্যাস কোত্তে হয়। তুমি এক কাজ কর। আজ আর নয়, কাল্‌কের দিনটেও থাক্, পরশুদিন বিকেলবেলা তুমি এসো, আমি ওটাকে তোমার সঙ্গে বিদায় কোরে দিব।"

লোক।—ছোঁড়াটা দেখ্‌তে দিব্বি ফুট্‌ফুটে, আদরে আদরে বোধ করি আয়েসী হয়ে পোড়েছে, সহজে বোধ হয় বাগে আনা যাবে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সেই কথাটাই আগে দরকার ; জাতটা কি ?

ঠাকুরাণী।—জাতজন্ম আমি কিছুই জানি না। কার ছেলে, কোথাকার ছেলে, কোন দেশে ঘর, কিছুই জানা নাই : কর্ত্তা জানতেন কি না, সে কথাও আমি বোল্‌তে পারি না, আমায় কিন্তু একদিনও কিছু বলেন নাই। আমি জানি, ছোঁড়াটা বেওয়ারীস। মাসে মাসে বেনামী রেজিষ্টারী চিঠিতে টাকা আস্‌তো, তাই আমি জান্‌তেম, কে পাঠাতো, কতবার জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, কর্ত্তা কিছুই বোল্‌তেন না। ডাকের মোহরে অবশ্য ডাকঘরের ঠিকানা থাক্‌তো, আমি মেয়েমানুষ কি জানবো, চিঠি খুলে নিয়েই কর্ত্তা সেই খামখানা ছিঁড়ে ফেল্‌তেন। যাক্ সে কথা, জাতের কথা তুমি জিজ্ঞাসা কোচ্চো কেন ? কাজ চোল্লেই হলো, জাতের খবরে কি দরকার ?

লোক।—জিজ্ঞাসা কোচ্চি এই জন্য, অন্য কাজ যদি না জানে, অন্য কাজ যদি না পারে, চাষের কাজে জুড়ে দিব। দশ জায়গায় দশজনের হাতে আমার কাজ, একটা কিছু সুবিধা পেলেই এক-রকমে লাগিয়ে দিব।

ঠাকু।—যাতে দিবে, তাই পার্‌বে। কেন পার্‌বে না ? পেটের দায় বড় দায়। পেটের জ্বালা ধোল্লে লোকে বাঘের মুখে সাপের মুখে যেতেও পেছুপা হয় না। দোকানের কাজেই দাও, পেয়াদার কাজেই দাও কিম্বা চাষের কাজেই লাগাও, ক্রমে ক্রমে সব কাজেই পটু হয়ে উঠ্‌বে।

আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো। আমার গুরুপত্নী আমাকে এই লোকটার হাতেই সোঁপে দিবেন, এই লোক আমাকে চাষের কাজে নিযুক্ত কর্‌বে। কোথায় যে নিয়ে যাবে, কে বোল্‌তে পারে ? চাষের কাজে দুদিনেই আমি মারা যাব ! হায় হায় ! আমার ভাগ্যে যে কি আছে, ভাগ্যলিপির যিনি কর্ত্তা, সেই বিধাতাপুরুষ ভিন্ন আর কেহই সে তত্ত্ব পরিজ্ঞাত নয়। ভাগ্য আমার বড়ই মন্দ। তা যদি না হবে, জন্মাবধি নিরাশ্রয় হয়েও একটা আশ্রয় পেয়েছিলেম, অকস্মাৎ সে আশ্রয়টীও হারাব কেন ? আমার ভাগ্যের কথা নিয়ে এরা আমোদ কোরে হাসিখুসী কোচ্চে, এটাও আমার ভাগ্যের ফল ! হায় হায় !

মানুষের মন বুঝে উঠা মানুষের অসাধ্য! এই গুরু-গৃহিণীকে আমি মায়ের সমান দেখ্তেম ; এখন দেখ্তে পাচ্ছি, তা তো নয়, ইনি একটী মায়ারাক্ষসী। মনে এই সব আলোচনা কোরে সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি তিনটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেম।

খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে লোকটা আবার আমার গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "লেখাপড়ায় কেমন ?"

বিকৃতকণ্ঠে গুরুপত্নী উত্তর কোল্লেন, 'লেখাপড়া মাথা আর মুণ্ডু! কেবল খানকতক পুঁথি, কে জানে কি, তাই নিয়ে বর্ষাকালের ব্যাঙের মতন কোঁ কোঁ কোত্তো, দশ জনে জড়ো হয়ে চীৎকারশব্দে আমার এই দর্ম্মার ঘরের চালের গোলপাতাগুলো পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিতো, এই পর্য্যন্ত বিদ্যা! সে বিদ্যাতে তোমার কোন উপকার হবে না। তুমি ওটাকে তোমার মনের মতন কাজেই ভর্ত্তি কোরে দিও। না পারে ত সপাসপ চাবুক দিও, চাবুকের চোটে ভূত-প্রেত বশীভূত হয়, ওটা তো একটা সামান্য বেওয়ারীস ছোঁড়া!"

আবার আমি কেঁপে উঠ্লেম। উঃ! এই রাক্ষসী আমাকে বাছা বোলে ডাক্তো, কত রকম আদর কোত্তো, স্নেহ জানাতো, মায়ায় ভুলে—আমি ছেলে-মানুষ, এত কি জানি, মায়ায় ভুলে এই রাক্ষসীকে আমি জননী তুল্য শ্রদ্ধাভক্তি কোত্তেম। পেটে পেটে এত ছিল, কেমন কোরেই বা জানবো! রাক্ষসী আমাকে চাবুক মার্বার হুকুম দিচ্ছে! উঃ! সংসারের মায়া-মমতা কত স্থানে কত আবরণে ঢাকা, নিরূপণ করা অসাধ্য। একবার ইচ্ছা হলো, সরাসর সম্মুখে গিয়ে চোটপাট জবাব করি, আশ্রয়ের ধূলায় দণ্ডবৎ কোরে জন্মের মত বিদায় চাই ; ইচ্ছা হলো বটে, কিন্তু ভয় এসে অগ্রে অগ্রে সেই ইচ্ছার সম্মুখে দাঁড়ালো। যদি এখন গিয়ে দেখা দিই, লোকটা এখনি আমাকে ধোরে ফেল্বে, দুদিন সময় দিবার পরামর্শ হোচ্ছিলো, সে অবসরও আর থাক্বে না। ভয়ে ভয়ে মনে মনে এইরূপ চিন্তা কোরে সেইখানেই আমি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম।

দুজনে আবার চুপি চুপি কি বলাবলি কোরে দু-একবার আমার নাম কোল্লে, আবার খানিকক্ষণ চুপ কোরে থাক্লো ; তার পর লোকটা ইতস্তত কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা, আজ নিয়ে যেতে তুমি বারণ কোচ্চো কেন ?" ঠাকুরাণী বোল্লেন, "আজ আমি সব কথা ওকে খুলে বোলেছি, এ দেশে আমি থাক্বো না, এখানকার সব জিনিসপত্র বেচে কিনে মেয়েটী নিয়ে কাশী যাব, এই মিথ্যাকথাটাও বোলেছি, তাই শুনে ছোঁড়াটা হাপুসনয়নে কাঁদ্তে লেগেছে। খুব ছোটবেলা থেকে এখানে রয়েছে, মায়ার সংসারে বেরাল-কুকুরের উপরেও একটু একটু মায়া বসে, তার কান্না দেখে আমারও একটু মায়া হয়েছিলো, সেইজন্য তাকে গাছতলায় বোসিয়ে আমি এখানে চোলে এসেছি। আমার পায়ে ধোরে কতই কেঁদেছে, কতই সাধনা কোরেছে, আমার চক্ষেও জল এসেছিলো, তাই জন্যে বলা, এ দু-দিন থাক্, পরশুদিন তুমি নিয়ে যেয়ো।"

হো হো কোরে হেসে লোকটা বোল্লে, "ও হো হো! এই কথা তোমার! এত মায়া তোমার! ঐ রকম মায়াকান্নায় তুমি ভুলে যাও! ছোঁড়াটা তো ভারী

ধড়ীবাজ! এই বয়সে এত ধড়ীবাজী বুদ্ধি ধরে! ও সব মায়াকান্না! ও মায়াতে তুমি ভুল্‌তে পার, আমি ভুলি না। আজ রাত্রেই আমি নিয়ে যাব। রাত্রিকালে নিয়ে যাওয়াই ভাল। কোন দিক্ দিয়ে কোথায় নিয়ে ফেল্‌বো, পথ চিনে আর ফিরে আস্‌তে পার্‌বে না। মল্লিকবাবুদের নদীয়াজেলার নীলকুঠীতে।”

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ঠাকুরাণী বোলে উঠ্‌লেন, “না, না, এ রাত্রে নিয়ে যেয়ো না ; আর একটা দিন থাক্ : দেখই না, কি তামাসা হয়, কি রঙ্গটা করে ; আর একটা দিন থাক। ঘনশ্যাম, তুমি আমারে চেন না ; যখন আমি যে সঙ্কল্পটা ধরি, সেটা আমি সিদ্ধ করিই করি ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জনে একত্র হোলেও আমারে নিবারণ কোত্তে পারে না। যখন আমি সঙ্কল্প কোরেছি তাড়াবো, তখন ওটাকে তাড়াবোই তাড়াবো! মায়া-দয়া আমার কিছুই নাই! কার প্রতি মায়া-দয়া?—কে ও? তোমাকে আমি দিয়েছি, ও এখন তোমারি ; একটা দিন রেখে দাও। রাত্রি কত?—বোধ হয় বেশী। ছোঁড়াটা একাকী গাছতলায় বোসে আছে, আজ তুমি বিদায় হও, তারে বাড়ীর ভিতর এনে বুঝিয়ে পড়িয়ে আমি রাজী কোরে রাখ্‌বো। তার পর অন্যকথা।”

আর আমার সেখানে লুকিয়ে থাক্‌বার সাহস হোলো না। গুরুঠাকুরাণী আগে গিয়ে যদি দেখেন, সেখানে আমি নাই, তা হোলে বিপদ্ হবে! বাড়ীর ভিতর থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, এটা যদি তিনি দেখ্‌তে পান, তবেই মনে কোর্‌বেন, লুকিয়ে লুকিয়ে আমি তাঁদের গুপ্তপরামর্শ শ্রবণ কোরেছি। ভারী রাগ হবে ; আজ রাত্রেই আমাকে মেরে ধোরে তাড়িয়ে দিবেন। সেটা ভাল নয় : একটা রাত্রি, একটা দিন, আবার একটা রাত্রি, তার পর এক বেলা, সময় নিতান্ত কম নয় ; আজ রাত্রে যদি রক্ষা পাই, তা হোলে ঐ সময়ের মধ্যে অবসর বুঝে যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকেই আমি পালিয়ে যেতে পার্‌বো, রাক্ষসীর কাছেও থাক্‌তে হবে না, রাক্ষসের কবলেও পোড়্‌তে হবে না। এই স্থির কোরে চুপি চুপি সেই গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে অলক্ষিতে আমি সেই বকুলতলায় গিয়ে চুপটী কোরে বোসে থাক্‌লেম। আকাশে উজ্জ্বল চন্দ্র, ধরাতলে দিব্য জ্যোৎস্না।

চতুর্থ কল্প

দালালের বাড়ী

আমি বকুলতলায়। বাড়ীর পশ্চিমদিকে বকুলগাছ। যাকে আমি বাড়ীর ভিতর দেখেছিলেম, তার চেহারা-বর্ণনে বোলে রেখেছি, বর্ণ-ঘনশ্যাম ; ঠাকুরাণীর সহিত তার যখন কথোপকথন হয়, তখন শুনেছি, ঠাকুরাণী তাকে ঘনশ্যাম বোলে সম্বোধন কোরেছিলেন। আমার বর্ণনা নিরর্থক হয় নাই। লোকটার নাম ঘনশ্যাম। বর্ণের সঙ্গে নামের মিলটী বেশ আছে। যে দিকে

আমি ছিলেম, সে দিক্ দিয়ে ঘনশ্যাম বাহির হয় নাই ; বাড়ীর পূর্ব্বদিকে আর একটী দরজা ছিল, সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেল। ঠাকুরাণী আমার কাছে এলেন ; এসেই বোল্লেন, "হরিদাস ! রাত্রি অনেক হয়েছে, বাড়ীর ভিতর চল।" আমি যে এতক্ষণ কি কোরেছি, তা তিনি কিছুই জানতে পাল্লেন না।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। মনে সুখ ছিল না, যৎসামান্য আহার কোল্লেম। গুরুঠাকুরাণী তাই দেখে কপট স্নেহে একবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কিছুই খেতে পাল্লে না, অসুখ হয়েছে কি ?"—আমি উত্তর কোল্লেম, "তেমন অসুখ কিছুই না—অক্ষুধা।"

কর্ত্তার মৃত্যুর পর অবধি রাত্রিকালে যে ঘরে আমি শয়ন করি, সেই ঘরেই শয়ন কোল্লেম। ঠাকুরাণী সে রাত্রে সেই ঘরের দরজায় চাবী দিয়ে রাখ্লেন। পাছে আমি পালাই, সেই জন্যই সাবধান। পালাতে আমি পার্বো না, তা তিনি জানতেন। কেন না ঐ পাঠশালা ছাড়া আর কোথাও আমি যেতেম না, গ্রামের পথঘাট কিছুই চিনতেম না। রাত্রিকালে পালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল, সেটা তিনি ভালই জানতেন, তথাপি সন্দেহ ; সেই সন্দেহেই চাবী দিলেন। আমি যেন নিরপরাধে সেই রাত্রে ঘরের ভিতর কয়েদী হয়ে থাক্লেম।

নিদ্রা হলো না। ভয়ে আর চিন্তায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ কোল্লেম। ভয় কিসের ? সেই বিকটাকার ঘনশ্যাম আমার মনিব হবে, বলদের মতন হাল-লাঙ্গলে জুড়ে দিয়ে, কোথায় যে নিয়ে যাবে, কতই যে যন্ত্রণা দিবে, সেই ভয়। চিন্তা কিসের ?—কি প্রকারে পরিত্রাণ পাই, কি প্রকারে পলায়ন করি, কি প্রকারে সেই নরাকার রাক্ষসমূর্ত্তি আর দর্শন কোত্তে না হয়, সেই চিন্তা।

চিন্তা আমাকে কোন উপায় বোলে দিতে পাল্লে না। দিনের বেলা পলায়ন কর্বো, এইরূপ সঙ্কল্প কোরেছিলেম, সে সম্বন্ধটাও সিদ্ধ হলো না। প্রভাতে গুরুপত্নী আমার ঘরের চাবী খুলে দিলেন, বিমর্ষবদনে আমি বাহির হোলেম, একটু সুবিধা দেখলেই ছুটে পালাবো, এইরূপ আশা কোত্তে লাগ-লেম, কিন্তু সুবিধা ঘোটে উঠ্লো না ; ঠাকুরাণী সর্ব্বক্ষণ আমাকে চক্ষে চক্ষে আটক রাখ্তে লাগ্লেন ; নিজে যখন কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তখন ছোট মেয়েটীকে আমার কাছে রেখে যান ; মুহূর্ত্তের জন্যও আমি পালাবার সুবিধা পেলেম না।

আমার গুরুকন্যার বয়স আট বৎসর, নাম অপরাজিতা। অপরাজিতা বেশ বুদ্ধিমতী ; আমার প্রতি তার ভ্রাতৃতুল্য ভালবাসা হয়েছিল। আমিও সেটীকে ভগ্নীতুল্য ভালবাস্তেম। সেই দিন মাতৃ-আদেশে অপরাজিতা যখন আমার কাছে এসে বোস্লো, আমি তখন সুভাবনায় অন্যমনস্ক ছিলেম, বদন বিষণ্ন ছিল, তাই দেখে সে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "দাদা ! আজ তুমি একটীও কথা কোচ্চো না, একটীবারও হাস্চো না, মুখখানি ভারী কোরে রয়েচো, এমন হয়েচো কেন ?"

আমার চক্ষে জল এলো। মেয়েটীর মুখের দিকে ভাল কোরে চাইতে না পেরে নতবদনে বোল্লেম, "রাত্রে একটা কুস্বপ্ন দেখেছি, তাতেই এমন বিমর্ষ

দেখ্ছো। আমার বড় দুর্ভাবনা হয়েছে। স্বপ্ন দেখেছি, আমি যেন এ বাড়ীতে, আর জায়গা পাব না, কে যেন আমাকে ধোরে বেঁধে কোন দেশে নিয়ে যাবে, তোমারে আর দেখ্তে পাব না, তুমিও আমারে দেখ্তে পাবে না, সেই জন্যই দুর্ভাবনা।"

অপরাজিতার দুটী চক্ষু ছল ছল কোত্তে লাগ্লো। সত্য সত্য স্বপ্ন কি না, স্বপ্ন কখন সত্য হয় কি না, বালিকার সে জ্ঞান ছিল না, আমার দুখানি হাত ধোরে ভেউ ভেউ কোরে কাঁদতে লাগ্লো, চক্ষের জলে আমার হাত-দুখানি ভাসিয়ে দিলে।

গৃহিণী কোথায় ছিলেন, মেয়ের কান্না দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে, তার হাত ধোরে সেখান থেকে সোরিয়ে নিয়ে গেলেন, আমাকেও মিষ্ট মিষ্ট ভর্ৎসনা কোল্লেন। আমি চুপ কোরে থাক্লেম। তদবধি তিনি আর আমাকে একবারও নজরছাড়া কোল্লেন না। দিনমান কেটে গেল, সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, সন্ধ্যার পর আহারাদি সমাপ্ত হলো, পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় সে রাত্রেও তিনি আমাকে দ্বারে চাবী দিয়ে আটক রাখ্লেন। দ্বিতীয় প্রভাতে দ্বার মুক্ত হলো, আমি বাহির হোলেম। মন অত্যন্ত চঞ্চল। সেই দিন আমার সে আশ্রমবাসের শেষ-দিন। আজ বৈকালে সেই লোক আসবে, এসেই আমাকে ধোরে নিয়ে যাবে। ছোট ছোট ছেলেরা ছেলেধরার ভয়ে যেমন কাতর হয়, ঘনশ্যামের ভয়ে আমিও সেইরূপ কাতর হোলেম। সূর্য্য যতক্ষণ পূর্ব্বগগনে ছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটু একটু আশা ছিল, সূর্য্য যখন মধ্যগগনে বিরাজ করেন, তখনও আমি নিতান্ত হতাশ হই নাই, সূর্য্য যখন অল্পে অল্পে পশ্চিমদিকে ঢোল্তে লাগ্লেন, তখন আমার বক্ষঃস্থল গুরু গুরু কোরে কাঁপ্তে লাগ্লো। আর বিলম্ব নাই ; অপরাহ্ন আগত ; এইবার আমাকে নিরাশা-সাগরে ডুবে যেতে হবে, সেই ভাবনাতেই আমি ম্রিয়মাণ হয়ে থাক্লেম।

বৈকালে মহাজনের মত পোষাক পোরে ঘনশ্যাম এসে দেখা দিলে। তাকে দেখেই আমার সমস্ত আশা-ভরসা উড়ে গেল! আমার গুরুপত্নী সেই লোক-টাকে সঙ্গে কোরে আমার কাছে নিয়ে এলেন। আমি কাঁপতে লাগলেম। লোকটার চেহারা যে রকম, একবার চক্ষে দেখ্লেই ভয় হয়, পোষাক পোরে আরও ভয়ানক হয়েছে। দুর্জ্জনেরা দেখ্তেও যদি সুশ্রী হয়, তবু তাদের চক্ষু দেখ্লে নিরীহ লোকে অন্তরে অন্তরে ভয় পায় ; আর এর সেই যমো-পম মূর্ত্তি! ঘনশ্যামের চক্ষের দিকে আমি চক্ষু রাখ্তে পাল্লেম না, মাথা হেঁট কোরে থাক্লেম।

ঠাকুরাণী বোল্লেন, "হরিদাস! এই ইনিই তোমার মনিব হোলেন। ইনি একজন বড়দরের মহাজন, ইনি তোমাকে বেশ যত্নে রাখ্বেন ;—সহজ সহজ কাজ দিবেন, যে কাজ তুমি জান, যে কাজ তুমি পার্বে, সেই কাজেই ইনি তোমাকে নিযুক্ত রাখ্বেন। এঁর সঙ্গে তুমি যাও ; কোন কষ্ট হবে না।"

এই পর্য্যন্ত বোলে কপট স্নেহ জানিয়ে, বসনাঞ্চলে নয়নকোণ মার্জ্জন কোরে, ঠাকুরাণী আবার আমাকে বোল্লেন, "কি করি বাছা, সকল কথাই তো তোমাকে বোলেছি। এদেশে আমি থাক্বো না, মেয়েটী নিয়ে কাশী যাব।

তোমাকে বিদায় করবার ইচ্ছা ছিল না, নিতান্ত দায়ে পোড়েই বিদায় কোরে দিতে হলো। একটা কিছু কিনারা কোরে না দিলে অজানা জায়গায় কোথায় তুমি যাবে, তাই ভেবে এই ভদ্রলোকটীর হাতে সোঁপে দিলেম, যাতে তুমি ভাল থাক, যাতে তুমি সুখে থাক, তাই আমার ইচ্ছা ; তাই তোমাকে ভাল-লোকের হাতেই সমর্পণ কোল্লেম। মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্র লিখ্‌বো, তুমিও লিখ্‌বে, কোন প্রকার কষ্ট হোলে আমারে জানাবে, আমি তখন অন্য প্রকার বন্দোবস্ত কোরে দিব। এখন যাও। আহা! তোমাকে বিদায় দিতে আমার প্রাণ কেমন কোচ্চে!"

ঘনশ্যামের স্বর অতি কর্কশ। সেই কর্কশ স্বরকে একটু মিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কোরে লম্বা লম্বা কথায় ঘনশ্যামও আমাকে অনেক রকম আশ্বাস দিলে। আমি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। গুরুপত্নী পুনঃপুনঃ ঘনশ্যামের মুখের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে ইসারা কোল্লেন, ঘনশ্যাম আমার একখানা হাত ধোল্লে। উঃ! ঠিক যেন বজ্রমুষ্টি! বোধ হলো, আমার হাতখানি যেন ভেঙে গেল! এক হস্তে গুরুপত্নীর চরণ ধারণ কোরে সেইখানে আমি শুয়ে পোড়্‌লেম, কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে এলো, শুষ্ককণ্ঠে রোদন কোত্তে লাগ্‌লেম। ঘনশ্যামের একবারও দয়া হলো না, গুরুপত্নীও দয়া কোল্লেন না। ঘনশ্যাম আমাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে বাড়ী থেকে বাহির কোরে নিয়ে চোল্লো। আমার পরিত্রাহি চীৎকার, গুরুপত্নীর চক্ষে কপট অশ্রুবিন্দু, অপরাজিতার বালিকাসুলভ ক্রন্দন, এই তিন একত্র, কিন্তু একত্র হোলে কি হয়, ঠাকুরাণী আমাকে রাক্ষসের হস্তে সমর্পণ কোরেছেন, ইচ্ছা-বশেই মায়া-দয়া বিসর্জ্জন দিয়েছেন, রাক্ষস আমাকে ছাড়বে কেন, হিড়্‌হিড়্‌ কোরে টেনে নিয়ে চোল্লো।

বাইরে একখানা গাড়ী ছিল, সেই গাড়ীতে ঘনশ্যাম আমাকে টেনে টেনে তুল্লে। বেলা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো, দিবাকর অস্তাচলে গমন কর্‌বার উপক্রম কোচ্ছিলেন, সেই সময় আমি আমার আশৈশব আশ্রয়স্থান থেকে জন্মশোধ বিদায় হোলেম ; জন্মশোধ বিদায় কি না, ভগবান জানেন, আমি কিন্তু মনে কোল্লেম, জন্মশোধ! আমার নিজের কোন জিনিসপত্র ছিল না, জিনিসপত্রের মধ্যে আমি আর আমার পরিহিত বস্ত্রখানি। আমার দেহ আর আমার প্রাণকে লয়েই আমি। সম্বলের মধ্যে পুঁথি কখানি ছিল, গুরু-পত্নী সেগুলি আমাকে দিলেন না। বেশী ভালবাসতেন কি না, বেশী স্নেহ কোত্তেন কি না, সেই জন্য সেইগুলি বিক্রয় কোরে স্নেহ ও ভালবাসার নিদর্শন দেখাবেন, সেইটীই তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল।

আমাকে গাড়ীতে তুলে যমোপম ঘনশ্যাম আমার বামদিকে এসে বোসলো। আমার আর নড়নচড়নের শক্তি থাক্‌লো না। বড় বড় ঘোড়ারা আমাদের গাড়ী-খানাকে পবনবেগে টেনে নিয়ে চোল্লো। খানিক দূর গিয়েই সন্ধ্যা হলো। কোন দিকে যাচ্ছি, কতদূর যাচ্ছি, কিছুই আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে ছিল, কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গাড়ী ক্রমাগতই চোল্‌ছে ; কোথাও দাঁড়ায় না, কোথাও থামে না, ঘোড়াবদলও হয় না ; পিপাসায় আমার ছাতি ফাটে, একবিন্দু জল কোথাও আশা কোত্তে পারি না,

কণ্ঠ-তালু বিশুষ্ক। ভয়ের সময়, রোদনের সময়, নৈরাশ্যের সময় পিপাসা অধিক হয়, ক্ষুধা থাকে না, কিন্তু জলপিপাসায় দম বন্ধ হবার লক্ষণ দাঁড়ায়; গাড়ীর ভিতর আমারও সেই দশা।

রাত্রি যখন প্রায় শেষ, গাছে গাছে পাখীরা কলরব কোচ্ছে, দূরে দূরে গঙ্গা-স্নানের যাত্রীরা দুর্গা দুর্গা নাম স্মরণ কোচ্ছে, যবনপল্লীতে কুক্কুটধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তাতেই আমি অনুমান কোল্লেম, ঊষাকাল। মনে মনে আমিও দুর্গা-নাম স্মরণ কোল্লেম। বৃহৎ একখানা ভগ্নবাড়ীর সম্মুখে গিয়ে গাড়ীখানা দাঁড়ালো। ঘনশ্যাম আমাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে সেই বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। পথে পথেই রাত্রিকাল কেটে গিয়েছে. গাড়ীর-ঘোড়ারা কত স্থানে কত বেগে পথ অতিক্রম কোরেছে, কোন দিক্ দিয়ে এসেছি, কোথায় এসেছি, কিছুই ঠিক্ কোত্তে পাল্লেম না; যে বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেম, সে বাড়ীর কোন্ দিকে কি, ঊষার আঁধারে, চক্ষের আঁধারে তাও আমি দেখ্‌তে পেলেম না।

একটু পরেই প্রভাত হলো। পূর্ব্বদিন বেলা এক প্রহরের সময় যৎকিঞ্চিৎ আহার কোরেছিলেম, তার পর সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি উপবাস, একবিন্দু জল পর্য্যন্ত না, তার উপর মনের চাঞ্চল্য, কাজে কাজে চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ঘনশ্যাম একটা ঘরে আমাকে রেখে দরজায় শিকল দিয়ে বোধ হয় অন্য ঘরে চোলে গেল। ঘরে আমি একাকী থাক্‌লেম। সূর্য্যোদয় হলো। যে ঘরে আমি ছিলেম, সে ঘরে পাঁচটা জানালা; একটা জানালাতেও কপাট ছিল না, ঘরের ভিতর রৌদ্র এলো। তখন আমি ঘরের আসবাবপত্রের প্রতি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। গৃহশয্যা দেখ্‌বার প্রবৃত্তি ছিল না, যা আমি দেখ্‌-ছিলেম, যা দেখ্‌বার ইচ্ছা হোচ্ছিলো, সে বস্তু সে ঘরে আছে কি না, সেই দিকেই আমার লক্ষ্য। ধন্য জগদীশ! ধন্য তাঁর দয়া! চারিদিকে চক্ষু ঘুরিয়ে শেষকালে দেখ্‌তে পেলেম, ঘরের এক কোণে একটা জলের কল্‌সীর নিকটে একটা মাটীর ভাঁড়। জলের কল্‌সীতে ঢাকা ছিল না, গিয়ে দেখ্‌লেম, তাতে প্রায় একসের আন্দাজ জল ছিল, সেই জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশক-মক্ষিকারা সাঁতার দিচ্ছিলো। জল অপেয়; তবু আমার আহ্লাদ হলো; মাটীর ভাঁড়ে সেই কীটপূর্ণ জল পরিপূর্ণ কোরে দুই নিশ্বাসে দুই চুমুকে সবটুকু আমি পান কোল্লেম। বুক অনেকটা ঠাণ্ডা হলো; আমিও একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিশ্বাস ফেল্লেম।

এইবার দেখ্‌লেম, ঘরের খিলানে খিলানে বড় বড় মাকড়সার জাল, কোণে কোণে কালো কালো ঝুল, দেয়ালে দেয়ালে ভুষাকালি, ঘরের মধ্যস্থলে এক-খানা পায়াভাঙা তক্তপোষ, তার উপর একখানা খেজুরপাতার চেটাই, একধারে একটা শ্মশানের বালিশ, এক কোণে একটা প্রকাণ্ড ডাবা হুঁকা, তিন ধারে আমের আটার তালি দেওয়া, কোল্‌কেট্টার তিন ধারে ফাটা, পার্শ্বে একটা কাণাভাঙা হাড়ী, তার গর্ভে আধ হাঁড়ি ছাই। এই পর্য্যন্ত আসবাব! আর কিছুই না!

আমি বোল্লেম, সুপারিসটা খুব পাকা-রকম বটে! গুরুপত্নী বোলেছেন, ঘনশ্যাম একজন মহাজন! খুব ভদ্রলোক! পোষাকেও দেখা গিয়াছে বড়

মহাজন! ব্যবহারেও দেখা গিয়াছে খুব ভদ্রলোক! এখন আমার ভাগ্যে কি হয়, সেইটুকু জানতেই বাকী। বোসে আছি, একবার একবার আসবাবপত্র নিরীক্ষণ কোচ্ছি, এমন সময় দরজার শিকল খুলে একটা বুড়ী সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লে। ঘরের চারিদিকে চেয়ে আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই বুড়ী কম্পিত-কণ্ঠে একটু থেমে থেমে বোল্লে, "হ্যাঁ গা ছেলেটী, তোমার নামটী কি ভাল,—হাঁ, ঠিক ঠিক! হরি—হরি ;—হ্যাঁ গা হরি! তুমি কি আমাদের বাবুর বাড়ী ভাত খাও? বাবু আমাদের ব্রাহ্মণ। বাবু জিজ্ঞাসা কোরে পাঠালেন, ব্রাহ্মণের ভাত তুমি খাও কি না?"

প্রশ্ন শুনেই আমি মনে কোল্লেম, অদ্ভুত সমস্যা। চেহারা যে রকম, ব্যবহার যে রকম, বাক্য যে রকম, তাতে কোরে বোধ হয়, আগাগোড়া সমস্তই কৃত্রিম। বুড়ী বোল্লে, "বাবু আমাদের ব্রাহ্মণ।" বাবু যে দিন সপ্তগ্রামে গিয়েছিলেন, সে দিন খোলা গা আমার চক্ষে পোড়েছিল ; ব্রাহ্মণের লক্ষণ ত কিছুই ছিল না, নিদর্শন একগাছি যজ্ঞসূত্র, তা পর্য্যন্ত ছিল না, এখন এখানে এসে ব্রাহ্মণ সেজেছে! ব্যাপার বড় শক্ত! ভেবে চিন্তে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমার বড় অসুখ, কিছুই আহার কর্‌বার ইচ্ছা নাই, তবে যদি এখানকার কোন দোকানে কিছু মিষ্টান্ন পাওয়া যায়, তা হোলে—"

আমার কথা সমাপ্ত হোতে না হোতেই বুড়ী বোলে উঠ্‌লো, "মিষ্টান্ন কি বাবা! মিষ্টান্নের মধ্যে মুড়ি পাওয়া যায়, চিঁড়ে পাওয়া যায়, ঘোল পাওয়া যায়, আর—আর—আর—"

বোলেছি বটে বড় অসুখ, ক্ষুধায় কিন্তু পৃথিবী অন্ধকার দেখ্‌ছি ; কি করি, বুড়ীকে বোল্লেম, "ঐ রকম মিষ্টান্নই পেটের অসুখে বড় ভাল। চিঁড়ে আর ঘোল ভাল, ঐ দুরকম মিষ্টান্ন হোলেই ঠিক হবে।"

আমার উত্তর শ্রবণ কোরে বুড়ী আপনা আপনি কি বোক্‌তে বোক্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিক পরেই আমার ভাগ্যে ঘোল-চিঁড়ে হাজির।

প্রাণধারণের অনুরোধে যৎসামান্য ঘোল-চিঁড়ে আমি ভক্ষণ কোল্লেম, কিন্তু চিঁড়েগুলি সহজে আমার উদরস্থ হলো কি না, বোল্‌তে পারি না। কারণ, চিঁড়েগুলির আকার কিছু বৃহৎ, বর্ণও আরক্ত, গন্ধও বিকৃত! তাদৃশ বস্তু মানুষে ভক্ষণ করে, এমন বিশ্বাস আমার ছিল না, তথাপি যথাশক্তি চর্ব্বণে এক ছটাক আন্দাজ রক্তচিপিটক আমি ভক্ষণ কোরেছিলেম। পেটে থাক্‌লো না ; বুড়ী বিদায় হবার পরেই বমি হয়ে গেল। কপাটশূন্য জানালায় মুখ বাড়িয়ে বমনকার্য্য সম্পাদন কোল্লেম, গৃহমধ্যে কোন চিহ্ন থাক্‌লো না, আমার উদরেও থাক্‌লো না ; সুতরাং কেহই কিছু দেখ্‌তে পেলে না।

বেলা প্রায় দেড় প্রহর। নূতন রকম পোষাক পোরে, মুখে একটা চুরুট লাগিয়ে, ঘনশ্যাম এসে দর্শন দিলে। আমার মুখের কাছে চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে লোকটা গম্ভীর আওয়াজে বোল্লে, "কেমন, প্রস্তুত আছ? আহার হয়েছে? আপিস করবার সময় হয়েছে। এসো আমার সঙ্গে।"

আফিস কি, জন্মাবধি আমি কখনো শুনি নাই। কি রকমে আফিস করে, তাও আমি জানতেম না। কিন্তু অপ্রস্তুত কেন হব, কৌতূহলে কৌতুকী হয়ে

তৎক্ষণাৎ আমি উঠে দাঁড়ালেম ; অগ্রে অগ্রে ঘনশ্যাম, পশ্চাতে আমি, দুজনে একসঙ্গে সে ঘর থেকে বেরুলেম। চতুর্দ্দিকেই আমার চক্ষু বিঘূর্ণিত।

তিনখানা ঘরের পরে আর একখানা ঘর। ঘনশ্যাম সেই ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। ঘরটা কিছু জম্‌কালো। মেজেতে ক্যাম্বিস মোড়া ; মাঝখানে একটা বড় টেবিল ; ধারে ধারে ৩।৪ খানা ছোট ছোট চৌকী। টেবিলের উপর রাশীকৃত চোতা কাগজ, ধারে ধারে সেই রকম কাগজে নানা বর্ণের নানা প্রকার জিনিস ;—ছোলা, মাষকলাই, প্রেক, তেঁতুলবীচি, সাগুদানা, কুল, সাবান, মসিনা, তেজপত্র, কাবাবচিনি ইত্যাদি।

টেবিলের পার্শ্বে একখানা সাদা রঙের গড়াপাতা ক্ষুদ্র বিছানা। সেই বিছানার উপর মুন্সীধরণের একজন বৃদ্ধ খাতাপত্র কোলে কোরে চক্ষু বুজে বোসে আছে, দু-কাণে দুটো সরকাঠীর কলম গোঁজা। লোকটীর চেহারা মন্দ নয়। বর্ণ অর্দ্ধ গৌর, গঠন দীর্ঘও নয়, খর্ব্বও নয়, মোটাও নয়, রোগাও নয়, দিব্য পাকাগোঁফ, মাথার চুলগুলিও শ্বেতবর্ণ, পশ্চাদ্দিকে ঘাড়ের নীচে খোঁপাবাঁধা, বয়স অনুমান ৬০।৬৫ বৎসর।

আমি, ঘনশ্যাম আর সেই মুন্সী, এই তিনজন মাত্র তথায় উপস্থিত। ঘনশ্যাম আমাকে বোসতে বোল্লে, টেবিলের দক্ষিণ ধারে একখানি চৌকীর উপর আমি বোস্‌লেম ; আমার গা ঘেঁসে আর একখানা চৌকীতে ঘনশ্যাম নিজেও বোসলো।

ঘনশ্যাম আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আপিসের কাজকর্ম্ম তুমি জানো ?" —আমি উত্তর কোল্লেম, আফিস কাকে বলে, তাই জানি না। আফিসের কাজকর্ম্ম কিরূপে জান্‌বো ?" ঘনশ্যাম পুনরায় বোল্লে, "আপিস ইংরাজী কথা, যে বাড়ীতে অথবা যে ঘরে বিষয়কার্য্যের লেখাপড়া হয়, তারই নাম আপিস।"

আমি কিছু উত্তর দিব মনে কোচ্ছিলেম, এমন সময় সেই ঘরে ৫।৭ জন লোক প্রবেশ কোল্লে। সকলেরই চাপ্‌কান গায়, বড় বড় পাগ্‌ড়ী মাথায়। তাদের মধ্যে দুজনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভুঁড়ী। সচরাচর সাধারণ লোকে যাকে ঢাকাই জালা বলে, সেই রকমের ভুঁড়ী, মানুষের তত বড় ভুঁড়ী হয়, আমি আর কখনো দেখি নাই। ভুঁড়ীর ভারে কাতর, কাজেই আর তারা বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পাল্লে না, ধুপ্ ধুপ্ কোরে দুজনে দুখানা চৌকীর উপর বোসে পোড়্‌লো। চৌকী দুখানা মড়্ মড়্ শব্দে কেঁপে উঠ্‌লো। বাকী লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের টেবিলের উপর হাত দিয়ে দিয়ে এক এক রকম জিনিস পরীক্ষা কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। ভাবে বুঝ্‌লেম সেখানে খরিদ-বিক্রী দুই-ই চলে। কেহ কেহ খরিদ করে, কেহ কেহ বিক্রয় করে। সকলেই ব্যাপারী। ভুঁড়ীওয়ালারা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গায়ের চাদরের বাতাস খেতে খেতে বার দুই তিন বড় বড় হাই তুল্লে। ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে একজন বোল্লে, "ভাই সায়েব, তুমি সেদিন আমার কাছে যে একখানা ইস্তাহার পাঠিয়েছিলে, সেখানা ভারী চমৎকার! তেমন ইস্তাহার ইতিপূর্ব্বে আমার নজরে আর একখানাও পড়ে নাই। সেই কারবারে আমার বড় ইচ্ছা।"—তিনবার মাথা নেড়ে নেড়ে হুঁ হুঁ দিয়ে ঘনশ্যাম একটু হাস্য কোল্লে। তার পর অনেক রকম

কথা হলো, জিনিসপত্রের দর-দস্তুর ঠিক করা হলো, ভুঁড়ীওয়ালারা ছাড়া অন্য লোকেরা বিদায় হবার উপক্রম কোল্লে, এমন সময় আর একজন লোক এলো। সে লোকের চাপকান পাগড়ী ছিল না, বাঙ্গালীর মত সাদাসিদা কাপড় পরা, দেখতেও বেশ সুশ্রী। বয়স অনুমান ৫০।৫২ বৎসর। ঘনশ্যাম তাকে চিনতো না, তথাপি আদর কোরে বসালে। লোকটী বোল্লে, "যে কারবারে পাঁচবৎসরে লক্ষপতি হওয়া যায়, সেই কারবারে আমি অগ্রিম ৫০৲ টাকা জমা দিতে এসেছি, কারবারের নিয়মাবলী একবার দেখ্‌তে চাই।"

মহাজনের পার্শ্বে বৃদ্ধ মুন্সীজী বোসে বোসে ঝিমুচ্ছিলেন, মহাজন তার দিকে ফিরে একবার একটা ঘণ্টা বাজালেন, মুন্সীর চমক ভাঙ্‌লো। কারবারের ভাষায় মহাজন ঘনশ্যাম সেই মুন্সীকে কি উপদেশ দিলে, মুন্সী তখন বড় একখানা খাতা হাতে কোরে সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দুই কাণে দুটী কলম। পঞ্চাশ টাকা জমা হবে, নিয়মাবলী জানাতে হবে, ঘনশ্যামের বড়ই আহ্লাদ, মুন্সীজী বড়ই ব্যস্ত। আগত ব্যাপারীরাও আহ্লাদে কৌতুকে একবার ঘনশ্যামের মুখের দিকে, একবার সেই নূতন লোকটীর মুখের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাইতে লাগ্‌লেন।

এইবার নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা। ঘনশ্যাম নিজেই ব্যাখ্যাকর্ত্তা। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তিনি বোল্লেন, "লক্ষপতি হওয়া ছোট কথা। দশ টাকা জমা দিলেই পাঁচ বৎসরে আপনি লক্ষপতি হোতে পারেন। আচ্ছা এনেছেন পঞ্চাশ টাকা, দিয়ে যান পাঁচগুণ ; পাঁচ দশে পঞ্চাশ ; পাঁচ বৎসরে আপনি পাঁচ লক্ষ টাকা পাবেন। যদি কিছু বেশী হয়, সেটা আমার এই মুন্সীজীকে দস্তুরী বোলে বকসীস দিয়ে যাবেন। জমা দিন। লেখ হে মুন্সী!"

সকলেরই চক্ষু তখন মুন্সীজীর মুখের দিকে নিক্ষিপ্ত হলো। কাণের একটী কলম খুলে নিয়ে মুন্সীমহাশয় সেই আগন্তুক জমাদাতাকে নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনার নাম কি মহাশয়?"—জমাদাতা বোল্লেন, "হরেরাম শুকুল, নিবাস পাটনা, খয়রাতগঞ্জ।"

মুন্সী সেই নাম-ধাম লিখে নিলেন। টাকা হাতে না পেয়ে অঙ্কপাত করা হয় না, সুতরাং অঙ্কপাত কোল্লেন না, হাঁ কোরে সেই লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোক বোল্লেন, "নিয়মের কথাটা অগ্রে শোনা যাক্‌, তার পর বন্দোবস্ত।"

অট্টহাস্য কোরে ঘনশ্যাম বোল্লেন, "ও হো হো! ওটা আমার ভুল হোচ্ছিলো বটে। নিয়ম হোচ্ছে এই—অগ্রিম দশ টাকা জমা দিলে পাঁচসের তেঁতুলবীচি প্রদান করা হয়। তেঁতুলবীচিকে বাঙ্‌লাদেশে কাঁইবীচি বলে, এ কথাও বোধহয় আপনি জানেন। সেই কাঁইবীচিগুলি বর্ষাকালে একটা জমীতে ছড়িয়ে দিতে হয়। সকল বীচিতেই গাছ হয়, একটা বীচিও নষ্ট হয় না। পাঁচ বৎসরে সেই সব গাছ বড় হয়, ফল ধরে। মনে করুন, পাঁচসের কাঁইবীচিতে দশ হাজার গাছের কম জন্মে না। এক একটা গাছে বৎসরে যদি এক টাকার তেঁতুল বিক্রী হয়, তা হোলে দশহাজার টাকা। আমি খুব কম কোরেই হিসাব ধোল্লেম ; বাস্তবিক বিশ হাজার টাকা। আর সেই গাছগুলি যদি কেটে কেটে কয়লা করা

হয়,—তেঁতুলকাঠের কয়লার দাম খুব বেশী, দশ হাজার গাছের কয়লা আশী হাজার টাকায় বিক্রী হবে। তবেই ধরুন্ লক্ষ টাকা।”

নিয়মাবলী শ্রবণ কোরে হরেরাম শুকুলের চক্ষু স্থির! জমা দিবার জন্য টাকা বাহির কোচ্ছিলেন, সেগুলি সামলে রেখে, ঘনশ্যামকে সেলাম দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ; একটীও বাক্যব্যয় না কোরে মস্ মস্ শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুন্সীর হাতের কলমটা খোসে পোড়লো, সকলের মুখ শুকিয়ে গেল, দর্শক লোকেরা অবাক্! আমি ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চমকিত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরালেম। ভয়ের সঙ্গে ঘৃণা এসে আমাকে নিতান্তই অবশ—অস্থির কোরে ফেল্লে।

যারা এসেছিলো, কাজকর্ম্ম দেখে তারা চোলে গেল, জমা না পেয়ে হতাশ হয়ে শুষ্কবদনে মুন্সী গিয়ে আপন আসনে উপবেশন কোল্লেন, ঘনশ্যাম গম্ভীরবদনে বোসে রইলেন। আফিসের কাজকর্ম্ম তখনকার মত সমাধা হলো, আমি কেবল দেখ্লেম আর শুনলেম, আমাকে আর কোন কাজ স্বহস্তে কোত্তে হলো না।

একটু পরে ঘনশ্যাম উঠে গেলেন। মুন্সীর কাছে বোসে বোসে খানিকক্ষণ আমি তাঁর ঘুমন্ত চক্ষু দর্শন কোল্লেম, তার পর আমিও সে ঘর থেকে বেরুলেম।

বাড়ীখানা খুব বড়, কিন্তু অনেক দিনের জীর্ণ। বাহিরদিকে বারান্দা ছিল না, পূর্ব্বকালে বোধ হয়, সে প্রকার পদ্ধতিও ছিল না, ছোট ছোট জানালা রাখলেই বাড়ী মানাতো, সে রকমের বাড়ী। আমার মনের ভিতর যা হোচ্ছিলো, অট্টালিকা বর্ণনা করা তার কাছে ছোট কথা। বাড়ীতে অনেক ঘর ; একতালা, দোতালা, তেতালা। সকল ঘরেই লোকজন আছে কি না, সেটা আমি প্রথমে জান্তে পাল্লেম না, জানবার ইচ্ছাও হলো না। আমার ইচ্ছা কেবল পলায়ন। দোতালার একটা ঘরের জানালা দিয়ে দেখ্-লেম, বাহিরে রাস্তার দিকে ফটক ; সেই ফটকে একজন দরোয়ান বোসে দুই হাতে গাঁজা টিপ্‌ছে আর হিন্দুস্থানী সুরে গান গাচ্ছে। ফটকে দুখানা বৃহৎ বৃহৎ কপাট, সেই কপাটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটে তালায় চাবী বন্ধ। জানা হলো আফিসবাড়ী, কিন্তু আফিসবাড়ীর ফটকে দিনের বেলা চাবী বন্ধ থাকে কেন, সেটা আমি বুঝতে পাল্লেম না। ঘর অসংখ্য ; কোন দিকের কোন ঘরে কি, দেখতে পেলেম না, ভাবতে ভাবতে উপর থেকে নীচে নেমে এলেম। সকল ঘরেই মানুষ আছে, গরু আছে, ছাগল আছে, ভেড়া আছে। অনেক ঘরে কাজকর্ম্মও হোচ্ছে ; ঘর প্রায় খালি নাই। এক জায়গায় দেখি, কামারেরা বড় বড় জাঁতায় লৌহ দগ্ধ কোচ্ছে, বড় বড় হাতুড়ী দিয়ে লোহা পিট্‌ছে, অনেক দূর পর্য্যন্ত আগুন ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে যাচ্ছে, মিস্ত্রীরা নানারকম গড়ন প্রস্তুত কোচ্ছে। সকলেই ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর। আর এক জায়গায় দেখি, করাতী মিস্ত্রীরা বড় বড় বাহাদুরীকাঠ চিরে চিরে জমা কোরে রাখ্‌ছে, র‍্যাঁদা-বাটালীর কার্য্যও হোচ্ছে, করাতীরা এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম পাচ্ছে না। আর এক জায়গায় স্তূপাকার ধোঁয়া উঠ্‌ছে, পাঁচ সাতজন লোক সেইখানে হৈ হাই কোরে গোলমাল কোচ্চে ; বোধ হলো, কি যেন পোড়াচ্ছে। আর এক জায়গায় ভেড়া-ভেড়ী জবাই হোচ্ছে, রক্তের ঢেউ খেলাচ্ছে,

বড় বড় ছোরা-হাতে দাড়ীওয়ালা লোকেরা চতুর্দ্দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর খানিক এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লেম, উচ্চ উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মস্ত একটা পুষ্করিণী, জল সবুজবর্ণ, ধারে ধারে তক্তার মাচান, ধোপারা সেই সকল তক্তার পাটে কাপড় কাচ্ছে। লোক অনেক। সকল লোকই নানা কাজে ব্যস্ত। কোন দিকেই আমি পালাবার পথ পেলেম না। অত বড় বাড়ীতে একটামাত্র ফটক, অন্য কোনদিকে আর দরজা নাই, এটাও আ-রোধ হলো। আবার উপরে উঠে গেলেম।

যে ঘরে মুন্সীজী, যে ঘরটার নাম আফিসঘর, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। মুন্সী তখন খাতাপত্র বন্ধ, কাণেও কলম নাই। তিনি তখন কাঁইবীচির ঝুড়ীগুলা সাজিয়ে সাজিয়ে একধার থেকে আর একধারে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌ছেন, আর অনবরত ঘাম্‌ছেন। বৃদ্ধ লোকের উপর অত বড় শক্ত কাজের ভার, সেটাও আমি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা মনে কোল্লেম। আমি প্রবেশ করবামাত্র মুন্সীজী আপন হাতের কাজ পরিত্যাগ কোরে হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা চৌকীর উপর বোসে পোড়্‌লেন। পূর্ব্বে আমি ঘরের উপরদিকে চেয়ে দেখি নাই, কড়িকাঠে খুব লম্বা একখানা টানাপাখা ঝুল্‌ছিলো, দেয়ালের গায়ে দড়ী বাঁধা ছিল। মুন্সী সেই দড়ীগাছটা খুলে নিয়ে আপন হস্তেই পাঙ্খাওয়ালার কাজ কোত্তে লাগ্‌লেন, আমাকে নিকটে বোস্‌তে বোল্লেন। আমিও সেই পাখার নীচে বোস্‌লেম। পাখার বাতাসে শরীর একটু জুড়ুলো। কথায় কথায় মুন্সীর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হলো। আমার জীবনকাহিনীর গোটাকতক কথা শুনেই তিনি এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। কি যে তিনি বুঝ্‌লেন, কি যে তাঁর মনে হলো, প্রথমে আমি সেটা অনুভব কোত্তে পাল্লেম না, তিনি কিন্তু আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কাতরভাব জানাতে লাগ্‌লেন।

কথায় কথা বাড়ে। ইচ্ছা কোরেই আমি কথা বাড়ালেম। ঘনশ্যামের পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেম। মুন্সীজী দিব্য সরলপ্রকৃতি, কোন বিষয়ে কোন কথায় তাঁর একটু কপটতা আমি ধোত্তে পাল্লেম না। পূর্ব্বে তিনি ঘনশ্যামের মুখে আমার একটু পরিচয় পেয়েছিলেন, নামটীও শুনেছিলেন, সেই সূত্রে আমার নাম ধোরেই সম্ভাষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। দ্বিতীয়বার নিশ্বাসত্যাগ কোরে তিনি বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি এখানে কেন এসেছ? এ জায়গা ভাল নয়, এখানকার বাতাস পর্য্যন্ত পাপরক্তে মাখা। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার উপর ঘনশ্যামের অধিক প্রভুত্ব চলে। এখান থেকে যদি আমি চোলে যাই, যমের বাড়ী না গেলে ঘনশ্যামের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব না, ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার জীবনান্ত সম্বন্ধ ; সেই জন্যই আমি আছি। তুমি কেন এ নরককুণ্ডে প্রবেশ কোরেছ?"

সত্য সত্য উত্তর দিয়ে পুনর্ব্বার আমি ঘনশ্যামের পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুন্‌লেম, জাতিতে ঘনশ্যাম চাষা-গয়লা, ঘনশ্যাম বিশ্বাস নামে পরিচয়, পেশা দালালী। সকল কাজের দালালী করাই ঘনশ্যামের কার্য্য। এ বাড়ীতে তিনি সর্ব্বদা আসেন না, সকল দিন আসেনও না, সাত দিন অন্তর, দশ দিন অন্তর, কখনো বা একমাস অন্তর একবার আসেন, লোকজনের উপর

জুলুম করেন, মনের মতন ব্যাপারী পেলে দস্তুরমত ব্যাপারও করেন। কাঁইবীচির কারবারেই তাঁর বেশী ঝোঁক।

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, দিনের বেলা ফটকে চাবী দেওয়া কেন? মুন্সী বোল্লেন, "তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন; বেরিয়ে গেলেই সদরফটকে চাবী পড়ে। এ বাড়ীতে যে সকল লোক থাকে, সকলকেই তিনি কেনা গোলাম মনে করেন। সকলের কাজের উপার্জ্জন তিনি নিজেই গ্রাস কোত্তে চান। তুমি এখানে এসেছ, বাহির হোতে না পার, দরোয়ানকে সেইরূপ হুকুম দিয়ে গিয়েছেন; আমাকেও বোলে গিয়েছেন, 'ছেলেটাকে ছেড়ো না।' ভাবভক্তি আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই, তোমাকে গোলাম কোরে রাখাই বোধ হয় তাঁর মতলব। যা হোক, তুমি ভয় পেয়ো না। যাতে তুমি নিরাপদে এস্থান থেকে প্রস্থান কোত্তে পার, আমি তার উপায় কোরে দিব। আমি ব্রাহ্মণ, আপাততঃ পাঁচ সাত দিন তুমি এইখানে থাকো। আমি স্বয়ং রন্ধন কোরে ভোজন করি, আমার কাছেই তুমি আহার কোর্‌বে, আমার ঘরেই শয়ন কোর্‌বে। কষ্ট যাতে না হয়, সাধ্যমতে আমি সেই রকম ব্যবস্থা কোর্‌বো। তোমাকে নূতন এনে রেখে গিয়েছেন, বোধ হয়, এবার আর তিনি বেশী দিন বাইরে বাইরে থাক্‌বেন না, শীঘ্রই ফিরে আসবেন। তোমার কিরূপ ব্যবস্থা করেন, সেইটী জেনে শুনে যাহা কর্ত্তব্য আমি অবধারণ কোর্‌বো।"

আমি একটু আশ্বস্ত হোলেম। ব্রাহ্মণ আমার মুক্তির উপায় কোরে দিবেন, এইটুকু মাত্র আশবাস। মনের ভয় মনেই থাক্‌লো, মনের ঘৃণা মনেই চাপা দিয়ে রাখ্‌লেম, মুন্সীর কাছেও সে কথা প্রকাশ কোল্লেম না।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। যে যে ঘরে মানুষ থাকে, সেই সব ঘরে এক একটা প্রদীপ জ্বালা হলো। লোকেরা সব নানা প্রকার গোলমাল কোত্তে লাগ্‌লো। আমার মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, কোন দিকে আমি মন দিতে পাল্লেম না। আফিস-ঘরের আশে পাশে যে সকল ঘর, একে একে সেই সব ঘরে আমি উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। যে ঘরে আলো, সে ঘরে দুই একজন মানুষ, যে ঘর অন্ধকার, সে ঘর খালি; আরশোলা, মাকড়সা, ছুঁচো আর ইঁদুরেরা সেই ঘরের বাসিন্দা; ঘরগুলিও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ,—সমস্তই দুর্গন্ধ। পাপের পরাক্রম যেখানে অধিক, সেখানে শান্তির ছায়া পড়ে না, এই কারণেই আমার মনে তত ভয় ও তত ঘৃণা। রাত্রি চারি দণ্ডের পর মুন্সীর ঘরে ফিরে গেলেম, এক প্রহরের মধ্যেই তাঁর রন্ধনকার্য্য শেষ হলো। আমার জাতিজন্ম আমার জানা ছিল না, উভয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বোসে আহার কোল্লেম। শেষকালে সেই বুড়ী এসে মুন্সীর পাতে প্রসাদ পেলে, উচ্ছিষ্ট স্থানগুলি পরিষ্কার কোরে দিয়ে গেল, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শয্যায় মুন্সীর ঘরেই আমরা শয়ন কোল্লেম।

মনে আমার আর এক ভাবের উদয়। মনে মনে না রেখে চুপি চুপি মুন্সীজীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা মহাশয়! আপনি যে বোল্লেন, ঘনশ্যামবাবু সর্ব্বদা এখানে থাকেন না, কত দিন অন্তর এক একবার আসেন? সে সব দিন তবে থাকেন কোথায়?"

মুন্সী উত্তর কোল্লেন, "কিছুই ঠিক নাই, কোথায় যে কখন থাকেন, কোন

কার্য্যে যে কখন ব্যস্ত, কেহই সে কথা বোল্‌তে পারে না। তবে আমি কেবল এইটুকু জানি, হুগলীজেলার সপ্তগ্রামের কাছে কি একখানা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেইখানে একখানা আড়ত আছে, সেইখানেই মধ্যে মধ্যে আড্ডা হয়। কুলিধরা কাজ একটা ভাল ব্যবসা,—যাদের কাজ, তারাই বলে ভাল। এই ঘনশ্যামবাবু সেইখান থেকেই ছেলেধরা ব্যবসাটা চালান; ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ধোরে নদীয়াজেলায় আর অন্য অন্য জায়গায়, যেখানে নীলকুঠী আছে, সেই সব জায়গায় চালান দেন। পাপের কর্ম্ম কি না, এক এক সময় এমনি ঘটে, ঘনশ্যামের আহার পর্য্যন্ত জোটে না; সে সময় তিনি বড় বড় কুঠীয়াল লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন; মুষ্টিভিক্ষা নয়, মোটা মোটা সাহায্য ভিক্ষা। কোথাও ফল ফলে, কোথাও অর্দ্ধ ফলন কেবল কুঠীয়ালের কথাই বা কেন বলি, রকমারী দাতালোকের শরণাপন্ন হওয়াও ঘনশ্যামের অভ্যাস। সেই প্রকারের দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছে, আমি তার সন্ধান জানতে পেরেছি। আর সেই যে হরেরাম শুকুলটী এসেছিলেন, সত্য তিনি হরেরাম শুকুল নন; আমি তাঁকে চিনি। এখন সে কথা আমি তোমাকে বোল্‌বো না; এখন তোমাকে এখান থেকে মুক্ত করাই আমার কাজ। এব পর যদি কখনো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তুমি আমার মুখে ঘনশ্যামচরিত সবিশেষ শুনতে পাবে। আমার নাম গয়ারাম মিশ্র, আমার পিতামহ নবাব-সরকারে চাকরী কোত্তেন, তাঁর পদবী ছিল মুন্সী। সেই জন্য এখনও আমরা পুরুষানুক্রমে মুন্সী। আমার নিবাস নবদ্বীপ। আর দেখ হরিদাস! আমি যে এখানে থাকি, ঘনশ্যামের চাক্‌রী করি না, কাজকর্ম্ম করি, বেতন গ্রহণ করি না, বরং ঘনশ্যাম আমার কাছে মধ্যে মধ্যে বিশ পঞ্চাশ টাকা হাতকর্জ্জ বোলে গ্রহণ করেন, শেষে উবুড়হস্ত হন না, তবু আমি দিই। কেন দিই, সে কথাও এখন ভাঙ্‌বো না। আমার পিতার কাছে ঘনশ্যামের দস্তখতী পঞ্চাশখানা খত ছিল, পিতার মৃত্যুর পর সেই সকল খত আমার হাতে এসেছে। আমি যদি পীড়াপীড়ি করি, সেই ভয়ে আমার নাম জাল দস্তখত কোরে ঘনশ্যাম অনেক টাকার জালখত আপন হস্তে রেখেছে। আমি যদি এখানকার কাজকর্ম্ম ছেড়ে অন্যস্থানে চোলে যাই, সেই সময় আমাকে জব্দ কোর্‌বে, এইটীই তার মতলব। সেই জন্যই আমি বোল্‌ছি, আমার উপর ঘনশ্যামের অধিক প্রভুত্ব। আমার খাতক আমার হাতে থাক্‌লো না, কালের গতিকে আমিই এখন তার হাতের ভিতর। সেই দিন একবার—"

ঘরের দরজা খোলা ছিল, ঘরে প্রদীপ জ্বোল্‌ছিলো, মুখে ঐ কথাটী নির্গত হোতে না হোতেই কে একজন হঠাৎ ঘরের ভিতর এসে ধমক দিয়ে বোল্লে, "এত রাত পর্য্যন্ত ঘুম নাই? কোথাকার একটা পলাতক ছোক্‌রাকে ধোরে এনেছে, তার কাছে ঐ সকল ঘরের কথা? এবার তিনি এলেই এই সব কথা আমি বোলে দিব, দুজনে তোরা ইংরেজের জেলখানায় পোচে মোর্‌বি!"

আমি চোম্‌কে উঠ্‌লেম। মুন্সীজীও ভয় পেলেন। তিনি বোল্লেন, "কস্তুরো! এত রাত্রে তুই এখানে কি কোত্তে এলি? ঘরে যা!—শুগে যা! বোলে দিয়ে যা কোত্তে পারিস, চেষ্টা করিস, তোকেও আমি ভয় করি না, তাকেও আমি ভয় করি না।"

যার সঙ্গে মুন্সীজীর ঐ রকম কথা-কাটাকাটি, কে সে?—যে আমাকে ঘোল-চিঁড়ে এনে দিয়েছিল, সেই বুড়ী। মুন্সীজীর কথা শুনে খিলখিল কোরে হেসে বুড়ী তখন চুপি চুপি বোল্লে, "সেজন্য নয় গো, সেজন্য নয়, এই ছেলেটীকে দেখে আমার কেমন মায়া হয়েচে, কি কোচ্চে, তাই আমি দেখ্‌তে এসেচি। তুমি বোলেচ, ঠিক কথা! কর্ত্তা আমাদের দু-এক দিনের মধ্যেই ভিক্ষাযাত্রা কোর্‌বেন, আমি তার আভাষ পেয়েছি, সেই সময় এই ছেলেটীকে তুমি এখান থেকে সোরিয়ে দিও, আমি তোমার সহায় হবো।

এই কথা বোলেই বুড়ী চোলে গেল, সে প্রসঙ্গে আমরাও আর কিছু বলা-বলি কোল্লেম না, ঘুমিয়ে পোড়্‌লেম। নিরুদ্বেগে রজনী প্রভাত হলো। পাঁচ সাত দিন আমি মুন্সীজীর কাছেই থাক্‌লেম, কাজকর্ম্ম কিছুই কোত্তে হলো না, রাশীকৃত কাঁইবীচি দেখে দেখেই কেবল হাসলেম আর ভগবানকে ডাক-লেম।

অষ্টম রজনীতে ঘনশ্যাম দর্শন দিলেন। বাড়ীর মধ্যে সোরগোল পোড়ে গেল। রাত্রি প্রায় এক প্রহরের কাছাকাছি। কর্ত্তা এসেই উপরে উঠে অগ্রে আমাকেই খোঁজ কোল্লেন। মুন্সীর ঘরে আমি শুয়েছিলেম, মুন্সী আমাকে ডেকে দিলেন, নিজেও আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে কর্ত্তার সম্মুখে দাঁড়া-লেন। সকলকে বিদায় দিয়ে ঘনশ্যাম কেবল আমাকেই নিকটে রাখ্‌লেন। যেটার নাম আফিসঘর, সেই ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। ঘরে আলো ছিল না, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে ফটকের সেই দরোয়ান এসে একটা আলো জেলে দিয়ে গেল। দুজনে আমরা দুখান চেয়ারে বোসলেম। চেয়ার, টেবিল, আফিস, এ সকল নাম আমি জানতেম না, ক্রমে ক্রমে শিক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। এতদিন আচার্য্যগৃহে শিক্ষা পেয়েছি, সে শিক্ষা অন্যপ্রকার ;—সে শিক্ষা কেবল পুথি-গত ; সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশে এখন অবধিই আমার সংসার-শিক্ষা আরম্ভ।

পঞ্চম কল্প

দালালী ইস্তাহার

ঘনশ্যাম হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন ছোক্‌রা! এখানকার কাজকর্ম্মের ধরণ-ধারণ সব দেখলে শুনলে? অনেক লোক এখানে অনেক রকম কাজ করে, বেশ দশ টাকা রোজগার করে ; কোন কাজে তোমার মন যায়, সেইটী জানবার জন্যই এই বাড়ীতে তোমায় আনা। সেদিন একটা বিশেষ জরুরী কাজের খাতিরে হঠাৎ তাড়াতাড়ি আমাকে স্থানান্তরে চোলে যেতে হয়ে-ছিল, সকল কথা তোমাকে বোলে যেতে পারি নাই, মুন্সীর উপরেই ভার দিয়ে গিয়েছিলেম ;—কেমন, কি রকম বুঝ্‌লে? কোন কাজে তোমার ইচ্ছা হয়?"

আমি চুপ্ কোরে থাক্‌লেম। কি উত্তর দিব?—কাঁইবীচির কারবার, নাম শুনেই অরুচি জন্মে,—ভয়ানক জুয়াচুরি ফন্দী বোলেই বিশ্বাস হয় ; সে

কারবারে আমার মত বালকের প্রবৃত্তি আসতেই পারে না, সকলেই এটা বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। তা ছাড়া—লোহা পেটা, কাঠ কাটা, ভেড়া কাটা, তক্তা চেরা, কাপড় কাচা, এ সকল কার্য্য ভদ্রলোকের নয় ; কাজেই আমি মাথা হেট কোরে নীরব হয়ে থাক্‌লেম।

ভাব দেখে, গম্ভীর হয়ে, গম্ভীরবদনে একটু হেসে, গম্ভীরস্বরে ঘনশ্যাম বোল্লেন, "হাঁ হাঁ, বুঝা গেছে, ও সব কাজে তোমার মন যাবে না, লেখাপড়ার কাজটাই তুমি ভালবাস। আচ্ছা, লেখো দেখি, কেমন লিখ্‌তে পার দেখি।"

কথা বোল্‌তেও যতক্ষণ, কাজ কোত্তেও ততক্ষণ। দুইখানা বড় বড় সাদা কাগজ আর দোয়াত-কলম আমার সম্মুখে ধোরে দিয়ে, পুনর্ব্বার গম্ভীরস্বরে তিনি বোল্লেন, লেখো! যা যা আমি বলি, ঠিক ঠিক লিখো। সাবধান!—খবরদার! ভুল কোরো না, ঠিক্‌ ঠিক্‌ লিখে যাও!

উপদেশগুলি আমি মনেই রাখ্‌লেম ; উত্তর কোল্লেম না। তিনি এক এক কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, আমি সাবধান হয়েই লিখ্‌তে লাগ্‌লেম।

"পরমার্থ-বিদ্যা"

"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া, চন্দ্রসূর্য্যাদি নবগ্রহকে এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালকে সাক্ষী রাখিয়া, এতৎ ইস্তাহারপত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে আহবান করা যাইতেছে, সপ্তাহের মধ্যে জ্ঞানদর্পণে যাঁহারা বিষ্ণুমূর্ত্তি-দর্শন করিতে বাসনা রাখেন, তাঁহারা প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবারে দামোদরে প্রাতঃস্নান করিয়া বর্দ্ধমানের পরমার্থ-কুটীরে শ্রীশ্রীসাধুসেবক ঘনশ্যাম সরস্বতীর নিকটে আগমন করিবেন। চিত্রকূটপর্ব্বতের সাধু মহাপুরুষের নিকট অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানদর্পণ লাভ করা হয়েছে। দর্পণের জ্যোতিতে দিনমানে সূর্য্যরশ্মি মলিন হয়। সেই দর্পণে ভক্তিপূর্ব্বক নয়ন অর্পণ করিলে শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী নবঘনশ্যাম চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিতে পাইবেন। তেমন মূর্ত্তি কেহ কখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই, কস্মিনকালে পারিবেও না। আসুন—আসুন—আসুন! অদ্ভুত ব্যাপার! অদ্ভুত ব্যাপার! অদ্ভুত ব্যাপার! সে মূর্ত্তি দর্শন করিলে ভবধামে আর জন্ম লইতে হইবে না। দর্শনী কেবল এক টাকা পাঁচ আনা মাত্র। এই ইস্তাহার-প্রেরণের ডাক-মাশুল অগ্রিম ছয় পয়সা। প্যাকিং খরচা আমার নিজের।"

এই ইস্তাহার আমি লিখ্‌লেম। হাত কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো ; সর্ব্বশরীরে ঘাম হলো। তত বড় ভয়ানক দাগাবাজীর অক্ষরগুলো আমার হাত দিয়ে বেরুলো, তাই ভেবে মনে মনে বিস্তর অনুতাপ কোল্লেম। কাগজখানা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুই তিনবার দেখে দেখে, ইস্তাহার-ওয়ালা ঘনশ্যাম প্রফুল্লবদনে বোল্লেন, "বেশ হয়েছে। দিব্বি হয়েছে! অক্ষর-গুলি যেন মণিমুক্তার হারের মতন শোভা পাচ্ছে! বেশ ছোক্‌রা তুমি! আচ্ছা, ইস্তাহারের অক্ষর তো বেশ হলো, এখন একখানা দরখাস্ত লেখো দেখি। দরখাস্তের অক্ষর যদি এই রকম হয়, তা হোলে আমি তোমাকে খুব বড়

একটা নীলকুঠীতে বড় একটা চাক্‌রী কোরে দিব। আমার শ্বশুরের পিসতুতো ভগ্নীপতির মেজো কাকা সেই কুঠীর সর্ব্বেসর্ব্বা দেওয়ানজী।"

ইচ্ছা হলো উঠে পালাই, কিন্তু কায়দায় পোড়ে গেছি, কোথায় যাব? গুরুঠাকুরাণী আমাকে অম্‌নি অম্‌নি বিদায় কোরে না দিয়ে এমন ভয়ংকর লোকের হাতে গছিয়ে দিলেন কেন, কিছুতেই বুঝতে পাল্লেম না। ভাবছি, ঘনশ্যাম আবার আদর কোরে বোল্লেন, "কি হে! ভাব্‌ছ কি? ধর না! দরখাস্তখানা লিখে ফেলো!"

কাজে কাজেই তাই। আর একখানি কাগজ আমার হাতে দিয়ে কর্ত্তা বোলতে লাগ্‌লেন, "লেখো—মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত দাতালোক মহাশয় বরাবরেষু।—বিধাতার নিগ্রহে দুরদৃষ্টক্রমে গত ১৭ই চৈত্র তারিখে নিশাকালে আমার গৃহে হঠাৎ অগ্নি লাগিয়া সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। সাতখানি ঘর, পাঁচটী গাই গরু, মায় বাছুর, এক জোড়া বলদ, আটটী পরিবার, তিনটী বিড়াল, একটী প্রাচীন কুক্কুর, আর ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র নিঃশেষে ভস্ম হইয়াছে। আমি এককালে নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় হইয়াছি। দেশের বড় বড় রাজা, মহারাজা, দেওয়ান, নবাব, খাঁ সাহেব, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর এবং মহামান্য জমিদার মহোদয়গণের নামে রেজিষ্টারী করিয়া এক একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়াছি। এক্ষণে মহাশয়ের নামডাক শুনিয়া দ্বারস্থ হইয়াছি। মহাশয়ের তুল্য দাতা আমাদের এ অঞ্চলে নাই। অতএব প্রার্থনা এই যে, গরিবের প্রতি দয়া করিয়া আশ্রমনির্ম্মাণের ও ভরণপোষণের ও গোবধের প্রায়শ্চিত্তের খরচাগুলি দান করিলে চরিতার্থ হইব। এই পুণ্যফলে মহাশয় পুরুষানুক্রমে স্বর্গবাসী হইবেন। আমার দরখাস্তের মধ্যে যদি কোন মিথ্যাকথা লেখা থাকে, এমন সন্দেহ করেন, তাহা হইলে পাতিয়ালার মহারাজকে পত্র লিখিলে অনির্ব্বচনীয়রূপে সে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যাইবেক। কেননা, আমার পিতামহের এক শ্বশুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভ্রাতুষ্পুত্র পাতিয়ালার রাজসংসারে পূর্ব্বে মুহুরীগিরী চাক্‌রী—"

ঘৃণায় কলমটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালেম। ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, এইরূপ লক্ষণ বুঝ্‌তে পেরে কর্ত্তা তখন একটু উগ্রস্বরে বোল্লেন, "কি হে ছোকরা! তুমি এমন বেয়াদব কেন? লিখ্‌তে বোল্লেম একখানা দরখাস্ত, লিখ্‌তে লিখ্‌তে অমন কোরে ক্ষেপে উঠলে কেন? ঘাড়ে ভূত চাপলো না কি?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, ও রকম দরখাস্ত লেখা আমার কর্ম্ম নয়। ছেলেবেলা থেকে গুরুগৃহে আমি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন কোরেছি, ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ, তাহাই আপনি—"

শেষ পর্য্যন্ত না শুনেই কর্ত্তা একটু হাস্য কোরে বোল্লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝ্‌তে পেরেছি। ঘুম পেয়েছে। আচ্ছা, আজ ঐ পর্য্যন্তই থাক্, কল্য আবার দেখা যাবে। যাও, শয়ন কর গে।"

আমি যেন বাঁচ্‌লেম্। মুন্সীর ঘরে শয়ন কোত্তে যাচ্ছি, পশ্চাতে ডেকে কর্ত্তা আবার বোল্লেন, "আর দেখ, খুব ভোরে উঠো; ভোরে তোমাকে আমার দরকার আছে; বিশেষ দরকার; ভুলো না।"

পশ্চাতে একবার চেয়ে দেখ্‌লেম, কিন্তু কথা কইলেম না, সরাসর মুন্সীর ঘরে চোলে গেলেম। কর্ত্তা তার পর কি কোল্লেন, কোথায় থাক্‌লেন, কিছুই জানলেম না। আমি শয়ন কোল্লেম। শয়নের অগ্রেই দুর্ভাবনা জুটেছিল, শয্যা গ্রহণ করবামাত্র সেই ভাবনার পরিপাক। কি ভয়ানক লোক! বিষ্ণুদর্শনের ইস্তাহার! গৃহদাহের দরখাস্ত! সর্ব্বৈব মিথ্যা! এমন লোক সংসারে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কোরে বেড়ায়, মহাজনের বেশ ধারণ কোরে স্থানে স্থানে কারবার করে, কেহই ধরে না, কেহই কিছু বলে না, স্বচ্ছন্দে ফাঁকে ফাঁকে এড়িয়ে যায়, এটাও তো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! উঃ! উপাধি আবার সরস্বতী!—হায় হায়! মা সরস্বতী আর আশ্রয় করবার স্থান পান নাই!

ভাবতে ভাবতে নিদ্রা এলো, আমি ঘুমিয়ে পোড়লেম। খানিক পরে দরজা ঠেলে লোকেরা আমাকে ডাকাডাকি কোত্তে লাগ্‌লো, গোলমালে আমি জেগে উঠ্‌লেম, দরজা খুলে বেরুলেম। সম্মুখেই কর্ত্তা। তিনি আমার এক-খান হাত ধোরে উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে এলেন, ফটক পার হয়ে যখন আমরা রাস্তায় এলেম, তখন ঘোর অন্ধকার। ভোর নয়, রাত্রি তখন অনেক ছিল। সেই অন্ধকারে কর্ত্তা আমাকে কত দূরে নিয়ে গেলেন, ঠিক অনুমান কোত্তে পাল্লেম না।

যখন প্রভাত হলো, তখন দেখ্‌লেম, ঘনশ্যামের আর একরকম বেশ। মহাজনী পাগ্‌ড়ী নাই, চাপ্‌কান নাই, বদনে সে গাম্ভীর্য্য নাই, নূতন ভেক!—সব নূতন! পরিধান একখানা অল্প বহরের থানকাপড়, কাঁধে একখানা গাম্‌ছা, মস্তকের কেশ রুক্ষ, বগলে এক তাড়া কাগজ; বদন বিষণ্ণ; চলন-টাও একটু বাঁকা বাঁকা। লোকে দেখে মনে করে একটা পা খোঁড়া।

ভঙ্গী দেখে আমার মনে আর একটা সন্দেহ দাঁড়ালো। নূতন কি একটা দাগাবাজ মত্‌লবে এই লোক আজ বেরিয়েছে কি ফ্যাঁসাতেই আমাকে ফেলবে, মনে বড় ভয় হলো, ভয়ে ভয়ে মুখটী বুজে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি চোল্লেম। লোকটা আমার ডান হাতখানা খুব শক্ত কোরে ধোরে রইলো।

হেঁটে হেঁটেই চোলেছি। কতদূর চোলেছি, একটুও বিরাম পাচ্ছি না। পথে পথে ঘনশ্যাম আমাকে কত রকমের কত কথাই শিখিয়ে দিতে লাগ্‌লো, শুনে শুনে কেবল আমার ভয়, সংশয় আর ঘৃণাই বেড়ে বেড়ে উঠলো। বেলা এক প্রহর হয়ে গেল। এই সময় আমরা একটা লোকাকীর্ণ গঞ্জের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। বোধ হলো যেন সহর গঞ্জটা পার হয়ে গৃহস্থপল্লী পাওয়া গেল। সেইখানে ঘনশ্যাম আমাকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়ে বার বার সাবধান হোতে বোল্লে। কিছুই আমার ধারণা হলো না।

ষষ্ঠ কল্প

নূতন আশ্রয়

রাস্তার ধারে ধারে অনেকগুলি বাড়ী। ঠাঁই ঠাঁই ভাল ভাল অট্টালিকা। কোন কোন বাড়ীতে কি কি রকমের লোক থাকেন, বোধ হয়, ঘনশ্যামের জানা-

ছিল, সে আমার হাত ধোরে ধীরে ধীরে এক একখানা বাড়ীর দেউড়ীতে গিয়ে দাঁড়ালো, নানা সুরে কাঁদুনী গেয়ে, চক্ষে জল এনে, মুস্কিল আশানের ফকিরের মতন আশীর্ব্বাদ কোরে কোরে ভিক্ষা চাইলে, কিছুই ফল হলো না। অনেক জায়গাতেই তাড়া খেলে, দুই একখানা বাড়ীর চাকরেরা মুষ্টিভিক্ষা দিতে এলো, ঘনশ্যাম সে ভিক্ষা গ্রহণ কোল্লে না।

এক বাড়ীর বাহিরের দরজায় একটী বাবু বোসে ছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে ঘনশ্যাম ফাঁদুনী কোরে কাঁদুনী ধোল্লে। "ঘর পুড়ে গেছে, গরু পুড়ে গেছে, ছেলেমেয়ে পুড়ে গেছে, এই দরখাস্ত দেখুন, দোহাই বাবা! এই ছোট ছেলেটী নিয়ে আমি পথে বোসেছি, দোহাই বাবা! দয়া কর! ভগবান নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল কোরবেন।"—এই রকম অনেক আড়ম্বর কোরে ভিকারীটা হেঁট হয়ে, আমার মুখের দিকে চেয়ে, একখানা কাগজ বাহির কোরে বাবুটীকে দেখালে; ঝর্ঝর কোরে চক্ষের জল ফেলতে লাগ্‌লো।

লোকটা মহাজনও নয়, দালালও নয়, কারবারীও নয়, কিছুই নয়; বহুরূপী ভিকারী, ভেকধারী বদ্‌মাস, সেটা আমি তখন বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম। গত রাত্রে আমাকে দিয়ে যে দরখাস্তখানা লিখিয়ে নিয়েছিল, সেইখানাই ঐ বাবুর হাতে দিতে গেল।

মহা বিরক্ত হয়ে বাবু তৎক্ষণাৎ উগ্রস্বরে বোলে উঠ্‌লেন, "যাও যাও, ও রকম দরখাস্ত আমি অনেক দেখেছি, তোমার মতন ভিকারীও অনেক দেখেছি; ঘর পোড়া, গরু পোড়া, বাগান পোড়া, ব্যাগ চুরি, টাকা চুরি ইত্যাদি বাহানায় নিত্য নিত্য কত লোক এখানে ঘোরে, গৃহস্থ লোকে তাদের জ্বালায় জর্জ্জর হয়ে আছেন; বর্দ্ধমান জায়গা, এখানে তোমার বুজরুকী খাটবে না; চোলে যাও!"

সেখানেও তাড়া খেয়ে বুজ্‌রুকটা আমাকে অন্য দিকে নিয়ে চোল্লো। একবারও হাত ছাড়ে না। একবার একটু ফাঁক পেলেই আমি ছুটে পালাই, সে সুবিধা কিছুতেই ঘট্‌লো না। হাতখানা ধোরেই আছে। এক একবার একটু আল্‌গা দেয়, আবার জোর কোরে চেপে ধরে। বিষম বিভ্রাট্‌! বেলা দুই প্রহর। প্রচণ্ড রৌদ্রে মাথা ফাটছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আঁধার দেখ্‌ছি, কোথাও একটু বসি, লোকটা একবারও সে অবসর দিচ্ছে না; ক্রমাগতই টেনে নিয়ে চোলেছে! পা আর চলে না। সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে পোড়্‌লো। ত্রাহি মধুসূদন!

শেষবেলায় আমরা যে দিকে গিয়ে উপস্থিত হোলেম, সে দিক্‌টা বোধ হলো, সহরের প্রান্তভাগ। লোকজনও বেশী চলে না, দোকানপাটও বেশী নাই, বড় বড় বাড়ীও খুব কম। একখানা ময়রার দোকানে প্রবেশ কোরে, এক পয়সার পাটালী গুড় কিনে ঘনশ্যাম দু-ঘটী জল খেলো। আমাকেও একবিন্দু পাটালী দিয়েছিল, সেই বিন্দুটুকু জিবে বুলিয়ে আমিও এক ঘটী জল খেলেম। সূর্য্যদেব আর আমার কষ্ট দেখতে পাল্লেন না, অগ্নিকিরণ, সংবরণ কোরে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে, অস্তাচলে প্রস্থান করবার উপক্রম কোল্লেন।

আর রৌদ্র নাই। দোকান থেকে বেরিয়ে ঘনশ্যাম আমাকে একখানি সুদৃশ্য অট্টালিকার সম্মুখে নিয়ে গেল। রাস্তার উপরেই ফটক; ফটকে একজন দীর্ঘা-

কার দরোয়ান ছিল, যেন কত কালের পরিচয়, সেই ভাব জানিয়ে ঘনশ্যাম তাকে "রাম রাম" দিয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করবার উপক্রম কোল্লে। দরোয়ানটী রুকে দাঁড়ালো।—"কাঁহাকা উল্লুক! কাঁহা যাও?—নিকালো!" এইরূপ মিষ্টবাক্য উপহার দিয়ে, দরোয়ান তারে ধাক্কা মেরে পাঁচহাত তফাতে সোরিয়ে দিলে। বেহায়া বদমাস বুজ্‌রুক্‌টা তখনো আমার হাত ছেড়ে দিলে না; ধাক্কার সময় আমি তার হাতের সঙ্গে পাখীর মত ঝুল্‌তে লাগ্‌লেম।

তফাতে দাঁড়িয়ে মহাজন তখন অভাজনের ন্যায় ভিক্ষা চাইতে লাগ্‌লো। দরোয়ান বোল্লে, "নেই--নেই, এসমাফিক জোয়ান আদ্‌মীকো ভিচ্ছা দেনেকা হুকুম হ্যায় নেই!" এই কথা উপলক্ষে দ্বারপালের সঙ্গে ভিকারীর বচসা আরম্ভ হলো;-কলহতুল্য বচসা! আর সূর্য্য দেখা গেল না; দেখা গেল কেবল অল্প অল্প আলো;-অট্টালিকার মাথায় চপলার ন্যায় ক্ষণস্থায়িনী স্বর্ণরেখা।

অন্ধকার হবার অত্যল্প বিলম্ব। ভিক্ষুকে দোবারিকে বচসা চোল্‌ছে, ইত্যবসরে মুখ ফিরিয়ে আমি চেয়ে দেখি, রাস্তায় একটু দূরে একটী ভদ্র-লোক। মৃদুপদসঞ্চারে প্রসন্নবদনে তিনি সেই বাড়ীর দিকেই এগিয়ে আস-ছেন। ঘনশ্যাম ইতিমধ্যে ফটকের দিকে দুই চারি পা অগ্রসর হয়েছিল, দরো-য়ানজী তাই দেখে ফটক বন্ধ কোরে দিয়েছিল, ভদ্রলোকটী নিকটবর্ত্তী হবা-মাত্র দ্বার উন্মুক্ত কোরে দ্বারপাল ব্যস্তভাবে ঘনশ্যামকে বোল্লে, "যাও যাও, তফাৎ যাও, বাবু আতা হ্যায়।"—ঘনশ্যাম একটু পেছিয়ে দাঁড়ালে বাবু এসে ফটকের সম্মুখে দাঁড়ালেন, দ্বারপাল দুই হস্তে সেলাম দিলে।

বাবুর চেহারা অতি সুন্দর। দিব্য গৌরবর্ণ, গঠন মোলায়েম, বদন বাদামে, নয়ন দীর্ঘ, জোড়া ভ্রূ, সর্ব্বাংশেই নিখুঁত; মাথার চুলগুলি শ্বেতবর্ণ; গোঁফজোড়াটী দিব্য কালো; বয়স অনুমান ৬০।৬২ বৎসর।

একটু তফাতে সোরে দাঁড়িয়ে, দরখাস্তখানি বাহির কোরে, চক্ষে জল এনে, ঘনশ্যাম কেঁদে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি বড় গরিব, ঘরে আগুন লেগে সর্ব্বস্ব পুড়ে গিয়েছে, পরিবারলোক মারা গিয়েছে, গরু-বাছুর পুড়ে মরেছে, কেবল এই ছেলেটী আর আমি প্রাণে বেঁচে আছি; থাক্‌বার স্থান নাই, আহারের সংস্থান নাই, একবারে নিরুপায়। এই ছেলে-টীর জন্যেই আরো আমার বেশী ভাব্‌না।"

এক কথাই বার বার। লোকটা কত বড় ধড়ীবাজ, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, সে আমার হাতখানি খুব শক্ত কোরে ধোরেছিল, কিছুতেই আমি ছাড়াতে পাল্লেম না, দুই চক্ষু দিয়ে জল পোড়্‌ছিলো, বাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ ছেলেটী তোমার কে হয়?"—লোক উত্তর কোল্লে, "ছেলে হয়, আর কে হবে। এই ছেলেটী নিয়ে আমি পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছি, তিনদিন উদরে অন্ন নাই, ছেলেটীকে বাঁচানো ভার!—হুজুর হোচ্ছেন কাঙ্গাল গরিবের মা-বাপ, হুজুর রক্ষা না কোল্লে ছেলেটী আমার না খেয়ে মারা যাবে।"

এতক্ষণ আমি চুপ কোরে ছিলেম, লোকটার এই কথা শুনে কেঁদে কেঁদে বাবুকে আমি বোল্লেম, "আমি নিরাশ্রয়, আমার নিজের পরিচয় আমি নিজেই জানি না, এই লোক আমাকে আটদিন হলো, সপ্তগ্রামের গুরুবাড়ী থেকে আমাকে ধোরে এনেছে। জন্মাবধি গুরুর বাড়ীতেই ছিলেম, সেইখানেই শাস্ত্র অধ্যয়ন কোত্তেম, সম্প্রতি অধ্যাপকের মৃত্যু হয়েছে, গুরুপত্নী আমাকে বিদায় কোরে দিয়েছেন, এই লোক আমাকে এনেছে। এ আমার কেহই নয়, একে আমি কখনো চক্ষেও দেখি নাই। সমস্তই মিথ্যাকথা বোল্ছে, এ লোকের জুয়াচুরীর কথা আমি সব শুনেছি। এ আমাকে কোথাকার নীলকুঠীতে চালান কোরে দিবে, কুলীর কাজ করাবে, এই মত্লব।"

আমার কথাগুলি শুনে, লোকটার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ কোরে, বাবু তাকে বোল্লেন, "কেমন হে, বালক যে যে কথা বোল্ছে, এ সব সত্য কি না?" —ঘনশ্যাম উত্তর কোল্লে "একটাও সত্য নয়, সমস্তই মিথ্যাকথা, তবে এইটুকু সত্য হোতে পারে, ও আমার নিজের ছেলে নয়, পথে কুড়িয়ে পেয়ে আমি পুত্রবৎ মানুষ কোরেছি, কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছি, কলিকালের ছেলে কি না, এখন আর আমার কাছে থাক্তে চায় না; খেতে পেতো না, জায়গা পেতো না, পথে পথেই পোড়ে থাক্তো, কত উপকার কোরেছি, সব কথা এখন ভুলে গেছে।"

খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে গম্ভীরস্বরে বাবু তাকে বোল্লেন, "হাঁ, তুমি যা যা বোলছো সমস্তই সত্য, আর এই বালক যা যা বোলছে, সমস্তই মিথ্যা, কেমন, এই কথা তোমার নয়? সব আমি বুঝেছি; তোমার চেহারাতে সকল কথাই ব্যক্ত হোচ্ছে। তুমি ভিকারী হয়েছ, জুয়ান মরদ, খেটে খেতে পার না? তোমাকে ভিক্ষা দেওয়া গৃহস্থলোকের উচিত হয় না। তুমি জয়াচুরী অভ্যাস কোরেছ, তোমাকে আমি এখনি পুলিশে দিতেম কিন্তু ক্ষমা কোল্লেম, ছেলে-টীর হাত ছেড়ে দাও; চেহারায় বুঝ্তে পাচ্ছি, ভদ্রলোকের ছেলে, এ ছেলে আমার কাছেই থাক্বে। তুমি ভিক্ষা নিতে এসেছ, ভিক্ষা নিয়ে চোলে যাও। ফের যদি কথা কও, পুলিশের গারদে তোমার স্থান হবে; এ কথা নিশ্চয়!"

পুলিশের কথা শুনে লোকটা কেঁপে কেঁপে আমার হাত ছেড়ে দিলে, আমি দৌড়ে গিয়ে বাবুর দুটী পায়ে জড়িয়ে ধোল্লেম, "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বোলে অনবরত কাঁদতে লাগ্লেম। অভয় দিয়ে বাবু আমাকে বোল্লেন, "তুমি শান্ত হও, কোন ভয় নাই, সব আমি বুঝেছি। তুমি আমার কাছেই থাক্বে, যাতে তোমার ভাল হয়, যাতে তুমি নিজের পরিচয় জানতে পার, যাতে তোমার আপনার লোকেরা সংবাদ পান, আমি তার চেষ্টাও কোর্বো, কোন চিন্তা নাই।"

লোকটার সম্মুখে একটা আধুলি ছুড়ে ফেলে দিয়ে উগ্রস্বরে বাবু বোল্লেন, "লও তোমার ভিক্ষা, চোলে যাও, তিলার্দ্ধ আর এখানে বিলম্ব কোরো না।"

ঘনশ্যামকে এই কথা বোলে আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে বাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। লোকটা তখনও যায় না, ফটকের বাহিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কট্মট্চক্ষে আমার দিকে চাইতে লাগ্লো, ইসারায় ইসারায় যেন শাসালে।

তার ভঙ্গী দেখে বাবু তখন দরোয়ানকে হুকুম দিলেন, "গলাধাক্কা দিয়ে দূর কোরে দাও !"—দরোয়ান তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল কোল্লে। আড়ে আড়ে চাইতে চাইতে আপন মনে গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে জুয়াচোর ঘনশ্যাম দক্ষিণদিকে ছুটে পালালো। আমারো ভয় ভাঙ্‌লো, আশ্রয়হারা হয়েছিলেম, মহৎ আশ্রয় প্রাপ্ত হোলেম। বাবুর বাড়ীতেই আমি থাক্‌লেম।

সপ্তম কল্প

জামাইবাবু

বাবুর নাম সর্ব্বানন্দ মুস্তফী ;—বসু মুস্তফী। পুত্রসন্তান নাই, তিনটী কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শ্যামাসুন্দরী, মধ্যমা উমাকালী, কনিষ্ঠা আশালতা। বড়মেয়েটী বিধবা, মেজোটী সধবা, ছোটটী অবিবাহিতা. বয়ঃ-ক্রম প্রায় দশ বৎসর। বাবুর বাড়ীতেই আমি থাক্‌লেম। বাবু মহৎলোক, নামলব্ধ জমীদার, বৎসরে প্রায় আশী হাজার টাকা আয়, সংসারে বিলক্ষণ জলজলাট। আমার প্রতি বাবুর বেশ আদর-যত্ন। টোলে আমি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা কোরেছিলেম, সংস্কৃতের প্রতি বাবুরও বিশেষ অনুরাগ, সেই কারণেই তিনি আমাকে বেশী ভালবাসলেন। মাসখানেক থাক্‌তে থাক্‌তে একদিন তিনি আমাকে বোল্লেন, "দেশে এখন ইংরেজের রাজত্ব, কিছু কিছু ইংরেজী শিক্ষা করা ভাল, তুমি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর।"—তৎক্ষণাৎ আমি সম্মত হোলেম। আমি পর, কে আমি, তা তিনি কিছুই জানতেন না, জাতি কি, তাও আমি বোল্‌তে পাত্তেম না. বাড়ীতে রসুই-ব্রাহ্মণ ছিল, ব্রাহ্মণের পাককরা অন্ন সকলেই খায়, তাই আমি আহার কোত্তেম। আহারে কিছুই কষ্ট ছিল না, বাবু আমাকে ভিন্ন ভাব্‌তেন না, উপাদেয় সামগ্রী আহার কোত্তেম, উত্তম গৃহে উত্তম শয্যায় শয়ন কোত্তেম, নূতন লোকেরা আমাকে বাবুর বাড়ীর ছেলে বোলেই মনে কোত্তো, দিব্য সুখস্বচ্ছন্দেই সে বাড়ীতে আমি থাক্‌লেম। বাবু আমার জন্য একজন শিক্ষক রেখে দিলেন, স্কুলে দিলেন না, সেই শিক্ষকের নিকটেই আমি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম।

বাড়ীখানি বৃহৎ ; তিন মহল। সদরমহলে পূজার দালান, তিনদিকে বারান্দাযুক্ত বৈঠকখানা, নীচের একদিকের বৈঠকখানায় জমিদারী সেরেস্তা। অন্দরমহলে স্ত্রীলোকেরা থাকেন, তৃতীয় মহলে একটী সরোবর, চারিধারে উচ্চ প্রাচীর, প্রাচীরের কোলে কোলে নানাজাতি ফলফুলের গাছ ; একধারে খুব লম্বা একখানা চালাঘর, সেই ঘরে অনেকগুলি গরু থাকে, রাখালেরাও একপাশে শয়ন করে। সুন্দর বন্দোবস্ত।

একমাস আমি থাকলেম। আমার রীতিব্যবহার দেখে বাবু আমাকে অন্দর-মহলেও প্রবেশ করবার অনুমতি দিলেন। রাত্রিকালে সদরমহলের উপরের একটী বৈঠকখানায় আমি শয়ন কোত্তেম। অন্দরে বাবুর ধর্ম্মপত্নী আর ছোট-

মেয়েটী। তারা ছাড়া স্বসম্পর্কীয় পাঁচ-সাতটী স্ত্রীলোক নিয়তই সেই বাড়ীতে বাস কোত্তেন। কর্ত্তার বড়মেয়েটী বিধবা বটেন, কিন্তু পিত্রালয়ে থাক্‌তেন না, শ্বশুরালয়েই থাক্‌তেন ; মধ্যমাটীও শ্বশুরালয়বাসিনী। পূর্ব্বে বোলেছি, ছোটমেয়েটীর নাম আশালতা। থাক্‌তে থাক্‌তে আশালতার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হলো। আশালতা লেখাপড়া করেন, রামায়ণ-মহাভারত বেশ শুদ্ধ শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ কোত্তে পারেন, আমার সঙ্গে আশালতার লেখাপড়ার চর্চ্চা হতো, আরও অনেক রকম ভাল ভাল কথাবার্ত্তা চোল্‌তো, গৃহিণী আমাকে সন্তানের মতন আদর কোত্তেন, অপরা স্ত্রীলোকেরাও আমাকে আপন ভেবে স্নেহ-যত্ন কোত্তেন, কোন সুখের আমার অভাব ছিল না। অবকাশকালে সর্ব্বানন্দবাবু আমাকে নিকটে বোসিয়ে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা কোত্তেন, যেমন জানি, যতদূর শিখেছিলেম, সেই রকম উত্তর কোত্তেম, শুনে তিনি খুসী হোতেন।

বাড়ীতে তিনজন চাকর, পাঁচজন দাসী, একজন মালী, তিনজন রাখাল আর আট দশ জন সেরেস্তার আমলা। ইহা ছাড়া দুইজন রসুই ব্রাহ্মণ আর একজন ব্রাহ্মণী ছিল। চাকরেরা সকলেই আমাকে বাবুর ছেলের মতন মান্য কোত্তো আর ভালবাসতো।

একটা কথা এইখানে বোলে রাখি। আমার পূর্ব্বকাহিনীতে যেখানে যেখানে যে সকল লোকের যে যে নাম বর্ণিত আছে, সেই নামগুলি কাল্পনিক, এ কাহিনীর নামগুলিও অকাল্পনিক নহে ; তথাপি পাঠক-মহাশয় এই সকল নামের সঙ্গে আসল আসল নামের অনেকটা সাদৃশ্য দেখতে পাবেন।

ছয় মাস আমি সর্ব্বানন্দবাবুর বাড়ীতে নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখেই থাক্‌লেম। এক রাত্রে বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস ! তুমি কি নিজের পরিচয় কিছুই জান না ? কোথায় তোমার নিবাস, কে তোমার মাতা-পিতা, কিছুই কি তোমার জানা নাই ?"—আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞে না, কিছুই আমি জানি না। জানি শুধু আমার নাম হরিদাস। নিতান্ত শিশুকাল থেকে হুগলী-জেলার সপ্তগ্রামে অধ্যাপকের গৃহে আমি প্রতিপালিত হয়েছি, অধ্যাপকের মৃত্যুর পরে সেই ভিকারী বেশধারী লোকটা আমাকে একখানা অজানা বাড়ীতে নিয়ে আসে, তার পর বর্দ্ধমানে এনেছিল, তার পর যা হয়েছে, আপনি জ্ঞাত আছেন। বাসস্থান জানি না, জাতি জানি না, আপনার লোক কে কোথায় আছে, আছে কিনা তা পর্য্যন্ত আমি জানি না।"

আমার উক্তিগুলি শ্রবণ কোরে, একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে, বাবু অনেকক্ষণ চুপ করে থাক্‌লেন, তার পর মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আশ্চর্য্য বটে ! আচ্ছা, যাতে সন্ধান হয়, আমি তার উপায় কর্‌বার জন্য সবিশেষ যত্ন কোর্‌বো। ভদ্রলোকের ছেলে, হীনবংশে তোমার জন্ম নয়, চেহারাই সে কথা বোলে দিচ্ছে। আমি তোমাকে পুত্রতুল্য ভালবেসেছি, চিরদিন ভালবাসবো, যাতে তোমার মঙ্গল হয়, অবশ্য সেই চেষ্টা আমি কোর্‌বো। তুমি কিছু ভেবো না, মন দিয়ে লেখাপড়া শিক্ষা কর।"

আমি মাথা হেঁট কোরে চুপ কোরে থাক্‌লেম। বাবু আমাকে যথার্থই পুত্রতুল্য স্নেহ করেন, সেইটী স্মরণ কোরে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম।

আর একমাস অতীত। একদিন বৈকালে আমি বৈঠকখানার বারান্দায় বোসে আছি, নিকটে কেহই নাই, এমন সময় গাড়ীবারান্দার নীচে একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। চমৎকার গাড়ী। দামী দামী সাজপরা বড় বড় দুটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব সেই গাড়ীতে সংযোজিত। গাড়ীর পশ্চাতে উর্দ্দীতকমাধারী দুজন আরদালী, কোচবাক্সেও সারথির বামদিকে সেই রকমের আর একজন আরদালী। গাড়ীতে কে এলেন, অগ্রে আমি জানতে পাল্লেম না, গাড়ীখানি ভাল কোরে দেখ্‌বার জন্য আগ্রহে আগ্রহে উপর থেকে নেমে এলেম। বাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না, সেরেস্তার দুজন আমলা আর বাড়ীর দুজন চাকর সেই গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, পরস্পর মুখচাহাচাহি কোচ্চে। মূল্যবান পরিচ্ছদ-পরিহিত একটী বাবু গাড়ী থেকে নামলেন। সম্মুখে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সকলেই করপুটে সেই বাবুটীকে নমস্কার কোল্লে, দেখাদেখি আমিও নমস্কার কোল্লেম। কারো পানে না চেয়েই, কোন কথা না বোলেই, বাবু সরাসর উপরে গিয়ে উঠ্‌লেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলেম। চুপি চুপি একজনকে জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, জামাইবাবু।

দিব্য চেহারা। আকার দীর্ঘ, অঙ্গ স্থূল, বদন গম্ভীর, বর্ণ গৌর, দিব্য মুখ, দিব্য গোঁফ, মাথার চুলগুলি খাটো খাটো, মাঝখানে সিঁতিকাটা ; মাথার আর গোঁফের দুই চারিগাছ চুল পাকা ; বয়স অনুমান ৪৫।৪৬ বৎসর। পরিধানে শান্তিপুরে কালাপেড়ে মিহি ধুতী, অঙ্গে চাপ্‌কানের উপর সবুজ শাটিনের চোকা, পায়ে পঞ্চবর্ণের মোজা, মোজার উপর ফুলদার জরীর জুতা, বুকপকেটে সোণার চেইনঝুলানো ঘড়ী, দশ অঙ্গুলীতে দশ অঙ্গুরী ; হস্তে একগাছি গজদন্তমণ্ডিত সূক্ষ্ম যষ্টি।।

জামাইবাবু উপরে উঠেই, ভিতরদিকের বারান্দার একখানি চেয়ারের উপর উপবেশন কোল্লেন, দুই পাশে দুজন চাকর বড় বড় পাখা হাতে কোরে বাতাস কোত্তে আরম্ভ কোল্লে, একজন চাকর সোণার আলবোলাতে তামাক সেজে এনে দিলে। জামাইবাবু আপন মনে সালুমোড়া বৃহৎ নলে ওষ্ঠার্পণ কোরে উদাসভাবে ধূম নির্গত কোত্তে লাগ্‌লেন ; মুখে বাক্য নাই। চেয়ারের একটু তফাতে আমি চুপ কোরে দাঁড়িয়ে ছিলেম, জামাইবাবুর মন কিছু চঞ্চল, চঞ্চলনয়নে তিন দিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ একবার আমার দিকে নজর পোড়্‌লো। ভাবে বুঝ্‌লেম, আমার দিকে চেয়েই তিনি যেন একটু চোম্‌কে উঠ্‌লেন। ভাব গোপনের ক্ষমতা বেশ, এমনি সাবধানে তৎক্ষণাৎ সাম্‌লে নিলেন যে, কেহই কিছু অনুভব কোত্তে পাল্লে না। সকলের অলক্ষিতে চকিতমাত্রেই কার্য্যটা হয়ে গেল ; আমার নাকি কিছু কূটদৃষ্টি, সেই চমকিত ভাবটা কেবল আমিই জানতে পাল্লেম।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্কভাবে একজন আমলাকে সম্বোধন কোরে জামাইবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “কর্ত্তা কোথায় ?”—উত্তর পেলেন, “আহরান্তে বাগানে গিয়েছেন, এখনি আস্‌বেন। আজ আপনার আসবার কথা ছিল, সেটা তিনি জানেন, অধিক বিলম্ব হবে না।”

বাস্তবিক দশ মিনিট পরেই কর্ত্তা বাড়ী এলেন, দস্তুরমত আদর-অভ্যর্থনা কোরে জামাইয়ের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। দুই এক কথায় উত্তর দিয়ে জামাইবাবু পুনর্ব্বার গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লেন ; আসন থেকে উঠ্‌লেন না, শ্বশুরকে একটী প্রণামও কোল্লেন না ; আদরের মধ্যে আলবোলার নলটীকে ক্ষণেকের জন্য উরুদেশের উপর বিশ্রাম দিলেন।

কর্ত্তা একবার অন্দরমহলে গেলেন, একটু পরে জামাইবাবুকে ডেকে পাঠালেন। জামাইবাবু একজন চাকরের সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ কোল্লেন, কৌতূহলবশে আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম। জলযোগের আয়োজন হলো, জামাইবাবু জল খেলেন, আমি একটু তফাতে তফাতে ঘুর্‌তে লাগ্‌লেম, কিন্তু জামাইবাবুর দিকে একটু একটু কটাক্ষ থাক্‌লো। কটাক্ষভঙ্গীতে বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমার দিকেও জামাইবাবুর কটাক্ষ। সে কটাক্ষের প্রত্যক্ষ ফলও তৎক্ষণাৎ জানা গেল। কর্ত্তার দিকে চেয়ে, আমাকে লক্ষ্য কোরে, জামাইবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি যে দেখ্‌ছি, মাঝে মাঝে নূতন নূতন লোকজন আমদানী কোচ্ছেন। ঐ ছোকরাটীকে আপনি কোথায় পেলেন?"

প্রশ্ন শুনেই আমি অমনি ধাঁ কোরে সেখান থেকে সোরে গেলেম ; সে প্রশ্নে কর্ত্তা কি উত্তর দিলেন, শুন্‌তে পেলেম না ; শোনবার তত আবশ্যকও ছিল না। একটু পরে জামাইকে সঙ্গে নিয়ে কর্ত্তাবাবু বাহিরের বৈঠকখানায় এসে বোস্‌লেন, আমিও অন্যদিক্‌ দিয়ে বৈঠকখানার বারান্দার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেম। সন্ধ্যা হবার অধিক বিলম্ব ছিল না, একটু পরেই সন্ধ্যা হলো ; বৈঠকখানার ঘরে ঘরে বাতী জ্বেল্লো ; কর্ত্তাবাবুর খাসকামরায় বসা-সেজে ডবল বাতী। ঘরে কেবল কর্ত্তা আর জামাইবাবু।

যেটী কর্ত্তাবাবুর খাস-কামরা, সেই ঘরের পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটী পুস্তকাগার। আমি একাকী সেই পুস্তকাগারে বোসে একখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠ কোচ্ছি, কর্ত্তার গৃহে কিছু বড় বড় কথা শুন্‌তে পেলেম। শ্বশুর-জামাই নির্জ্জনে কথোপকথন কোচ্ছেন, সে কথায় কাণ দিবার আমার কোন দরকার ছিল না, কিন্তু চুপি চুপি কথা নয়, নিতান্ত গোপনীয় কথাও হোতে পারে না, বিশেষতঃ শোনবার ইচ্ছা না থাক্‌লেও কথাগুলি আমার কর্ণে প্রবেশ কোত্তে লাগ্‌লো। দুটী ঘরের মধ্যস্থলে একটী দরজা, সে দরজা তখন বন্ধ ছিল না। আমি পুস্তকাগারে আছি, কর্ত্তা সেটা হয় তো জানতেন না। তিনি একটু জোর গলায় কথা কোচ্ছিলেন, তাই শুনে কেমন একটা আগ্রহ হলো। দরজা ভেজানো ছিল। বইখানি বন্ধ কোরে রেখে, সেই দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। গুরুগৃহে ঘনশ্যামের সঙ্গে গুরুপত্নীর যখন কথা হয়, তখন যে রকমে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি শুনেছিলেম, এখন সে লুকাচুরিভাব ছিল না, অথচ দাঁড়ালো যেন সেই ভাব।

কর্ত্তা বোল্লেন, "দেখ মোহনলাল! দিন দিন তুমি বেজায় বাজেখরচ আরম্ভ কোরেছ। যা যখন চাও, তাই তখন আমি দিই, তাতেও তোমার কুলায় না, প্রায় প্রতি মাসেই রাশি রাশি দেনা হয় ; আজ আবার দশ হাজার টাকা চাচ্ছো ;—দিব আমি, তোমরা ভিন্ন আর আমার কে আছে? থাক্‌লে তোমরাই

পাবে, না থাক্‌লে তোমরাই বঞ্চিত হবে। আমি মনে কোরেছি, এখন অবধি আর আমি তোমার বে-হিসাবী খরচে প্রশ্রয় দিব না। আমার তিনটী মাত্র কন্যা, তিন নামেই আমি সমান সমান অংশে উইল কোরে রেখেছি। তুমি যদি বার বার এই রকম অপব্যয় কর, বার বার বে-হিসাবী টাকা লও, তা হোলে উইলের ক্রোড়পত্রে তোমার অংশে সেই সব টাকা আমি বাদ দিয়ে নূতন ব্যবস্থা কোরে যাব, তখন তুমি আমাকে দোষ দিতে পার্‌বে না।"

এই পর্য্যন্ত বোলে, অঙ্গুলিসঙ্কেতে একটী সিন্দুক দেখিয়ে দিয়ে, কর্ত্তা আবার বোল্লেন, ঐ সিন্দুকেই উইল আছে, যদি দেখ্‌তে চাও, দেখ্‌তে পার।"

একটু যেন লজ্জা পেয়ে জামাইবাবু বোল্লেন, "না, আপনার সিন্দুক আপনার উইল, এখন আমার দেখ্‌বার অধিকার নাই। আপনি অনুমতি কোচ্ছেন, এখন অবধি আমি সাবধান হয়েই চোল্‌বো, এইবার একটা দায় পোড়েছে, দশ হাজার টাকা হোলেই সেই দায় থেকে আমি মুক্ত হোতে পারি।"

খানিকক্ষণ আর কোন কথাবার্ত্তা আমি শুন্‌তে পেলেম না, তার পর একটী বাক্স খুলে কর্ত্তাবাবু জামাইবাবুর হস্তে খানকতক নোট দিলেন। বুঝ্‌তে পাল্লেম, দশ হাজার টাকা।

রাত্রি এক প্রহর অতীত। একজন দাসী এসে সংবাদ দিলে, শ্বশুর-জামাই উভয়েই অন্দরে প্রবেশ কর্‌বার জন্য সে ঘর থেকে বেরুলেন। আমি তখন অন্যদিক্ দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেম, কর্ত্তা আমায় দেখেই একটু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হরিদাস! চুপটী কোরে এইখানেই দাঁড়িয়ে আছ? পড়াশুনা সাঙ্গ হয়েছে?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞে হাঁ, নূতন বইখানির দশ পাতা পড়েছি, ঘরে বড় গ্রীষ্ম বোধ হোচ্ছিলো, সেই জন্য একটু বাতাসে এসে দাঁড়িয়েছি।"

কর্ত্তাবাবু, জামাইবাবু আর আমি, তিনজনে একসঙ্গে অন্দরমহলে প্রবেশ কোল্লেম। একসঙ্গেই আহারাদি হলো। আহারের সময় জামাইবাবু বক্রনয়নে দুই তিনবার আমার দিকে চাইলেন, দেখেও যেন দেখলেম্ না, মাথা হেঁট কোরে শান্ত হয়ে থাক্‌লেম।

আহারান্তে বাড়ীর ভিতরের একটী ঘরে জামাইবাবুর শয্যা প্রস্তুত হলো; জামাইবাবু শয়ন কোল্লেন, কর্ত্তাবাবু আপন শয়নগৃহে গেলেন, আমি নিত্য রাত্রে যেখানে থাকি, সেইখানেই এসে শয়ন কোল্লেম।

প্রভাতে জামাইবাবু বিদায় হোলেন। আমার একটা ভয় ঘুচে গেল। আমাকে দেখেই প্রথমে তিনি চোম্‌কেছিলেন, কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কর্ত্তাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করে জানেন, বার বার কেমন একরকম ভঙ্গীতে আমার দিকে কটাক্ষপাত কোরেছিলেন, আমি যেন কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। তিনি বিদায় হবার পর কর্ত্তা আমাকে ডেকে খুব হাসতে হাসতে বোল্লেন, "হরিদাস! তোমার উপর জামাইবাবুর নজর পোড়েছে। আমার কাছে তুমি থাক, সেটা যেন তাঁর ইচ্ছা নয়; তিনি তোমাকে তাঁর নিজ বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান; আমাকেও সে কথা জানিয়েছিলেন, আমি রাজী হই নাই। তোমার অভিপ্রায় কি?—যাবে?"

জলে আমার চক্ষু ছলছল কোরে এলো। সজলনয়নে কর্ত্তার মুখপানে চেয়ে কম্পিত কণ্ঠে আমি বোল্লেম, "আজ্ঞে না, তাঁর বাড়ীতে আমি যাব না,—আপনার আশ্রয় ছেড়ে কোথাও আমি যাব না। আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ। পাঠশালা পরিত্যাগ কোরে একটা দুষ্ট লোকের হাতে আমি পোড়েছিলেম, আপনি রক্ষা না কোল্লে আমার কপালে কতই না বিপদ্ ঘোট্‌তো, তাই ভেবে সর্ব্বদাই আমার গা কাঁপে। সংসার আমি চিনি না, সংসারের লোকের রীত-ব্যবহার কিছুই আমি জানি না, মাতৃগর্ভে যেমন থাকা, চতুর্দ্দশ বর্ষকাল পাঠশালার গর্ভেই আমি সেইরূপ ছিলেম; আমার অধ্যাপক-মহাশয় পাঠশালার বাহিরে কোথাও আমাকে যেতে দিতেন না। তিনিও সংসারলীলা সাঙ্গ কোল্লেন, তাঁর পত্নীর নিষ্ঠুরতায় আমিও নিরাশ্রয় হয়ে একটা ভয়ানক জুয়াচোরের সঙ্গে পথে বেরুলেম। আর দুর্দ্দশাই যে আমার হোতো, অদৃষ্ট কোন পথেই যে আমাকে নিয়ে যেতো, কিছুই আমি বোল্‌তে পারি না। বিপদ্‌কালে বিপত্তির মধুসূদন আমার প্রতি সদয় হোলেন, জুয়াচোরের ঘটনাবশে আপনার দ্বারেই আমায় নিয়ে এলো, আপনার কাছে আমি আশ্রয় পেলেম, আপনার দয়ার ক্রোড়েই আমি প্রতিপালিত হোচ্ছি, এ আশ্রয় ত্যাগ কোরে কোথাও আমি যাব না। দোহাই আপনার! আপনি আমাকে পরিত্যাগ কোর্‌বেন না।"

সন্তুষ্ট হয়ে কর্ত্তা বোল্লেন, "না হরিদাস! তোমাকে আমি পরিত্যাগ কোর্‌বো না, তোমার স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল, নির্ভাবনায় এই বাড়ীতেই তুমি থাকো, মন দিয়ে লেখাপড়া শিক্ষা কর, অবশ্যই তোমার ভাল হবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি আপন পাঠাগারে প্রবিষ্ট হয়ে নিবিষ্টচিত্তে নূতন পথের অভ্যাস কোত্তে লাগ্‌লেম। দুর্ভাবনা দূরে গেল, নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ীর পরিবারবর্গের সঙ্গে পরমসুখে আরো একমাস সেই মহৎ আশ্রমে আমি থাক্‌লেম।

অষ্টম কল্প

সব নূতন

ভূমিষ্ঠ হবার পর ক্রমশঃ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশু যেমন জগৎসংসারের সমস্ত পদার্থই নূতন দেখে, বর্দ্ধমানে সর্ব্বানন্দবাবুর পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় পেয়ে আমিও সেইরূপ সমস্ত পদার্থই নূতন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। যা যা দেখি, সমস্তই নূতন; যা যা শুনি, আমার কর্ণে সমস্তই নূতন। এক বর্দ্ধমানেই নূতন জগৎ। সব নূতন। কর্ত্তার অনুমতি নিয়ে মধ্যে মধ্যে আমি নগরদর্শনে বাহির হই। এক একদিন এক একজন লোক সঙ্গে থাকে, এক একদিন আমি একা। নগরের পথ, ঘাট, দোকান, পসার, বাজার, লোকালয়, আদালত, একে একে দর্শন করি, সব যেন চমৎকার বোধ হয়। বর্দ্ধমানে এক মহারাজা থাকেন, মহারাজের সম্পদ্‌সমৃদ্ধি দেশবিখ্যাত। মহারাজের আসবাব-

পত্র সমস্তই সুন্দর সুন্দর। একে একে অনেকগুলি আমার দেখা হলো। রাজবাড়ী, রাজগাড়ী, রাজঠাকুর, রাজবাগিচা, রাজবানর, রাজতুরঙ্গ, রাজমাতঙ্গ, রাজমৎস্য, রাজবাদ্য, রাজসিপাহী, রাজসাগর, রাজ-পশুশালা, কৌতুকে কৌতুকে আমি সব দর্শন কোল্লেম। সকলগুলিই আশ্চর্য্য! মহারাজের চেহারা কেমন, অনেক দিন আমি দেখ্তে পাই নাই ; একদিন অপরাহ্নে জনাকীর্ণ রাজপথে রাজমূর্ত্তি আমি দর্শন কোরেছিলেম। বর্দ্ধমানের মহারাজ। শুন্তেও যেমন নামটী জম্কালো, চেহারাও তদ্রূপ মনোহর ; যেমন রূপ, তদ্রূপযুক্ত বেশভূষা, তদুপযুক্ত গাড়ী-ঘোড়া, তদুপযুক্ত অনুচর-রেসালা। মহারাজকে যুগলহস্তে নমস্কার কোরে সেইদিন আমি আমাকে চরিতার্থ মনে কোরেছিলেম। কমলার কৃপায় মহারাজের সমস্তই পরম সুন্দর।

রাজপথে আমি বেড়াই, দিন দিন কত কি দেখি, সকলগুলির নাম জানি না, কিন্তু দেখে দেখে বড় আমোদ হয়।—না না, বোল্তে আমার ভুল হোচ্ছে ; সকলগুলি দেখে আমোদ হয় না। যেখানে জনতা অধিক, সেখানে ভাল-মন্দ সব রকম দেখা যায়, সুদৃশ্য-কুদৃশ্য, উৎকট বিকট, নানা প্রকার জীবপ্রবাহ নয়নগোচর হয়। মানুষের ভিতর বিকটমূর্ত্তি দর্শন কোরে ভয় হয়। মানুষেরা সৎকার্য্যে যেমন প্রতিষ্ঠাভাজন হয়ে থাকে, দুষ্কার্য্যেরত দুরাচার মনুষ্য তদ্রূপ নিন্দাভাজন হয়।

কেবল এই পর্য্যন্ত ভেদ, এ কথাও বলা যায় না। সৎ-পুরুষ দর্শনে মনে যেমন প্রীতি ও সন্তোষের আবির্ভাব হয়, দুষ্টলোক দর্শনে স্বভাবতঃ মনে সেইরূপ ঘৃণার উদয় হয়ে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত এইখানে আমি পাঠক-মহাশয়কে শুনাই।

একদিন বৈকালে বাজারের কিঞ্চিৎ দূরে একাকী আমি ভ্রমণ কোচ্ছি, এমন সময় দেখি, একটা জায়গায় অনেক লোকের ভিড়। আমি একাকী, এ কথার অর্থ কি? যেখানে অনেক লোক, সেখানে কেন আমি একাকী বলি, এটাও একটা ক্ষুদ্র সমস্যা। গঠনে, চলনে, বর্ণে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাক্লেও সকল মনুষ্যই একাকার। দুই হস্ত, দুই পদ, এক মস্তক, এক বক্ষ, এক উদর সবাকার, তথাপি সকল মনুষ্যই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন খ্যাতি লাভ করে। আমার যেমন আকার, ভিড়ের ভিতর সকল লোকের প্রায় সেই রকম। তবে কেন আমি একা?—আমি অপরিচিত, ভিড়ের ভিতর আমার চেনা লোক একজনও ছিল না ; পূর্ব্বে কোথাও দেখেছি, এমন একটীও লোক সেই জনতার মধ্যে দেখ্লেম না ; সেই জন্যই আমি একাকী।

কিসের ভিড়? সেই সময় কেহ আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লে নিশ্চয়ই আমি বোল্তেম, "কি জানি!"—এখন ঠিক উত্তর প্রদান কোত্তে পারি। খোলা জায়গা,—ছোট মাঠ, চতুর্দ্দিকে ঘাসবন, একধারে একটা পুকুর ; মাঠের ঘাসের উপর মস্ত একটা মশারি ফেলা ; মশারির বাহিরে একটা লোক বোসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পোড়ে পোড়ে মস্ত একটা ঘণ্টা বাজাচ্ছে। আমি একটু দূরে ছিলেম, মন্ত্রগুলা কি, স্পষ্ট স্পষ্ট শুনতে পেলেম না, ভিড়ের সমারোহে

কৌতুকী হয়ে পায়ে পায়ে নিকটবর্ত্তী হোলেম। তখন সেই মন্ত্রগুলো ঠিক ঠিক আমার কাণে এলো। লোক বোল্‌ছে ঃ—

"একখানা গরু!—সাতখানা পা!—তিনখানা পুচ্ছ!—দুইখানা মুখ!—এক মুখে খায়, এক মুখে প্রস্রাব করে!—ভগবতীর স্বপ্ন!—দর্শনে সশরীরে স্বর্গ-বাস!—দর্শনী এক পয়সা।"

মন্ত্র শুনেই আমার চক্ষু স্থির! বিধাতার সৃষ্টির বিষম বিপর্য্যয়! যে লোকটা ঘণ্টা বাজিয়ে ঐরূপ মন্ত্র পাঠ কোচ্ছিলো, সে লোকটার চেহারাও বিষম উৎকট! রং কালো, জোঁদা কালো; গঠন কতকটা দীর্ঘ, নীচের দিক্‌টা হ্রস্ব; হাত-দুখানা মোটা মোটা পা-দুখানা সরু সরু; বুকখানা খুব খোলা; দু-ধারে উঁচু উঁচু দুটো ঢিবি; পেটের মাংস উপরদিকে উঠে সেদিকেও একটা ঢিবি বানিয়ে রেখেছে; মাথা হেঁট কোল্লে বুকের খালায় দাড়ী ঠেকে; দাড়ীতে চুল নাই, অথচ ত্রিকোণ আকারে অনেকটা লম্বা; নাকটা চ্যাপ্‌টা; চক্ষু-দুটো কোটরে বসা, সেই চক্ষু রক্তবর্ণ; ভাল কোরে দেখ্‌লে মনে হয় যেন দুটো গর্ত্তের ভিতর দুটো জবাফুল ঘুর্‌ছে; কপালখানা প্রায় আধ হাত চওড়া; কাণের দিকে কিছুই নাই; মাথাটা নেড়া, কিন্তু খুব ডাগর; ঘাড় আছে কিনা অনুভব করা যায় না; বয়স আন্দাজ ৪০।৪২ বৎসর।

লোকটার চেহারাও আমি নূতন দেখ্‌লেম, মন্ত্রগুলো নূতন শুনলেম। ভিড়ের লোকেরা এক এক পয়সা দর্শনী দিয়ে সশরীরে স্বর্গলাভের আশায় একে একে মশারির ভিতর ঢুকে সেই অদ্ভুত গরু দর্শন কোরে এলো। আমার প্রবৃত্তি হলো না, স্বর্গবাসের বাসনাও ছিল না, আমি গেলেম না; খানিক-ক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে এলেম। লোকটাকে চিনে রাখ্‌লেম। কে যেন আমাকে বোলে দিলে, এ লোকের অসাধ্য দুষ্কার্য্য কিছুই নাই!

মন কেমন অস্থির হলো। সে দিন আর অন্য কিছু দর্শন কর্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লো না। আশ্রমে ফিরে যাবার জন্য পশ্চিমদিকের রাস্তা ধোল্লেম। সে রাস্তাটায় জোয়ার-ভাঁটার জলস্রোতের ন্যায় অনবরত নরনারীর স্রোত প্রবাহিত। পথে যেতে যেতে আমি মনে কোল্লেম, মা জগদম্বার সৃষ্টিতে কত রকম জীব-জন্তুর খেলা হয়, জগদম্বাই জানেন। মানুষের জ্ঞান-গোচর হওয়া অসম্ভব। ভাব্‌তে ভাব্‌তে আশ্রমে ফিরে এলেম।

নবম কল্প

খুন!!!

চৈত্রমাস অতিক্রান্ত। বৈশাখ মাস আগত। বৈশাখে গ্রীষ্মাতিশয্য অনুভব হয়, প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্নে আকাশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মেঘোদয় হয়, এক এক-দিন বাতাসে উড়ায়, এক একদিন বৃষ্টি পড়ে; ছোট ঝটিকা প্রায় প্রতিদিন; তথাপি এ দেশে বৈশাখমাসে বসন্ত-ঋতুর পরিশিষ্ট শোভা নয়নগোচর হয়ে

থাকে। পল্লীগ্রামের প্রতি প্রকৃতিদেবীর কিছু বেশী অনুগ্রহ। তথায় নানা-জাতি তরুলতা পল্লবিত—কুসুমিত হয়ে প্রকৃতির শোভাবর্দ্ধন করে, প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি সুসজ্জিত হয়ে চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিতরণ করে, দক্ষিণদিক্ থেকে সুখস্পর্শ মলয়ানিল প্রবাহিত হয়, দিবসের শেষভাগ অতি রমণীয় বোধ হয়, এই সকল লক্ষণেই আমাদের বৎসরের প্রথম মাসকে বসন্তকাল বোল্‌তে অনেক লোক ইচ্ছা করে। বর্দ্ধমান সহরের পশ্চিমপ্রান্ত-পল্লীতে বৈশাখমাসের সেই-রূপ ক্রীড়াই আমি দর্শন করি; প্রমোদানন্দে চিত্ত পুলকিত হয়ে উঠে।

মাসের দশম দিবসের সন্ধ্যার পর সর্ব্বানন্দবাবু আপন উপবেশনকক্ষে অনেকগুলি লোকের সঙ্গে সদালাপ কোচ্ছেন, নানা প্রকার জিনিসের মহাজন সেইখানে উপস্থিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বায়নাপত্র গ্রহণ কোচ্ছে, সর্ব্বানন্দ-বাবু সকলের সঙ্গেই মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ কোচ্ছেন, বৈঠকখানা গুল্‌জার!

লোকেরা বিদায় হবার পর কর্ত্তা আমাকে ডেকে খানকতক পত্র লিখ্‌তে বোল্লেন। একখানিপত্র তিনি স্বহস্তে লিখে রেখেছিলেন, সেইখানি দেখে দেখে আমি প্রায় বিশ পঁচিশখানি নকল কোল্লেম। আশালতার বিবাহ। এক-মাস পূর্ব্বে থেকেই বিবাহের কথা আমি শুনে আসছিলেম, ঘটকেরা যাতায়াত কোচ্ছিলো, সম্প্রতি বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়েছে, এই মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে শুভবিবাহ অবধারিত। পত্র-কখানি আমি লিখ্‌লেম, কর্ত্তা সেইগুলি একবার একবার দেখে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোলেন। কল্য শিরোনাম লেখা হবে, আমাকে এই কথা বোলে তিনি বাড়ীর ভিতর যাবার উপক্রম কোচ্ছেন, এমন সময় সেই-খানে একজন লোক এলো। লোক এলো কি জানোয়ার এলো, চেহারা দেখে অগ্রে আমি সেটা ঠাওরাতে পাল্লেম না।

লোকটা বেঁটে, কৃষ্ণবর্ণ, গঠন গাঁট গাঁট, একখানা হাত বড়, একখানা হাত ছোট; পা-দুখানা বাঁকা; বুক পেট সমান; মুখখানা গোল; ঠিক মানু-ষের মতন মুখ নয়, পুতুলে আর ছবিতে বাদরের মুখ যেমন দেখা যায়, চক্ষু কর্ণ নাসিকা ওষ্ঠ সর্ব্বাবয়বে ঠিক সেই রকমের মুখ; ওষ্ঠের দুই পার্শ্বে বরাহ অথবা হস্তীদন্তের ন্যায় বড় বড় দুটো দাঁত, দেখ্‌লেই ভয় হয়; মাথায় ঝুম্‌রো ঝুম্‌রো কোঁকড়া কোঁকড়া, লম্বা লম্বা অনেক চুল; কপালের চুলে চক্ষু পর্য্যন্ত ঢাকা পোড়েছে; মাথার মাঝখানে টাক; সর্ব্বাঙ্গে ভল্লুকের ন্যায় লম্বা লম্বা লোম; পৃষ্ঠে একটী বৃহৎ কুঁজ; লোকটা একে বেঁটে, তার উপর কুঁজের ভার, দাঁড়ালে আরও বেঁটে দেখায়। কুঁজের মাপে জামা তৈয়ারী হয় না, সুতরাং গাত্রের লোমাবলী শীতকালে জামার কাজ করে; গ্রীষ্মকালে ঘামে ভিজে কিম্ভুতকিমাকার দেখায়।

আমি সেই অবস্থায় সত্য সত্যই কিম্ভুতকিমাকার দেখলেম। ঘাড়ে গর্দ্দানে এক। গোঁফ-দাড়ী ছিল, কিন্তু যে লোকের সর্ব্বাঙ্গে গোঁফ-দাড়ী সে লোকের মুখের গোঁফ-দাড়ীর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক; বাহুল্যপাঠ মাত্র।

লোকটা এসেই চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে কর্ত্তাকেই জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হরি-দাস নামে কোন ছোকরা এই বাড়ীতে থাকে?"

প্রশ্ন শুনেই আমি কেঁপে উঠলেম। চেহারাটা এতক্ষণ আমি ভয়ানক বোলেই জানছিলেম, এক একবার মানুষ বোলেও মনে হোচ্ছিলো, কিন্তু এবার আর সে বিশ্বাস থাকলো না ; মনে কোল্লেম, হয় হনুমান, না হয় রাক্ষস ! মনে কোরেই সুট কোরে কর্ত্তার পশ্চাতে গিয়ে লুকালেম ; থর থর কোরে কাঁপতে লাগলেম ! আমার ভয় দেখে কর্ত্তা সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি কে ? তোমার নাম কি ? হরিদাসের কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর ?"

মর্কটমুখো লোকটার চেহারা যেমন কদাকার, কণ্ঠস্বরও সেইরূপ বিকট কর্কশ। ভাঙা ভাঙা কাঁসী যেমন ঝন ঝন শব্দে বাজে, সেই রকম ভাঙা ভাঙা ঝনঝনে আওয়াজ। সেই আওয়াজে সেই কুব্জ রাক্ষসটা গর্জ্জন কোরে উত্তর কোল্লে, "কেন ? ও কথা তুমি জিজ্ঞাসা কর কেন ? আমি যা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সেই কথার উত্তর দাও। হরিদাস নামে কোন বালক এ বাড়ীতে আছে কি না ?"

লোকটার অভদ্রতার পরিচয় পেয়ে উত্তেজিতস্বরে কর্ত্তামহাশয় বোল্লেন, "আছে। কি তা ? আমার কাছেই হরিদাস আছে ; এই ছেলেটীর নাম হরিদাস।"

আমার দিকে অংগুলিসংকেতে কর্ত্তামহাশয়ের এই উত্তর। কুঁজোটা আরো কর্কশ কণ্ঠে বোলতে লাগলো, "হরিদাস আমার ভাগ্নে হয়, আমি হরিদাসের মামা হই, আমার নাম জটাধর তরফদার। কাজকর্ম্ম শিক্ষার উদ্দেশে একটী ভদ্রলোকের কাছে ওকে আমি রেখেছিলেম, পালিয়ে এসেছে। ভারী দুষ্ট, ভারী অবাধ্য ; কাজকর্ম্ম কিছুই কোরবে না, বেয়াড়া ছোঁড়াদের সংগে কেবল মাঠে মাঠে ছুটে বেড়াবে, গাছে গাছে উঠে উঠে বনের পাখী ধোরে ধোরে মারবে, লোকজনের সংগে দাংগা-হাংগামা কোরবে, এই ওটার মতলব। আমি ওটাকে নিতে এসেছি, ছেড়ে দাও, নিয়ে যাই।"

বাতাসে যেমন কলাগাছ কাঁপে, রাক্ষসটার কথা শুনে সেই রকমে আমি কাঁপতে লাগলেম : দরদরধারে সর্ব্বশরীরে ঘাম ঝরতে লাগলো, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল : কর্ত্তার পশ্চাৎ থেকে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে কুঁজোটার দিকে আর একবার চাইলেম ! পান খেয়ে এসেছিল, যে সকল রাক্ষস কাঁচা কাঁচা গরু-মানুষ ধোরে ধোরে খায়, তাদের কস বেয়ে যেমন রক্তধারা গড়ায়, সেই মর্কটমুখোর দুই কস দিয়ে সেই রকম পানের পিক গড়াচ্ছিল, সেই পানের পিকে তার বড় বড় দুটো গজ-দাঁত লাল হয়ে গিয়েছিল ; ঠিক যেন রক্তমাখা ! সব দাঁতগুলোই বড় বড়, গজদাঁত-দুটো আরো বড় ; সব দাঁত রক্তবর্ণ !

মামা হয়ে আমাকে নিতে এসেছে, এই কথা শুনে কিছু কুপিতস্বরে কর্ত্তা তাকে বোল্লেন, "তুমি হরিদাসের মামা, বিশেষ প্রমাণ না পেলে ও কথায় আমার বিশ্বাস হোচ্চে না। হরিদাসের আপনার লোক কে কোথায় আছে, হরিদাস তা জানে না ; জানবার জন্য খবরের কাগজে আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছি, সে সকল বিজ্ঞাপনের ফলাফল না জেনে হরিদাসকে আমি কোথাও যেতে দিব না। তোমার কথা শুনে কেবল আমার সন্দেহ বাড়ছে, কিছুতেই বিশ্বাস হোচ্ছে না।"

"বিশ্বাস হোচ্ছে না ?"—দাঁত খিঁচিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, ব্যংগচ্ছলে জটাধর বোল্লে, "বিশ্বাস হোচ্ছে না ? আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে। যে ভদ্রলোকের কাছে

ওটাকে আমি রেখে দিয়েছিলেম, সেই ভদ্রলোককে তোমার কাছে আমি আনবো, তিনি মিথ্যাকথা জানেন না, তাঁর মুখে সব কথা তুমি জানতে পারবে।"

একটু নরম কথায় কর্ত্তা বোল্লেন, "হাঁ, হাঁ, সেই কথাই ভাল। ভদ্রলোক ! সেই ভদ্রলোককেও আমি চাই ! তোমার কথায় বিশ্বাস করা যেমন উচিত, তোমার সেই ভদ্রলোককেও এখানে হাজির করা সেইরূপ উচিত। বোধ হয়, সেই ভদ্রলোকের হাত থেকেই হরিদাসকে আমি উদ্ধার কোরেছি, তাকেও আমি চিনে রেখেছি, আজ তুমি চোলে যাও, কাল সেই লোককে নিয়ে এসো।"

আমি একটীও কথা কইলেম না, কথা কইতে পাল্লেমই না। বোসে বোসে কাঁপছি আর ঘামছি, মর্কটমুখো আরো গর্জ্জন কোরে কর্ত্তার সঙ্গে কলহ বাধাবার উদযোগ কোল্লে। রাত্রিকালে অকস্মাৎ বৈঠকখানায় কিসের গোলমাল, জানবার অভিপ্রায়ে বাড়ীর তিন চারিজন আমলা আর চাকর তাড়াতাড়ি সেইখানে উপস্থিত হলো। সকলেই ঐ সব কথা শুনলে। লোকটাকে দেখে সকলের আতঙ্ক হলো ; সকলেই দেখে বদমাস বিবেচনা কোরে তাড়িয়ে দিবার চেষ্টা কোত্তে লাগলো। ক্রমশঃ বাগ্‌বিতণ্ডায় গোলমাল আরও বেড়ে উঠলো।

কর্ত্তা একা ছিলেন, কুঁজো পাছে জোর কোরে আমাকে কেড়ে নিয়ে যায়, এতক্ষণ আমার সেই ভয় হোচ্ছিলো, আমলারা সহায় হোলেন দেখে, একটু ভরসা পেলেম। কর্ত্তাকে কিছু বলি বলি মনে কোচ্ছি, এমন সময় বৈঠকখানা ঘরের উত্তরদিকের একটা দরজা খুলে গেল। একটী নীলবসনা কুমারী ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। কে এই কুমারী ?—আশালতা।

আশালতা অল্পবয়স্কা, অবিবাহিতা বালিকা, কি দিবা, কি রাত্রি, মধ্যে মধ্যে বৈঠকখানায় এসে পিতার সঙ্গে কথা কন, বই পড়েন, ছবি দেখেন, পুতুল নিয়ে খেলা করেন ; লজ্জা করবার বয়স হয় নাই, লজ্জা করেন না। ঘরে প্রবেশ কোরেই সেই কুব্জাকার রাক্ষসমূর্ত্তি নিরীক্ষণ কোরে বালিকা অত্যন্ত ভয় পেলেন, স্বভাবসিদ্ধ কোমলকণ্ঠে পিতাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বাবা ! ওটা কে ? ওটা এখানে কেন এসেছে ? ওটা বলে কি ? এখানে এত গোলমাল হোচ্চে কেন ?"

কর্ত্তা উত্তর কোল্লেন, "কে ও, আমি জানি না। ও বোলছে, হরিদাসের মামা হয়, হরিদাসকে নিয়ে যেতে এসেছে।"

এক নিশ্বাস ফেলে, গালে হাত দিয়ে, আশালতা বোল্লেন, "ও বাবা ! হরিদাসের মামা ! না বাবা, ও কখনই হরিদাসের মামা নয়, ও কখনই মানুষ নয় ! হরিদাস এমন সুন্দর, হরিদাসের মামা কি ঐরকম ? না বাবা, ওর সঙ্গে তুমি হরিদাসকে ছেড়ে দিয়ো না।"

কন্যার কথায় একটু হাস্য কোরে, কুঁজোটার দিকে চেয়ে কর্ত্তামহাশয় বোল্লেন, "দেখ দেখি, শোন দেখি, এই ক্ষুদ্র বালিকা কি বলে ! তুমি হরিদাসের মামা, কেহই এ কথা বিশ্বাস কোরবে না। তবে যদি বিশেষ প্রমাণ দিতে পার, আর সেই—আর সেই—যার কথা তুমি বোল্‌ছো, তোমার সেই ভদ্রলোককে যদি হাজির কোত্তে পার, তা হোলে বিবেচনা করা যাবে। আজ তুমি মানে মানে বিদায় হও।"

প্রতিধ্বনি কোরে আশালতা বোল্লেন, "সেই ভাল, সেই ভাল, বিদায় কোরে দাও, হরিদাসকে তুমি কোথাও যেতে দিয়ো না, আমিও যেতে দিব না। কোথাকার মামা, কোথাকার ভদ্রলোক, কোথাকার কে, ওর সঙ্গে কি আমাদের হরিদাসকে যেতে দিতে আছে? দিয়ো না, দিয়ো না। যে-ই হোক, ওকে তুমি এখনি তাড়িয়ে দাও।"

আশালতার মধুর বচনগুলি শ্রবণ কোরে, অভয় পেয়ে আমি তখন কর্ত্তার কাছ থেকে সোরে আশালতার কাছে গিয়েই দাঁড়ালেম, কুঁজোটার দিকে চাই-লেম না; আশালতার মুখের দিকে মুখ রেখে, পশ্চাদ্দিকে অঙ্গুলি হেলিয়ে, সভয়বদনে আতঙ্কে আতঙ্কে কুঁজোটাকে দেখিয়ে দিতে লাগলেম।

কুঁজোটাকে সম্বোধন কোরে কর্ত্তা পুনরায় বোল্লেন, "শুনলে জটাধর, শুনলে। মেয়েটী কি বোলছে, শুনতে পেলে। সকলেই ঐ কথা বোলবে: বিশেষ প্রমাণ না পেলে কেহই তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস কোরবে না। তুমি চোলে যাও।"

গম্ভীর কর্কশগর্জ্জনে কুঁজোটা বোলতে লাগলো, "এখনো ঐ কথা? এখনো বিশ্বাস হোচ্ছে না? বিশেষ প্রমাণ! আচ্ছা, আচ্ছা, আমার উকীলের মুখে তুমি বিশেষ প্রমাণ পাবে, বিশেষ প্রতিফল তোমাকে ভোগ কোত্তে হবে। পরের ছেলেকে—পরের ভাগ্নেকে গুম করার দাবীতে তোমার নামে আমি নালিশ আনবো। আমি তোমাকে—"

কথা সমাপ্ত কোত্তে না দিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, কর্ত্তা তখন বোল্লেন, "যাও যাও, চোলে যাও, তোমার শাসানীতে আমি ভয় করি না। তুমি যা কোত্তে পার কোরো, তোমার উকীল যা কোত্তে পারে, কোত্তে বোলো। বিনা প্রমাণে তোমার হাতে হরিদাসকে আমি কখনই দিব না।"

কুঁজো দেখলে, জোরজবরদস্তী খাটবে না, বলপ্রকাশ কোত্তে গেলেই বিভ্রাট ঘোটবে, কাজে কাজে সে রাত্রে আর বাগবিতণ্ডা না কোরে, চক্ষু পাকিয়ে আড়ে আড়ে আমার দিকে চাইতে চাইতে রাগে ফুলতে ফুলতে, আপন মনে বিড় বিড় কোরে বোকতে বোকতে, এঁকেবেঁকে উপর থেকে নেমে গেল। চাকরেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাততালি দিতে দিতে, হো হো শব্দে গোল কোরে উঠলো। দেউড়ীতে একজোড়া কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড কুক্কুর ছিল, তারাও ঘেউ ঘেউ রবে রাক্ষসটাকে ফটক পার কোরে দিয়ে এলো।

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, বোধ হলো যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল: সে যাত্রা রক্ষা পেলেম। রাত্রি অনেক হয়েছিল, আহারাদি সমাপ্ত হোলো, রাক্ষসের কথা বলাবলি কোত্তে কোত্তে সকলে যথাস্থানে শয়ন কোল্লেন, আমিও প্রেতমূর্ত্তি ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ জেগে জেগে শেষরাত্রে নিদ্রাভিভূত হোলেম।

রজনী প্রভাত। আশালতার বিবাহের আয়োজনে লোকজন সকলেই ব্যস্ত। পাঁচদিন অতীত। ১৬ই বৈশাখ। বিবাহের আটদিন মাত্র বাকী। আটদিন থাকতেই বাড়ী-মেরামত আরম্ভ হলো, ঘর সাজাবার ব্যবস্থা হলো, জিনিসপত্র আমদানী হোতে লাগলো, ফটকের দু-ধারে দুটী পাকা নবৎখানায় নবৎবাজা

আরম্ভ হলো। ১৬ই বৈশাখের দিবা-রজনী আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন, দিবা-ভাগে একবারও সূর্য্যমূর্ত্তি দর্শন হলো না, রাত্রিকালেও নক্ষত্র উঠলো না। ১৭ই বৈশাখ প্রাতঃকালে গুড়ুনি গুড়ুনি বৃষ্টি আরম্ভ, আকাশের দৃশ্য ভয়ঙ্কর, দিনমানেই অন্ধকার! বৈকালে অল্প অল্প হাওয়া উঠলো, বেলা যতই শেষ হয়ে এলো, ততই জোর হাওয়া। সন্ধ্যাকালে ঝড়; ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। মেঘে গর্জ্জন থাকলো না, কালো অন্ধকার মেঘ, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চকমকি। রাত্রে কেহই আর বাড়ী থেকে কোথাও যেতে পাল্লে না, রাত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগবৃদ্ধি, বৃষ্টির অবিরাম। সকলেই চিন্তাযুক্ত। নিয়মিত আহারাদির পর সকলে শয়ন কোল্লেন, অট্টালিকা নিরাপদ, ঝড়-বৃষ্টিতে কোন হানি হবার ভয় ছিল না, জানালা-দরজা বন্ধ কোরে সকলেই সুখনিদ্রা সম্ভোগ কোত্তে লাগলেন। কত রাত্রি পর্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, রাত্রের মধ্যে থেমেছিল কি না থেমেছিল, তা আমার মনে নাই; ভোরবেলা ভারী একটা গোলমালে আমি জেগে উঠলেম। কেন গোলমাল, কিসের গোল-মাল, ব্যাপারখানা কি, জানবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উপর থেকে আমি নেমে এলেম।

বাড়ীর সকলেই তখন জেগেছে। সদরবাড়ীর উঠানে গোটাকত আধপোড়া মশাল, খানকত চূণমাখা বাখারি, আর পাঁচ-সাতটা জলের কলসী পোড়ে আছে। ডাকাত পোড়েছিলো, বাড়ীতে ডাকাতী হয়ে গেছে, ভোরের সময় ডাকাতেরা পালিয়েছে, এই রকম সোরগোল শুনে ভয়েই আমি আড়ষ্ট! অকস্মাৎ অন্দর-মহলে রোদনের কোলাহল! স্ত্রীলোকগণের অত্যুচ্চ ক্রন্দনধ্বনিতে বাড়ীখানা যেন প্রতিধ্বনিত হোতে লাগলো। "ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?" এই কথা বোলতে বোলতে চাকরেরা অন্দরমহলে ছুটে গেল! হাহাকার কোত্তে কোত্তে বাহিরে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বোল্লে, "সর্ব্বনাশ হয়েছে! ডাকাতেরা কর্ত্তা-বাবুকে বিছানার উপরে কেটে রেখে গিয়েছে! রক্তের ঢেউ খেলছে।"

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠানের মাঝখানে আমি আছাড় খেয়ে পোড়লেম। লোকেরা অনেক যত্নে অনেক কষ্টে আমার চৈতন্যসম্পাদন কোরেছিল। না কোল্লেই ভাল হোতো, চেতন পেয়ে আমি দশদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেম, বন বন শব্দে মাথা ঘুরতে লাগলো; চেতন পেলেম, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান থাকলো না; উন্মত্তের ন্যায় "হা কর্ত্তা! হা পিতা! হা আশ্রয়দাতা! হা রক্ষাকর্ত্তা! হা দয়ার সাগর! আমাদের সকলকে অতলে ভাসিয়ে আপনি কোথায় চোলে গেলেন? সংসারে কেহই আপনার শত্রু ছিল না, কে এমন শত্রুতাবাদ সাধলে? কোথা থেকে ডাকাত এলো? কেন এমন সর্ব্বনাশ কোরে গেল?"—বারংবার আর্ত্তস্বরে এইরূপ বিলাপ কোত্তে কোত্তে মস্তকে বক্ষে ঘন ঘন করাঘাত কোত্তে লাগলেম। বাড়ী-ময় ক্রন্দনের কোলাহল!

গৃহিণী মূর্চ্ছিতা! পিতৃশোকে আশালতা মূর্চ্ছিতা! দাস-দাসী, আত্মীয়-কুটুম্ব-চাকর-লোকজন, সকলেই শোকাকুল! রাত্রের মহা ঝটিকা অপেক্ষা এখন যেন এ বাড়ীতে প্রবল-ঝটিকার প্রাদুর্ভাব। আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার! সদর-

দরজা বন্ধ ছিল। যেমন বন্ধ, ঠিক সেইরূপ বন্ধই আছে, ডাকাতেরা তবে কোন পথে এসেছিল, কোন পথ দিয়ে পালিয়েছে, সকলেই বিস্ময়ে বিস্ময়ে সেই কথা বলাবলি কোত্তে লাগলো।

মহা ঝটিকার পর প্রকৃতি প্রশান্ত হয়, এ বাড়ীতে প্রকৃতি নিতান্তই অশান্ত! কেবল ক্রন্দনধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। আকাশ পরিষ্কার; উজ্জ্বল প্রভাত; পূর্ব্বাকাশে উজ্জ্বল সূর্য্য সমুদিত; গত দিবসের মেঘাবৃত গগনে আর এক বিন্দুও মেঘ নাই। সেরেস্তার সর্দ্দার আমলা স্বয়ং পুলিশের থানায় গিয়ে ডাকাতীর সমাচার এজাহার কোল্লেন। থানার দারোগা প্রায় এক কুড়ি বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে তদারকে এলেন। জমাদারের বগলে এক দিস্তা কাগজ, মুন্সীর কর্ণে ময়ূরপুচ্ছের কলম; ভারী ঘটা!

তদারক আরম্ভ হলো। পোড়া মশাল, সাদা বাঁখারি, জলের কলসী, এই তিনটী ঐ ডাকাতীর সাক্ষী। দারোগা-মহাশয় ঘরে ঘরে তদন্ত কোরে জানতে পাল্লেন, জিনিসপত্র কিছুই যায় নাই, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সমস্তই আছে, জানালা-দরজা যেমন তেমনি আছে, ডাকাতেরা সিন্দুক-বাক্স কিছুই ভাঙে নাই। যে ঘরে কর্ত্তা থাকেন, সেই ঘরখানি ছাড়া অন্য ঘরে ডাকাত প্রবেশ কোরেছিল কি না, তারও কোন চিহ্ন নাই। কর্ত্তা একাকী আপন শয়নকক্ষে খট্টার উপর নিদ্রিত ছিলেন, গৃহিণী সে রাত্রে সে ঘরে ছিলেন না, আশালতাকে নিয়ে অন্যঘরে শুয়েছিলেন। সে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, সে ঘরে ডাকাত প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য ঘরেরও দরজা খোলা ছিল না, সেই সকল ঘরে যাঁরা যাঁরা ছিলেন, প্রভাতে তাঁরাই ভিতরদিক থেকে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়েছেন। সকলের জবানবন্দীতে এইরূপ প্রমাণ হলো। দারোগা-মহাশয় সকল কথাই রিপোর্টে লিখে নিলেন। কর্ত্তার ঘরের দরজা প্রতি রাত্রেই খোলা থাকে, সে রাত্রেও খোলা ছিল, সেই ঘরেই খুন। বিছানায় রক্ত ছড়াছড়ি, বালিসের কাছে বৃহৎ একখানা রক্তমাখা ছোরা, কর্ত্তার কণ্ঠদেশ মাঝামাঝি কাটা।

আরো এক আশ্চর্য্য এই যে, ডাকাতেরা সে ঘরেরও কোন জিনিসপত্রে হাত দেয় নাই, সিন্দুক-বাক্সও ভাঙে নাই, সিন্দুক-বাক্সের চাবী কর্ত্তা নিজেই রাখতেন, রাত্রিকালে বালিসের নীচেই রিঙে গাঁথা চাবীর গোছা থাকতো, ঠিক আছে, কেহই সরায় নাই। বেশ জানা গেল, জিনিসপত্রের লোভে এ ডাকাতী নয়।

তবে এ ডাকাতীর অর্থ কি?—বাড়ীতে ডাকাত পোড়লো, জিনিসপত্র নিলে না, অলঙ্কারপত্র ছুঁলে না, কেবল গৃহস্বামীকেই প্রাণে মেরে রেখে গেল, ব্যাপার অবশ্যই অদ্ভুত। এমন শত্রুতা কার সঙ্গে ছিল?

পুলিশের লোকেরা একটা না একটা অছিলা পেলেই আপনাদের স্বার্থের দিকে বেশী ঝোঁক রাখেন। যে সময়ের কথা আমি বোলছি, সে সময়ে সে ঝোঁকটা আরও কিছু বেশী ছিল। যাদের বিপদ, তাদের উপরেই বেশী জুলুম করা সে কালের দারোগাদের বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র তত নাই। চুরি, ডাকাতী, খুন, অপঘাতমৃত্যু ইত্যাদি বড় বড় অভি-

যোগে গৃহস্থের উপর দৌরাত্ম্য অতি প্রবল হয়। এদেশের প্রভুরা এক এক জায়গায় ঠিক সেই ভাব দেখান।

পাইক বরকন্দাজ প্রভৃতি ছোট বড় শান্তিরক্ষকগণের সে সময়ের সদর-বাড়িতে সাধুলোকের হৃদয়ে বিষম ভয়ের সঞ্চার হয়।

তদারকের অনেক দূর সমাপ্ত কোরে দারোগা-মহাশয় দলবল সহ সদর-বাড়িতে গেলেন। সেই সময় আর এক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হলো। সমস্ত রাত্রি সদর দরজা বন্ধ, খিড়কীদরজা বন্ধ, খিড়কীর প্রাচীরগুলোও উচ্চ উচ্চ, ডাকাত তবে কোন পথে এসেছিল? কোন পথ দিয়েই বা বাহির হয়ে গেল? দারোগা-মহাশয় এই প্রশ্ন উত্থাপন কোরে মুখের কথায় রায় দিলেন, "ডাকাতীর সংবাদ মিথ্যা, বাড়ীর লোকেরাই শত্রুতা কোরে কর্ত্তাটীকে কেটে ফেলেছে, মিছামিছি গোটাকতক পোড়া মশাল আর খানকতক চূণমাখা বাঁখারি উঠানের মাঝখানে ফেলে রেখেছে। সর্ব্বৈব মিথ্যা।" মূল কথা, কিছু মোটা ধরণের দক্ষিণালাভ হোলে এ সকল কথা বোধ হয়, উত্থাপিত হোতো না। জমীদারের বাড়ীতে জমীদার খুন, সে ক্ষেত্রে বেশী দক্ষিণার আশা করা পুলিশের লোকের স্বভাবসিদ্ধই হওয়া উচিত, কিন্তু কে টাকা দিবে, কেন দিবে, সে কথার মীমাংসা না হওয়াতে পুলিশ কিছু ক্ষুণ্ণ হোলেন, তাঁদের মনে মনে রাগও হলো। হলো হলোই, সে রাগের উপশম করা বাড়ীর লোকের সাধ্য নয়, কাজে কাজে দারোগা তখন ডাক্তার ডাকবার হুকুম দিলেন।

একজন ডাক্তার এলেন, মৃতদেহ পরীক্ষা কোল্লেন, যেমন দস্তুর, সেই রকম আপন মন্তব্য লিখে দারোগার হাতে দিলেন ;—"ছোরা দিয়ে কাটা, বেশী রাত্রে কাটা, যারা অস্ত্রচালনে শিক্ষিত ও সুপটু, তাদের মধ্যেই একজন কর্ত্তাকে খুন কোরেছে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।" ডাক্তারের সার্টিফিকেটখানি পুলিশের রিপোর্টের সঙ্গে চালান হবে, সুতরাং সেখানি দারোগার হাতেই থাকলো।

এই সকল কাণ্ড হোচ্ছে, এমন সময় বাড়ীর দুজন চাকর তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটে এসে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বোল্লে, "ভারা বেয়ে লোক উঠেছিল, আশালতার বিবাহের জন্য বাড়ী মেরামত হোচ্ছিল, বাইরে ভারা বাঁধা ছিল, সেই ভারার বাঁশের উপর কাদামাখা মানুষের পায়ের দাগ। গোটাকতক দাগের সঙ্গে রক্ত দেখা যাচ্ছে, দু-পাঁচটা বাঁশের বাঁধনদড়ীও আলগা হয়ে গিয়েছে, কজন লোক এসেছিল, ঠিক জানা গেল না, কিন্তু ভারা বেয়ে মানুষ উঠা, সে স্পষ্টই জানা গেল।"

দারোগা-মহাশয় এই প্রমাণে গম্ভীরবদনে খানিকক্ষণ মাথা হেঁট কোরে রইলেন, শেষকালে মৌনভঙ্গ কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "পুরুষ ওয়ারীস কে আছে?" সেরেস্তার দেওয়ানজী অগ্রবর্ত্তী হয়ে উত্তর কোল্লেন, "আপনি তো সকলি জানেন, পুরুষ ওয়ারীস কেহই নাই, তবে জামাইবাবু কন্যাদের পক্ষে অভিভাবক হবেন। তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি এলেই লাস জ্বালাবার ব্যবস্থা হবে। কর্ত্তার বড়মেয়েটীকে, মেজোমেয়েটীকে আর জামাইবাবুকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিলো, কে কতক্ষণে পৌঁছিবেন, সেই অপেক্ষায় দারোগা-

মহাশয় সেই বাড়ীতেই থাকলেন। জামাইবাবুর বাড়ী অধিক দূরে ছিল না, খুব শীঘ্রই তাঁর পত্নীকে সঙ্গে কোরে তিনি এসে উপস্থিত হোলেন ; সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে নিজেকে সামাল দিয়ে দু-এক ফোঁটা অশ্রুপাত কোল্লেন। কন্যা উমাকালী পিতার নিকটে গিয়ে হাহাকার কোত্তে লাগলেন, তাঁর সঙ্গে বাড়ীর লোকগুলির ক্রন্দন এমন উচ্চে পোঁছল যেন বাতাস পর্য্যন্ত কাঁপাতে লাগলো।

এদিকে অন্য বন্দোবস্ত। মৃতদেহ হাসপাতালে চালান না দিয়ে সহজে যাহাতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়, জামাইবাবু দারোগাকে সেইরূপ অনুরোধ কোল্লেন। খানিক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে দারোগা মহাশয় দুই একটা কূটতর্ক উত্থাপন কোল্লেন, শেষকালে গোপনে আশামত সেলামী পেয়ে জল হয়ে গেলেন ; গৃহস্থের তত বিপদেও তাঁর গম্ভীরবদনে মৃদু হাস্য দেখা দিল, লাস জ্বালাবার হুকুম দিয়ে, জামাইবাবুর সঙ্গে আত্মীয়তা কোরে তিনি তখন বিদায় হোলেন।

শ্মশানে সর্ব্বানন্দবাবুর মৃতদেহের সৎকার হলো। শোকের বেগ কতকটা থামলো। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামাসুন্দরী রোদন কোত্তে কোত্তে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোলেন। গোলমাল, ক্রন্দন, হাহাকার, নানাকথা ইত্যাদি এ সকল কার্য্যের অঙ্গ। জামাইবাবু সকলকে প্রবোধ দিয়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা কোল্লেন, কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হোলেন। চতুর্থ দিবসে কন্যারা নিয়মিত কার্য্য সমাধা কোরে শুদ্ধ হোলেন। নির্দ্ধারিত সময়ে গৃহিণী ঠাকুরাণী পতির ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন কোল্লেন। গোলমাল অনেকটা থেমে গেল।

দশম কল্প

উইলপাঠ

মোহনলালবাবু সর্ব্বদাই ব্যস্ত, সর্ব্বক্ষণ চঞ্চল। কি জন্য যে তত ব্যস্ততা, সকল লোকে সেটা অনুভব কোত্তে পাল্লে না। মোহনলালের শোক অপেক্ষা উদ্বেগ অধিক, সেটা আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম। সংসারের প্রকৃতি এই যে, যাদের সঙ্গে শোণিত-সম্পর্ক, যাদের সঙ্গে নিকট-সম্পর্ক, কারো বিয়োগে তাদেরি শোক অধিক হয়, অপর লোকের ততটা হয় না। আমি একজন অপর লোক, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক, তথাপি আমি যেন বুঝলেম, সর্ব্বাপেক্ষা আমারি অধীরতা অধিক হয়ে দাঁড়ালো। কেন এমন বিপর্য্যয় ?—জন্মাবধি আমি নিরাশ্রয়, এই মহৎলোকের আশ্রয় পেয়েছিলেম, তিনি আমাকে ফাঁকী দিয়ে চোলে গেলেন, দুষ্টলোকে অন্ধকারে তাঁকে খুন কোরে গেল, আবার আমি নিরাশ্রয় হয়ে পোড়লেম। কে আর আমাকে আশ্রয় দিবে ? সংসারে আমার আপনার লোক কেহই নাই, লোকের বরং মাথা রেখে থাকবার এক-আধখানা পর্ণকুটীর থাকে, আমার ভাগ্যে তা পর্য্যন্ত নাই। গৃহিণী যদি দয়া না করেন,

তবে আমি যাব কোথা, খাব কি, সর্ব্বক্ষণ সেই ভাবনা ; সেই ভাবনাতেই আমার অধিক শোক।

একমাস অতীত হয়ে গিয়েছে। বাবু মোহনলাল একদিন বৈকালে পাড়ার দশজন ভদ্রলোককে ডেকে প্রস্তাব কোল্লেন, "বিষয়াদি-বণ্টনের কিরূপ ব্যবস্থা হবে, সেইটীই এই সময় নির্দ্ধারণ করা হোক। যা হবার, তা তো হয়ে গেল, তিনি তো আর ফিরে আসবেন না, এখন যারা থাকলো, তাদের একটা ব্যবস্থা করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। কর্ত্তা আমাকে বোলেছিলেন, উইল করা হয়েছে, সিন্দুকে উইল আছে। আপনারা চলুন, আপনাদের সকলের সাক্ষাতে সিন্দুকটী খুলে উইলখানি দর্শন করা যাক।"

একটী ভদ্রলোক বোল্লেন, "অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তো থাকবোই, কিন্তু একজন সরকারী লোক উপস্থিত থাকা আবশ্যক ; সেইটীই বিধিসিদ্ধ কার্য্য। পুলিশের দারোগাকেই মাঝখানে দাঁড় করানো ভাল।"

তাই-ই মঞ্জুর। মোহনবাবু নিজেই পুলিশে গেলেন, দারোগার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল, বিশেষতঃ তদন্তের দিন সেলামী দান করা হয়েছে, তিনি তুষ্টও ছিলেন, আহ্বানমাত্রই মোহনবাবুর সঙ্গে তিনি আগমন কোল্লেন। কর্ত্তার শয়নগৃহে সকলেই উপস্থিত। কর্ত্তার চাবীগুলি দারোগা পেয়েছিলেন, কিন্তু নিজে রাখেন নাই, সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারিণী গৃহিণী, তাঁর কাছেই চাবী-গুলি ছিল। চাবীর তাড়াটী চেয়ে নিয়ে বাবু মোহনলাল একটু সন্দিগ্ধবদনে বোল্লেন, "কোন সিন্দুকে উইল, তা তো ঠিক জানা নাই, এক এক কোরে সব সিন্দুকগুলি খুলে দেখতে হবে।" সকলে সেই কথাতেই সায় দিলেন, সর্ব্বসম্মতিতে সেইরূপ কার্য্যই আরম্ভ হলো।

ঘরে পাঁচটী সিন্দুক! একে একে পাঁচটী সিন্দুক খোলা হলো। অন্য জিনিস পাওয়া গেল, উইল পাওয়া গেল না।

বলা উচিত, ভদ্রলোকগুলির সঙ্গে সেই দিন সেই সময় আমিও সেই ঘরে উপস্থিত হয়েছিলেম। মোহনবাবু রঙ্গ দেখে আমার বড় বিস্ময়বোধ হলো। পাঠক-মহাশয়ের স্মরণ থাকতে পারে, যে রাত্রে শ্বশুর-জামাই দুজনে নির্জ্জনে বৈঠকখানায় বোসে কথোপকথন করেন, পুস্তকাগারের দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আমি শুনেছিলেম, কর্ত্তাবাবু জামাইবাবুকে ভর্ৎসনা কোরে শাসিয়ে বোলে-ছিলেন, "ঐ সিন্দুকে উইল আছে।" সে সিন্দুক বৈঠকখানায়। অন্দরের শয়ন-কক্ষে পাঁচটী সিন্দুক খোলা হলো, সে সকল সিন্দুকে উইল ছিল না, মোহন-বাবু অবশ্যই তা জানতেন, জেনেও যেন ন্যাকা সেজে লোকগুলির কাছে সাঁচ্চা হবার ভূমিকা কোল্লেন। পাঁচটী সিন্দুকে উইল পাওয়া গেল না, বৈঠকখানায় লৌহসিন্দুক আছে, সেইখানে যাওয়াই স্থির হলো। সকলে চোল্লেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। মনে আমার দারুণ সন্দেহ।

মোহনবাবু কেমন প্রকৃতির লোক, সেটা আমার ভাল জানা ছিল না। আমাকে প্রথম দেখে তিনি চোমকেছিলেন, আমাকে নিজবাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য কর্ত্তার কাছে অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন, সে কথা আমার মনে আছে। তাঁকে দেখে আমার ভয় হয়। সেবারে কেবল এক রাত্রিমাত্র এ বাড়ীতে ছিলেন,

আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ দেখাশুনা হয় নাই, একটী কথাও হয় নাই। কর্ত্তার কথা শুনে জামাইবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জেনেছিলেম, স্বভাব ভাল নয়, এইটুকু মাত্র আমার ধারণা হয়েছিল। এক একমাসের অধিক দিন আমার সঙ্গে দেখাশুনা, দুই একটী কথাও হয়, কিন্তু আমি বেশীক্ষণ তাঁর সম্মুখে থাকি না, আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এক একবার মনে কোন সন্দেহ আসে, তাঁর সঙ্গে দেখা হবামাত্রই কিম্বা তিনি আমার দিকে আসবেন, বুঝতে পাল্লেই ধাঁ কোরে সেখান থেকে আমি সোরে যাই। কেন এমন ভয়, কেন এমন সন্দেহ তখনো পর্য্যন্ত সেটা আমি ভাল কোরে বুঝতে পারি নাই। আজ আবার উইলের প্রসঙ্গে নূতন সন্দেহ। কোথায় উইল, জেনেও জানেন না। সিন্দুকটী দেখিয়ে দিয়ে কর্ত্তা তাঁকে স্পষ্টাক্ষরে বোলেছিলেন, ঐ সিন্দুকে উইল আছে। এখন তিনি যেন ন্যাকা লোক, সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছেন।

যা-ই হোক, বৈঠকখানায় আশা হলো, লৌহসিন্দুক খোলা হলো, উইল-খানা পাওয়া গেল। সিন্দুকে আরও পাঁচরকম অল্পমূল্যের জিনিসপত্র ছিল, টাকাকড়ি ছিল না, খান দুই তিন সাদা ষ্ট্যাম্পকাগজ আর সেই উইলখানি।

উইলখানি হাতে নিয়ে, সকলের দিকে চেয়ে, মোহনবাবু বোল্লেন, "আপনা-দের মধ্যে একজন এইখানি পাঠ করুন।" সমবেতবাক্যে সকলে সমস্বরে বোল্লেন, আমাদের কেন, সরকারের লোক দারোগা-মহাশয়, ইনিই পাঠ করুন। সর্ব্ব-সম্মতিতে দারোগা-মহাশয় উইল পাঠ কোল্লেন। উইলে লেখা ছিল :—

"আমার তিনটী কন্যা। প্রথমা শ্যামাসুন্দরী, দ্বিতীয়া উমাকালী, তৃতীয়া আশালতা। শ্যামাসুন্দরী বিধবা, আশালতা অবিবাহিতা। আমার * * * নম্বরের জমীদারী এবং ৭৫ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং ভদ্রাসনবাটী ও বাগানবাটী ইত্যাদি যাহা কিছু আছে, আমার সম্ভাবিত পুত্রিকা মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী উমাকালী দাসী প্রাপ্ত হইবেন। আমার জামাতা উক্ত উমাকালী দাসীর স্বামী শ্রীযুক্ত মোহনলাল ঘোষ তাহার অছি ও অভিভাবক থাকিবেন। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামাসুন্দরী দাসী মাসে মাসে একশত টাকা মাসহারা পাইবেন, কনিষ্ঠা কুমারী কন্যা শ্রীমতী আশালতা দাসীর শুভবিবাহ যদি আমি জীবদ্দশায় সম্পাদন করিয়া না যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবনান্তে উক্ত মোহনলালবাবু দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া উপযুক্ত পাত্রে আশালতাকে সম্প্রদান করিবেন। আশালতার গর্ব্ভে পুত্রসন্তান জন্মিলে আমার মধ্যমা কন্যা উল্লিখিত উমাকালী দাসী আপন প্রাপ্ত সম্পত্তির তৃতীয়াংশ সেই পুত্রকে অথবা পুত্রগণকে প্রদান করিবেন, আশালতার পুত্র না জন্মিলে আশালতা মাসিক একশত টাকা মাসহারা পাইবেন। যদবধি আমার পত্নী শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দাসী জীবিতা থাকিবেন, তদবধি কেহই আমার বিষয়টি বণ্টন করিয়া লইতে পারিবেন না, তাঁহার মতানুসারে ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে সমস্ত বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক, কিন্তু উক্ত মহালক্ষ্মী দাসীও কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বিষয়ের কোন অংশ কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারি-বেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।"

উইলের পাঠ শ্রবণ কোরে আমি এককালে হতবুদ্ধি হোলেম। কর্ত্তার মুখে কি শুনেছিলেম, এখনি বা কি শুনলেম। সমস্তই বিপরীত! এ বৈপরীত্যের হেতু কি, কিছু অনুমান কোত্তে পাল্লেম না; মনে মনে যতই আলোচনা করি, ততই সন্দেহবুদ্ধি এবং মনের কথা প্রকাশ কোরে বলি, এখন একটী লোক নাই। মনের সংশয় মনে চেপে রাখলেম। উইল যখন পড়া হয়, তখন আমি দারোগার পাশে দাঁড়িয়ে একবার দেখেছিলেম, উইলে তিন-জন সাক্ষীর নাম লেখা। শ্রীকুঞ্জবিহারী সান্যাল নবীদার, সাং বর্দ্ধমান; শ্রীনফরচন্দ্র ঘোষাল, সাং রায়না; শ্রীজনার্দ্দন মজুমদার, সাং বর্দ্ধমান। এই তিনজনের কোন পরিচয় আমি জানি না। কেমন কোরেই জানবো? আমি আসবার অগ্রে উইল লেখা হয়েছিল কিংবা পরে হয়েছিল, আমার অজ্ঞাত; অধিকন্তু আমি বর্দ্ধমানে আসবার পর ঐ তিনজনের একজনও বাড়ীতে আসে নাই, কারো মুখে তাদের নামও আমি শুনি নাই, আমার সম্বন্ধে ওরা তিন-জনেই নূতন লোক। মনে মনে অনেক আন্দোলন কোল্লেম, কিছুই মীমাংসা খুঁজে পেলেম না, সন্দেহটাও গেল না। বাড়ীতে ডাকাত পোড়েছিল, লুটপাট কোল্লে না, অন্যঘরেও গেল না, কেবল কর্ত্তাটীকে কেটে গেল, ইহাও বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ সমস্যা বড়ই বিষম সমস্যা!

যে সকল ভদ্রলোক মধ্যস্থ হোতে এসেছিলেন, তাঁরা বিদায় হোলেন, দারোগা-মহাশয় থানায় গেলেন, গোলমাল চুকে গেল। লোকগুলি যখন বিদায় হন, তখন আমি দেখেছিলেম, কারো কারো মুখ বিষণ্ণ হলো, কারো কারো মুখ প্রসন্নভাব ধারণ কোল্লে; দারোগার মুখে প্রসন্ন অপ্রসন্ন কোন ভাবই লক্ষিত হলো না।

হায় হায়! শুভকার্য্যের সূচনায় কি ভয়ঙ্কর অশুভসংঘটন! এক এক-খানা উপন্যাসে আমি পাঠ কোরেছি, বিবাহরজনীতে অকস্মাৎ কন্যার মৃত্যু, বাসরঘরে বরের মৃত্যু, অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বদিন দুগ্ধপোষ্য শিশুর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি! এখানেও প্রায় সেইরূপ শোচনীয় ঘটনা। আশালতার বিবাহ। সমস্ত আয়োজন ঠিকঠাক, আত্মীয়-কুটুম্ব স্থলে নিমন্ত্রণপত্র পর্য্যন্ত প্রেরিত হয়েছিল, অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! বিবাহের কথা আর কারো মুখে উচ্চারিত হলো না, সকলেরি মুখে কেবল শোকের কথা! মাসাধিক যে বাড়ীতে হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হোচ্ছিল, সে বাড়ী এখন বিষাদপূর্ণ!

একাদশ কল্প

মামা!

পাঁচদিন গেল। সেই পাঁচদিন আমি জামাইবাবুর কাছে কাছে থাকতে শিখলেম, ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছা হলো। কেন হলো, পাঠক-মহাশয় বোধ হয়,

সেটা অনুভবে বুঝতে পেরে থাকবেন। নিরাশ্রয় আমি, উত্তম আশ্রয় পেয়েছিলেম, কর্ত্তা আমাকে ভালবেসেছিলেন, বাড়ীর পরিবারেরাও আদর কোচ্ছিলেন, সুখেই ছিলেম, এ আশ্রয় যদি যায়, তবে আমি পথের ভিকারী হব! জামাই-বাবু যদি দয়া কোরে এই বাড়ীতে আমাকে থাকতে দেন, সেই আশাতেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছা। যখন যা তিনি বলেন, তখনি তাই আমি করি, কোন কথাতেই আর অবাধ্যতা দেখাই না, সর্ব্বদাই তাঁর অনুগত হয়ে থাকি! তিনি যে সকল কথা কন, তা শুনে আমার প্রতি তার আদেশ আছে, এমন কিছুই বুঝা যায় না। কোন কার্য্যের আদেশ পেয়ে যখন আমি শীঘ্র ছুটে যাই, তখন তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করেন, আড়ে আড়ে তাও আমি দেখতে পাই। আমার প্রতি তার একটু সদয়ভাব, ঐ হাস্য দেখে সেটাও আমি যেন বুঝতে পারি। মনে একটু ভরসা হয়।

বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা কর্ত্তা বিদ্যমানে আমার প্রতি যে ভাব দেখাতেন, এখনও তাঁদের সেই ভাব। আশালতার সুন্দর মুখখানি সর্ব্বদা বিষণ্ণ, মুখখানি দেখে আমার বড় কষ্ট হয়, তথাপি আমার প্রতি তাঁর সমান ভালবাসা।

কর্ত্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামাসুন্দরী পূর্ব্বে আমাকে দেখেন নাই, এই বিপদের সময় প্রথম দেখা, তথাপি তিনি আমাকে বেশ আদর-যত্ন করেন। আমি যখন তার মুখের দিকে চাই, তিনি তখন একদৃষ্টে খানিকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরান ; বোধ হয়, যেন চক্ষে একটু জল আসে। কেন যে তেমন ভাব, তা আমি বুঝতে পারি না। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোলে গেলেও তিনি আমার দিকে চেয়ে থাকেন। মধ্যমা উমাকালীর সে ভাব নয়, তিনি আমাকে আদর করেন বটে, কিন্তু ততটা স্নেহ-মমতা প্রকাশ পায় না।

গৃহিণী ঠাকুরাণী একদিন আমাকে কাছে বোসিয়ে এ কথা সে কথার পর সস্নেহবচনে বোল্লেন, "হরিদাস! ঘরসংসার তো অন্ধকার হয়ে গেল! এত সাধে বিধাতা বাদসাধলেন! বিধাতার মনে যা থাকে, তাই হয় ; আমাদের ভাগ্যে যা ছিল তাই হলো ; তুমি কিন্তু এখান থেকে কোথাও যেয়ো না ; আমি তোমাকে কোথাও যেতে দিব না ; কর্ত্তার কাছে যেমন ছিলে, আমাদের কাছেও তেমনি থাকো। আমি তোমাকে ঠিক যেন পেটের ছেলের মতন দেখি, কোথাও তুমি যেয়ো না, মোহনলাল তোমাকে আপন বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান, কর্ত্তাকেও বোলেছিলেন, আমাকেও বোলেছিলেন, আমি অস্বীকার কোরেছি ; তোমাকে যদি বলেন, তুমিও অস্বীকার কোরো। মোহনলালের—"

কথাটী সমাপ্ত হোতে পেলে না, গৃহিণীর অর্দ্ধোক্তির সময়েই শ্যামাসুন্দরী সেইখানে এলেন ; কথাটী চাপা পোড়ে গেল। শ্যামাসুন্দরী বোধ হয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে জননীর কথাগুলি শুনেছিলেন, তিনিও ঠিক সেই রকমে স্নেহ জানিয়ে অতি কোমলস্বরে বোল্লেন, "হরিদাস! মা যে কথা তোমাকে বোলছেন, তুমি তাই কোরো, এইখানেই থেকো, কোথাও যেয়ো না ; তোমাকে দেখলে আমরা সকলেই—"

বোলতে বোলতে বসনাঞ্চলে চক্ষু ঢেকে দয়াবতী নীরবে অশ্রুপাত কোল্লেন। কেন, কে জানে, তাঁর চক্ষের জল আমি দেখতে পাল্লেম না ;—কি জানি কেন, ভারী কষ্ট হোতে লাগলো, চক্ষু মুছতে মুছতে আমি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে গেলেম।

আরো পাঁচদিন গেল। সন্ধ্যার সময় আমি আর জামাইবাবু বৈঠকখানায় নির্জ্জনে। স্থান প্রকার ভূমিকা না কোরেই জামাইবাবু আমাকে বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি আমার বাড়ীতেই চলো। কর্ত্তার কাছে যেমন ছিলে, আমিও সেইরূপ যত্নে রাখবো। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, আমার কাজকর্ম্ম কোরবে, মাসে মাসে কিছু কিছু জলপানীও পাবে, কোন কষ্ট হবে না। থাকতে থাকতে আমি তোমাকে একটা ভাল কাজে নিযুক্ত কোরে দিব, বেশ সুখেই থাকবে। এখানে তো কিছু পেতে না, কর্ত্তা কেবল ভালকথা বোলে তোমাকে ভুলিয়ে রাখতেন, আমার কাছে সে রকম অবিবেচনার কার্য্য হবে না ; আমার সঙ্গেই তুমি চল। দুই এক হপ্তার মধ্যেই আমি যাব, সেই সঙ্গেই তোমাকে নিয়ে যাব, এইরূপ ইচ্ছা কোরেছি। কেমন, কি বল?"

নতবদনে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞে না, তা আমি যেতে পারবো না, কর্ত্তা আমাকে নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছিলেন, চিরজীবন আমি এইখানেই থাকবো, এইরূপ আজ্ঞা কোরেছিলেন, সে মহাপুরুষের সে আজ্ঞা আমি লঙ্ঘন কোত্তে পারবো না। বিশেষতঃ গৃহিণী ঠাকুরাণী আমাকে ছেড়ে দিবেন না, সেদিন তিনি আমাকে বোলেছেন, 'এ সংসার ছেড়ে কোথাও তুমি যেয়ো না।' তাঁর কথা অমান্য কোল্লে আমার ধর্ম্ম থাকবে না। জন্মাবধি আমি জননী জানি না, তারে আমি জননী তুল্য দেখি, তিনিও আমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করেন। আমি যাব না।"

উত্তর শুনে, মুখ ভারী কোরে, সক্রোধে জামাইবাবু বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে থাকো! এই অবাধ্যতাই তোমার অধঃপাতের কারণ হবে! অবোধ বালক! আপনার ভাল আপনি বুঝতে পারে না! আমি তোমার ভাল করবার জন্য চেষ্টা কোরছিলেম, সেটা তোমাকে ভাল লাগলো না, গৃহিণী পুত্রতুল্য স্নেহ করেন, সেই কথাটাই বড় হলো! ধর্ম্ম থাকবে না! উঃ! কত বড় ধর্ম্মজ্ঞান! আচ্ছা, ধর্ম্ম তোমার কত উপকার করে, দেখা যাবে! থাকো তুমি!"

আমি আর একটীও কথা কইলেম না, নতশিরে অল্পক্ষণ সেইখানে বোসে থাকলেম। একখানা কাগজ হাতে কোরে জামাইবাবু সেখান থেকে উঠে গেলেন, একটু পরে আমিও বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেম।

আরো পাঁচদিন অতীত। উইলপাঠের পর এক পক্ষ অতিক্রান্ত। পক্ষান্ত-রজনী প্রভাত হলো। প্রভাতসূর্য্য পূর্ব্বগগনে হাসতে হাসতে দেখা দিলেন। বড় বড় গাছেরা আর বড় বড় অট্টালিকার সূর্য্যকিরণ মাথায় কোরে রজতবর্ণ দীপ্তি ধারণ কোল্লে। আমাদের বৈঠকখানার সংলগ্ন মনোহর পুষ্পোদ্যানে প্রস্ফুটিত কুসুমেরা বাতাসে বাতাসে হেলে দুলে সুগন্ধ বিতরণ কোরে, আমার সন্তপ্তচিত্তকে সুশীতল কোত্তে লাগলো, ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে গুন গুন স্বরে গান কোত্তে কোত্তে মধুভক্ত মধুমক্ষিকারা প্রভাতকুসুমের মধুপানে প্রবৃত্ত

হলো, একাকী বারান্দায় বোসে বোসে প্রকৃতির সেই নয়নমোহিনী শোভা আমি দর্শন কোত্তে লাগলেম।

বেলা অনুমান চারিদণ্ড। জামাইবাবু বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় বোসলেন। একজন চাকর তামাক দিয়ে গেল, তিনি আপন মনে তামাক খেতে লাগলেন। বৈঠকখানাঘর থেকে বারান্দা বেশ দেখা যায়, যেখানে আমি বোসে ছিলেম সেদিকের দরজার সঙ্গে বৈঠকখানার দরজা ঠিক রুজু রুজু ; জামাইবাবু আমাকে দেখতে পেলেন, কিন্তু ডাকলেন না। আমি একবার তার দিকে চেয়ে দেখলেম, বুঝলেম, রাগ রাগ ভাব।

গাছের মাথায় ছাদের মাথায় রৌদ্র দেখেছিলেম, সে রৌদ্র সে দিন মাটীতে নামলো না, সূর্য্যও আর দেখা গেল না। মেঘ উঠলো ; মেঘের সঙ্গে অল্প অল্প হাওয়া প্রভাতের মেঘে বৃষ্টি হয় না এই আমার সংস্কার, সুতরাং বারান্দা থেকে উঠলেম না, মেঘ ক্রমশই গাঢ় হয়ে এলো। ঊষাকালে কাক ডাকে ; বেলা চারি দণ্ডের সময়, ঝাঁক ঝাঁক কাক কা কা রবে ডেকে ডেকে ঝটাপট শব্দে উড়ে উড়ে আমাদের বাড়ীর দিকে আসতে লাগলো ; বাড়ীর নিকটস্থ জঙ্গলে শেয়ালেরা হুয়া হুয়া রবে চীৎকার কোরে উঠলো। মেঘাগমে দিনমানকে ঊষা অনুমান কোরে কাক-শৃগাল কলরব কোচ্ছে। এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভুল ; অল্পজ্ঞানে আমার মনে যেন কোন অমঙ্গল আশঙ্কার আবির্ভাব হলো। দিবাভাগে শিবার ডাক অমঙ্গল, এ দেশের স্ত্রীলোকেরাও ইহা জানেন ; অমঙ্গল আশঙ্কায় অকস্মাৎ আমার বুক কেঁপে উঠলো। কর্ত্তার অপমৃত্যুতে মহা অমঙ্গল ঘোটেছে, আজ আবার আরো বা কি ঘটে, সেই আশঙ্কাই প্রবল। বারান্দা থেকে উঠে আমি বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। যে ঘরে জামাইবাবু ছিলেন সে ঘরে গেলেম না, সেই ঘরের পাশের ঘরে অদেখা হয়ে একটা গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেম ; ঘরে যখন প্রবেশ করি, তখন দেখলেম, জামাইবাবুর কাছে আরো তিন চারিটী ভদ্রলোক বোসে আছেন। পোষাকে ভদ্র কি ব্যবহারে ভদ্র, তা আমি বুঝলেম না ; কেন না, তাঁদের আমি আর কোন দিন দেখি নাই ; সব মুখ অচেনা ; কখন তাঁরা এসেছেন, কুসুম দর্শনে অন্যমনস্ক ছিলেম, তা আমি দেখতে পাই নাই। জামাইবাবুর সঙ্গে তাদের হাসি-ঠাট্টা চোলছে, গল্প-গুজব হোচ্ছে, শব্দ আমার কাণে এলো। কিসের হাসি, কিসের গল্প, তা আমি জানতে পাল্লেম না ; জানবার দরকার ছিল না, সেদিকে মনোযোগ রাখলেম না ; ভ্রূক্ষেপই কোল্লেম না।

জামাইবাবু আমাকে ডাকলেন না, আমি ইচ্ছাবশে সে ঘরে গেলেম না ; অন্যলোকের সঙ্গে যদি কোন গোপনীয় কথাই থাকে, আমার সেখানে যাওয়া অনধিকারপ্রবেশ, তাই ভেবেই গেলেম না ; ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁদের অলক্ষিতে উপর থেকে নেমে এলেম ; সদরদরজায় দাঁড়িয়ে আকাশপানে চেয়ে দেখি, ঘোর অন্ধকার ! সেই সময় যদি আমার নিদ্রাভঙ্গ হোতো, তা হোলে মনে কোত্তেম, তখনো রাত্রি আছে ; এত অন্ধকার !

বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়ে দুই একজন লোক যাওয়া-আসা কোচ্ছে, এখনি হয় তো বৃষ্টি আসবে, এই ভেবে তারা খুব তাড়াতাড়ি চোলছে, আর

এক একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশপানে চেয়ে চেয়ে দেখছে ;—দেখছে আর চোলেছে। হাওয়া ;—ক্রমশই জোর হাওয়া ! আকাশের পশ্চিমকোণে ঘন ঘন চপলার হাসি ; চপলার হাসি আমি অনেকবার দেখেছি, কিন্তু সে দিনের হাসি যেন কেমন একপ্রকার অভূতপূর্ব, অভাবনীয়পূর্ব, অননুভূতপূর্ব্ব বিকট ভয় দেখাচ্ছে ! একবার গুড়গুড়শব্দে মেঘ ডেকে উঠলো। সেই অসাময়িক জলদ-গর্জ্জনও কেমন এক একার ভয়প্রদ ! অল্প অল্প বৃষ্টি এলো। তখন আর আমি সদরদরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে পাল্লেম না, দেউড়ী পার হয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেম।

উপরে উঠি উঠি মনে কোচ্ছি, সিঁড়ির দিকেই মুখ রয়েছে, হঠাৎ পশ্চাদ্দিক থেকে কে একজন এসে আমার একখানা হাত ধোরে ফেল্লে। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, সেই বিকটাকার রক্তদন্ত ! বিকটমূর্ত্তি দেখেই আমার হৃৎকম্প ! জোর কোরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়েই ছুট ! এক ছুটে গুম গুম শব্দে উপরে উঠে, চীৎকার কোরে কেঁদে জামাইবাবুর দুই পায়ে জড়িয়ে ধোল্লেম ; কুঁজোটাও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সটান ছুটে এসে বৈঠকখানার চৌকাঠের উপর দাঁড়ালো। আমি কেঁদে কেঁদে জামাইবাবুকে বোলতে লাগলেম, রক্ষা করুন। রাক্ষস ! রাক্ষস ! আমাকে ধোরেছিল ! ঐ এসেছে ! ঐ এসেছে ! রক্ষা করুন !"

বাবুর পাশের লোকগুলো যেন কি একটা অপরূপ রঙ্গ মনে কোরে খিলখিল শব্দে হেসে উঠলো। কতই যেন বিরক্ত হয়ে পা ছুড়ে ছুড়ে আমাকে ঠেলে ঠেলে দিয়ে, জামাইবাবু গম্ভীরগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি ?"—রাক্ষসটা সেই সময় সুযোগ বুঝে ভয়ানক ঝনঝনে আওয়াজে বোলতে আরম্ভ কোল্লে, "ঐ ছোঁড়া আমার ভাগ্নে, আমি ঐ ছোঁড়ার মামা, আমি ওটাকে নিয়ে যাবো। কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কিছুতেই বাগে আনা যায় না। একবার আমি এইখানে নিতে এসেছিলেম, এই বাড়ীর কর্ত্তা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, এবার আমি কিছুতেই ছাড়বো না।"

কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমি বোল্লেম, "না গো না, ও আমার মামা নয় ! ও আমার কেহই নয় ! ও কখনই মানুষ নয় ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন ! ওর সঙ্গে আমি কখনই যাব না ! ওটা রাক্ষস ! আমারে ধোরে নিয়ে গিয়েই খেয়ে ফেলবে ! দয়া কারে আপনি আমাকে রক্ষা করুন !"

করুণস্বরে এই সব কথা বোলতে বোলতে একবার আমি বাবুর মুখের দিকে আর একবার কুঁজোটার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে দেখলেম। বোধ হলো যেন, সেই সময় তাঁদের পরস্পর কি এক রকম চোক-টেপাটিপি হয়ে গেল। জামাইবাবু আরো বিরক্ত হয়ে উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠলেন, "আমি তার কি জানি ? কে কার মামা, কে কার ভাগ্নে, আমি তার কি জানি ? যে যা ভাল বুঝবে, সে-ই তাই কোরবে, আমি তাতে কি কোরবো ? এ ফ্যাঁসাতে আমি কেন মাথা দিব ? আমি কেমন কোরে রক্ষা কোরবো ? নানা কাজে নানা দিকে আমার মাথা ঘুরছে, তার উপর এ কি উৎপাত ! যাও,—যাও,—চোলে যাও ! যে যার মামা, সে তারে নিয়ে যাবে, আমি তাতে বাধা দিবার কে ?"

বাবু যেন তখন সেই বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা, পাশে যারা বোসেছিল, তারা যেন তাঁর মোসাহেব, তারা সকলেই বাবুর কথায় প্রতিধ্বনি কোরে বোলতে লাগলো, "তা বটেই তো তা বটেই তো! বাবু কেন কথা কবেন? কে কার মামা, কে কার ভাগ্নে, বাবু তার কি জানেন? কাজের সময় কোথাকার মামা ভাগ্নের ঝগড়া এসে উপস্থিত হলো! কোথাকার পাপ! বিষম উৎপাত!"

মোসাহেবের কলরবে ভ্রূক্ষেপ না কোরে জামাইবাবুকে আমি বিস্তর মিনতি কোল্লেম, চক্ষের জলে তাঁর পা-দুখানি ভিজালেম, কিছুতেই তাঁর দয়া হলো না! উৎসাহ পেয়ে, সাহস পেয়ে, বিকট মর্কট মুখখানা আরো বিকট কোরে, বিকট বিকট দাঁতগুলো আগাগোড়া বিকাশ কোরে, সেই বিকটাকার রাক্ষসটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এগিয়ে জাজিমের উপর এসে উঠলো। আমি ক্রমাগত কাঁদতে লাগলেম, বাবু তাতে কর্ণপাতও কোল্লেন না, মোসাহেবদের সঙ্গে আবার হেসে হেসে নূতন গল্প জুড়ে দিলেন! কুঁজোটা আমার দুখানি হাত ধোরে হিড়হিড় কোরে টেনে নিয়ে চোল্লো, দরজার বাহিরে এনে ফেল্লে টেনে হিঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে সদরদরজায় নিয়ে এলো। চীৎকার শব্দে আমি বাড়ীখানা কাঁপিয়ে তুল্লেম; বলিদানের অগ্রে ভিজে পাঁঠা যেমন কাঁপে, সেই-রকম কাঁপতে লাগলেম, দুঃখ প্রকাশ কোরে কেহই একটী কথাও কইলে না! দেউড়ীতে দরোয়ান ছিল, বাবুর কাছ থেকে একটা রাক্ষস আমাকে ধোরে এনেছে, বাবু তাতে বাধা দেন নাই, সুতরাং দরোয়ানেরাও সাহস কোরে কিছু বোলতে পাল্লে না, কিন্তু তাদের মুখের ভাব দেখে আমি বুঝলেম, তাদের যেন মনে মনে কষ্ট হোতে লাগলো।

রাস্তায় বাহির কোরে কুঁজোটা আমাকে জলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চোল্লো। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি; বৃষ্টির জলে রাস্তা প্লাবিত, সেই জলের উপর আমি গড়গড়িয়ে যাচ্ছি, এক আধ জায়গায় আধখানা শরীর ডুবে ডুবে যাচ্ছে, তখনও আমি কেবল চেঁচাচ্ছি আর হাঁপাচ্ছি। বৃষ্টির জলে আমাদের দুজনেরি অষ্টাঙ্গ অভিষিক্ত। খানিক দূরে একটা উঁচু রাস্তা। সে রাস্তায় কেবল বালী আর কাদা; জল দাঁড়ায় নাই; কাদার উপর দিয়ে লোকটা আমাকে টানছে; সর্ব্বশরীর কাদামাখা হয়ে যাচ্ছে; ইঁট-পাথরের রাস্তা হোলে কেটে ছিঁড়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতো, পথেই হয় তো প্রাণ যেতো, প্রাণ গেলেই ভাল হোতো; তত যন্ত্রণা সহ্য কোত্তে হোতো না।

কোথায় আমি চোল্লেম? রাক্ষসটা আমাকে কোথায় নিয়ে চোল্লো? হায় হায়! কারো সঙ্গে দেখা হলো না! আশালতাকে দেখতে পেলেম না! আমার কি দশা হলো, বাড়ীর পরিবারের কেহই কিছু জানতে পাল্লেন না! নিষ্ঠুর মোহনলাল হাসতে হাসতে আমাকে রাক্ষসের হাতে সমর্পণ কোরে দিলেন! আমার ভাগ্যবিধাতা আমার ভাগ্যে কত কষ্টই লিখে রেখেছেন, সেই বিধাতাই তা জানেন!

লোকটার আকর্ষণে ক্রমাগতই আমি গোড়িয়ে গোড়িয়ে চোলেছি। লোকটার শরীরে অনেক বল। মুখে বানর, দন্তে রাক্ষস, লোমে ভল্লুক, কুঁজে উষ্ট্র, হস্তপদে মনুষ্য, এই পঞ্চজীবের সমষ্টিতে এ লোকটার পঞ্চভূতের গঠন,

সমাপ্ত! বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে তার গায়ের লোমগুলো আর মাথার ঝুমরো ঝুমরো চুলগুলো গায়ের সঙ্গে লেপে গেছে, মূর্ত্তিটা আরো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে! একবার একবার আমি তার দিকে চেয়ে দেখছি, জলে শীতে সর্ব্ব-শরীর কাঁপছে, উচ্চৈঃস্বরে রোদন কোচ্ছি, রক্তদন্ত আমার রোদনে কর্ণপাত কোচ্ছে না! রাস্তায় লোক নাই। সে দুর্যোগে কে-ই বা বাহির হবে? কেহই নাই। রাস্তার ধারে ধারে তফাতে তফাতে লোকালয় আছে, সে সকল বাড়ীর লোকেরাও আমার দুর্দ্দশা দেখে রক্ষা করবার চেষ্টা কোচ্ছে না; বরং কেহ কেহ গবাক্ষ পথে দাঁড়িয়ে যেন তামাসা দেখছে, কেহ কেহ করতালি দিয়ে হাস্য কোচ্ছে! আমি চীৎকার কোচ্ছি, তাদের হাস্যকোলাহলে সে চীৎকার ডুবে ডুবে যাচ্ছে। কুঁজোটা দুই হাতে ধোরে ক্রমাগতই আমাকে টানছে; কাঁচপোকা যেমন আর্শলা টানে, সেই রকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এক জায়-গায় গিয়ে থামলো। বোধ হয় আর টানতে পাল্লে না, সেইজন্য সেইখানে এক-খানা গরুর গাড়ী ভাড়া কোল্লে। এ অঞ্চলের গরুর গাড়ীর উপর ছত্রী থাকে, রাক্ষসটা আমাকে টেনে ছত্রীওয়ালা গাড়ীর উপর তুল্লে; আপনিও আমার গা ঘেঁষে ঠেসে বোসলো। তার গায়ের দুর্গন্ধে আমার তখন বমী আসতে লাগলো।

গরুরগাড়ী চোলেছে, কাদার উপর দিয়ে হেলে হেলে চোলেছে। গতি অত্যন্ত মৃদু। আমার সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত। লোকটার আকর্ষণে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; বোসে থাকতে পাল্লেম না, গাড়ীর ভিতর খড়ের বিছানায় শুয়ে পোড়লেম।

বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় পাষণ্ড আমাকে ধোরেছিল, সমস্ত দিন গেল, সমস্ত রাত্রি গেল, উদরে একবিন্দু জলও গেল না, অত্যন্ত কাতর হোলেম।

আবার প্রভাত হলো। গাড়োয়ান দুজন। তারা আপনাদের আহারের সম্বল সঙ্গে রেখেছিল, ক্ষুধার সময় আহার কোল্লে, গাড়ী থামিয়ে নিকটের পুকুর থেকে জল খেয়ে এলো। আমার উপবাস! আমাকে জব্দ করবার জন্য রাক্ষস-টাও উপবাসী।

আকাশ পরিষ্কার। পূর্ব্বদিনের ন্যায় ঘনঘটা ছিল না, জল-ঝড় ছিল না, প্রকৃতির হাসিমুখ দেখলে ছেলেবেলা থেকে আমার আনন্দ হোতো, সেদিন আর আমার হৃদয়ে সে আনন্দের স্থান হলো না, ছত্রীর ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সূর্য্য দর্শন কোরে জগচ্ছক্ষু দেব দিবাকরকে প্রণি-পাত কোল্লেম; মনে মনে মধুসূদনের নাম স্মরণ কোরে শরীর যেন একটু শীতল বোধ হলো।

গাড়ী চোলেছে। বেলা প্রায় দুই প্রহরের কাছাকাছি। সম্মুখে একটা বাগান। রক্তদন্ত সেই বাগানের কাছে একবার নামলো আমাকেও নামতে বোল্লে, আমি নামলেম। নিকটে একটা পুষ্করণী ছিল, যথারীতি নিত্যকর্ম্ম সমাধা কোরে সেই পুষ্করণীতে আমরা স্নান কোল্লেম। সঙ্গে আর বেশী বস্ত্র ছিল না, উভকেই সিক্তবস্ত্রে থাকতে হলো। বাগানের ধারে একখানা মুদীর দোকান।

রক্তদন্ত সেই দোকানে চিঁড়ে-মুড়কি কিনে জল খেলে ; আমার সম্মুখেও কিছু ধোরে দিলে ; রক্তদন্তের বৃহৎ দন্ত, সে সকল দন্তের শক্তিও বেশী, আমি নিস্তেজ বালক, তার মত জোরে জোরে চিঁপিটক চর্ব্বণে অশক্ত, সুতরাং একমুষ্টি মুড়কি মুখে দিয়ে এক ঘটী জল খেলেম।

বেলা আড়াই প্রহর। আবার আমরা গাড়ীতে উঠলেম, গাড়োয়ানেরাও জলযোগ কোরে গাড়ী চালাতে আরম্ভ কোল্লে। শেষবেলায় একখানি গ্রামে গিয়ে পৌঁছিলেম। কি গ্রাম কোথাকার গ্রাম, বিনা জিজ্ঞাসায় আমার জানবার উপায় ছিল না, কেবল গৃহস্থলোকের বাড়ী আর দোকানপাট দেখে স্থির কোল্লেম, একখানি পল্লীগ্রাম। সেই গ্রামের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ গিয়ে একখানা একতালা বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীখানা দাঁড়ালো। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে, আমাকে হাত ধোরে নামিয়ে নিয়ে, রক্তদন্ত সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লে ; আমাকে শিখিয়ে দিলে, "বেশ শিষ্ট-শান্ত হয়ে থাকবে, কোন কথার অবাধ্য হবে না, আমাকে মামা বোলে ডাকবে, কোথা থেকে কি রকমে আমি তোমাকে এনেছি, কারো কাছে সে সকল কথা গল্প কোরবে না! সাবধান! সাবধান!"—দায়ে পোড়ে আমি সম্মত হোলেম। তদবধি রক্তদন্ত আমার মামা!

দ্বাদশ কল্প

অমরকুমারী

বাড়ীখানা অনেকদিনের পুরাতন। দেয়ালে দেয়ালে নোণা ধোরেছে, ঠাঁই ঠাঁই চূণ-বালী খোসে পোড়েছে, ছাদের মাথায় ছোট ছোট গাছ বোসেছে, এক এক জায়গায় ফাট ধোরেছে। একতালা বাড়ী বটে, কিন্তু দুমহল। সদর-মহলে একখানি ঘর, সেই ঘরের সম্মুখে একটা রক, রকের ধারে ধারে গরান-কাষ্ঠের খুঁটী, খুঁটীদের মাথায় উলুখড়ের চাল। অন্দরমহলে সারি সারি তিনখানি ঘর, সেই ঘরগুলির সম্মুখেও ছোট ছোট থাম দেওয়া দর-দালান, মাথায় খড়ের চাল নয়, বরোগা দেওয়া ঢালু ছাদ। দর-দালানের ধারে রন্ধন-গৃহ। রক্তদন্ত আমাকে সঙ্গে কোরে ঐ তিনখানি ঘরের মাঝের ঘরে নিয়ে বসালে। সেই ঘরে একটী স্ত্রীলোক একখানি মাদুরের উপর শুয়ে ছিলেন, রক্তদন্ত তাঁকে সম্বোধন কোরে বোল্লে, "এই হরিদাস এসেছে, আদর-যত্ন কোরো, নজরে নজরে রেখো, কোথাও যেন পালায় না ; ছেলেটা ভারী ছটফটে।"

স্বভাব কোথাও যায় না, কর্কশভাষীর কর্কশকণ্ঠ লুকায় না, প্রকৃতিসিদ্ধ কর্কশ আওয়াজে ঐ কথাগুলি বোলেই রক্তদন্ত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটী বিছানার উপর উঠে বোসলেন। কোমলদৃষ্টিতে অল্পক্ষণ আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে অতি কোমলস্বরে তিনি বোল্লেন, "হরিদাস! তোমারে আমি আর কখনো দেখি নাই, কর্ত্তার মুখে তোমার নাম শুনেছিলেম, তুমি এসেছ, বড় তুষ্ট হোলেম।"

কথা বোলতে বোলতে আমার কাপড়ের দিকে তাঁর নজর পোড়লো। ভিজে কাপড় দেখে তৎক্ষণাৎ একখানি শুষ্ক বস্ত্র এনে আমাকে পরিধান কোত্তে দিলেন। আমি কাপড় ছেড়ে একটু সুস্থ হয়ে বোসলেম। মনে দুর্ভাবনা অনন্ত, ম্লানবদনে চুপটী কোরে বোসে থাকলেম। স্ত্রীলোকটী তখন আবার বোল্লেন, "হরিদাস! তোমার মুখখানি এমন বিরস বিরস দেখছি কেন? পথে কি বড় কষ্ট পেয়েছ?"

রক্তদন্তের সাবধানতা স্মরণ কোরে ধীরে ধীরে মদুস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "কষ্ট এমন কিছুই নয়, দুদিন আহার হয় নাই।"

আমার উত্তরবাক্য শ্রবণ কোরেই স্ত্রীলোকটী তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে পাশের ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, একখানি রেকাবে চারিখানি বড় বড় বাতাসা আর এক গেলাস জল এনে আমাকে খেতে দিলেন; বোল্লেন, "আহা! ছেলেমানুষ, দুদিন আহার নাই, কিছু জল খাও।" আমি জল খেলেম। একবার ইচ্ছা হলো, আমার জীবনকাহিনীর কতকগুলি কথা তাঁকে আমি শুনাই, কিন্তু চেপে গেলেম। কিসে কি হবে, কি জানি কি বিপদ ঘোটবে, রক্তদন্ত যদি শুনে, যে রকম স্বভাব, হয় তো আমাকে কত লাঞ্ছনা কোরবে, তাই ভেবে সে সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ কোল্লেম না; অপর কথা উত্থাপন কোরে স্নেহ জানিয়ে স্ত্রীলোকটী আমাকে যে সব কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সংক্ষেপে সংক্ষেপে সেই সব কথারই উত্তর দিলেম। প্রথমে তিনি যেমন আমার পানে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন, আমিও সেই রকমে তাঁর সর্ব্বাবয়ব নিরীক্ষণ কোল্লেম। স্ত্রীলোকটী সুন্দরী, চক্ষু দুটী বড় বড়, কপালখানি ছোট, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকেশ, কিন্তু বর্ণটী কিছু ফিঁকে ফিঁকে। বোধ হলো যেন কোন প্রকার পীড়া আছে; শরীরে রক্তের কিছু অভাব; শরীর কাহিল, মুখখানি ম্লান; বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর।

আমাকে সেই ঘরে বোসিয়ে সেই কৃপাময়ী রমণী অন্যঘরে উঠে গেলেন; বোলে গেলেন, "এইখানে একটু থাকো। আহা! দুদিন আহার হয় নাই, আমি তোমার আহারের আয়োজনে যাই।"

তিনি গেলেন, আমি একাকী বোসে বোসে আপন অদৃষ্টের ভাবনাই ভাবতে লাগলেম। ভাবছি, এমন সময় একটী বালিকা ধীরে ধীরে সেই ঘরে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। বালিকাটীও দিব্য সুন্দরী। ফুট গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার, মুখখানি নিখুঁত সুন্দর, খগচঞ্চু নাসিকা, চক্ষু আকর্ণ বিশ্রান্ত, কপাল চৌরস, দাঁতগুলি ছোট ছোট, অধরোষ্ঠ লাল টুকটুকে, কেশ পরিপাটী, সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর কিন্তু কিছু কাহিল; বয়স অনুমান একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর। ফল কথা, আমার অপেক্ষা কিছু কম বয়স দেহের উচ্চতায় উভয়েই আমরা সমান। মেয়েটীকে দেখে দেখে আমার তখন কেমন এক প্রকার নূতন আহ্লাদ হলো; আহ্লাদের সঙ্গে কিছু কিছু সংশয়। এ মেয়েটী কে? আর সেই রমণীই বা কে?

মনের সংশয় মনে চেপে রেখে মেয়েটীকে আমি বোসতে বোল্লেম। মেয়েটী বোসলেন না, যে ভাবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত রমণী পুনর্ব্বার সেই ঘরে এসে পূর্ব্ববৎ কোমলস্বরে আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! এটা তোমার ভগিনী হয়, এটী আমারি কন্যা. এর নাম অমরকুমারী। তোমরা দুটী ভাই-ভগিনীতে এইখানে বোসে গল্প কর,. একটু পরেই আবার আমি আসছি।"

আমাকে ঐ কথা বোলে কন্যাটীকে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "অমর! এই সেই হরিদাস ; কর্ত্তার মুখে যার কথা শুনেছিলে, এই সেই হরিদাস। তোমার পিসীমার ছেলে, হরিদাসের কাছে লজ্জা কোত্তে নাই ; ভাই হয়, ভাইকে দেখে কেহ কি লজ্জা করে বোসো ; বোসে দুজনে কথাবার্ত্তা কও, লেখাপড়ার পরিচয় দাও, লজ্জা কি ? আমি শুনেছি, হরিদাস বেশ লেখাপড়া জানে, হরিদাসের কাছে তোমার অনেক শিক্ষা হবে ; দুটীতে বেশ আমোদে থাকবে ; বোসো।"

অমরকুমারী বোসলেন, কুমারীর জননী অন্য কার্য্যে চোলে গেলেন। অমরকুমারীর সঙ্গে আমি কথা কইতে আরম্ভ কোল্লেম। আমার মুখে অনেক কথা, অমরের মুখে দুটী একটী মাত্র। অমরকুমারী লেখাপড়া করেন, আমি দুটী একটী লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, অমরকুমারী সুন্দর মুখখানি একটু নীচু কোরে মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেন। অতি মধুর মৃদু হাস্য। বর্দ্ধমানে আশালতাকে দেখেছি, আশালতাও সুন্দরী, এই অমরকুমারীও সুন্দরী। আশালতার মুখে মৃদু হাস্য দেখেছি, সেই হাস্য যেমন সুমধুর, অমরকুমারীর হাস্যও তদ্রূপ সুমধুর। আহা! অভাগিনী আশালতা! অকালে অকস্মাৎ পিতৃহীনা! বিবাহের সূচনায় নিদারুণ বিঘ্ন! আহা! এ জন্মে হয় তো আশালতাকে আর আমি দেখতে পাব না!

দুঃখের কথা যতই ভাবি, ততই বাড়ে! অদৃষ্ট আমার! যতটা ভুলে থাকা যায়, ততই মঙ্গল। যেখানে এখন এসেছি, সেইখানকার কথাই বলি। লেখাপড়ার কথায় অমরকুমারী হাসলেন কেন ?—কারণ আছে। আজকাল আমাদের দেশে আমাদের বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার যে প্রকার রীতি আরম্ভ হয়েছে, তখন এপ্রকার ইংরাজীধরণের বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। অমরকুমারী কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই ; এখনকার বালিকা-বিদ্যালয়সমূহে যে সকল পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত, তখন সে সকল পুস্তকের জন্মও হয় নাই। অমরকুমারী আপন জননীর নিকটে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করেন, অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করেন, বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের শ্লোকগুলি মুখস্থ করেন, এই রকম শিক্ষা। চন্দ্র কত বড়, পৃথিবী কত বড়, পৃথিবী থেকে সূর্য্য কত দূর, নবাব সিরাজোদ্দৌলা কেমন লোক, এই ভাবের গোটাকতক প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, সেই জন্যই অমরকুমারী হেসেছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহজ সহজ কথায় অমরকুমারী বেশ নীতিশিক্ষার পরিচয় দিলেন, সেই সঙ্গে মুখখানি একটু কাচুমাচু কোরে বোল্লেন, "শিক্ষার আমি সময় পাই না ; মেয়েমানুষের লেখাপড়ার উপর বাবা বড় চটা। বাবা যখন ঘরে না থাকেন, সেই সময় গোপনে একটু একটু পড়াশুনা করি ; তিনি দেখতে পেলে কিম্বা

জানতে পাল্লে আমাকে শুদ্ধ, মাকে শুদ্ধ মেরে গুঁড়ো কোরে দিবেন, পুঁথি-গুলি পর্য্যন্ত আগুন জেবলে পুড়িয়ে দিবেন ; এত বড় রাগ!"

মনে আমার বিস্ময়ের উদয় হলো। সবিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার বাবা কোথায় থাকেন?"—যেন চোমকে উঠে মৃদুস্বরে কুমারী বোল্লেন, "এ কি গো! কেমন কথা জিজ্ঞাসা কর? যিনি তোমারে নিয়ে এলেন, যাঁর বাড়ীতে তুমি এসেছ, তিনিই আমার বাবা। তা কি তুমি জান না? তিনি বলেন, তোমার মামা তিনি ; মামাকে তুমি জানো না?"

বিস্ময়ভাব গোপন কোরে অম্লানবদনে আমি বোল্লেম, "না, তা আমি কেমন কোরে জানবো? তিনি তোমার বাবা, সে পরিচয় আমি কার কাছে পাবো? এ সব কথা তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই।

কুমারীকে এই কথা বোল্লেম বটে, কিন্তু মনটা বিষম চঞ্চল হলো ; সর্ব্ব-শরীর শিউরে উঠলো ; প্রাণে কেমন ব্যথা লাগলো। কি ভয়ানক কথা! সেই রুগ্নশরীরা সুন্দরী কি না রক্তদন্তের পত্নী! এই কুসুমকোমলা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী অমরকুমারী কি না রক্তদন্তের কন্যা! কি সর্ব্বনাশ! বিধাতার এ কি অদ্ভুত সংঘটন! রাক্ষসের গৃহে সুরসুন্দরী! রাক্ষসের সঙ্গে সুরসুন্দরীর বিবাহ! প্রজাপতির এ কি অদ্ভুত নির্ব্বন্ধ! অমরকুমারী যেন যথার্থই অমর-কুমারী! এই দেবকন্যার পিতা কি সেই রাক্ষস রক্তদন্ত?

মনে অনেক প্রকার তোলপাড় কোল্লেম, ক্রমশই সংশয় বিস্ময় বেড়ে উঠতে লাগলো। কথাটা চাপা দিয়ে অমরকুমারীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় আমি এসেছি? এটা কোন স্থান? এ গ্রামের নাম কি?"

অমরকুমারী বোল্লেন, "গ্রামের নাম নন্দীগ্রাম, বীরভূম জেলা, অতি নিকটেই সিউড়ি সহর। এ জেলার নাম তুমি কি কখনো শুন নাই? এত দিন তুমি কোথায় ছিলে?

এই আবার সেই বিভ্রাট! এ প্রশ্নের কি উত্তর দিই? এত দিন আমি কোথায় ছিলেম, সে কথা বোলতে গেলেই গোড়ার কথা এসে পড়ে। সে সব কথা প্রকাশ করা রক্তদন্তের বারণ। রক্তদন্তের বারণ না থাকলেও এই সুশীলা কুমারীর কাছে সে সব কথা আমি বোলতে পাত্তেম না ; সে ভাবের কোন কথাই বোল্লেম না ; ভাবলেম কেবল বলি কি? যদি বলি বর্দ্ধমানে ছিলেম, সে কথাতে সঙ্গতি রাখা যাবে না। কেন না, বর্দ্ধমানের নিকটেই বীরভূম। যারা বর্দ্ধমানে থাকে, তারা বীরভূমের নাম জানে না, এ কথা হাস্যকর ; অমর-কুমারীর বয়স অল্প, তথাপি এই হাস্যকর কথায় অমরকুমারীরও বিশ্বাস হবে না। তবে বলি কি?—অনেক ভেবে চিন্তে শেষকালে বোল্লেম, যেখানে যখন থাকা আবশ্যক হয়েছিল, সেইখানেই তখন ছিলেম ; বীরভূমে কখনো আসি নাই ; নূতন জায়গায় এলেই স্থানের নামটা জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়, সেই জন্যই জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম। আচ্ছা অমর, তোমার জননীকে ওরকম কাহিল কাহিল শুষ্ক শুষ্ক বিবর্ণা দেখায় কেন? রূপের সঙ্গে লাবণ্য ছিল, চেহারা দেখে সেটী বেশ বুঝা যায়, বাঙ্গালী সুন্দরী-সমাজে তিনি গণনীয়া, ওরকম

সুন্দরী আমি কম দেখেছি, এ কথাও বেশ বলা যায়, তবে তাঁর দেহখানি কেন ও রকম পাণ্ডুবর্ণ ?"

কুমারী উত্তর কোল্লেন, "আগে ও রকম ছিল না, আজ প্রায় দু-বছর হবে, পেটের ভিতর কি একটা রোগ হয়েছে, তাতেই মা আমার দিন দিন কাহিল হয়ে যাচ্চেন, গায়ের রক্ত জল হয়ে যাচ্চে, সেই জন্যই রংটা অমন ফ্যাঁসাটে দেখাচ্চে। আহা ! মায়ের আমার কি চমৎকার বর্ণই ছিল ! ঠিক যেন মা ভগবতীর বর্ণ !"

পূর্ব্বেই আমি অনুমান কোরেছিলেম, কোন প্রকার পীড়া আছে, কুমারীর মুখে শুনে জানতে পাল্লেম, সত্যই তাই। একটু চিন্তা কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, চিকিৎসা করান হয় না ? কি রোগ ? কবিরাজেরা কিছু বলেন না ?"

চঞ্চলনয়নে ঘরের বাহিরের দিকে চেয়ে কুমারী উত্তর কোল্লেন, "কবিরাজ কোথায় পাবো ? চিকিৎসা করাবে কে ? বাবা ও সকল দিকে আসলেই মন দেন না। একটী কথা বোলতে গেলেই রেগে উঠেন। কথায় কথায় রাগ ! কেবল রাগ ! মা আমার ঐ রোগা শরীরে সংসারের সব কাজ করেন, আমারে কিছুই কোত্তে দেন না, তবু আমি যতদূর পারি, সাহায্য করি ; তাতেও তিনি বারণ করেন ; হাজার কষ্ট হোলেও উঠে হেঁটে বেড়ান, কাজকর্ম্ম করেন, সাধ্যমতো বাবার সেবা করেন, একটু ত্রুটি হোলেই বাবা বেজার হন, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গালাগালি দেন, মারতে আসেন। এক একদিন ঐ রোগা মানুষকে মেরেও বসেন ! মেরে মেরে আধমারা করেন ! তিনি আবার চিকিৎসা করাবেন ? ও হরি ! আমাদের কপাল যেমন !"

সজললোচনে চুপি চুপি ঐ কটী কথা বোলে কুমারী যেন কতই ভয়ে ঘন ঘন বাহিরের দিকে চাইতে লাগলেন। পাছে সেই নৃশংস রাক্ষসটা হঠাৎ এসে পড়ে, সেই ভয়। ভাবটা বুঝতে পেরেও কাতরে মৃদুস্বরে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার বাবার যদি অতই রাগ, অতই অযত্ন, তবে ঘর-সংসার চলে কিরূপে ?"

চক্ষের জল মার্জ্জন কোরে, পুনর্ব্বার বাহিরের দিকে চেয়ে চেয়ে, দীর্ঘ একটী নিশ্বাস ফেলে, ভয়াকুলা সুশীলা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বোল্লেন, "আর আমাদের ঘরসংসার। সংসারে আমাদের ভারী কষ্ট ! এক বিন্দুও সুখ নাই ! বাবা আমার খামখেয়ালী ! যেমন রাগী, তেমনি অস্থির ! রাগের কথা কি আর বোলবো, শুনলে তুমিও মনে কষ্ট পাবে। আমার একটী দিদি ছিল, আমার চেয়ে দু-বছরের বড়। বাবা যখন আমার উপর রাগ করেন, বিনা দোষে আমাকে ধোরে ধোরে মারেন, আমি তখন মুখটী বুজে চুপটী কোরে থাকি, কাঁদতেও পারি না ; কাঁদলে পর আরো মারেন ! দিদি সে সব দৌরাত্ম্য সইতে পাত্তো না, মুখের উপর চোটপাট জবাব কোত্তো। একদিন বাবা তাকে সপাসপ ঝ্যাঁটার বাড়ি মারেন, বিনা দোষে ঝ্যাঁটা ; বুক বেয়ে, পিঠ বেয়ে রক্ত পড়ে, ঠাঁই ঠাঁই ঝ্যাঁটার কাঠী ফুটে থাকে ; জ্বালায় ছটফট কোত্তে কোত্তে দিদি সেই দিন আমার একটা খেলানাপুতুল ছুড়ে মেরেছিলো, গায়ে লাগে নাই, তবুও রক্ষে থাকলো না ; বাবা একেবারে রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে, দিদির গলা

টিপে ধোরে, মাটীতে ফেলে, দুমদুম কোরে লাথি মাত্তে লাগলেন। মা ছুটে গিয়ে বাবার একখানা হাত ধোল্লেন, আমিও কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়ে দিদির গায়ের উপর শুয়ে পোড়লেম। আমাদেরও নিস্তার থাকলো না! মায়ের তখন পীড়া হয় নাই, শরীরে বল ছিল, বাবাকে ধোরে টানাটানি কোল্লেন, তবুও পেরে উঠলেন না; পুরুষের জোরে পারবেন কেন? জোর কোরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে, মাকে দুই লাথ মেরে পাঁচ হাত তফাতে ঠেলে দিলেন; আমাকেও এক লাথি মেরে তফাৎ কোরে দিয়ে দিদিকে আবার ধোল্লেন, গুম-গুম কোরে কীল মাত্তে মাত্তে হাত ধোরে টেনে টেনে দাঁড় করালেন; দিদির নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত পোড়তে লাগলো! তবুও ক্ষান্ত নাই! শেষকালে একখানা ন্যাকড়া পোড়িয়ে গলা-ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন! বাড়ীর কাছেও থাকতে দিলেন না, ধাক্কা দিতে দিতে কত দূর নিয়ে নদী-পারে ফেলে দিয়ে এলেন! সেই অবধি আমার দিদির আর উদ্দেশ নাই! আছে কি মোরে গেছে, তাও আমরা জানি না!"

থেমে থেমে নিশ্বাস ফেলে ফেলে এই দুঃখের কথাগুলি বোলে, অমর-কুমারী দুই হস্তে চক্ষু ঢেকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। হৃদয়ে বেদনা পেয়ে অনেক প্রবোধবাক্যে আমি তাঁকে সান্ত্বনা কোত্তে লাগলেম। রাত্রি প্রায় এগারটা। জননী মেয়েটীকে ডাকলেন, সাবধানে রোদন সংবরণ কোরে, জননীর সঙ্গে স্নেহময়ী কন্যাটী রন্ধনগৃহে গেলেন। একমু পরেই আহারের আয়োজন হলো, আমি আহার কোল্লেম। আহার হলো রুটী, নিরামিষ তর-কারী আর দুগ্ধ-সন্দেশ। বীরভূমজেলায় ময়রার দোকানের চিঁড়ে-মুড়ী ছাড়া সমস্ত খাবার জিনিসকেই সন্দেশ বলে। মুড়কীও সন্দেশ, পাটালীও সন্দেশ, বাতাসাও সন্দেশ, গুড়ও সন্দেশ। লোকবিশেষের নিকটে কচুরিজিলাপীও সন্দেশ নামে বাচ্য। রুটীর সঙ্গে আমি দুধ-সন্দেশ খেলেম, এই কথা বোলেছি, এখানে সন্দেশ মানে গুড়।

রক্তদন্ত তখনও ফেরে নাই। কন্যার মুখে শুনলেম, লোকটা খামখেয়ালী। যখন ইচ্ছা হয়, তখন আসে, কোন কোন দিন আসেও না। আমি আহার কোল্লেম, অমরকুমারী খেলেন না, গৃহিণীও খেলেন না; কর্ত্তার অপেক্ষায় দুজনেই বোসে থাকলেন। তিনটী ঘরের একটী ঘরে আমার শয়নের স্থান হলো। রক্তদন্তের মুখের সম্পর্কে অমরের জননী আমার মামী;—রক্তদন্তকে মামা বোলতে আমার মনে বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হয়, অমরের জননীকে মামী বোলতে আহ্লাদ জন্মে।

মামী আমাকে শয়ন কোত্তে বোল্লেন। পথে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেম, শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, সুতরাং তাদের আহারের অগ্রেই আমি শয়ন কোল্লেম।

ক্লান্তশরীরে শয়নমাত্রেই নিদ্রা হয়, সে রাত্রে আমার তা হলো না। মনে মনে অনেকক্ষণ অমরকুমারীর কথাগুলি আলোচনা কোত্তে লাগলেম। কবিরা বলেন, আকারের সঙ্গে চরিত্রচর্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কথা ঠিক। রক্তদন্তের আকার যেমন ভয়ঙ্কর, স্বভাবও ঠিক তাহার অনুরূপ। পরিবারের প্রতি সেই লোকের যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার, সত্য সত্য নরখাদক রাক্ষসদেরও সেরূপ

ব্যবহার হয় না! সামান্য অপরাধে বড়মেয়েটীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, দেশছাড়া কোরে দিয়েছে, আছে কি নাই, সংবাদ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত! বড়ই ভয়ঙ্কর!—ভয়ঙ্কর রাক্ষস অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর! এই লোক যে অবাধে মানুষ-গরু হত্যা কোত্তে পারে না, কাঁচা কাঁচা মানুষ-গরু ধোরে ধোরে খেতে পারে না, কিছুতেই তো আমার মনে এমন ধারণা আসে না; এমন ধারণা এলোও না।

এই সব আলোচনা কোত্তে কোত্তে নিদ্রা এলো, আমি অকাতরে ঘুমালেম। প্রভাতে জাগরিত হয়ে দরজা খুলতে যাই, খোলা যায় না;—দরজা বন্ধ; বাহিরদিকে বন্ধ; বোধ হলো, চাবী দেওয়া। বেলা যখন আটটা কি নটা, সেই সময় কটকট শব্দে চাবী খুলে কে যেন একটু বাহিরদিকে পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালো। বেরিয়েই দেখি, রক্তদন্ত।

রক্তদন্তের মুখখানা তখন রক্তবর্ণ, চক্ষু-দুটোও রক্তবর্ণ। মুখের গন্ধে নিকটে দাঁড়াতে পাল্লেম না, একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ালেম। কিসের দুর্গন্ধ?—তফাৎ থেকেও সেই দুর্গন্ধটা আমার নাকে আসতে লাগলো, বোধ হলো, মদ খেয়েছে। লোকের মুখে শুনেছি, পচা গন্ধ অপেক্ষা মদের গন্ধের ঝাঁজ বেশী। রক্তদন্তটা নিশ্চয়ই মদ খেয়েছে।

আপন মনে এইরূপ অবধারণ কোচ্ছি, কর্কশকণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে রক্তদন্ত জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি রে ছোকরা! বাবুর বাড়ীতে তুই যে বড় বোলেছিলি, আমি তোর মামা নই! এখন কেমন? মামার বাড়ীতে তোর আদর-যত্ন কেমন? খাসা রুটী, খাসা দুধ, খাসা সন্দেশ, খাসা বিছানা, জন্মে কখন কি এত সুখের মুখ দেখতে পেয়েছিস? মনে রাখিস, মামা না হোলে এত সুখে রাখতে কেহই পারে না! কেমন, এখন আমাকে মামা বোলতে—"

অমরকুমারী ব্যস্তভাবে এসে তাড়াতাড়ি বোল্লেন, "বাবা! সদরে কে একজন লোক এসেছে, তোমাকে ডাকছে।"

রাক্ষস শেষকালে আমাকে যে কথা বোলছিল, তা আর বলা হলো না, রক্তচক্ষে আমার দিকে চাইতে চাইতে সদরবাড়ীতে চোলে গেল। একটু পরে কুমারীর মুখে শুনলেম, নূতনলোকের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। একটা ঝড়ের মুখ থেকে আমি যেন পরিত্রাণ পেলেম।

প্রভাতের নিয়মিত কার্য্য সমাধা কোরে নিকটের এক সরোবরে আমি স্নান কোল্লেম, কেহই আমার সঙ্গে থাকলো না। সেই সময়ে একবার মনে হয়েছিল, এই বেলা ছুটে পালাই, কিন্তু সেই সংসারের মাতা পুত্রীর সদব্যবহার স্মরণ কোরে সে ইচ্ছাটা পরিত্যাগ কোল্লেম। তাঁরা আমাকে কখন দেখেন নাই, এক রাত্রির মধ্যে ততটা দয়া জানালেন, ততটা ভালবাসলেন, তাঁদের প্রতি আমার স্নেহ-ভক্তির সঞ্চার হলো।

স্নান কোরে বাড়ীর ভিতর আমি ফিরে গেলেম, কাপড় ছাড়লেম, সন্দেশ-নামক ফেনীবাতাসা জল খেলেম, রাত্রে যে ঘরে শয়ন কোরেছিলেম, সেই ঘরে গিয়ে বোসলেম, অমরকুমারী তখন গৃহকার্য্যে জননীর সাহায্যে ব্যস্ত ছিলেন, আমার কাছে বসবার অবসর পেলেন না। নিরবলম্বনে একাকী বোসে বোসে

আমি কি করি? পাঠশালা থেকে দূরীভূত হবার পর অবকাশকালে নিত্য নিত্য যা আমি কোরে থাকি তাই করি ;—ভাবি।—ভাবনা আমার নিত্য-সহচরা। নির্জ্জনে ভাবনা ভিন্ন আর কিছুই আমার সঙ্গে থাকে না। আজ এখন একটা নূতন ভাবনা। আহারের ব্যবস্থা কিরূপ হয়? আমার জাতি আমি জানি না, সে কথা সত্য, কিন্তু তা বোলে যার তার অন্ন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হয় না। ব্রাহ্মণের অন্নে বাধা নাই, কিন্তু এটা ব্রাহ্মণের বাড়ী নয়, কি জাতির বাড়ী, সেটাও আমার জানা হয় নাই। আমি কি জাতি, রক্তদন্ত হয় তো জানে না। জানলে মামা বোলে আমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে যাবে কেন? আচ্ছা তাই যদি ঠিক হয়, আমি যে জাতি, রক্তদন্ত সেই জাতি, তাই যদি ঠিক হয়, তা হোলেই বা রক্তদন্তের অন্নভক্ষণে আমার রুচি হবে কিরূপে? একটী কথা আছে। রক্তদন্তের স্ত্রী-কন্যার যে প্রকার রূপলাবণ্য, যে প্রকার মুখশ্রী, তাতে কোরে রক্তদন্তের পত্নীকে ইতরজাতীয়া বোলে কিছুতেই প্রত্যয় হয় না ; ব্যবহারেও এই রমণীটী রমণী-রত্ন ; ইতরজাতি হোলে এ রকম হতো না। পরিচয়টা মিথ্যা হোলেই ভাল হয় ;—এ রমণী রক্তদন্তের স্ত্রী, মিথ্যা হোলেই ভাল হয়। রক্তদন্তের উপর আমার ঘৃণা, রক্তদন্তকে দেখলেই আমার ভয় হয়, অমরকুমারীকে দেখলে, অমরকুমারীর জননীকে দেখলে উল্লাসে যেন হৃদয় নৃত্য করে ; অমরের জননীর হস্তে পাক করা অন্নভক্ষণে কোন দোষ হবে না, কাজে কাজে অনেক ভাবনার পর শেষে এই সিদ্ধান্তটা দাঁড়ালো। না দাঁড়ালেই বা কি হতো? পশ্চিমের হিন্দুস্থানী লোকের মতন দু-বেলা রুটী খাওয়া বঙ্গদেশের পদ্ধতি নয়, তোমাদের ভাত আমি খাব না, এ কথা বলাও ভাল নয়, সুতরাং সেই সিদ্ধান্তের উপদেশেই আমি কাজ কোল্লেম ; বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে স্নেহময়ী মাতুলানীর হস্তে পাক করা অন্নব্যঞ্জন পরিতোষ-রূপে ভোজন কোল্লেম।

রক্তদন্ত এলো না ; বেলা আড়াই প্রহর অতীত হয়ে গেল, তিন প্রহর হোতে যায়, এখনো এলো না। তবে আর আসবে না, স্থির কোরে, নিতান্ত শেষবেলায় মাতাপুত্রী উভয়ে আহার কোল্লেন।

একটু পরেই সন্ধ্যা হলো। সন্ধ্যাকালের কাজকর্ম্ম সমাপন কোরে অমর-কুমারী আমার কাছে এসে বোসলেন। প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সমস্ত দিন গেল, তোমার বাবা তো এলেন না, আহারও কোল্লেন না, কি কাজে তিনি ব্যস্ত আছেন?"

কুমারী বোল্লেন, "তাঁর স্বভাবই ঐ রকম। কাজকর্ম্ম থাক না, থাক, বাইরে বাইরে দিন কাটাতেই তিনি ভালবাসেন ; মাঝে মাঝে একেবারে ডুব মারেন। কখনো পাঁচ দিন অন্তর, দশ দিন অন্তর, বিশ দিন অন্তর, কখনো বা মাসান্তরে দেখা দেন। এবারে হয় তো সে রকম কোরবেন না। তোমারে এনেছেন, তুমি নূতন এসেছ, তোমার খবরদারী লওয়া দরকার ; কি প্রকার ব্যবস্থা করা হবে, দিনে দিনে তিনি সেটা স্থির কোরবেন বোলেছেন, এখন আর বাইরে বাইরে রাত কাটাবেন না। কাল অনেক রাত্রে এসেছিলেন ; বেশী রাত্রে বাড়ীতে এলে তিনি বিষম গণ্ডগোল করেন, মিছামিছি চীৎকার শব্দে

বাড়ী ফাটান ; চিরদিন ঐ রকম অভ্যাস। কাল রাত্রে সেই রকম চীৎকারে তিনি যখন গোলমাল করেন, সেই গোলমালে আমি তখন জেগে উঠি। মা ঘুমুচ্ছিলেন, ঘরের ভিতর এসেই বাবা তাঁকে এক ধাক্কা মেরে জিজ্ঞাসা করেন, হরিদাস কোন ঘরে? যে ঘরে তুমি শুয়েছিলে, মা সেই ঘরটী দেখিয়ে দিলেন, বাবা তাড়াতাড়ি একটা চাবীতালা খুঁজে নিয়ে ঘরের দরজার চাবী দিলেন ; চাবীটা আমাদের কাছে রাখলেন না, নিজেই রাখলেন। রাত্রি তখন বেশী ছিল না, বাবা কিছুই আহার কোল্লেন না, আমরাও উপবাস কোরে থাকলেম। কেন যে তিনি তোমার ঘরে চাবী দিয়েছিলেন, আমরা তার ভাব বুঝতে পাল্লেম না। আজও হয় তো সেই রকম কোরবেন। সমস্ত দিন তো এলেন না, আজো হয় তো অনেক রাত্রে আসবেন।"

অমরের জননী অন্যঘরে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃতা। বন্ধনাদি কার্য্য ছাড়া তাকে অনেক কাজ কোত্তে হয়। কাপড় ছিঁড়ে গেলে, বিছানা-বালিশ ছিঁড়ে গেলে, স্বহস্তে সেলাই কোত্তে হয়, নিকটের বাগান থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনতে হয়, মাঠের গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিতে হয়, সাজিমাটী দিয়ে ময়লাকাপড় কেচে নিতে হয়, আরো কত কি রকমারী কাজ, একে একে অমরকুমারী অনেক পরিচয় দিলেন। সকল কাজ রাত্রে হয় না, রাত্রে তিনি একখানি ছেঁড়া, কাপড় সেলাই কোত্তে বোসেছিলেন, অমরকুমারীও বোসেছিলেন। অমরকুমারীও সেলাই জানেন, কিন্তু আমি একাকী থাকবো, সেটা ভাল দেখায় না, সেই জন্য আমার কাছেই তারে বোসতে হয়েছিল। আমরা দুজনে নির্জ্জনে ঘরে বোসে গল্প কোচ্ছিলেম। কথা কইতে কইতে বার বার আমার মুখের দিকে চেয়ে বুদ্ধিমতী বালিকা হঠাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! তুমি যেন সর্ব্বক্ষণ অন্যমনস্ক, সদাই যেন বিমর্ষ, এসে অবধি একবারও তুমি ভাল কোরে হেসে কথা কইলে না, একবারও আমি তোমাকে প্রফুল্ল দেখলেম না, মনের ভিতর কি যেন দুর্ভাবনা আছে এই রকম বোধ হয়। আমার মনে হয়, কি যেন তুমি ভাবো। রাতদিন এত কি তুমি ভাবো?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "ভাবনা আমার অনেক। আমার ভাবনার পার নাই, পথ নাই, সীমা নাই। কত কি যে ভাবি, মুখে আমি তা বোলতে পারি না। তোমার বাবা আমাকে আমার দুঃখের কথা তোমাদের কাছে বোলতে বারণ কোরেছেন, কি কারণে বারণ, তা আমি জানি না, সে সব কথা আমি বোলতে পারবো না। যেটা আমার এখন বেশী ভাবনা, সেটা কেবল মনের উদ্বেগ ; বিষম একটা সন্দেহ। তোমারে দেখা অবধি আমি একটু ভাল আছি, তুমি আমারে বিশ্বাস কোরেছ, আমিও তোমারে বিরক্তি কোরেছি ; তোমার কাছে যদি বলি, কারো কাছে প্রকাশ হবে না, সেটাও আমি বুঝতে পাচ্ছি। তুমি যখন জিজ্ঞাসা কোল্লে, তখন আর গোপন রাখতে পারি না ; আপনার লোকের কাছে মনের বেদনা প্রকাশ কোল্লে হৃদয়ের ভার অনেকটা লাঘব হয়, এটা সাধু-বাক্য ; সাবধান, যা তোমাকে আমি বোলবো, কারো কাছে গল্প কোরো না, মায়ের কাছেও না। বর্দ্ধমানে এক বাবুর বাড়ীতে আমি ছিলেম, বাবু আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন, ভবিষ্যতে আমার ভাল কোরবেন অঙ্গীকার কোরেছিলেন, বাড়ীর

মেয়েদের কাছেও আমার আদর ছিল। হঠাৎ একরাত্রে সেই দয়াময় বাবুটীকে কোন দুষ্টলোকে খোঁজ কোরে গেছে! বাড়ীতে ডাকাত পোড়েছিল, এই কথা প্রকাশ, পুলিশের তদারকে কিন্তু কোন বিষয়ের কিছুই কিনারা হলো না। ডাকাতে কেটে গেছে, ডাকাতের সন্ধান করা হলো, পুলিশের রিপোর্টে এই পর্য্যন্ত কথা। ডাকাত পোড়েছিল, জিনিসপত্র লয় নাই, কেবল কর্ত্তাকেই খুন কোরেছে, এটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! পুলিশের তদন্ত, পুলিশের অনুসন্ধান, এই দুটী বাক্য অথবা এই দুটী কার্য্য অনেক জায়গায় ছেলে ভুলানো প্রবোধের মধ্যেই দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম দিনকতক একটু হৈ চৈ পড়ে, তার পর প্রায়ই চাপা পোড়ে যায়। আহা বাবুটীকে কোন দুরাত্মা খুন কোরে গেল, কেনই বা খুন কোল্লে, তাই আমি সর্ব্বক্ষণ ভাবি, সেই বাড়ীতে থেকে আমি বেশ জানতে পেরেছিলেম, বাবুর কেহ শত্রু ছিল না, বাবুর স্বভাব অমায়িক ছিল, সকল লোকের উপকারে তিনি অগ্রে দাঁড়াতেন, মিষ্ট সম্ভাষণে সদয় ব্যবহারে সকলকেই তিনি তুষ্ট রাখতেন। আহা! তেমন সদাশয় মহৎলোকের ভাগ্যে এমন বিপরীত ঘটনা কেন হলো!

রাত্রি অনুমান আটটা। ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল, সজোরে ঝনঝন শব্দে দরজাটা খুলে ফেলে একটা লোক সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরেই দুই হাতে আমার গলা টিপে ধোল্লে! ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আমি চেয়ে দেখলেম, সেই দুরন্ত দুরাচার রক্তদন্ত! ভীষণগর্জ্জনে সে আমাকে বিস্তর গালাগালি দিয়ে, ধোমকে ধোমকে বোল্লে, "পাজি! শুয়ার! কুক্কুর! ইঁদুর! ছুঁচো! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর! পরের বাড়ীর খুন-ডাকাতীর কথা নিয়ে ঘরের ভিতর তোলাপাড়া! কাঁচ-মেয়ের কাছে খুন-ডাকাতীর গল্প? আমি তোকে বারণ কোরেছিলেম, সে কথা ভুলে গেছিস? আচ্ছা, থাক তুই, হাতে হাতে প্রতিফল পাবি!"

আমাকে ঐ রকমে গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে, শেষকালে মেয়েটীর উপরে হুহুঙ্কার! "ও সব কথা তুই কেন শুনতে আসিস? তুই কেন ওর কাছে বোসে থাকিস? এক লাথিতে তোকে আমি যমের বাড়ী পাঠাবো! একটাকে বিদায় কোরেছি, তোকেও সেই পথে বিদায় কোরবো! আয় আয় বেটী আয়, এ ঘর থেকে বেরিয়ে আয় আজ তোকে আমি আর আস্ত রাখবো না, গুঁড়ো কোরে ফেলবো!"

এইরূপ গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে মেয়েটীকে টেনে নিয়ে সেই রাক্ষসটা তখন ঘর থেকে বেরুলো, ঘরের দরজার শিকল টেনে দিলে, ঘরের ভিতর আমি একাকী কয়েদ থাকলেম। রক্তদন্ত গুমগুম শব্দে ভূতলে পদাঘাত কোত্তে কোত্তে কতরকম চীৎকার কোল্লে, ঘরের হাঁড়ি-কলসী ঘটী-বাটী ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগলো, তার পর আমার ঘরের দ্বারে চাবী বন্ধ কোরে বোকতে বোকতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ীখানা যেন একটু জুড়ুলো।

ঠিক আমি কয়েদী। মনে আবার নূতন ভয়ের আবির্ভাব। সর্ব্বশরীরে নূতন কম্প। অমরকুমারীর সঙ্গে এক ঘরে আমি বোসেছিলেম, অমরকুমারীকে যে সব কথা বোলেছিলেম, রাক্ষসটা হয় তো আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সব

কথা শুনেছিল, তা না হলে, অত রাগ কেন হবে? বর্দ্ধমানের বাবুর বাড়ীর ডাকাতীর কথায় এ লোকটারই বা সে রকম অগ্নিমূর্ত্তি কেন হলো? এর ভিতরেও বোধ হয়, কোন ভয়ঙ্কর গুপ্তব্যাপার আছে! যা-ই হোক, আমার নিজের এখন উপায় কি?

উপায় তো কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। লোকটা আমাকে কয়েদ কোরে রেখে গেল, রাত্রিমধ্যে আর ফিরে আসবে কি না, সে-ই জানে। যদি আসে, এসেই হয় তো আমাকে কেটে ফেলবে! শাসিয়ে গেল, হাতে হাতে প্রতিফল! আমার আর প্রতিফলের বাকী কি? এই বয়সে, অল্প দিনে কত বিপদের মুখে পতিত হয়েছি, কত কষ্টই সহ্য কোরেছি, আমি জানি, আর যিনি সেই সর্ব্বসাক্ষী ভগবান, তিনিই জানেন। হাতে হাতে প্রতিফল!—এটাই বা কি কথা? প্রতিফল কিসের?—কুকার্য্য কোল্লে তো পাপীলোকে প্রতিফল পায়; আমি জন্মাবধি জ্ঞানগোচরে কোন কুকার্য্য করি নাই, যে কার্য্যে পাপ হয়, সে কার্য্য কখনো আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই, তবে আমি প্রতিফল কেন পাব? নিরাশ্রয় নিঃসহায় আমি, দয়াময় ভগবান আমাকে রক্ষা কোরবেন, সেই ভরসায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে করযোড়ে আমি সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম উদ্দেশে শত শত প্রণিপাত কোল্লেম।

রাত্রে আর রক্তদন্ত ফিরে এলো না। তার স্ত্রী-কন্যা উপবাসিনী থাকলেন, আমিও উপবাস কোল্লেম। পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় রক্তদন্ত এলো, স্ত্রী-কন্যার উপর পূর্ব্ববৎ গর্জ্জন কোল্লে, আমার ঘরের চাবী খুলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাইরের ঘরে নিয়ে গেল। প্রহরীরা যেমন জেলখানায় কয়েদীগণকে পাহারা দিয়ে স্নান করায়, রক্তদন্ত আমাকে সেই রকমে পাহারা দিয়ে স্নান করিয়ে আনলে। আমি মনে কোল্লেম, বলিদানের অগ্রে বলীকে, যেমন ছাগ-শিশুকে স্নান করিয়ে শেষকালে গলা কাটে, এ লোকটাও আমাকে সেই রকমে কাটবে, স্নান করানোটা তারি পূর্ব্বলক্ষণ।

কুঁজোটা আমাকে কাটলে না, বরং দুটো ভালকথা বোলে মন ভিজিয়ে আবার অন্দরমহলে নিয়ে গেল। অমরের জননী সেই সংসারের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, রাক্ষসের তাদৃশ দুর্ব্যবহার সহ্য কোরেও রন্ধন কোরে রেখেছিলেন, সকলের যথাসম্ভব আহার হলো, সেদিনের আহারে আমার একটুও তৃপ্তিবোধ হলো না, আতঙ্ক আমাকে হতাশ কোরে দিয়েছিল।

অপরাহ্নে আবার আমাকে দুটী পাঁচটী মিষ্টকথা বোলে, সাবধান কোরে, রক্তদন্তটা ঘর থেকে বেরুলো, চাবী দিয়ে রেখে গেল না, আমি খোলসা থাকলেম। সন্ধ্যাকালে অমরকুমারী বাড়ীর মাঝদরজা বন্ধ কোরে আমার কাছে এসে বোসলেন, গত রজনীর হাঙ্গামা শেষ কোরে অন্যকথা কিছুই উত্থাপন কোল্লেন না, আমিও আমার ভাগ্যের কোন কথাই উত্থাপন কোল্লেম না। অশোক-বনে সীতাদেবীর যন্ত্রণার কথা রামায়ণে যেরূপ লেখা আছে, অমরকুমারী সেই-ভাবের গুটীকতক কথা বিরসবদনে আমার কাছে বোল্লেন।

ভাব বুঝতে পাল্লেম না। পূর্ব্বে কিছু সূচনা ছিল না, হঠাৎ কেন সে কথা মনে কোল্লেম, এটা হয় তো অভাগিনীর অন্তরের উচ্ছ্বাস। এই দুরন্ত-

লোকের সংসারে কন্যা-জননীর যেরূপ যন্ত্রণাভোগ হয়, বালিকা সেই সব যন্ত্রণা মনে কোরে রাখে। সীতাদেবীর যন্ত্রণার উদাহরণটী বোধ হয় সেই স্মৃতির উচ্ছ্বাস।

রামায়ণের কথা উত্থাপন না কোরে সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার সেই দিদিটীর কি বিবাহ হয়েছিল?"—কুমারী ম্লানবদনে উত্তর কোল্লেন, "বিবাহ হয় নাই। তখন তার বিবাহের সময়ও হয় নাই। দিনকতক এক একটা সম্বন্ধ এসেছিল, বাবা তাতে কিছুই মনোযোগ করেন নাই। দিদির নাম সমর-কুমারী। নামটা খুব নূতন, ছোটবেলা থেকে দিদি বড় চঞ্চলা ছিল, মুখরা ছিল, গায়ে অনেক জোর ছিল, ছেলেবেলা ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে খেলা করবার সময় প্রায়ই ঝগড়া কোত্তো; বাখারি, তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ কোত্তো; তার চেয়ে বড় বড় মেয়েদের কিল চড় মেরে মেরে ফেলে ফেলে দিতো; এক একজনকে কামড়ে কামড়ে রক্তপাত কোত্তো; মায়ের মুখে শুনেছি, সেই সব দেখে শুনে পাড়ার সম্পর্কের একজন ঠাকুরদাদা আমার দিদির নাম দিয়েছিলো সমরকুমারী। দুঃখের সময় একটা হাসির কথা মনে পোড়লো। একটী লোক তাঁর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবার জন্য দিদিকে দেখতে এসেছিল, সমরকুমারী নাম শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল;—বলে গেল, বাবা! বাঙ্গালীর মেয়ের এমন নাম! ও বাবা? এ মেয়ে নিশ্চয়ই রাক্ষসী হবে! আমার ছেলেটী রোগা, টপ্ কোরে খেয়ে ফেলে দেবে।

আমার মুখে হাসি আসে না, কত দিন হাসি ছিল না, তবু অমর-কুমারীর ঐ কথাগুলো শুনে আমি হাস্য সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না; মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেম। অমরকুমারী আমার হাসি দেখে বড় খুসী হোলেন। মধুর স্বর সুমধুর কোরে প্রফুল্লবদনে ফুল্লমুখে বোল্লেন, "হরিদাস! তিন দিনের মধ্যে একবারও তোমার মুখে আমি হাসি দেখি নাই। আজ তোমারে হাসিয়েছি! বাঃ! তোমার মুখে হাসিটুকু বেশ মানায়!"

আমোদে আমি হাসি নাই, কৌতুকেও হাসি নাই, বালিকার কথার ভঙ্গীতে হাসি এসেছিল, সেই হাসির জন্য বালিকার মুখে আমি খোসনামী পেলেম;—খোসনামীতে আমি তুষ্ট থাকি না; দৈবাৎ যেখানে যে কেহ আমাকে বেশ ছোকরা বোলে তারিফ কোরেছে, সেইখানেই আমি অন্যমনস্ক হয়েছি; অমরকুমারীর খোসনামীতেও তাদৃশ মনঃসংযোগ কোল্লেম না। তখন আমি মনে মনে আর একটা কথা ভাবছিলেম; কেমন একটা কৌতূহলের উদয় হয়েছিল, খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে, সমসূত্রে কুমারীর মুখপানে চেয়ে, মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অমর! তোমার বিবাহ হয়েছে?"

মেঘের কোলে চপলা একবারমাত্র খেলা কোরেই অমনি মেঘ-সাগরে ডুবে গেল। নম্রমুখখানি অবনত কোরে দীর্ঘ দীর্ঘ নেত্রপল্লবে পদ্মমুখী তখনি তখনি দুটী পদ্মনেত্র ঢাকা দিয়ে ফেল্লেন; সুন্দর কপোলযুগল আরক্তবর্ণ ধারণ কোল্লে; একটু পূর্ব্বে যে মুখে কত কথাই শ্রবণ কোচ্ছিলেম, সে মুখে আর তখন একটী বাক্যও নিঃসৃত হলো না; লজ্জাবনতমুখী বালিকা ধীরে ধীরে উঠে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কথায় কথায় আমরা অন্যমনস্ক ছিলেম, সূর্য্যদেব অস্ত গিয়েছিলেন, অন্ধকার হয়েছিল, জানতে পারি নাই। গৃহিণীঠাকুরাণী সেই ঘরে একটী প্রদীপ জেবলে দিয়ে গেলেন, যাবার সময় এদিক ওদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "অমর কোথায় ?"—তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "ছিলেন এই-খানে, এইমাত্র উঠে গেছেন।"

গৃহিণী রন্ধনগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। আমি একাকী যথাস্থানেই বোসে থাকলেম। অনেকক্ষণ অমরকুমারী দেখা দিলেন না। বাড়ী থেকে তিনি কোথাও যান না, বাড়ীতেই আছেন, সেইটী স্থির জেনে জননী উদ্বিগ্ন হোলেন না। বৈকালে বাড়ীর মাঝ-দরজা বন্ধ হয়েছিল, সে দরজা তখন খোলা ; তাই দেখে আমি মনে কোল্লেম, অমরকুমারী সদরবাড়ীতেই গিয়েছেন। একাকী বোসে থাকলেম, একাকী থাকলে চিন্তা-তপ্ত অন্তরে নানা চিন্তার উদয় হয়, নানা চিন্তায় আমার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে অস্থির হোতে লাগলো, আমি যেন তখন চিন্তা-সাগরে ডুবে রইলেম।

অমরকুমারী সদরমহলেই গিয়েছিলেন, গবাক্ষ দিয়ে দেখলেম, ফিরে এসে রন্ধনগৃহে জননীর কাছে গেলেন। কতক্ষণ তাঁরা সেইখানে ছিলেন, তার পর রন্ধনকার্য্য সমাপ্ত কোরে, দুজনেই একসঙ্গে শয়নগৃহে প্রবেশ কোল্লেন ; সে রাত্রে জননীর কিছু বেশী অসুখ বোধ হয়েছিল, অসুখেও তাঁরে সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম কোত্তে হয়, কাজগুলি একরকম সারা হয়েছিল, ঘরে এসে তিনি শয়ন কোল্লেন। মেয়েটী খানিকক্ষণ তাঁর কাছে বোসে থাকলেন, তার পর বাইরে এলেন ; এসেই আবার সদরবাড়ীর দিকে চোলে গেলেন। রাত্রি অনুমান এক প্রহর।

কত কি যে আমি ভাবছি, স্থিরতা রাখতে পাচ্ছি না। চিন্তার সাগর, সে সাগরে আমি থই পাচ্ছি না। একবার মনে হোচ্ছে, এখানে যেন কোন প্রকার বিপদ ঘোটবে, সে বিপদ থেকে নিস্তার পাবার উপায় কি হবে ? একবার মনে কোচ্ছি, সত্যই কি রক্তদন্ত আমার মামা ? সত্য সত্যই কি অমরকুমারী রক্ত-দন্তের কন্যা ? মীমাংসা কোত্তে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হয় ; যতই মনে করা যায়, ততই সন্দেহ বাড়ে। রক্তদন্ত এখানে কেন আমাকে এনেছে ? ভাল মত-লবে কখনই না ; তবে তার মতলব কি ? একবার দুটো ভালকথা কয়, একবার বিষবর্ষণ করে, একবার কপটমায়ায় বিড়াল সাজে, একবার ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ! লোকটী বড়ই ভয়ঙ্কর ! বিকট চেহারাটাই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এই লোকের হাতে আমার যে কি দশা হবে, ভাগ্যে আমার যে কি ফল ফোলবে, কিছুই তো স্থির কোত্তে পাচ্ছি না। তার মেয়ের কাছে আমি বর্দ্ধমানের ডাকা-তীর গল্প কোচ্ছিলেম, গোপনে দাঁড়িয়ে সেই কথা শুনে আমাদের উভয়কে যেন খেতে এসেছিল ! আজ দুই একটা ভালকথা বোলে বেরিয়ে গেছে, আমাকে চাবী দিয়ে রেখে যায় নাই, একটু সদয়, কিন্তু দুর্জ্জনের প্রসন্নতা, দুর্জ্জনের সদয়-ব্যবহার বিষাক্ত ঘৃত দুগ্ধের মত অধিকতর ভয়ঙ্কর !

নানা কথা ভাবছি, রাত্রিও ক্রমশঃ বাড়ছে, ঘর থেকে বেরিয়ে একবার বারান্দায় এলেম, জ্যোৎস্না-রজনী ; ফুট জ্যোৎস্না। আকাশে শুক্লপক্ষের

দ্বাদশকলা চন্দ্রমার সমুদ্রহাস্য ; পৃথিবীও হাস্যমুখী। এ শোভা দেখলে স্বভাবতই মানুষের মনে আনন্দ জন্মে. আমার মনে আনন্দ এলো না ; প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে কি যেন এক প্রকার আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠলেম। কি অমঙ্গল ?—বারান্দায় আর দাঁড়ালেম না, আবার সেই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। কি জানি, কিরূপে ঘরের প্রদীপটী তখন নিবে গিয়েছিল ; অন্ধকারে আমি বোসে থাকলেম। সহচর আতঙ্ক, সহচরী চিন্তা। অমরকুমারী এলেন না।

ত্রয়োদশ কল্প

নারীবেশ

ঘরের ভিতর অন্ধকারে আমি বোসে আছি, অন্যঘরে অমরের জননী শুয়ে আছেন। জাগরিতা কি নিদ্রিতা, জানি না, রাত্রি এক প্রহর অতীত হয়ে গেছে, কোন দিকে আর কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না, জ্যোৎস্না-রাত্রে ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ কিছু কম শুনা যায়, সেই দিকে মন রাখলে বেশীও শুনা যায়, আমি কেবল ঝিল্লীরব শ্রবণ কোচ্ছি ; অমরকুমারী এলেন না। কোথায় অমরকুমারী ? বিবাহের কথায় লজ্জাতে লজ্জাবতী বাইরে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে এসেছিলেন, আমার কাছে আসেন নাই, জননীর কাছে এসেছিলেন, আবার সদরবাড়ীতে গিয়েছেন দেখেছি, ফিরে আসতে দেখি নাই। গেলেন কোথায় ? —সদরবাড়ীতেই আছেন। সেখানে কেহ নাই, বালিকা একাকিনী সেখানে কি কচ্ছেন ? ইচ্ছা হলো, একবার দেখে আসি।

উঠি উঠি মনে কোচ্ছি, অকস্মাৎ ঘরের-বাহিরে চৌকাঠের ধারে কাহার পদশব্দ ; কে যেন অতি সাবধানে টিপে টিপে আমার দিকে আসছে ; কে আসছে ? নিশ্বাস বন্ধ কোরে স্থির হয়ে আমি শুনলেম। পা টিপে টিপে কে যেন আমার কাছে এলো ; অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে আমার কাছে এসে বোসলো ; অতি মৃদুস্বরে আমার কাণের কাছে তাড়াতাড়ি বোল্লে, "চুপ ! চুপ ! চুপ ! আমি অমরকুমারী। মহাবিপদ ! বাবু এসেছেন ; সঙ্গে দুটো লোক এনেছেন ; পরামর্শ হোচ্ছে ! সাংঘাতিক পরামর্শ ! বাইরের ঘরের পশ্চিমদিকের লাগাও একটা ছোটঘর, সে ঘরটা তুমি দেখ নাই, ছেলেবেলা আমরা সেই ঘরে খেলা কোত্তেম, এখন আর সে ঘরে বড় একটা কেউ যায় না, বর্ষাকালে কাঠ-ঘুঁটে থাকে ; আমি একাকিনী এত রাত্রে সদরবাড়ীতে আছি, বাবা দেখলেই রেগে উঠবেন, সেই ভয়ে সদরদরজার কাছে তাঁকে দেখেই সেই ছোটঘরে আমি লুকিয়েছিলেম, বাড়ীর ভিতর আসতে পারি নাই, চাঁদের আলোতে দেখতে পেতেন, সেই ভয়েই আসি নাই, সেইখানেই লুকিয়ে ছিলেম ; লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁদের সেই ভয়ানক পরামর্শ আমি শুনেছি। রাত দুপুরের সময় তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে, বাবার লোকেরা সেই সময় তোমারে হাত-পা বেঁধে

ধোরে নিয়ে যাবে, কোথাকার একটা নীলকুঠীতে চালান কোরে দিবে। তা যদি না পারে, তবে হয় তো কেটে ফেলবে!"

শুনে আমার আত্মাপুরুষ কেঁপে উঠলো। শুষ্ক-কম্পিত-মৃদুকণ্ঠে আমি বোলে উঠলেম, "তবে উপায়? এইখানে এইরূপ ডাকাতের হাতে বিঘোরে আমার প্রাণ যাবে, এই কি বিধাতার মনে ছিল? প্রাণে আমার সুখ নাই, এ কথা সত্য, কিন্তু বিঘোরে অপঘাতে প্রাণ হারাব, এ কথাটা ভেবে তো আমি যেন জগৎ অন্ধকার দেখছি!"

পূর্ব্বাপেক্ষা আরো মৃদুস্বরে আশ্বাস দিয়ে আমার হিতৈষিণী ভগ্নী অভয়বচনে বোল্লেন, "ভয় নাই! আমি রক্ষা কোরবো! এখনো সময় আছে। তুমি এক কাজ কর। আমার একখানি শাড়ী পর, দুগাছি পিতলের বালা দিচ্ছি, হাতে দাও, মেয়েমানুষ হও; শীঘ্র!—শীঘ্র! রান্নাঘরের পাশেই খিড়কীদরজা; সে দরজা খোলা আছে, যেখানে তারা বোসে পরামর্শ কোচ্ছে, সেখান থেকে আমাদের রান্নাঘরখানি বেশ দেখা যায়, চাঁদের আলো, উঠানে নামলেই তারা দেখতে পাবে; পুরুষবেশে বাহির হোলে তুমি পালাতে পারবে না, ছুটে এসে তারা ধোরে ফেলবে! মেয়েমানুষ সেজে পালাও! ভগবান যদি দিন দেন, আবার দেখা হবে; তুমি আমারে ভুলে থেকো না, আমিও তোমাকে ভুলে যাব না; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন; তুমি পালাও! শীঘ্র!—শীঘ্র! —আর বিলম্ব কোরো না; বিলম্বেই বিপদ সম্ভাবনা?"

প্রাণের মায়া বড় মায়া। প্রাণের মায়ায় আমি সেইখানেই নারীবেশ ধারণ কোল্লেম, দয়াময়ী স্নেহকুমারী একখণ্ড ছিন্নবস্ত্রে আমার মস্তক বেষ্টন কোরে ঠিক যেন একটী কবরী প্রস্তুত কোল্লেন, সেই কৃত্রিম কবরীর উপর একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে আমি উঠানে নামলেম। কুমারী চুপি চুপি আমার হাতে একটী টাকা দিলেন, কিছুতেই আমি গ্রহণ কোরবো না, দয়াবতী সে কথা শুনলেন না, "রাহাখরচ কোরো" বলে দিব্য দিয়ে গছিয়ে দিলেন, আবার পরমেশ্বরের নাম কোরে মঙ্গলকামনা কোল্লেন। আমি ধীরে ধীরে খিড়কীর দিকে চোল্লেম; আড়ে আড়ে চেয়ে দেখলেম, সদরের ঘরের রোয়াকে তিনজন লোক। নারীবেশে আমিই যেন তখন অমরকুমারী, লোকেরা যদি দেখে থাকে, নিশ্চয়ই আমাকে অমরকুমারী মনে কোরেছে, নতুবা সন্দেহ কোরে ছুটে আসতো, এলো না, আমি মনে মনে নিরাপদ ভাবলেম; তবু আমার বুক কাঁপলো; পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে, দয়াময়ী বালিকাটীকে আশীর্ব্বাদ দিয়ে, খিড়কীদরজা পার হয়ে আমি রাস্তায় পোড়লেম! এতক্ষণ প্রায় নিশ্বাস বন্ধ ছিল, রাস্তায় এসে নিশ্বাস ফেল্লেম।

দু-দিকে দুটো রাস্তা। বামদিকের রাস্তা ধোল্লে রক্তদন্তের বাড়ীর সম্মুখ দিয়েই ঘুরে যেতে হয়, সে দিকে না গিয়ে দক্ষিণের রাস্তা দিয়েই দৌড়!—ভোঁ দৌড়! রাত্রি অন্ধকার হোলে অজানা পথে ছুটে যেতে পাত্তেম না, নিকটেই ধরা পোড়তেম, ভগবান সুধাকরের কৃপায় অনেক দূর ছুটে গেলেম; কেহ ধোত্তে আসছে কি না, কেহ পিছু নিয়েছে কি না, সতর্ক হয়ে এক একবার পশ্চাদ্দিকে চেয়ে দেখি আর প্রাণপণে ছুট দিই!

এই ভাবে ছুটে ছুটে প্রায় আধ ক্রোশ পথ গিয়েছি, সম্মুখে দেখি, রাস্তার মাঝখানে একখানা গাড়ী। কাদের গাড়ী, কিসের গাড়ী, মানুষ নাই, এত রাত্রে পথের মাঝখানে খালিগাড়ী কেন দাঁড়িয়ে আছে, মনে মনে এইরূপ ভাবছি, এমন সময় দু-দিক থেকে দুজন লোক ছুটে এসে আমার মুখে চোকে কাপড় বেঁধে সেই গাড়ীখানার ভিতর তুলে দিলে ; তারাও গাড়ীর ভিতর উঠে বোসলো। একজন আমার সম্মুখে, একজন আমার পার্শ্বে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়ারা গাড়ীখানা নিয়ে নক্ষত্রবেগে দক্ষিণদিকে ছুটে চোল্লো। লোকেরা তখন আমার মুখের বাঁধন—চক্ষের ঢাকন খুলে দিলে। যে লোকটা সম্মুখে বোসেছিল, তার হাতে একখানা ছোটরকম তলোয়ার ; আমার মুখের কাছে সেই তলোয়ারখানা নাচিয়ে নাচিয়ে লোকটা বোলতে লাগলো, "খবরদার ! চুপ কোরে থাক ! যদি কথা কবি, যদি চেঁচাবি, এখনি দু-টুকরো কোরে কেটে ফেলবো !"

আমি আড়ষ্ট ! বাকশক্তি তখন যেন আমাকে পরিত্যাগ কোরে গেল। লোক আমাকে ভয় দেখিয়ে কথা কইতে নিষেধ কোল্লে, নিষেধ না কোল্লেও সে সময় আমার রসনা থেকে একটী কথাও নির্গত হতো না। ভাবতে লাগলেম, কে এরা ? কোথায়ই বা নিয়ে চোল্লো ? কেনই বা মুখ-চোক বেঁধেছিল, কেনই বা খুলে দিলো ? প্রাণের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কতই যে ভাবলেম, এখন আর যে সব কথা মনে পড়ে না। রাত্রিকালে পথে আমাকে ধোরেছে ; কেন ধরেছে ? —পুরুষমানুষ রেতের বেলায় মেয়েমানুষ সেজে রাস্তায় বেরুলে এখানকার লোকেরা বুঝি এম্নি কোরে ধরে। ধোরে নিয়ে কি করে ? ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। লোকেরা গাড়ীর দরজা-খড়খড়ি বন্ধ কোরে দিয়েছিল, কোন দিকে যাচ্ছি, গাড়ীখানা কোন পথ দিয়ে চোলেছে, তাও কিছু স্থির কোত্তে পাল্লেম না। দরজা খোলা থাকলেই বা কি আমি ঠিক কোত্তেম ? এ সব জায়গায় কখনো আসি নাই, পথ-ঘাট কিছুই জানি না, জ্যোৎস্নারাত্রেও আমার চক্ষে সমস্ত অন্ধকার বোধ হতো। কে এরা ? কোথাকার লোক ? আমাকে প্রাণে মারবার জন্য দুরাত্মা রক্তদন্ত যাদের ভাড়া কোরে এনেছিল, এরাই কি তারা ? না, তারা নয়। আমি যখন অমরকুমারীর পরামর্শে উঠান পার হয়ে খিড়কীর দিকে আসি, তখন একবার সদরের দিকে চেয়ে দেখেছিলেম, তিনজন লোক। একজন রক্তদন্ত, আর দু-জন নূতন। সেই দু-জনের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোতে একজনকে আমি একটু একটু চিনতে পেরেছিলেম ; ঘনশ্যাম বিশ্বাস। যে লোকটা আমাকে গুরুপত্নীর উপদেশে কারখানাবাড়ীতে ধোরে এনেছিল, ভিকারী সেজে যে লোকটা আমাকে বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়েছিল, বিধাতার অনুগ্রহে যার হাত থেকে আমি অভাবনীয় উপায়ে রক্ষা পেয়েছিলেম, সেই লোকটা—সেই দালাল, মহাজন, ভিকারী ঘনশ্যাম বিশ্বাস। এখন যারা আমাকে ধোরেছে, এদের ভিতর সে লোক নাই। তবে এরা কে ? কোথাকার লোক ?

গাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত ; কিন্তু আমার ভাবনার স্রোত যত দ্রুত প্রবাহিত, গাড়ীর গতি তত দ্রুত নয় ; হওয়াটা সম্ভবও নয়। কত দূরে গেলেম।

এক জায়গায় লোকেরা আমাকে গাড়ী থেকে নামতে বোল্লে, আমি নামলেম, তারাও নামলো। চন্দ্র তখন মধ্যগগন পার হয়ে পশ্চিমে খানিক দূরে ঢোলে-ছিলেন, তখনও বেশ জ্যোৎস্না ছিল ; দেখলেম, সম্মুখে একটা নদী ; নদীর ধারে নৌকা ছিল, লোকেরা সেই নৌকাতে আমাকে তুল্লে ; গাড়ীখানা সেই-খান থেকে ফিরে গেল। নৌকাযোগে নদীপার হয়ে আমরাও পারে উঠলেম। একজন আমাকে চৌকী দিতে লাগলো, আর একজন কোথায় চোলে গেল ; খানিক পরে আর একখানা গাড়ী আনলে, সেই গাড়ীতে উঠে আমরা প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম কোল্লেম।

গাড়ীখানা যেখানে থামলো, তার বামদিকে একখানা দোতালা বাড়ী। সম্মুখে ফটক। ফটকে আলো ছিল না, আকাশেও চন্দ্র ছিল না, শুক্লদ্বাদশীর চন্দ্র, সমস্ত রাত্রি বিহার করেন না, রজনীকে একাকিনী রেখে রজনীকান্ত তখন অস্তাচলে চোলে গিয়েছিলেন, অন্ধকার হয়েছিল, লোকেরা আমাকে সেই অন্ধকারে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। সদরবাড়ী। একটা ঘরে আলো ছিল, লোকেরা সেই ঘরে আমাকে টেনে তুল্লে। ঘরে একটী বৃদ্ধলোক বোসে ছিলেন, তাঁর প্রকৃতি গম্ভীর, মাথায় শ্বেতবর্ণ ছোট ছোট চুল, শ্বেতবর্ণ গোঁফ, গলায় তুলসীর মালা, বাহুতে একখানা অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্বর্ণকবচ। আমাকে দেখেই সেই বৃদ্ধটী চোমকে উঠলেন ; যারা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, চমকিত-স্বরে তাদের জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে এ ?"—লোকেরা অবাক।

বৃদ্ধ তখন আমাকেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি ?"—কিছুমাত্র চিন্তা না কোরেই আমি উত্তর কোল্লেম, আমি হরিদাস।

আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে, বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, বৃদ্ধ পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ রকম বেশ কেন তোমার ?"

কি উত্তর করি ? সত্যকথা যদি বলি, নানা সন্দেহের কারণ উপস্থিত হবে, ঘটনাসূত্রে লোকের মুখে মুখে রক্তদন্তও হয় তো শুনতে পাবে, বিপদ আরো বেড়ে উঠবে। এক বিপদ থেকে রক্ষা পাবার আশায় নারীবেশে পথে বেরিয়ে-ছিলেম, বেরিয়েই নূতন বিপদে পোড়েছি, তার উপর যদি আরো গোলযোগ হয়, তা হোলে আর রক্ষা পাবার কোন উপায়ই থাকবে না। ভরসা ভগবান ; ভগবানের কৃপায় সেই সময় আমার একটা উপস্থিতবুদ্ধি যোগালো। একটা মিথ্যাকথা বোল্লেম। সপ্তগ্রামে পাঠদ্দশায় গুরুদেবের মুখে শুনেছিলেম, এমন এক একটা বিপদ ঘটে, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না কোল্লে সে বিপদ থেকে উদ্ধার হবার উপায় থাকে না ; তাদৃশ স্থলে মিথ্যাকথায় দোষ হয় না, শাস্ত্রেও এরূপ বিধান আছে। সেই কথাটীও তখন আমার স্মরণ হলো, ভেবে চিন্তে কাজে কাজে একটা মিথ্যাকথা বোল্লেম।

বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তর দিলেম, "আমি বিদেশী বালক, নিরুপায়, নিরাশ্রয়, যাত্রার দলের একজন অধিকারী আমাকে আমার অনিচ্ছায় আপনাদের দলে ভর্ত্তি কোরেছিল। আজ রাত্রে এক বাড়ীতে যাত্রা হয়, অধিকারী আমাকে সখী সাজিয়েছিল ; তাদের দলে ভাল ভাল সাজপোষাক নাই, সেই কারণেই আমার এই রকম বেশ। যারা আমাকে এখানে ধোরে এনেছেন, তাঁরা যেখানে আমাকে

দেখতে পান, তারা আধ ক্রোশ তফাতে যাত্রা। যাত্রা করা আমার ইচ্ছা নয়, অভ্যাসও নয় ; অতএব দলের ভিতর থেকে বেরিয়ে চুপি চুপি আমি পালিয়ে আসছিলেম, খুব ছুটে ছুটে আসছিলেম, আসতে আসতেই পথের মাঝখানে ধরা পোড়েছি।"

এই পর্য্যন্ত বোলেই আমি চুপ কোল্লেম। বৃদ্ধটী হেসে উঠলেন, যারা আমাকে ধোরেছিল তারাও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগলো। একটু পরেই পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাব। বৃদ্ধ আমাকে বোল্লেন, "কিছু মনে কোরো না তুমি, ভুলে তোমাকে ধরা হয়েছে, বৃথা বৃথা কষ্ট পেয়েছো, আচ্ছা থাকো,—রাত্রিও আর বেশী নাই, এই ঘরেই তুমি থাকো ; যেখানে যেতে চাও, কাল সকাল-বেলা বিদায় কোরে দিব।"

কথার ভাবে বুঝলেম, তিনিই সেই বাটীর কর্ত্তা। একজন চাকরকে ডেকে কর্ত্তা আমাকে একখানি কাপড় আনিয়ে দিলেন, সখীবেশ পরিত্যাগ কোরে আমি আবার হরিদাস হোলেম ; কাপড় ছেড়ে, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বোস-লেম ; ভয়টা ঘুচে গেল। বড়মানুষের বাড়ী, খাদ্যসামগ্রীর অভাব ছিল না, কর্ত্তার হুকুমে বাড়ীর ভিতর থেকে আমার জলখাবার এলো, পরিতোষে জল-যোগ কোরে কর্ত্তার সঙ্গে নানা রকম কথা কইতে লাগলেম। আমার কথাবার্ত্তা শুনে কর্ত্তা তুষ্ট হোলেন। তার পর সেই ঘরে আমার শয়নের ব্যবস্থা কোরে দিয়ে, কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর উঠে গেলেন, নির্দ্দিষ্ট সুখশয্যায় আমি শয়ন কোল্লেম।

যে ঘরে আমি, তারি পাশের ঘরে চাকরেরা থাকে। কর্ত্তা উঠে যাবার আধ ঘণ্টা পরে সেই ঘরে একটা হাসির গর্‌রা উঠলো। একজন বোল্লে, "সাবাস বাবা সাবাস! কি ধোত্তে কি ধোরেছে! ধোত্তে গেল মেয়েমানুষ, ধোরে আনলে হরিদাস! কানাইবাবু ভারী তুখোড় লোক! ধরেন মাছ, না ছোঁন পানী! এই বাড়ীতে মানুষ হয়ে মামার মেয়েটীকে বেমালুম সোরিয়ে দিয়েছেন, রকমারি আখড়ায় মজা করা হবে, এই মতলব! আর কি তাকে পাওয়া যায়! ধরবার জন্য চারি-দিকে লোক ছুটেছে, কেহই ধোত্তে পারবে না ; এরা তবু যা হোক একটা ধোরে এনেছিল, হয়ে গেল হরিদাস! এরা ভদ্রলোক, এদের ঘরে এই কাণ্ড! আমরা ছোটলোক, আমাদের ঘরে এমন কাণ্ড হয় না!"

পাঁচজনে মিলে আবার হেসে উঠলো। আমি তখন একটু একটু বুঝতে পাল্লেম, ব্যাপারখানা কি। বাড়ীতে একজন কানাইবাবু আছেন, কর্ত্তাবাবুর ভাগ্নে তিনি, কর্ত্তার একটী মেয়েকে কুপথগামিনী করা তাঁর কার্য্য, অন্য-লোকের দ্বারা সোরিয়ে ফেলেছেন, নিজে খাঁটি হবার চেষ্টা পাচ্ছেন, নিজেও খুঁজতে বেরিয়েছেন। যাঁদের হাতে আমি পোড়েছিলেম, তাঁদের মধ্যে কানাই-বাবু ছিলেন কি না, জানতে পাল্লেম না, কিন্তু বড় ঘৃণা হলো। যারা আমাকে ধোরেছিল, তারা কোন ঘরে শুতে গেল, তাও আমি জানি না। রাত্রি শেষ, নানা ভাবনায় একবারও আমি চক্ষের পাতা বুজতে পাল্লেম না, দূরে দূরে

রামপাখী ডেকে উঠলো, গাছে গাছে গায়ক পক্ষীরা গান আরম্ভ কোল্লে, বনে বনে দলে দলে শেয়াল ডাকলো, কাকেরা কা কা রবে বাসা ছেড়ে উড়ে যেতে লাগলো, বুঝতে পাল্লেম, ঊষাকাল। একটু পরেই প্রভাত। একটী যুবা-পুরুষকে সঙ্গে কোরে কর্ত্তাবাবু বৈঠকখানায় এলেন। আমি তখন বিছানার উপর উঠে বোসেছি, কিছুই যেন জানি না, সেইভাবে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি, কর্ত্তা এসেই প্রসন্নবদনে আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হরিদাস! উঠেছ? রাত্রে কোন কষ্ট হয় নাই তো?"

নম্রস্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞে না, কোন কষ্ট হয় নাই, বেশ আরামেই ছিলেম ; এমন সুন্দর বিছানা আমার ভাগ্যে জুটে না।"

কর্ত্তা একটু হেসে, যুবাটীর মুখের দিকে চেয়ে, আমার দিকে ফিরে একটু স্নেহ জানিয়ে বোল্লেন, "রাত্রে কিছুই আহার হয় নাই, কষ্ট হয়েছে, এইখানে আহারাদি কোরে যেখানে যেতে চাও, সেইখানেই—"

আর আমি বোলতে দিলেম না ; শীঘ্র শীঘ্র বাধা দিয়ে শানুনয়ে বোল্লেম, "আজ্ঞে না, আহারের জন্য এখানে আর আমি বিলম্ব কোরবো না, এ অঞ্চলে থাকতে আমার ভয় ; এখনি আমি যাবো।"

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় তুমি যাবে?"—সাত পাঁচ ভেবে আমি উত্তর কোল্লেম, "কোথায় যাব, ঠিক নাই ; যাবার জায়গা আমার কোথাও নাই ; আমি বড় গরিব : আমার আপনার লোক কেহই নাই, থাকবার স্থানও কোথাও নাই ; যেখানে আশ্রয় পাব, যেখানে একটী চাকরী পাব, যেখানে দশজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে, ভবিষ্যতে ভাল হবার আশা থাকবে, সেই রকম জায়গাই আমি অন্বেষণ কোচ্ছি।"

একটু চিন্তা কোরে কর্ত্তা বোল্লেন, "সে রকম জায়গা পাড়াগাঁয়ে বড় কম ; সহরেই সবরকম সুবিধা ; আচ্ছা, বেশ কথা ; সেই রকম জায়গাতেই তোমাকে আমি পাঠাব। আমার একটী ভাইপো আজ কলিকাতায় যাবেন, তারি সঙ্গে তুমি যাও, দেখে শুনে তিনি তোমার একটা বিলি-ব্যবস্থা কোরে দিবেন। সেই কথাই ভাল। থাকো, আহারাদি কর, আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সকলেই আহার কোত্তে পারে, এখানে আহার কোত্তে তোমার কোন বাধা নাই।"

আর আমি আপত্তি কোত্তে পাল্লেম না, অস্বীকার করাও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ ; বিশেষতঃ কলিকাতায় যাবার সুবিধা হোচ্ছে ; কলিকাতার নাম আমি শুনেছি, অনেক দিন অবধি কলিকাতা-দর্শনের ইচ্ছা রয়েছে, সুবিধা ঘটে নাই। পুস্তকে পাঠ কোরেছি, কলিকাতা সহর ভারতবর্ষের রাজধানী, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন হয়, লক্ষ লক্ষ লোকে কাজকর্ম্ম পায়, কেহই বেকার থাকে না ; সেখানে অনেক রকম কারবার চলে, অনেক রকম চাকরী মেলে, অনেক দেশের লোক কলিকাতায় গিয়ে সুখে থাকে, আমি কলিকাতায় যাব। একজন ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবেন, এটা আরও বিশেষ সুবিধা। কলিকাতা অনেক দূর : চিনে চিনে ততদূর হেঁটে যাওয়া আমার অসাধ্য ; যানবাহনেরও খরচা নাই ; অমর-

কুমারীর দত্ত একটী টাকামাত্র আমার সম্বল ; অসুবিধা অনেক ; এই সকল বিবেচনা কোরে কর্ত্তার প্রস্তাবেই আমি সম্মত হোলেম।

কর্ত্তার নাম বাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম নরহরি চট্টোপাধ্যায়। বাণেশ্বরবাবু একজন জমীদার। তাঁর জমীদারীতে নায়েব-গোমস্তা অনেক আছে, কিন্তু ঐ নরহরিবাবুই সময়ে সময়ে সমস্ত জমীদারী পর্য্যবেক্ষণ করেন, মামলা-মোকদ্দমার তদ্বিরাদি করেন, তাঁর উপরেই সকল ভার। সম্প্রতি আলীপুরের দেওয়ানী আদালতে কি একটা বৃহৎ মোকদ্দমা রুজু আছে, সেই মোকদ্দমার তদ্বির করবার জন্যই নরহরিবাবু কলিকাতায় যাবেন, এইরূপ বন্দোবস্তই আমি জানতে পাল্লেম।

বেলা এক প্রহরের পর আমরা আহার কোল্লেম। আহারান্তেই যাত্রা। কর্ত্তা আমার জন্য একজোড়া ধুতি-চাদর আর দুটী জামা আনিয়ে দিলেন, আর কি কি ব্যবস্থা কোত্তে হবে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে চুপি চুপি সে সব কথা বোলে দিলেন। নূতন কাপড় পোরে, নূতন জামা গায়ে দিয়ে, সেইখানে আমি এক রকম বাবু সাজলেম। অনন্তর কর্ত্তাকে প্রণাম কোরে নরহরিবাবুর সঙ্গে বাড়ী থেকে আমি বেরুলেম। ঘরের গাড়ী প্রস্তুত ছিল, সেই গাড়ীতে আরোহণ কোরে আমরা যাত্রা কোল্লেম ; সঙ্গে একজন চাকর থাকলো। গাড়ীখানা সরাসরী উত্তরমুখে চোল্লো।

লোকেরা রাত্রিকালে যখন আমাকে ঐ বাড়ীতে নিয়ে যায়, পথে তখন একটা নদী পার হোতে হয়েছিল, এবারে নদী দেখা গেল না, খানিক দূরে কেবল একটা বালীর চড়ার উপর দিয়ে গাড়ী এলো। চড়া পার হয়ে নরহরিবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রাত্রে এ পথে গাড়ী আসে নাই, নদী ছিল, এটা কি তবে সে পথ নয় ?"

বাবু উত্তর কোল্লেন, "সেই পথ। নদী আমরা পার হয়েছি। আশ্চর্য্য নদী। সর্ব্বদা জল থাকে না, অল্প অল্প বৃষ্টি হোলে কিম্বা আকাশে মেঘ দেখা দিলে নদীতে জল হয়, অতি বেগে স্রোত বয়, অন্য সময়ে কেবল বালী ধু ধু করে। কল্য দিবাভাগে মেঘ ছিল, এদিকে বৃষ্টিও হয়েছিল, সেইজন্য গাড়ী চলে নাই।"—জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, সেই নদীর নাম ময়ূরাক্ষী নদী।

পূর্ব্বে বোলেছি, বীরভূমের প্রধান সহর সিউড়ী। গাড়ীখানা সিউড়ীতে একবার থামলো, সেইখানে ঘোড়া বদল কোরে আবার আমরা সদর-রাস্তায় যেতে লাগলেম। এখানকার রাস্তাগুলি বড় সুন্দর ; মিউনিসিপালিটীর সাহায্য ব্যতিরেকে বালী-কাঁকরে নির্ম্মিত ; বর্ষাকালেও কাদা হয় না, সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। আমাদের গাড়ী সেই পথে বরাবর একটা জায়গায় এসে থামলো ; সেই জায়গার নাম সাঁইথিয়া। যে সময়ের কথা আমি বোলছি, সে সময় এদেশে রেল পথ হয় নাই, এখন সাঁইথিয়াতে ইষ্টইণ্ডিয়া-রেলওয়ে কোম্পানীর একটী ষ্টেশন হয়েছে।

সাঁইথিয়া থেকে ঘরের গাড়ীখানি বিদায় হয়ে গেল, আমরা একখানা ভাড়া-টিয়া গাড়ীতে আরোহণ কোরে কলিকাতার দিকে আসতে লাগলেম। কোথাও

ঘোড়ার গাড়ী, কোথাও গরুর গাড়ী, কোথাও নৌকা, এইরূপ বিবিধ যানে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম কোরে, তিন দিনে আমরা কলিকাতায় পৌঁছিলেম।

চতুর্দ্দশ কল্প

রাজধানী

গঙ্গার পূর্ব্বতীরে কলিকাতা সহর। এই সহরটী এখন ভারতবর্ষের রাজধানী। ইংরেজেরা এখানে মা গঙ্গার নাম রেখেছেন, হুগলী। ইংরেজী অক্ষরে গঙ্গানামটী লেখা যায় না, এমন কথা নয় ; গঙ্গাকে আমরা দেবতা বলি, সেই কারণ গঙ্গানাম লিখনে বা উচ্চারণে হয় তো তাঁরা ঘৃণা বোধ করেন। গঙ্গাকে তাঁরা ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ কোরে নিয়েছেন। কোথাও গঙ্গা, কোথাও ভাগীরথী, কোথাও হুগলী ; যে স্থানটুকু গঙ্গা, সে স্থানেও তাঁরা গঙ্গানামটী লেখেন না, কল্পনাবলে ভূগোলাদিতে লিখে দেন, "গ্যাঞ্জেস্।" ইংরেজ আমাদের রাজা, তাঁদের যে রকম ইচ্ছা, রাজক্ষমতায় অবশ্যই তাঁরা মা গঙ্গার সেই রকম নাম দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের ভাগীরথী গঙ্গা যত দিন ভারতভূমিতে প্রবাহিত থাকবেন, ততদিন পতিতপাবনী গঙ্গানাম কিছুতেই বিলুপ্ত হবে না ; কালক্রমে গঙ্গা যদি সত্য সত্যই শুষ্কতোয়া হন, তথাপি চিরপ্রসিদ্ধ গঙ্গানামটী ভারতবাসী আর্য্য-সন্তানের চিরস্মরণীয় থাকবে।

মা গঙ্গার পূর্ব্বতীরে কলিকাতা। নৌকাপথে আমাদের কলিকাতায় আসা হয়েছিল। যে ঘাটে আমরা অবরোহণ করি, সেই ঘাটটীর নাম জগন্নাথ-ঘাট। সে ঘাটে নৌকা লাগাবার কারণ এই ছিল যে, জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বীরভূমের বাগেশ্বরবাবুদের একখানি বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীখানি জগন্নাথঘাট থেকে অতি নিকট। নৌকা থেকে উঠে প্রথমেই আমরা জোড়াসাঁকোতে গেলেম। যতদূর গেলেম, ততদূর কেবল দু-ধারে সারি সারি ছোট বড় অট্টালিকা ; মাঝে মাঝে দোকান। বাবুদের বাড়ীতে রাত্রিবাস করা হলো, কলিকাতায় গঙ্গার যেরূপ অপরূপ শোভা দর্শন কোরে এলেম, রাত্রে সেই শোভার সমালোচনা আমার হৃদয়ক্ষেত্রে সমুদিত হোতে লাগলো। অপরূপ শোভা! বহুদূর-ব্যাপ্ত অসংখ্য তরণী! কোনখানি হালভরে, কোনখানি পালভরে, উত্তরদক্ষিণে ভেসে ভেসে চোলেছে, বায়ু-হিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে গঙ্গা-তরঙ্গ যেন মধুময় প্রেমতরঙ্গে নেচে নেচে যাচ্ছে ; বোধ হলো যেন জীবপূর্ণ, পণ্যপূর্ণ তরণীগুলি বক্ষে নিয়ে পুলক-প্রমোদে মা গঙ্গা নিজেই তালে তালে নৃত্য কোচ্ছেন, তরণীগুলিও বায়ুপ্রভাবে—তরঙ্গপ্রভাবে হেলে দুলে নৃত্য কোচ্ছে ; সাহেবলোকের বড় বড় জাহাজ স্থানে স্থানে মাস্তুলাঙ্গ ধ্বজপতাকায় সুশোভিত হয়ে শৃঙ্গশোভিত অচল-পর্ব্বতের ন্যায় নঙ্গর করা রয়েছে ; দৃশ্য অতি চমৎকার! যখন আমরা নেমেছিলেম, তখন বেলা প্রায় দশটা ; নগরবাসী লোকের স্নানের সময় ; গঙ্গার প্রতি যাঁদের অচলা ভক্তি, তাঁরা সকলেই প্রতিদিন গঙ্গাস্নান

করেন ; যাঁদের অল্প ভক্তি অথবা যাঁরা ভক্তিশূন্য, তাঁরাও গঙ্গাস্নানে আনন্দ অনুভব করেন ; অসংখ্য স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা একসঙ্গে এক এক ঘাটে পরমানন্দে স্নান কোচ্ছেন ; বালক-বালিকারা অল্প জলে গঙ্গার সঙ্গে হেসে হেসে খেলা কোচ্ছে ; একটু বেশী বয়সের বলবান ছেলেরা গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিয়ে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ; গঙ্গা-ভক্তি স্ত্রীলোকের হৃদয়েই অধিক বিরাজ করে, স্ত্রীলোকেরা স্নানান্তে পুষ্প-চন্দনে শিবপূজার সঙ্গে গঙ্গা-পূজা কোচ্ছেন ; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা অষ্টাঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপন কোরে, ললাটে তিলক কেটে, চক্ষু বুজে ধ্যানযোগে বোসে আছেন ; বহুলোকের সমাগমে গঙ্গার জল-স্থল পরম শোভা ধারণ কোরেছে ; সেই শোভা আমি নূতন দর্শন কোরেছি, সেই জন্যই গঙ্গা-প্রসঙ্গে এত কথা বোল্লেম।

প্রভাতে নগরদর্শন। নরহরিবাবুর মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসা আছে, কলিকাতার অন্ধি-সন্ধি তাঁর বেশ জানা ছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে কোরে সহরটী দেখালেন। শকটারোহণে নগরদর্শন ভাল হয় না, অতএব প্রাতে ও অপরাহ্নে পদব্রজেই আমরা বেরুতেম। পূর্ব্বে কখনো আমি কলিকাতা দেখি নাই, এই সবে নূতন দেখা ; দু-এক দিনে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দর্শন করা অসম্ভব, ভ্রমণে ও দর্শনে আমাদের সাত দিন লাগলো। যা যা দেখলেম, সমস্তই আশ্চর্য্য।

বাড়ী, গাড়ী, দোকান, এই তিনটী জিনিস অসংখ্য। যে দিকে যাই, সেই দিকেই বাড়ী, সেই দিকেই গাড়ী, সেই দিকেই দোকান। ঠাঁই ঠাঁই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ; ক্ষুদ্র-বৃহৎ এত বাড়ী আমি দর্শন কোল্লেম, গণনা কোরে শেষ করা যায় না। এক জায়গায় এত অট্টালিকার সমাবেশ, সেই কারণেই বোধ হয়, কলিকাতার নাম প্রাসাদ-নগরী। কলিকাতায় বাজার অনেক, বাজারগুলি তন্ন তন্ন কোরে আমি দেখলেম ; বাজারে বাজারে নানাদেশের নানাপ্রকার জিনিসপত্র বিক্রয় হয়। ইংরেজী-বাজার ধর্ম্মতলায়, বাঙালীবাজার বাঙালী-টোলায়। বাজারগুলি দিব্য গুলজার। নিকটে নিকটে পুলিশের থানা, রাস্তায় রাস্তায় দিবারাত্রি প্রহরীদের ঘাঁটি। নরহরিবাবুর সঙ্গে থানাগুলি আমি দেখ-লেম, আদালতগুলি আমি দেখলেম, কেল্লা আর কেল্লার মাঠ একদিন দেখে এলেম। দক্ষিণে আলীপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট। আলীপুরে নরহরিবাবুর মোকদ্দমা। একদিন তাঁর সঙ্গে আলীপুরে গিয়ে সেখানকার আদালতগুলিও দর্শন কোল্লেম। দেওয়ানী, ফৌজদারী এক জায়গায় নয়, ফৌজদারী কাছারীর অনেক দূর পশ্চিমে স্বতন্ত্র বাড়ীতে জজ-আদালত ; সেই বাড়ীতে জজ, সদর-আলা, সদর-আমীন আর মুন্সেফেরা এজলাস করেন। দেওয়ানী-ফৌজদারী উভয় বিভাগেই হাকিমের সংখ্যা বেশী। নরহরিবাবুর মুখে শুনলেম, এত বড় আদালত আর এতাধিক হাকিম বঙ্গদেশের আর কোন জেলাতেই নাই। এই জেলাটী সদরজেলা ; এ জেলার নাম চব্বিশ পরগণা। রাজধানীর নিকট বোলেই এই জেলার প্রাধান্য। বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর এই আলীপুরের বেলভেডিয়ার উদ্যানে বাস করেন।

কলিকাতা উত্তম সহর ; লোকের মুখে শুনলেম, পূর্ব্বে কলিকাতার এ অবস্থা ছিল না। স্থানে স্থানে জঙ্গল ছিল, বাগান ছিল, পচা পচা পুষ্করিণী ছিল, পশু-পক্ষী অনেক বাস কোত্তো, ভদ্রলোক অপেক্ষা ইতরলোক আর দুষ্টলোকই বেশী ছিল, ক্রমে ক্রমে সংস্কার হয়ে আসছে।

ঐ সকল কথার সার্থকতাও আমি বেশ অনুভব কোল্লেম। অনেকগুলি রাস্তার নামে তদ্বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। হাতীবাগান, বাদুড়বাগান, ভাল্লুকবাগান, ডালিমবাগান, পেয়ারাবাগান, গুয়াবাগান, হরীতকীবাগান, চোরবাগান, জোড়াবাগান, ডিঙ্গীভাঙা, শানকীভাঙা, কসাইটোলা, উলটা-ডিঙী, নারিকেলবাগান ইত্যাদি পরিচয়ে বেশ জানা যায়, পূর্ব্বে এ সহরের এরূপ শ্রী ছিল না ; পুষ্করিণী-পরিচয়ে এক দৃষ্টান্ত হেদুয়াদিঘী। ইংরেজ-শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের অনুগ্রহে কলিকাতা ক্রমে ক্রমে সুন্দর শ্রীধারণ কোচ্ছে, ক্রমশঃ আরও সুন্দর হবে, তারও আভাস পাওয়া গেল।

নরহরিবাবু প্রায় কুড়ি দিন কলিকাতায় থাকলেন ; সেই কুড়ি দিন আমি তাঁদের বাড়ীতেই থাকলেম। পাচক-ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়েছিল, আহারাদির কোন কষ্টই ছিল না। থাকতে থাকতে পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার জানাশুনা হলো ; পরিচয় হলো না, পরিচয় আমার কি আছে, কাহার কাছে কি পরিচয় দিব, কিছুই পরিচয় হলো না ; তথাপি বিনা পরিচয়ে ভদ্রলোকেরা আমাকে যেন ভালবাসলেন, লক্ষণে এইরূপ আমি বুঝলেম।

একদিন একটী ভদ্রলোক আমাকে সাবধান কোরে বোল্লেন, "এ সহর বড় ভয়ঙ্কর স্থান ; চোর, জুয়াচোর, গাঁটকাটা, জুয়ারী, মাতাল, লম্পট এখানে অনেক ; ভদ্রলোকের সঙ্গে তুলনায় বদমাসলোকের সংখ্যাই অধিক। সহরে যখন একাকী বাহির হবে, খুব সতর্ক হয়ে থেকো, অচেনা লোকের কথায় শীঘ্র বিশ্বাস কোরো না, দুষ্টলোকের মিষ্টকথায় ভুলো না, ছেলেমানুষ তুমি, খুব সাবধান হয়ে চোলো ; অসাবধান হোলেই বিপাকে ঠেকবে। সাবধান! সাবধান! বিশেষতঃ রাত্রিকালে।"

ভ্রমণকালে কতক কতক লক্ষণ দেখে দেখে ঐ রকম অনেকটা আমি বুঝে-ছিলেম, সাবধান হয়েই বেড়াতেম ; ভদ্রলোকের মুখে স্পষ্ট স্পষ্ট ভয়ের কথা শুনে তদবধি আমি আরো অধিক সতর্ক হোলেম।

নরহরিবাবুর দেশে যাবার দিন নিকট হয়ে এলো। আমাকে তিনি কোথায় কার কাছে রেখে যাবেন, বোধ হয়, আগে থেকেই ভেবেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর পাড়ার একটী ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে আসেন, লোক-টীর বয়স কিছু ভারী, দিব্য শান্তমূর্ত্তি, চেহারায় জানা যায়, বাবুলোক। আমাকে কাছে ডেকে, নরহরি সেই লোকের নিকটে সুপারিশ কোরে সংক্ষেপে সংক্ষেপে বোল্লেন, "এই ছোকরার কথাই আমি আপনাকে বোলেছিলেম ; যেমন বয়স, সেই হিসাবে সম্ভবমত লেখাপড়া শিখেছে, চরিত্র খুব ভাল, অবাধ্যতা জানে না, অত্যন্ত গরিব, আপনি যদি দয়া কোরে এটীকে রাখেন, আমার যথেষ্ট উপকার করা হবে, গরিবকে আশ্রয় দিলে আপনারও পুণ্য হবে, ইহার দ্বারা

আপনার ছোট ছোট কাজকর্ম্ম বেশ চোলবে, ছোকরা খুব বিশ্বাসী, সত্যবাদী, ধর্ম্মভীরু ; অল্পদিনে অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি।"

তাঁকে আর বেশী কথা বোলতে হলো না, আমার মুখপানে চেয়ে, একটু হেসে ভদ্রলোকটী বোল্লেন, "কি বল হরিদাস ! আমার বাড়ীতে তুমি থাকবে ? কাজকর্ম্ম বেশী কিছু নয়, দপ্তরখানায় বোসে অল্প অল্প লেখাপড়া করা ; আর বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হোলে এক আধবার বাজারে যাওয়া, এই মাত্র কার্য্য। কেমন, রাজী আছ ?"

নমস্কার কোরে তৎক্ষণাৎ আমি সম্মত হোলেম। পূর্ব্বে দুই একদিন ঐখানে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাতেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, আমার নাম হরিদাস। আমিও তাঁর সততা অনুভব কোরেছিলেম, তাঁর কাছে চাকরী কোত্তে আমার অনিচ্ছা হলো না, বরং আহ্লাদ হলো। খানিকক্ষণ থেকে সেই বাবুলোকটী আপন বাড়ীতে চোলে গেলেন, "কল্য আবার দেখা হবে," এই কথা বোলে গেলেন।

সেদিন রবিবার। আগামী বুধবার নরহরিবাবুর স্বদেশযাত্রা। সোমবার বৈকালে সেই বাবুটী আবার এলেন। আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে চাই-লেন, নরহরিবাবু বাধা দিয়ে বোল্লেন, "আজ নয়, এ দু-দিন এইখানেই থাকুক, যেদিন আমি যাব, সেই দিন আপনার কাছে রেখে যাব।" সেই কথাতেই বাবুটী রাজী হোলেন ; নরহরিবাবুর বাড়ীতেই আমি থাকলেম।

মঙ্গলবার বৈকালে আমাকে সঙ্গে নিয়ে, নরহরিবাবু একবার বাজারে বেরুলেন ; দেশের জন্য যা কিছু খরিদ করা আবশ্যক ছিল, খরিদ কোল্লেন আমার জন্য আর এক জোড়া ধুতী-চাদর, আর এক জোড়া জামা আর এক জোড়া বার্ণিসকরা বিলাতী জুতা কিনে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুটে এলো, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা বাড়ীতে ফিরে এলেম।

রাত্রে নূতন অভিনয়। কল্য প্রাতে নরহরিবাবু দেশে যাবেন সন্ধ্যার সময় দুটী পাঁচটী বন্ধুবান্ধব দেখা কোত্তে এলেন, প্রসঙ্গাধীন পাঁচরকম গল্প হলো। তাঁরা উঠে যাবার পর নরহরিবাবু আমাকে ডাকলেন, ম্লানবদনে আমি তাঁর কাছে গিয়ে বোসলেম। দু-চারি কথার পর আমার হাতে ৫০০৲ টাকার পাঁচখানি ব্যাংকনোট দিয়ে, বাবু স্নেহবচনে বোল্লেন, "এই নোট-কখানি রাখ। আমি দেশে চোল্লেম, মাসখানেক পরে আবার আসবো, তুমি কেমন থাকো, সাক্ষাৎ কোরে জেনে শুনে যাব, তুমি সাবধানে থেকো, সাবধান হয়ে কাজকর্ম্ম কোরো, বাবুটী লোক ভাল, আপাততঃ তোমাকে কিছু কিছু জলপানী দিবেন, কাজকর্ম্ম শিখলে, থাকতে থাকতে তোমার ভাল হবে।"

নোট-কখানি ফিরিয়ে দিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বোল্লেম, "এ সব আমাকে কেন দিচ্ছেন ? আমি আপনাদের কি উপকার কোরেছি ? আমাকে টাকা দেওয়া কিসের জন্য ? আপনাদের কাছেই বরং আমি উপকার পেয়েছি, তজ্জন্যই কৃতজ্ঞ আছি, চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো, টাকা আমি গ্রহণ কোরবো না ; ও টাকা আপনিই রাখুন।"

শান্তবদনে বাবু বোল্লেন, "সে জন্য নয়, তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ, অকারণে

আমাদের লোকেরা তোমাকে ধোরে কত কষ্ট দিয়েছে, তজ্জন্য আমরা বড় দুঃখিত আছি। জ্যাঠামহাশয় বোলে দিয়েছেন, সে সব কথা তুমি কিছু মনে কোরো না, ভুলক্রমে লোকেরা তোমায় ধোরেছিল, সে কথা কারো কাছে গল্প কোরো না, ভুলে যেয়ো। নোট-কখানি দিচ্ছি কেন, সে কথাও বোলছি ; কর্ত্তার অনুমতি। বিশেষতঃ যেখানে তোমাকে আমি রেখে যাচ্ছি, সেখানে যদি তোমার কষ্ট হয়, সে বাড়ীতে যদি তুমি বেশী দিন থাকতে না পার, আশ্রয়হারা হয়ে ফাঁপরে পোড়বে ;—সহর জায়গা, বিশেষ কলিকাতা, এখানে সহজে কেহ তোমাকে আশ্রয়ও দিবে না, কারো কাছে সাহায্য পাবে না ; ছেলেমানুষ, অর্থাভাবে কোথায় যাবে, কি কোরবে, কোথায় থাকবে, বড়ই কষ্ট হবে ; নোট-কখানি রাখ, আবশ্যকমত খরচপত্র কোরো ; গ্রহণ না কোল্লে আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হব ; কর্ত্তাও ক্ষুণ্ণ হবেন।"

আমিও গ্রহণ কোরবো না, তিনিও কিছুতে ছাড়বেন না, বার বার জেদ কোত্তে লাগলেন, কাজেই সেই পাঁচখানি নোট গ্রহণ কোত্তে হলো ; অগত্যা স্বীকার।

রাত্রি দশটার পূর্ব্বে আহারাদি কোরে আমরা যথাস্থানে শয়ন কোল্লেম। বাণেশ্বরবাবুর বদান্যতা, নরহরিবাবুর ভদ্রতা আর আমার অদৃষ্টের প্রসন্নতা চিন্তা কোত্তে কোত্তে নিদ্রিত হোলেম, ঊষাকালে নিদ্রাভঙ্গ হলো। প্রভাতে নরহরিবাবু গাত্রোত্থান কোরে, নিয়মিত কার্য্য সমাপন কোল্লেন, যে বাড়ীতে আমাকে রাখবার কথা, সঙ্গে কোরে সেই বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সময়োচিত কথাবার্ত্তার পর বাবুর হস্তে আমাকে সমর্পণ কোল্লে, বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে, নরহরিবাবু আপন বাড়ীতে চোলে এলেন। কখন তিনি যাবেন, যাবার সময় দেখা কোরবো, সেই অভিলাষে আমার নূতন মনিবকে বোলে, আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলেম। দূরপথে যাওয়া, কোথায় কখন আহার হবে, হবে কি না হবে, কিছুই নিশ্চয় ছিল না, অতএব সেইখানেই আহারাদি সমাপন কোরে, বাড়ীর দরজায় চাবী দিয়ে, তিনি গাড়ীতে উঠলেন। আমার চক্ষে জল এলো, আমার মুখপানে চেয়ে, তাঁর চক্ষু-দুটীও সজল ; মিষ্টবাক্যে আমাকে সান্ত্বনা কোরে, নানাপ্রকার হিতোপদেশ দিয়ে, তিনি নেত্রমার্জ্জন কোল্লেন ; আর আমার দিকে চাইতে পাল্লেন না। জিনিসগুলি গাড়ীর ভিতর তুলে দিয়ে চাকরটী কোচবাক্সে কোচমানের কাছে বোসলো, গাড়ীখানা গড়গড় শব্দে গঙ্গার দিকে ছুটে চোল্লো।

খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে চক্ষু মুছতে মছুতে আমি মনিব-বাড়ী ফিরে এলেম।

পঞ্চদশ কল্প

এ আবার কি কান্ড ?

যে বাড়ীতে আমার চাকরী হলো, সেই বাড়ীখানি দোতালা ; সম্মুখে ঝিলিমিলি দেওয়া টানা বারান্দা ; সদরবাড়ীতে অনেকগুলি ঘর। উপরের

একটী ঘরে বাবু বসেন, আর সব ঘরগুলি প্রায় সর্ব্বদাই শূন্য থাকে, ক্রিয়া-কর্ম্মোপলক্ষে জনপূর্ণ হয়। সব ঘরগুলি কিন্তু সমভাবে সাজানো। নীচের দুটী ঘরে দপ্তরখানা, উত্তরদিকে পূজার দালান, বাড়ী চকবন্দী ;—চকের অন্যান্য ঘরে সরকার, মুহুরী, গোমস্তা, খানসামা আর অন্যান্য চাকর থাকে। সদরে দেউড়ী আছে, দরোয়ান নাই।

বাবুর নাম প্রতাপচাঁদ মৈত্র. বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ ; বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, গঠন নাতিদীর্ঘ, দোহারা. চক্ষুদুটী বড় বড়. মুখখানি সুন্দর, দীর্ঘ নাসি-কার অগ্রভাগটী কিছু টেপা. মাথার চুলগুলি কিছু লম্বা লম্বা, বয়স অনু-মান পঞ্চাশ বৎসর। বাবুর দুটী পুত্র, দুটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরি-দয়াল, কনিষ্ঠের নাম শ্যামধন। বড়বাবু পিতার ন্যায় নাতিদীর্ঘ, বর্ণ গৌর, মুখ-চোখ দিব্য মানানসই. কেশ দীর্ঘ. মধ্যস্থলে সিঁতিকাটা ; বয়স অনু-মান পঁচিশ বৎসর। ছোটবাবুটী কিছু কালো, খর্ব্বাকার, একহারা, মুখে-চক্ষে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় ; বয়স অনুমান বাইশ বৎসর।

অন্দরে বাবুর পত্নী. কন্যা দুটী, আর দুজন দাসী থাকে ; আর কেহই না। আমি ছেলেমানুষ. অন্দরে প্রবেশ করবার অনুমতি ছিল, সময়ে সময়ে অন্দরে আমি যেতেম. মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেম, কেহই আমারে দেখে লজ্জা কোত্তেন না। গৃহিণী দিব্য সুন্দরী ; মেয়ে-দুটীও সুন্দরী। বড়-মেয়েটীর নাম মৃণালিনী, বয়স অনুমান ১৮।১৯ বৎসর। ছোটমেয়েটীর নাম তরুবালা, বয়স অনুমান দশ বৎসর। মৃণালিনী সধবা, তরুবালা কুমারী।

একমাস সেই বাড়ীতে আমি থাকলেম। দু-বেলা দপ্তরখানায় বোসে লেখা-পড়া করি, সন্ধ্যার-সময় একজন সরকারকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় একটু একটু বেড়াই, অবকাশকালে দুই একখানি নূতন নূতন পুস্তক পাঠ করি ; বেশ থাকি। বাবু বোলেছিলেন, মাঝে মাঝে এক একবার বাজারে যাওয়া আবশ্যক হবে ; কিন্তু একমাসের মধ্যে সে রকম আবশ্যকতা একদিনও উপস্থিত হয় নাই ; বাড়ীতেই আমি থাকি ; বাহিরে অন্দরে সকলেই আমাকে ভালবাসেন। আমার ভাগ্যফলের মধ্যে সেইটুকু একটী সুফল।

ক্রমেই দিন গত হোতে লাগলো। হিসাব কোরে দেখলেম, একমাস আট দিন। মাসখানেকের মধ্যে আর একবার কলিকাতায় আসবেন, নরহরিবাবু এই কথা বোলে গিয়েছিলেন, কিন্তু এলেন না ; চিঠিপত্রও লিখলেন না ; বোধ হয়, আমাকে ভুলে গেলেন। ভুলে থাকেন ভুলেছেন, তবু আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যে আশ্রয়ে তিনি আমারে রেখে গিয়েছেন, সে আশ্রয়টী খুব ভাল। আরো ভাল এই জন্য বলি, রক্তদন্তের ভয়টা ঘুচে গেছে। কোথায় বীরভূম, কোথায় কলিকাতা। এত বড় সহরের ভিতর কোথায় কোন গলীতে কোন বাড়ীতে আমি আছি, কলিকাতায় এলেও সে রাক্ষসটা কিছুই জানতে পারবে না ; আমি কলিকাতায়, কে-ই বা তাকে এ সন্ধান বোলে দিবে ? কেহই দিবে না। আমি নিরাপদ। এইরূপ আমি ভাবলেম ; এইরূপ আমার মনের ধারণা। রক্তদন্ত এখানে আসতে পারবে না, এই ধারণায় এক প্রকার আমি নিশ্চিন্ত ; কিন্তু অমরকুমারী সর্ব্বক্ষণ আমার মনে জাগেন। সে রাত্রে আমি পালিয়ে

এসেছি, সেটা জানতে পেরে রাক্ষসটা হয় তো সেই স্নেহময়ী কুমারীটীকে কতই লাঞ্ছনা কোরেছে। আহা! সেখানে একদিন আমি মনে মনে বোলেছিলেম, অভাগিনী অমরকুমারী! ভাল করি নাই। অমরকুমারী অভাগিনী নহেন, অমরকুমারীর ভাগ্যে অবশ্যই সুখ আছে। অভাগিনী হোলে সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ে ততটা দয়ার স্থান হতো না। অমরকুমারীর জন্য আমি ভাবি ; অমরকুমারীর জননীর জন্যও ভাবনা হয়। বর্দ্ধমানের আশালতাকেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

এই রকমে আমার দিন যায়। দুই মাস পরিপূর্ণ। নরহরিবাবু এলেন না। নরহরিবাবুর জন্য আমি কেন ভাবি ? তিনি আমার উপকার কোরেছেন, আমি তাঁর কেহই নই, তবু তিনি আমারে আপন ভেবে ভালবেসেছেন, দয়া কোরে চাকরী কোরে দিয়েছেন, ৫০০৲ টাকার নোট দিয়ে গিয়েছেন, সেই জন্যই তাঁরে মনে করি। শেষকথাটা কিছু বেশী ভাবি। অত টাকা তিনি আমারে কেন দিলেন ? বোলেছিলেন, কর্ত্তার অনুমতি। সেই অনুমতিরই বা কি কারণ ? সেই রাত্রে চাকরেরা বোলেছিল, তাঁদের বাড়ীর একটী মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে কি বেরিয়ে গিয়েছে, বাড়ীর লোকেই বাহির কোরেছে, কোন সূত্রে আমি যদি সেটা জানতে পেরে থাকি, অন্যলোকের কাছে প্রকাশ না করি, সেই জন্যই বোধ হয় টাকা দেওয়া। বোধ হয় কেন, সত্যই তাই। কর্ত্তাও বোলেছিলেন, নরহরিবাবুও বারংবার বোলে গিয়েছেন, "সে রাত্রে কষ্টের কথা ভুলে যেয়ো, কোথাও গল্প কোরো না।" সত্যই তাই। কেন আমি গল্প কোরবো ? পরের ঘরের কথা পরের কাছে বলা কখনই আমার অভ্যাস নয় ; মনের কথা মনেই রয়ে গেছে ; গল্পে আমার দরকার কি ? গরিব আমি, গরিবের মত থাকাই আমার পক্ষে ভাল।

বেলা আটটা কি নটা। বড়বাবু গঙ্গাস্নানে যাবেন, আমারেও সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তাঁর সঙ্গে একটা বড় রাস্তায় উপস্থিত হোলেম। রাস্তার নাম চিৎপুর রোড। বড়বাবু বোল্লেন, "জগন্নাথ-ঘাটের চেয়ে আহীরি-টোলার ঘাট ভাল, সে ঘাটে ভিড় কম, সেই ঘাটেই যাওয়া যাক।" সেই ঘাটেই আমরা চোল্লেম। রাস্তায় ভারী ভিড়। ঘোড়ার গাড়ীর ভিড়, গরুর গাড়ীর ভিড়, হাঁটা-লোকের ভিড়, রাস্তা প্রায় দুর্গম। গাড়ীও অগণিত, মানুষও অগণিত। দুধারেই বাড়ী, দুধারেই দোকান। দেখতে দেখতে আমি চোল্লেম। এক জায়গায় খানকতক গাড়ী এদিক ওদিক ফিরি কোরে বেড়াচ্ছে, গাড়োয়ানেরা "কাশীপুর, বাবু কাশীপুর, চোলতি বল্লগর" বোলে চীৎকার কোরে হাঁকছে ; কথা বুঝতে না পেরে বাবুকে জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, সহরের উত্তরে কাশী-পুর বরানগর নামে পল্লী আছে, ভাগাভাগি গাড়ী কোরে কাজের লোকেরা সেই-দিকে যায়, সেই জন্য ঐ সকল গাড়ী ঐ রকমে ঐ জায়গায় বেড়ায়। লোকের সুবিধা বেশ।

সে দিন কি একটা যোগ ছিল। গঙ্গার পথে, গঙ্গার ঘাটে স্ত্রী-পুরুষের বেশী জনতা। এক জায়গায় তত স্ত্রীলোক কখনো আমি দেখি নাই। ঘাটে ঘাটে দাঁড়া, বসা, শোয়া, চলা, গানকরা ভিকারীও বিস্তর। আরো শুনলেম,

দিনের বেলা গঙ্গাস্নানের যোগে ঐ রকম ভিড়ের ভিতর অনেক গাঁটকাটাও বেড়ায়। দুষ্টলোকে সকল কাজেই হুজুগ চায়। দুষ্কার্য্য বেশ চলে, পুলিশ প্রায় কিছুই কোত্তে পারে না।

আহীরিটোলার ঘাটে স্নান কোরে আমরা বাড়ীতে ফিরে এলেম। নানা কাজে দিনমান কেটে গেল। সন্ধ্যার পর আমি কর্ত্তাবাবুর বৈঠকখানায় নিষ্কর্ম্মা হয়ে বোসে থাকলেম। কর্ত্তা তখন বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, সে ঘরে আর কেহই ছিল না, আমি একাকী। এইখানে বাবুদের সংসারের কথা আর একটু বলি। প্রতাপবাবুর জমীদারী নাই ; সহরে পাঁচ সাতখানি বাড়ী আছে, ভাড়া চলে ; বাহির অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড জমীজায়গা আছে, গোলপাতার ঘর বেঁধে ইতরজাতীয় প্রজালোক বাস করে, ভেড়া রাখে, মহিষ রাখে, দোকান করে ; তাদের কাছেও বাবু অনেক টাকা খাজনা পান ; তা ছাড়া কোম্পানীর কাগজ ; ছমাস অন্তর সুদ আসে, বেশ সচ্ছলে সংসার চলে। বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়, অপরাপর ক্রিয়াকর্ম্মও প্রায় বাদ যায় না। সকল পার্ব্বণে ঘটা হয় না, সকলে জানতেও পারে না, দুর্গোৎসবে কিছু ঘটা হয়।

বড়বাবু আর ছোটবাবু উপরের বৈঠকখানায় বসেন না, তাঁদের জন্য নীচের তালায় দুটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৈঠকখানা আছে। ভাই-দুটীতে বেশ ভাব। স্বতন্ত্র বৈঠকখানা থাকলেও তাঁরা দুজনে প্রায়ই এক ঘরে বোসে থাকেন। খোস-গল্প হয়, তাসখেলা হয়, বই পড়া হয়, বেশ আমোদ। দুজনেই তামাক খান না, কোন উৎপাত নাই। বোলেছি, ভালবাসা পাওয়া আমার অদৃষ্টের একটী সুফল ; বাবুরা দুজনেই আমাকে ভালবাসেন ; কথায় বার্ত্তায়, আদর-যত্নে, ঠিক যেন সহোদরের মতন ভাব ; ভাবের বিনিময়ে আমিও তাঁদের আজ্ঞাকারী। বাবুরা যখন আমারে ডাকেন, আমি তখন তাঁদের বৈঠকখানায় গিয়ে বসি, তাঁরা আমারে কত কথাই জিজ্ঞাসা করেন, বেশী কথা আমি কি জানি, সকল কথার উত্তর দিতে পারি না, পরিচয়ের কথায় বোবা হই, তাঁরা পরস্পর মুখ-চাহাচাহি কোরে গম্ভীরভাব ধারণ করেন।

বড়বাবুর নিজের একটী গাড়ীঘোড়ার কারবার আছে। নীলামে অল্পদরে সাহেববাড়ীর গাড়ী-ঘোড়া কিনে, সুবিধা বুঝে বেশী দামে বিক্রয় হয়, সে কারবারে বৎসর বৎসর বেশ দশ টাকা আয় হয়ে থাকে। বড়বাবুর হাত কিছু দরাজ, দশ টাকা খরচপত্র আছে, কিছু কিছু ব্যয় করাও আছে ; আমোদগুলি কিন্তু নির্দ্দোষ। ছোটবাবু কিছু কৃপণ ; নিজ খরচের জন্য পিতার কাছে মাসে মাসে তিনি ১০০৲ টাকা পান, অতি অল্পই খরচ হয়, বাকী টাকাগুলি তিনি তেজারতিতে খাটান ; বয়স অল্প, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি বেশ। যাতে কোরে টাকা জমে, সেই দিকেই তাঁর অধিক ঝোঁক।

আরো একমাস গেল। শ্রাবণ মাস। বাবুর বাড়ীতে প্রতিমা গড়া আরম্ভ হলো। দুর্গাপ্রতিমা কখনো আমি দেখি নাই ; পঞ্জিকায় ছবি দেখেছি, মাটীর গড়ন কেমন হয়, সেটী দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই ; এইবার বোধ হয় ঘোটবে, এইরূপ আশা জন্মিল। খড়বাঁধা থেকে মাটীর কাজ পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য আমি দর্শন করি। দিন যেতে লাগলো, মাস যেতে লাগলো, শ্রাবণ-

ভাদ্র বিদায় হলো, আশ্বিনমাস আগত। শরৎকাল। সুখের শরৎ। বসন্ত-ঋতুর ন্যায় বৎসরের এই ঋতুটীও অতি সুন্দর। শীত-গ্রীষ্ম থাকে না, বৃষ্টিও বেশী হয় না, পথে-ঘাটে বড় একটা কাদা থাকে না. সুখের শরৎকাল। পল্লী-গ্রামে থাকলে এই ঋতুর বেশী মহিমা অনুভব করা যায়। উদ্যানে উদ্যানে শেফালিকা, কামিনী, মল্লিকা আর যুথি-যাঁতি প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সরোবরে পদ্মফুল ফুটে. সূর্য্যের তেজ বেশী থাকে না. আকাশ নির্ম্মল হয়, চন্দ্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, দেশের কবিরা শরচ্চন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা কীর্ত্তন করেন।

প্রতিমায় রং করা. চিত্র করা আরম্ভ হলো। নিত্য নিত্য মা দুর্গার নূতন রূপ আমি দর্শন করি। কৃষ্ণনগরের কারিকর ; প্রধান কারিকরের নাম রামচরণ পাল। মুখ কখানি গড়া. রং-ফলানো আর চিত্র করা ব্যতীত অপরাপর কার্য্য রামচরণ স্বহস্তে কিছুই করে না, তাঁবেদারেরাই ওস্তাদের উপদেশমতে দস্তুর-মত সে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। রামচরণ পাল সৌখীন লোক ; ফর্সা ফর্সা কোঁচানো কাপড় পরে, ভাল ভাল জামা গায়ে দেয়. দিল্লীর নাগোরা ব্যবহার করে, কোথাও যাবার সময় ছাতা-ছড়ি সঙ্গে রাখে ; দক্ষিণ হস্তে একখানি ইষ্ট-কবচ, বামহস্তের বাহুমূলে চারি-পাঁচটী ঠাকুরের মাদুলী, গলায় ছোট ছোট মাদুলী-গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালা ; বেশ মানায়। চেহারাও মন্দ নয়, অল্প শ্যামবর্ণ, মুখেরও চটক বেশ. বয়স আন্দাজ ৫৫ বৎসর। বাবুসজ্জার প্রায় সকল অঙ্গই আছে, রামচরণ কিন্তু চুল ফিরায় না : পাকা গোঁফ. চুলগুলিও অনেক পাকা, কাঁচা-পাকায় মিশানো. দেখায় বেশ। সতরঞ্চখেলায় রামচরণের বিশেষ নৈপুণ্য, বাড়ীর কর্ত্তাবাবুও সতরঞ্চখেলা ভালবাসেন ; রামচরণের সঙ্গেই প্রতিদিন বৈকালে সতরঞ্চখেলা হয় ; প্রায় সকল বাজীতেই বাবু হারেন. রামচরণের জিত। বাবু কিন্তু হেরে হেরেও অট্ট অট্ট হাস্য করেন. রাগ করেন না, বরং আরো খেলার উপর বেশী ঝোঁক হয়।

প্রতিমা চিত্র করা হয়ে গেল। মহালয়া অমাবস্যার দিন দুজন মালী এসে সপরিবার মা দুর্গাকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে দিলে, কেবল কার্ত্তিকের গোঁফ-চুল আর অসুরের গোঁফ-চুল-ভ্রূ বাকী থাকলো, সে কাজগুলি রামচরণের। ষষ্ঠীর পূর্ব্বদিন রামচরণ কার্ত্তিক-অসুরকে পূর্ণাঙ্গ কোরে দিল. ষষ্ঠীর রাত্রে অধিবাস হয়ে গেল. তার পর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, তিনদিন মহাপূজা। দুর্গাপূজা কখনো দেখি নাই, নূতন দেখলেম ; হৃদয়ে ভক্তির উদয় হলো, তিনদিন তিন তিনবার সাষ্টাঙ্গে ভক্তিভাবে প্রতিমা-সমীপে প্রণিপাত কোল্লেম। অনেক লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল, নিমন্ত্রিত লোকেরা ঘটের কাছে প্রণামী দিয়ে, প্রতিমাকে প্রণাম কোরে, কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে যথাযোগ্য প্রিয়সম্ভাষণ কোল্লেন, অনন্তর যাঁর যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ আহারাদি কোরে বিদায় হোলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ী, ছোট খাট অন্নক্ষেত্র হয়েছিল, কতক লোক অন্ন-প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল।

দশমীতে নিরঞ্জন। কলিকাতায় দুর্গা-প্রতিমা অনেক হয়। বৈকালে নূতন কাপড় পোরে, বাবুদের সঙ্গে আমি বিসর্জ্জন দেখতে বেরুলেম। কলিকাতায়

প্রতিমা-বিসর্জ্জনে যেরূপ সমারোহ, দেখে আমার তাক লেগে গেল! চক্ষে না দেখলে সে সমারোহ ব্যাপার অক্ষরে লিখে অথবা মুখের কথায় বোলে অপর-লোককে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না, সে বর্ণনায় আমি অক্ষম, সুতরাং ক্ষান্ত থাকতে হলো। গঙ্গাজলে দুর্গা-বিসর্জ্জন। অনেক ঘাটেই বিসর্জ্জন হয়, তন্মধ্যে নিমতলাঘাটেই বেশী।

বিসর্জ্জনের পর বাড়ীতে ফিরে এসে বিল্বপত্রে দুর্গানাম লেখা, প্রসাদী-সিদ্ধি পান করা এবং পরস্পর প্রণাম, আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলালিঙ্গন সমাপ্ত করা হলো। এই প্রথাটীও আমার নূতন দেখা, নূতন জানা।

বঙ্গের প্রধান পর্ব্ব দুর্গাপূজা। বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতির এমন পর্ব্ব আর নাই। বৎসরের মত দুর্গাপূজা ফুরিয়ে গেল। আশ্বিনমাস প্রায় শেষ। ছয় মাস আমি কলিকাতায়। রাস্তাঘাট অনেক জানা হয়েছিল, বিসর্জ্জনের পাঁচদিন পরে, কোজাগর-পূর্ণিমার দিন বৈকালে আমি একাকী চিৎপুর রোডে বেড়াতে বেরিয়েছিলেম। বৈকালে এ রাস্তায় আমি একদিনও আসি নাই। অন্যদিন অন্য সময়ে এ রাস্তায় যে রকম ভিড় আর যে রকম শোভা দেখি, আজো সব সেই রকম, কেবল একটা শোভা আজ আমার চক্ষে নূতন। গরাণহাটা থেকে কলুটোলা-রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেম, দুধারি বারান্দায় বারান্দায় রকমারি মেয়েমানুষ। রকমারি বর্ণের কাপড়পরা, রকমারি ধাতুর গহনাপরা, রকমারি ধরণের খোঁপাবাঁধা, অনেক রকম মেয়েমানুষ। কেহ কেহ টুলের উপর বোসে আছে, কেহ কেহ চেয়ারে বোসেছে, কেহ কেহ রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রূপা-বাঁধা হুঁকায় তামাক খাচ্ছে, কেহ কেহ রেলিঙের উপর বুক রেখে ভানুমতী-ধরণের মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে ঝুলছে ; কারো বুকে রংদার কাঁচুলী, কারো কারো মুখে রংমাখা, কারো খোঁপা নাই, পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘবেণী, কেহ কেহ এলোকেশী। কারা এরা ? লোকমুখে শুনেছিলেম, কলিকাতা সহরে বেশ্যা অনেক ; যে সকল পণ্ডিত সাধুভাষায় কথা কন, তাঁরা বলেন, বেশ্যা মানে নগরবিলাসিনী বারাঙ্গনা ; সুখবিলাসী মতিচ্ছন্ন যুবা-দলের চিত্তমোহিনী-বিলাসিনী ; এরা সব জঘন্য বিলাস-রসিক যুবাপুরুষের ইহকাল পরকাল ভক্ষণ করে। চিৎপুর রোডে দাঁড়িয়ে পূর্ব্বের সেই শোনা-কথাটা আমার মনে পোড়লো ; স্থির কোল্লেম, এরাই তবে সেই সকল যুবক-নাশিনী বিলাসিনী বারাঙ্গনা। দেখেই আমি চোম্‌কে উঠলেম। সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিলে। নগরের বিলাসিনীরা স্ত্রী-জাতিসুলভ লজ্জাসম্ভ্রমের মস্তকে পদা-র্পণ কোরে, হেসে হেসে সদররাস্তার ধারে বাহার দিচ্ছে! আকার-অবয়বে ঠিক মানবী, কিন্তু ব্যবহারে এরা দানবী—পিশাচী! কলিকাতা সহর কলুষে পরি-পূর্ণ! সিঁতিকাটা, গন্ধমাখা, সাজপরা ফুলবাবুরা রাস্তা দিয়ে চোলে যাচ্ছেন, চক্ষু আছে ঊর্দ্ধ দিকে! বারান্দার চক্ষুরা তাঁদের দিকে ঘুরে ঘুরে ঘন ঘন কটাক্ষবাণ সন্ধান কোচ্ছে। সহরের একজন পক্ষীকবি এই সব কাণ্ড লক্ষ্য কোরে এক মজলীসে বোলেছিলেন, "বারান্দার ঐ চক্ষুগুলি পাখীধরা ফাঁদ ; পুরুষের মন মাতাবার মোহনমন্ত্রের বাঁশী!" আমারো মনে হলো, যথার্থই তাই!

চিৎপুররোড এই সকল ফাঁদে আচ্ছন্ন। এ রাস্তাটায় গৃহস্থলোকের বাস

একেবারে নাই বোল্লেই হয়। থাকলেই বা কি হতো? কলিকাতার বেশ্যা-নিবাসের প্রণালীটী অতি জঘন্য। গৃহস্থের বাড়ীর কাছে বেশ্যা, ছেলেদের পাঠশালার পাশে বেশ্যা, ডাক্তার-কবিরাজের আবাসের পাশে বেশ্যা, কোথাও বা ভালমানুষের মাথার উপর বেশ্যা; অধিক কথা কি, ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেশ্যা। যে সহরের এমন দশা, সে সহরের পরিণাম কি হবে, সহরবাসী ভদ্রলোকেরা সেটা কি একবারও চিন্তা করেন না? ইংরেজীতে যাঁরা যাঁরা পণ্ডিত হয়েছেন, সগৌরবে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে বলেন, "যেখানে সহর, সেই-খানেই পাপ। সহরমাত্রেই বেশ্যা বেশী, মদ বেশী, বদমাস বেশী, রাজধানীতে আরো বেশী। রাজধানীতেই পাপের রাজত্ব। এ সকল পাপের নাম উপকারী পাপ; প্রয়োজনীয় পাপ। এ সকল পাপ না থাকলে কোন দেশেই সহর চলে না।"

না চলাই ভাল। সর্ব্বনাশকর পাপের অভাবে সহর যদি না চলে, তবে সহরে আমাদের কাজ কি? সহরের উপর আমার ঘৃণা হলো। কলিকাতায় আর বেশী দিন থাকবো না, মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কোল্লেম। পথিক পুরুষেরা রাস্তা দিয়ে চোলে যায়, বারান্দার দিকে চক্ষু থাকে, উপরে নীচে রসিকতা বর্ষে, গাড়ী-ঘোড়ার ধাক্কায় আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙতে পারে, তেমন তেমন হোলে, প্রাণ যেতেও পারে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও থাকে না। এমন সহরে কি থাকতে আছে? কখনই থাকবো না। মনের ঘৃণায় এইরূপ সঙ্কল্প কোরে বাড়ীর দিকে আমি ফিরে চোল্লেম।

বীরভূমের নরহরিবাবু যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে আমার মনিববাড়ী যেতে হয়। সেই পথ দিয়ে আমি যাচ্ছি, দেখলেম, সেই বাড়ীর দরজা খোলা। মনে কোল্লেম, নরহরিবাবু এসেছেন। সূর্য্য তখনও অস্ত যান নাই, অল্প অল্প বেলা ছিল, আশায় আশায় সেই বাড়ীর ভিতর আমি প্রবেশ কোল্লেম; উপরে গিয়ে উঠলেম; দুই-একজন চাকর আমার সম্মুখ দিয়ে চোলে গেল, আমাকে দেখে কিছুই বোল্লে না, আমিও কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম না; সরাসর একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। ঘরে এক-খানি চেয়ারের উপর একটী বাবু। বেশ বাবুটী। দিব্য সুপুরুষ। বাবরী চুল, দিব্য গোঁফ, দিব্য চক্ষু, দিব্য বুকের ছাতি, বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। আমারে দেখেই বাবু চকিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি? কি চাও?"

বাবুটীর ভাবভঙ্গী আর কণ্ঠস্বর যে প্রকার, দেখলে শুনলে উত্তর কোত্তে ইচ্ছা হয় না, তথাপি আমি ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম, "চাই না কিছু, আমি হরিদাস; নরহরিবাবু এসেছেন কি না, জানতে এসেছি।"

পূর্ব্ববৎ তীব্রস্বরে বাবু বোল্লেন, "কেন? তার কাছে তোমার কি দর-কার? তিনি এখন আসবেন না, পৌষমাসের শেষে আসবেন।"

আর আমি কথা কইলেম না, সেখানে আর দাঁড়ালেমও না, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, একজন চাকর উপরে উঠছিল, তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বাবুটীর নাম কি? চাকর বোল্লে, কানাইবাবু, বীর-ভূমের বাগেশ্বরবাবুর ভাগ্নে।

শিউরে উঠে, অবাক হয়ে আমি নেমে এলেম। তখন আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হলো, অন্তর্যামীই জানতে পাল্লেন।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমি মনিববাড়ীতে এসে পৌঁছিলেম। কোজাগরি-পূর্ণিমা। পাড়ার একজন আত্মীয়ের বাড়ীতে মা লক্ষ্মীর প্রতিমা হয়, নিমন্ত্রণ আছে, প্রদোষেই পূজো, বাবুরা সেই বাড়ীতে গিয়েছেন, আমি এসে বড়বাবুর বৈঠকখানায় বোসলেম। ভাবনা আমাকে পরিত্যাগ কোরে যেতে চায় না। অন্য-মনস্ক হবার জন্য যতই চেষ্টা করি, ততই নূতন নূতন ভাবনা এসে জোটে। মিছামিছি পরের জন্য কেন ভাবনা, তাও আমি বুঝতে পারি না। নরহরিবাবুর তত্ত্ব নিতে গিয়ে শুনে এলেম, কানাইবাবু। মনটা ঝাঁৎ কোরে উঠলো। যে রাত্রে আমি মেয়েমানুষ সেজে পালাই, নূতন লোকের হাতে ধরা পড়ি, সেই রাত্রে বাণেশ্বরবাবুর চাকরেরা হাসির তুফান তুলে যে কানাইবাবুর নাম কোরেছিল, এই সেই কানাইবাবু! ইনি বাণেশ্বরবাবুর ভাগ্নে হন, ইনি আপন মাতুলকন্যাকে কুলকলঙ্কিনী কোরেছেন, অন্যলোকের দ্বারা কৌশলে সেই কন্যাটিকে ঘরের বাহির কোরেছেন! সে রাত্রে সেখানে কানাই-বাবুকে আমি দেখি নাই, কলিকাতায় দেখলেম। মুখের ভাব আর কথার ভাব যে রকম, তাতে কোরে বিশ্বাস হলো, সত্যই তিনি সেই পাপকার্য্যের নায়ক! বাহাদুর পুরুষ বটে! নায়িকাটীকে কলিকাতায় এনেছেন কি না, বলা যায় না ; অনুমানে বোধ হয়, এনে থাকবেন। কলিকাতা সহর যে রকম জায়গা, ঐ প্রকার কার্য্যের সুবিধাই এখানে বিস্তর। কে কোথায় কি ভাবে আছে, কি ভাবে থাকে, অন্যলোকে কিছুই জানতে পারে না ; পোষাক-পরিচ্ছদে, কথার আলাপে, বাহিরে বেশ ভদ্রলোক, ভিতরে ভিতরে নরককুণ্ড!

এই সব আমি ভাবছি, বড়বাবু এলেন ; এসেই আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে পূজাবাড়ীতে গেলেন। লক্ষ্মীপূজা দেখা হলো, সেইখানে মা লক্ষ্মীর প্রসাদ পাওয়া হলো, বাড়ী আসা হলো না। রাত্রে সেই বাড়ীতে লক্ষ্মী-মঙ্গল যাত্রা ছিল, সমস্ত রাত্রি আমরা সেই যাত্রা শুনলেম। কোজাগরের নিশা-জাগরণে লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়, যাত্রার কল্যাণে আমাদের বেশ আমোদ-আহ্লাদে পূর্ণিমার যামিনী পরিযাপিত হলো।

প্রভাতে বাবুদের সঙ্গে আমি বাড়ী এলেম। স্নানাহারান্তে রাত্রিজাগরণের ক্লান্তিদূরকরণার্থে বাবুরা নিদ্রা গেলেন, আমার নিদ্রা নাই। দিবানিদ্রায় দোষ আছে, সেইজন্য আমি দিনমানে নিদ্রা যাই না, পাঠকমহাশয় এমন কথা মনে কোরবেন না ; শরীর রক্ষার শাস্ত্রসম্মত নিয়মগুলি পালন আমার মত পরি-ব্রাজকের পক্ষে অসম্ভব ; সকল দিন রাত্রিকালেই বেশীক্ষণ নিদ্রা হয় না, দিনমানে নিদ্রা তো বহু দূরের কথা। কেন এমন হয়? যার হৃদয়ে অহরহঃ চিন্তা-রাক্ষসী খেলা করে, যার মনে অজ্ঞাতকারণে সদাসর্ব্বদা নানা আশঙ্কা, একটা আশ্রয়হারা হোলে রজনীপ্রভাতে কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো, যার মনে প্রতি রজনীতে এই দুঃসহ অনিশ্চিত ভাবনা, তার প্রতি কি বিরাম-দায়িনী নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহ হয়? আমার অবস্থাও সেইরূপ। আমার প্রতি নিদ্রাদেবীর কৃপা হয় না, সেই জন্য আমার নিদ্রা নাই।

আমি জেগে আছি। বড়বাবুর বৈঠকখানার সম্মুখদিকের একটী দরজা খোলা আছে, তক্তপোষের বিছানার ধারে সেই দরজার কাছে আমি বোসে আছি। বেলা প্রায় পাঁচটা। আশ্বিনমাসে বেলা যখন পাঁচটা বাজে, তখন ঠিক এক ঘণ্টা বেলা থাকে। সেই ঘরেই বড়বাবু নিদ্রিত ; তখনো নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সহসা "বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন-কুঞ্জকানন বিহারী। বংশীবদন রাধিকারমণ শ্রীমুকুন্দ মুরারি॥" উচ্চকণ্ঠে এইরূপ গান কোত্তে কোত্তে পাঁচজন সন্ন্যাসী সেই-খানে এসে দাঁড়ালো। সন্ন্যাসিদের চীৎকারধ্বনিতে বড়বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল ; তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছতে মুছতে তিনি বিছানার উপর উঠে বোস-লেন। বাবুকে দেখে সন্ন্যাসীরা কত রকম ভঙ্গীতে কত কথাই বোলতে লাগলো, কত রকম সুরে শ্রীরাধাবল্লভের কত রকম ভজন-গীত গাইতে লাগলো, সব কথা আমি মনে কোরে রাখতে পাল্লেম না ; একদৃষ্টে কেবল সন্ন্যাসিদের আকার-অবয়ব আর চমৎকার ভাবভঙ্গী দর্শন কোত্তে লাগলেম।

পঞ্চ সন্ন্যাসী। পাঁচজনেই প্রায় সমবয়স্ক ; কারো বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক বোধ হলো না। দুজন গৌরবর্ণ, দুজন শ্যামবর্ণ, একজন কৃষ্ণবর্ণ। লক্ষণে বুঝলেম, তারা পাঁচজনেই কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী। সচরাচর সন্ন্যাসিদের দুই শ্রেণী ;—শিব-সন্ন্যাসী আর কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী। পথে পথে যারা বেড়ায়, তাদের মধ্যে শিব-সন্ন্যাসীই অধিক, কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী অল্প ; লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন। শিব-সন্ন্যাসীরা শিব সাজবার ভাব দেখায় ; সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখে, মস্তকে জটা রাখে, রঙ দিয়ে মুখ-চক্ষু চিত্র করে, বাঘছাল পরে, বাঘছালের বদলে কেহ কেহ কৌপীন ধারণ করে, কেহ কেহ উলঙ্গ। শিব ত্রিশূলধারী, ত্রিশূলের বদলে সন্ন্যাসীর দক্ষিণ হস্তে দণ্ড ধরে, ডমরুর বদলে বামহস্তে কমণ্ডলু : এক একজনের হাতে গলায় রুদ্রাক্ষমালা, এক একজনের মালাভরণ থাকে না। মুখে থাকে হর্ হর্ বম্ বম্। ভেকধারিদের অনেক রকম ভেক থাকতে পারে, তিনটী মাত্র অভাব থাকে। মহাদেবও ত্রিনয়ন, চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, মহাদেবের কণ্ঠে হলাহল, মহাদেবের অঙ্গে মস্তকে বিষধর সর্প। সন্ন্যাসীরা কপালের উপর চক্ষু ফুটাতে অক্ষম, বিষ খেয়েও নীলকণ্ঠ হোতে অক্ষম, ফণী ধারণ কোরে ফণিভূষণ হোতেও অক্ষম। রোগা রোগা সন্ন্যাসী ছাড়া মোটা মোটা সন্ন্যাসীরা ভোলানাথের মত ভুঁড়ি বাড়াবারও চেষ্টা করে।

কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী সে রকম নয়। শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে কেহ কেহ ইচ্ছা রাখে, সর্ব্বাংশে কৃতকার্য্য হয় না। কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী জটা রাখে না, ভস্ম মাখে না, বাঘছাল পরে না, রুদ্রাক্ষ ধরে না, সে ভাবের কিছুই করে না। জটার বদলে স্ত্রীলোকের মত দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ কপালের উপর খোঁপার আকারে চূড়া কোরে বাঁধা (অভাব ময়ূরপুচ্ছের), ভস্মবিভূতির বদলে সর্ব্বাঙ্গে হরিমৃত্তিকার ছাপ-কাটা, বাঘছালের বদলে গেরুয়া, বহির্ব্বাসের বদলে গৈরিক নামাবলী, কেহ কেহ কৌপীনধারী, বাঁশরীর বদলে গোপীযন্ত্র, কেহ কেহ শূন্যহস্ত, রুদ্রা-ক্ষের বদলে তুলসীমাল্য, কেহ কেহ শূন্যকণ্ঠ। শিব-সন্ন্যাসীরা গাঁজা খায়, কৃষ্ণ-সন্ন্যাসীরা প্রায়ই গাঁজা খায় না। দুই দলে এই সকল প্রভেদ। দুই দলের মধ্যে ভণ্ডসন্ন্যাসী অনেক, আমি ছেলেমানুষ, আমি সে পরিচয় না দিলেও

বহুদর্শী সুবিজ্ঞ পাঠক-মহাশয়েরা মনে অবশ্যই সে বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারবেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রসাদে যাঁরা কৌপীনধারী বৈষ্ণব, তাঁরা এই কৃষ্ণ-সন্ন্যাসিগণের অন্তর্গত কি না, সে বিচারেও আমি অসমর্থ।

আমাদের সম্মুখে পঞ্চ সন্ন্যাসী। বাহ্যলক্ষণে পাঁচজনেই কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীগুলির রূপ ভাল। যে দুটী গৌরবর্ণ, তাদের চেহারা আরো বেশী সুন্দর। আমাদের বড়বাবু শক্তিভক্তির সঙ্গে সনাতনী বিষ্ণুভক্তি হৃদয়ে ধারণ করেন, বাড়ীতে সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন দিলে আদরযত্নে তিনি তাঁদের সেবা করেন, কর্ত্তাও তাতে উৎসাহ দেন। সন্ন্যাসিদের উপর ছোটবাবু বড় চটা। ছোটবাবু সেদিন তখন সেখানে ছিলেন না, বড়বাবু আমোদ কোরে সন্ন্যাসিদের গান শুনলেন, শ্লোক শুনলেন, বৃন্দাবন-মথুরার গল্প শুনলেন, শুনে শুনে খুসী হয়ে পাঁচজনের হাতে পাঁচটী টাকা দিলেন ; সন্ন্যাসীরা মিলিতকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কোল্লে।

টাকা বড় চমৎকার জিনিস। "লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়, পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথায় এড়ায় ?" কবিবর ভারতচন্দ্রের এই কটী কথা অখণ্ডনীয়। পাঁচ টাকা হাতে পেয়ে সন্ন্যাসিদের লোভ বেড়ে উঠলো ; তারা তখন আপনাদের বেশী বেশী গুণপনা জাহির কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। এ ধরণের সন্ন্যাসিদের যেমন যেমন দস্তুর সেই রকমে একজন সন্ন্যাসী বোলতে লাগলো, "হরেক রকম ঔষধ রাখি। বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়, তামা ছুঁলে সোণা হয়, সোণা ছুঁলে হীরা হয়, বেদামী জিনিস যা কিছু দিবে, তার বদলে বহুতর মহামূল্য জিনিস পাবে, বড় বড় চিকিৎসকেরা মানুষের যে সকল ব্যাধি অসাধ্য বলে, একদিনের মধ্যে সে সকল ব্যাধি আমরা নির্ম্মূল কোরে দিতে পারি। আমাদের ঔষধের গুণে হারানিধি পাওয়া যায়, নিরুদ্দেশ প্রবাসী ঘরে আসে, অপ্রিয়জন প্রিয় হয়, অবাধ্যেরা বশীভূত হয়, রাগী লোক ঠাণ্ডা হয়, ব্যবসাবাণিজ্যে প্রচুর লাভ হয় ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কলিকাতা সহরে এ সকল বুজরুকী বড় একটা খাটে না, তথাপি মেয়ে-মহলে খুব খাটে। সন্ন্যাসীর কথা শুনে বড়বাবুর মুখের ভাব আর এক প্রকার হয়ে এলো ; মনে যেন ঘৃণা জন্মিল ; তাচ্ছীল্যভাবে তিনি বোল্লেন, "হাঁ, হাঁ, দ্রব্যগুণে সব হয়, দেবতাদের কৃপায় সব সিদ্ধ হয়, ভগবানের সৃষ্টিতে কিছুই অসম্ভব নয়। আর একদিন আসবেন, একটা একটা পরীক্ষা কোরে দেখা যাবে।"

ফুল্লমুখে জয় উচ্চারণ কোরে সন্ন্যাসীরা বিদায় হলো, সে দিন আর অন্য ঘটনা কিছুই হলো না। বাবুরাও কোথাও গেলেন না, আমিও কোথাও বেরুলেম না। লক্ষ্মীবিসর্জ্জনে ঘটা হয় না, দূরে দূরে দুই একটা বিসর্জ্জনের বাদ্যধ্বনি শুনা গেল, তার পর সমস্তই চুপচাপ। নিয়মিত কার্য্যান্তে নিদ্রা, নির্ব্বিঘ্নে রজনীপ্রভাত।

সন্ন্যাসীরা নিত্য নিত্য দেখা দেয়, নাচে, গায়, শ্লোক পড়ে, কেচ্ছা ঝাড়ে, নিত্যই নূতন রঙ্গ। এক বাড়ীতে নয়, পাড়ায় পাড়ায় দশবাড়ীতে বেড়ায়, যেখানে সুবিধা পায়, সেইখানে বুজরুকী জানায়, শক্তলোকের কাছে জায়গা

পায় না। লক্ষ্মীপূজার পর এই রকমে একমাস কেটে গেল। স্মরণ কোত্তে পারা যায়, এই একমাসের মধ্যে তেমন বিশেষ ঘটনা কিছুই হলো না। আমি শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতা-পরিত্যাগের সঙ্কল্প কোরেছিলেম, বাড়ীর পরিবারদের অনুরোধে ক্রমশই বিলম্ব হোতে লাগলো। একদিন সকালবেলা বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় সবে মাত্র আমি বেরিয়েছি, খানিক দূরে ভারী একটা গোলমাল উঠলো। কিসের গোলমাল, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। রাস্তা দিয়ে অনেক লোক ছুটে ছুটে যাচ্ছে, "কোথায় খুন ?—কোথায় খুন ?—কোন বাড়ীতে খুন ?" এই সব কথা বোলছে আর ছুটছে। খুনের কথায় ভয় পেয়ে ছুটে আমি বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেম, বাবুদের কাছে সেই সব কথা বোল্লেম। লোকের বিপদে সম্পদে অগ্রসর হওয়া বড়বাবুর চিরদিন অভ্যাস, শশব্যস্তে তিনি একটা জামা গায়ে দিয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে বাড়ী থেকে বেরুলেন ; জামার বোতাম দিবার অবসর হলো না, যেদিকে গোলমাল হোচ্ছিল, রাস্তার লোকেরা যেদিকে ছুটছিল, অত্যন্ত দ্রুতপদে তিনি সেই দিকে যেতে লাগলেন। তখন একটু সাহস পেয়ে আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! যে বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা হয়েছিল, সেই বাড়ীর দরজার সম্মুখেই ভয়ঙ্কর গোলমাল। বহুলোক একত্র জমায়েত, পুলিশ জমায়েত, রৈ রৈ কাণ্ড ! সেই বাড়ীতেই খুন ! অন্দরমহলে কর্ত্তার একটী কন্যার ঘরে রেতের বেলা খুন হয়েছে ! কি রকমে কি হলো, কিছুই ঠিকানা হোচ্ছে না।

অগ্রে একটু পরিচয় আবশ্যক, তার পর খুনের বৃত্তান্তটা আলোচনা করা যাবে। বাবুর নাম বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বরবাবুর এক পুত্র, তিন কন্যা। পুত্রের নাম হরিবিলাস, কন্যাদের নাম নিতম্বিনী, কাদম্বিনী সৌদামিনী। তিনটী কন্যাই বিবাহিতা, তিনটীই সধবা। সৌদামিনী সর্ব্বকনিষ্ঠা। সৌদামিনী পূর্ণযুবতী, দিব্য সুন্দরী, বয়স ১৮।১৯ বৎসর। বিবাহ হয়ে অবধি সৌদামিনী কখনো শ্বশুরবাড়ী যায় নাই। পূর্ব্বদেশে শ্বশুরবাড়ী ; শ্বশুর গরিব, স্বামী মূর্খ, তাতে দূরদেশ, এই কারণেই সৌদামিনী চিরদিন বাপের বাড়ীতেই থাকে। বৎসরে দুই একবার স্বামী আসে, মান পায় না, আদর পায় না, দু-পাঁচদিন থেকেই চোলে যায়। সৌদামিনীর সন্তান হয় নাই, কিন্তু সন্তানকামনায় সৌদামিনী অনেক রকম ব্রত করে, ঠাকুর-দেবতাদের কাছে মানতি করে, নানা রকম ঔষধ খায়, সন্তান হয় না। সেই সৌদামিনীর ঘরেই খুন হয়েছে !

কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিবিলাসবাবু বেহার অঞ্চলের একজন মুন্সেফ, দুর্গাপূজার ছুটীতে বাড়ী এসেছিলেন, শ্যামাপূজার পরেই চোলে গিয়েছেন। বাড়ীতে কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা হয়, সেই উপলক্ষে নিতম্বিনী আর কাদম্বিনী আশ্বিনমাসে পিত্রালয়ে এসেছিলেন, লক্ষ্মীপূজার পরেই চোলে গিয়েছেন। বিশ্বেশ্বরবাবুর স্ত্রী নাই, সুতরাং সৌদামিনীই এখন এই বাড়ীর গৃহিণী। সঙ্গিনী কেবল একজন দাসী আর একজন পাচিকা ব্রাহ্মণী। বিশ্বেশ্বরবাবু তাদৃশ বড়মানুষ নন, মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ মাত্র, পুত্রের উপার্জ্জনেই সংসার

চলে, সম্ভবমত ক্রিয়াকর্ম্ম হয়। রাত্রিকালে মেয়েমানুষের ঘরে খুন, ভয়ানক ব্যাপার!

পুলিশের তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। পুলিশের লোকেরা বাজে দর্শকগণকে তাড়া-হুড়া দিয়ে তফাত কোরে দিচ্ছে; সেই সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হোলেম। আমাদের বড়বাবুটী পুলিশের লোকের চেনা, বাড়ীর ভিতর যেতে তারা তাঁকে বারণ কোল্লে না. আমি বড়বাবুর সঙ্গেই গিয়েছিলেম, বাবুর খাতিরে অবাধে আমিও যেতে পেলেম; গিয়ে শুনলেম, সৌদামিনীর ঘরে একজন সন্ন্যাসী খুন হয়েছে!

যে পাঁচটা সন্ন্যাসী মাসাবধি নেচে গেল, বুজরুকী জানিয়ে জোড়াসাঁকো পল্লীতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যাদের আমি ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী বোলে বর্ণনা কোরেছি, কাটা পোড়েছে, তাদেরি মধ্যে একজন। সন্ন্যাসীদের নাম সর্ব্বদা প্রকাশ হয় না, কিন্তু এ সন্ন্যাসীর নাম পাওয়া গিয়েছে, সৌদামিনীই নাম বোলেছে। সৌদামিনী গৃহস্থকন্যা, সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার কিসের আলাপ, সৌদামিনী কি প্রকারে সন্ন্যাসীর নাম জানতে পাল্লে, সে কথাও একটু বলা দরকার। সৌদামিনী পুত্রকামনা করে, মহাপুরুষ সন্ন্যাসী এসেছে, বন্ধ্যা-নারীকে ছেলে দেয়, বোবালোকের কথা ফুটায়, অসাধ্য ব্যাধি আরাম করে, কাঁসাপিতলকে সোণা করে, এই সকল গুণের পরিচয় শুনে পিতাকে বোলে কোয়ে সন্ন্যাসীকে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়েছিল, সৌদামিনীর রূপ দেখে সন্ন্যাসী মোহিত হয়, হাত দেখে মুখ দেখে, কপালের রেখা দেখে সন্ন্যাসী বলে, 'তোমার ভাগ্য ভাল, তুমি তিন পুত্রের জননী হবে। তোমার জন্য আমি একটী যজ্ঞ কোরবো, সে যজ্ঞ সাতদিনে পূর্ণ হয়, যজ্ঞস্থলে তোমাকে উপস্থিত থাকতে হবে, তোমাদের বাড়ীর ভিতরেই যজ্ঞকুণ্ডু প্রতিষ্ঠা কোরবো।' সৌদামিনী সেই কথা পিতাকে বলে, বিশ্বেশ্বরবাবু বৃদ্ধ, বুদ্ধির ভিতর কোন রকম মার-পেঁচ খেলে না, সাধু-সন্ন্যাসীর উপর ভক্তিও আছে, মনে কোন প্রকার দ্বিধা না কোরে তিনি সম্মত হয়েছিলেন, যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছিল। নিশা-কালেই যজ্ঞ! হোমকুণ্ড-সমীপে চন্দনচর্চ্চিত হয়ে, তুলসীমাল্য ধারণ কোরে, কপালের উপর চূড়াবাঁধা খোঁপাটা এলিয়ে পৃষ্ঠের দিকে ফেলে, সেই কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী যজ্ঞ কোত্তে বোসতো, পাশে থাকতো সৌদামিনী। প্রথম রাত্রে যখন সঙ্কল্প হয়, তখন উভয়ের নামে মন্ত্রপাঠ করা হয়েছিল, তাতেই সৌদামিনী শুনেছিল;—শুনেছিল আর জেনেছিল, সন্ন্যাসীর নাম রমাই সন্ন্যাসী। পুলিশের লোক সেই নামটা লিখে নিয়েছে। যজ্ঞ কিন্তু পূর্ণ হয় নাই, দুদিন বাকী ছিল, পঞ্চম রজনীতেই কর্ম্ম ফর্সা! বৃহৎ একখানা বঁটীর আঘাতে রমাই সন্ন্যাসীর প্রাণপক্ষী ছট ফট কোরে বেরিয়ে গিয়েছে; ভেঙে দুখানা হয়ে হোমকুণ্ডের ধারে দেহপিঞ্জরটা পোড়ে আছে! রক্তমাখা বঁটীখানাও কুণ্ডের কাছে পাওয়া গিয়েছে। একঠাঁই সন্ন্যাসীর মুণ্ড, একঠাঁই ধড়। এক কোপে গলাকাটা।

শুনলেম, এই খুনের ব্যাপারে পুলিশের লোক হতবুদ্ধি। এরকমে খুন কোল্লে কে, কিছুই তারা অনুমান কত্তে পারে না। বাড়ীতে অন্যলোক থাকে

না, পুরুষের মধ্যে বৃদ্ধ কর্ত্তা বিশ্বেশ্বর, তিনি হরিনামের মালা ঘুরিয়ে পরমার্থ চিন্তা করেন, মালাজপের সময়েও তাঁর হাত কাঁপে, তিনি সন্ন্যাসী খুন কোরবেন, অসম্ভব কথা। তবে কে? সৌদামিনী ব্রতবতী, সৌদামিনীর মঙ্গলের জন্যই আগমন, সন্ন্যাসীর প্রতি সৌদামিনীর অচলা ভক্তি, সৌদামিনী খুন কোরেছে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। তবে কে? দাসী আর পাচিকা। যে রকমে এক চোটে গলাকাটা, সে রকমে খুন করা স্ত্রীলোকের অসাধ্য ; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে সন্ন্যাসী কাটে, সচরাচর এ কথা শুনা যায় না। বাকী কেবল একজন। কর্ত্তার একজন পুরাতন চাকর। সে চাকর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এই বাড়ীতে আছে, সে লোকটাও কর্ত্তার সমবয়স্ক ; তার নাম গঙ্গারাম। তার প্রতি সন্দেহ করাও নিতান্ত ভুল ; এই জন্যই পুলিশ হতবুদ্ধি। শেষে তারা স্থির কোরেছে, বাহিরের লোকেই কেটে গিয়েছে। যে লোকটা কেটেছে, সে বড় চতুর। সে জানে, বাড়ীতে কেবল স্ত্রী-লোক, দুজন পুরুষ আছে, তারা অথর্ব্ব বৃদ্ধ সুতরাং স্ত্রীলোকের দ্বারা খুন হওয়াই সকল লোকের সিদ্ধান্ত দাঁড়াবে, এইরূপ বিবেচনা কোরেই ছোরা না চালিয়ে, তলোয়ার না চালিয়ে, বঁটী দিয়ে কেটেছে। পুলিশের এই আনু-মানিক মীমাংসা অনেক লোকেরি যুক্তিসিদ্ধ বোলে মনে হলো, কিন্তু কে সেই বাহিরের লোক, রাত্রিকালে কোন পথ দিয়ে বাটীর ভিতর এসেছিল, সেটা কিছু ঠিক হলো না। পুলিশের লম্পঝম্প জারিজুরী সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, সে সব ঠিক হলো, ঠিক থাকলো, কিন্তু পর্ব্বতের প্রসববেদনার ন্যায় শেষ দাঁড়ালো একটা ইঁদুর : আসলকাজ কিছুই হলো না। বড় বড় তদারকে এক একজন পুলিশপুরুষ মনে যেরূপ আশা রাখেন, সে আশাও বিফল হয়ে গেল। রিপোর্ট লেখা হলো, হাসপাতালে লাস চালান হয়ে গেল, সৌদামিনী কাঁদতে লাগলো, বৃদ্ধ কর্ত্তা গ্রহশান্তির নিমিত্ত হরিনাম জপ কোত্তে লাগলেন।

কিছুই কিনারা হলো না। দর্শকলোকেরা একে একে ঘরে ফিরে চোল্লো, কেহ কেহ বলাবলি কোত্তে কোত্তে গেল, "হয়েছে ভাল। এই রকম হওয়াই ঠিক। যেই কাটুক, যেই আসুক, ফলাফল এই রকম হওয়াই সংসারের মঙ্গল। সোণাকরা সন্ন্যাসী, ছেলেকরা সন্ন্যাসী, অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করে, সে দলের সন্ন্যাসীকে বঁটীকাটা করাই সর্ব্বাংশে উত্তম, উপযুক্ত প্রতিফল।" আমিও মনে মনে প্রতিধ্বনি কোল্লেম, উপযুক্ত প্রতিফল। রমাই সন্ন্যাসীর পরিণাম দর্শন কোরে, বড়বাবুর সঙ্গে আমি বাড়ী ফিরে এলেম। সেই অবধি রমাই সন্ন্যাসীর সঙ্গী আর চারিজন সন্ন্যাসীকে একদিনও কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না ; বোধ হলো, তাদেরও পাছে ঐ রকম বিপদ ঘটে, তারাও ঐ কাজের কাজী, তাদেরও পাছে প্রাণ যায়, সেই ভয়েই তারা সহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। যেদিনের কথা আমি বোলছি, সেই দিন বৈকালে বিশ্বেশ্বরবাবুদের বাড়ীর দাসী কামিনীর মা আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল, কামিনীর মা হাবা-গোবা মেয়েমানুষ, বয়সটাও কিছু ভারী, সে এসে আমাদের বাড়ীর কর্ত্তৃ-ঠাকুরাণীর কাছে চুপি চুপি কত কথা বোলছিল, আমি সেই সময় একটা কাজের জন্য হঠাৎ বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলেম। যেখানে তাদের কথা হোচ্ছিল,

সেখান পর্য্যন্ত যেতে না যেতেই আমার কাণে এলো, ‘খুনের কথা,’ আমি এক-টুকু গা-ঢাকা হয়ে দাঁড়ালেম। আগেকার কথা শুনি নাই, শেষের কথা কেবল এইটুকু শুনতে পেলেম, সৌদামিনীর ঘরে তক্তপোষের নীচে তিনটে মদের বোতল বেরিয়েছে, একটা কাণাভাঙা মাটীর গেলাস আর কতকগুলো ছোট ছোট হাড় ; পাঁটার কি মুরগীর কি আর কোন পাখীর হাড়, কে জানে, কিন্তু বেরিয়েছে, একটা বোতলে খানিকটা মদ ছিল। সন্ন্যাসীটা মদ খেতো। বোধ হয়, সৌদামিনীও খেয়েছে !

শুনেই আমি সেখান থেকে ধাঁ কোরে সোরে এলেম, যে কাজের জন্য গিয়ে-ছিলেম, সে কাজটা তখন আর সারা হলো না ; কেন না, গৃহিণীর কাছেই দরকার, তাঁদের তখন যে প্রকার গুপ্তকথা হোচ্ছিল, তখন সেখানে দেখা দেওয়াটা দোষ, তাই ভেবেই সোরে পোড়লেম ; বড়বাবুর বৈঠকখানায় এসে বোসে পূর্ব্বাপর সেই কথাই মনে মনে তোলাপাড়া কোত্তে লাগলেম। কিছুই বিচিত্র নয়। সন্ন্যাসীর দলে ভণ্ডসন্ন্যাসীই বিস্তর। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, কিন্তু কোন প্রকার কুকার্য্য তাদের বাকী নাই। কথার ছলনে মেয়েমানুষ ভুলায়, মেয়েমানুষের সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কয়, একসঙ্গে নির্জ্জনে থাকে, ছেলে হবার ঔষধ দেয়, এ সব কাজ যারা কোত্তে পারে, তারা কি একটু মদ খেতে পারে না ? কি তারা পারে না ? সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের ঘটী-বাটী চুরি করে, সোণা করার লোভ দেখিয়ে কৌশলে সর্ব্বস্ব চুরি করে, ভদ্রলোকের জাতিকুল নষ্ট করে, কি তারা করে না ? ছেলেমানুষ আমি, কিন্তু একবার আমি শুনেছিলেম, ভস্মমাখা একটা শিব-সন্ন্যাসী কোথাকার এক বড়মানুষের সাত দেউড়ীর ভিতর থেকে একটী টুকটুকে বউ বাহির কোরে নিয়ে কোন দেশে পালিয়ে গিয়েছিল !

সন্ন্যাসিদের উপর আমার ঘৃণা ছিল, সে ঘৃণাটা আরো বেড়ে উঠলো। কেবল সন্ন্যাসীর উপরে কেন, সহরের উপরেই ঘৃণা বাড়লো। কলিকাতায় আর থাকা হবে না, এ অঞ্চলে আর থাকবো না, পশ্চিমদেশে চোলে যাই ; সে দেশে অনেক তীর্থস্থান আছে, সম্পর্কশূন্য উদাসীন নিরাশ্রয় আমি, তীর্থে তীর্থে দেবদর্শন কোরে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবো। সহরেই পাপ, সহরেই দুষ্ক্রিয়া, সহরেই মানুষ খুন, সহরেই ব্যভিচার, সহরে থাকা আমার পক্ষে ভাল নয়। আমার মত অবস্থায় সহরে যারা থাকে, মনে হয় কখনই তারা চরিত্র রাখতে পারে না। সব আমি হারিয়েছি, অনেক কষ্টই পেয়েছি, ভগবান রক্ষা করেন, দোহাই ভগবানের, চরিত্রটী আমি হারাব না, হারাতে পারবোই না।

অষ্টাহ অতীত হয়ে গেল। কার্ত্তিকমাস শেষ হয়ে গিয়েছে, অগ্রহায়ণমাসের দশবারোদিন অতিক্রান্ত, শীতকাল উপস্থিত। আমার গায়ের কাপড় কিনে দিবার জন্য বড়বাবু আমাকে একদিন চাঁদনীর বাজারে নিয়ে গিয়েছিলেন, এক-জন দরজীর কাছে আমার গায়ের মাপ দিয়ে জামা তৈয়ারী করবার ফরমাস দিলেন, গায়ের একখানি কাপড় কিনে দিলেন, পাঁচদিন পরে জামা হবে, এই-রূপ স্থির হয়ে থাকলো। পাঁচদিন পরে আমি একাকী চাঁদনীর চক-বাজারে

জামা আনতে যাই, জামা নিয়ে ফিরে আসছি, একটা রাস্তার মোড়ে দেখতে পেলেম, দু-জন লোক হন হন কোরে দক্ষিণদিকে চোলে যাচ্ছে। যেদিকে আমি ছিলেম, সেদিকে তারা চাইলে না, আপনা আপনি গল্প কোত্তে কোত্তে আমার পাঁচ হাত তফাৎ দিয়েই চোলে গেল। সর্ব্বদাই আমার মনে কেমন একপ্রকার আতঙ্ক ; সেই দুটো লোককে দেখে আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে উঠলো। দুজনের মধ্যে একজন সেই কালান্তক কুব্জ রাক্ষস রক্তদন্ত !

ও বাবা! রক্তদন্তটা এখানে পর্য্যন্ত এসেছে! তবে তো আমার আর নিস্তার নাই! কার-মুখে হয় তো শুনেছে, আমি কলিকাতায় আছি, তাই শুনেই হয় তো আমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে ; বীরভূমের লোক কি না, বীরভূমে আমাকে নিয়ে একটা মস্ত কান্ড হয়ে গিয়েছে, মুখে মুখে কাণে কাণে সেই কান্ডটা হয় তো প্রকাশ হয়ে পোড়েছে, সেই সূত্রেই রক্তদন্ত কলিকাতায় আমাকে ধোরতে এসেছে! এই ভাবনায়, এই ভয়ে, এই সন্দেহে, আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠলো ; এক মুহূর্ত্তও সেখানে আর দাঁড়ালেম না, হেঁটে আসবো মনে কোরেছিলেম, সে সংকল্প পরিত্যাগ কোল্লেম ; সঙ্গে টাকা ছিল, একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া কোরে শীঘ্র শীঘ্র মনিববাড়ীতে এসে পেঁৗছিলেম। সারাটা পথ গাড়ীর ভিতর কেবল ভাবনা। ঐ লোক আমার মামা সেজেছিল, ঐ লোক আমাকে বীরভূমে নিয়ে গিয়েছিল, ঐ লোক আমাকে নীলকুঠীতে চালান দিবার পরামর্শ কোরেছিল, ঐ লোক আমাকে প্রাণে মারবার মন্ত্রণা এঁটেছিল, সেই লোক আবার কলিকাতায়। আর আমি কলিকাতায় থাকবো না। আজিই আমি পালাবো। বেলা তখন অতি অল্প ছিল, স্থির কোল্লেম, যোগেযাগে রাত্রিটা কাটিয়ে, ভোরেই আমি পালাবো।

এই সংকল্প স্থির।—একটী কথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। যখন আমি প্রতাপবাবুর বাড়ীতে ভর্ত্তি হই, তখন আমার সঙ্গে সম্বল ছিল ৫০১৲ টাকা :— অমরকুমারীর দত্ত এক টাকা, আর নরহরিবাবুর দত্ত পাঁচখানি নোটে ৫০০৲ টাকা। প্রতাপবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে মাসে মাসে পাঁচটাকা কোরে জলপানী পেয়েছি। সব টাকাগুলি আমি বড়বাবুর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেম। সেই রাত্রে বড়বাবুকে আমি বোল্লেম, বিশেষ প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য আমাকে স্থানান্তরে যেতে হোচ্ছে, গচ্ছিত টাকাগুলি আমায় প্রদান করুন।” বড়বাবু প্রথমে আমাকে স্থানান্তরগমনে নিষেধ কোরেছিলেন, সে নিষেধ আমি মানলেম না ;—না গেলেই নয়, বার বার এই কথা বোলে দৃঢ়-সংকল্প হোলেম। শেষকালে তিনি আর বাধা দিলেন না, কোন আপত্তিও কোল্লেন না, টাকাগুলি আর নোট-কখানি এনে আমার হাতে দিলেন, আমি নমস্কার কোল্লেম।

রাত্রিকালে নিদ্রা। নামমাত্র নিদ্রায় খানিক রাত্রি অতিবাহিত কোরে, চঞ্চলমনে বিছানার উপর বোসে থাকলেম। রাত্রি কত আছে, জানবার জন্য একএকবার গবাক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়াই, ঠিক কোত্তে পারি না, চঞ্চলপদে ঘরের ভিতর পাইচারী করি, বারম্বার জানালার কাছে যাই, আকাশপানে উঁকি মেরে দেখি, কিছুই ঠিক হয় না। রাত্রে যে ঘরে আমি শুই, সে ঘরে ঘড়ী ছিল না, অন্য ঘরের ঘড়ীর আওয়াজও শুনতে পেলেম না, ক্রমশই চাঞ্চল্যবৃদ্ধি হলো।

বেশী রাত থাকতে গৃহস্থবাড়ীর সদরদরজা খুলে রেখে বেরিয়ে যাওয়া দোষের কথা,—কর্ম্মটা ভাল হয় না ; করি কি ? বেরুতেও পাচ্ছি না, থাকতেও ভয় হোচ্ছে। প্রভাত হোলে কোনরকম বাধা পোড়তে পারে, খুঁজে খুঁজে সন্ধান নিয়ে রক্তদন্তটাও হয় তো এখানে এসে পোড়তে পারে, করি কি ?

রাস্তার দিকে জানালার গরাদে ধোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, পল্লী নিস্তব্ধ, এমন সময় দূরবর্ত্তী গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং শব্দে ছয়টা বাজলো ;—স্থির হয়ে, কাণ পেতে, এক এক কোরে আমি গণনা কোল্লেম, ছয়টা। অগ্রহায়ণ-মাসের রাত্রে ছয়টা বাজবার পরেই ঊষার আগমন ;—ঠিক বুঝলেম, ঊষাকাল। দুর্গা দুর্গা বোলে যাত্রা কোল্লেম। কর্ত্তার কাছে বিদায় লওয়া হলো না, বাড়ীর মেয়েদেরও কিছু বলা হলো না, ছোটবাবুও কিছু জানতে পাল্লেন না, আমি বিদায় হোলেম, সংক্ষেপে কেবল এইটুকু জানলেন বড়বাবু। জানলেন বটে, কিন্তু কোথায় যে আমি যাব, তা তিনি কিছুই জানতে পাল্লেন না। আমি বিদায় হোলেম। দুর্গা-শ্রীহরি ! দুর্গা-শ্রীহরি !

ষোড়শ কল্প

কাশীধাম

কোথায় আমি যাব, অপরে কি জানবে, নিজেই আমি জানি না। কিছুই ঠিক নাই। ঠিক নাই, অথচ আমি কলিকাতার নূতন আশ্রয়টী পরিত্যাগ কোল্লেম ! মনে বড় ভয়, কখন কোথায় কি বিপদ ঘটে, কখন দুর্ব্বিপাকে বৈরিহস্তে ধরা পড়ি, সেই ভয়ে প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, স্থলপথে যাব না, জলপথেই বরাবর দূরদেশে চোলে যাব। জানা ছিল, বড়বাজারের ঘাটে সর্ব্বক্ষণ নৌকা পাওয়া যায় ; ভোরে ভোরে ভোঁ ভোঁ কোরে ছুটে ছুটে বড়বাজারের ঘাটে পোঁছিলেম। যে সকল নৌকা পশ্চিম অঞ্চলে যায়, তারি একখানা ভাড়া কোরে আমি পশ্চিমদেশে চোল্লেম। দাঁড়ী-মাঝীরা বদর বদর মন্ত্রে নৌকা ছেড়ে দিলে। আট দাঁড়ে অতি দ্রুত তরণীখানি গঙ্গা-তরঙ্গে ছুটে ছুটে চোল্লো। বাগ-বাজারের সীমা যখন ছাড়িয়ে গেল, পূর্ব্বগগনে সূর্য্যদেব তখন অল্পে অল্পে উঁকি মাত্তে লাগলেন।

গঙ্গার দুধারে যে সকল স্থান, মাঝীকে জিজ্ঞাসা কোরে সেই সকল স্থানের নাম জেনে নিতে লাগলেম। যে স্থানগুলি প্রসিদ্ধ, সেইগুলির নাম মনে থাকলো, ছোট ছোট গ্রামের নাম মনে কোরে রাখতে পাল্লেম না। বালী, শ্রীরাম-পুর, বৈদ্যবাটী, চন্দননগর ছাড়িয়ে হুগলীতে নৌকা পোঁছিল। বেলা এগারটা। চন্দননগরে একবার নেমেছিলেম, ছোট সদর, কিন্তু মন্দ নয়। চন্দননগরের নূতন নাম ফরাসডাঙ্গা ; এই স্থানটী ফরাসীদের অধিকারে ; এখানে ইংরেজের আইন-কানুন চলে না, লোকের মুখে শুনলেম, ইংরেজের অধিকারে নরনারীহত্যা, চুরি-ডাকাতী, জালিয়াতী ইত্যাদি বড় বড় অপরাধ

কোরে যারা ফরাসডাঙ্গায় আশ্রয় লয়, ফরাসী গবর্ণরের অনুমতি ব্যতিরেকে ইংরেজী পুলিশ সে সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার কোত্তে পারে না। আরও শুনলেম, ফরাসী অধিকারে বাঙ্গালী গৃহস্থ প্রজারা অনেক প্রকার সুখে আছে।

হুগলীতে উত্তীর্ণ হয়ে স্নানাহার সমাপন কোল্লেম, দাঁড়ী-মাঝীরাও স্নানাহার কোরে নিলে ; গঙ্গায় তখন ভাটা ; জোয়ার আরম্ভ হোলে নৌকা-ছাড়া হবে, মাঝীরা আমাকে এই কথা জানালে ; জোয়ার আসবার বিলম্ব আছে। এক প্রকার হলো ভাল। হুগলীটী প্রাচীন কুঠী, প্রাচীন সহর, বেড়িয়ে বেড়িয়ে সেখানকার বাজার হাট আমি দেখলেম। বেশী বিলম্ব হবে বোলে আদালতগুলি দেখা হলো না। সুখের আসা নয়, সুখের যাত্রা নয়, দুরন্ত রাক্ষসের ভয়ে কলিকাতা পরিত্যাগ। পরিহিত বস্ত্র শীতকালের গাত্রবস্ত্র আর টাকাগুলি ব্যতীত দূরপথে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছুই সঙ্গে ছিল না, হুগলীর বাজারে লেপ, তোষক, বালিশ আর কয়েকখানি তৈজসপত্র কিনে নিলেম ; বেলা যখন আড়াইটে, সেই সময় নৌকাছাড়া হলো।

দিবারাত্রি নৌকা চোলতে লাগলো ; অষ্ট প্রহরের মধ্যে অল্পক্ষণ মাত্র বিরাম। ক্রমশঃ শান্তিপুর, কালনা, কাটোয়া ইত্যাদি স্থান অতিক্রম কোরে অনেক দূরে গিয়ে পোড়লেম। শান্তিপুরে নেমেছিলেম ; শান্তিপুর একটী সুবিখ্যাত গণ্ডগ্রাম ; সহর বোল্লেও সাজে। শান্তিপুরে বহুলোকের বাস ; হাটবাজারও বেশ গুলজার ; সেখানে দেখবার জিনিস অনেক আছে। শুনলেম, কার্ত্তিকমাসে রাসের সময় শান্তিপুরে মহাসমারোহ হয়। কালনাতেও নেমেছিলেম ; সেখানে বর্দ্ধমানের মহারাজের অনেকগুলি দেবালয় আছে ; সারি সারি অনেক মন্দির ; এখানকার প্রধান বিগ্রহ লালজী। অতি সুন্দর নবরত্নমন্দির লালজী বিরাজমান। লালজীর সেবা ও লালজীর বাড়ীর অতিথি-সেবার বন্দোবস্ত অতি উত্তম।

ক্রমে ক্রমে অনেক স্থান ছাড়িয়ে গেলেম। দূরে যেন কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা নয়নগোচর হলো। নৌকা যতই অগ্রসর হয়, ততই দেখি, সেই মেঘমালা যেন অনেক দূরে। মেঘের গায়ে গায়ে যেন কত রকম পাখী বোসেছে, ছোট ছোট গাছপালা রয়েছে, এই রকম অনুমান কোল্লেম। মেঘের গায়ে পাখী, মেঘের গায়ে গাছ, তবে তো মেঘ নয় ; তবে ওটা কি ? ক্রমশই নিকটবর্ত্তী। তখন দেখলেম, সত্যই মেঘ নয়, উচ্চ উচ্চ ভূমিস্তূপ, প্রস্তরস্তূপ ; যেগুলিকে ছোট ছোট গাছপালা মনে কোরেছিলেম, সত্যই সেগুলি বড় বড় বৃক্ষলতা ; কতকগুলি পুষ্পবৃক্ষে নানাবর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে যেগুলিকে পাখী মনে কোরেছিলেম, সেগুলি গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহ-পালিত পশু ; তারা সেইখানে নির্ব্বিঘ্নে চরা কোরে বেড়াচ্ছে। মাঝীকে জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, রাজমহলের পাহাড়। গরু-বাছুরেরা পাহাড়ে উঠে চোরে চোরে বেড়ায় সেটা আমার জানা ছিল না, আমার চক্ষে আশ্চর্য্য বোধ হলো, কিন্তু শুনলেম, পাহাড় অঞ্চলের পশুজাতির ঐরূপ শিক্ষা,—ঐরূপ অভ্যাস।

কলিকাতার বড়বাজারের ঘাট থেকে কদিনে রাজমহলে নৌকা পেঁছিছিল, সেটা আমার ঠিক মনে নাই ; শীঘ্র শীঘ্র কাশী যাব, ইহাই আমার আকিঞ্চন ; রাজমহলে নেমে পাহাড়গুলি ভাল কোরে দেখা হলো না। নৌকা চোল্লো। সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা ছাড়িয়ে পোড়লেম। ভাগলপুর ছাড়িয়ে একটা পাহাড় দেখা গিয়েছিল, সে পাহাড়টার নাম জাংরের পাহাড় ; —জলের মাঝখানে যেমন দ্বীপ থাকে, এটাও প্রায় সেইরূপ ; বোধ হয় যেন, জলের ভিতর থেকেই পাহাড় উঠেছে। প্রবাদ এইরূপ যে, জহ্নুমুনি এইখানে গঙ্গা পান কোরেছিলেন। তদবধি গঙ্গার একটী নাম জাহ্নবী।

পাটনা সহরটী অতি সুন্দর। পাটনার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র। এই স্থান থেকে গণ্ডকী নদীর মোহানা দেখা যায়। পাটনার পর দানাপুর, আরা, বক্সার, তার পর গাজীপুর। গাজীপুরের গোলাপ অতি প্রসিদ্ধ। কৌতুকে কৌতুকে কত স্থান দেখতে দেখতে চোল্লেম : আটদিন পরে কাশীর ঘাটে নৌকা পেঁছিল।

পথের একটী ঘটনার কথা এইখানে বোলে রাখা অতি আবশ্যক। কলের গাড়ী যখন ছিল না, অনেক যাত্রী তখন হাঁটাপথে যেতো ; সঙ্গতিমান লোকেরা নৌকাযোগে যেতেন। পথের স্থানে স্থানে এক একটা চটী ছিল। চটী মানে ছোট ছোট পান্থনিবাস। তিনদিকে বেড়া, একদিক খোলা, মাথার উপর চাল। খোপে খোপে চৌকা। যাত্রীরা দলে দলে সেই সকল চটীতে আশ্রয় নিতো, রন্ধনাদি কোত্তো, অনেকে রাত্রিকালেও চটীর ভিতর শুয়ে থাকতো। তখনকার তীর্থ-যাত্রিগণের পথে অনেক ভয় ছিল ; চোরের উপদ্রবে সকলেই সদাসর্ব্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকতো ; খুব সাবধানে থাকলেও অনেকে চোরের দৌরাত্ম্য থেকে পরিত্রাণ পেতো না। সেই কারণেই একসঙ্গে দল বেঁধে থাকা, রাত্রিজাগরণ করা নিতান্ত আবশ্যক হতো। তাতেও নিস্তার ছিল না। যারা ঘুমিয়ে পোড়তো, চোরেরা চুপি চুপি তাদের ঘটী, বাটী, কাপড়, তল্পী, বাক্স ইত্যাদি চুরি কোরে নিয়ে পালাতো। মানুষ-চোর ব্যতীত ঠাঁই ঠাঁই কুকুর-চোর ছিল। আট দশজন যাত্রী গায়ে গায়ে রাত্রিকালে নিদ্রাগত, মাথার নীচে তল্পী, তাদৃশ স্থলেও কুকুরেরা নিঃশব্দে চুপি চুপি গিয়ে ঘুমন্ত লোকের মাথার তল্পী চুরি কোরে নিয়ে যেতো ; কেহই কিছু জানতে পাত্তো না, কারো অঙ্গে কুকুরের হাত-পা ঠেকতো না ; কুকুরেরা এত সাবধান। মানুষ-চোরেরা সেই সকল কুকুরকে ঐ রকমের চুরি করা শিক্ষা দিত। কুকুরের বুদ্ধি ভাল, যা শিখাও তাই শিখে ; চোরেরা মনিব, সর্ব্বদাই সেই বিদ্যা শিক্ষা দেয়, চুরি শিখে সুশিক্ষিত হয়ে কুকুরেরাও বিলক্ষণ চোর হয়ে উঠতো।

তীর্থপথের চোর সাধারণ ডাকাত অপেক্ষাও অধিক সাহসী। দিনমানেও যাত্রিদের সঙ্গে সরপট কথা কোয়ে জিনিস চুরি কোত্তো। পিতলের তসলায় যাত্রীরা রন্ধন কোচ্ছে, চোর গিয়ে লাঠী হাতে কোরে সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কোত্তো, "তসলা তেরা কি মেরা ?" যারা জানতো, তারা উত্তর দিতো, "তেরা।" —চোর তখন সেখান থেকে চোলে যেতো ; নূতন যাত্রী তাদের কাণ্ডকারখানা না জেনে যদি উত্তর কোত্তো, "এ তসলা মেরা," তা হোলে চোর তৎক্ষণাৎ লাঠী

মেরে আগুনের উপর থেকে তসলাটা ফেলে দিয়ে, হাতে কোরে নিয়ে গজেন্দ্র-গমনে চোলে যেতো, দেখলে বোধ হতো, যেন একজন রাজা কি নবাব। কারো কথায় কর্ণপাত কোত্তো না, বুকে একটু ভয়ও রাখতো না।

সেই রকমের একটা চটীতে আমি একদিন উত্তীর্ণ হয়েছিলেম। সেই চটীর নাম ভেলুয়া চটী। রন্ধনাদি কোরে সেইখানে আমি আহার করি, অন্যান্য যাত্রীরাও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে আহারাদি করে। যাত্রী সে দিন বড় কম ছিল না। ঘর একখানা নয়, তফাৎ তফাৎ বিশ পঁচিশখানা ঘর। চটীর বন্দো-বস্ত দেখবার জন্য অনেকক্ষণ আমি সেইখানে ছিলেম ; বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা হয়ে যায় ; সন্ধ্যাকালে নৌকার দিকে ফিরে আসছি, সাত আটখানা নৌকা সেইখানে নঙ্গর করা ছিল, ভয় ছিল না, নির্ভয়ে আপন মনে আমি চোলে আসছি, হঠাৎ দেখি, চটীর উত্তরদিকের একখানা কুটীরে দাউ দাউ কোরে আগুন জ্বেলছে, কে একজন সেই আগুনের ভিতর থেকে পরিত্রাহি চীৎকার কোচ্ছে। "কে আছ গো! বাঁচাও গো! প্রাণ যায় গো! পুড়ে মোলেম গো! রক্ষা কর গো" এই রকম চীৎকার—এই রকম আর্ত্তনাদ! কণ্ঠস্বরে বুঝলেম, বামাকণ্ঠ! কোন স্ত্রীলোক সেই ঘরে আছে, ঘরে আগুন লেগেছে, বাহির হোতে পাচ্ছে না, আশে পাশে জনকতক লোক হৈ হাই শব্দে ছুটাছুটি কোচ্ছে, আগুনের কাছে কেহই এগুতে পাচ্ছে না। স্ত্রীলোকের ক্রন্দন, স্ত্রীলোকের প্রাণ যায়, আমার প্রাণ কেমন অস্থির হয়ে উঠলো ; গঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেম, ফিরে দাঁড়ালেম ; যে দিকে আগুন, ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে সেইদিকে ছুটলেম। সম্মুখদিকে বেশী আগুন, সেই ভয়ে লোকেরা অগ্রসর হোতে পাচ্ছিল না ; আগুনের ভেল্কীতে লোকেরা কেবল জল জল কোরে চেঁচাচ্ছিল। আমার তখন একটা উপস্থিতবুদ্ধি যোগালো, লোকেরা যে দিকে গোলমাল কোচ্ছিল, সে দিকে না গিয়ে তফাৎ দিয়ে ঘুরে ঘরের পশ্চাদ্দিকে উপস্থিত হোলেম। সম্মুখদিকে আগুন লেগেছিল, পশ্চাতে তখনও আগুন ধরে নাই, তাই দেখে আমার একটু সাহস হলো। পরমেশ্বরের কৃপা! পলক ফেলবার অবসর রাখলেম না, নাসিকাতে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিলেম না, গাত্রবস্ত্রগুলি খুলে তফাতে টেনে ফেলে, এককাপড়ে কোমর বেঁধে, এক লাথিতে ঘরের বেড়া ভেঙে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম ; কোন দিকেই না চেয়ে স্ত্রীলোকটীকে কোলে কোরে নিয়ে ভোঁ কোরে বেরিয়ে পোড়লেম, স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাইলেম না, লম্ফে লম্ফে দশ হাত তফাতে এসে দম রাখলেম।

আমিও বেরিয়েছি, ওদিকে উত্তুরে হাওয়ায় ঘরখানা সমস্ত জ্বেলে উঠে হু হু শব্দে ; চতুর্দ্দিকে আগুনের হল্কা ছড়াতে লাগলো। পাছে অন্যান্য ঘরে লেগে যায়, সেই আশঙ্কায় চটীর লোকেরা কলসী কলসী জল এনে তফাৎ থেকে ছুড়ে ছুড়ে ছড়াতে আরম্ভ কোল্লে ; ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে আমিও একটু ঠাণ্ডা হোলেম। যেটীকে উদ্ধার কোরে আনলেম, সেটীকে ঘাসের উপর শুইয়ে রেখে দুই হাতে সর্ব্বাঙ্গের ঘাম মুছতে লাগলেম।

অগ্রহায়ণমাস শেষ হয়ে গিয়েছে, বিলক্ষণ শীত, সে অঞ্চলে আরো বেশী, তথাপি আমার সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্মধারা। কারে আমি বাঁচিয়েছি, কিছুই জানি

না, তখনো তাঁর মুখের দিকে আমি চেয়ে দেখি নাই ; অন্ধকার রাত্রি, ঘুট-ঘুটে অন্ধকার ; ঘরজ্বলা আগুনের আলোতে এতক্ষণের পর সেই স্ত্রীলোক-টীর মুখপানে আমি চাইলেম। চেয়েই অমনি অকস্মাৎ চোমকে উঠে মনের আবেগে অস্ফুট চীৎকার কোরে উঠলেম। স্ত্রীলোকটী অজ্ঞান ;—অঙ্গের কোন স্থানে অগ্নিস্পর্শ হয় নাই, কাপড়েও আগুন ধরে নাই, কিন্তু চৈতন্যশূন্য ! চক্ষু-দুটী বিমুদিত !

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! বিধাতা আমাকে এই সময় এখানে এনে পরম উপকার-সাধন কোরেছেন, এই কথা স্মরণ কোরে, উদ্দেশে বিধাতাকে নমস্কার কোল্লেম। ঘন ঘন বক্ষঃস্থল কম্পিত হোতে লাগলো। সন্দেহে সন্দেহে স্ত্রীলোকটীর নাসিকায় হস্ত দিয়ে বুঝলেম, নিশ্বাস আছে, মরে নাই, মূর্চ্ছা। পুনরায় এক নিশ্বাস ফেলে জগদীশ্বরকে প্রণিপাত কোল্লেম। তখন আমার অমঙ্গল-আশঙ্কা দূর হলো। স্ত্রীলোকটীর মুখে, কপালে, মস্তকে বারবার হস্ত স্পর্শ কোরে, হেঁট হয়ে ভাল কোরে, সেই মুখখানি আবার দেখলেম। প্রাণে আমার তখন কতই উৎসাহ, কতই আনন্দ, কতই উচ্ছ্বাস, সে কথা আমি বোলতে পারি না। এক-দিকে আনন্দ, অন্যদিকে কিন্তু বিপুল সন্দেহ।

লোকেরা কলসী কলসী জল ঢেলে ঘরের অগ্নিনির্ব্বাণের চেষ্টা কোচ্ছিল, জলাহুতি পেয়ে অগ্নি ক্রমশই প্রবল হোচ্ছিল, ডেকে ডেকে চীৎকার কোরে আমি লোকগুলিকে বোলতে লাগলেম, "ওগো, এইখানে একটু জল আন, আমাকে একটু জল দাও, স্ত্রীলোকটী অচেতন, বাঁচাও, বাঁচাও, শীঘ্র বাঁচাও !"—আমার কথাগুলি যেন বাতাসে উড়ে গেল, কেহই শুনতে পেলে না ; কিম্বা হয় তো শুনতে পেয়েও গ্রাহ্য কোল্লে না। তখন আমি কি করি, যত্নের দেহ অযত্নে ফেলে রেখে গঙ্গা পর্য্যন্তও যেতে পারি না, কি করি, নিজের কোমরের কাপড় খুলে ধীরে ধীরে সেই চন্দ্রমুখে বাতাস কোত্তে লাগলেম। একটু পরে দুটী পদ্মচক্ষু যেন অল্প অল্প নিমীলিত হলো ; আনন্দে আমার অন্তরাত্মা যেন নেচে উঠলো ; আদরে তারস্বরে ডাকলেম, "অমরকুমারী !"

অমরকুমারী অল্প অল্প চেয়েছিলেন, আমার কথা শুনে, একটীবার আমার দিকে চেয়েই তখনি আবার চক্ষু বুঝলেন ; দীর্ঘ দীর্ঘ নেত্রপল্লবে পদ্মফুল-দুটী ঢাকা পোড়ে গেল ! আমি শুশ্রূষা কোচ্ছি, চৈতন্য প্রাপ্ত হয়েও অমর-কুমারী কেন এমন হলেন, এইরূপ ভাবছি, এমন সময় দেখি, সেই জ্বলন্ত ঘরের কাছে একটী ভদ্রলোক ছুটে এলেন ; তাঁর মুখে হাহাকার ধ্বনি, অঙ্গ-বস্ত্র শিথিল। আমার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে একজন লোক সেই ভদ্রলোকটীকে কি কথা বোল্লে, তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদসঞ্চারে আমাদের কাছে এসে উপ-স্থিত হোলেন। তফাৎ থেকে একটু একটু আমি চিনতে পেরেছিলেম, নিকটে এলে স্পষ্টই চিনলেম, মোহনলালবাবু। ঘটনার কথা একনিশ্বাসে তাঁর কাছে আমি বর্ণনা কোল্লেম, সাদরে আমার মস্তক স্পর্শ কোরে, আরক্তবদনে মিষ্টবচনে তিনি বোল্লেন, "খুব বাহাদুর ! খুব বাহাদুর ! তুমি আমার পরম উপকার কোরেছ ! এখানে তুমি কেমন কোরে এলে ?"

যেমন কোরে এসেছিলেম, সংক্ষেপে সংক্ষেপে পরিচয় দিলেম, শুনে তিনি

ম্লানবদনে একটু হাস্য কোল্লেন। ঘরখানা ওদিকে ভস্মসাৎ হয়ে গেল, এদিকে অমরকুমারীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হলো, আমার দিকে পৃষ্ঠ রেখে, মোহনবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে, অমরকুমারী উঠে বোসলেন। মোহনবাবুকে সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, "এখনো ভয়ের ঘোর আছে ; অমরকুমারী আমারে চিনতে পাচ্ছেন না।"

বিস্ফারিতনেত্রে একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে সবিস্ময়ে মোহনবাবু বোল্লেন, "এ কি হরিদাস ? ইহারে কি তুমি চেনো ? ইহারে কি তুমি আর কোথাও দেখেছ ?"

আমার মনের ভিতর তখন যেন চপলার খেলা হয়ে গেল। যেমন আলো এলো, সঙ্গে সঙ্গে তখনি তেমনি অন্ধকার। অমরকুমারী আমারে চিনতে পাচ্ছেন না, আমি যদি বলি চিনি, সেটা তো ভাল কথা হবে না। যে জায়গায় দেখাশুনা, সেটা আমার পক্ষে অনুকূল স্থান নয়, সে সব কথা যদি প্রকাশ করি, কিসে কি হবে, চেপে যাওয়াই ভাল ; তাই ভেবেই চেপে গেলেম ; মোহনবাবুর প্রশ্নে কেবল এইটুকুমাত্র উত্তর দিলেম, "আজ্ঞা হাঁ, এই রকমের একটী বালিকাকে আমি দেখেছি, তাঁর নাম অমরকুমারী।"

হাস্য কোরে মোহনবাবু বোল্লেন, "তোমার ভুল হোচ্ছে। এর নাম অমরকুমারী নয়। এটী আমার নূতন পরিবার। সন্তান হলো না বোলে দ্বিতীয়বার আমি এটীকে বিবাহ কোরেছি। আগুনের মুখ থেকে তুমি এটীকে রক্ষা কোরেছ, আমি তোমার কাছে উপকৃত হয়েছি, এখন তুমি যাবে কোথায় ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "কাশী যাব। আমি কারো শত্রু নই, জন্মাবধি কখনো কারো কোন অনিষ্ট করি নাই, অকারণে দেশে আমার অনেক শত্রু হয়েছে, দেশে আর থাকবো না, কাশীবাসী হয়ে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন কোরবো, কাশীর ঘাটে নিত্য গঙ্গাস্নান কোরবো, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের পবিত্র নাম কীর্ত্তন কোরবো, এই আমার বাসনা। কাশীনাথ যদি কাশীতে আমাকে জায়গা না দেন, তা হোলে গঙ্গা পার হয়ে সন্ন্যাসীর মত তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন কোরে বেড়াবো।"

পুনর্ব্বার হাস্য কোরে মোহনবাবু বোল্লেন, "ছেলেমানুষ ! ও রকম কাজ কি কোত্তে আছে ? শিশুকালে সন্ন্যাস ! বোকা ছেলে। চল আমার সঙ্গে, আমি প্রয়াগে যাচ্ছি, আগে প্রয়াগে চল, তার পর আমিই তোমাকে সঙ্গে কোরে কাশীতে নিয়ে যাব। দেশে তোমার কে এমন শত্রু হয়েছে ? কেনই বা শত্রু হবে ? কেহই শত্রু হয় নাই। ওটা তোমার মনের স্বপ্ন ; ও সকল মিথ্যা স্বপ্ন মন থেকে দূর কোরে দাও ; চল আমার সঙ্গে ; আমার নৌকা আছে, একসঙ্গে সেই নৌকাতেই বেশ যাওয়া যাবে।"

পূর্ব্বাপর চিন্তা না কোরেই আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, আমার নৌকা আছে, ভগবান বিশ্বেশ্বর আমার চিত্তকে আকর্ষণ কোরেছেন, অগ্রেই আমি কাশী যাব। আপনি যদি একান্তই আমারে প্রয়াগে নিয়ে যেতে চান, সেটা আপনার অনুগ্রহ কিন্তু বিশ্বেশ্বর-দর্শনের অগ্রে কিছুতেই আমি যেতে পারবো না, দয়া কোরে ক্ষমা কোরবেন।"

মোহনবাবু বিস্তর জেদাজেদি কোল্লেন, ভাল করবার আশ্বাস দিয়ে বিস্তর অনুরোধ কোল্লেন, তথাপি আমি সম্মত হোলেম না। শেষকালে তিনি আমাকে সঙ্গে কোরে আপনার নৌকায় নিয়ে গেলেন, নাক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়ে অমর-কুমারীও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেন। দুই একবার আমি মোহনবাবুর অলক্ষিতে অমরকুমারীর দিকে কটাক্ষপাত কোরেছিলেম, অমরকুমারী কিন্তু একবারও আমার পানে ফিরে চাইলেন না। আমার আশ্চর্য্য বোধ হলো। এত অল্পদিনে অমরকুমারী আমাকে ভুলে গেলেন, এককালে চিনতেই পাল্লেন না, ব্যাপারখানা কি?

নৌকায় আমরা আরোহণ কোল্লেম, প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক দুটী পাঁচটী কথার পর মোহনলালবাবু একটী বাক্স খুলে আমার হাতে খানকতক ব্যাঙ্ক-নোট দিলেন ; বোল্লেন, "হরিদাস ! আজ তুমি আমার যে উপকার কোরেছ, তার যোগ্য পুরস্কার আমি দিতে পাল্লেম না, এই নোট-কখানি গ্রহণ কর, যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন, আমাকে তুমি মনে রেখো, তোমার ঠিকানা লিখে নিচ্ছি, যখন কিছু অভাব হবে, চিঠি লিখে আমাকে জানিও, তৎক্ষণাৎ আমি সাহায্য কোরবো।"

নোট-কখানি ফিরিয়ে দিবার উপক্রম কোরে, ম্লানবদনে আমি বোল্লেম, "উপকার আমি বিক্রয় করি না ; অগ্নিকুণ্ডে স্ত্রীহত্যা হোচ্ছিল, আমি রক্ষা কোরেছি, সেটী আমার কর্ত্তব্যপালন ; কর্ত্তব্যপালনের পুরস্কার আমি চাই না। আপনার নোট আপনিই রাখুন, আমার প্রয়োজন নাই।"

একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে, যেন একটু বিস্ময় বোধ কোরে, মোহন-বাবু বোল্লেন, "না না, সে জন্য বোলছি না, উপকার-বিক্রয়ের কথা নয় ; তবে কি না, তুমি ছেলেমানুষ, বিদেশে এসেছ, তীর্থস্থানে যাচ্ছ, তীর্থে অনেক প্রকার খরচপত্র আছে, টাকাগুলি সঙ্গে রাখ, সময়ে উপকারে আসবে।"

বার বার অস্বীকার কোল্লেম, বিশেষ আগ্রহ জানিয়ে বার বার তিনি অনু-রোধ কোল্লেন, আমি গ্রহণ কোরবো না, জোর কোরে তিনি গোছিয়ে দিবেনই দিবেন, দৃঢ়সংকল্প, কাজেই আমারে গ্রহণ কোত্তে হলো। আবার মোহনবাবু আমাকে প্রয়াগে নিয়ে যাবার জন্য আকিঞ্চন পেলেন, অনেক রকম হেতুবাদ দিয়ে, অসম্মতি জানিয়ে, আড়ে আড়ে অমরকুমারীর দিকে চাইতে চাইতে নৌকা থেকে আমি নেমে এলেম, অনতিদূরেই আমার নিজের নৌকা নোঙ্গরকরা ছিল, সেই নৌকায় আরোহণ কোল্লেম। রাত্রি তখন নয়টা কি দশটা। রাত্রেও নৌকা চলে ; দাঁড়ী-মাঝীরা নোঙ্গর তুলে ভগবানের নাম কোরে, নৌকা খুলে দিলে, গঙ্গাবক্ষে নাচতে নাচতে নৌকাখানি দ্রুতবেগে ছুটে চোল্লো।

এটা কাশীতে পোঁছিবার পূর্ব্বের ঘটনা। নৌকায় বোসে বোসে আমি চিন্তা কোত্তে লাগলেম, এটা হলো কি! অমরকুমারী আমাকে চিনতে পাল্লেন না। অমরকুমারীই নিশ্চয়। সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই চুল, সেই বর্ণ, সেই গঠন, সব ঠিক ; সাত আটমাসে আমার এতই কি দৃষ্টিভ্রম হওয়া সম্ভব? —কখনই না। অমরকুমারী নিশ্চয়। মোহনবাবু বোল্লেন, অমরকুমারী নয় ; আর একজন ঐ কন্যাটীকে তিনি বিবাহ কোরেছেন। বিবাহটা সম্ভব হোলেও হোতে পারে, কেন না, অমরকুমারীকে আমি অবিবাহিতা দেখে এসেছি, বিবাহ

হওয়া বিচিত্র নয় ; কিন্তু অমরকুমারী ভিন্ন ঐ কন্যা আর একজন, ইহা তো কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য হোতে পারে না। অবিকল একরূপ চেহারা, একরূপ ভঙ্গী, একরূপ বয়স, ইহা কিরূপে সম্ভবে ? সংসারে আকার-অবয়বে এমন চমৎকার মিলন নিতান্তই বিরল। আচ্ছা, অমরকুমারী আমাকে চিনতে পাল্লেন না কেন ? মোহনবাবু কাছে ছিলেন, সেই জন্যই কি গোপন করা ? সেই জন্যই কি উদাসীনভাব ?

এই চিন্তার পর আর এক চিন্তা। রক্তদন্তের কথা যদি সত্য হয়, সত্য যদি রক্তদন্ত আমার মামা হয়, সত্য যদি অমরকুমারী সেই রক্তদন্তের কন্যা হন, তবে তো অমরকুমারী আমার মাতুলকন্যা। বাবু মোহনলাল সেই অমরকুমারীকে বিবাহ কোরেছেন, তাঁর নিজের মুখের পরিচয় এইরূপ ; আচ্ছা, এ যোগাযোগ কি প্রকারে ঘোটলো ? রক্তদন্তের সঙ্গে কি মোহনবাবুর পূর্ব্বে জানাশুনা ছিল ? তা যদি হয়, তবে বর্দ্ধমানে রক্তদন্ত যখন আমাকে ধোত্তে গিয়েছিল, সেটাও তো বেশী দিনের কথা নয়, তখন কেন মোহনবাবু সেই রক্তদন্তকে চিনতে পারেন নাই ? একটা কদাকার কুব্জাঙ্গ অপরিচিত লোকের হাতে কেনই বা আমাকে তখন ছেড়ে দিয়েছিলেন ? অনেক ভাবলেম, কিছুই মীমাংসায় আনতে পাল্লেম না। অন্য মীমাংসা এলো না, কিন্তু যাঁরে আমি আগুনের মুখ থেকে উদ্ধার কোরেছি, সেই বালিকাটী যে নিশ্চয়ই সেই সরলা, সুশীলা, স্নেহময়ী অমরকুমারী সে পক্ষে কিছুমাত্র সংশয় থাকলো না।

কাশীর ঘাটে নৌকা পেঁছিল। গঙ্গা থেকে কাশীধামের দৃশ্য অতি চমৎকার। অর্দ্ধচন্দ্রাকার বিশ্বেশ্বরক্ষেত্র অগণিত সৌধ-মন্দিরে আলো কোরে রয়েছে। নৌকায় বোসে বোসে সেই দৃশ্য আমি দর্শন কোল্লেম, ভক্তিভাবে করপুটে কাশীপুরীকে নমস্কার কোল্লেম, উদ্দেশে কাশীশ্বর-কাশীশ্বরীকে প্রণিপাত কোল্লেম, শরীর রোমাঞ্চিত হলো।

নৌকার জিনিসপত্রগুলি তীরে উত্তোলন কোরে নৌকার ভাড়া চুকিয়ে দিলেম। কোথায় তখন যাব, অন্তরে সেই ভাবনার আবির্ভাব। জনকতক পাণ্ডা এসে আমাকে ছেঁকে ধোল্লে। সকলেই বলে, আমার সঙ্গে এসো ; হাত ধোরে টানাটানি। একজন উত্তরসাধক আমার দরকার, আমি একজন পাণ্ডাকেই বরণ কোল্লেম। সে একখানি গাড়ী ভাড়া কোরে আমার জিনিসগুলি একটা ঠিকানায় পেঁছে দিবার বন্দোবস্ত কোত্তে লাগলো। আমি সেই অবসরে গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে মা গঙ্গার শোভা দর্শন কোত্তে লাগলেম। গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী। জোয়ার-ভাটা আছে কি না, বুঝা গেল না, কিন্তু তরঙ্গ-বেগ অত্যন্ত প্রবল ; অল্পজলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অতি বলবান পুরুষেরও অসাধ্য। একদিকেই স্রোতের টান। নৌকা থেকে যখন আমি উত্তীর্ণ হোলেম, তখন প্রাতঃকাল, শত শত নরনারী মনের আনন্দে ভাগীরথী-সলিলে স্নান-আহ্নিক কোচ্ছেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা উচ্চকণ্ঠে ভাগীরথীর স্তবপাঠ কোচ্ছেন, ছোট ছোট বালকেরা অভ্যাসবশে সেই স্রোতে সাঁতার দিতে দিতে এক একটা চাতালের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ; চারিদিকে চক্ষু ঘুরিয়ে সেই সকল আমি দেখতে লাগলেম। সারি সারি অনেক ঘাট। সকল ঘাটেই উচ্চ উচ্চ সিঁড়ি ;

ঘাট যেমন অসংখ্য, সিঁড়িও তদ্রূপ অসংখ্য। সচরাচর ঘাটের সিঁড়ি যেমন ক্রমান্বয়ে ঢালুভাবে নীচে নামে, কাশীর গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ি সে রকম নয় ; উপর থেকে ঠিক নিম্নদিকে ঋজুভাবে ধাপ গাঁথা ; সে সকল সিঁড়ি দিয়ে নামা-উঠা নূতনলোকের পক্ষে নিতান্তই দুঃসাধ্য ; ধাপে ধাপে পা কাঁপে ;— নীচের দিকে চাইতে ভয় হয়। স্নানের ঘাটের দুই ধারে রুলীওয়ালা পাণ্ডা। বাঁশের ছাতা মাথায় দেওয়া, নাকে তিলক কাটা, বুকে কপালে চন্দনমাখা, লম্বা লম্বা মালা গলায় দীর্ঘ দীর্ঘ পাণ্ডাদের মূর্ত্তি-দর্শনে ভক্তির উদ্রেক হয় না ; পাণ্ডাদের ভিতর হিন্দুস্থানীও আছে, উৎকলবাসীও আছে। উৎকল-বাসীরা গঙ্গাস্নান কোরে, লম্বা চুলে খোঁপা বেঁধে, বড় বড় পান খেয়ে, গাল ভারী কোরে বোসেছে, পানের পিক গালের দু-ধারে যেন রক্তধারা গড়াচ্ছে, সে মূর্ত্তি-দর্শনে হৃদয়ে ভক্তি আনয়ন করা কিছু জোরের কাজ, অতি ভক্তি ব্যতিরেকে তাদৃশ পাণ্ডাগণকে প্রণামী দিতে ইচ্ছা হয় না। কি করা যায়, এক-জন পাণ্ডা আমার কপালে রুলী পরালে, তারে আমি কিঞ্চিৎ প্রণামী দিলেম, সে আমার মাথায় একটা ফুল ছুঁইয়ে, অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণে আশীর্ব্বাদ কোল্লে, আমি চুপটী কোরে দাঁড়িয়ে রইলেম। সাধারণ পাণ্ডা ছাড়া কাশীতে আর দুই শ্রেণীর পাণ্ডা আছে, তাদের উপাধি যাত্রাওয়ালা আর গঙ্গাপুত্র। তারা যাত্রী-গণকে তীর্থ দর্শন করায়, দর্শনী আদায় কোরে, বাসাবাড়ী ঠিক কোরে দেয়, দাসী-চাকর নিযুক্ত করবার বন্দোবস্ত করে, যাত্রীদের কাছে বকসীস পায়। একজন পাণ্ডা আমার জন্য একখানি বাসাবাড়ী ঠিক কোরে দিলে, জিনিসপত্র-গুলি সেই বাড়ীতে তুলিয়ে দিলে, আর আর যা কিছু আমার প্রয়োজন, সমস্তই সেই পাণ্ডার দ্বারা সংগৃহীত হলো।

দশাশ্বমেধঘাটে আমি স্নান কোল্লেম। স্নানের পর পাণ্ডাদের যেরূপ দস্তুর আছে, সেই রকমে আমাকে সাজিয়ে দিয়ে তীর্থদর্শনে নিয়ে চোল্লো। প্রথমেই বিশ্বেশ্বরের মন্দির ; দ্বারে ঢুণ্টিগণেশ। অগ্রে ঢুণ্টিগণেশকে প্রণাম কোরে বিশ্বে-শ্বরের মন্দিরে প্রবেশ কোল্লেম। মন্দিরে লিঙ্গরূপী বিশ্বেশ্বর বিরাজমান; লিঙ্গটী একটু পশ্চিমে হেলা। প্রবাদ এইরূপ যে, কালাপাহাড়ের ভয়ে আসল বিশ্বেশ্বর জ্ঞানবাপীতে ডুবে লুকিয়ে আছেন, নকল বিশ্বেশ্বর মন্দিরমধ্যে বিরাজ কোচ্ছেন। শিবলিঙ্গের মস্তকে গঙ্গাজল-বিল্বদল অর্পণ কোরে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোল্লেম। তার পর জ্ঞানবাপী। একটা চতুষ্কোণ কুণ্ড ; কুণ্ডের জল বেলপাতায় ঢাকা ; যাত্রীরা সেই জলে আতপচাল আর বিল্বপত্র নিক্ষেপ করে ; পচাপাতায় কুণ্ডের জল দুর্গন্ধ। যাত্রিগণকে ভক্তিভাবে সেই জল পান কোত্তে হয়। একজন পাণ্ডা বৃহৎ একগাছা লাঠী দিয়ে বিল্বপত্র সরাচ্ছে, পাড়ের উপর তুলে ফেলছে, ষাঁড়েরা মনের আহ্লাদে সেই সকল বিল্বপত্র ভক্ষণ কোচ্ছে। আমি জ্ঞানবাপীর জল এক গণ্ডূষ পান কোরে মাথায় হাত মুছলেম, অন্তরে ভক্তি না এলেও বাহ্যভক্তিভাবে করযোড়ে বাপীকে নমস্কার কোল্লেম।

তার পর অন্নপূর্ণার মন্দির। পাণ্ডা আমাকে সেই মন্দিরে নিয়ে গেল। অসম্ভব লোকের ভিড়। "হর হর বিশ্বেশ্বর ! জয় মা অন্নপূর্ণা !" এককালে বহু রসনায় ইত্যাকার ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত। মানুষের ভিড়ের সঙ্গে

বহুসংখ্যক ষাঁড়ের ভিড় ; দীর্ঘ দীর্ঘ শৃঙ্গবিশিষ্ট স্থূলাঙ্গ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষাঁড়, দেখলেই ভয় হয়, ষাঁড়েরা কিন্তু কাহাকেও কিছু বলে না। পাণ্ডার সঙ্গে আমি মন্দিরে প্রবেশ কোরে অন্নপূর্ণা দর্শন কোল্লেম। দুই প্রকার প্রণামী ; আসলমূর্ত্তি যারা দর্শন কোত্তে যায়, পূজকেরা দরজা বন্ধ কোরে স্বতন্ত্র প্রণামী নিয়ে সেই মূর্ত্তি দেখায়। শুনেছিলেম, অন্নপূর্ণা স্বর্ণ-প্রতিমা, বাস্তবিক তা নয়, পাথরের প্রতিমা, এক হস্তে থালি, এক হস্তে হাতা ; সম্মুখে করযোড়ে সদাশিব। মুখটী অতি সুন্দর, দর্শনমাত্র ভক্তির উদয় হয় ; মূর্ত্তি দর্শন কোরে রোমাঞ্চিতকলেবরে ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে আমি প্রণিপাত কোল্লেম।

মন্দির-দুটী সুনিপুণ স্থপতি-হস্তে বিনির্ম্মিত। বিশ্বেশ্বরের মন্দির-টীর অর্দ্ধাংশ স্বর্ণময়। পাণ্ডার মুখে শুনলেম, পঞ্জাবের মহারাজ রণজিৎ সিংহ ঐ মন্দিরটী আদ্যোপান্ত স্বর্ণমণ্ডিত করবার ইচ্ছা কোরেছিলেন, অর্দ্ধাংশ মণ্ডিত হবার পর মহারাজ রণজিৎ পরলোকযাত্রা করেন, সুতরাং তদবধি ঐরূপ অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের তিন রকম রং ; কতক শ্বেতবর্ণ, কতক রক্তবর্ণ, কতক কৃষ্ণবর্ণ। শোভা রমণীয়।

পূর্ব্বে এমন শুনা ছিল, কাশীপুরী স্বর্ণময়ী পঞ্চক্রোশী। এটী কিন্তু কবি-কল্পনা। কাশীপুরী স্বর্ণপুরী নহে, প্রস্তরপুরী ; এখানকার সমস্ত গৃহই প্রস্তরনির্ম্মিত। মন্দিরদর্শন কোরে বেরিয়ে আমি চতুর্দ্দিকেই শিব-লিঙ্গ দর্শন কোত্তে লাগলেম। কোথাও মন্দিরের ভিতর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ, কোথাও প্রাচীরের ধারে অনাবৃত স্থানে বিল্বপত্রে ঢাকা শিবলিঙ্গ, কোথাও বা এক জায়গায় রাশীকৃত শিবলিঙ্গ। এত শিব কোথাও নাই ; গণনা কোরে সংখ্যা করা যায় না ; সকল শিবের পূজাও হয় না। শিবলিঙ্গ ব্যতিরেকে স্থানে স্থানে আরও অনেক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে, একে একে সেগুলিও আমি দর্শন কোল্লেম। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে পাণ্ডা আমারে নির্দ্দিষ্ট বাসা-বাড়ীতে নিয়ে গেল, যথাসময়ে একজন ব্রাহ্মণ অন্নপূর্ণার ভোগের প্রসাদ আমার বাসায় এনে দিলেন, ব্রাহ্মণকে যথাসম্ভব অর্থ দান কোরে আমি প্রসাদ পেলেম। সে দিন আর কোথাও বেরুলেম না ; সন্ধ্যার পর অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখে অন্তঃকরণ পুলকিত হলো।

বাঙ্গালীটোলায় আমার বাসা হয়েছে। যখন আমি গিয়েছিলেম, তখন কাশীতে অনেক বাঙ্গালীর বাস হয়েছে ; বাঙ্গালীটোলা প্রায় বাঙ্গালীতেই পরিপূর্ণ ; দোতালা, তেতালা, চৌতালা, অনেক বাড়ী ; একতালা বাড়ী প্রায়ই দেখা গেল না ; সকল বাড়ীই পাথরে গাঁথা ; গায়ে গায়ে বাড়ী ; কলিকাতা সহরে অসংখ্য বাড়ী আমি দেখেছি, তুলনায় বোধ হয়, সেখানকার অপেক্ষাও কাশীর বাড়ীগুলি বেশী গিজ্ঞি গিজ্ঞি। কাশীধামের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীটোলার রাস্তাগুলি অতি সঙ্কীর্ণ ; গঙ্গাতীরের রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন গলীতে প্রায়ই গাড়ী যায় না ; অতি কষ্টে পাল্কী যায়, এক একটা গলীতে পাল্কীও যেতে পারে না। এত সঙ্কীর্ণ যে, দুইজন মানুষ পাশাপাশি চোলে যেতেও কষ্ট হয় ; অন্যদিক থেকে একটা ষাঁড় চোলে এলে সে গলীর গন্তব্য পথ বন্ধ

হয়ে যায়। এই কারণেই বাঙ্গালীটোলা সর্ব্বদা অপরিষ্কার দেখায়। আমি শীত-কালে গিয়েছিলেম, গলী-রাস্তাগুলি তত দুর্গম বোধ হলো না, কিন্তু লোকের মুখে শুনলেম, বর্ষাকালে অত্যন্ত কাদা হয়, অনেক লোক গলীতে গলীতে আছাড় খেয়ে কর্দ্দমাক্ত-শরীরে ঘরে ফিরে আসে।

আমার বাসাটী মন্দ হয় নাই। দোতালা বাড়ী, উপর-নীচে অনেকগুলি ঘর, দু-দিকে দুটী সিঁড়ি ; উপরের ঘরগুলি দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সকল ঘরেই লোক আছে ; আমার জন্য দুটী ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল ;—একটী ঘরে শয়ন, একটী ঘরে রন্ধন। বেশ আরামেই ছিলেম। অন্যান্য ঘরে যারা যারা ছিল, তাদের দু-একজনের সঙ্গে সেইখানে আমার আলাপ হয়, তারাও বাঙ্গালী, কিন্তু বহুদিন পশ্চিমে থাকাতে তারা হিন্দীকথা বেশ শিখেছিল, অবকাশকালে আমিও তাদের কাছে হিন্দীভাষা শিক্ষা কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম।

একমাস আমার কাশীবাস হলো। কাশীর মহিমা বিচিত্র। এখানে ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীর লোক আছে। ভক্তিযোগে তীর্থবাসী, তেমন লোক অতি কম, নানা লোক নানা ব্যপদেশে কাশীবাস কোচ্ছে ; নূতন-পরিচিত লোক-গুলির নিকটে যে রকম শুনলেম, তাতে আমার কতক কতক আতঙ্কও হলো, কতক কতক ঘৃণাও জন্মিল।

গৃহস্থলোক ছাড়া উদাসীনলোকের ভক্তি বেশী, এই কথাই লোকে বলে ; কিন্তু একমাস কাশীবাস কোরে যত দূর আমি জানলেম, তাতে কোরে সেই সাধারণ উক্তির সার্থকতা আমি স্বীকার কোত্তে পাল্লেম না। দণ্ডী, সন্ন্যাসী, ভৈরবী, ভৈরব, পাণ্ডা প্রভৃতি তীর্থবাসী লোকেরা বাহিরে যে প্রকার ভাব দেখায়, অন্তরের ভাব সে ভাবের সঙ্গে মিলে না, বিপরীতভাবের সূক্ষ্ম পরি-চয় বিলক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রক্তবস্ত্রের পাগড়ী বাঁধা, রক্তবস্ত্র ঢাকা, বাঁশের কণ্ঠীর দণ্ড হাতে যে সকল লোক ধ্যানযোগে চক্ষু বুজে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, অন্নপূর্ণার মন্দিরে ধারে ধারে বোসে থাকে, এক একবার "বোম কেদার, বোম বিশ্বেশ্বর!" বোলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠে, পুণ্যসঞ্চয় করবার জন্য যাত্রী-লোকেরা নিমন্ত্রণ কোরে, ভক্তিভাবে যাদের ভোজন কোরিয়ে দক্ষিণা দেন, সেই সকল লোকের তীর্থোপাধি দণ্ডী। বিশেষ বিশেষ প্রমাণে আমি জানতে পেরেছি, সেই সকল দণ্ডীর ভিতর দুজন পাঁচজন ছদ্মবেশী গুণ্ডা থাকে। কাশীর গুণ্ডা সর্ব্বত্র বিখ্যাত, গুণ্ডার হাতে অসাবধান নূতন যাত্রিদের প্রাণ পর্য্যন্ত সংকটাপন্ন হয়। টাকার লোভে ডাকাতেরা মানুষ মারে, কিন্তু আমি শুনলেম, কাশীর গুণ্ডারা একখানি লাল গামছার লোভও সংবরণ কোত্তে পারে না ; 'মারি তো হাতী লুটি তো ভাণ্ডার,' এই উপদেশ গুণ্ডাদের কাছে অমান্য, অগ্রাহ্য। পথিক যাত্রীলোকের কাছে ধন-দৌলত আছে কি নাই, গুণ্ডারা সেটা আদৌ বিবেচনা করে না, তাগে বাগে পতনে পেলেই রুল কসায়! কেবল মানুষ মারা আর মানুষের অর্থ অপহরণ করা গুণ্ডাদের কার্য্য নয় ; দুরন্তলোকেরা বৈরনির্য্যাতনের বাসনায় সঙ্গোপনে গুণ্ডা ভাড়া করে, গুণ্ডারা সেই অর্থলোভে নির্দ্দোষ নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ কোরে থাকে ; জাতিকুল পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে নষ্ট করে!

অনেক আমি দেখলেম ; ভক্ত দেখলেম, দণ্ডী দেখলেম, সন্ন্যাসী দেখলেম, ভৈরবী দেখলেম, কুমারী দেখলেম, ভেকধারী শৈব দেখলেম, গৃহস্থ দেখলেম, তীর্থবাসী দেখলেম, নূতন নূতন যাত্রীও দেখলেম, কিছুই দেখতে বাকী রাখলেম না। পাণ্ডারা তো যাত্রীলোকের নিত্য-সহচর, পাণ্ডা দেখবার জন্য চেষ্টা কোত্তে হয় না, সময় খুঁজতে হয় না, সর্ব্বসময়েই পাণ্ডাদের গতিক্রিয়া বিলক্ষণ দেখা যায়। সমস্তই আমি দেখলেম। দিন দিন নূতন নূতন কাণ্ড দেখে, নূতন নূতন গল্প শুনে, শান্তির পরিবর্ত্তে ক্রমশই আমার ঘৃণা ও শঙ্কার মাত্রা বেড়ে বেড়ে উঠলো।

আরও একমাস। এই দুই মাসে এই পুণ্যক্ষেত্রের গুহ্যরহস্য আমি অনেক জানতে পাল্লেম। যে সকল বিদেশী লোক মুক্তিকামনায় কাশীধামে চিরদিন বাস করবার সংকল্প কোরে কাশীবাসী হয়ে আছেন, কাশীতে জীবনান্ত হোলে মোক্ষ হয়, মোক্ষদাতা মহাদেব স্বয়ং মুমূর্ষুর কর্ণমূলে তারকব্রহ্মনাম শুনিয়ে দেন, মৃতজীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয় ; জীবের দক্ষিণকর্ণে মহেশ্বর তারকব্রহ্মমন্ত্র দেন, এই জন্য যাঁরা যাঁরা কাশীতে মরেন, বিশ্বেশ্বরের কৃপায় মরণকালে তাদের দক্ষিণকর্ণটী উপরদিকে থাকে ; কেবল মানুষের নয়, গো, অশ্ব, কুকুর, বিড়াল, গর্দ্দভ ইত্যাদি সমস্ত জীবজন্তুরও ঐ রকম। মরণের স্থানাস্থানও বিচার নাই আঁস্তাকুড়ে মৃত্যু হোলেও শিবত্বপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহ ; এই বিশ্বাসে অনেক লোক কাশীবাসী, তন্মধ্যে বঙ্গবাসীর সংখ্যা কিছু অধিক।

বাসাবাড়ীতে আমি থাকি ; বাসার লোকের রীতিচর্য্যা যত দূর পারি, আলোচনা করি, একজনেরও চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে না। যাঁরা যাঁরা পুত্র-পরিবার নিয়ে গৃহবাসী হয়ে আছেন, তাঁদের ব্যবহার বাস্তবিক কিরূপ, সেটা আমি ঠিক জানতে পারি না। কত দিন আমি কাশীতে থাকবো, সেটাও নিশ্চয় কোরে বোলতে পারি না। গৃহস্থ-ব্যবহার অবগত হবার নিমিত্ত বড়ই ইচ্ছা হলো ; কি প্রকারে কৃতকার্য্য হওয়া যায় তারই উপায়, তারই সুবিধা অন্বেষণ কোত্তে লাগলেম ; ঘরে বোসে সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, প্রত্যহ পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম।

এখানকার দোকানদারেরা সকলেই খোট্টা, বাঙ্গালী দোকানদার প্রায় একজনও দেখলেম না। খোট্টামহলে বড় বড় গদিয়ান মহাজনও আছে, তারা নানা রকম বড় বড় কারবার করে, কারবারে তাদের বিলক্ষণ লাভও হয়। এক একদিন আমি এক একজন মহাজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে কারবারের কথা তুলেছিলেম, চাকরীতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না, কারবার করবার ইচ্ছা ছিল, সেই জন্যই কারবারী লোকের কাছে কারবারের কথা তুলেছিলেম। কত টাকা আমার আছে, একজন মহাজন সেই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, যা আমার সম্বল, সেই কথা আমি বোলেছিলেম, শুনে তিনি হো হো শব্দে হাস্য কোরেছিলেন।

পূর্ব্বে আমি বোলতে ভুলেছি, নৌকাতে মোহনলালবাবু আমাকে যে কখানি নোট দিয়েছিলেন, সে সময় গণনা করা হয় নাই, তার পর গণনা কোরে দেখি, দশখানি ; প্রত্যেক নোট ১০০৲ টাকা, দশখানিতে হাজার টাকা। বীরভূমের

নরহরিবাবু দিয়েছিলেন ৫০০৲ টাকা, এই হলো দেড় হাজার ; তা ছাড়া কলিকাতায় প্রতাপবাবুর বাড়ীতে সাতমাসে জলপানী পেয়েছিলেম ৩৫৲ টাকা, বকসীস পেয়েছিলেম, ৬৫৲ টাকা। এই ষোল-শ টাকার মধ্যে নৌকাভাড়া আর খোরাকী ইত্যাদিতে ৫০৲ টাকা খরচ হয়েছিল, বাকী টাকায় বড় কারবার চলতে পারে না, মহাজনের মুখে শুনে দিনকতক আমি হতাশ হয়েছিলেম। তার পর যে ঘটনা হয়, একটু পরেই প্রকাশ পাবে। এখন নগরভ্রমণের কিঞ্চিৎ ফলাফল প্রকাশ করি।

বাঙ্গালীটোলার প্রায় একক্রোশ দূরে সিক্রোল। সিক্রোলে ইংরেজলোক বাস করেন। কাশীর আদালতগুলি সিক্রোলে অবস্থিত। সেখানকার রাস্তাঘাট প্রশস্ত, দিব্য পরিষ্কার। বাঙ্গালীরা সাহেবলোককে ম্লেচ্ছ বলেন, কিন্তু সাহেবলোকের বাসস্থানগুলি, সাহেবপল্লীর রাস্তাগুলি নিরপেক্ষচক্ষে দর্শন কোল্লে বাঙ্গালীকেই সে অংশে বরং ম্লেচ্ছ বোলে মেনে নিতে হয়। ইংরেজটোলা দেখলেম, ময়দান দেখলেম, উদ্যান দেখলেম, আদালত দেখলেম, অন্তরে আনন্দোদয় হলো। একদিন দেখলেম বরুণা-অসিসঙ্গম। এই দুটী নদী ভাগীরথীর শাখা ; এই দুই নদীর নামেই কাশীর দ্বিতীয় নাম বারাণসী।

একদিন দুর্গাবাড়ী দর্শন কোল্লেম। দুর্গাবাড়ীতে দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি প্রতিটি নিত্য পূজা হয়, বলিদান হয়, ভোগ হয়, অনেক লোক প্রসাদ পায়। অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের সন্নিধানে যেমন ষাঁড় অনেক, দুর্গাবাড়ীতে সেইরূপ বানর অনেক। যাত্রীরা দুর্গাবাড়ীতে প্রবেশ করবার সময় সেই সকল বানরকে দুটী দুটী ছোলা দেয়, বানরেরা তুষ্ট থাকে, যাত্রিগুলিকে কিছু বলে না ; যারা কিছু খাদ্যসামগ্রী না দেয়, তাদের আঁচড়ায়, কামড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে দেয়, উৎপাত করে। দুর্গাবাড়ীতেও অনেক প্রকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কাশীর বাঙ্গালীটোলায় যাঁরা ছাগমাংসভক্ষণে ইচ্ছা করেন, তাঁরা দুর্গাবাড়ী থেকেই প্রসাদী মাংস আনিয়ে থাকেন।

সপ্তদশ কল্প

লালা বুলকচাঁদ

দুর্গাবাড়ী-দর্শনের সাতদিন পরে আপনার বাসাঘরে আমি একাকী বোসে আছি, বেলা অপরাহ্ন এমন সময় সেইখানে একটী লোক এলেন। দিব্য গৌরবর্ণ, বেশ মোটাসোটা, গায়ে চাপকান, চড়ীদার পায়জামা, কাণে বীরবৌলী, কপালে রক্তচন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা, দিব্য কেয়ারীকরা গোঁফ, কাণের দুপাশে ছোট ছোট গালপাট্টা, মাথায় সবুজবর্ণ পাগড়ী, বয়স অনুমান ৪০।৪৫ বৎসর। লোকটী এসেই আমারে হিন্দীভাষায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সিদ্ধেশ্বরবাবু কাঁহা ?"—আমিও তখন অল্প অল্প হিন্দী শিখেছিলেম, হিন্দীতেই

উত্তর কোল্লেম, "আদালতে একটা মামলা আছে, সিক্রোলে গিয়েছেন, ফিরে আসতে সন্ধ্যা হবে ; সন্ধ্যার আগেও আসতে পারেন।"

আমার কথা শুনে সিদ্ধেশ্বরবাবুর অপেক্ষায় সেই লোকটী আমার ঘরে আমার কাছেই বোসলেন। কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কতদিন কাশীতে আছি, কাজকর্ম্ম কি করি, লোকটী আমাকে এই সব কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেন। যেমন যেমন প্রশ্ন, সংক্ষেপে সংক্ষেপে আমি সেই ভাবেই উত্তর দিলেম। কাজকর্ম্ম কিছুই করি না, এই কথা শুনে গম্ভীরভাব ধারণ কোরে লোকটী বোল্লেন, "নিষ্কর্ম্মা বোসে আছ ? কাজকর্ম্ম কিছুই নয় ? এ কেয়া তাজ্জব কী বাত !"

একটু চুপ কোরে থেকে আমি আবার বোল্লেম, "কাজকর্ম্ম কোথাও মিলছে না, নূতন এসেছি, সকলের সঙ্গে জানাশুনা হয় নাই, কোথায় কাজ-কর্ম্ম পাওয়া যায়, তাও ঠিক জানি না, কাজে কাজেই নিষ্কর্ম্মা থাকতে হয়েছে।"

লোকটী আপশোষে করতালি দিয়ে বোল্লেন, "হায় হায় হায়! বাঙ্গালী কেবল চাকরী চাকরী কোরেই হায়রাণ হয়! চাকরী না পেলেই হাত-পা গুটিয়ে জড়ভরত হয়ে বোসে থাকে! এই জন্যই বাঙ্গালীর কপালে ভাল হয় না। কারবারে বাঙ্গালীর মতি নাই, উৎসাহ নাই, সাহস নাই, সেই জন্যই বাঙ্গালী কষ্ট পায়।"

লোকটীর কথায় আমি বড় লজ্জা পেলেম ; লজ্জার সঙ্গে একটু উৎসাহও অন্তরে অন্তরে উদয় হলো। যে লোকের সঙ্গে কথা, সে লোক অবশ্যই বাণিজ্যপ্রিয়, বাণিজ্যে লিপ্ত, লক্ষণেও বুঝলেম, কথার ভাবেও বুঝলেম। কার-বারে আমারও বিশেষ অনুরাগ, নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, নিঃসহায়, সেই জন্যই সুবিধা ঘটে না। তখন আমার হাতে কিছু টাকা ছিল, উৎসাহে উৎসাহে নম্র-স্বরে লোকটীকে আমি বোল্লেম, 'আমি বাঙ্গালী, আমার সহায়-সম্পদ কিছুই নাই, জানাশুনা আপনার লোক কেহই নাই, তীর্থদর্শনের অভিলাষে কাশী-ধামে আমার আসা ; দাসত্বের প্রতি আমার ঘৃণা আছে ; কিন্তু অর্থাভাবে আর পৃষ্ঠপোষক সহায়ের অভাবে কোন কারবারে প্রবৃত্ত হোতে পারি না। কোন সদাশয় ব্যবসায়ী ভদ্রলোক যদি আমার প্রতি দয়া করেন, তা হোলে আমি—"

আমার সকল কথা না শুনেই, একটু মুখ ভারী কোরে, লোকটী একটু থেমে থেমে বোল্লেন, "তাই তো! গোড়ায় কিছু টাকা না থাকলে, কোন কারবারেই সুবিধা ঘটে না, শূন্যভাগী থাকলে এক রকম চোলতে পারে বটে, কিন্তু সে কাজে পরিশ্রম বেশী, দায়িত্বও বেশী ; তুমি বালক, ততটা ভারবহন কোত্তে পারবে না। কোন রকমে কিছু টাকা যদি যোগাড় কোত্তে পার, তা হোলে এক প্রকার উপায় হোতে পারে। আমি কারবারী লোক, কাশী, প্রয়াগ, পঞ্জাব এবং কলিকাতায় আমার নানা রকম কারবার চলে ; আমি তোমাকে একজন অংশী কোরে নিতে পারি। এখানে আজ আমি যাঁর তত্ত্বে এসেছি, সেই সিদ্ধেশ্বর-বাবু সম্প্রতি আমার একজন অংশী হয়েছেন, মাসে মাসে তাঁর বিলক্ষণ দশ

টাকা আয় হোচ্ছে ; তুমি যদি সেই রকমে আমার অংশী হোতে পার, তা হোলে তোমারও অল্পশ্রমে অধিক আয় হোতে পারে, সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনগুজ-রাণের সুবিধা হয়।"

একটু পূর্ব্বেই অন্তরে উৎসাহের উদয় হয়েছিল, আরও উৎসাহ পেলেম : আগ্রহে আগ্রহে লোকটীকে আমি বোল্লেম, "কিছু টাকা আমার কাছে আছে, তাতে যদি আপনার অভিপ্রায়মত কার্য্য চলে, তা হোলে—"

এবারেও লোকটী ধৈর্য্য রাখতে পাল্লেন না, আমার অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যে বাধা দিয়ে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কত টাকা?"—আমি উত্তর কোল্লেম, "দেড় হাজার।"

যেন তাচ্ছীল্যভাবে একটু মুচকে হেসে লোকটী বোল্লেন, "ছেলেবুদ্ধিতে ছেলেখেলার কথাই আগে যোগায় : দেড় হাজার টাকাতে কি বড় কারবারের অংশী হওয়া যায়? আচ্ছা, বালক তুমি, তোমার কথা শুনে তোমার উপর আমার স্নেহ হোচ্ছে, সেই দেড় হাজার টাকাতেই আপাততঃ আমি তোমাকে কারবারে নামাব ; আগামী শুক্রবার বেলা দশটার পর টাকাগুলি নিয়ে আমার কুঠীবাড়ীতে আমার সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ কোরো। সিদ্ধেশ্বরবাবু আমার কুঠীর ঠিকানা জানেন, তাঁকেও আমি বোলে যাব, তিনি তোমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাবেন।"

এই সব কথা হোচ্ছে, সিদ্ধেশ্বরবাবু এলেন : মহাজনকে আমার ঘরে দেখে অগ্রে আমার ঘরেই প্রবেশ কোল্লেন। "রাম রাম" নমস্কার বিনিময়ের পর উভয়ে একসঙ্গে পাশের ঘরে চোলে গেলেন ; আমার সাক্ষাতে তাঁদের তখন কিছু কথাবার্ত্তা হলো না।

আমি একাকী হোলেম। একাকী হোলেই চিন্তার অবসর ভাল পাওয়া যায়, চিন্তা আমার নিত্য-সহচরী, চিন্তাকে আহ্বান কোল্লেম। চিন্তার সঙ্গেই আমার কথোপকথন। এক বাসায় থাকা, সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সিদ্ধেশ্বরবাবু বঙ্গদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলের লোক, জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ, বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর ; বেশ মিষ্টভাষী, সদালাপী, ব্যবহারে বোধ হয়, উদারপ্রকৃতি ; চেহারাও বাবুর মত, পরিচ্ছদগুলিও বাবুর মত, খরচপত্রও বাবুর মত। এক একদিন তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, আমিও মাঝে মাঝে তাঁদের নিমন্ত্রণ করি, অল্পদিনে দুজনে বেশ সদ্ভাব হয়েছিল। তিনি যদি মধ্যবর্ত্তী হয়ে ঐ মহাজনের সঙ্গে আমার মিশ খাইয়ে দেন, তা হোলে ভালই হবে, এইরূপ আশা জন্মিল।

আধঘণ্টা পরে সেই হিন্দুস্থানী মহাজনটী সিদ্ধেশ্বরবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, মুখখানি বেশ প্রফুল্ল প্রফুল্ল দেখলেম, আমার ঘরের চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়িয়ে প্রসন্নবদনে বোল্লেন, "ঠিকঠাক হয়ে গেল ; বাবুকে আমি সব কথা বোলে গেলেম ; যেয়ো, মনে রেখো শুক্রবার।"

আমি নমস্কার কোল্লেম, তিনি একবার আপনার কপালের কাছে অঙ্গুলি তুলে চঞ্চলচরণে চোলে গেলেন। আমি উৎকণ্ঠিত হোলেম ; কতক্ষণে কাজের কথা শুনবো, সেই উৎকণ্ঠায় ঘরের ভিতর পাইচারী কোত্তে লাগলেম। সিদ্ধে-

শবরবাবু আমার ঘরে আসবেন, সেই সব কথা বোলবেন, অপেক্ষা কোত্তে না পেরে আমি নিজেই তাঁর ঘরে চোলে গেলেম। আমারে দেখেই একটু হেসে মিহি আওয়াজে তিনি বোল্লেন, "কি হরিদাস! কারবার কোরবে? মহাজন হবে?—আচ্ছা, আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! এই বয়সে তোমার এমন সৎপ্রবৃত্তি হয়েছে, শুনে আমি খুসী হোলেম। শুক্রবার আমি তোমাকে কুঠীতে নিয়ে যাব, যা যা কোত্তে হয়, বন্দোবস্ত কোরে দিব; লোকটী খুব ভাল, তার কারবারে আমিও একজন অংশী, আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে তোমার ভালই হবে। মহাজন একটু 'কিন্তু' রেখে গিয়েছেন; কম টাকা তোমার, আপাততঃ বেশী লাভ পাবে না। তা হোক, ক্রমশই সুবিধা হয়ে আসবে। মহাপুরুষেরা বলেন, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।"

যে কথায় যে উত্তর দিতে হয়, সেইভাবে সকল কথার আমি উত্তর কোল্লেম; কথাপ্রসঙ্গে আরও পাঁচরকম কথা এসে পোড়লো, কথায় কথায় জানলেম, সেই মহাজনটীর নাম লালা বুলকচাঁদ।

রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় আমি আপনার ঘরে এলেম, আহারাদি কোরে যথা-সময়ে শয়ন কোল্লেম, শীঘ্র নিদ্রা এলো না। ভাবনার সঙ্গে নিদ্রার বড় বিরোধ। সুভাবনাতেও শীঘ্র নিদ্রা আসে না, কুভাবনাতেও আসে না। দুর্ভাবনা আমি অনেক ভেবেছি. ভাবনার আগুনে চিত্ত আমার অহরহঃ পুড়ে পুড়ে গিয়েছে, আজ রাত্রের ভাবনাটী কিছু শুভ। বিদ্যাশিক্ষার অগ্রে এদেশের শিশুদের যেমন হাতে-খড়ি হয়, আমারও সেইরূপ কারবারে হাতেখড়ি; বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে; অল্প টাকায় একটা বড় কারবারের অংশী হব; কাশীর একজন বড় মহাজনকে বন্ধু পাব; হৃদয়ে পরমানন্দ। সংসারে থাকতে গেলে টাকার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হয়;—চিরদিন আমি গরিব, টাকার মুখ আমি কখনো দেখি নাই; আমার হাতে এখন দেড় হাজার টাকা। বড়লোকের হস্তে দানপ্রাপ্তি। দাতা হোলেন নরহরিবাবু আর মোহনলালবাবু। মনে মনে তাঁদের উভয়কে নমস্কার কোরে আপনাকে আপনি কৃতার্থ বোধ কোল্লেম। এই ভাবে থাকতে থাকতে নিদ্রা এলো, আমি ঘুমালেম। অনেক দিনের পর কাশীধামে এই রাত্রে আমার সুখের নিদ্রা। আজ আমার প্রতি নিদ্রাদেবীর বড়ই অনুগ্রহ।

সুখের রজনী সুপ্রভাত। কাশীর প্রভাত আনন্দময়। ভক্তের মুখে ঘন ঘন অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের নাম, গঙ্গাস্নানের যাত্রীর মুখে গঙ্গাদেবীর স্তব, দণ্ডী-সন্ন্যাসীর মুখে বম বম ববম শ্রীমধুরধ্বনি, ভক্তমাত্রেই পূজার আয়োজন ভক্তিমান। আমিও গঙ্গাস্নান কোল্লেম, আমিও দেবদেবী দর্শন কোল্লেম, আমিও জয় বিশ্বেশ্বর জয় অন্নপূর্ণা গান কোল্লেম; হৃদয়ে ভক্তি-সিন্ধু উথলিল। আমার ভক্তিদর্শনে আকাশে সূর্য্যদেব মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেন। শীতকালে সূর্য্যের হাস্য মৃদু হয়, বিশেষতঃ প্রভাতে; অতএব আমি সূর্য্য-মণ্ডলে মৃদুহাস্য দর্শন কোল্লেম।

আজ মঙ্গলবার। তিন দিন পরে বুলকচাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার দিন-স্থির। বঙ্গদেশে শারদীয়া মহামায়ার আগমনে ভক্তজনের তিনটী দিন যেমন শীঘ্র শীঘ্র চোলে যায়, আমারও এই তিনটী দিন—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, এই

তিনটী দিন সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র চোলে গেল। শুক্রবারের প্রভাত। সকাল সকাল স্নান-আহার সমাপন কোরে, সঞ্চিত ব্যাঙ্কনোটগুলি সঙ্গে নিয়ে একখানি এক্কাগাড়ী ভাড়া কোরে, সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমি বুলকচাঁদের কুঠীতে উপস্থিত হোলেম। মস্ত একখানা বাড়ী। লোকজন অনেক যাওয়া আসা কোচ্ছে, অনেক লোকের মুখে অনেক রকম কথা, সমস্ত লোক হিন্দুস্থানী, একখানি বাঙ্গালীর মুখও দেখতে পেলেম না। নীচের তালায় ছোট একটী ঘরে আমারে বোসিয়ে, সম্মুখে হস্তবিস্তার কোরে সিদ্ধেশ্বরবাবু বোল্লেন, "কৈ তোমার টাকা? দাও, টাকাগুলি আমার হাতে দাও, খাতায় জমা দিয়ে একটু পরেই রসীদ এনে দিচ্ছি। কোথাও তুমি যেয়ো না, কাকেও কিছু বোলো না, চুপ কোরে বোসে থাকো, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, আমার নাম কোরো না; শীঘ্রই আমি ফিরে আসছি।"

বাবুর হস্তে ১৫ খানি নোট সমর্পণ কোরে, উপদেশমত চুপটী কোরে, সেই ঘরে আমি বোসে থাকলেম। বাবু অন্যদিকে চোলে গেলেন। যে ঘরে আমি বোসলেম, সে ঘরে তখন একটীমাত্র লোক ছিল, দেখতে দেখতে আরও পাঁচ সাতজন এসে সেইখানে গোলমাল কোত্তে লাগলো। সকলেই হিন্দুস্থানী; প্রায় সকলেই চাপকানপরা, পাগড়ী বাঁধা, দুই একজনের খালি গা। তাদের কথাবার্ত্তা শুনে লক্ষণটা বড় ভাল বোধ হলো না। তিন চারিজন ভুঁড়িওয়ালা লোক সেইখানে বোসে বোসে গাঁজা সেজে খেলে, রকমারিসুরে উচ্চ উচ্চ আওয়াজে গান ধোল্লে, এক একবার বম মহেশ্বর বোলে হেসে উঠলো। আমি অবাক! প্রায় এক ঘণ্টা বোসে আছি, সিদ্ধেশ্বরবাবু ফেরেন না, দেড়ঘণ্টা হয়, তখনো আসেন না; দশটার সময় এসেছিলেম, দু-ঘণ্টা অতীত হলো, বারোটা বেজে গেল, তখনো পর্য্যন্ত দেখা নাই! বড়ই অস্থির হোলেম। একবার ভাবলেম, উঠে গিয়ে তত্ত্ব নিয়ে আসি, আবার ভাবলেম, উঠে যেতে বারণ, বিশেষতঃ কোন দিকের কোন ঘরে তাঁরা আছেন, উপরে কি নীচে, তাও ঠিক জানি না, কোথায় গিয়ে অন্বেষণ কোরবো, খুঁজেই হয় তো পাব না; এই সব আলোচনা কোরে সেখান থেকে উঠলেম না, সমভাবেই বোসে থাকলেম। মন কিন্তু ক্রমশই চঞ্চল।

নীরবে একধারে আমি বোসে আছি, লোকেরা হয় তো এতক্ষণ আমাকে দেখতে পায় নাই, আপনাদের আমোদেই—আপনাদের কথাতেই আপনারা মত্ত ছিল, দেখেও হয় তো দেখে নাই, এই সময় হঠাৎ একজন ভুঁড়িওয়ালা লোক আমার দিকে এগিয়ে এসে, কটমটচক্ষে চেয়ে, গর্জ্জন কোরে বোল্লে, "তুই ছোঁড়া কে রে? এখানে বোসে বোসে তুই কি কোচ্ছিস? উঠে যা! দূর হয়ে যা! আমাদের ঘরে তোর কি দরকার? কোথাকার পাপ! দূর হয়ে যা!"

লোকটার গভীরগর্জ্জনে আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো; মনেও বড় ভয় হলো; ভয়ে ভয়ে বিনম্রস্বরে বোল্লেম, "আমি একটী বাবুর সঙ্গে এসেছি, বুলকচাঁদ মহাজনের কাছে আমাদের বিষয়কর্ম্মের কথা আছে, বাবু আমাকে এইখানে রেখে তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়েছেন, এখনি আসবেন, তিনি এলেই—"

লোকটা অকস্মাৎ রেগে উঠে, এক হ্যাঁচকাটানে আমার হাত ধোরে তুলে, রক্তচক্ষু পাকল কোরে, ঘাড় বেঁকিয়ে, আরও অধিকগর্জ্জনে বোলতে লাগলো, "দূর হয়ে যা! কোথাকার বাবু? কোথাকার বুলকচাঁদ? এখানে তারা থাকে না। এটা আমাদের বাড়ী, আমাদের ঘর, আমরাই এখানকার কর্ত্তা, বুলকচাঁদ ফুলকচাঁদকে আমরা চিনি না, কোথাকার কে তুই, এখনি বেরিয়ে যা! সহজে না গেলে ধাক্কা দিয়ে বাহির কোরবো, ঘুষী মেরে মুণ্ড ঘুরিয়ে দেবো!" এই সব কথা বোলতে বোলতে সেই লোক আমাকে জোরে জোরে ঠেলে ঠেলে দরজা পর্য্যন্ত নিয়ে এলো; যে কথা আমি বোলছিলেম, তা আর বোলতে দিলে না; তার সঙ্গীলোকেরাও সেই রকম গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে তার সঙ্গে এসে যোগ দিলে।

আমি ঠক ঠক কোরে কাঁপতে লাগলেম। কোন কথাই তারা শুনে না, কোন কথাই বোলতে দেয় না, কেবল রেগে রেগে আমাকে গালাগালি দেয় আর জোরে জোরে ধাক্কা মারে! কিছুই শুনে না, তথাপি আমি বার বার মিনতি কোরে বোলতে লাগলেম, "কেন তোমরা আমাকে মারো? কেন আমাকে তাড়িয়ে দাও? কোন দোষ আমি করি নাই, বুলকচাঁদবাবুর কুঠী, সিদ্ধেশ্বরবাবু আমাকে এনেছেন, তোমরা দয়া কর, সিদ্ধেশ্বরবাবু এলেই আমি বেরিয়ে যাব, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকবো না।

দলের ভিতর একজন কিছু ভালমানুষ ছিল, সেই লোকটী ঐ দুরন্ত লোকগুলাকে একটু থামিয়ে, আমার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কোল্লে। শুনে তার যেন কিছু কষ্ট বোধ হলো; আমাকে একটু সোরিয়ে এনে দুঃখ প্রকাশ কোরে বোল্লে, "সব ফক্কিকার! সমস্তই মিথ্যা! এ বাড়ী বুলকচাঁদের নয়, কোন কারবারের কুঠী-বাড়ীও নয়, বুলকচাঁদ নামে কোন মহাজনও এ সহরে নাই, এ বাড়ীটা সোখীনলোকের খেলাঘর; দিবারাত্রি এখানে জুয়াখেলা হয়; একটা লোক এখানে মাঝে মাঝে আসে বটে, তার নাম বুলকচাঁদ; সে লোকটা জুয়াড়িদলের একজন দালাল; নিজেও একজন জুয়াড়ী; তুখোড় জুয়াড়ী; পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে নূতন নূতন শীকার ধোরে আনে; তোমার মতন ছোকরা শীকার তার হাতে প্রায়ই পড়ে। কেন তুমি তার সঙ্গে মিশতে গিয়েছিলে? কেন তার সাক্ষাতে টাকার কথা বোলেছিলে? টাকার কথা বলাতেই তোমার এই দশা ঘোটেছে! টাকাগুলি তোমার গিয়েছে! ধড়ীবাজ বুলকের খর্পরে পোড়েছে, আর উদ্ধার হবে না! তুমি ঘরে যাও! ঘরে গিয়ে বোসে বোসে কাঁদো! একটা বাঙ্গালী সেই বুলকের সঙ্গে আসে বটে, সেটাও বুলকের পেটাও দালাল; তারা দুজনে মিলে তোমার টাকাগুলি ফাঁকী দিয়েছে! আর কেন এখানে বৃথা কষ্ট পাও? বিদায় হও! সন্ধ্যা হোলেই বিপদ ঘোটবে!"

আমি কেঁদে ফেল্লেম। দারুণ শীতেও দরদরধারে আমার অঙ্গে ঘাম ঝরতে লাগলো, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে এলো, লোকেরা আমার হাত ধোরে রেখেছিল, ঘরের বাহির কোরে দিয়ে যখন হাত ছেড়ে দিলে, তখন আমি কাঁপতে কাঁপতে একখানা পাথরের উপর বোসে পোড়লেম। যে

লোকটী মিষ্টকথা বোলেছিল, মিষ্টকথায় প্রবোধ দিয়ে হতাশ কোরে দিয়েছিল, কেঁদে সে লোকটীর পায়ে ধোরে কাতরবচনে বোল্লেম, "সিদ্ধেশ্বরবাবু গেল কোথা ? টাকা পাই না পাই, একবার তার সঙ্গে দেখা কোরে যাওয়া আমার ইচ্ছা। বুলকচাঁদ কি এখন এ বাড়ীতে আছে ? আপনি যদি দয়া কোরে একবার সংবাদ দেন কিম্বা আমারে সঙ্গে কোরে তাদের কাছে নিয়ে যান, তা হোলে চক্ষের জলে আমি তাদের পাষাণ-অঙ্গ অভিষিক্ত কোরে আসি!"

যখন ১২টা বেজেছিল, তখন আমার জ্ঞান ছিল, তার পর খোট্টাদের হুড়াহুড়িতে, চীৎকারধ্বনিতে, ধমকানীতে আমি এক প্রকার জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেম ; যখন শুনলেম, জুয়ার আড্ডা, যখন শুনলেম, আমার টাকাগুলি জুয়াচোরে ফাঁকী দিলে, তখন আমি পাগল হয়েছিলেম ; বেলা শেষ হয়ে এসেছিল, সূর্য্যদেব অস্তে যাচ্ছিলেন, কিছুই জানতে পারি নাই ; সন্ধ্যা হয়, সিদ্ধেশ্বর এলো না, তখন নিশ্চয় বুঝলেম, জুয়ারীই হোক, গাঁজাখোরই হোক, যে সব কথা এরা বোল্লে, সমস্তই সত্য। যে লোকটীকে শেষের কথাগুলি আমি বোল্লেম, বড় একটা হাই তুলে, সহানুভূতি জানিয়ে, সেই লোকটী বোল্লে, "হায় হায়! ছেলেমানুষ, ছেলেবুদ্ধি, এখনও দেখা করবার ইচ্ছা! হায় হায়! এ বাড়ীটার চারিদিকে চারিটা দরজা। কে কখন কোন দিক দিয়ে আসে, কোন দিক দিয়ে যায়, কেহই জানতে পারে না। যার সঙ্গে তুমি এসেছ বোলছো, সে লোক কখন কোন দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, কে তার সন্ধান কোরবে ? বুলকচাঁদের কথা। বুলকচাঁদ দিনমানে আসে না, রাত্রে আসে ; তাও আবার ঠিক নাই, সকল রাত্রে দেখা দেয় না। আজ একটা শীকার কোরেছে,—একটা কি কটা, তারাই জানে, কি কোরে বলা যাবে, শীকার যখন কোরেছে, তখন আজ আর এখানে তাদের পদার্পণ হবে কি না, সে পক্ষে সম্পূর্ণই সন্দেহ। তুমি ঘরে যাও। তাদের সঙ্গে আজ আর তোমার দেখাসাক্ষাৎ হবে না!"

হতাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমি বাসাবাড়ীতে ফিরে চোল্লেম। আর তখন এক্কাগাড়ীর ভাড়া জুটলো না, সন্ধ্যাকালে পদব্রজেই চোল্লেম। তখনো আমার মনে মনে আশা, সিদ্ধেশ্বরকে পাওয়া যাবে। এক বাড়ীতেই থাকা হয়, বাসা ছেড়ে কোথায় পালাবে সিদ্ধেশ্বরকে পাওয়া গেলেই টাকার কিনারা হোতে পারে। বুলকচাঁদকে দরকার নাই। সিদ্ধেশ্বরের হাতেই আমি টাকা দিয়েছি, সিদ্ধেশ্বরকে পেলেই হয় তো টাকা পাব। আকাশ-কুসুম আশা আমাকে তখন ঐ কথাই বোলে দিলে। হতাশ প্রাণের চমৎকার সান্ত্বনা! আশাকে লোকে নিন্দা করে, কিন্তু আমি তো বলি, আশাদেবী করুণাময়ী। আশা যাদের সফল হয় না, তারাই বলে, আশা পিশাচী সফল বিফল উভয় অবস্থাতেই আশাকে আমি দেবী-কল্পনায় পূজা করি। আশাদেবী সংসারে কত শত লোককে নিতান্ত দুঃসময়েও প্রাণে বাঁচিয়ে রাখেন, মহাশোকেও প্রবোধ দান করেন ; এমন উপকারিণী আশাকে পিশাচী বলা অধর্ম্মের কথা।

আশাকে সহচরী কোরে বাসায় এসে আমি পোঁছিলেম। অগ্রেই সিদ্ধেশ্বরের ঘরে। ঘর পরিষ্কার! একগাছি ঝাঁটা পর্য্যন্তও ঘরে নাই! সমস্ত

আসবাবপত্র তিরোহিত! এ কার্য্য কখন হলো? আমাকে সংগে কোরে সিদ্ধেশ্বর আজ সকালে যখন এক্কায় আরোহণ করে, তখন কি ঘরের জিনিস ঘরে ছিল না? না থাকাই সম্ভব? সোমবার রাত্রে বুলকচাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল, আমার কাছে টাকা পাবার পরামর্শও সোমবারে, সুতরাং মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি তিন দিন সময় ছিল: সেই তিন দিনের ভিতরেই সিদ্ধেশ্বর আপন অভিসন্ধি সিদ্ধ কোরে নিয়েছে, বাসার সমস্ত জিনিসপত্র সোরিয়ে ফেলেছে, বাড়ীওয়ালাকে ফাঁকী দিয়েছে, আমার তো একেবারেই সর্ব্বনাশ! আমি এখন যে ফকির, সেই ফকির! আবার আমি পথে দাঁড়ালেম! ঐ দেড় হাজারের উপর যা কিছু ছিল, কলিকাতা থেকে কাশীতে পোঁছিবার নৌকাভাড়া আর কাশীর খরচপত্রে সমস্তই ফুরিয়ে গিয়েছে, দু-একটী টাকা সম্বল থাকা সম্ভব, কিন্তু তাতেই বা কি হবে? বাসার জিনিসপত্র বিক্রয় কোল্লে নগদ কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তা হোলেই বা থাকি কিরূপে? ঘর রাখতে পারবো না; কোথা থেকে ভাড়া দিব? ঘর না থাকলে জিনিসপত্রই বা থাকে কোথা? বিধাতা আমার ভাগ্যে এক আঁচোড়ে যা কিছু লিখে দিয়েছেন, শিশুকাল থেকেই সেই সকল ফল ফলে আসছে! চিরজীবন আমি নিরাশ্রয়—নিঃসম্বল! বিধাতার লিখন কখনো কি খণ্ডন হোতে পারে? দুটী দাতালোক দয়া কোরে এই অভাগারে দেড় সহস্র মুদ্রা প্রদান কোরেছিলেন, অভাগার কাছে সে দেড় সহস্র কত দিন থাকতে পারে?—ভোগেও এলো না, খরচও কোল্লেম না, কোন সৎকার্য্যে এক পয়সা দানও কোল্লেম না; জুয়াচোরে ঠকিয়ে নিলে! এখন যাই কোথা? থাকি কোথা? খাই কি?

লালা বুলকচাঁদ! উঃ! কি ভয়ংকর লোক! মহাজন সেজে দেখা দিলে, সিদ্ধেশ্বরের সংগে আলাপ, এই পরিচয় দিলে, সিদ্ধেশ্বর তার কারবারের একজন অংশী, আমিও একজন অংশী হব, কতই যেন ভালমানুষ হয়ে, কতই যেন উপকারী বন্ধু সেজে, আমারে এই রকম আশ্বাস দিলে, শেষকালে কি না, আমারে এক কালে পথের ভিকারী কোরে ছেড়ে দিলে! লালা বুলকচাঁদ! নামটাও শুনতে ভয়ঙ্কর! বোধ হয়, ওটা তার সত্যনাম নয়; যেরূপ স্বভাবের লোক, তাতে কোরে সে লোক যে সত্যনামে পরিচয় দেবে, এমন তো মনে লয় না, বুলকচাঁদ নামটা হয় তো জালনাম! লালা বুলকচাঁদ নানা স্থানের বড় বড় কুঠীর বড় মহাজন! উঃ! ভয়ানক বাটপাড়ী! কাশীর জুয়ার আড্ডার দালাল! আমার মত হতভাগা ভালমানুষ পেলেই দালাল-গিরীর চূড়ান্ত পরিচয় দেয়! ভারী তুখোড় লোক! এত বড় সহরের ভিতর এত বড় জুয়াচুরী-ব্যবসা চালায়, অবাধে স্বচ্ছন্দে চালায়, কেহই ধরে না, কেহই কিছু বলে না, শান্তিরক্ষক নামে যাদের পরিচয়, তারাও এই রকম লোকের সংগে বন্ধুত্ব রাখে, অসাধারণ আশ্চর্য্য ব্যাপার!

বড় বড় জুয়াচুরীতে—বড় বড় জুয়াচুরি-শীকারে এক একটা ঘাই থাকা দরকার! কাশীতে বুলকচাঁদের কারবারে ঘাই ছিল সিদ্ধেশ্বর। একটা সিদ্ধেশ্বর অথবা বেশী সিদ্ধেশ্বর, সে কথা প্রকাশ পেলে না, কিন্তু বেশী থাকাই সম্ভব। থাকে থাকুক, সে সকল গণনা করা আমার কার্য্য নয়, কিন্তু সিদ্ধে-

শ্বরটা গেল কোথায় ? কাশী ছেড়ে কোথাও যাবে না, এমন মজা কোথাও পাবে না, আমাকে ভিকারী কোরে, একটা আস্তানা ছেড়ে, আর একটা নূতন আস্তানায় ভর কোরেছে, ইহাই নিশ্চয়। যেখানে বুলকচাঁদ, সেইখানেই সিদ্ধেশ্বর, ইহাও নিশ্চয়। দুজনের চেহারা মনে রেখে, মনের কষ্টে অনাহারে সেই বাসাতেই আমি নিশাযাপন কোল্লেম। থেকে থেকে জুয়াচোরের কথাই মনে পড়ে, নিদ্রা আসে না, নিদ্রা এলো না, জাগরণেই রজনীপ্রভাত।

দশ কল্প

এরাই কি তীর্থবাসী ?

আজ শনিবার। নিয়মমত গঙ্গাস্নান কোল্লেম, দেবদর্শন কোল্লেম, মনের দুঃখে আহার কোল্লেম না ; অন্নপূর্ণা-পুরীতে আমি উপবাসী থাকলেম ! বাসাঘরে চাবী দিয়ে, রাস্তায় বেরিয়ে, মন্দিরের দিকে চেয়ে, করযোড়ে জগন্মাতার উদ্দেশে সাশ্রু-লোচনে ডাকলেম, "মা অন্নপূর্ণে ! শিব যখন ত্রিভুবনপরিভ্রমণ কোরে কোথাও কিছু ভিক্ষা পান নাই, এই কাশীধামে অন্নপূর্ণারূপিণী হয়ে, তুমি তখন ক্ষুধাতুর বিশ্বনাথকে অন্নদান কোরেছিলে ; মা ! আজ আমি এই ক্ষুদ্র জীব, তোমার এই পুণ্যক্ষেত্র উপবাসী রয়েছি, আমার প্রতি মা তোমার দয়া হলো না !"—তারস্বরে অন্নপূর্ণাকে ডাকলেম আর এই কথাগুলি বোল্লেম। মা অবশ্যই আমার কাতরোক্তি শুনলেন, কিন্তু উত্তর দিলেন না। আমার শুনা ছিল, কাশীতে কেহ উপবাসী থাকে না ; পুরীমধ্যে অথবা অন্নছত্রে অথবা গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হোলেই উদর পূর্ণ হয়। শুনা ছিল বটে, কিন্তু সেরূপ চেষ্টা কিছুই কোল্লেম না ; কিছুই ভাল লাগলো না ; ভবিষ্যৎ-ভাবনায় ক্ষুধা-তৃষ্ণাও যেন উড়ে গেল ; পথে পথেই বেড়াতে লাগলেম। অন্যমনস্ক, কোথায় কি হোচ্ছে, কোন দিক দিয়ে কারা সব চোলে চোলে যাচ্ছে, কোন দিকে কি কলরব হোচ্ছে, কোন দিকে চক্ষুও নাই, কোন দিকে কর্ণও নাই ; বরাবর সিক্রোলের দিকে চোলে যাচ্ছি। এক একবার সূর্য্যপানে চেয়ে দেখ্‌ছি, সূর্য্যও যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে চোলেছেন, এইখানে বোধ হোচ্ছে। আমার কষ্ট দেখে দেখে দেব দিবাকর ক্রমশঃ রক্তবর্ণ ধারণ কোল্লেন, আর কষ্ট দেখতে পারেন না বোলেই যেন পশ্চিমাচলের অন্তরালে লুক্কায়িত হবার উপক্রম কোল্লেন। আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটা বৃক্ষতলে বোসে পোড়লেম। বেলা অবসান, সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, দিনমানে বরং অধিক ভাবনা ছিল না, রাত্রিকালে কি হবে, কোথায় খাব, বাসাবাড়ী চাবী দেওয়া আছে, সেখানে ফিরে গিয়েই বা কি কোরবো, দ্বিতীয় প্রভাতেই বা কি উপায় হবে, বাসাঘরের ভাড়াই বা কোথা থেকে শোধ দিব, কি ভরসাতেই বা বাসা রাখবো, এই সকল ভাবনাতেই প্রাণ আকুল ! ভাবনা-সাগরের পার নাই ! অকুলপাথার ভাবনা !

রাস্তার দিকে চেয়ে বোসে আছি, বাঙ্গালীটোলার যে সকল ভদ্রসন্তান সিক্রোলে চাকরী করেন, তাঁরা সব দলে দলে ঘরে ফিরে আসছেন, আমোদ-প্রমোদে পরস্পর কত রকম গল্প কোচ্ছেন, কেহই আমার দিকে ফিরে চাইলেন না! অদৃষ্ট যার বিগুণ, তার প্রতি সকলেই বুঝি নিষ্ঠুর, এই ভাবনাই তখন আমার মনে উদয় হলো। ঠিক ভাবলেম, কি ভুল ভাবলেম, মনের আবেগে সেটা তখন বুঝতেই পাল্লেম না। ইচ্ছা ছিল না কাঁদবার, তবু কেন জানি না, আপনা হোতেই চক্ষু-দুটী অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো, গণ্ডস্থল প্লাবিত কোরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো ; উদাস অন্তরে এক জায়গায় বোসে বোসেই আমি কাঁদলেম। আমার চক্ষের জল তখন কেহই দেখলে না।

সম্মুখ দিয়ে অনেক লোক চোলে গেল, দুই একজন এক একবার আমার দিকে চেয়ে ; চেয়ে দেখলেম, তামাসা মনে কোরে কেহ কেহ হাসলে, কেহ কেহ গম্ভীরভাব ধারণ কোরে মুখ ফিরালে . আমার দুঃখে কেহ দুঃখিত হলো কিম্বা কারো প্রাণে দয়া এলো, এমন লক্ষণ কিছুই বুঝা গেল না।

সন্ধ্যা হয়। ক্রমশই লোকজনের চলাচল কম। আমি তখন সেখান থেকে উঠে আসি আসি মনে কোচ্ছি, এমন সময় একটী বাবু এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, দিব্য সুশ্রী পুরুষ, দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান, মুখে যেন স্বাভাবিক দয়ামায়া সমঙ্কিত। কি জানি, কার উপদেশে দর্শন-মাত্রই সেই বাবুটীর প্রতি আমার ভক্তির সঞ্চার হলো। বাবুর সঙ্গে কেহই ছিল না, তিনি একাকী। পথের ধারে একাকী বোসে আমি রোদন কোচ্ছি, তাই দেখে যেন কাতর হয়ে স্নিগ্ধস্বরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "বালক! তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? পথে বোসে এমন কোরে কাঁদছো কেন? তোমার হয়েছে কি?"

দুই হস্তে নেত্রমার্জ্জন কোরে তৎক্ষণাৎ আমি উঠে দাঁড়ালেম। উত্তর আমার মুখস্থই ছিল, যত সংক্ষেপে পাল্লেম, আত্মপরিচয় নিবেদন কোল্লেম। পরিচয় কিছুই নয়, পরিচয় আমি জানিই বা কি, বাল্যজীবনের বড় বড় ঘটনা-গুলি এক এক কোরে তাঁরে জানালেম ; শেষের সম্বল গত কল্য জুয়াচোরে ঠকিয়ে নিয়েছে, সেই কথাটী বোলে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেম ; সেই সময় আমার চক্ষে পুনরায় দরবিগলিত অশ্রুধারা!

শিবনেত্রে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে মিষ্ট-মিষ্ট-বাক্যে বাবু বোল্লেন, "হায় হায়! এমন ঘটনা হয়েছে! কাশীর লোক যে কোন ভাবে চলে, সহজে বুঝে উঠা অত্যন্ত কঠিন। অচেনা লোককে ততটা বিশ্বাস করা তোমার ভাল হয় নাই। আচ্ছা, যা হবার, হয়ে গিয়েছে, জুয়াচোরে নিয়েছে, সে টাকা আর পাওয়া যাবে না। তুমি আমার সঙ্গে এসো, এখানে আমার বাড়ী আছে, পরিবারলোকজন সব এইখানে, আমার বাড়ীতেই তুমি থাকবে, কোন কষ্ট হবে না, যাতে তোমার ভাল হয়, আমি চেষ্টা পাব। বাসাটা ছেড়ে দাও, বৃথা কেন একটা ঝঞ্ঝাট বাড়ানো? খরচপত্রেরও অভাব। আপাততঃ আমি তোমাকে কিছু টাকা দিব, কল্য প্রাতঃকালেই বাড়ীভাড়া চুকিয়ে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এসো। এখন চল আমার সঙ্গে।"

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলেম। তাদৃশ বিপদে যিনি অভয় দেন, যিনি আশ্রয় দেন, তিনি পিতৃতুল্য ; পিতৃজ্ঞানে বাবুকে প্রণাম কোরে, আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম।

মহল্লা সোণাপুর, দিব্য একখানি বাড়ী ; তেতালা চকবন্দী। পাথরের বাড়ী, এ কথা বলাই বাহুল্য। বাড়ী দু-মহল। বাবু আমাকে সদরবাড়ীর একটী ঘরে বোসিয়ে, একজন চাকরকে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়ে, বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেন ; আমাকে বোলে গেলেন, "বোসো হরিদাস, শীঘ্রই আমি আসছি।"—আমি বোসে থাকলেম। একটু পরে সেই চাকর এক গাড়ু জল, একখানি গামছা, একখানি কাপড় আর কিছু জলখাবার এনে দিলে, হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আমি জল খেলেম ; শরীরটা অনেক সুস্থ বোধ হলো।

প্রায় আধঘণ্টা পরে বাবু বৈঠকখানায় এসে বোসলেন, পাঁচ হাত তফাতে একটু জড়সড় হয়ে আমি বোসে থাকলেম। বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার নামটী আমি শুনেছি, কিন্তু তোমার জাতি কি ?"—এইবার বিষম বিভ্রাট ! জাতি-জন্ম কিছুই আমি জানি না, বলি কি। একটা কথা স্মরণ হলো। মোহনলালবাবু বোলেছেন, অমরকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে ; অমর-কুমারী রক্তদন্তের কন্যা ; রক্তদন্ত বলে, সে আমার মামা হয় ; মোহনলাল-বাবু কায়স্থ, তিনি অবশ্যই স্বজাতির কন্যাকেই বিবাহ কোরেছেন, তবেই বুঝে নিতে হলো, চেহারায় রাক্ষস-বানরের মত হোলেও জাতিতে রক্তদন্তটা কায়স্থ ; মামা যদি কায়স্থ, তবে আমিও অবশ্য কায়স্থ ; এই সিদ্ধান্তে উপ-স্থিত হয়ে সেই ভাবেই আমি উত্তর কোল্লেম। বাবুর মুখখানি বেশ প্রসন্ন হলো। রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত বাবুর সঙ্গে আমি অনেক রকম গল্প কোল্লেম ; ভূতপ্রেতের গল্প নয়, রাক্ষসপিশাচের গল্প নয়, রাজপুত্র-কোটালের পুত্রের রূপকথা নয়, আমিই আমার গল্প। পথে তাড়াতাড়ি গোটাকতক কথা বোলে-ছিলেম, এই সময় আমূল-বৃত্তান্ত দস্তুরমত বর্ণনা কোল্লেম। স্থির হয়ে শুনে শুনে বাবু মহা বিস্ময়াপন্ন হোলেন ; পুনরায় আশ্বাস দিয়ে, অভয় দিয়ে, আমার ভাল করবার অঙ্গীকার কোল্লেন।

অনিশ্চিত জাতির পরিচয় যা-ই হোক, বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, আহারে দ্বিধা থাকলো না, একসঙ্গে আহারাদি কোল্লেম, পরিতোষরূপে ভোজন করা হলো। বৈঠকখানার একটী নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আমি শয়ন কোল্লেম। কখনই আমি চিন্তাশূন্য থাকি না, বিশেষতঃ সেই দিন আমার টাকাগুলি জুয়াচোরে নিয়েছে, পূর্ব্বে অত টাকা দেখি নাই, দাতালোকে দিয়েছিলেন, সেইগুলি গেল, বড়ই কাতর হোলেম।

নিরুপায় ! এখন এই নূতন আশ্রয়ে যদি কিছু সুবিধা হয়, আবার আমি টাকার মুখ দেখবো, ভবিষ্যৎ আশায় আপনা আপনি এইরূপ সান্ত্বনা পেলেম ; রাত্রি দুই প্রহরের পর নিদ্রা, ঊষাকালেই নিদ্রাভঙ্গ।

প্রভাতে বাবুর প্রথম কার্য্য আমার বাসা তোলা। ভাড়া কত বাকী ছিল, আমার মুখে শুনে, একজন লোক সঙ্গে দিয়ে, সেই বাসায় আমায় পাঠালেন, টাকাগুলিও আমার হাতে দিলেন। আমি সেখানে পেঁছে, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে

সাক্ষাৎ কোরে ভাড়াগুলি চুকিয়ে দিলেম, দুঃখের কথা বোল্লেম। সিদ্ধেশ্বরের উদ্দেশে তিনি বিস্তর গালাগালি দিলেন ; লোকটা সে বাড়ীতে ছয় মাস ছিল, একমাসেরও ভাড়া দেয় নাই, গোপনে গোপনে জিনিসপত্র সোরিয়ে গা-ঢাকা হয়েছে ! জুয়াচোরলোকের ধর্ম্মই ঐরূপ !

আমার জিনিসপত্রগুলি সঙ্গে নিয়ে বাবুর প্রেরিত লোকের সঙ্গে আবার আমি বাবুর বাড়ীতে এলেম। সে দিন রবিবার, বাবু আফিসে যাবেন না, অনেক বেলা পর্য্যন্ত বাবুর কাছে বোসে পুণ্যধাম বারাণসী-ক্ষেত্রের অনেক রকম ভয়ানক ভয়ানক গল্প শুনলেম। কথাপ্রসঙ্গে বাবু একটী নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "তুমি ত তুমি, কাশীর চোরেরা কত শত বড় বড় পাকা পাকা বিষয়ী লোককে অদ্ভূত কৌশলে ঠকায়, তার সংখ্যা হয় না ; এখন অবধি তুমি খুব সাবধানে থেকো ; অচেনা লোকের কোন ছলনায় ভুলো না।"—অদৃষ্টের উপর নির্ভর কোরে আমি নীরব থাকলেম।

আহারান্তে বিশ্রামের পর বাবু আমাকে সঙ্গে কোরে দুই একজন বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন, বন্ধুদের কাছেও আমার পরিচয় দিলেন, তাঁরাও সকলে আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ কোল্লেন। যাতে আমি একটী কাজকর্ম্ম পাই, যাতে আমি পরের গলগ্রহ না হয়ে একরকম সুখে থাকতে পারি, এই অল্পবয়সে যাতে আমি আলস্যে আলস্যে বৃথা সময় নষ্ট না করি, সকলেই এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কোল্লেন। আমাকে দেখে, আমার অবস্থা শুনে, বাবুর বন্ধুরা আমাকে দয়ার পাত্র বিবেচনা কোরে স্নেহ প্রদর্শন কোল্লেন, কথা-বার্ত্তার ভাবে আমি সেটা বুঝতে পাল্লেম।

সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরে এসে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বাবু আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লে, "হরিদাস ! তুমি ইংরেজী জান ?"—চিন্তা কোরে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞে, কিছু কিছু শিখেছি। কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করা হয় নাই, একজন দয়াময় আশ্রয়দাতা বাড়ীতে শিক্ষক নিযুক্ত কোরে কিছু কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন ; ভূগোল, ব্যাকরণ, গণিতাঙ্ক, ইতিহাস, সরলপাঠ কিছু কিছু আমি শিক্ষা কোরেছি ; তৎপূর্ব্বে হুগলিজেলার এক অধ্যাপকের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন কোরেছি, অবস্থা প্রতিকূল, অধিক দূর অগ্রসর হোতে পারি নাই ; ঐ পর্য্যন্তই আমার শিক্ষা।"

পার্শ্বে কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তক সাজানো ছিল, তন্মধ্যে একখানি হাতে কোরে নিয়ে বাবু আমাকে পাঠ কোত্তে দিলেন। দেখলেম, সেখানি রোম-রাজ্যের ইতিহাস। রোমের ইতিহাস আমার পড়া ছিল না, তথাপি আমি আবৃত্তি কোল্লেম, এক একটী মানুষের নাম উচ্চারণে বেধে বেধে গেল, হাসতে হাসতে বাবু সেগুলি বোলে বোলে দিলেন, দ্বিতীয়বারে আমিও সুধরে নিতে পাল্লেম। তার পর বাঙলা-ব্যাখ্যার আদেশ। ভাবলেম, এইবারেই ঠেকাঠেকি ! একে তো অল্পবিদ্যা, তাতে আবার অপঠিত পুস্তক, অর্থ করা সহজ নয়। ছোট ছোট কথার অর্থ বুঝতে পাল্লেম, ইতিহাসের পাঠ, ভাবটাও অনেক দূর পরিগ্রহ হলো, বড় বড় কথার মানে জেনে নিয়ে, একরকমে খানিকদূর আমি

ব্যাখ্যা কোল্লেম। আমার ব্যাখ্যা শুনে বাবু সন্তুষ্ট হোলেন ; তাঁর মুখের ভাব দেখে আমি বুঝলেম. ব্যাখ্যাতে বড় একটা ভুল হলো না।

অল্পক্ষণ চুপ কোরে থেকে গম্ভীরবদনে—গম্ভীর অথচ প্রসন্নবদনে বাবু আমাকে বোল্লেন, "তোমার হাতের ইংরেজী-লেখা কেমন, কল্য আমাকে দেখিও ; দোয়াত, কলম, কাগজ এইখানেই থাকলো, রাত্রে যদি অবসর পাও, কষ্ট যদি না হয়. বেশ পরিষ্কার কোরে এক পাতা লিখে রেখো, কল্য যখন আমি আফিসে যাব, আমাকে দিয়ো।"

যথাসময়ে নৈশ আহার সমাপ্ত হলো, বাবু বাড়ীর ভিতর শয়ন কোত্তে গেলেন, আমি আমার নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে কাগজ-কলম নিয়ে বোসে গেলেম। কি লিখি ? সেই রোমের ইতিহাস। এক বাঘিণী দুটী শিশুকে স্তন দান কোরেছিল, এই কথা যেখানে লেখা, সেই পাতাটী আমি নকল কোল্লেম, প্রায় পঁচিশ ছত্র লিখলেম : চিহ্নগুলি যেখানে যেমন, অর্থবোধ হয়েছিল কি না, ঠিক ঠিক দিয়ে দিলেম। কেতাবখানি এক কোণে চাপা দিয়ে, সেই কাগজখানি বাতাসের মুখে রেখে আমি শয়ন কোল্লেম। এক ঘুমেই রাত্রিপ্রভাত।

সোমবার। বেলা দশটার পুর্ব্বে আফিসের কাপড় পোরে বাবু যখন উপর থেকে নেমে আসেন, রাত্রের লেখা সেই কাগজখানি হাতে কোরে আমি তখন তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম, কাগজখানি সম্মুখে ধোল্লেম। পুর্ব্বকথা স্মরণ কোরে, একটু হেসে তিনি বোলে উঠলেন, "ওহো! লিখেছ ? বেশ বেশ !"—একটু থোমকে দাঁড়িয়ে, অক্ষরগুলির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কোরে, আবার তিনি হাসতে হাসতে বোল্লেন, "আচ্ছা !"

আচ্ছা বোলেই কাগজখানি পকেটে রেখে, বাবু সরাসর নেমে এলেন, চাকরদের যাকে যা বোলতে হয়, উপদেশ দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। আহারান্তে আমি বাবুর বৈঠকখানায় বোসে একখানি ইংরেজী পুস্তক পাঠ কোত্তে লাগলেম। বেলা যখন তিনটে, সেই সময় একটী ভদ্রলোক সেই বৈঠক-খানায় এসে দর্শন দিলেন। কল্য বৈকালে যে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ কোরেছিলেন, এই ভদ্রলোকটী তাঁদেরই মধ্যে একজন। আমিও তাঁরে চিনলেম, তিনিও আমাকে চিনলেন। আমি ইংরেজী পুস্তক পাঠ কোচ্ছি দেখে, আমার কাছে বোসে তিনি দুটী একটী কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেন, বিনম্রবচনে আমিও উত্তর দিতে লাগলেম। শেষকালে তিনি বোল্লেন, "তুমি বেশ বুদ্ধি-মান, তোমার চেহারাও ভাল, রমণবাবুর কাছে কিছুদিন যদি তুমি থাকো, নিশ্চয়ই তোমার ভাল হবে।" পরিচয়ে জানলেম, সেই ভদ্রলোকটীর নাম রসিক-লাল পিতুড়ী, বয়স প্রায় ২৭।২৮ বৎসর, একটী ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করেন, কোন কার্য্য উপলক্ষে সাতদিনের ছুটী পেয়েছেন, বাহিরে কোথাও যান নাই, বাড়ীতেই আছেন, তিনি আমাদের বাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সেই রসিকবাবুর মুখেই শুনলেম, আমাদের বাবুর নাম রমেন্দ্রনাথ মিত্র, নিবাস বঙ্গদেশ। সাত বৎসর হলো কাশীতে এসেছেন, প্রথম প্রথম ভাড়াটে বাড়ীতে বাস কোত্তেন, এখন এই বাড়ীখানি কিনেছেন, সপরিবারে এই

বাড়ীতেই থাকেন ; বৎসরান্তে অল্পদিনের জন্য একবার দেশে যান, শীঘ্রই ফিরে আসেন। বাবুর আর দুটী সহোদর আছেন, তাঁরাও সঙ্গে এসেছেন, তাঁদেরও পরিবার আছে। বাবু এখানকার জজ-আদালতের সেরেস্তাদার, মাসিক বেতন ২০০৲ টাকা, সেরেস্তায় তাঁর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ; বর্ত্তমান জজ-সাহেব তাঁরে খুব ভালবাসেন, শীঘ্রই বেতনবৃদ্ধি হবে, জজ-সাহেব এই-রূপ আভাষ দিয়ে রেখেছেন।

রমেন্দ্রবাবুর দুই বিবাহ, দুটী পত্নীই এই বাড়ীতে আছেন ; তাঁরা ব্যতীত দুটী ভ্রাতৃবধূ, দুটী সহোদরা ভগিনী, একটী পিসীমা আর পিসীমার দুটী কন্যা ; তাঁরা সকলেই এই বাড়ীতে আছেন। রমেন্দ্রবাবু সুশিক্ষিত, তাঁর দুই বিবাহের কারণ কি, রসিকবাবু আমার সে সন্দেহও মিটিয়ে দিলেন। প্রথমা পত্নীর সন্তান হয় নাই, সেই জন্য দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ। প্রথমার বয়ঃক্রম প্রায় ৩০ বৎসর। দ্বিতীয়াটীর বয়ঃক্রম ১৭।১৮ বৎসর মাত্র ; সেটী এ বাড়ীতে নূতন-বৌ নামে পরিচিত। বাবুর মা নাই, পিসীমাই এখানে গৃহিণীর কার্য্য করেন। বৌগুলির ততটা স্বাধীনতা নাই, কিন্তু বড় বউটী যা যখন বলেন, পিসীমা তাতে অমত কোত্তে পারেন না। পিসীমার কন্যা-দুটীর বিবাহ হয়েছিল, দুটীই এখন বিধবা। বড়টীর বয়স ২৪।২৫ বৎসর, ছোটটী বিংশতি-বর্ষের ন্যূনবয়স্কা। ভাই তিনটীর মধ্যে রমেন্দ্রবাবুই জ্যেষ্ঠ, মধ্যম রামশঙ্কর, কনিষ্ঠ মতিলাল। বাড়ীতে তিনজন চাকর, একজন পাচক ব্রাহ্মণ, দুজন দাসী আর একজন গঙ্গাজলতোলা ভারী। পোষ্য অনেকগুলি। মেজোবাবু আর ছোটবাবু রামনগরে চাকরী করেন, বড়বাবুই তাঁদের চাকরী কোরে দিয়েছেন।

রসিকবাবুর মুখে এই সকল পরিচয় আমি অবগত হোলেম। বাবুর ভাই-দুটী রামনগরে চাকরী করেন, রামনগর কোথায়, রামনগর কেমন জায়গা, রামনগরে কি কি আছে, উদ্দীপ্ত কৌতূহলে এই কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। রসিকবাবু বল্লেন, "কাশীর গঙ্গাপারেই রামনগর। রামনগরে একজন রাজা আছেন, তিনিই কাশীরাজনামে বিখ্যাত। রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের নিমিত্ত সেখানেও অনেক কার্য্যালয় আছে, দোকান আছে, বাজার আছে, বাড়ী আছে, অনেক লোক সেখানে চাকরী করে। গঙ্গাতীরে হাজার হাজার গাধা চরে, ধোপারা দলবদ্ধ হয়ে এক এক পাটা খাড়া কোরে সারি সারি গঙ্গাজলে কাপড় কাচে ; গাধারা সেখানকার ধোপাদেরই সম্পত্তি।"

রামনগরের এইরূপ বর্ণনা কোরে রসিকলাল বাবু আরও বোল্লেন, "রাম-নগর-সম্বন্ধে একটা চমৎকার পৌরাণিক রহস্য আছে। বিশ্বেশ্বর একবার বেদব্যাসকে কাশী থেকে দূর কোরে দিয়েছিলেন ; শিবের উপর রাগ কোরে ব্যাসমুনি ঐ রামনগরে নূতনকাশী পত্তন করবার বাসনা কোরেছিলেন। কবিবর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলগ্রন্থে ব্যাসের সঙ্কল্পের এইরূপ বর্ণনা আছে :—

'আমাকে কাশীতে, না
ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে, আমি এইখানে,
করিব দ্বিতীয় কাশী॥'

ব্যাসদেব এই সঙ্কল্পে রামনগরে কাশী প্রতিষ্ঠার কল্পনায় যোগাসনে বসেন। কাশীতে তারকব্রহ্মনামে জীবকে শিব মুক্তি দেন, ব্যাসদেবের নূতন কাশীতে তারকব্রহ্মনামের প্রয়োজন থাকবে না, শিবের কৃপার অপেক্ষা থাকবে না, মরণমাত্রেই জীবগণ মোক্ষলাভ কোরবে। ব্যাসের বাসনা পূর্ণ হোলে কাশীনাথের কাশীধামের মহিমা কম হবে কিম্বা আসলেই মাহাত্ম্য থাকবে না, এই বিঘ্ন সন্দেহ কোরে সর্ব্ববিঘ্ননাশিনী জগজ্জননী অন্নপূর্ণা জরাজীর্ণা ভিকারিণীবেশে ব্যাসদেবকে ছলনা করেন। দুইবার ভগবতী জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে মরিলে কি হয় ?'—দুইবার যোগাসনস্থ ব্যাসদেব উত্তর দেন, 'এখানে মরিলে সদ্য মোক্ষ হয়।' তৃতীয়বার দেবী যখন ঐরূপ প্রশ্ন করেন, যোগভঙ্গের আশঙ্কায় ক্রোধান্ধ হয়ে ব্যাস তখন বোলে ফেলেন, 'গর্দ্দভ হইবে বুড়ি এখানে মরিলে।'

দেবী বোল্লেন, 'তথাস্তু।' তদবধি রামনগরের নাম ব্যাসকাশী, সাধুভাষায় গর্দ্দভবারাণসী। প্রবাদ এইরূপ যে, যে সকল পাপীলোককে কাশীছাড়া করবার জন্য কালভৈরব তাড়া করেন, সেই সকল পাপীলোক গঙ্গা পার হয়ে ব্যাস-কাশীতে গিয়ে মরে, মরণমাত্রেই গাধা হয় ; সেই কারণে এখনো রামনগরে গাধার সংখ্যা অত বেশী !"

ব্যাসকাশীর বর্ণনা শুনে আমি হাস্য কোল্লেম। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে এলো, রসিকবাবু বাড়ী গেলেন, ঠিক সন্ধ্যার সময় আর দুটী নূতন বাবু বৈঠকখানায় এসে দাঁড়ালেন। বৈঠকখানায় বাবুর বিছানার ধারে আমাকে দেখেই খানিকক্ষণ তাঁরা অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে রইলেন, আমিও নির্ব্বাকে একদৃষ্টে তাঁদের পানে চেয়ে থাকলেম। একটু পরেই একটী বাবু কিছু রুক্ষস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে তুমি ? কোথা থেকে এসেছ ?"—অপ্রতিভ না হয়েই নির্ভয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "আমি হরিদাস, বড়বাবু আমাকে এনেছেন, এইখানেই আমি আছি, এইখানেই আমি থাকবো।"

উভয়ে মুখ-চাহাচাহি কোরে দুই তিনবার বক্রনয়নে আমার দিকে কটাক্ষপাত কোল্লেন, বোধ হলো যেন বিরক্ত হোলেন। সেখানে আর তাঁরা বোসলেন না, বিড় বিড় কোরে বোকতে বোকতে মস মস শব্দে বাড়ীর ভিতরের দিকে চোলে গেলেন।

ঘরের সেজে বাতী জ্বালবার জন্য সেই সময় একজন চাকর একটা লণ্ঠন হাতে কোরে সেইখানে এলো, বাতী জেলে দিলে। সে যখন ফিরে যায়, তখন আমি তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এইমাত্র যে দুটী বাবু এসেছিলেন, তাঁরা কে ?" চাকর উত্তর কোল্লে, "বাবুর ভাই মেজোবাবু আর ছোটবাবু।"

তখন আমি বুঝতে পাল্লেম ; তথাপি পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তিন দিন আমি রয়েছি, শনিবার রবিবার ঐ বাবু-দুটীকে দেখি নাই কেন ?" চাকর বোল্লে, "সকল দিন আসেন না ; রামনগরে কাজ করেন, সেইখানেই থাকেন। বড়বাবু বেজার হন ; বাইরে বাইরে রাতকাটানো, বড়বাবু ভালবাসেন না, কতদিন বারণ কোরেছেন, বাবুরা শুনেন না, প্রায়ই মাঝে মাঝে দেখা দেন না, বিশেষতঃ শনিবার রবিবার।"

এই পর্য্যন্ত বোলেই, মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে চাকরটী বেরিয়ে গেল।' হাসি আমি দেখতে পেলেম, কিন্তু হাসির ভাব কিছু বুঝতে পাল্লেম না ; বাতীর কাছে সোরে বোসে আবার আমি পুস্তকপাঠে মন দিলেম।

রাত্রি যখন সাতটা, সেই সময় বড়বাবু বাড়ী এলেন ; অগ্রেই বৈঠকখানায়। আমি পুস্তকপাঠে নিবিষ্টচিত্ত, তাই দেখে বাবুর মুখখানি সহসা প্রফুল্ল হলো, প্রফুল্লবদনে তিনি আমাকে বোল্লেন, "বড়ই তুষ্ট হোলেম। মিছে কাজে কালক্ষয় না কোরে তুমি যে একাকী বোসে বোসে পড়াশুনা কোচ্ছো, খুব ভাল ; এই রকম আমি ভালবাসি। দেখ হরিদাস, কাল থেকে আমার সঙ্গে তোমায় বেরুতে হবে ; তোমার চাকরী হয়েছে ; তোমার সেই লেখাখানি দেখে সাহেবেরা পছন্দ কোরেছেন, আমার সেরেস্তাতেই তুমি বোসবে, আমিই তোমাকে কাজকর্ম্ম দেখিয়ে দিব, শিখিয়ে দিব, সহজ সহজ কাজ, তা তুমি বেশ পারবে, কিছুই কঠিন বোধ হবে না। এখন আপাততঃ মাসে মাসে কুড়ি টাকা পাবে, কাজকর্ম্মের দাঁড়া-দস্তুর শিক্ষা হোলে ক্রমশঃ বেতন বাড়বে।"

পুস্তকখানি মুড়ে রেখে, দাঁড়িয়ে উঠে, বাবুকে আমি নমস্কার কোল্লেম। "আপনি মহৎলোক, আপনি সদাশয়, গরিবের প্রতি আপনার বিশেষ দয়া, বিশেষ অনুগ্রহ, আপনার অনুগ্রহে আমি সংসারের অকূল সাগরে পার পেলেম, চিরদিনের জন্য উপকারঋণে আমি ঋণী হয়ে থাকলেম, হৃদয়ের আনন্দবেগে এই সকল কথা বোলে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানালেম। মৃদু হেসে, আমার মস্তকে হস্তার্পণ কোরে, হৃষ্টবচনে বাবু বোল্লেন, অত কথা আমাকে কিছুই বোলতে হবে না, আমি তোমাকে পুত্রের মত পালন কোরবো, দু-দিনেই আমি তোমার সদগুণের পরিচয় পেয়েছি। বেশ ছোকরা তুমি ; বেশ বুদ্ধি তোমার ; পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুর্ঘটনার কথা ভুলে গিয়ে, সুস্থির হয়ে আমার কাছে থাকো, মন দিয়ে কাজকর্ম্ম কর, লেখাপড়ার আলোচনা রাখ, ভবিষ্যতে ভাল হবে। এখানে তোমার কিছুমাত্র অযত্ন হবে না, ঘরের ছেলের মত থাকবে, স্বচ্ছন্দে বাড়ীর ভিতর যাবে আসবে, মেয়েদের সকলকেই আমি বোলে দিব, সকলেই তোমাকে আদর-যত্ন কোরবে ; আদর করবার বস্তু তুমি, ভালবাসবার সামগ্রী তুমি, সকলেই তোমাকে ভালবাসবে, কারো কাছে তোমার অনাদর হবে না।"

উত্তম অবসর পেয়ে, কুণ্ঠিতভাবে মুখখানি নীচু কোরে, মৃদুস্বরে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "মেজোবাবু এসেছেন, ছোটবাবু এসেছেন, দুজনেই এই ঘরে আসছিলেন ; আমি তাঁদেরে চিনতেম না, উঠে দাঁড়াই নাই, কর্কশস্বরে দুই একটা কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরে আমার সামান্য উত্তর শুনেই তাঁরা বিরক্ত হয়ে চোলে গেলেন ; ঘরে বোসলেনও না, আমার সঙ্গে আর কথাও কইলেন না।"

গম্ভীরবদনে বাবু বোল্লেন, "তাদের ঐ রকম স্বভাব, তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি তাদের বোলে দিব, চেনাশুনা হোলে আর সে রকম মেজাজ দেখাবে না। এখন তুমি পড়, আমি আসছি।"

এই কথা বোলে বাবু অন্দরমহলে প্রবেশ কোল্লেন, আমি আবার পুস্তকখানি খুলে আরব্ধ পাঠে মনোনিবেশ কোল্লেম।

আধঘণ্টা পরে বাবু এলেন। আমার চাকরী-সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে বাবু বোল্লেন, "দিন দিন এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক হোচ্ছে। যাদের মাথার উপর শাসনকর্ত্তা নাই, অভিভাবক নাই, তারা প্রায় সকলেই দুষ্কর্ম্মে রত। কেহ কেহ চাকরী করে, কেহ কেহ বেকার। অনেকে মনে করে, অল্প লেখাপড়া জানলেই পশ্চিমদেশে চাকরী হয় ; কথাটা কতক পরিমাণে সত্য, কিন্তু কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে যারা রীতিমত কাজকর্ম্ম শিক্ষা কোত্তে পারে, অল্প লেখাপড়ায় তাদের ততটা আটকায় না, যারা কর্ম্মস্থলে গিয়ে কেবল রোজসই কোরে আসে, বেশী দিন তাদের চাকরী থাকে না। যারা বেকার, তারা বাড়ী থেকে আসবার সময় মা-বাপের সিন্দুক-বাক্স ভেঙে যা কিছু আনে, তাতেই এখানে বাবুয়ানা কোরে দিন কাটায় ; তাও দিনকতক মাত্র ; শেষে অনন্ত দুর্গতি! একে কুক্রিয়াসক্ত, তার উপর নিঃসম্বল, কেশেল লোকের সঙ্গে মিশে অর্থ-লালসায় নানা কুক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় ; এক একদিন এক এক বাঙ্গালীর বাসায় বাসায় ভিক্ষা কোরে উদরপোষণ করে, এক একদিন উপবাসে কাটায়, তথাপি বদখেয়ালী বাবুগিরী ছাড়ে না। সাবধান, সে প্রকার লোকের সঙ্গে খবরদার তুমি মিশো না, মুখামুখি দেখা হোলে বাক্যালাপও কোরো না ; দুদিনে চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে, চাকরীটীও হারাবে, আমিও তোমাকে বিশ্বাস কোত্তে সন্দেহ কোরবো। তোমার স্বভাব ভাল, সেই জন্যই অগ্রে উপদেশ দিয়ে রাখলেম ; ভুলো না, সাবধানে থেকো।"

নতবদনে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা, বদলোকের সঙ্গে সংস্রব রাখা কখনই আমার অভ্যাস নয়, কখনই আমি আপনার আজ্ঞার অবাধ্য হব না।" বাবু বোল্লেন, "হাঁ, তা হোলেই ভাল হয়।"

কথা হোচ্ছে, এমন সময় সেই দুটী বাবু এলেন। বাবুর সহোদর। বড়বাবু তাঁদের সম্বোধন কোরে, আমার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে মিষ্টবাক্যে বোল্লেন, "দেখ, এই ছেলেটীর নাম হরিদাস, গরিব, চেহারা দেখেই বুঝতে পাচ্ছো, ভদ্রলোকের ছেলে, আমাদের স্বজাতি, চলনসই লেখাপড়া জানে, চরিত্র খুব ভাল, আমাদের আদালতে এই বালকের জন্য আমি একটী চাকরী স্থির কোরেছি, কাল থেকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব। তোমরা হরিদাসকে অযত্ন কোরো না, কটুকথা বোলো না, ভয় দেখিও না, ঘরের ছেলের মতন সদয়-চক্ষে দর্শন কোরো।"

আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বাবু-দুটী তখন বড়দাদার কথাতেই সম্মতি জানালেন ; আমি সেই সময় তাঁদের উভয়ের মুখের দিকে চাইলেম ; দেখলেম, ছোটবাবু একটু একটু হাসছেন, মেজোবাবুর মুখখানি ভারী ভারী ; সেই ভারিত্বের সঙ্গে যেন কিছু বিরক্তিভাব অঙ্কিত বোধ হলো।

বাবু-দুটীর সঙ্গে সে রাত্রে আমার কোন প্রকার কথাবার্ত্তা হলো না। ছোটবাবু একবার উঠে, একটা আলমারী থেকে লাল চামড়াবাঁধা একখানা কেতাব আর খানকতক কাগজ বাহির কোরে, বড়বাবুর বালিশের ধারে বোসলেন ; একখানা কাগজ বড়বাবুকে দেখালেন। মস্তকসঞ্চালন কোরে বড়বাবু বোল্লেন, "হুঁ, আচ্ছা, ঐ রকম হোলেই চোলবে।" ছোটবাবু তখন ঘাড় বেঁকিয়ে মেজো-

বাবুর দিকে চাইলেন ; তার পর দুজনেই একসঙ্গে বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেন ; কাগজগুলি আর কেতাবখানি ছোটবাবুর হাতেই থাকলো। একটু পরে বড়বাবুর সঙ্গে আমিও অন্দরে প্রবেশ কোল্লেম। যথাসময়ে আহার করা হলো, নিদ্রায় রজনীপ্রভাত।

নূতন চাকরী, সকাল সকাল আহার কোরে বড়বাবুর সঙ্গে আমি আদালতে গেলেম। কি আমার কার্য্য, বড়বাবু দেখিয়ে দিলেন, হুঁসিয়ার হয়ে সমস্ত দিন আমি কাজ কোল্লেম। কাজ কেবল নকল করা আর মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা ফর্দ্দে অংকমালা ঠিক দেওয়া। আফিস বন্ধ হবার অগ্রে বড়বাবু স্বয়ং আমার লেখাগুলি আর অংকগুলি দর্শন কোল্লেন, প্রসন্নবদনে মন্তব্য দিলেন, "ঠিক।"

সেই দিন থেকেই আমার চাকরী হলো। ছুটীর সময় বড়বাবু আমাকে সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন, সাহেবকে আমি সেলাম কোল্লেম, সাহেবের সঙ্গে বড়বাবুর কি কি কথা হলো, সব আমি বুঝতে পাল্লেম না, ভাবে বুঝে নিলেম, আমার পক্ষে অনুকূল।

আমরা বাড়ী এলেম। সেদিন বড়বাবু আমার উপর বেশী সন্তুষ্ট। সেই দিন থেকে অন্দরে একটী ঘরে রাত্রে আমার শয়নের বন্দোবস্ত হলো। ভাগ্য-দেবতাকে ধন্যবাদ দিয়ে সে রাত্রে আমি নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখ অনুভব কোল্লেম। বোধ হলো যেন, জন্মাবধি তেমন সুখে একদিনও আমি ঘুমাই নাই।

ক্রমে ক্রমে বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আমার বেশ জানাশুনা হলো, সকলেই আমাকে বেশ ভালবাসলেন। বড়বাবুর পূর্ব্ববাক্য সার্থক। বড়-বৌটীকে আমি মা বলি, নূতন-বৌটীকে ছোট মা, বাবুর ভগ্নী-দুটীকে পিসীমা, বাবুর পিসীমাকে দিদিমা, মেজো-বৌকে আর ছোট-বৌকে কাকীমা, বাবুর পিসীমার মেয়ে-দুটীকে বড়পিসী, ছোটপিসী, এই রকম সম্পর্ক ধোল্লেম ; সম্পর্কানুসারে তাঁরাও আমার প্রতি বেশ স্নেহ-যত্ন দেখাতে লাগলেন। দিন দিন সে সংসারে আমার বেশী বেশী আদর।

একমাস আমার চাকরী করা হলো। কার্য্যালয়ে আমি খোসনামী পেলেম। সেখানে যাঁরা যাঁরা চাকরী করেন, তাঁদের সঙ্গেও বেশ আলাপ-পরিচয় হলো, মনের সুখেই আমি থাকলেম। সোণাপুরা মহল্লায় অনেকগুলি বাঙ্গালীর বাস ; বড়বাবুর পরিচয়ে রবিবারে রবিবারে তাঁদের এক একজনের বাড়ীতে আমি যাই, বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ হয়, কর্ত্তারাও আমার পরিচয় পান, সে সকল বাড়ীতেও আমার অনাদর হয় না। পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধাম আমার যেন চিরদিনের পরিচিত, জন্ম-কর্ম্ম সকলই যেন কাশীতে, দিন দিন আমার এই রকম জ্ঞান হোতে লাগলো।

নূতন আশ্রয়ে দুই মাস অতীত, দুই মাস চাকরী। বড়বাবুর মধ্যম সহোদরের নাম রামশঙ্কর, কনিষ্ঠের নাম মতিলাল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে ; সকল দিন তাঁরা বাড়ীতে আসেন না, রামনগরে থাকেন, মাঝে মাঝে আসেন, তাঁদের সঙ্গে আমার বেশী ঘনিষ্ঠতার অবসর ঘটে না ; যখন যখন দেখা হয়, আমি তাঁদের কাকাবাবু বোলে সম্মান জানাই। ছোটবাবু আমার সঙ্গে কথা কন, হাসির কথা হোলে হাসেন, কিন্তু মেজোবাবু যেন আর এক

রকম। দৈবাৎ তিনি আমাকে এক একটা কাজের হুকুম করেন, হুকুম আমি তামিল করি, তিনি কিন্তু তুষ্ট হন না ; মুখ যেন সর্ব্বদাই ভার ভার। মুখ দেখে মনে হয়, এই বাবুটীর মনে মনে বেজায় অহঙ্কার।

যে বাড়ীতে দশ দিন থাকতে হয়, কথায় কথায় সেই বাড়ীকে "আমাদের বাড়ী" বলাই প্রায় সকল লোকের অভ্যাস। আমাদের বাড়ীর উত্তরাংশে একটী ভদ্রলোকের একখানি বাড়ী। দুই বাড়ীর মধ্যস্থলে আড়াই হাত ওসারের একটী ক্ষুদ্র রাস্তামাত্র ব্যবধান। এক বাড়ীর ছাদে দাঁড়ালে দ্বিতীয় বাড়ীর ছাদের লোকের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা কওয়া যায়। চেঁচাতে হয় না ; মৃদু-কথোপকথনেও পরস্পরের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। এ বাড়ীতে আমি দুমাস আছি, একদিনও ছাদে উঠি নাই। এক রবিবার অপরাহ্নসময়ে অজ্ঞাত কৌতূ-হলে একাকী আমি সদরবাড়ীর ছাদে উঠলেম। সদরেও সিঁড়ি আছে, অন্দরেও সিঁড়ি আছে, আমি কিন্তু সদরের সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলেম। দুই মহলে দুই সিঁড়ি বটে, কিন্তু সদর অন্দরের ছাদগুলি সব একঢাল ; মাঝে মাঝে আর ধারে ধারে ছোট ছোট আলসে। ছাদগুলি দিব্য পরিষ্কার।

বসন্তকাল। বেলা প্রায় শেষ, রবিরশ্মি প্রায় নিষ্প্রভ, সুশীতল দক্ষিণানিল প্রবাহিত, সময় অতি সুখময়। গগনবিহারী বিহঙ্গকুল গগনা-ঙ্গনের নিম্নদেশে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সুবাতাসে উড়ে যাচ্ছে, মাথার উপর নির্ম্মল নীলবর্ণ আকাশমণ্ডল শোভা পাচ্ছে, ইতস্ততঃ উচ্চ নিম্ন শত শত অট্টালিকা নয়নগোচর হোচ্ছে, বড় বড় মন্দিরের চূড়া সর্ব্বসৌধ অতিক্রম কোরে যেন গিরিশৃঙ্গের ন্যায় বিরাজিত রয়েছে, দূরে তরলতরঙ্গ ভাগীরথী যেন অস্থিরগামিনী বৃহৎ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় দেখা যাচ্ছেন, ছাদের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সকল শোভা আমি দেখ্‌ছি, দেখ্‌ছি আর পাইচারী কোরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেম, দ্বিতীয়বাড়ীর ছাদের উপর একটী নারী-মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি এতক্ষণ সেখানে ছিল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই যেন শুক্ল-পক্ষের সন্ধ্যাকালের তরল মেঘঢাকা চন্দ্রের ন্যায় আশু এসে উদয় হয়েছে। পরমসুন্দরী নারীমূর্ত্তি! পরিধান একখানি ময়ূরকণ্ঠী চেলী, বুকে সবুজ-বর্ণ কাঁচুলী, কাঁচুলীর উপর দুহালী সোণার হার, গলায় সোণার উপর ডায়মনকাটা চিক, দুহাতে দুগাছি সোণার বালা, দু-কাণে দুটী নীলমণিদুল, নাসিকায় একটী গজমুক্তার নোলক, এই পর্য্যন্ত অলঙ্কার ; মস্তকে আবরণ নাই, কবরী নাই, পৃষ্ঠদেশে ভুজগাকার বিলম্বিতপৃষ্ঠ-বেণী। চমৎকার রূপ ; সৌখীন বসনভূষণে সেই রূপের আরো চমৎকার খোলতা হয়েছে। নিখুঁত রূপ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ; দোষের মধ্যে একটু কোলকুঁজো। বয়স কত, ঠিক অনুমান কোত্তে পাল্লেম না, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে পূর্ণযুবতী। হাতে এক-খানি গোলাপী ফুলদার রেশমী রুমাল, সুন্দরী সেই রুমালখানি মুখের কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। আমি যদি কবি হোতেম তা হোলে কল্পনাবলে বোলতে পাত্তেম, মুখখানি পদ্মফুল, চঞ্চলহস্তে পদ্মিনী সেই রুমাল দিয়ে ভ্রমর তাড়াচ্ছেন।

কে এই সুন্দরী? পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই, ঐ বাড়ীতে কারা থাকে,

ঠিক পাশের বাড়ী হোলেও তা আমার জানা ছিল না, রমণীকে দেখে আমার বিস্ময়বোধ হলো। রমণীর লজ্জা নাই। আমি যেন বালক, আমাকে দেখে লজ্জা না আসতে পারে, কিন্তু এ সময় অন্যান্য বাড়ীর অনেক পুরুষ ছাদে উঠেছে, তথাপি লজ্জা নাই! রমণী স্বচ্ছন্দে অনাবৃতবদনে রুমাল সঞ্চালন কোত্তে কোত্তে, থেকে থেকে নৃত্য-ভঙ্গীতে খোলাছাদে পরিক্রমণ কোচ্ছেন। আমিও পরিক্রমণ কোচ্ছিলেম, মূর্ত্তিদর্শনে নিস্পন্দ হয়ে এক জায়গায় থোমকে দাঁড়ালেম। কি জানি কেন, আমার দিকে দৃষ্টিপাত হবামাত্র রমণীও থোমকে দাঁড়ালেন। ক্ষণেকের জন্য উভয়ের চারি চক্ষু সমসূত্রে মিলিত হয়ে গেল। যে চক্ষু এতক্ষণ খঞ্জনপক্ষীর ন্যায় নেচে নেচে চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমাকে দেখে সেই উজ্জ্বল চক্ষু তখন চিত্রচক্ষুর ন্যায় অচঞ্চল; মূর্ত্তিও অচলা।

আমার লজ্জা এলো। কি আমি দেখছি, কেনই বা দেখছি, কেনই বা দাঁড়িয়ে আছি, অন্তরে অকস্মাৎ এই ভাবের উদয়। মনে মনে আপনাকে আপনি ধিক্কার দিয়ে, চারিদিকে চেয়ে, উপর থেকে নেমে আসবার উপক্রম কোচ্ছি, বাধা পোড়ে গেল। যে ছাদে সেই রমণীমূর্ত্তি, সেই ছাদের সিঁড়ির দরজা উন্মুক্ত হলো, একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সেই অচলা মূর্ত্তির কাছে দাঁড়ালো। পরিচ্ছেদের অপারিপাট্য দেখে স্থির কোল্লেম, পরিচারিকা।

কেবল কি তাই? অহো! এ কি আশ্চর্য্য! এ বৃদ্ধা এখানে কোথা থেকে এলো? এই মূর্ত্তি কোথায় আমি পূর্ব্বে দেখেছি; সত্যই কি এই সেই? দুই তিনবার আড়ে আড়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেম, স্মৃতিকে আকর্ষণ কোরে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ কোল্লেম. আকর্ষণে পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠলো; সন্দেহ হোচ্ছিল, ঠিক মনে কোত্তে পাচ্ছিলেম না, সে সন্দেহ ঘুচে গেল; তখন আমি নিশ্চয় বুঝলেম, ঠিক সেই! নিশ্চয়ই এই বুড়ী সেই কামিনীর মা;—কলিকাতার বিশ্বেশ্বরবাবুর বাড়ীর চাকরাণী সেই কামিনীর মা।

এ বুড়ী এখানে কেমন কোরে এলো? কামিনীর মা এখানে কি কোত্তে এসেছে? কার সঙ্গে এসেছে? বিশ্বেশ্বরবাবুর পরিবারেরা কেহ কী কাশী-ধামে এসেছেন? এই বাড়ীতেই কি তাঁরা বাসা কোরে রয়েছেন? এই সুন্দরী যুবতী তবে কে? এ যুবতী সেখানকার কি এখানকার? কামিনীর মা কলি-কাতার চাকরী ত্যাগ কোরে একাকিনী কাশীবাসিনী হোতে এসেছে, এই বাড়ীতেই চাকরী পেয়েছে, এটাও একবার মনে ভাবলেম, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না।

আর সেখানে সে ভাবে অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ভাল নয়, সন্ধ্যা হবারও বিলম্ব নাই, কটাক্ষে আর একবার মাত্র তাদের উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কোরেই উপর থেকে আমি নেমে এলেম। বড়বাবু ইতিপূর্ব্বে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসেছেন; বৈঠকখানায় প্রবেশ কোরেই তাঁরে আমি দেখতে পেলেম। অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হলো। আমি ঘরে ছিলেম না, না জানি, বাবু রাগ কোরে কি বলেন, সেই ভয়। বাবু তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি

একটা জিনিস অন্বেষণ কোচ্ছিলেন, সম্মুখে চেয়ে আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথা গিয়েছিলে হরিদাস?"

সত্য আমি গোপন কোল্লেম না। অন্তরের ভয়কে অন্তরে রেখে স্পষ্টই আমি বোল্লেম, "ছাদে উঠেছিলেম; ছাদের উপর থেকে নগরের শোভা বেশ দেখা যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই আমি দেখছিলেম। একদিনও আমি ছাদে উঠি নাই, মনের উল্লাসে আজ আমি দেখলেম, দৃশ্য বড় চমৎকার!"

মৃদুহাস্য কোরে বড়বাবু বোল্লেন, "হাঁ হাঁ, উপর থেকে দূরের শোভা দেখায় ভাল; শেষবেলায় যেদিন যেদিন অবকাশ পাবে, এক একবার ছাদের উপর বেড়িয়ে এসো; তাতে উপকার আছে; কৃত্রিম শোভা অপেক্ষা প্রকৃত শোভা উপরে দাঁড়িয়ে অনেক দেখা যায়। "বোসো; আজ একটা নূতন খবর আছে! আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে একটী বাবু এসেছেন, তাঁর পরিবার সঙ্গে আছে, বাবুটী জমিদার। তিনি এখানে দশটাকা খরচপত্র কোরবেন। দণ্ডীভোজন, সন্ন্যাসীভোজন, সধবাভোজন, কুমারীভোজন, কাঙ্গালীভোজন, বৃষভোজন, এই রকম অনেক কাজ করা সেই বাবুটীর পরিবারের বাসনা। খুব সমারোহ হবে। অন্যদিন হোলে আমরা থাকতে পারবো না, এই জন্য আমি বোলে এলেম, আগামী রবিবার। তুমিও আমার সঙ্গে যেয়ো; ও সব কাণ্ড কখনো দেখ নাই, দেখে শুনে রাখবে। আরো এক কথা। প্রথমদিন তুমি আমার কাছে বীরভূমের নাম কোরেছিলে, যে বাবুটী এসেছেন, তাঁদেরো বাড়ী বীরভূম। বাবুকে দেখে যদি তুমি চিনতে পার—না, সে কথায় এখন কাজ নাই, রবিবার আসুক, যা হয়, সেইদিন দেখা যাবে।"

সে দিনের কথোপকথন এই পর্য্যন্ত। বীরভূমের বাবু কাশীধামে এসেছেন, পূজা দিবেন, সৎকাজ কোরবেন, কথা ভাল, কিন্তু কোন বাবুটী? যিনি আমাকে সঙ্গে কোরে কলিকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি যদি হন, তবে তো ভালই হবে; যা আমার মনে আছে, জিজ্ঞাসা কোরে জেনে নিব, নূতন যা কিছু আমি জানি, যা কিছু জানতে পেরেছি, তাও একটু একটু জানাবো। বীরভূম আমার পক্ষে দুই প্রকার;—শঙ্কাপ্রদ আর আনন্দপ্রদ। যে কারণে শঙ্কা, যে কারণে আনন্দ, পাঠকমহাশয় তা অবগত আছেন, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

সোমবার। নিয়মিত সময়ে আমরা কর্ম্মস্থলে গেলেম, নিয়মমত কাজকর্ম্ম কোল্লেম, বৈকালে একটা ঘর থেকে আমি বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ দেখি, দুজন লোক আর একটা ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে; ঘাড় নেড়ে নেড়ে কত রকম কথা কোচ্ছে, মাঝে মাঝে তুড়ি দিয়ে দিয়ে হাসছে, একজনের বগলে একতাড়া কাগজ। লোক-দুটীর কেবল পশ্চাদ্ভাগ আমি দেখতে পেলেম, মুখ দেখতে পেলেম না; দেখবার জন্য ততটা আগ্রহও জন্মিল না;—সরকারী আদালত, কত লোক আসছে, কত লোক যাচ্ছে, খোঁজ-খবরে আমার দরকার কি? আমি তো ভাবলেম, দরকার কি, কিন্তু যেদিন যেটী ঘটবার, সেদিন সেটী ঘোটবেই ঘোটবে। সিঁড়িতে নামতে নামতে সেই দুজনের মধ্যে একজন মুখখানা ঘুরিয়ে একবার এদিক ওদিক চাইলে; মুখখানা দেখেই আমি শিউরে

উঠলেম। সেদিকে আমার নজর পোড়েছিল, আমার দিকে তার নজর পোড়েছিল কি না, বোলতে পারি না, তবু আমি ভয়ে ভয়ে একটা কপাটের আড়ালে গা-ঢাকা হয়ে দাঁড়ালেম। লোকটার পৃষ্ঠদর্শনে অগ্রেই একটু সন্দেহ জন্মেছিল, কিন্তু কত লোকের পৃষ্ঠে কুঁজ থাকে, কুঁজালোক দেখে ততটা আমি ভ্রূক্ষেপ করি নাই ; মুখ দেখে ভয় হলো। লোকটা সেই বীরভূমের বিকট বানরাকার রক্তদন্ত !

লোকটা কি সর্ব্বব্যাপী ? বর্দ্ধমানে আমি ছিলেম, আমার মামা সেজে ঐ লোকটা সেইখানে গেল, আবার দেখলেম, সেই লোক বীরভূমে ; কলিকাতায় আমি পালিয়ে গেলেম, সেখানেও সেই লোক ; আবার দেখছি, সেই লোক এই কাশীতে ! কি ব্যাপার ? আমার সঙ্গে ঐ লোকের কি লোহা-চুম্বক-সম্বন্ধ ? যেখানে আমি যাই, সেইখানেই রক্তদন্ত ! এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা ! লোক যদি আমার ইষ্টানিষ্টের সংস্রবশূন্য থাকতো, তা হোলে তো কোন কথাই ছিল না, তা তো নয়,—ভাড়াকরা গুণ্ডা এনে বীরভূমে আমার প্রাণবিনাশের চেষ্টা পেয়েছিল ! ঐ লোকের সঙ্গে আমার কি যে শত্রুতা, আকাশ-পাতাল ভেবেও কিছু ঠিক কোত্তে পারি না।

রক্তদন্ত কাশীতে ? তবে তো আমার আর কাশীধামে থাকা হয় না ! কি জানি, কখন কোথায় ঐ দুরন্তলোকের খর্পরে পোড়ে যাব, হয় তো গলা টিপে ধোরে নিয়ে যাবে, না হয় তো মেরেই ফেলবে ! কাশীতে আর থাকা হলো না ! বিশ্বেশ্বর কেন এমন কোল্লেন ?

ভাবছি, তারা দুজনে সেই রকম গল্প কোত্তে কোত্তে ক্রমে ক্রমে আমার চক্ষের অন্তর হয়ে গেল, আদালতের সীমার মধ্যেই আর থাকলো না। রক্তদন্তের বগলেই কাগজের তাড়া ছিল, শেষের সিঁড়ি থেকে সে যখন নামে, তখন সেই তাড়ার ভিতর থেকে খানকতক কাগজ সোরে পোড়লো ; আমি দেখতে পেলেম, কিন্তু রক্তদন্ত সেটা জানতে পাল্লে না ; পশ্চাতেও আর চাইলে না ; অন্যমনস্কভাবে সটান বাহিরের দিকে চোলে গেল। তারা আমার চক্ষের অন্তর হবার পর আমি চুপি চুপি গিয়ে সেই কাগজ কখানা কুড়িয়ে নিলেম ; কিসের কাগজ, সেখানে আর দেখলেম না, চারিদিক চেয়ে চেয়ে চাপকানের পকেটেই রেখে দিলেম। সবেমাত্র রেখেছি, সেরেস্তা বন্ধ কোরে বড়বাবু সেই সিঁড়ির ধারে এসেই আমাকে দেখতে পেলেন ; দেখেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এখানে তুমি ? আমি তোমাকে অন্বেষণ কোচ্ছিলেম। চল, আফিস বন্ধ হয়েছে, চল, বাড়ী চল।"

আমরা বাড়ী চোল্লেম। সারাপথ মনটা আমার ছমছমে ; দৃষ্টি চঞ্চল। চলি চলি, চারিদিকে চাই ; কোন দিকে সেই রাক্ষসটা দাঁড়িয়ে আছে কি না, চঞ্চলনয়নে বার বার চেয়ে চেয়ে ভয়ে ভয়ে তাই আমি দেখি। আমি পশ্চাতে ছিলেম, বড়বাবু আমার চঞ্চলভাব দেখতে পেলেন না, জানতেও পাল্লেন না।

বাড়ীর নিকটে পোঁছে বড়বাবু আমাকে বোল্লেন, "হরিদাস ! তুমি বাড়ী যাও, যে বাড়ীতে সেই বীরভূমের বাবুটী এসেছেন, সেই বাড়ীতে আমি

একবার যাব, যাবার কথা আছে, একবার দেখা কোরে শীঘ্রই চোলে আসবো ; তুমি বাড়ী যাও।"

বড়বাবু বন্ধুর বাড়ীতে গেলেন, আমি বাড়ী এলেম। ঠিক সন্ধ্যাকাল। বৈঠকখানায় বাতী জ্বেলেছে ; আফিসের কাপড় ছেড়ে, পকেট থেকে সেই কাগজ-কখানি বাহির কোরে সেজের আলোর কাছে আমি বোসলেম। বড়বাবু উপস্থিত নাই, আমার পক্ষে সেটা তখন একরকম ভালই হলো ; দুষ্টলোকের দলীলপত্র নির্জ্জনে দর্শন করাই ভাল। খুলে দেখলেম, খণ্ড খণ্ড ৮।১০ খানা কাগজ। কোন কাজের নয়। তিনখানা দরখাস্তের খসড়া, দুখানা চিঠির মুসাবিদা, চারিখানা দাগধরা ছেঁড়া ছেঁড়া দুর্গন্ধ সাদা কাগজ ; কেবল একখানি রক্তদন্তের নামের ক্ষুদ্রচিঠি। কৌতূহলবশে মনোযোগ দিয়ে সেই চিঠিখানি আমি পাঠ কোল্লেম। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ—

"জটাধর !

অনেক দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই, এখন তুমি কোথায় আছ, কি করিতেছ, তোমার বেতনের টাকা কোন ঠিকানায় পাঠাইব, এই পত্রের উত্তরে তাহা লিখিও। হরিদাসকে কোথাও যদি দেখতে পাও, তাহা হইলে তাহার প্রতি আর তুমি কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করিও না, ভয় দেখাইও না, মুখামুখি সাক্ষাৎ হইলে মিষ্টকথা বলিয়া আদর করিও। তাহার পর যাহা যাহা করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া যথাসময়ে তাহা আমি তোমাকে জানাইব, ইতি।"

ইতির পর যেখানে সন-তারিখ ছিল, পত্রলেখকের দস্তখৎ ছিল, সে জায়গাটা ছিঁড়ে গিয়েছে, লেখকের নাম আমি জানতে পাল্লেম না। না পাল্লেও সেই লোকটী যে আমার ভাল চেষ্টা করেন, পত্রের আভাষে তা কতকটা আমি বুঝতে পাল্লেম। ভাল চেষ্টা করেন, তাও কিন্তু ঠিক নয়। রক্তদন্তের নাম জটাধর, দাঁতের বিকৃতি দেখে আমি নাম রেখেছি রক্তদন্ত। রক্তদন্ত আমার উপর দৌরাত্ম্য করে, পত্রলেখক সেটা জানেন ; না জানলে নিষেধ কোরবেন কেন ? পত্রের আভাষে আরো বুঝা গেল, ঐ পত্রলেখকের হুকুমমতই যেন রক্তদন্ত চলে, বলে, কাজ করে ; হুকুম তামিলের জন্যই রক্তদন্ত তাঁর কাছে বেতন পায়। সমস্যা বড় কঠিন। লোকটী তবে কে ? দস্তখৎ ছেঁড়া, নির্ণয় করবার উপায় নাই। যা-ই হোক, আপাততঃ আমার পক্ষে মঙ্গল, রক্তদন্তকে দেখে আর আমাকে এখন ভয় পেতে হবে না। ধন্য বিশ্বেশ্বর ! রক্তদন্তের ভয়ে বিশ্বেশ্বরপুরী পরিত্যাগ কোরে স্থানান্তরে পালিয়ে যাবার সঙ্কল্প কোচ্ছিলেম, রক্ষা পেলেম, এখন আমাকে কাশী ছেড়ে পালাতে হবে না।

উল্লাসে উল্লাসে প্রস্থান-সঙ্কল্প পরিত্যাগ কোল্লেম, আসলে সন্দেহ থাকলেও মন অনেকটা প্রবুদ্ধ হলো। চোঁতা কাগজগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে দূর কোরে টেনে ফেলে দিয়ে কেবল সেই ক্ষুদ্র চিঠিখানি আমি যত্ন কোরে তুলে রাখলেম।

নির্জ্জনে আপন মনে এই কাজগুলি আমি সমাধা কোল্লেম। মনের চিন্তা মনেই থাকলো, অন্য কাজে তখন মনোনিবেশ কোত্তে পাল্লেম না ; চুপ কোরে বোসে আছি, মিছামিছি একটা কাজের অছিলা কোরে বৈঠকখানার চাকরটী

আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। চাকরের নাম যজ্ঞেশ্বর ; বয়স প্রায় ৫০।৫৫ বৎসর। বাবুরা যখন কাশীবাস করেন নাই, তার দশবৎসর পূর্ব্বাবধি যজ্ঞেশ্বর তাঁদের দেশের বাড়ীর পুরাতন চাকর। বড়বাবু তাকে সকল কার্য্যেই বিশ্বাস করেন, যথেষ্ট ভালও বাসেন। মেজোবাবুকে আর ছোটবাবুকে যজ্ঞেশ্বর "তুমি তুমি" বোলে কথা কয় বেচাল দেখলে ধমকও দেয় ; ছোটবাবু চুপ কোরে থাকেন, মেজোবাবু চোটে চোটে উঠেন ; যজ্ঞেশ্বর গ্রাহ্য করে না। আমার উপর যজ্ঞেশ্বরের স্নেহ বোসেছে ; ঘনিষ্ঠভাবে আমাকেও "তুমি" বলে, আদরের "তুমি" সম্ভাষণ আমার কাণে বেশ মিষ্ট লাগে।

বাবু বৈঠকখানায় থাকলেও কোন কাজের কথা বলবার আবশ্যক হোলে যজ্ঞেশ্বর বেপরোয়া জাজিমের উপর এসে বসে, বিশেষ কথা থাকলে বাবুর গা ঘেঁসেও বসে, বাবু তাকে কিছুই বলেন না। ঐ রাত্রে যজ্ঞেশ্বর আমার গা ঘেঁসে বোসে চুপি চুপি বোলতে লাগলো, দেখ হরিদাসবাবু! বাবু তোমাকে ভালবাসেন, তোমার অসাক্ষাতে লোকের কাছে কত প্রশংসা করেন, বাড়ীর মেয়েরাও তোমার গুণের কথা বাবুর কাছে বলেন, বাবু খুসী হন। ছোট-বাবুও তোমার উপর তুষ্ট, কিন্তু মেজোবাবুর ভাবটা যেন কেমন কেমন। কোন মন্দকাজ তুমি কর না, কোন লোকের কথাতেও তুমি থাকো না ; তবু যেন তোমার উপর মেজোবাবুর কেমন রাগ রাগ ভাব। আজ তিনি অনেক বেলা থাকতে বাড়ী এসেছেন, ছোটবাবু আসবেন না, সেখানকার এক বন্ধুর বাড়ীতে নাচ আছে, রাত্রে সেইখানে তাঁর নিমন্ত্রণ, তিনি আজ রাত্রে আসবেন না, মেজোবাবুরও নিমন্ত্রণ ছিল, কি একটা কথা নিয়ে ছোটবাবুর সঙ্গে বকা-বকি কোরে তিনি চোলে এসেছেন ; সেই রাগের ঝালটা বাড়ীর ভিতর মেয়েদের কাছে ঝাড়া হোচ্চে। স্পষ্ট কারো নাম কোচ্চেন না, আঁচে আঁচে ঠোকোর দিয়ে যাচ্চেন। দাদার উপরেই যেন বেশী ঝাল। মেয়েগুলি সকলেই এক জায়গায় জমা হয়েচেন, কথার উপর কথা কওয়া কারোর সাধ্য নয়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মেজোবাবু বোলচেন, 'সংসারটা একেবারে ছারেখারে দিলে! হিসেব নাই! ওজন নাই! নিকেশ নাই! কেবল বাজেখরচ, কেবল বাজেখরচ! একজন মানুষ রোজগার করে, দশজনে কেবল বোসে বোসে খায়! মামার শালা, খুড়-শ্বশুরের সম্বন্ধী, ছোটখুড়ীর সম্পর্কের মাসী-পিসী, মামীশাশুড়ীর নাতনী, পাড়ার পুঁটীপিসীর দেওরপো, এই সকল পরগাছা জুটে অনেক লোকের সংসার মাটী করে। আমাদেরও প্রায় সেই দশা হয়ে এসেচে! দাদা আমার যেন দাতাকর্ণ! বিদেশে আসা গিয়েচে, এখানকার খরচপত্র অনেক, দশ টাকা হাতে থাকলে অসময়ে কাজে লাগে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! এখানেও পরগাছার বংশবৃদ্ধি! ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কিসে কি দাঁড়াবে, ভুলে একবার সেটা মনে করাও নাই! চাকরী—চাকরী—চাকরী! আরে, চাকরীর আবার বড়াই কি? চাকরী ত তালগাছের ছায়া, কখন আছে, কখন নাই, কে জানে? দাদা আমার চাকরীর গুমোরেই মত্ত! দেলদরিয়া! ছোট ভাইটীকেও সেই রকমে বানিয়ে তুলচেন! আমি মাঝে মাঝে এক একটা কথা বলি, সেই জন্যই আমি অবাধ্য, সেই জন্যই আমি গোঁয়ার! আমার একটা কথাও ভাল

লাগে না! খোসামুদে লোকগুলো হাত তুলে বলে, রমণবাবুটী আশুতোষ, ভোলা মহেশ্বর! সেই কথা শুনে দাদা আমার একেবারে ভোলানাথ হয়ে গঙ্গা-জলে গোলে যান! লোকগুলোরই বা আক্কেল কি? একটা ঘর নষ্ট হয়ে যায়, একটা সংসারে আগুন জ্বলে, সেই আগুনে বাতাস দেয়! বলে কি না, দশ-জনের ভরণপোষণ করা বড় ভাগ্যের কথা! আরে, আমি যখন ফকির হয়ে বেড়াবো, তখন আমার ভাগ্যের কথা কোথায় থাকবে? পরিবারের পাঁচজনে খায় পরে, সুখে থাকে, এটা কার ইচ্ছা নয়? যার যেমন ক্ষমতা, সে সেই রকমে সংসার চালায়। এত উৎপাত কার ঘরে? এত পরগাছা কে পুষতে পারে? ধর্ম্মের ঘরে কুঠের অভাব নাই! আমাদের ঘরটা তাই হয়েচে! অমুক এলো, অমুক থাকলো, অমুকের শালীর মেয়ে, শালীর ছেলে, শালীর বৌমা এসে সংসার আলো কোরে তুল্লেন! থাকলে সব ভাল, না থাকলে দেয় কে? দাদা আমার সবার উপর ইস্কাবনের টেক্কা! কোথা থেকে একটা ছোঁড়া ধোরে নিয়ে এসেচেন, আমরা মায়ের পেটের ভাই, আমাদের চেয়ে সে ছোঁড়াটার বেশী আদর! ঘিয়ের বাটী, ক্ষীরের বাটী, রুইমাছের মুড়ো, নিত্য বরাদ্দ! উঃ! রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বোলে যায়! বাড়ীর ভিতর মেয়ে-মহলে সেই ছোঁড়াটার শোবার ঘর! উচক্কা উচক্কা বৌ-ঝি যাদের ঘরে, তারা কি পথের লোককে ধোরে এনে বাড়ীর ভিতর শুতে দেয়? যেদিন আমার খপ্পরে পোড়বে, সেই দিন দেখাবো, একবার মজাখানা!'—এই রকম কত কথাই যে ঠেস দিয়ে দিয়ে মেজোবাবু বোলচেন, মুখে আনতে ঘৃণা হয়। একটা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সেই সব কথা শুনছিলেম, অনেকক্ষণ আমার দিকে চক্ষু পড়ে নাই, আমি যেমন সেখান থেকে বেরিয়ে সদরে আসবার জন্য মাঝের দরজা পর্য্যন্ত এসেছি, সেই সময়ে আমাকে দেখেই একেবারে আগুন-অবতার! 'তুই বেটা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কি শুনছিলি? থাক্ বেটা থাক্! বড় বাড় বেড়েচে! জুতো মেরে তাড়াবো! সব আমি জানতে পেরেচি! তুই বেটাও সেই হতভাগা ছোঁড়া বেটার গোলাম হয়েচিস!' আরো যে কত রকম গালাগালি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে শুনতে পাল্লেম না, মনের ঘৃণায় গুম হয়ে বেরিয়ে এলেম। ঝড় এখনো থামে নাই, এখনো ভয়ানক গর্জ্জন হোচ্চে! বড়বাবু বাড়ী এলে সব কথা আমি বোলে দিব; মেয়েদের মুখেও শুনতে পাবেন, তবু যদি মেজোবাবু আমাকে সেই রকম গালাগালি পাড়ে, আমি না হয় চাকরী ছেড়ে দেশে চোলে যাবো, আর আমার কি হবে? দেখ হরিদাসবাবু, তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেকো; মেজোবাবুর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা কোত্তে যেয়ো না, তার কথায় বেশী উত্তর কোরো না, গোঁয়ার-গোবিন্দি-লোক, কি কথায় কি হবে, কখন কি কোরে বোসবে, তোমার জন্য আমার বড় ভয় হয়। আর একদিন আমি—"

যজ্ঞেশ্বরের কথা শেষ হোতে না হোতেই চৌকাঠের কাছে বড়বাবু। কোঁচার কাপড়ে চক্ষু মুছে, যজ্ঞেশ্বর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, অন্যদিকে চেয়ে, বাবুর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। বাবু ঘরে এলেন; এসেই আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যজ্ঞেশ্বর এখানে বোসে বোসে কি কোচ্ছিল?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "মেজোবাবু বাড়ীর ভিতর কি বকাবকি কোচ্ছেন, অনেক রকম ঝঙ্কার, আমার উপরেও ঠেস ঠাস অনেক ; আমি এ বাড়ীতে আছি, আপনি অনুগ্রহ করেন, সেটা তিনি সইতে পারেন না। যজ্ঞেশ্বর আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই সব কথা শুনেছিল, সেই অপরাধে যজ্ঞেশ্বরকে তিনি যা ইচ্ছা তাই বোলে গালাগালি দিয়েছেন : যজ্ঞেশ্বর কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে সেই সব কথা বোলছিল।"

বাবু আর তখন বৈঠকখানায় বোসলেন না, আমারেও আর কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন না, আপন মনে দুই একটা অস্পষ্ট কথা বোলতে বোলতে বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেন। যজ্ঞেশ্বর তখন অন্যঘরে প্রবেশ করে নাই, বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল, তৎক্ষণাৎ আমার কাছে আবার এলো ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বোলতে লাগলো, "বেশ কোরেচো, বোলে দিয়েচো ; বাড়ীর ভিতর যে সব কাণ্ড হয়, সব কথা বাবুর কাণে উঠে না, পিসীমা এক একদিন এক একটা কথা বলেন, সে সব কথা ভেসে যায়, বাবু গুম হয়ে চুপ কোরে শুনেন, রা কাড়েন না।" বোলতে বোলতে যজ্ঞেশ্বর ধীরে ধীরে বোসলো ; আবার চুপি চুপি বোলতে লাগলো, "বাবুর কিন্তু ধন্নি বরদাস্ত ! ভাল-মন্দ কোন কথাতেই কথা নাই। ভাই-দুটীকে খুব ভালবাসেন, ছোট ভাইটী কথার বাধ্য, মেজোটী কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তেরিয়া। যে দিক দিয়ে যা হোক, সব খরচ বড়-বাবুর ; ভায়েরা যা কিছু রোজগার করেন, আপনাদের সখের খরচেই তার অর্দ্ধেক উড়ে যায়, বাকী অর্দ্ধেক হয় তো জমা থাকে, সংসারে এক পয়সাও সাহায্য করেন না, বড়বাবুও সাহায্য চান না। ছোটবাবু বরং এক একটা ক্রিয়াকর্ম্মের সময় কিছু কিছু দেন, মেজোবাবু চক্ষু বুজে থাকেন। তবু ঐ রকম গায়ের জ্বালা। কর্ত্তার আমোল থেকেই আমি আছি, এই সংসারের উপর আমার বড় মায়া, এই বাড়ীকে আমি আপনার বাড়ী মনে করি, ঘরের কথা প্রকাশ কোত্তে নেই, বড় দুঃখেই বোলতে হয়, মেজোবাবুর স্বভাব-চরিত্র একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েচে ! ছোটবাবুটীরও বদখেয়ালী আছে, কিন্তু সে সব বাহিরে বাহিরে ; মেজোবাবুর কাণ্ড-কারখানা কথার কথা নয় ; ঘরের ভিতর—না না, কি কেলেঙ্কার কি কেলেঙ্কার ! সে সব কেলেঙ্কারের কথা মুখে আনলে প্রাচিত্তির কোত্তে হয় ! বেশী দিন তুমি যদি এ বাড়ীতে থাকো, ক্রমে ক্রমে তুমিও অনেক জানতে পারবে। আমি সে দিন—"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে শঙ্কিতচিত্তে আমি বোলে উঠলেম, "না বাপু, সে সব কথা আমি শুনতে চাই না, জানতেও চাই না ; সে সব কথা তুমি আমার কাছে বোলো না। কে কোথা থেকে শুনবে, একে আর হয়ে যাবে ! একে তো মেজোবাবু আমার উপর চটা, তাতে যদি আবার ঘরের কুচ্ছকথা আমি শুনতে চাই কি জানতে চাই, তা যদি তিনি জানতে পারেন, এই আশ্রয়টী আমি হারাবো ; কাশীতে থাকবার আর স্থান পাব না ; তুমি চুপ কর। যিনি যা ভাল বুঝেন, তিনি তাই করেন, ভালকাজে ভাল হবে, মন্দকাজে পাপের ফল ভোগ কোত্তে হবে, আমার মত গরিবের সে সব কথায় থাকবার দরকার

কি ? ওসব কথা ছেড়ে দাও ; আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের পাশের বাড়ীতে কারা থাকে, তা কি তুমি জানো ? ঐ উত্তরদিকের বাড়ীখানা, ছাদে উঠলে যে বাড়ীর ছাদের অন্ধিসন্ধি বেশ দেখা যায়, ছাদের লোকগুলিকেও স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা যায়, সেই বাড়ীর কথাই আমি বোলছি। জানো কি ?"

যজ্ঞেশ্বর একটু হাসলে। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন দিয়ে আমাকেই জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেন গো ? সে বাড়ীর খোঁজ-খবরে তোমার কি দরকার ?"

অপ্রস্তুত না হয়েই আমি উত্তর কোল্লেম, "দরকার এমন কিছুই নয়, তবু বাড়ীর কাছে বাড়ী, ছাদে যদি কোন দিন উঠি, কিছু যদি দেখতে পাই বুঝে রাখবো, এইমাত্র কথা। একদিন আমি উঠেছিলেম, দুটী স্ত্রীলোককে আমি দেখেছি, একজনের বয়স কম, আর একজন বুড়ী। সেই বুড়ীকে যেন আমি কোথায় দেখেছি, তাকে যেন আমি চিনি, এই রকম বোধ হলো ; সেই জন্যই জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, ও বাড়ীতে কারা থাকে ?"

একটী নিশ্বাস ফেলে যজ্ঞেশ্বর বোল্লে, "দেখেচো ? রোজ রোজ তাদের আমি দেখি। কত রকম ভাব-ভঙ্গী, কত রকম হাসি-তামাসা, কত রকম চক্ষের খেলা, দেখে দেখে আমি পালিয়ে পালিয়ে আসি ; ভাব-ভঙ্গী কিছুই বুঝতে পারি না। বাড়ীখানি অনেক দিন খালি ছিল, তুমি এখানে আসবার মাসখানেক আগে কলিকাতার একটী বাবু ঐ বাড়ীতে এসে রয়েছেন, কুড়ি-টাকা ভাড়া দেন, পরিবার কজন, তা আমরা জানতে পারি না, বাবুটীর নামও জানি না, মাঝে মাঝে তিনি ছাদে উঠেন, তাতেই চেহারাখানা দেখতে পাই ; চেহারাখানা বাবুলোকের মত, কিন্তু কে কি বৃত্তান্ত জানবার সুবিধা হয় না। অনুমানে লাগে, কেবল এক পরিবার ভিন্ন আর কেহ সঙ্গে নাই ; সঙ্গিনী ঐ বুড়ী।"

আর আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না, যতটুকু শুনলেম, তাতেও কিছু বুঝতে পাল্লেম না। বাড়ীর ভিতর ভারী একটা গোলমাল উঠলো, যজ্ঞেশ্বর ছুটে গেল, আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাণ পেতে শুনতে লাগলেম ; দুই তিনজনের গলার আওয়াজ। তা উপলক্ষে গণ্ডগোল, স্পষ্ট বুঝা গেল না, আমিও বাড়ীর ভিতর যাই যাই মনে কোচ্ছি, দ্রুতপদে বড়বাবু উপরে এসে উঠলেন। তখনো কাপড় ছাড়া হয় নাই, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম,—ঘর্ম্মজলে গাত্র-বস্ত্র পরিসিক্ত, বদন রক্তবর্ণ। ভাব দেখে আমি বুঝলেম, ব্যাপার গুরুতর। বৈঠকখানাতেই কাপড় ছাড়া হলো, যজ্ঞেশ্বর একখানি শুষ্ক তোয়ালে দিয়ে গাত্র মার্জ্জনা কোরে দিলে, বাবু অনেকক্ষণ নীরব হয়ে একটী তাকিয়ার কাছে বোসে রইলেন। এই সময় সদরবাড়ীতেও চীৎকারশব্দ। কে একজন চীৎকার কোত্তে কোত্তে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। পরে শুনলেম, মেজোবাবু। তিনি আর সে রাত্রে বাড়ীতে ফিরে এলেন না, বড়বাবুও তত্ত্ব নিলেন না, অসুখে অসুখেই রাত্রিটা কেটে গেল। কি সূত্রে কি প্রকার কলহ, আমি আর

সেটা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কোল্লেম না। সূত্রের আভাষটা যজ্ঞেশ্বরের মুখে পূর্ব্বেই কতক কতক শুনা হয়েছিল, অনুমানে সিদ্ধান্ত কোল্লেম, আমাকে উপলক্ষ কোরেই ভাই ভাই কলহ। কলহে বড়বাবু অনভ্যস্ত, মেজো-বাবুই বেশী কথা বোলেছেন, বেশী গোল কোরেছেন, তাতে আর সন্দেহ থাকলো না।

প্রভাতে বাড়ীর ভিতর মেয়েদের কাছে শুনলেম, মেজোবাবু এ সংসার থেকে পৃথক হবেন, পরিবার নিয়ে স্বতন্ত্র থাকবেন, বড়বাবুর টাকায় বাড়ী, তবুও অংশমত বাড়ীর তৃতীয়াংশের মূল্য আদায় কোরবেন, কারো সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখবেন না। লক্ষণও সেইপ্রকার। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই পাঁচ দিনের মধ্যে মেজোবাবু আর একদিনও বাড়ী এলেন না, কোন সংবাদও পাঠালেন না।

রবিবার। আজ সেই বীরভূমের বাবুর তীর্থোৎসব। কোন্ বাড়ীতে তিনি এসে উঠেছেন, ঠিক আমার জানা হয় নাই, শুনেছিলেম, কেবল বড়বাবুর এক বন্ধুর বাড়ীতেই সেই সমারোহ হবে। আহারাদির পর বড়বাবু আমাকে সঙ্গে কোরে সেই বন্ধুর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। দণ্ডীভোজন, কাঙ্গালী-ভোজন আর কুমারীভোজন। পাঠক-মহাশয়ের স্মরণ থাকতে পারে, রসিকলাল পিতুড়ী নামে একটী বাবু আমার কাছে একদিন আমাদের বড়বাবুর পরিবার-বর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন, এই বাড়ীখানি সেই রসিকবাবুর। বাড়ীতে একটা ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হোলে, বাড়ীর লোকেরা, বিশেষতঃ কর্ত্তাপক্ষের পুরুষেরা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, উপরে নীচে, ভিতরে বাহিরে, এ ঘর ও ঘর ছুটাছুটি করেন, নিমন্ত্রিত লোকের আদর-অভ্যর্থনা করেন, ছোট বড় কর্ম্মচারিলোকের উপর গলাবাজী করেন ; রসিকবাবু আজ সেইরূপ ব্যস্ত। বড়বাবু আমাকে একটী ঘরে পাঁচজনের কাছে বোসিয়ে রেখে কার্য্যান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়া-চ্ছিলেন, রসিকবাবুর সঙ্গে এক একটা কার্য্যের পরামর্শ কোচ্ছিলেন, ঘরের ভিতর থেকে এক একবার আমি তাঁদের উভয়কেই দেখতে পাচ্ছিলেম। যে ঘরে আমি, রসিকবাবু সেই ঘরের সম্মুখ দিয়ে দুই তিনবার হন হন কোরে চোলে গিয়েছেন, এক একবার ঘরের দিকেও চেয়েছেন, আমার প্রতি ততটা লক্ষ্য করেন নাই ; বোধ হয় তখন তিনি আমাকে চিনতেই পারেন নাই।

একদিনের দেখা, খানিকক্ষণের পরিচয়, চিনতে পারা ততটা সম্ভবও ছিল না, তিনি আমাকে চিনতে পারেন নাই। একঘণ্টা পরে, বোধ হয় বড়বাবুর মুখে শুনে, রসিকবাবু সেই ঘরে এসে আমাকে দেখলেন, তখন চিনতে পাল্লেন ; প্রসন্নবদনে বোল্লেন, "হরিদাস! তুমি এসেছ, বড়ই সন্তুষ্ট হোলেম, নানা কার্য্যে আমি ব্যস্ত, এতক্ষণ তোমাকে দেখতে পাই নাই, এখানে তুমি কেন বোসেছ, তুমি ছেলেমানুষ, সদরবাড়ীর ভিড়ের ভিতর তুমি কেন?—এসো, বাড়ীর ভিতর এসো, কুমারীভোজন আরম্ভ হয়েছে, দেখবে এসো।"

আমার মন তখন অন্যদিকে ছিল। রসিকবাবুকে দেখবো, কুমারীভোজন দেখবো, আমি তখন আশা করি নাই ; আমার প্রধান আশা কর্ম্মকর্ত্তাকে দেখা।

বীরভূমের জমীদার, তিনি আমার পরিচিত কি অপরিচিত, তিনি আমার সেই অকারণ-বন্ধু নরহরিবাবু কি না, সেইটী জানবার জন্যই আমার চিত্ত ব্যাকুল ছিল, তখন সুবিধা হলো না ; রসিকবাবু ডাকলেন, তাঁর সঙ্গে অন্দরমহলে গেলেম। কেবল মেয়েমানুষের ভিড়। হরেক রকম কাপড়পরা, রকমারি গহনা গায়, রকমারি খোঁপাবাঁধা, শতাধিক মেয়েমানুষ। এ বাড়ীর ভিতরমহলটাও চকবন্দী ; চারিদিকে টানা বারান্দা, প্রত্যেক বারান্দায় সারি সারি কার্পেটের আসন পাতা, প্রত্যেক আসনের কাছে কাছে পুষ্পচন্দনের রেকাব, আসনের সম্মুখে সম্মুখে পরিষ্কার ধাতুপাত্রে বিবিধ মিষ্টান্ন, দক্ষিণপার্শ্বে এক একটী জলপাত্র। দশজন স্ত্রীলোক একধারে কুমারীগণের পদপ্রক্ষালন কোরে দিচ্ছে, কুমারীরা বাতকম্পিত পদ্মফুলের মত হেলে দুলে এক একখানি আসনে গিয়ে বোসছে। কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা ঢাকা, অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা, বারাণসী শাড়ীপরা, একটী শ্যামবর্ণা, সুন্দরী যুবতী গলবস্ত্র হয়ে প্রত্যেক কুমারীর পাদপদ্মে পুষ্পদান, গলদেশে মাল্যদান আর ললাটে রক্তচন্দনের তিলকদান কোরে করপুটে প্রণাম কোচ্ছে। অর্চ্চনাকার্য্য সমাপ্ত হলো, কুমারীরা ভোজন-কার্য্যে মনোযোগ দিল। চকের একটী ঘরের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আমি কুমারী-ভোজন দেখতে লাগলেম।

বড় বড় কুমারী। হিন্দুস্থানী কুমারীও আছে, বাঙ্গালী কুমারীও কতকগুলি আছে। বঙ্গদেশে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির বচনপ্রমাণে দশ বৎসরের অধিকবয়স্কা বালিকাগণকে কুমারী বলা হয় না, কাশীতে দেখলেম, বিংশতিবর্ষের ন্যূন-বয়স্কা কুমারী একটীও নাই ; হিন্দুস্থানী কুমারীদের দলে তদপেক্ষা আরো অধিকবয়স্কা রমণীও অনেক। আমার মনের কথার মিলনে সে সকল কুমারীর যদি পরিচয় হয়, তা হোলে আমার মনের অভিধান অনুসারে ব্যাখ্যা হওয়া উচিত, তারা সব প্রৌঢ়া কুমারী। অনুমানে আসে, কেহ কেহ একপুত্রবতী, কেহ কেহ দুই বা ততোধিক সন্তানের গর্ভধারিণী, সূক্ষ্মদর্শকের নয়নে বক্ষঃ-স্থলের নিম্নভাগের গঠনে কেহ কেহ গর্ভবতী !

কুমারীদের কারো মুখে ঘোমটা নাই। না থাকার দুই কারণ। বিবাহের অগ্রে আমাদের দেশে ঘোমটা দিবার রীতি নাই, এই এক কারণ, দ্বিতীয় কারণ, সে মজলীসে যুবা অথবা প্রৌঢ়পুরুষ একজনও ছিল না। আমার মত বয়সের আট দশজন বালকের সঙ্গে কতকগুলি স্ত্রীলোক সেখানে পরিবেশনকার্য্যে নিযুক্ত ; সুতরাং ঘোমটা নিষ্প্রয়োজন। বালিকারাও কুমারী, যুবতীরাও কুমারী, প্রৌঢ়ারাও কুমারী ; অভাবের মধ্যে প্রবীণা প্রাচীনা। সধবা কুমারী থাকা সম্ভবও হয় না, নিতান্ত অসম্ভবও মনে করা যায় না। সধবার চিহ্ন সীমন্তে সিন্দূর ; যে সকল সধবার কুমারীপূজাগ্রহণে আকাঙ্ক্ষা থাকে, তারা স্বচ্ছন্দে অল্পক্ষণের জন্য ললাটের সিন্দূরবিন্দুগুলিকে বিদায় কোরে দিতে পারে ; এরূপ প্রক্রিয়ায় সধবা-কুমারী জানা যায় না ; বিধবা-কুমারী ধরবার তো কোন সম্ভাবনাই নাই ; কেন না, বিধবারা সিঁদুরের ধার ধারে না, সিঁদুরের উৎপাতও রাখে না !

সব মুখগুলি খোলা। একজায়গায় দাঁড়িয়ে যতগুলি মুখ দেখা যায়, কুভাবপরিশূন্য-নয়নে সবমুখগুলি আমি ভাল কোরে দেখলেম। সুন্দরী কুমারী, অসুন্দরী কুমারী, মনে মনে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কোল্লেম ; কলসীর উপর কলসী, তার উপর কলসী, গঙ্গাজলপূর্ণ তিন তিন কলসী মাথায় নিয়ে, কাশীর ঘাটের অগণিত সিঁড়ি ভেঙে, যে সকল গজেন্দ্রগামিনী খোট্টা-মহিলা অক্লেশে গৃহস্থলোকের বাড়ী বাড়ী গঙ্গাজল যোগান দেয়, তাদেরও কেহ কেহ এই কুমারীর দলে আছে, দুই একখানা মুখ দেখে তাও আমি চিনতে পাল্লেম। একে একে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে দুখানি মুখের দিকে আমার চঞ্চলনয়ন অকস্মাৎ সর্মাধিক আকৃষ্ট হলো। আমি চোমকে উঠলেম !

এরাও কি কাশীধামের কুমারী ? কি আশ্চর্য্য ! মোহনলালবাবু একজন মানীলোক, মান্যগণ্য ধনবান লোক, একজন উপরত প্রসিদ্ধ লোকের জামাতা, তিনি কিরূপে এই গর্হিত কার্য্যে অনুমতি দিলেন ? এ তো দেখছি অমর-কুমারী ! ভেলুয়া-চটীতে মোহনলালবাবু আমাকে বোলেছিলেন, অমরকুমারী নয়, সেই কন্যাটীকে সম্প্রতি তিনি বিবাহ কোরেছেন। বিবাহটা হয় তো সত্য হোতে পারে, কিন্তু অমরকুমারী নয়, এটা তো আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ;—তখনও হয় নাই, এখনো হোচ্ছে না। অমরকুমারী নিশ্চয়। আমি যখন অমরকুমারীকে দেখি, তখন অমরকুমারী সত্যই কুমারী ছিলেন ; পিতা গরিব, কোন গতিকে কাশীতে এসে, অমরকুমারী আপনাদের দেশস্থ লোকের কুমারী-পূজায় কুমারী হোতে এসেছেন, এটা তত দোষের কথা নয় ; কিন্তু সত্য যদি বিবাহ হয়ে থাকে, তবে এটা নিতান্তই জঘন্য কার্য্য। অমরকুমারীর মন আমি বুঝেছি, সরলতাও জেনেছি, সৎশিক্ষার পরিচয়ও পেয়েছি, এমন জঘন্য কার্য্যে সেই অমন সরলচরিত্রা অমরকুমারীর প্রবৃত্তি হবে, এমন তো কখনই বিশ্বাস হয় না। তবে কি মোহনলালবাবু আমার কাছে মিথ্যাকথা বোলেছেন ? তাই হয় তো ঠিক হবে। মিথ্যাকথা ; বিবাহের কথাটা একান্তই মিথ্যা !

অমরকুমারীকে আমি দেখলেম, অমরকুমারী আমাকে না দেখেন, সেজন্য সাবধান হোলেম ; কপাটের আড়ালে একটু সোরে দাঁড়ালেম। পূর্ব্বে বোলেছি, দুখানি মুখ। একখানি তো অমরকুমারীর, আর একখানি কার ?—তা আমি জানি না। কার মুখ, তা আমি জানি না বটে, কিন্তু যার মুখ, তারে আমি একদিন দেখেছি ;—এই কাশীধামেই দেখেছি। সেই সুন্দরী কিসের লোভে এখানে কুমারী হোতে এসেছে ? যখন আমি দেখেছিলেম, তখন দামী দামী অলঙ্কার-বস্ত্র অঙ্গে ছিল, এখনো দেখছি সেই রকম ; তবে এ সুন্দরী এমন ভাবে দানবাড়ীতে কেন বেড়ায় ? আরো এক কথা—বাঙ্গালীর মেয়ে, এত বয়স পর্য্যন্ত কুমারী আছে, এটাই বা কি ? এত কুমারী একত্র, এদের মধ্যে ঐ রকমের আরো কত আছে অথবা সকলেই ঐ রকম, তাই বা আমি কিরূপে জানবো ? সকলে একরকম নয়, এমন কথাই বা কে বোলতে পারে ? কাশী একেবারে মেয়েলোকের পুরী নয়, যে সকল মেয়েলোকের মাথার উপরে পুরুষ

অভিভাবক আছে, সেই সকল পুরুষেরাই বা কোন লজ্জায় এমন সব সধবা-বিধবা সুন্দরীগুলিকে ঠাঁটঠমোকে কুমারী সাজিয়ে পাঠায়? খোট্টামহলে কি রকম চলে না চলে তা আমার বিশেষ জানা নাই, কিন্তু বাঙ্গালীমহলে এ কি? একদিন একটী লোক আমাকে বোলেছিল, "কাশীর বাঙ্গালীদলে অনেকগুলি বহুরূপী; দেশে যারা ছাগল ছিল, ধরা পড়াতে কিম্বা পড়বার আশঙ্কাতে সেই সকল ছাগল কাশীতে এসে বাবু হয়েছে!"

সত্যই কি তাই? পুণ্যবানের ভান কোরে তারাই কি সব কাশীবাসী? দেশের ছাগল কাশীর বাবু; দেশের ছাগলী কাশীর কুমারী, কাশীর সধবা; কাশী-রঙ্গভূমির এ রঙ্গ লোমহর্ষণ! ধন্য কাশীরাম! ধন্য বিশ্বেশ্বর! ধন্য মহিমা! মরণেই মুক্তি! মরণের অগ্রে এই সব কাশীবাসী যেন সশরীরে শিব-লোকে প্রস্থান কোচ্ছে. ভূতনাথের অনুচর সেজে তালে-বেতালে নৃত্য কোচ্ছে, রঙ্গভঙ্গ দেখে শুনে তাই যেন আমার মনে হয়! বোলেছি, একটী সুন্দরী কুমারীকে একদিন আমি কাশীতেই দেখেছি, সত্য সত্য কুমারী কি না, বিশ্বে-শ্বর জানেন; কিন্তু আমি দেখেছি। কোথায় দেখেছি, সেই কথাটী আবার বলি। আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীর ছাদের উপর। যৌবনভার-মন্থরা, পীনোন্নত-পয়োধরা, রেশমী-রুমাল-হস্তা, চঞ্চল-কুরঙ্গনেত্রা সুরঙ্গিণী। সেই সুরঙ্গিণীই এই কার্য্য-বাড়ীর একটী পবিত্রা কুমারী!

বাহবা—বাহবা—বাহবা! বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে এই পবিত্র মুক্তিক্ষেত্রে কত রকম তামাসাই যে হয়, কাশীবাসীরাই সেই সকল তামাসার নিত্য-দর্শক, নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসভোগী! কাশী আমি ছাড়বো না। রক্তদন্ত কাশীতে এসেছে, রক্তদন্তকে দেখে আমার ভয় হয়েছিল, রক্তদন্তের ভয়ে কাশী ছাড়বার ইচ্ছা হয়েছিল, সে ভয়টা ঘুচে গিয়েছে;—সেই ছেঁড়া চিঠিখানা আমাকে সে ভয় থেকে আপাততঃ পরিত্রাণ কোরেছে। কাশী আমি ছাড়বো না, কতদূরে এই সকল রঙ্গের সমাপ্তি, সেটা আমি দেখবোই দেখবো!

সে সব দেখা তো ভবিষ্যতের কথা, এখন—এই আজ আমার কি দেখবার সাধ? বীরভূমের জমীদার। যাঁর দৌলতে কুমারী-রঙ্গ দর্শন, তাঁরে আমি কখন দেখতে পাবো, সেই ব্যাকুলতা সর্ব্বক্ষণ আমার অন্তরে। কুমারীভোজন সমাপ্ত হলো, রসিকবাবু এসে আমাকে কিছু জল খেতে দিলেন, রসিকবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আমি দেখা কোল্লেম। স্ত্রীটী দিব্য প্রসন্নমুখী, সন্তান হয় নাই; কিন্তু দেখায় যেন দুই তিন পুত্রের জননী, রসিকবাবুর চেয়ে যেন আট দশ বৎসরের বড়। পিতুড়ীর ঘরে "বর বড় কি কোনে বড়," এই মন্ত্রের যে তো সার্থকতা আছে, এই ভাবটা একবার মনে এলো;—যেমন এলো, তেমনি আবার ডুবে গেল। স্ত্রীটী কিছু স্থূলাঙ্গী, সেই জন্যই বোধ হয়, বড় দেখায়, সেই জন্যই হয় তো পুত্রবতী মনে হয়।

রসিকবাবু আমাকে সদরবাড়ীতে নিয়ে এলেন, সদরবাড়ীর লোক তখন অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে, একটা ঘরের সম্মুখে আমাদের বড়বাবু একটী

লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কোচ্ছিলেন, সেই লোকটী দীর্ঘাকার, স্থূলাঙ্গ, বুকে অনেক চুল, শ্যামবর্ণ, গলায় তুলসীমালার সঙ্গে ছোট ছোট মাদুলী, চোমরা গোঁফ, ক্ষুদ্র চক্ষু, টানা ভ্রূ, বাবরী চুল, মাঝখানে সিঁতিকাটা, কথা শুনে বুঝতে পাল্লেম, স্বর বড় কর্কশ। আমি তাঁদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেম, একটু হেসে বড়বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হরিদাস! কুমারীভোজন দেখা হলো ?"

আমার হাসি পেলে। মাথা হেঁট কোরে মৃদু হেসে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞে হাঁ।" যে লোকটীর সঙ্গে বড়বাবুর কথা হোচ্ছিল, সেই লোকটী আমার দিকে একবার চাইলেন, আমিও তাঁর মুখের দিকে তাকালেম, বোধ হলো, যেন চিনেছি, চেনা মুখ, মনটা কেমন তর্কে উঠলো। সেই সময় বড়বাবু আমাকে বোল্লেন, "যাঁর কথা তোমাকে আমি বোলেছিলেম, ইনিই সেই বাবু, বীরভূমের জমীদার ;—নাম কানাইলাল বাবু।"

তর্কের উপর তর্ক। চেহারা দেখে যা অনুমান কোরেছিলেম, নাম শুনে সেই অনুমানটা নিশ্চয়তায় পরিণত হলো। শিষ্টাচারের অনুরোধে হাত তুলে আমি কানাইবাবুকে নমস্কার কোল্লেম, অন্তরে কিন্তু বিজাতীয় ঘৃণা। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ঐ মূর্ত্তি আমার একবারমাত্র দেখা, ঐরূপ কর্কশস্বরে এই কানাই আমাকে বিদায় কোরে দিয়েছিলেন। কানাইবাবুর স্বভাবের পরিচয় বীরভূমের বাণেশ্বরবাবুর চাকরদের মুখে শুনা হয়েছিল, মাতুলকন্যার রসের নাগর! সেই কথা স্মরণ হওয়াতেই এই লোকের প্রতি অকস্মাৎ আমার ঘৃণা।

আমার কাছে কানাইবাবুর পরিচয় দিয়ে, বড়বাবু সংক্ষেপে সংক্ষেপে কানাইবাবুর কাছেও আমার পরিচয় দিয়ে দিলেন। কানাইবাবু আর একবার আমার দিকে চাইলেন, কথাও কইলেন না, চিনতেও পাল্লেন না। তিনি বাবুলোক, আমি গরিব, একদিন একবার পলকমাত্র দেখা, আমি চিনে রেখেছিলেম, তিনি কেন আমার চেহারা মনে কোরে রাখবেন ? বীরভূমে তাঁরে আমি দেখি নাই ; নাম শুনেছিলেম, কার্য্য শুনেছিলেম, কলিকাতায় একবার দেখেছিলেম, এই পর্য্যন্ত কথা। তাঁর সম্বন্ধে কি কি আমি জানি, তিনি সে কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নাই।

কানাইবাবু ব্যস্ত, বড়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে তিনি কার্য্যান্তরে অন্যদিকে চোলে গেলেন। বড়বাবু আমারে আর একটী ঘরে নিয়ে বসালেন, তিনি নিজেও সেখানে বোসলেন। সে ঘরে তখন অন্য কেহ ছিল না। নির্জ্জন পেয়ে বড়বাবুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ঐ উনিই কি একা এসেছেন কিম্বা আর কোন জমীদার সঙ্গে আছেন ?" বড়বাবু বোল্লেন, "পুরুষের মধ্যে উনি একাকী, পরিবার সঙ্গে আছেন।" আর কোন কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। বেলা গেল, রসিকবাবুর সঙ্গে দেখা কোরে বড়বাবুর সঙ্গে আমি বাড়ী চোলে এলেম। সেই রাত্রে আমার অনেক ভাবনা। দুটী ভাবনা প্রধান। কানাইবাবু বীরভূমের জমীদার, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। যতদূর আমি জানি, তাতে

কোরে বুঝা যায়, কাশীতে উনি পালিয়ে এসেছেন। সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক আছে, তারেই পরিবার বোলে পরিচয় দিয়েছেন। যে স্ত্রীলোকটী বারাণসী শাড়ী পোরে কুমারীগুলিকে ফুল-চন্দন দিলেন, ফুলের মালা পরালেন, তিনিই বোধ হয় পরিবার। আমি যে রাত্রে রক্তদন্তের বাড়ী থেকে নারীবেশে পলায়ন করি, পথে বেরিয়েই ধরা পড়ি, সেই রাত্রে কানাইবাবুর মামার বাড়ীতে আমার বাস হয়; যারা আমাকে ধোরেছিল, তাদের ভুল। কানাইবাবু এখন যারে পরিবার সাজিয়ে কাশীতে এনেছেন, সেই মেয়েটী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, নারীবেশে আমিই বুঝি সেই, তাই ভেবেই লোকেরা আমাকে ধরে। মেয়েটী কানাইবাবুর মাতুলকন্যা, সেই মাতুলকন্যার প্রেমাসক্ত কানাইবাবু; তিনিই তাকে কুপথগামিনী করেন; নিশ্চয় বুঝলেম, সেই মাতুলকন্যাই এই পরিবার! আর একটা কথা। কানাইবাবু বাল্যাবধি মামার বাড়ীর অন্নদাস; জমীদার অথবা জমীদারপুত্র হোলে কদাচ মাতুলের গলগ্রহ হয়ে থাকতেন না। কাশীতে কানাইবাবু একজন ছদ্মবেশী ভূমিশূন্য ভণ্ড ভূস্বামী, এই পরিচয় ঠিক। বীরভূমে গুপ্তভাবে মাতুলের ঘরজামাই হয়েছিলেন। বাড়ীর ভিতর বেশী দিন ঘরজামাই থাকা চোলবে না, প্রকাশের ভয়ে নায়ক-নায়িকা একে একে তফাৎ হয়ে পড়েন। প্রথমে হয় তো নায়িকাটীকে কলিকাতায় আনা হয়েছিল, তার পর নিরাপদ হবার জন্য পরিবার-পরিচয়ে কাশীতে আনা হয়েছে। ইহার মধ্যেও একটা প্রশ্ন আছে। কানাই যদি জমীদার নয়, তবে কাশীর উৎসবে এত সমারোহ করবার টাকা পেলে কোথা? এ প্রশ্নের উত্তরটা কিছু কঠিন হোলেও আমার অনুমানে অতি সহজ। যে লোক মামার ভাতে মানুষ হয়ে মামার মেয়েকে ঐ ভাবে দখল কোত্তে পারে, তার অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? নিশ্চয়ই মামার টাকা চুরি কোরে এনেছে: তীর্থস্থানে বাবুগিরীর টাকাগুলি নিশ্চয়ই চুরিকরা টাকা। এ রহস্য প্রকাশ হবে না, এমন কথাও নয়; পাপ-কর্ম্ম কত দিন চাপা থাকে?—একদিন না একদিন অবশ্যই প্রকাশ হবে। আমি যদি মনে করি, নরহরিবাবুকে চিঠি লিখে অচিরেই ধোরিয়ে দিতে পারি। পারি বটে, কিন্তু কাজ কি? ধর্ম্ম আছেন, দশদিন পরে হোক, একমাস পরে হোক অথবা বর্ষ পরেই হোক, ধর্ম্মের ঢাক বাজবেই বাজবে।

দ্বিতীয় ভাবনা অমরকুমারী। কাশীর কুমারীদলে অমরকুমারী। অতক্ষণ আমি কুমারীভোজের আসরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকলেম, আমার দিকেও কতবার চক্ষু পোড়লো, তথাপি অমরকুমারী আমাকে চিনতে পাল্লেন না। ভেলুয়া-চটীতে জ্বলন্ত আগুনের মুখ থেকে যখন আমি উদ্ধার করি, তখনো অমরকুমারী আমাকে চিনতে পারেন নাই। ভাব কি? চেনা-লোকের সঙ্গে দেখা হোলে, মুখের কথায় না হোক, ভাবভঙ্গী দ্বারাও কিছু না কিছু প্রকাশ পায়; কিন্তু কিছুই না। ভাব কি? সরলার ততটা হিতানুরাগ, ততটা দয়া, আত্মীয়তা কোথায় গেল? সত্য কি অমরকুমারী এত অল্পদিনে আমাকে একেবারে ভুলে গেলেন? মোহনলালবাবু অমরকুমারীকে বিবাহ কোরেছেন, আমি কাশীতে আসবো, অমরকুমারীকে নিয়ে তিনি প্রয়াগে যাবেন, এইরূপ কথা ছিল, অমরকুমারী তবে কার সঙ্গে কাশীতে এসেছেন?

বিবাহিতা বালিকা কার মন্ত্রণায় কুমারী সেজেছেন? ভাবলেম অনেক, কিছুই ঠিক কোত্তে পাল্লেম না। মোহনবাবুও হয় তো এখানে এসে থাকবেন, অনুমানে কেবল এইটুকু অবধারণ করা গেল।

অপরাপর চিন্তা এ ক্ষেত্রে পাঠকমহাশয়ের প্রীতিকরী না হোতে পারে, তাই ভেবে এখন সে সব প্রকাশ কোল্লেম না। রজনী প্রভাত হলো, প্রভাত-সূর্য্য দেখা দিলেন, যথাসময়ে অস্ত গেলেন, আবার রাত্রি এলো, আবার ঊষা দেখা দিল, আবার সূর্য্যোদয়, আবার অস্ত। এই প্রকারে সপ্তাহকাল সূর্য্যের উদয়াস্ত আমি দর্শন কোল্লেম। আবার রবিবার। এক রবিবার ছাদে উঠেছিলেম, নূতনমূর্ত্তি দর্শন কোরেছি, আর একবার দেখে আসি, এইরূপ মনে হলো, কিন্তু সাহস কোত্তে পাল্লেম না; কিসে কি হবে, কে কি বোলবে, এই শঙ্কায় মনের ইচ্ছাকে মনে মনেই চেপে রাখলেম।

ঊনবিংশ কল্প

কোথাকার পাপ কোথায়?

বড়বাবু প্রতি রবিবার বৈকালে বেড়াতে যান, সন্ধ্যার পর ফিরে আসেন। আজ রবিবার। বেলা পাঁচটা বাজবার পূর্ব্বেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন, বৈঠকখানায় আমি একাকী আছি। মেজোবাবু আর বাড়ী আসেন না, ছোটবাবুও দু-তিনদিন আসেন নাই, বাড়ীতে তখন আমি একাকী। রবিবার হোলেই আমার ইংরেজী আলোচনার অবসর হয়, একখানি ইংরেজী পুস্তক পাঠ কোত্তে আরম্ভ কোরেছি, মন কিন্তু উতলা; কত রকমের কত কথাই মনে আসছে, ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হোচ্ছি, পুস্তকপাঠে একাগ্র হোতে পাচ্ছি না, অর্থবোধের সমন্বয় থাকছে না, এক একবার অক্ষরগুলিও যেন ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছি, এতদূর অন্যমনস্ক। কিছুই ভাল লাগছে না। পুস্তকখানি মুড়ে রাখলেম, উঠে একবার বারান্দায় এলেম; আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম, কি জানি, কেমন এক প্রকার অস্থিরতা আমাকে আক্রমণ কোল্লে; যজ্ঞেশ্বরকে ডাকলেম; যজ্ঞেশ্বর এলো; আমার কাছে এসে বোসলো। খানিকক্ষণ নীরবে আমি তার মুখপানে চেয়ে থাকলেম, কি কথা বোলবো, যজ্ঞেশ্বর কিছুই অনুমান কোত্তে পাল্লে না। আরও খানিকক্ষণ চুপ কোরে থেকে মৃদুস্বরে আমি বোল্লেম, "যজ্ঞেশ্বর! আজ কদিন আমি তোমাকে একটী কথা বোলবো বোলবো মনে কোচ্ছি, বোলতে পাচ্ছি না, কথাটী তুমি রাখবে কি? কথাটী তুমি শুনবে কি? কারো কাছে কিন্তু এখন সে কথাটী প্রকাশ কোরো না; নিতান্ত গোপনীয়কথা নয়, তবু যেন ভয় করে! তুমি ভালমানুষ, তোমার মুখে বেশী কথা নাই, পরের কথা পরকে বলা তোমার স্বভাব নয়, বেশ আমি জানতে পেরেছি, সেই জন্যই তোমাকে বলা। কারো কাছে কিছু এখন প্রকাশ কোরো না।"

বুঝতে না পেরে অল্প অল্প হেসে, যজ্ঞেশ্বর তখন বোল্লে, "কথা তো তোমার কিছুই নয়, কেবল গৌর-চন্দ্রিমাই শুনচি, কেবল বার বার আমাকে সাবধানই কোচ্চো ; 'প্রকাশ কোরো না, প্রকাশ কোরো না,' এই কথাই তো বোলচো, আসলকথাটা কি, ভেঙে চুরে খোলসা কোরেই বল, আমার মুখে কেহই কিছু শুনতে পাবে না, ভয় নাই, তুমি বল।"

পুনর্ব্বার সাবধান কোরে চুপি চুপি আমি বোল্লেম, "জানোই তো, সে দিন আমি ছাদে উঠেছিলেম, যা যা দেখেছি, তোমার সাক্ষাতে বোলেছি, তুমিও কতদিন দেখেছো, কে তারা, ভদ্রলোকের মেয়ে, লজ্জা-সরম নাই, এমন কোরে ছাদে ছাদে চেয়ে চেয়ে কেন বেড়ায়, কেন সে অঙ্গভঙ্গী কোরে রুমাল ঘুরায়, সন্ধানটা একবার নিতে পার ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত কোরে হাসতে হাসতে যজ্ঞেশ্বর বোল্লে, "ও বাপু ! তোমার পেটে এত বিদ্দে ! কাদের মেয়ে, কেন বেড়ায়, কেন ভঙ্গী করে, সে সব খবর নিয়ে তুমি কি কোরবে ? বাড়ীর সকলে তোমায় ভাল বলে, আমরাও দেখি, কোন দিকে তোমার উঁচু দৃষ্টি নাই, স্বভাব ঠাণ্ডা, ও সব খোঁজখবর তুমি কেন রাখতে চাও ? ছি ! লোকে জানতে পাল্লে নিন্দে হবে, বড়বাবু রাগ কোরবেন, মেয়েরা সব হাসবে, অমন কর্ম্ম কোরো না ; ও সব কথা আমায় বোলো না ; কাশীজায়গা, তীর্থস্থান, কত আসে, কত যায়, কে কোথায় থাকে, কে তার খবর রাখে ? আমার মুখে প্রকাশ হবে না বটে, কিন্তু কোন রকমে লোকে যদি কিছু জানতে পারে, তা হোলে ভারী একটা গোলমাল বেধে যাবে !"

একটু অপ্রতিভ হয়ে, সন্দিগ্ধ বক্তার মুখের দিকে চেয়ে, অসঙ্কোচে আমি বোল্লেম, "না না, সে কথা বোলছি না. আমার কথার ভাবটা তুমি বুঝতে পাচ্ছো না, আগে শোনো, তার পর ভালমন্দ বিচার কোরো। সেই যে বুড়ী আছে, তাকে যেন আমি চিনি চিনি মনে হয় ; কলিকাতায় তাকে যেন আমি দেখেছি। তুমিও সে দিন বোলেছো, কলিকাতার এক বাবু সম্প্রতি ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়েছে, এই কথা শুনেই আমি মনে কোরেছি, ঐ বুড়ী তবে সেই বুড়ী। দেখ যজ্ঞেশ্বর ! মন্দকাজ আমি জানি না, মন্দকথাও আমি শিখি নাই, মন্দভাবও আমার মনে আসে না ; তা যদি হোতো, তবে আমি তোমার কাছে এ সব কথা বোলতেম না। কথাটা হোচ্ছে এই যে, কোন কৌশলে সেই বুড়ীর সঙ্গে যদি তুমি একবার আমার দেখা কোরিয়ে দিতে পার, তা হোলে আমি বৃত্তান্তটা জেনে নিই। আর কিছুই না। ঐ বুড়ী যদি সেই বুড়ী হয়, তবে আমার একটা গুহ্যকথা জানা হোতে পারে। বুড়ীটা সেখানে যে বাড়ীতে থাকতো, সেই বাড়ীর সম্বন্ধে আমার মনে একটা সন্দেহ আছে, বিষম সন্দেহ ! বুড়ীকে একবার নির্জ্জনে পেলে সেই সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টা পাই। আরো শোনো। এ বাড়ীতেও না, ও বাড়ীতেও না, তফাতে একটা বিজনস্থানে,—কোন দেবালয়ের নিকটে দেখাসাক্ষাৎ হোলেই ভাল হয়। তুমি না হোলে সুবিধা হবে না, সেই জন্যই তোমাকে বলা। বুড়ী যদি সহজে তোমার সঙ্গে যেতে না চায়, লোভ দেখিও, বুড়ীদের লোভ বেশী, টাকার লোভ পেলেই তখনি রাজী হবে।"

পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ কোরে যজ্ঞেশ্বর তখন বোল্লে, "এই তোমার কথা? সে কাজ আমি বেশ পারবো। বুড়ী তো ঘরের ভিতর আটক থাকে না, রাস্তায় যায়, বাজারে যায়, গঙ্গাস্নান করে, ঠাকুরদর্শনে যায়, সব জায়গায় বেড়ায়; এইবার দেখা পেলেই আমি ধোরবো; আমাদের বাড়ীর একটী ছোট ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা কোত্তে চায়, এই কথা বোলবো। যেখানে দেখা হবে, জায়গা ঠিক কোরে তোমাকে সংবাদ দিব।"

আমি সন্তুষ্ট হোলেম। "অন্যদিন সময় হবে না, রবিবার বৈকালে দেখা কোরবো, এই কথাই বোলে রেখো, আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেই সময়ে সেইখানে তুমি যাবে, বুড়ীও সেইখানে থাকবে, তা হোলেই ঠিক হবে।"—যজ্ঞেশ্বরকে এই কথা বোলে আবার আমি পুস্তক নিয়ে বোসলেম; যজ্ঞেশ্বর বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার পর বড়বাবু এলেন, আমাকে যা কিছু বলা তাঁর প্রয়োজন ছিল, সেই সব কথা বোল্লেন; আমিও দুটী একটী কথা বোল্লেম, অন্যমনে আমার কথাগুলি শুনে বাবু হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কদিনের ঝঞ্ঝাটে একটা কথা আমার মনে হয় নাই, রসিকবাবুর বাড়ীতে উৎসবটা তুমি কেমন দেখেছ? মাঝে মাঝে তুমি বীরভূমের নাম কর, কানাইবাবুটীকে তুমি কি চিনতে পেরেছ?"

কেনই বা মিথ্যাকথা বোলবো, সাফ সাফ সত্যকথাই বোল্লেম। প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেম, "উৎসব বেশ হয়েছিল, কিন্তু কুমারীগুলি আমার চক্ষে যেন সত্য সত্য কুমারী ঠেকলো না। আমাদের দেশে অত বড় বড় কুমারী হয় না, বিশেষতঃ হিন্দুর গৃহে।"—উচ্চ হাস্য কোরে বড়বাবু বোল্লেন, "কাশীর কুমারী ঐ রকম! কেবল কাশীই বা কেন, অনেক তীর্থে গর্ভবতী, পুত্রবতী কুমারী অনেক দেখা যায়!"

মাথা নীচু কোরে আমিও একটু হাসলেম। তার পর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। সেই উত্তরে নির্ভয়ে আমি বোল্লেম, "কানাইবাবুকে বীরভূমে আমি দেখি নাই, কলিকাতায় একদিন দেখেছিলেম। তাঁকে আমি চিনতে পেরেছি, তিনি আমাকে চিনতে পারেন নাই। বেশীকথা আপনাকে আমি আর কি বোলবো, বাবুটী বড় সহজবাবু নন। কাশীতে যদি কিছু বেশী দিন থাকেন, বিশেষ পরিচয় প্রকাশ পাবে। একটুখানি আমি বোলে রাখি। কানাইবাবু জমীদার নন; মাতুল জমীদার; মাতুলের নাম বাণেশ্বরবাবু। আর—আর—আর—"

শীঘ্র বোলতে পাল্লেম না, বোলতে বোলতে থেমে গেলেম। চকিতনেত্রে আমার মুখপানে চেয়ে ত্বরিতস্বরে বড়বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আর কি হরিদাস? থামলে কেন? বল না,—কানাইবাবু আর কি?"

মাথা হেঁট কোরে তখন আমি বোল্লেম, "আর—কানাইবাবুর পরিবারটী বিয়েকরা পরিবার নয়, নিঃসম্পর্কীয়া নায়িকাও নয়,—ঐ পরিবারটী কানাইবাবুর মাতুল-কন্যা!"

স্কন্ধ কম্পিত কোরে, বিস্ময়ে শিউরে উঠে, বড়বাবু বোলে উঠলেন, "রাম! রাম! রাম! বল কি হরিদাস? এটা কি তুমি ঠিক জানো?"

বোলেছি সত্যকথা, জেরার মুখে আরো সত্য প্রকাশ কোত্তে হলো; কানাইবাবু যে প্রকৃতির লোক, তাঁর গুণের কথা স্পষ্ট কোরে ব্যাখ্যা করাই ভাল। মনে মনে এই রূপ স্থির কোরে স্পষ্ট স্পষ্ট আমি বোল্লেম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক আমি জানি। মাতুলের আশ্রিত অন্নদাস, মাতুল-কন্যাকে হরণ কোরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন, নিজে সাধু সেজে বাড়ীর ভিতর গলাবাজী কোচ্ছিলেন, সেই সময় আমি কিরূপে সে বাড়ীতে উপস্থিত হই, সে কথা পূর্ব্বে আপনাকে বোলেছি। সে রাত্রে সেখানে কানাইবাবুকে আমি দেখি নাই, কলিকাতায় একবার দেখা, তখন বোধ হয়, মাতুল কন্যাটীকে অন্য বাড়ীতে রেখেছিলেন, তার পর এখন জমীদার সেজে, সেই কন্যাটীকে পরিবার সাজিয়ে নিয়ে কাশীধামে এসেছেন। রসিকবাবুর বাড়ীতে যে কন্যাটী ভক্তি-মতী হয়ে কুমারী-পূজা কোল্লেন, সেই কন্যাটীই কানাইবাবুর মাতুল-কন্যা, আমার এইরূপ বিশ্বাস। পরিচয়ে জমীদার, উৎসবের খরচপত্রও জমীদারের মত, টাকাগুলিও বোধ হয় মাতুলের; দাতার অসাক্ষাতে দানপ্রাপ্তি। অধিক আর আমি কি বোলবো, সময়ে প্রকাশ পাবে।"

পুনরায় তিনবার রামনাম উচ্চারণ কোরে বড়বাবু বোল্লেন, "তাই ত! কানাইবাবু তবে তো সাধারণ লোক নয়! ধর্ম্মশীল জমীদার বটে! অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর মাথায় থাকুন, কাশী বড় ভয়ানক স্থান! কাশীতে ঐ রকমের জমী-দার, ঐ রকমের পরিবার অনেক পাওয়া যায়! পাঁচ সাতটা আমি জানি, মাতুল-কন্যা, পিতৃব্য-কন্যা, মাসী-পিসী, বিমাতৃ-কন্যা, এমন কি, যুবতী বিমাতা পর্য্যন্ত এখানে অনেক বাবুর পরিবার! এখানকার সমাজে তাঁরা প্রকাশ্যরূপে বেশ চোলে যাচ্ছেন! তাঁরা এখানে মান্যগণ্য সামাজিক ভদ্রলোক! তুমি বালক, তোমার কাছে বেশী বলা লজ্জার কথা, সে সব তোমার শুনেও কাজ নাই, পূর্ব্বে তোমাকে সাবধান কোরে রেখেছি, আবার সাবধান কোরে দিচ্ছি, এখানকার অজানা লোকের সঙ্গে কদাচ তুমি কোন সংস্রব রেখো না। ঐ রকমের অনেক কানাইবাবু কাশীর মাঝে মাথা উঁচু কোরে বুক ফুলিয়ে চোলে বেড়ায়! সাবধান!"

কানাই-নাটকের যবনিকা এইখানে পতিত হলো, পুনর্ব্বার পট-উত্তোলনের আবশ্যক হবে কি না, সেটা এখন ভবিষ্যতের গর্ভগত। যজ্ঞেশ্বরের কাছে আজ আমি যে নাটকের নান্দীপাঠ কোরে রেখেছি, সে অভিনয়টা কি রকম দাঁড়ায়, সাতদিন পরেই জানতে পারা যাবে। অমরকুমারীকে নিয়ে নাটক হবে না, অমরকুমারী আমার বিস্তর উপকার কোরেছেন, সাধারণ উপকার নয়, অমর-কুমারী আমার জীবনদায়িনী। অমরকুমারী কাশীতে; এটাই বা কিরূপ সঙ্ঘটন? অমরকুমারী এসেছেন, একাকিনী আসেন নাই, মোহনবাবুও এসেছেন; কিন্তু আছেন কোথায়? একবার দর্শন পেলে ভাল হোতো।

আমারে অন্যমনস্ক দেখে বড়বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ভাবছো কি হরি-

দাস ? তীর্থস্থানের মহিমা জানবার তোমার অনেক বাকী। ও সব কিছু মনে কোরো না, এখানকার কাণ্ডই প্রায় ঐ প্রকার।"

এই সব কথা বোলে বড়বাবু দুটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। দেখলেম, তাঁর মুখখানি যেন বিবর্ণ, যেন চিন্তাযুক্ত। সে রকম চিন্তাযুক্ত তাঁকে আমি আর একদিনও দেখি নাই। পুনরায় এক নিশ্বাস ফেলে তিনি বোল্লেন, "এখনকার কালে নিরুদ্বেগে সংসারধর্ম্ম করা প্রায় কারো ভাগ্যে ঘোটে উঠছে না ; হিংসা, দ্বেষ, বাদাবাদি, কলহ, নিন্দা, আত্মবিচ্ছেদ, একটা না একটা যেন লেগেই আছে। ঐ সব উৎপাত থেকে তফাৎ হবার আশায় দেশ ছেড়ে আমি এখানে এসেছি, এখানেও সুখ পাচ্ছি না। তিনটী ভাই একসঙ্গে মিলে মিশে ছিলেম, সে সুখেও বঞ্চিত হোতে হলো। রামশঙ্কর সেই সেদিন মিছামিছি বচসা কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, তদবধি আর বাড়ী এলো না ; লোক দিয়ে বোলে পাঠাচ্ছে, সে আর আমার সঙ্গে এক সংসারে থাকবে না, মুখদেখাদেখি পর্য্যন্ত রাখবে না, বাড়ীর অংশের মূল্য নিয়ে, রামনগরে নূতন বাড়ী বানাবে, পরিবার নিয়ে সেইখানেই বাস কোরবে। কথাটা শুনে মন আমার বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভাই-দুটীর সঙ্গে কখনো আমি অসদ্ব্যবহার করি নাই, দোষ কোল্লেও কটুকথা বলি নাই, তবু এই বিচ্ছেদটা ঘোটলো। মন্ত্রী জুটেছে। জানতে পেরেছি, সেই মন্ত্রীটী আমাদের দেশের লোক। সম্পর্কে আমাদের মামা হন, মহাভারতের শকুনিমামা ! বৃদ্ধ হয়েছেন, তথাপি এখনো মনের ভিতর ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মার্-পেঁচ খেলে ! হিংসায় হিংসায় অন্তরটা জরজর ! কারো ভাল দেখতে পারেন না ; ঘর ভাঙবার গুরুমশাই ! তাঁরই মন্ত্রণায় রামশঙ্করটা আজকাল উঠছে বোসছে। আমাদের বাঙলাদেশটা ইদানীং অনেক রকমে অধঃপাতে গিয়েছে। আচারব্যবহার উড়ে উড়ে যাচ্ছে, লোকের কথায় সেটা যেন কালের ধর্ম্ম, কিন্তু ভাই ভাই পৃথক হবার উপদ্রবটা বেজায় বেড়ে উঠেছে। ভাই ভাই বিরোধে এক একটা সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে, কেহ যেন সেটা গ্রাহ্যই করে না। গতিক যে রকম দেখছি, আমরা যদি দেশে থাকতেম, কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় এতদিনে কবে ঘরবাড়ী সব বাঁটোয়ারা হয়ে যেতো ! দেশে আজকাল বাঁটোয়ারার ভারী ধুম ! 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,' এই কথাটার বড় আদর ! ঠাঁই ঠাঁই হবার ঘোর তুফানে কত কত বোনেদী সংসার ডুবে ডুবে যাচ্ছে, স্নেহমমতা ভেসে ভেসে যাচ্ছে, দিন দিন এক এক পরিবারের বলক্ষয় হোচ্ছে, হাতে হাতে ফলাফল দেখেও লোকের হুঁস হোচ্ছে না। দশজন একত্রে এক সংসারে থাকলে সব রকমে সুখে থাকা যায়, এখনকার লোকে বলে, সেটা বিষম ভুল ! বিবাহিতা স্ত্রী এখন পরিবার, সেই পরিবারকে নিয়ে স্বতন্ত্র থাকাই পরম সুখ। ভাই ত ভাই, অনেক দূরের কথা, জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারিণী মাতাকেও পরিবারের সংসারে স্থান দিতে অনেকে নারাজ ! সেই সকল কুলক্ষণ দেখে আমি কাশীতে সোরে এলেম,—আনন্দকাননে জুড়াবার ঠাঁই, বড় আশায় অন্নদার ক্রোড়ে জুড়াতে এলেম, এখানেও সেই বিপত্তি ! হাঁ, এমন হোতে পারে, ভাই-দুটীর রোজগারের টাকা আমি গ্রহণ করি, আমার খরচ বেশী, তাঁদের

খরচ কম, টাকা তাঁদের জমে না, একসঙ্গে থাকলে ক্ষতি হয়, কাজে কাজে পৃথক হবার ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠে। এখানে তো তা নয়, কোন ভায়ের রোজগারের একটী পয়সাও আমি গ্রহণ করি না, অথচ সকলকে আমি সমান-চক্ষে দর্শন করি। তবু কেন এমনটা ঘোটলো? রামশঙ্কর পৃথক হবে! দুদিন পরে হয় তো মতিলালটীও বেঁকে দাঁড়াবে! হায় হায়! আমার ধর্ম্মের সংসারে এমন প্রতিকূল ঘটনা কেন হয়?"

এই সব কথা বোলে বড়বাবু আর একটী বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। আমারও হৃদয়ে বেদনা লাগলো। সে রাত্রে আর অন্য কার্য্য কিছুই হলো না, আহারান্তে চঞ্চলা নিদ্রায় রজনী অবসান।

সোমবার। যথাসময়ে আহারান্তে আমরা আদালতে গেলেম; গিয়ে শুনলেম, সেই দিন গঙ্গাস্নানের কি একটা যোগ, আদালত বন্ধ। একটী বাবু মির্জাপুর থেকে সেই আদালতে চাকরী কোত্তে আসেন। কাশীতে তাঁর বাসা আছে, পাঁচ সাত দিন ছুটী পেলে মির্জাপুরে যান। মির্জাপুরে বিন্ধ্যাচল। অনেক দিন অবধি বিন্ধ্যাচল-দর্শনে আমার অভিলাষ ছিল, সেই দিন সেই বাবুটী মির্জাপুরে যাবেন, সেই কথা শুনে আমিও তাঁর সঙ্গে যাবার অভি-প্রায় জানালেম। বাবুটী বোল্লেন, "কল্য তোমাকে আদালতে আসতে হবে, এক-দিনে বিন্ধ্যাচলে যাওয়া আসা হয় না. অতি কম পাঁচদিনের ছুটী না পেলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হবে না। আমি একমাসের বিদায় নিয়েছি, শনিবার ছুটী মঞ্জুর হয়েছে, আজ আমি চোলে যাব, একমাস আসবো না।"

বিন্ধ্যাচল-দর্শনের অভিলাষ আমার আরো বেড়ে উঠলো, বড়বাবুকে সেই অভিলাষ জানিয়ে সাত দিনের ছুটী চাইলেম। বড়বাবুই সেরেস্তার কর্ত্তা, তিনি আমাকে ছুটী দিলেন, মির্জাপুরের বাবুর সঙ্গে আমি নৌকাযোগে বিন্ধ্যাচল দেখতে চোল্লেম। সেদিন গেল, রাত্রি গেল, পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মির্জাপুরে পোঁছিলেম। রাত্রিটী সেই বাবুর বাড়ীতেই থাকা হলো, পরদিন বিন্ধ্যচল-দর্শন। সঙ্গী সেই বাবুটী আর একটী পাণ্ডা। বিন্ধ্যাচল অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অধিক উচ্চ নয়, কিন্তু খুব লম্বা। পুরাণে বর্ণিত আছে, বিন্ধ্যাচল ক্রমে ক্রমে কলেবর বৃদ্ধি কোরে গগনস্পর্শী হোতে যাচ্ছিল, অগস্ত্যমুনি উপস্থিত হয়ে পর্ব্বতের সেই উচ্চাভিলাষ ব্যর্থ কোরে দিয়েছেন। পর্ব্বত নতশিরে শায়িতভাবে অগস্ত্যকে প্রণাম করে। অগস্ত্য বলেন, "যতদিন আমি ফিরে না আসি, ততদিন এই ভাবেই থাকো, উঠো না।" বিন্ধ্যাচল তদবধি সেই অবস্থাতেই শুয়ে আছে। অগস্ত্য আর সেখানে ফিরে এলেন না, বিন্ধ্যগিরিও আর মস্তক উন্নত কোত্তে পাল্লেন না। যে দিন এই ঘটনা হয়, সেদিন একটী মাসের প্রথম দিবস। ঐ ঘটনার স্মরণার্থ মানুষেরা আজিও মাসের প্রথম দিবসে কোথাও যাত্রা করে না; ঐ দিনের যাত্রাকে অগস্ত্যযাত্রা বলা হয়। যাত্রানিষেধের হেতু এই যে, অগস্ত্য যেমন গেলেন, আর এলেন না, অগস্ত্যদিবসে অর্থাৎ মাসের প্রথমদিবসে যারা কোথাও যাত্রা করে, সেইরূপে তারাও আর ফিরে আসে না।

বিন্ধ্যাচলে অনেক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান;

—বিন্ধ্যবাসিনী, যোগমায়া আর ভোগমায়া। ত্রিকোণাকারে এই তিনটী পীঠ-স্থান, সেই কারণে এই স্থানকে ত্রিকোণমণ্ডল বলা হয়। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির উপরিভাগে, যোগমায়া ভোগমায়া গহ্বরমধ্যে। যোগমায়ার এক নাম মহাকালী। মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী! অবয়ব দেখা যায় না, কেবল একখানা পাথরের প্রকাণ্ড মুখ হাঁকরা, মুখে সিঁদুর মাখা, চক্ষের দুটী গহ্বরমাত্র দৃষ্ট হয়, আর কিছু না। যাত্রীলোকেরা সেই মুখে দুগ্ধ-গঙ্গাজল প্রভৃতি প্রদান করে, সে সকল বস্তু কোথায় যায়, কিছুই দেখা যায় না। পর্ব্বতের নিম্নে এক কালীমূর্ত্তি আছে, লোকে বলে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে সেই কালীর কাছে নরবলি হোতো, এখন হয় না। দেবদেবীগুলিকে আমি প্রণাম কোল্লেম, পাণ্ডারা কিছু কিছু দর্শনী নিলে। পাণ্ডা ব্যতীত অনেক যোগী-সন্ন্যাসী স্থানে স্থানে চক্ষু মুদে বোসে আছেন, তাঁদের কাছে দর্শনী দিতে হয় না। পর্ব্বতের পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত একটা প্রান্তর, একধারে একটা ঝরণা, সেই ঝরণার জল অতি নির্ম্মল। স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল, স্থানে স্থানে পুষ্পকানন ; নানা জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে স্থানটীকে আমোদিত করে।

বিন্ধ্যাচল দর্শন করা হলো, দুদিন আমি মির্জাপুরে থাকলেম। সাত দিনের ছুটী, তথাপি আমি বিলম্ব কোল্লেম না, নৌকাযোগে শনিবার বৈকালে কাশীতে ফিরে এলেম। যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে কথা ছিল, রবিবার বৈকালে সেই বুড়ীর সঙ্গে দেখা করা হবে, সেই জন্যই শীঘ্র শীঘ্র ফিরে আসা।

অগ্রেই আমি বাড়ী এলেম। সন্ধ্যার পর বড়বাবু এলেন ; এসেই আমাকে সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এসেছ হরিদাস? বেশ হয়েছে। বিন্ধ্যাচল কেমন দেখলে?"

যা যা আমি দেখেছিলেম, সংক্ষেপে সংক্ষেপে বর্ণনা কোল্লেম ; বড়বাবু খুসী হোলেন। তার পর বাড়ীর ভিতর থেকে ফিরে এসে বৈঠকখানায় বোসে, বাক্স থেকে একখানি চিঠি বাহির কোরে, আবার তিনি হাসতে হাসতে আমাকে বোল্লেন, "আমার একটী বন্ধু আসছেন, এই চিঠি লিখেছেন, বন্ধুটীর নাম মোহনলাল ঘোষ, বর্দ্ধমানজেলায় নিবাস, খুব ভাললোক, খুব বড়মানুষ, তাঁর সঙ্গে আলাপ হোলে তুমি সুখী হবে। এই সেই চিঠি, এই লও, চিঠিখানি পড়।"

মনে তখন আমার কি ভাবের উদয় হলো, আমিই জানতে পাল্লেম, কিছুই প্রকাশ কোল্লেম না, বাবুর হাত থেকে নিয়ে চিঠিখানি আমি পাঠ কোল্লেম। চিঠিতে লেখা ছিল :—

প্রিয় রমেন্দ্রবাবু!

আমি সপরিবার প্রয়াগধামে আসিয়াছি। ইতিমধ্যে একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে কাশীতে গিয়াছিলাম, ব্যস্ততা প্রযুক্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি নাই, এই সপ্তাহের মধ্যেই পুনরায় বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যাইব, একমাস কাশীতে থাকিবার ইচ্ছা আছে, এইবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্তোষ লাভ করিব। তোমার বাড়ীর পরিবারগণকে আমার প্রিয়-

সম্ভাষণ জানাইও, ঈশ্বরের নিকটে আমি তোমাদের সকলের কুশল প্রার্থনা করি। আমার শরীর এখন একপ্রকার ভাল আছে, সাক্ষাতে সকল কথা কহিব ও শুনিব ইতি সন ১২৫৮ সাল, ১৩ই ফাল্গুন।

বশম্বদ

শ্রীমোহনলাল ঘোষ।"

পত্রখানি আমি পাঠ কোল্লেম। অকস্মাৎ মনে কেমন একটা সংশয় এলো। দুই তিনবার সেই চিঠির অক্ষরগুলি ভাল কোরে দেখলেম; ক্রমশই সংশয়টা প্রবল। আমার সংশয়ভাব বড়বাবু যাতে বুঝতে না পারেন, সেইরূপে সাবধান হয়ে থাকলেম। হঠাৎ কি একটা কার্য্যে বড়বাবু শশব্যস্তে বাড়ী থেকে একবার বেরিয়ে গেলেন, সেই অবসরে আমি অন্দরমহলে প্রবেশ কোরে, আমার শয়নঘর থেকে একখানি পত্রিকাখণ্ড হাতে কোরে নিয়ে আবার বৈঠকখানায় এসে বোসলেম। মোহনলালবাবুর চিঠিখানি সেইখানেই খোলা পোড়ে ছিল, আমি যেখানি আনলেম, সেখানিও সেইখানে খুলে রাখলেম; পাশাপাশি দুখানি চিঠি।

ঠিক তাই! সংশয়ে সংশয়ে ইতিপূর্ব্বে যা আমি ভেবেছিলেম, ঠিক তাই! অক্ষরে অক্ষরে ঠিক মিলন; দুখানি চিঠিই এক হস্তের লেখা!

এ কি আশ্চর্য্য সম্মিলন! মোহনলালবাবুর চিঠির সঙ্গে আমার রক্ষিত চিঠিখানির অক্ষরে অক্ষরে ঠিক মিলন, এ কি আশ্চর্য্য সংঘটন! আমার রক্ষিত চিঠিখানি কোন চিঠি, সে কথাও পাঠকমহাশয়কে জানাই। আদালতের সিঁড়ির উপর রক্তদন্তের বগল থেকে যে কখানা কাগজ পোড়ে গিয়েছিল, সেই সকল কাগজের ভিতর যে ক্ষুদ্র পত্রিকা আমি পেয়েছিলেম, যে পত্রিকায় দস্তখতের জায়গাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, যে পত্রিকা সাবধানে যত্ন কোরে আমি রেখেছিলেম, সেই পত্রিকা। দুই পত্রিকার অক্ষর ঠিক একরকম! কেমন হলো! মোহনলালবাবুই কি তবে রক্তদন্তকে সেই চিঠি লিখেছিলেন? আমার উপর রক্তদন্ত আর উপদ্রব না করে, সেই চিঠিতে এইরূপ উপদেশ। রক্তদন্ত আমার উপর দৌরাত্ম্য করে, মোহনবাবু কি সেটা জানতেন? না জানলেই বা নিষেধ করবার মানে কি? রক্তদন্তের সঙ্গে কি মোহনবাবুর পূর্ব্বাবধি যোগাযোগ ছিল? তাঁর উপদেশেই কি রক্তদন্ত আমাকে ধোরে নিয়ে গিয়েছিল? তাই তো সম্ভব বোধ হোচ্ছে! মোহনবাবুর কাছে রক্তদন্ত বেতন পায়; রক্তদন্তটা মোহনবাবুর চাকর! কি কার্য্যের জন্য চাকর? আমাকে নষ্ট করবার জন্যই কি? রক্তদন্ত আমাকে প্রাণে মারবার চেষ্টা পেয়েছিল, সে চেষ্টাটাও কি মোহনবাবুর উপদেশে? কেমন উপদেশ? তাঁর কাছে আমি কোন অপরাধে অপরাধী? কোন্ কালে কবে আমি তাঁর কি অনিষ্ট কোরেছি? আমি বেঁচে থাকলে মোহনবাবুর কোন অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত হোতো? কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে আবার আমার প্রতি তিনি সদয় হোলেন, রক্তদন্তকে নিবারণ কোল্লেন, ইহারই বা ভাব কি? একটা কারণ আমার মনে আসছে। অমরকুমারীকে অগ্নিকুণ্ড থেকে আমি উদ্ধার কোরেছিলেম, মোহনবাবুর বাক্য-

প্রমাণে অমরকুমারী তাঁর নববিবাহিতা পত্নী ; আমি অমরকুমারীর প্রাণরক্ষা কোরেছি, সেই উপকারের বিনিময়ে মোহনবাবু আমাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেই উপকার স্মরণ কোরেই হয় তো রক্তদন্তকে ঐ ভাবে পত্র লেখা। স্থির কোল্লেম এই রকম, কিন্তু আমার প্রতি মোহনবাবুর বৈরভাব কেন জন্মেছিল, অনেক ভেবে চিন্তে সেটা কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

বড়বাবু এখনি ফিরে আসবেন, এই দস্তখৎশূন্য পত্রিকা তাঁকে আমি এখন দেখাবো না, এই সঙ্কল্পে সেখানি তখন আমি গোপন কোরে রাখলেম। একটু পরে বড়বাবু ফিরে এলেন, এসেই আমারে বোল্লেন, "হরিদাস! মোহনলাল-বাবু আসছেন, তাঁর সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় কোরিয়ে দিব, তিনি অমায়িক ভদ্রলোক, আলাপ থাকলে তোমার অনেক উপকার হবে।"

মনোভাব আমি গোপন কোরে রাখতে পাল্লেম না। পত্রের কথা গোপন কোরে সাদাকথায় কেবল এইটুকু বোল্লেম, "মোহনলালবাবুকে আমি চিনি। কাশীতে আসবার পূর্ব্বে আমার বাল্যজীবনে যে যে ঘটনা হয়েছিল, আপনার অনুগ্রহপ্রাপ্তির সময় যে সব কথা অতি সঙ্ক্ষেপে আপনাকে আমি বোলেছি, সে সব কথা বোধ হয়, আপনার স্মরণ থাকতে পারে। বর্দ্ধমানে একটা জুয়া-চোরের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে, যে বাড়ীতে আমি আশ্রয় প্রাপ্ত হই, সে বাড়ীর কর্ত্তার নাম আপনাকে আমি বলি নাই ; সেই কর্ত্তার একটী জামাই আছেন, তিনি অপব্যয় করেন, দফায় দফায় শ্বশুরের কাছে টাকা চান, সে সব কথা বোলেছি, জামাইবাবুটীরও নাম করি নাই। সেই জামাই ঐ মোহনবাবু। সেই বাড়ীতেই মোহনবাবুর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল, তার পরেও একবার পথের চটীতে দেখা হয়েছিল ; অনেকপ্রকার কথা হয়েছিল। তিনিও আমাকে জানেন, আমিও তাঁকে চিনি।

প্রফুল্লবদনে বড়বাবু বোল্লেন, "তবে তো আরো ভালই হলো। পূর্ব্বের জানাশুনা আছে, তার উপর আমার অনুরোধ হবে, পরিচয়টা পাকা হয়ে দাঁড়াবে। তিনি আমার বন্ধুলোক, বড়মানুষ, তুমিও সুশীল, সচ্চরিত্র, ঘনিষ্ঠতা হোলে তুমি তাঁর প্রসন্নতা লাভ কোত্তে পারবে, সকল দিকে ভালই হবে।"

ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা, এই তিন একত্র হয়ে আমার চিত্তকে তখন অত্যন্ত আকুল কোরে তুল্লে ; বড়বাবুর কথাগুলি শুনলেম, কিন্তু কোন উত্তর দিলেম না। মন যেন আমারে বোল্লে, "মোহনবাবু ভয়ানক লোক, তাঁর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা কোরো না, ভাল হবে না। মনের উপদেশে বড়বাবুর আহ্লা-দের কথায় উত্তরদান কোত্তে আমি সঙ্কুচিত হোলেম।

শনিবার রাত্রে এই পর্য্যন্ত আমাদের নির্জ্জন কথোপকথন। প্রকাশযোগ্য অন্য কোন নূতন ঘটনা সে রাত্রে সংঘটিত হয় নাই।

রবিবার বৈকাল। বড়বাবু যেমন বন্ধুর বাড়ী যান, সেইরূপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন, যজ্ঞেশ্বর আমার কাছে এলো। চেয়ে দেখলেম, যজ্ঞেশ্বরের মুখে মৃদু মৃদু হাস্য খেলা কোচ্ছে, আমিও মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেম। যজ্ঞে-

শ্বর বোল্লে, "সব ঠিক ; প্রস্তুত হও ; বিলম্ব করা হবে না, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসতে হবে।"

প্রস্তুতই আমি ছিলেম, বৈঠকখানার দরজা বন্ধ কোরে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে আমি বাড়ী থেকে বেরুলেম। কোথায় যাচ্ছি, কেহ কিছু জানতে পাল্লে না। ছোট ছোট গলী পার হয়ে যজ্ঞেশ্বর আমাকে একটা পল্লীর দিকে নিয়ে চোল্লো। সে পল্লীতে পূর্ব্বে একদিনও আমি যাই নাই। দিবাশেষে বসন্তের শীতল বাতাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হোচ্ছিল, বায়ুস্পর্শে আমি সুখানুভাব কোচ্ছি, পল্লীর দুই ধারে নূতন নূতন দৃশ্য দর্শন কোচ্ছি, নয়ন পুলকিত হোচ্ছে। নূতন দৃশ্যাবলীর মধ্যে এক দৃশ্য আমার চক্ষে খুব নূতন।

সারি সারি দোতালা বাড়ী, রাস্তার দিকে বারান্দা ; সুসজ্জিতা সুন্দরী সুন্দরী অনেকগুলি কামিনী সেই সকল বারান্দা আলো কোরে বোসে আছে ; বারান্দায় এক একখানি চৌকি পাতা, চৌকির উপর গদীপাতা বিছানা, গদীর উপর তাকিয়া, তাকিয়ার কোলে কামিনী। পার্শ্বে দীর্ঘ দীর্ঘ নলশোভিত রূপার আলবোলা। কামিনীরা পেশোয়াজ পরা, বক্ষে কাঁচুলি, কারো কারো বিচিত্র আস্তিনযুক্ত আংরাখা, তার উপর বিচিত্রবর্ণের ওড়না, জামার উপর উজ্জ্বল উজ্জ্বল অলংকার, নাসিকায় মুক্তার নোলক দোদুল্যমান, কর্ণে বিবিধাকার কর্ণভূষা, কপালে সিঁথির সঙ্গে গাঁথা সোণার ঝাঁপা, কোলে কোলে মুক্তার ঝালোর, মস্তকের কেশপাশ ললাটের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত পেটেপাড়া, পৃষ্ঠ-ভাগে বৃহৎ চক্রাকার খোঁপাবাঁধা, এক একটী কবরী মনোহর পুষ্প-মাল্যে বিজড়িত ; নয়নে অঞ্জন, ওষ্ঠে মিসি, হস্তে আতরমাখা এক একখান রুমাল, আলতাপরা পায়ে মোটা মোটা গোল মল ; অপরূপ খোলতা। অধিকাংশই হিন্দুস্থানী, কতক কতক বাঙ্গালী, বসন-ভূষণে শীঘ্র প্রভেদ করা যায় না ; সকলেই হিন্দুস্থানী বেশভূষা, সকলেরই একপ্রকারে কেশবিন্যাস ; চমৎকার শোভা! বর্ণ ত্রিবিধ ;—কতক গৌরাঙ্গী, কতক শ্যামাঙ্গী, কতক কৃষ্ণাঙ্গী। যেগুলি গৌরাঙ্গী, সেগুলিকে যেন চিত্রকরা পরীবালা অথবা সুরবালা বোলে ভ্রম হয়। যজ্ঞেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কোরে পরিচয় পেলেম, ঐ সকল বিলাসিনী কামিনীদের সাধারণ উপাধি বাইজী। হিন্দুস্থানীও বাইজী, বাঙ্গালীও বাইজী ; কেবল উপাধিতে বাইজী নহে, সকলেই সুনিপুণা নর্ত্তকী। বাইজীরা সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রসঙ্গীতে ও কণ্ঠসঙ্গীতে সুশিক্ষিতা। এ মহলে যবনী বারাঙ্গনারা স্থান পায় না ; সিক্রোলের পথে যবনী গণিকাদের একচেটে বাহার। তারাও নৃত্য-গীত-বাদ্যে যশস্বিনী।

সিক্রোলের দিকে আমরা গেলেম না। হিন্দুস্থানী বাইমহলের একপ্রান্তে একটী শিবালয় ; মন্দিরের ধারে খানিক দূর পর্য্যন্ত সরু সরু রেল দেওয়া ; রেলের ভিতর দরোয়ানের ঘরের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র কক্ষ, সেই কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। সেই বুড়ী ; যার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে আমার যাওয়া, সেই কক্ষে সেই বুড়ী মৌনভাবে উপবিষ্টা। নিকটে উপবিষ্ট হয়ে, বুড়ীর দুহাতে দুটী টাকা দিলেম, মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি কি আমাকে চিনতে পাচ্ছো ?"—সটান আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, বুড়ী একটু ইত-

স্ততঃ কোরে বোল্লে, "চিনতে?—তোমাকে?—আমি?—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেচি বটে! সেই বাড়ীতেই বুঝি তুমি থাকো? একদিন তুমি ছাতে উঠেছিলে, আমি তোমাকে দেখেছিলেম।"

কথা ঘুরিয়ে আবার আমি প্রশ্ন কোল্লেম, "এখানে একদিন দেখেছো, পূর্ব্বে আর কোথাও আমাকে দেখেছো কি না, মনে হয়?"

আবার আমার মুখপানে তাকিয়ে তাকিয়ে, কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে, ঘাড় নেড়ে নেড়ে, গুঞ্জনস্বরে বুড়ী উত্তর কোল্লে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, মনে পোড়েচে; কলিকাতায় দেখেচি। তুমি বুঝি সেই হরিদাস? তুমি বুঝি জোড়াসাঁকো-পাড়ার প্রতাপবাবুদের বাড়ীতে থাকতে? এখানে কবে এসেচো?"

একটু হেসে আমি বোল্লেম, "হ্যাঁ গো কামিনীর মা, আমিই সেই হরিদাস, তিনমাস হলো কাশীতে এসেছি। তোমাকে আজ আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই। ঠিক ঠিক উত্তর দিও, ভয় নাই কিছু, কারো কাছে কোন কথা প্রকাশ হবে না, নির্ভয়ে তুমি সত্যকথা বল। সেই সুন্দরী মেয়েটী সেই বাড়ীর ছাদে রুমাল হাতে কোরে বেড়াচ্ছিল, সে মেয়েটী কে?"—শঙ্কিত-সন্দিগ্ধ নয়নে বুড়ী তখন যজ্ঞেশ্বরের দিকে চাইলে। মনের ভাব বুঝতে পেরে, যজ্ঞে-শ্বরকে আমি একবার বাইরে যেতে বোল্লেম। ঘর থেকে যজ্ঞেশ্বর বেরিয়ে গেল। আবার আমি প্রশ্ন কোল্লেম, "সে মেয়েটী কে?"

হাতে টাকা পেয়েছিল, মনে উল্লাস হয়েছিল, আমিও ছেলেমানুষ, লজ্জা অকারণ, বুড়ী তখন চুপি চুপি বোল্লে, "কেন?—তুমি কি তারে জানো না? আমার মনিববাড়ীতে কতবার তুমি গিয়েচো এসেচো, তারে কি তুমি দেখ নাই?—বাবুর ছোটমেয়ে,—সৌদামিনী। সৌদামিনীকে তুমি কি সে বাড়ীতে দেখ নাই?"

আমি সুযোগ পেলেম। আসলকথা বেরিয়ে পোড়েছে। সৌদামিনীকে চিনি আর না-ই চিনি, নাম শুনা ছিল, চেনা-অচেনা আমার দরকার ছিল না, যেটী আমার মনের কথা, সেইটী জানাই দরকার, তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "সে বাড়ীর অন্দরে তো আমি যেতেম না, মেয়েদের চিনে রাখবো কিরূপে? আচ্ছা, কামিনীর মা, সৌদামিনী এখানে কার সঙ্গে এসেছে? কর্ত্তাবাবু এসেছেন কি?"

একটু যেন কেঁপে কেঁপে কম্পিতকণ্ঠে কামিনীর মা বোল্লে, "সে কথা আমি বোলতে পারবো না, সে কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর?"

আমি।—আমার দরকার আছে। আরো দুটী টাকা আমি তোমাকে দিচ্ছি, সত্য বল, কার সঙ্গে তোমরা এসেছ?

কামি।—(টাকা গ্রহণ করিয়া) জয়হরিবাবুর সঙ্গে।

আমি।—জয়হরিবাবু কে?

কামি।—তা আমি বোলবো না।

আমি।—কেন বোলবে না? ভয় কি? তীর্থে এসেছো, এখানে মিথ্যা-কথা বোলতে নাই, সত্যকথা বল। সত্যকথায় দোষ কি?

কামি।—আবার তুমি কোলকেতায় যাবে, বাবুদের সঙ্গে দেখা হবে, ছেলে-বুদ্ধিতে গল্প কোরবে, আমার চাকরী থাকবে না। বুড়বয়েসে আমি কোথায় যাবো ?

আমি।—চাকরীর ভাবনা কি ? আমি তোমাকে চাকরী দিব ; আর চাকরী কোত্তে না হয়, তারো উপায় কোরে দিতে পারবো ; তুমি সত্যকথা কও। জয়হরিবাবু কে ?

কামি।—দেখো বাছা, যেন প্রকাশ হয় না, আমার মাথাটী যেন খেয়ো না ; জয়হরিবাবু সেই পাড়ার একটী লোক ; বেণের ছেলে, বাপের অনেক টাকা আছে, সাধ কোত্তে তীর্থদর্শনে এসেচে।

আমি।—বেণের ছেলের সঙ্গে সৌদামিনী কেন এলো ? ব্রাহ্মণের ঘরের যুবতী মেয়ে কি বেণের ছেলের সঙ্গে তীর্থে আসে ?

কামি।—এই আমার মাথা খেলে ! অতো কথা আমি বোলতে পারবো না।

আমি।—বোলতেই হবে। যদি না বল, তবে আমি আজ বিশ্বেশ্বরবাবুর নামে চিঠি লিখে সব কথা জানাবো ; ঢাকে কাঠী পোড়ে যাবে !

কামি।—(অধোবদনে নীরব)।

আমি।—আচ্ছা, কামিনীর মা, সে কথা এখন থাক, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সেই যে সন্ন্যাসীটা তোমাদের বাড়ীতে কাটা পোড়েছিল, সেই যে যার নাম রমাই-সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসীটাকে খুন কোরেছে কে ?

কামি।—(সভয়ে) আমি তার কি জানি ? আমি চাকরাণী, ঘরসংসারের কাজকর্ম্ম করি, খুনোখুনির খবর আমি কি কোরে জানবো ? অতগুলো পুলিশের লোক এলো, তারা কিছু কিনারা কোত্তে পাল্লে না, আমি কেমন কোরে জানবো ?

আমি।—কেমন কোরে জানবে ?—বোলবো ?—বলি ?—বলি তবে ?—ও কামিনীর মা ! তুমি বুঝি মনে কোচ্ছো, কিছুই আমি জানি না ? খুনের পর তুমি আমাদের বাড়ীতে গিয়ে গিন্নীর কাছে যে সব কথা বোলে এসেছো, তার অর্দ্ধেক কথা আমি শুনেছি। যখন তুমি বল, আমি তখন পাশের ঘরের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেম, তোমরা আমাকে দেখতে পাও নাই, তোমার অনেক কথা আমি শুনেছি। এখন গোপন কোল্লে চোলবে না ; মিথ্যা ঢাকবে না ; সত্য-কথা বল। সত্যের বিনাশ নাই ;—মিথ্যা বোল্লেই বিপদ হবে ! বল, কে খুন কোরেছে ?

অনেক তত্ত্ব আমি জানতে পেরেছি, অনেক কথা আমি শুনেছি, তাই শুনে কামিনীর মা যেন একটু ভয় পেলে ; ভয়ের সঙ্গে যেন কিছু বিস্ময়ভাব, সেটাও আমি বুঝতে পাল্লেম। হেঁটমুখে মাথা চুলকে চুলকে বুড়ী তখন বোলতে লাগলো, "ও বাবা ! এই একরত্তি ছেলে তুমি, তোমার ফিকিরফন্দ। এতো ? এতো বুদ্ধি তুমি ধরো ? লুকিয়ে লুকিয়ে গেরস্থবাড়ীর মেয়েদের কথা তুমি শোনো। ও বাবা ! সাবাস ছেলে তুমি !"

অধিকক্ষণ ধৈর্য্য রাখতে না পেরে, চঞ্চলস্বরে আমি বোল্লেম, "তোমার মুখে আমি সাবাসি শুনতে চাই না ! বুদ্ধির দৌড়, ফিকিরফন্দী, এ সকল

কথাও তোমার মুখে শোনবার ইচ্ছা নাই ; যে কথাটা জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, বাজে-কথা ছেড়ে দিয়ে সেই কথারই উত্তর দাও ;—সন্ন্যাসীকে খুন কোরেছে কে ?"

কামিনীর মা তখন ভেবে চিন্তে, গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, আমতা আমতা কোরে বোলতে লাগলো, "তা—তা—তা—শুনেছ যখন, তখন আর—তা—বোলো না বাছা কারু কাছে,—বোলবো কি, সৌদামিনীর স্বভাব ভাল নয়। সন্নিসীর সঙ্গে—"

এই পর্য্যন্ত বোলতে বোলতে বুড়ীটা থেমে গেল। আমি বিরক্ত হোলেম। রাগ প্রকাশ কোত্তেও পারি না, রাগের সময় নয়, রাগ কোল্লে কাজ হবে না, তথাচ একটু উগ্রস্বরে বোল্লেম, "তাতে আমি কি বুঝবো ? আমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, সন্ন্যাসীকে খুন কোরেছে কে ? তুমি আরম্ভ কোল্লে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সৌদামিনী ! ওটা তো একরকম বাজেকথা। ও কথায় আমি কি বুঝবো ? যেটা কাজের কথা, যেটা আসলকথা, সেইটে আমি শুনতে চাই, সেই কথাই বল।"

আবার মাথা চুলকে চুলকে একটু থেমে থেমে বুড়ী আরম্ভ কোল্লে, "সেই কথাই তো বোলচি। সৌদামিনীর স্বভাব ভাল নয় ; সন্নিসীর সঙ্গে সৌদা-মিনীর গলা গলা ভাব হয়েছিল ; সন্নিসী তারে ছেলে হবার ওষুধ দেবে, ভাতার-সোয়াগী কোরে দেবে, এই রকম লোভ দেখায় ; যাগ-যজ্ঞি কোরে দেবে, মাদুলী পরাবে, এই রকম অনেক কথা বলে ; রেতের বেলায় যাগ-যজ্ঞিও আরম্ভ হয়।"

আমি।—তা তো হয়, তা তো শুনেছি ; ছেলেকরা সন্ন্যাসীরা যুবতী মেয়েদের কাছে ঐ ভাবের নানা কথা বলে, তা আমি জানি ; তার ভিতর খুনোখুনি কান্ড কেন এলো ? সৌদামিনীই কি তবে সেই সন্ন্যাসীকে কেটে ফেলেছে ?

কামি।—(দন্তে রসনা কর্ত্তন করিয়া) ও মা ! এ কি কথা গো ! না না, সৌদামিনী কাটবে কেন ? আর একজন। সেই—

আমি।—বল, বল, থামো কেন ? আর একজন কি ? কে সে আর একজন ?

কামি।—ও বাবা ! তাও বোলতে হবে ?

আমি।—তাই তো আমি শুনতে চাই। খুনের তদারকের দিন থেকে সেই রকম সন্দেহই আমার মনে মনে গাঁথা রয়েছে। কে সেই আর একজন ?

কামি।—আর একজন সেই রাত্রে অন্ধকারে সৌদামিনীর ঘরের ভিতরে আসে। রাত্রে আমার ভালরকম ঘুম হয় না, পাঁচ সাত বছর আমি প্রায় অর্দ্ধেক রাত জেগে কাটাই ; একটা লোক এলো, আমি জানতে পাল্লেম ; সন্নিসী যেখানে যজ্ঞি কোত্তে বোসেছিল, সৌদামিনী সেইখানে ছিল ; সেখানে আলো ছিল ; যে লোক এলো, চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে, সেই লোকটী এক-খানা বঁটী হাতে কোরে তাদের দুজনের পেছনে এসে দাঁড়ালো ; তখন আমি তারে চিনতে পাল্লেম। একটু পরেই সন্নিসীর গলায় এক কোপ ! রক্তগঙ্গা ! সৌদামিনী অকস্মাৎ ভয় পেয়ে একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল, লোকটীর দিকে

মুখ ফিরিয়ে তখনি আবার থেমে গেল ; কাঁপতে লাগলো। লোকটী কিন্তু সেখানে আর দাঁড়ালো না, রক্তমাখা বঁটীখানা ফেলে রেখে দেখতে দেখতে ছুটে পালালো।

আমি।—ও কামিনীর মা! ফিকিরফন্দীর কথা তুলে তুমি আমারে সাবাসি দিচ্ছেলে, তুমি যে দেখছি, ফিকিরফন্দীতে তোমার মাথার চুলের চেয়েও বেশী পাকা! চুলগুলি ছোট ছোট মল্লিকাফুলের মতন ধপধপে সাদা হয়ে গিয়েছে. ফন্দী-ফিকিরের বুদ্ধিটুকু তার চেয়েও বেশী পেকে-জবাফুলের মতন লাল হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন এড়াবার ফিকির তুমি বেশ জানো! কিন্তু কামিনীর মা! মনে রেখো, বজ্রবাঁধনে ফস্কা গেরো! নাচতেছ ভালো, পাক দিচ্ছ এলো এলো! যতই ফিকির খাটাও, আমাকে তুমি ভুলাতে পারবে না। বোলছো সব কথা, আসলনামটা চেপে চেপে যাচ্ছো। 'আর একজন, একটী লোক, সেই লোকটী' এই রকম ছাঁটা ছাঁটা ছাড়া ছাড়া কথা ' রাত্রে তোমার ঘুম হয় না, দিনের বেলা হয়! এইমাত্র ঘুমের ঘুরে একেবারে বোলে ফেলেছ. লোকটাকে তুমি চিনতে পেরেছিলে। তবে আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন রাখো দিদি! নামটা বোলে ফেলো! আমিও নিশ্চিন্ত হই. তুমিও বাঁচো!—বোলে ফেলো!

আর কামিনীর মা চেপে রাখতে পাল্লে না ; নিজের কথাতেই নিজেই ধরা পোড়লে ; সামলাতে না পেরে শেষকালে বোলে ফেল্লে, "সব কথাই যখন বোলেছি, তখন আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কি ? কে সেই লোক, এত কথা শুনে তা কি তুমি বুঝতে পার নি ? পোড়াকপালী সৌদামিনী যার সঙ্গে কাশীতে এসেচে, সেই লোক!—আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীর সেই জয়হরি বড়াল!"

আমি চমকালেম না ; বুড়ীর মুখে যখন শুনেছি, বাড়ীর লোকজন কেহই আসেন নাই. সৌদামিনী একটা বেণের ছেলের সঙ্গে কাশীদর্শনে এসেছে কিম্বা কাশীবাসিনী হোতে এসেছে, তখনি বুঝেছি. সেই বেণের ছেলেটাই সৌদামিনীর পরকালের কালভৈরব ; তাই আমি বুড়ীর কথায় চমকালেম না ; বেশ ঠাণ্ডা থেকেই বুড়ীকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম. "জয়হরি বড়াল রাত্রিকালে কেমন কোরে গৃহস্থ ভদ্রলোকের অন্দরমহলে ঢুকেছিল ? কোন পথ দিয়ে গিয়েছিল ?"

বুড়ী অম্লানবদনেই বোল্লে, "রোজ রাত্রে যাওয়া-আসা কোত্তো, পথ, ঘাট, অন্ধিসন্ধি সব তার জানা ছিল। বাড়ীর পাশেই তাদের বাড়ী, মাঝখানে ছোট গলী ; বড় জোর তিনহাত তফাৎ ; ছাতে ছাতে সমান, ছাতে ছাতে বড় একখানা তক্তা ফেলে পার হয়ে আসতো ; সারারাত সৌদামিনীর ঘরে মদ খেতো, রঙ্গভঙ্গ কোত্তো, ভোরবেলা চোলে যেতো ; আপনাদের ছাতে গিয়ে, সেই তক্তাখানা আর একদিকে সোরিয়ে রেখে দিতো। তক্তা তো তক্তা, কিসের তক্তা, তাদের বাড়ীর লোকেরা সেটা কিছু মনে কোত্তো না, সন্দেহও রাখতো না।"

আমি।—ভাল, বুঝলেম। আচ্ছা, সৌদামিনীকে জয়হরি ভালবাসে, তক্তা পথে যাওয়া-আসা কোত্তো, মন্দকথা নয় ; কিন্তু সন্ন্যাসীটীকে কাটলে কেন ? সৌদামিনীর মঙ্গলের জন্যই যজ্ঞ কোচ্ছিল. সৌদামিনীর ছেলে হবার সুবিধা হোচ্ছিল, জয়হরি তারে কেটে ফেল্লে কেন ?

কামি।—কেটে ফেল্লে গায়ের জ্বালায়!

আমি।—কি রকম?

কামি।—রকম ভাল। ছেলেমানুষ তুমি, সে সব রকম-সকম কি বুঝবে? ছেলে হবার যজ্ঞি, জয়হরি সেটা ভাবলে না; জয়হরি মনে কোল্লে, ছেলে করবার জন্যই হয় তো যজ্ঞি হোচ্চে, অম্নি গায়ের জ্বালা ধোরে গেল, সেই জ্বালাতেই বটীর কোপ!

আমি।—সম্ভব বটে। আচ্ছা, সৌদামিনী কাশী এলো, কর্ত্তা কিছুই বোল্লেন না?

কামি।—পালিয়ে এসেছে। সন্নিসীখুন, রোজ রোজ বাড়ীতে পুলিশের লোকের আমদানী, পাড়ার লোকেরাও নানা রকম হৈ চৈ লাগালে, জয়হরি সৌদামিনীকে মন্তন্না দিলে, রাত্তিরযোগে দুজনে পালিয়ে এসেচে।

আমি।—তুমি তাদের সঙ্গে এলে কেন?

কামি।—ছাড়লে না। সৌদামিনী যা যা কোত্তো, সব আমি জানতেম। জয়হরির সঙ্গেও যা, সন্নিসীর সঙ্গেও যা, সব আমি জানতেম; খুনটাও আমি দেখেছিলেম; সৌদামিনী তা জানতে পেরেছিল, সেইজন্য আমাকে শুদ্ধ সোরিয়ে ফেলা ইচ্ছা হলো। এই গেল এক কথা, আরো একটা ঘরোয়া কথা। ছেলেবেলা থেকে পোড়াকপালীকে আমি বড় ভালবাসতেম, পোড়াকপাল আমার, ঐ সব কাণ্ড-কারখানা দেখেও ভালবাসার মায়াটা কাটাতে পারি নি, পালাবার সময় সর্ব্বনাশী যখন আমার হাতে ধোরে কাঁদতে লাগলো, "তুই না গেলে আমি সেখানে থাকতে পারবো না, তোরে না দেখলে একমাসও আমি বাঁচবো না," এই সব কথা যখন বোলতে লাগলো, তখন আর আমি মায়ার দায়ে কথা এড়াতে পাল্লেম না, কিছুতেই ওরা ছাড়লো না, কাজেই আসতে হলো।

আমি।—আচ্ছা, সৌদামিনী আবার কি বাড়ী ফিরে যাবে?

কামি।—মরণ দশা! আর কি ফিরে যেতে পারে? কোন লজ্জায় আবার লোকের কাছে ঐ কালামুখ দেখাবে? আর যাবে না। যে কদিন বাঁচে, এইখানেই থাকবে।

আমি।—আচ্ছা, সৌদামিনী এখানে জয়হরির সঙ্গে কি সম্পর্কে আছে? লোকের কাছে কি রকম পরিচয় দেয়?

কামি।—বিয়েকরা সোয়ামী।

আমি।—উত্তম পরিচয়! সোয়ামীকে ঘরে রেখে সৌদামিনী আবার কুমারী সেজে অন্য বাড়ীতে পুজোভোগের নিমন্ত্রণেও যায়! কাশীধামের মাহাত্ম্য বেশ! আচ্ছা কামিনীর মা, তুমি কি চিরদিন ওদের কাছেই থাকবে?

কামি।—না থেকে আর কোথায় যাবো? আমার কেউ নেই, কোথাও যাবার জায়গাও নাই। যে কদিন বাঁচি, ওদের কাছেই থাকবো, যা করেন বাবা বিশ্বেশ্বর!

আমি।—আচ্ছা কামিনীর মা, আমি যদি তোমারে কোন ভাল জায়গায় রেখে দিতে পারি, সেখানে তুমি যেতে রাজী আছ? বৃদ্ধবয়সে পাপের সংসর্গে আর কেন থাকবে? পাপের অন্ন কেন খাবে? কি বল?

কামি।—আঃ! তা হোলে তো বেঁচে যাই! প্রাতঃপাক্কে চিরজীবী হও, রাজা হও, কোথায় তুমি আমারে নিয়ে যেতে চাও?

আমি।—নিয়ে যেতে চাই না কোথাও, কাশীতেই থাকতে পাবে, ভদ্রলোকের বাড়ীতেই থাকবে, কিছুই কষ্ট হবে না। যে বাড়ীতে আমি আছি, সেই বাড়ীতেই রাখতে পাত্তেম, কিন্তু সৌদামিনী জানতে পারবে; সে বাড়ীতে রাখা হোতে পারে না। সে বাড়ীর বড়বাবুর সঙ্গে কাশীর অনেক বড় বড় লোকের আলাপ, তাঁরে অনুরোধ কোরে তোমার জন্য আমি একটা উত্তম আশ্রয় ঠিক কোরে দিব।

কামিনীর মা সম্মত হলো। আমিও শুনে সন্তুষ্ট হোলেম। ইতিমধ্যে আর একদিন অন্য কোন স্থানে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে, সেই দিন সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিকঠাক করা যাবে, এইরূপ স্থির হয়ে থাকলো।

সন্ধ্যা হবার অতি অল্প বিলম্ব। কামিনীর মা বেরিয়ে গেল, আমিও যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে রাস্তায় বেরুলেম। সে সময় পূর্ব্বকথিত বাইজীগুলির আরো অধিক নয়নমোহিনী শোভা। এক এক বারান্দায় সেতার-বেহালাযোগে সুমধুরকণ্ঠে সুস্বরলহরী হিল্লোলিত হোচ্ছে, শ্রবণে শ্রবণ-মন বিমুগ্ধ হয়, অল্পক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে একটী গীতের অর্দ্ধেকটুকু আমি শুনলেম, শেষ পর্য্যন্ত শোনবার অবকাশ হলো না। বড়বাবু সন্ধ্যার পরেই ফিরে আসেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী যাওয়া আবশ্যক, সঙ্গীতশ্রবণের আশাকে মনোমধ্যে গুপ্ত রেখে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে আমি বাড়ীর দিকে চোলে এলেম।

বস! এই পর্য্যন্ত আমার সে দিনের দৌত্যকার্য্য সমাধান। পাঠকমহাশয় জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, দৌত্যকার্য্য সমাধা কোল্লেম, আমি কাহার দূত?—কোন মনুষের দূত আমি নই, এ ক্ষেত্রে এ কার্য্যে আমি ধর্ম্মদেবের দূত।

এ দৌত্যকার্য্যের পরিণাম কি হবে? আমিও তাই ভাবছি। অজ্ঞাত খুনের আসামীটা কে, সন্ধানটী জানা হলো, কি উপলক্ষে কি রকমে খুন, সেটীও একপ্রকার জানা হলো, তার পর? মনে মনে ভাবলেম, তার পর আমি কি কোরবো? পুলিশে সংবাদ দিয়ে আসামীকে ধোরিয়ে দেওয়া, তাই বা কি প্রকারে হয়? সাক্ষী কোথায়? সাক্ষীর মধ্যে একটা স্ত্রীলোক আবার সামান্য চাকরাণীমাত্র; একটা চাকরাণীর সাক্ষ্যবাক্যে একটা লোকের প্রাণ যাওয়া বিচারকেরও বিবেচনায় কখনও যুক্তিযুক্ত বোধ হবে না। আরো একটা সন্দেহ আছে। কামিনীর মা আমার কাছে যে সব কথা বোল্লে, জজের কাছে সেই সব কথা বোলবে কি না? না বলাই অধিক সম্ভব। সংবাদ দিয়ে আমিই তখন ফ্যাঁসাদে পোড়বো! সন্ন্যাসী আমার কেউ ছিল না, জয়হরিও আমার শত্রু নয়, জয়হরির ফাঁসী হোলে রমাই সন্ন্যাসী বেঁচে উঠবে না, কাজ কি তবে বৃথা ফ্যাঁসাদ ডেকে আনা? বড় বড় বদমাসলোককে শাস্তি দেওয়া ধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ইংরেজী আইনের কূট-চক্রের গতি যে প্রকার, সে গতিতে একা-

ধিক প্রত্যক্ষ সাক্ষীর মুখে ঠিকঠিক প্রমাণ না হোলে সত্য অপরাধীরাও বেকসুর খালাস পায়, উলটে আবার সত্যসংবাদদাতার বিপদ পড়ে। দূর হোক, এখন আর সে উৎপাতে কাজ নাই। এর পর যদি অন্য কোন সূত্র প্রকাশ পায়, তখন-কার কর্ত্তব্য তখন স্থির করা যাবে। এইরূপ স্থির কোরে মনের ভাব মনেই চেপে রাখলেম, যজ্ঞেশ্বরকেও কিছু জানতে দিলেম না।

ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা বাড়ীতে পৌঁছিলেম, বড়বাবু তখনো ফিরে আসেন নি। মেজোবাবু পৃথক হবেন, যাতে কোরে সেই অপ্রিয় ঘটনা না ঘটে, সেই বিষয়ের উপায়নির্দ্ধারণের জন্য মধ্যস্থ নির্ব্বাচনে তিনি ব্যস্ত, ফিরে আসতে রাত্রি প্রায় দশটা বেজে গেল। সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার আর অন্য কথা কিছুই হলো না।

সেই সপ্তাহের শুক্রবার সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ীর দরজার সম্মুখে এক-খানা গাড়ী লাগলো ; একটী ভদ্রলোক সেই গাড়ী থেকে নেমে সরাসর বৈঠক-খানায় উঠে এলেন। সম্মুখেই আমি ছিলেম, দেখেই চিনলেম, মোহনলাল-বাবু। আমারে সেইখানে দেখে, বিস্ময় প্রকাশ কোরে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! তুমি এখানে?" নম্রভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, এই বাড়ীতেই আমি আছি, বড়বাবু যথেষ্ট স্নেহ করেন, এখানকার আদালতে তিনি আমার একটী চাকরী কোরে দিয়েছেন, কুড়িটাকা বেতন হয়েছে, এখানে আমি বেশ আছি।"

আমার কথাগুলি শুনে মোহনবাবু একটু আহ্লাদ প্রকাশ কোরে বোল্লেন, "বেশ হয়েছে! শুনে আমি তুষ্ট হোলেম। রমেন্দ্রবাবু আমার পরম বন্ধু, তোমার জন্য তাঁকে আমি বিশেষ কোরে বোলে দিব। এইখানেই তুমি থাকো, ছেলেবুদ্ধিতে আর কোথাও চোলে যেয়ো না, থাকতে থাকতে আরো ভাল হবে।"

আমি নমস্কার কোল্লেম। বড়বাবু তখন সেখানে ছিলেন না, একটু পরেই বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ; এসেই মোহনবাবুকে দেখে প্রফুল্লবদনে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, যথাসময়ে পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছে, সে কথাও বোল্লেন। আনুষঙ্গিক বিশ্রম্ভালাপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হলো, তাঁরা উভয়ে পাশাপাশি হয়ে বোসলেন, আমি একটু তফাতে বোসে থাকলেম।

মোহনলালবাবুর বদন বিষণ্ন। প্রথমাবধি সেই বিষণ্নতা আমি লক্ষ্য কোরে-ছিলেম, কারণ কিছু অনুভব কোত্তে পারি নাই। মুখপানে চেয়ে বড়বাবু তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আপনাকে এমন চিন্তাযুক্ত দেখছি কেন? এ রকম বিমর্ষভাব কখন তো দেখি নাই? সর্ব্বক্ষণ হাসিখুসী, সর্ব্বক্ষণ প্রসন্নতা, সর্ব্বক্ষণ আমোদ-আহ্লাদ, আজ কেন এমন ম্রিয়মাণ? হয়েছে কি? শরীরে কি কোন অসুখ আছে?"

অম্লানবদনে মোহনবাবু উত্তর কোল্লেন, "আমার নিজের শরীরে কোন অসুখ হয় নাই, আমার পরিবারটী অত্যন্ত পীড়িত। আজ তিনদিন হলো, আমরা কাশীতে এসেছি, এসে অবধি তিনি শয্যাগত ; ভয়ানক জ্বর ; ঘোর বিকার ; সেই জন্য এই তিনদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পারি নাই, আজ একটু

ভাল আছেন, চিকিৎসকেরা বোলছেন, এই রূপ যদি থাকে, আর কোন উপ-সর্গ না হয়, তা হোলে আরাম হোতে পারেন ; তথাপি একুশ দিনের কমে সম্পূর্ণ ভরসা করা যায় না।

বড়বাবু দুঃখ প্রকাশ কোল্লেন, আরাম হবেন বোলে প্রবোধ দিলেন ; মোহনবাবু নিশ্বাসত্যাগ কোল্লেন। মোহনবাবুর নূতন বিবাহের কথা বড়বাবু জানতেন না, মোহনবাবুও ভাঙলেন না, আমি কিন্তু বুঝতে পাল্লেম, নূতন পরিবার। আমার চিত্ত বিচলিত হলো, আহা ! আহা ! অমরকুমারীর শক্ত পীড়া ! ভয়ঙ্কর জ্বর-বিকার ! আমার একবার দেখা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ আমি ভাবলেম, কিন্তু উপযাচক হয়ে মোহনবাবুর কাছে সে ভাবটা ব্যক্ত কোত্তে পাল্লেম না। অমরকুমারী আমার কত বড় উপকারিণী, মোহনবাবু জানেন না, আমি যদি হঠাৎ তাঁর সাক্ষাতে বলি, আপনার পরিবারকে আমি দেখতে যাব, সেটা একটু দোষের কথা হয় ; তাই ভেবেই কিছু বোলতে পাল্লেম না, প্রাণ কিন্তু ব্যাকুল হলো ; আপন মনে ইতস্ততঃ কোত্তে লাগলেম।

মানুষের মনের ব্যাকুলতা মানুষে বুঝতে পারে না, অন্তর্যামী জানতে পারেন। আমার প্রতি তখন অন্তর্যামী যেন সদয় হোলেন ; আশা পূর্ণ হবার সুযোগ উপস্থিত হলো। বিদায়কালে মোহনলালবাবু আমার দিকে চেয়ে কি একটু চিন্তা কোরে বোল্লেন, "চল হরিদাস, তুমিও আমার সঙ্গে চল ; যে বাড়ীতে আমি রয়েছি, সেই বাড়ীখানি দেখে আসবে, আবশ্যক হোলে একা-কীও যেতে পারবে, আবশ্যক হবে, মাঝে মাঝে তোমাকে যেতে হবে, তাও আমি জানতে পাচ্ছি, চল।"

মন আমার যা চায়, তাই আমি পেলেম ; বড়বাবুর অনুমতি নিয়ে, পূর্ব্ব-কথিত শকটারোহণে মোহনবাবুর বাসাবাড়ীতে আমি গেলেম। যে ঘরে রোগী, সে ঘরে আমারে নিয়ে যেতে মোহনবাবু কোন প্রকার দ্বিধা রাখলেন না ; ঘরে আগুন লাগার কথাটা তাঁর মনে ছিল, সেই কারণেই আমি অমর-কুমারীর রুগ্ন-শয্যাপার্শ্বে অবাধে যেতে পেলেম।

অমরকুমারী শয্যাশায়িনী ! পদতলে ধাত্রীরূপিণী একটী দাসী। অমর-কুমারীর সেই পদ্মফুলের মত মুখখানি মলিন হয়ে গিয়েছে, স্থানে স্থানে যেন কালিমারেখা অঙ্কিত হয়েছে, সেই কুরঙ্গ-নেত্র-দুটী যেন জলভরে ছলছল কোচ্ছে, পূরন্ত কপোলে চক্ষের কোল বোসে গিয়েছে, মুখখানি বিশুষ্ক ; পার্শ্বে উপবেশন কোরে, ললাটে করস্পর্শে জানলেম, গাত্রে বিষম উত্তাপ ! খানিকক্ষণ মুখপানে চেয়ে চেয়ে, একটু হেঁট হয়ে, ধীরে ধীরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অমরকুমারি ! এখন তোমার কি রকম যাতনা হোচ্ছে ?"

দুই তিনবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, একটীও উত্তর পেলেম না। অমরকুমারীর চক্ষু যেন চিত্রিত চক্ষের ন্যায় আমার মুখের দিকে স্থির, মুখে কিন্তু কথা নাই ; কোন-দিন যে পরিচয় ছিল, সেই সুস্থির-নয়নে সে প্রকার কোন লক্ষণই অনুভূত হলো না। পুনরায় কথা কইলেম, অমরকুমারী কথা কইলেন না। পুনরায় আমি তাঁর উত্তপ্ত ললাটে হস্তস্পর্শ কোল্লেম, ধীরে ধীরে একখানি হস্ত উত্তোলন কোরে অমরকুমারী আমার হাতখানি সোরিয়ে দিলেন, কেমন যেন উদাসীনভাবে মুখখানি

অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। আমি অপ্রতিভ হোলেম, প্রাণে কেমন বেদনা লাগলো। মনে কোল্লেম, মিথ্যা মায়ায় অমরকুমারী আমারে ভুলে গিয়েছেন! আগুনের মুখ থেকে যখন উদ্ধার করি, তখন চিনতে পারেন নাই, এখনও চিনতে পাল্লেন না! এই রকম ভাবছি, সেই সময় অমরকুমারী বামহস্তের অঙ্গুলিগুলি অল্পে অল্পে সঞ্চালন কোরে, সঙ্কেতে আমারে সেখান থেকে উঠে যেতে বোল্লেন। নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে শয্যার উপর থেকে আমি নেমে এলেম। মোহনলালবাবু একটু দূরে একখানি চেয়ারে বোসে ঐ সব কার্য্য দেখলেন, কিছুই বোল্লেন না। তার পর অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি আমারে কিছু জল খেতে দিলেন। আর আমার জলখাওয়া! অমরকুমারী আমারে চিনতে পাল্লেন না, বিষাদের বহ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত, মোহনবাবুর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত একখানি গজা মুখে দিয়ে, এক গ্লাস জল খেয়েই আমি উঠে পোড়লেম। রাত্রে সেইখানে থাকবার জন্য মোহনবাবু আমারে অনুরোধ কোল্লেন, বড়বাবু উদ্বিগ্ন হবেন, এইরূপ ওজর কোরে, সে অনুরোধে আমি উপেক্ষা কোল্লেম; কাজে কাজেই আর একখানা ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়ে এনে, গাড়োয়ানকে ঠিকানা বোলে দিয়ে, রাত্রি এক প্রহরের পর মোহনবাবু আমারে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

আমার অপেক্ষায় বড়বাবু বাস্তবিক তখনো বৈঠকখানায় ছিলেন, বিমর্ষ-বদনে নিকটস্থ হয়ে তাঁরে আমি বোল্লেম, "সত্য সত্য মোহনবাবুর পরিবারের পীড়া বড় শক্ত! তিনদিনের মধ্যে স্বর্ণবর্ণ যেন কালী হয়ে গিয়েছে, চক্ষু বোসে গিয়েছে, চক্ষে ঝাপসা ধোরেছে, চাউনিও যেন ফ্যালফেলে! আহা! গতিক বড় ভাল বোধ হলো না! এত অল্পবয়সে—'

শুনতে শুনতে অন্যমনস্কভাবে আমারে থামিয়ে দিয়ে, সবিস্ময়ে বড়বাবু বোলে উঠলেন, "মোহনবাবুর সঙ্গে পূর্ব্বে কি তোমার দেখাশুনা ছিল? তাঁর পরিবারকে পূর্ব্বে কি তুমি দেখেছিলে? স্বর্ণবর্ণ, কালীবর্ণ, এত অল্পবয়সে, এ সব তোমার কি রকম কথা? মোহনবাবুর পরিবারের বর্ণ স্বর্ণবর্ণ নয়, তিনি শ্যামাঙ্গী, তাঁর বয়সও অল্প নয়, ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের কম হবে না; তুমি এ সব নূতনকথা কোথা থেকে এনেছ?"

তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, নূতনকথা নয়, সত্যকথাই আমি বোলছি। মোহনবাবুর বড় পরিবারটী সঙ্গে আসেন নাই, এটী নূতন পরিবার। বাবুর মুখেই আমি শুনেছি, তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ কোরে-ছেন; বীরভূমজেলায় নূতন পরিবারের পিত্রালয়। এ পরিবারটীর বয়েস অল্প, দিব্য গৌরাঙ্গী, চমৎকার সুন্দরী। মোহনবাবুর সঙ্গে আমার জানাশুনা আছে। প্রথম-দর্শন বর্দ্ধমানে, তার পর ভেলুয়াচটীতে। নূতন পরিবারটীকে সেই চটীতেই আমি দেখেছিলেম। আহা! অঙ্গে সবে যৌবনের অঙ্কুর, চমৎ-কার রূপ। বিশ্বেশ্বর করুন, আরাম হোন; সেটীর কিছু ভালমন্দ হোলে মোহনলালবাবুর প্রাণে বিষম আঘাত লাগবে!"

বড়বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন; আকাশপানে চেয়ে মৃদুমন্দবচনে বোল্লেন, "না না, অমঙ্গল আশঙ্কা কোত্তে নাই; অবশ্যই আরাম হবেন। মোহনলালবাবু ধর্ম্মপরায়ণ, পরোপকারী, বন্ধুবৎসল,

অমায়িক ভদ্রলোক ; কখনো তিনি কারো কোন অনিষ্ট করেন নাই, তাঁর মন্দ কেন হবে? ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন ; পরিবারটী অবশ্যই আরাম হবেন। তাঁদের সঙ্গে তোমার জানাশুনা আছে, শুনে আমি সন্তুষ্ট হোলেম। তুমি তাঁদের মঙ্গল চাও, তাঁদের কষ্টে তুমি কাতর হও, এতো অল্পবয়সে এরূপ মহত্ত্ব তোমার, এ লক্ষণেও তোমার প্রতি আমি পরিতুষ্ট।"

কথাগুলি শুনলেম, ভালমন্দ কিছুই বোল্লেম না। বড়বাবুর মুখের প্রশংসাগীত একপ্রকার, আমার প্রাণের নবসঙ্গীতের সুর অন্যপ্রকার। সে রাত্রে আহারান্তে যখন শয্যায় শয়ন কোল্লেম, তখন আমার হৃদয়তন্ত্রীতে সেই সুর বেজে উঠলো। মোহনবাবু ধার্ম্মিক, পরোপকারী, অমায়িক, কখনো তিনি কারো মন্দ করেন নাই, সে সুরের সঙ্গে আমার প্রাণের সুরের মিলন হলো না। কেন হলো না, সে হেতুবাদ সময়ান্তরে প্রকাশ হবে, এখন আমার অন্য-চিন্তা প্রবলা। অমরকুমারী বাঁচবেন না! বড়বাবুকে বোল্লেম বিকারের লক্ষণ, চক্ষে ঝাপসা ; সেই কথাই ঠিক। অগ্নিকাণ্ডের সময় আগুনভেল্কীতে আমারে চিনতে না পারা ততটা আশ্চর্য্যবোধ হয় নাই, এখন যে অমরকুমারী আমারে চিনতে পাল্লেন না, ইহাই বড় তাজ্জব ব্যাপার! বিছানার উপর পাশ ঘেঁসে বোসলেম, মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলেম, স্পষ্ট স্পষ্ট কথা কোইলেম, তবু অমরকুমারী আমারে চিনলেন না! অমরকুমারী কি এতই নিষ্ঠুরা?—না—না—না, অমরকুমারীকে নিষ্ঠুরা মনে করাও আমার অকৃতজ্ঞতা! অমরকুমারী দয়ার প্রতিমা! অমরকুমারী আমার জীবনদায়িনী! সেই দয়াময়ী অমরকুমারী কখনই নিষ্ঠুরা হোতে পারেন না। বিকারের ধর্ম্ম! ঘোর-বিকারাচ্ছন্ন রোগীরা মানুষ চিনতে পারে না,—মাতাপিতা, পুত্রকন্যা প্রভৃতি স্বজনবর্গকেও চিনতে পারে না, আসন্নকালে এই লক্ষণ দেখা দেয়! চক্ষে জল পড়ে! অমরকুমারীর সেই লক্ষণ! অমরকুমারীর সেই অবস্থা! অমরকুমারীর আসন্নকাল! ঘোর বিকার! অমরকুমারী বাঁচবেন না! এই চিন্তায় সমস্ত রজনী আমি ছটফট কোল্লেম, একটীবারও চক্ষের পাতা বুজতে পাল্লেম না!

প্রভাতে গাত্রোত্থান কোরে অগ্রেই আমি অমরকুমারীকে দেখতে গেলেম। তখনো সেই ভাব! অমরকুমারী আমারে চিনতে পাল্লেন না! চক্ষের জল মুছতে মুছতে আমি ফিরে এলেম। উপর্য্যুপরি তিনদিন সকাল বিকাল দুটী বেলা অমরকুমারীকে আমি দেখতে যাই, কেঁদে কেঁদে ফিরে আসি ; দিন দিন বিকারের বৃদ্ধি! বড়বাবু নিত্য নিত্য সংবাদ লন, আমার মুখে অবস্থা শুনে শুনে অত্যন্ত কাতর হন, নিত্য নিত্য আমি আফিসে যাই, কাজকর্ম্ম করি, কিন্তু কাজের দিকে মন থাকে না। আফিসের লোকেরা বুঝতে পারে, বড়-বাবুর নিজের লোক আমি, সেই জন্য কেহ কিছু বল্লে না।

একদিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় কেবল আমি আর বড়বাবু। আমারে সর্ব্বক্ষণ অন্যমনস্ক দেখে, মোহনবাবুর পরিবারের জন্য আমি কাতর, সেই ভাবটী বুঝতে পেরে, বড়বাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! মোহন-বাবুর বিপদে যে রকম কাতরতা তুমি দেখাও, তাতে কোরে বোধ হয়, তাঁদের

সঙ্গে তোমার অতি নিকট-সম্বন্ধ। আচ্ছা, বল দেখি, কি সূত্রে মোহনবাবুর সঙ্গে তোমার মিলন হয়েছিল ?"

প্রকাশ কোরবো না, মনে কোরে রেখেছিলেম, কিন্তু সে সঙ্কল্প রক্ষা কোত্তে পাল্লেম না ; বাবুর প্রশ্নে যখন সূত্র পর্য্যন্ত টান পোড়লো, তখন আর কি প্রকারে চেপে রাখি ? পাল্লেম না ; পাঁজী-পুঁথি খুলে সূত্রগ্রন্থি শিথিল করবার মন্ত্র আওড়াতে বাধ্য হোলেম। প্রথমেই বোল্লেম, "বর্দ্ধমানে প্রথম দেখা। এই কাশীধামে আপনার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম সাক্ষাৎ, সেই দিন আমার বাল্যজীবনের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেম, সেই পরিচয়ের মধ্যে কতকগুলি গুহ্যকথা আমি গোপনে রেখেছিলেম ; আজ আপনি সূত্র পরিজ্ঞাত হবার ইচ্ছা প্রকাশ কোল্লেন, তখন সেই গুপ্তকথাগুলি কাজেই আমারে প্রকাশ কোত্তে হলো। যদি কিছু অপ্রিয় বোধ হয়, দয়া কোরে আমার অপরাধ আপনি মার্জ্জনা কোরবেন। মোহনবাবুর গুণকীর্ত্তন করবার সময় সেদিন আপনি বোলেছেন, মোহনবাবু ধার্ম্মিক, অমায়িক, পরোপকারী ভদ্রলোক ; হোতে পারে, কথায় বার্ত্তায় বন্ধুলোকের কাছে সে সকল গুণের পরিচয় তিনি দিতে পারেন, কিন্তু আমি যতদূর জানতে পাচ্ছি, সেই প্রমাণে বোলতে পারি, ব্যবহারে বিপরীত। পূর্ব্বে আপনারে আমি বোলেছি, বর্দ্ধমানে ঘোরবিপদে যিনি আমারে আশ্রয় দেন, তাঁর একটী জামাই আছেন ; জামাইটী অত্যন্ত অপব্যয়ী, আমার আশ্রয়দাতা সেই জামাইকে সৎপথে আনবার জন্য স্বকৃত উইলে বিষয়ের অংশের কথা ব্যক্ত করেন, জামাই যদি ক্রমাগত বেশী টাকা নষ্ট করেন, উইলের ক্রোড়পত্রে তিনি সেগুলি বাদ দিয়ে যাবেন, এ কথাও বলেন, যে সিন্দুকে উইল ছিল, সেই জামাইকে সেই সিন্দুকটীও দেখান ; কিছু দিন পরে একরাত্রে বিছানার উপর কর্ত্তা কাটা পড়েন। এ সব কথা আপনাকে বোলেছি, কিন্তু সেই জামাইটীর নাম বলি নাই। সেই জামাই এই মোহনবাবু। শ্বশুরের খুনের পর সেই উইলের পাঠ আমি নূতনরকম শ্রবণ করি। সেই বাড়ীতেই মোহনবাবুকে আমি চিনি। তাঁর শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁরই কাছে আমি আশ্রয় চাই, সেই সময় একটা লোক আমার মামা সেজে গিয়ে মোহনবাবুর সম্মুখ থেকেই আমারে ধোরে নিয়ে যায়। সেই লোকের ডাকনাম রক্তদন্ত, আসল নাম জটাধর। লোকটা বড় ভয়ঙ্কর। শৈশবাবধি যত কষ্ট আমি পেয়েছি, এখন জানতে পেরেছি, সেই জটাধর ওরফে রক্তদন্তই সেই সকল কষ্টের মূল। রক্তদন্তের সঙ্গে মোহনবাবুর যোগাযোগ ছিল, সেটাও আমি এখন বুঝতে পেরেছি। মোহনলালবাবু ধার্ম্মিক, কি রকম ধার্ম্মিক ?—নিরামিষাশী বক যেমন ধার্মিক, হিতোপদেশের বিড়াল যেমন ধার্ম্মিক, স্বর্ণকঙ্কণহস্ত পঙ্কপতিত ব্যাঘ্র যেমন ধার্ম্মিক, আমার এখনকার বিশ্বাসে ঐ মোহনবাবুটীও সেইরকম ধার্ম্মিক !"

দুই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে বড়বাবু বোলে উঠলেন, "এ কি হরিদাস, পাগলের মত এ সব কথা তুমি কি বোলছ ? ওটা তোমার ভুলবিশ্বাস। মোহনলালবাবু যথার্থই ধার্ম্মিকলোক, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।"

একটু উচ্চকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ আমি বোলে উঠলেম, "আমিও বিশেষ প্রমাণ দিতে পারি। এই দেখুন!"—ত্বরিতস্বরে এই কটী কথা বোলেই আমি উঠে দাঁড়ালেম ; একটা আলমারী খুলে, একখানা কেতাব বাহির কোরে নিয়ে বাবুর কাছে এসে বোসলেম। আদালতের সিঁড়িতে যে চিঠিখানা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলেম, সেইখানা আর প্রয়াগ থেকে মোহনলালবাবু আমাদের বড়বাবুকে সম্প্রতি যে চিঠিখানা লিখেছেন, সেইখানা, ঐ দু-খানা চিঠিই আমি ঐ কেতাবের ভিতর যত্ন কোরে রেখে দিয়েছিলেম ; বাহির কোরে দেখিয়ে সাগ্রহবচনে বোল্লেম, "দেখুন, এ দুখানা চিঠি এক হাতের লেখা কি না?"

চিঠি দু-খানা হাতে কোরে নিয়ে, অক্ষরগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে ভাল কোরে দেখে বড়বাবু বোল্লেন, "হাঁ, এক হাতের লেখা ; কিন্তু কি তা?"

"কি তা?"—বিস্ফারিতনেত্রে বড়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে তৎক্ষণাৎ আমি পুনরুক্তি কোল্লেম, "কি তা? এই দেখুন, একখানাতে দস্তখৎ আছে, একখানার দস্তখৎ ছেঁড়া। দুখানাই মোহনবাবুর হাতের লেখা। ছোট চিঠিখানা তিনি জটাধরকে লিখেছিলেন। জটাধর আর আমার উপর কোন দৌরাত্ম্য না করে, ঐ চিঠিতে সেইরূপ উপদেশ। মোহনবাবুর উপদেশে জটাধর আমার উপর অশেষবিধ দৌরাত্ম্য কোরেছে, তা না হোলে এত দিনের পর ঐ চিঠি লিখে জটাধরকে তিনি নিষেধ কোরবেন কেন? সেই জন্যই বোলছি, বক, বিড়াল, ব্যাঘ্র যেমন ধার্ম্মিক, ঐ মোহনলালবাবুটীও সেইরকম ধার্ম্মিক!"

সর্ব্বনাশ! সবেমাত্র ঐ কথাগুলি আমি বোলেছি, তখনি তখনি রক্তমুখে গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে মোহনলালবাবু সেই ঘরের ভিতরে এসে উপস্থিত! কখন এসে ঘরের বাহিরে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, আড়াল থেকে আমার ঐ সব কথা শুনেছেন, কথা শেষ হবামাত্র ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে দর্শন দিলেন! আমি কাঁপতে লাগলেম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরক্তনেত্রে আমার দিকে চেয়ে, ভীষণগর্জ্জনে তিনি বোলতে লাগলেন, "কি হে ছোকরা! বড়ই যে শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছ? বক, বিড়াল, ব্যাঘ্রের মত ধার্ম্মিক আমি? ছেলেমুখে বুড়ো-কথা? যতদূর মুখ না, ততদূর কথা? জ্যাঠা ছেলের এত বড় স্পর্দ্ধা! আচ্ছা, আচ্ছা! থাকো তুমি! কি বোলবো, আমার বন্ধুর কাছে রয়েছিস, তা না হোলে এখনি আমি তোকে এক লাথিতে যমের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দিতেম!"

জোড়াবাতীর আলোতেও আমি তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখলেম! সর্ব্বাঙ্গে থরহরি কম্প! ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বড়বাবুর পশ্চাতে গিয়ে লুকালেম। চিঠি দু-খানা বালিশের কাছেই পোড়ে থাকলো।

সান্ত্বনাবাক্যে মোহনবাবুকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বড়বাবু মধ্যবর্ত্তী হয়ে বোলতে লাগলেন, "থামুন মহাশয়! থামুন, ছেলেমানুষ, বুঝতে পারে নাই, কি কথা বোলতে কি কথা বোলতেছিল, আপনার মত বিজ্ঞলোকের অতটা রাগ করা উচিত হয় না ; আমার অনুরোধে হরিদাসকে আপনি ক্ষমা করুন। আপনি মহৎলোক, আপনার স্বভাব-চরিত্র এ বালক বিশেষ জানে না, বালকের কথা মনে কোরে, ক্ষমা করাই সাধুলোকের কর্ত্তব্য।"

একটু যেন শান্ত হয়ে, অল্পগর্জ্জনে মোহনবাবু বোল্লেন, "দেখুন না, আস্পর্দ্ধাটা একবার দেখুন না! অসাক্ষাতে নিন্দা করা কত বড় দুষ্টবুদ্ধির কাজ, একবার ভাবুন না! গরিব বোলে দয়া করি, দেখা হোলে ভালকথা বলি, আপনার আশ্রয়ে রয়েছে, দেখে আমি তুষ্ট হয়েছিলেম, আপনাকে অনুরোধ কোরবো ভেবেছিলেম, নিমখারামীটা একবার দেখুন না! হাতের লেখা মিলাতে বোসেছিল! হাতের লেখা কি দু-তিনজনের একরকম হোতে পারে না? দেখি—দেখি, কি রকম অক্ষর?—বোলতে বোলতে ব্যস্তহস্তে সেই চিঠি-দুখানি তিনি তুলে নিলেন, দুখানা চিঠিতেই তাচ্ছীল্যভঙ্গীতে একবার চক্ষু দিলেন, দিয়েই অম্নি তাসখেলার মজলীসের চীৎকারের মত চীৎকার কোরে বোলে উঠলেন, "এখানা তো দেখছি জালচিঠি ;—দস্তখৎ-ছেঁড়া বজ্জাতী জালচিঠি!" বোলেই তৎক্ষণাৎ মোমবাতীর উজ্জ্বল শিখার উপরে ধোরে সেই ছোট চিঠিখানা তিনি জ্বালিয়ে দিলেন, ফরফর কোরে জ্বেলে উঠে চক্ষের নিমেষে সে কাগজখানা ভস্ম হয়ে গেল! বড়বাবুও অবাক, আমিও অবাক!

চিঠিখানা ভস্ম হলো, তখনো মোহনবাবুর রাগ থামলো না ; আড়ে আড়ে আরক্তচক্ষে আমার দিকে চেয়ে বড়বাবুকে তিনি বোল্লেন, "কোথাকার একখানা ছেঁড়া চিঠি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে, আমার চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে, আমাকে বক-ধার্ম্মিক বোলে বাহাদুরী দেখাচ্ছিল! এই বয়সে এত ফিসলেমী বুদ্ধি ধরে, বয়স হোলে না জানি কি হবে! হয় হবে, আপনিই মারা যাবে, আমার তাতে কি?"

মিষ্টবাক্যে বড়বাবু বোল্লেন, "ও সব কথায় আর কাজ নাই ; বালক, না বুঝে দৈবাৎ একটা কথা বোলে ফেলেছে, কথাটা আপনি ভুলে যান। তুচ্ছকথার আন্দোলনে কোন ফল নাই। আপনার পরিবারটী কেমন আছেন?"

"আজ একটু ভাল আছে।"—উগ্রস্বর একটু নরম কোরে মোহনবাবু বোল্লেন, "আজ একটু ভাল আছে। চিকিৎসক বোলে গিয়েছেন, আজ রাত্রেই জ্বরত্যাগ হবে ; ভয় নাই। আমার বড় দুর্ভাবনা হয়েছিল, এই আশ্বাসবচনে মনটা একটু সুস্থ হোচ্ছিল, কোথাকার পাপ কোথায়! মিছামিছি একটা বাজেকথা নিয়ে, বাজেকথা তুলে, ছোঁড়াটা অনর্থক আমাকে ক্ষেপিয়ে তুল্লে!"

শেষের কথায় কর্ণপাত না কোরে সময়মত উল্লাসে বড়বাবু বোল্লেন, "আহা, বিশ্বেশ্বর তাই করুন, বৌমাটী আরাম হোন! আপনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ কোরেছেন, এটা আমি জানতেম না, হরিদাসের মুখেই শুনলেম। তা একরকম মন্দ হয় নাই, বিষয়ী লোক আপনি, বিষয়বিভব বিস্তর, বংশও বড়, পুত্র-সন্তান না থাকাটা ক্ষোভের বিষয় বটে। প্রথমা স্ত্রীর সন্তান হবার সময় অতীত হয়ে গেলে দ্বিতীয়া স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত।"

এই কথার পর বড়বাবুকে ডেকে নিয়ে, মোহনলালবাবু পাশের একটী ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, আমি জড়সড় হয়ে পূর্ব্বস্থানেই বোসে থাকলেম। বোধ হয়, তাঁদের কি গোপনীয়কথা ছিল, নির্জ্জনে সেই সকল কথা বলা-কওয়া হয়ে গেল, বড়বাবু বৈঠকখানায় ফিরে এলেন, মোহনবাবু আর সেদিকে এলেন না, অন্যদিকের বারান্দা পার হয়ে, উপর থেকে নেমে গেলেন ; দরজায় গাড়ী ছিল,

চক্রবর্ষণের শব্দে বুঝতে পাল্লেম, তিনি চোলে গেলেন। যখন এসেছিলেন, তখন আমরা নানাকথায় অন্যমনস্ক ছিলেম, গাড়ীর শব্দ শুনতে পাই নাই।

কবিরা আর দার্শনিক পণ্ডিতেরা রজনীকে গর্ভবতী বলেন। রজনীর গর্ভে কি কি নিহিত থাকে, প্রভাতে কি কি প্রসূত হয়, পূর্ব্বে তাহা কিছুই অনুমানে আনা যায় না। শুভ অশুভ, দুই পক্ষেই একধারা। যে রজনীতে মোহনবাবুর মুখের ঝড়ে আমি উড়ে যাচ্ছিলেম, সেই রজনীপ্রভাতে এক নির্ঘাত সমাচার আমাদের বর্ণে প্রবিষ্ট হলো। মোহনবাবুর পরিবারটী রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় ইহ-সংসার পরিত্যাগ কোরে গিয়েছেন। চিকিৎসকের একটী কথা সত্য, একটী কথা মিথ্যা। "ভয় নেই" কথাটী সত্য হলো না, সত্য হলো জ্বরত্যাগ। সেই জ্বরত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণত্যাগ!

বাবু মোহনলালের প্রাণে অবশ্য আঘাত লেগেছিল, যাঁদের সঙ্গে মোহনলালের জানাশুনা, এই অশুভ সংবাদে তাঁরাও অবশ্য শোকাকুল হয়েছিলেন, কিন্তু আমার প্রাণে সেই ভীষণ শোকবজ্র যতটা বাজলো, তাঁদের মধ্যে কারো হৃদয়ে বোধ হয়, ততটা বাজলো না। বীরভূমের অমরকুমারীর সঙ্গে দু-দিন আলাপ কোরে আমি সুখী হয়েছিলেম, অমরকুমারী আমারে ভালবেসেছিলেন, সেই জন্যই কি সর্ব্বাপেক্ষা আমার হৃদয়ে বেশী শোক?—না, সে জন্য নয়। রক্তদন্ত আমারে প্রাণে মারবার জন্য গুণ্ডা যোগাড় কোরেছিল, দয়াবতী অমরকুমারী সেই সন্ধান জানতে পেরে, মেয়েমানুষ সাজিয়ে, আমারে গোপনে বাড়ী থেকে বাহির কোরে দিয়েছিলেন, নারীবেশেই আমি পলায়ন কোরেছিলেম, পলায়নেই পরিত্রাণ পেয়েছিলেম, আপন প্রাণকে সঙ্কটাপন্ন কোরে স্নেহময়ী অমরকুমারী আমার প্রাণরক্ষা কোরেছিলেন, সেই অমরকুমারী এখন আর পৃথিবীতে নাই! এই কারণেই আমার বেশী শোক। আর একটী প্রাণে আমার অপেক্ষাও বেশী শোক। সেই শোকাতুরা দুঃখিনী অমরকুমারীর অভাগিনী জননী! নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় কাতরা, দুরন্ত রক্তদন্তের নিষ্ঠুর পীড়নে প্রপীড়িতা সেই অভাগিনী যখন দূরদেশে এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ কোরবেন, তখন তাঁর যন্ত্রণাদগ্ধ ক্ষীণদেহে জীবনবায়ু আর অধিকক্ষণ প্রবাহিত হবে, কিছুতেই তো আমার এমন বিশ্বাস হয় না। অমরকুমারী নাই! এ শোক আমার অসহ্য। একটী প্রবোধ, অমরকুমারীর কাশীপ্রাপ্তি; অল্পদিনে মায়া-সংসার পরিত্যাগ কোরে, মায়াময় ক্ষুদ্রকলেবর পরিত্যাগ কোরে, মায়াময়ী অমরকুমারী অমরবাঞ্ছিত শিবপ্রাপ্ত হোলেন!

সংসারে শোকের বেগ দিন দিন কমে, দিন দিন পুরাতন হয়, বাবু মোহনলাল এক সপ্তাহের মধ্যেই অমরকুমারীকে ভুলে গেলেন। লোকের মুখে শুনলেম, কাশীর বাইজীমহলের একটী সুন্দরী নর্ত্তকীকে সঙ্গিনী কোরে মনের আনন্দে তিনি কাশীধাম পরিত্যাগ কোরে গিয়েছেন। সে সংবাদে আমার আনন্দ হলো। সত্যঘটনা জেনে, সত্যকথা বোলে, অকারণে আমি তাঁর বিষনয়নে পোড়েছি, কাশীতে তিনি থাকলে সর্ব্বদা আমার প্রাণে ভয় থাকতো, সে ভয়টা কিছু দিনের জন্য দূর হয়ে গেল। সে অংশে মনে আমি একটু শান্তি পেলেম, কিন্তু অমরকুমারীকে ভুলতে পাল্লেম না।

এই ঘটনার পর একমাস অতীত। আমি চাকরী করি, নূতন নূতন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করি, একরকমে দিন কেটে যায়। একরাত্রে এক বন্ধুর বাড়ীতে বাইনাচ। বন্ধু আমারে নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন। বড়বাবুর অনুমতি নিয়ে আমি নাচ দেখতে গিয়েছিলেম। বড়বাবু যান নাই। নাচের মজলীসে বেশী লোক ছিল না, যাঁর বাড়ীতে নাচ, তাঁর নিজের বিশেষ পরিচিত বিশ-পঁচিশটী বন্ধু নিয়েই মজলীস। বাবুটীর বাড়ী কলিকাতায়। সাত আট মাস পূর্ব্বে তিনি কাশীতে এসেছেন, পরিবার সঙ্গে নাই, টাকা আছে, বাই-মহলে কিছু বেশী প্রতিপত্তি। একঘণ্টা মাত্র নাচ, রাত্রি দশটার মধ্যেই মজলীসভঙ্গ। বাবুর নাম নীরেন্দ্রবাবু, জাতিতে সদ্গোপ, বয়স অল্প, চেহারা ভাল। যে ঘরে তিনি বসেন, সেই ঘরে আমারে নিয়ে গেলেন, আর তিনটী বন্ধু সেইখানে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হলো। নূতন আলাপ। নীরেন্দ্রবাবু তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় কোরে দিলেন। সেই তিনটী নূতন বন্ধুর মধ্যে একটী দিব্য সুশ্রী, ফুট গোরবর্ণ, গঠন মাঝারি, বক্ষঃস্থল পূরন্ত, হস্তপদ মোলায়েম, গলাটী কিছু খাটো, চিবুক একটু সরু, কপাল চওড়া, চিবুকের আর কপালের পরিমাণে মুখখানি যেন ত্রিকোণ দেখায় ; চক্ষু দুটী বড় বড়, নাসিকা দীর্ঘ, দিব্য গোঁফ ; বয়স অনুমান ২৫।২৬ বৎসর।

বাবুটীর সঙ্গে আলাপ কোরে আমি নিতান্ত অসুখী হোলেম না, কিন্তু তাঁর চাউনির ভঙ্গীতে কেমন এক প্রকার বিরূপ লক্ষণ অনুভূত হলো। কথা কন, হাসেন, সকল কথায় তর্ক ধরেন, মাঝে মাঝে স্ত্রীলোকের কটাক্ষের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। ক্ষুদ্র মজলীসে রসিকতাও বেশ চোল্লো। ঐ বাবুটীর সঙ্গে আমার ভাসা ভাসা আলাপ হলো বটে, কিন্তু তাঁর নামটী আমি জানতে পাল্লেম না।

জলযোগের আয়োজন হলো। ঘরে আমরা পাঁচজন। চারিজনে আঁখি-ঠারাঠারি, আমার দিকে ইঙ্গিত। চারিজনে একবার উচ্চ হাস্য কোরে উঠলেন ; আমি হাসলেম না। হাস্যের কোন কারণ উপস্থিত ছিল না, হাসি এলো না। চারিজনে একসঙ্গে সেখান থেকে একবার উঠে গেলেন, আমি একাকী বোসে রইলেম ; একটু পরেই তাঁরা ফিরে এলেন ; চারিজনেরই মুখ-চক্ষু লাল। তাঁরা যখন আমার কাছে এসে বোসলেন, তখন আমি কেমন এক প্রকার তীব্র গন্ধ অনুভব কোল্লেম। কারণ অনুমান কোত্তে অক্ষম হোলেম না, কিন্তু যেন কিছুই জানলেম না, কিছুই বুঝলেম না, এই ভাবে চুপ কোরে থাকলেম। যে বাবুটীকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী দেখেছিলেম, যে বাবুটীর চাউনি বাঁকা বাঁকা, সেই বাবুটী আমারে নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে স্থির কোরে, ঠেস দিয়ে দিয়ে বিদ্রূপ আরম্ভ কোল্লেন, পরস্পর নানা প্রকার ঠাট্টা-তামাসা চোল্লো। আমি বুঝতে পাল্লেম, সেই বাবুটীই কিছু বেশী রসিক ;—মজলীসী ভাষায় ইয়ারলোক।

সেই বাবুটীকে লক্ষ্য কোরে নীরেন্দ্রবাবু আমারে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস, আমাদের এই বন্ধুটী দিব্য সম্বক্তা ; কথায় কথায় সকলকে হাসান, মাতান, আমোদিত করেন। বেশ আমুদে লোক। কলিকাতার ছেলে কি না, এই রকম

হওয়াই চাই ; বাবুটীর সঙ্গে তুমি আলাপ রেখো, মাঝে মাঝে দেখা কোরো, কথা শুনে সুখী হবে ; দিনকতক ঘনিষ্ঠতা হোলে তুমিও বেশ চালাক-চতুর হয়ে উঠবে। বাবুটীর নাম তুমি মনে কোরে রেখো ; ইনি হোচ্ছেন, জয়হরি-বাবু, সর্ব্বত্রই জয় জয়কার!"

আমার মনটা ঝাঁৎ কোরে উঠলো। মনের সন্দেহ গোপন কোরে রেখে অম্লানমুখে আমি বোল্লেম, "কথাবার্ত্তা শুনে আমিও সন্তুষ্ট হয়েছি, বাবুটী চমৎকার লোক। আলাপ কোরে আমি তুষ্ট হোলেম ; বাবুর উপাধিটী কি?"

যিনি পরিচয় দিয়ে দিচ্ছেলেন, তিনি বোল্লেন, "উপাধি বটব্যাল ;— শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ; জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ না হোলে কি স্বভাবচরিত্র এত ভাল হয়?"

আর আমি অন্য পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেম না, মনে মনে ভাবলেম, কথাই ত বটে! জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ না হোলে এমন ঘটনা কেন হবে? ধোরেছি ঠিক, বটব্যালেরা চলিত কথায় বড়াল ; এই সেই জোড়াসাঁকোর জয়হরি বড়াল। কামিনীর মা এখানে থাকলে ঠিক সনাক্ত কোরে দিতে পাত্তো, তদভাবে আমার মন এখন নামের উপর সনাক্ত কোল্লে। সময় উপস্থিত হোলে ফলাফল জানা হবে।

জলযোগের আয়োজন হয়েছিল, বাবুদের মদ খাবার হুজুগে দেরী পোড়ে গিয়েছিল, সকলে এই সময় পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে লুচি-মাংস ইত্যাদি চর্ব্ব্যচোষ্য ভক্ষণ কোল্লেন, আমি কেবল অক্ষুধার ছল কোরে দুটী সন্দেশ খেয়ে জল খেলেম। রাত্রি দুই প্রহর অতীত। একজন লোক সঙ্গে দিয়ে নীরেন্দ্রবাবু আমারে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। বাড়ীর সম্মুখে গিয়েই দেখি, সদরদরজা খোলা, বাড়ীর ভিতর ভারী গোলমাল, সকলেই জেগে আছে, বড়বাবুও জেগে আছেন, চাকরেরা ছুটাছুটি কোরে বেড়াচ্ছে। ব্যাপার কি, তত রাত্রি পর্য্যন্ত কেনই বা দরজা খোলা, কেনই বা গোলমাল, প্রথমে কিছুই বুঝতে পাল্লেম না ; তার পর শুনলেম, বাবুর পিসীমার ছোট-মেয়েটী সন্ধ্যার পর থেকে অদৃশ্য। কে একজন লোক বাবুর পিসীমার ডান-হাতের পাঁচটী আঙ্গুল কেটে দিয়ে, মেজো-বৌমার গায়ের অলঙ্কারগুলি খুলে নিয়ে, তাঁর গলাতেও রক্ত-পাত কোরে পালিয়ে গিয়েছে ; সেই ঘটনার পর থেকেই নবীনকালীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবুর পিসীমার ছোটমেয়েটীর নাম নবীনকালী। অনু-সন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক বেরিয়েছে, কেহই কোন সন্ধান কোত্তে পাচ্ছে না।

বাড়ীতে চোর এসেছিল, গহনা চুরি কোরেছে, দুটী স্ত্রীলোককে আঘাত কোরেছে, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান কোচ্ছে ; সে অনুমান যদি ঠিক হয়, মেয়েটী তবে কোথায় গেল? কাশীর চোরেরা কি গৃহস্থলোকের বাড়ীর মেয়ে-ছেলে চুরি করে?

রাত্রের মধ্যে কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না, বাবুর পিসীমা সারারাত্রি রোদন কোল্লেন মেজো-বৌমা কাঁদতে কাঁদতে কত রকম কথা বোল্লেন, বৃথা কথা, বৃথা রোদন, নবীনকালী ফিরে এলো না। নবীনকালী বিধবা, নবীনকালী যুবতী, রাত্রিকালে নবীনকালীর পলায়ন, কলঙ্কের কথা, সেইজন্য বড়বাবু চেপে

গেলেন, কেহ কিছু প্রকাশ না করে, ভয় দেখিয়ে সাবধান কোরে সকলকে নিষেধ কোরে দিলেন।

আবার একটা রবিবার এলো। আমার মনের ভিতর জয়হরি বড়াল ক্রীড়া কোচ্ছিল ; স্বর্ণবণিক জয়হরি বড়াল কাশীতে ব্রাহ্মণ সেজে আছে, সে কথাটাও স্থির বুঝেছিলেম। নানা সন্দেহে ব্যাকুলিত হয়ে অপরাহ্নকালে আমি একবার ছাদে উঠলেম। সে দিনও সেই সুন্দরী যুবতী সেই রুমাল হাতে কোরে ছাদে ছাদে চরণবিহার কোচ্ছিল। সেদিন আর সে মূর্ত্তি আমার পক্ষে নূতন নয়, পরিচয়েও অচেনা নয়, সেই সৌদামিনী। চক্ষে চক্ষে যখন মিলন হলো, তখনো চক্ষু ফিরিয়ে নিলে না, একটু লজ্জার লক্ষণও বুঝা গেল না, বরং নির্নিমেষে একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে রইলো, ওষ্ঠপ্রান্তে অল্প অল্প হাস্যরেখাও দেখা দিলে। আমি চক্ষু ফিরিয়ে নিলেম।

স্ত্রীলোকের লজ্জা হলো না, আমি লজ্জা পেলেম ; অন্যদিকে চাইতে চাইতে শীঘ্র শীঘ্র নেমে এলেম। জয়হরিকে বিচারের হস্তে সমর্পণ করা আমার ইচ্ছা। শুনেছিলেম, রমাই সন্ন্যাসীর হত্যাকাণ্ডের তদন্তাবসানে এক ইস্তাহার প্রকাশ হয়েছিল, সেই খুন সম্বন্ধে যে কেহ কোন সংবাদ দিতে পারবে, যাতে যাতে খুনী আসামীর সন্ধান হয়, উপযুক্ত পুলিশ-কর্ম্মচারীর নিকটে তেমন সংবাদ জানাতে পারবে কিম্বা সন্তোষকর প্রমাণ সহ খুনী আসামীকে ধোরিয়ে দিতে পারবে, হুজুর হোতে তাকে একহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, সেই ইস্তাহারের এইরূপ মর্ম্ম।

যতদূর আমার জানা-শুনা হলো, তাতে কোরে আমি সন্ধানটা বোলে দিতে পারি, কিন্তু সন্তোষকর প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য। কোন গতিকে সৌদামিনীকে যদি বশীভূত কোত্তে পারা যায়, তা হোলে বোধ হয়, একরকম কিনারা হোতে পারে ; কিন্তু সৌদামিনীকে বশীভূত করবার উপায় কি ? নিমন্ত্রণ কোরে বাড়ীতে আনা, সেটা ঠিক উপায় নয় ; বিশেষতঃ নবীনকালীর নিরুদ্দেশে বাড়ীর সকলে মহা উদ্বিগ্ন, এ সময় একটা দুশ্চরিত্রা কামিনীকে বাড়ীতে আনবার অনুরোধ করা কোনমতেই হোতে পারে না। কি করা যায় ? একটা দুরাচার খুনেলোক বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পায়, জেনে শুনে চুপ কোরে থাকাও ভাল হয় না। দুষ্টলোকে খোলসা থাকলে তার দ্বারা আরো অনেক লোকের প্রাণ-মান সংকটাপন্ন হবার সম্ভাবনা, ধোরিয়ে দেওয়াই উচিত ; কি উপায়ে ধরা হয়, নিত্য নিত্য সেইপ্রকারের উপায়ই আমি চিন্তা কোত্তে লাগলেম।

কোথাকার পাপ কোথায় ? সংসারে নিঃসম্পর্ক সামান্য একজন বালক আমি, আমার চক্ষেই বা সে সকল পাপ কেন পতিত হয় ? বীরভূমের পাপ রক্তদন্ত, সে পাপ গেল কলিকাতায় ; কলিকাতা থেকে আমি পালিয়ে এলেম, সে পাপ এলো কাশীতে ! আমার সম্বন্ধে মোহনলালবাবুও এক পাপ ; অমরকুমারীকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য সে পাপ এসেছিল কাশীতে ! কলিকাতার পাপ সৌদামিনী, খুনে-পাপী জয়হরি বড়াল, আমার অশান্ত চিত্তকে আরো অশান্ত করবার জন্য সে পাপ এলো কাশীতে ! কাশীধাম কি ইদানী নানা পাপের আশ্রয়-স্থান হয়ে পোড়েছে ? লোকের মুখে যে রকম শুনতে পাওয়া যায়, সে প্রমাণে

ঐরূপ কলঙ্কই যেন সত্য বোধ হয়। বাঙ্গালীদলের বেশী কলঙ্ক। জাতিতে জাতিতে, জাতিতে বিজাতিতে, সম্পর্কে সম্পর্কে, সম্পর্কে নিঃসম্পর্কে, বাঙ্গালী নর-নারী পাপলিপ্ত হোলেই নিরাপদের আশাতে কাশীতে পালিয়ে আসে ; মাতুলের ঔরসে ভগিনী-পুত্রী, পিতৃব্যের ঔরসে ভ্রাতৃকুমারী, ভ্রাতার ঔরসে বিমাতৃকুমারী, ভাগিনেয়ের ঔরসে মাতুলানী, জামাতার ঔরসে শ্বশ্রূ-ঠাকরাণী, শ্বশুরের ঔরসে যুবতী পুত্রবধূ গর্ভবতী হোলেই কাশীধামে পালিয়ে আসে! গর্ভগুলি নষ্ট কোত্তে হয় না, কাশীর পবনের প্রসাদে বংশ-রক্ষা হয়! কেহ কেহ জোড়া জোড়া আছে, কেহ কেহ ছাড়া ছাড়া! সামান্য একটা প্রবাদ অছে, কাশীপুরী পৃথিবী-ছাড়া ; মহাদেবের ত্রিশূলের উপর কাশী। পৃথিবীর পাপ কাশী স্পর্শ করে না। এই প্রবাদে যাদের বিশ্বাস, পৃথিবীর সেই সকল পাপী কাশীধামে পালিয়ে এসে মনের সাধে নূতন নূতন পাপ করে। শাস্ত্রকথা তারা মনের কোণেও স্থান দেয় না। বেদব্যাসের শাপ আছে, অন্যস্থানে যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়, কাশীবাসী হোলে সে সকল পাপ ধ্বংস হয়ে যায় ; কিন্তু কাশীতে যারা পাপ করে, তাদের পাপ অবি-নাশী ; মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত সে পাপের ক্ষয় হয় না ; কাশীর পাপে অনন্ত-কাল নরকভোগ! ঋষিবাক্যানুসারে জ্ঞানের পাপ আর তীর্থের পাপ অক্ষয় হয়ে থাকে ; তীর্থের পাপীরা এই সকল শাস্ত্রবাক্যে আদৌ ভ্রূক্ষেপ রাখে না, সাধুবাক্যে বধির হয়ে নিরন্তর নূতনপাপে রত হয়! অনেক দেখে শুনে এই কারণেই আমি বোলছি, কোথাকার পাপ কোথায়!

আবার রবিবার। অপরাহ্নে যজ্ঞেশ্বরকে নির্জ্জনে পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বাড়ীর ভিতর সে সব কাণ্ডকারখানা কি? গহনা চুরি, আঙ্গুল কাটা, মেজো-বৌমার গলায় অস্ত্রাঘাত, নবীনকালীর পলায়ন, ব্যাপারখানা কি?"

যজ্ঞেশ্বর উত্তর কোল্লে, "ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! আর একদণ্ডও এ বাড়ীতে থাকতে আমার ইচ্ছে নেই। কেবল বড়বাবুটীর মুখ চেয়ে আছি, কিন্তু আর সহ্য হয় না! পুণ্যের সংসারে পাপ প্রবেশ কোরেচে, আর মঙ্গল নেই!"

ভাবার্থ কিছুই বুঝতে না পেরে আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "চোর প্রবেশ কোরেছিল, দৌরাত্ম্য কোরে গিয়েছে, সংসারের অপরাধ কি?"

কপালে এক চাপড় মেরে যজ্ঞেশ্বর বোল্লে, "চোর এসেছিল না হাতী এসে-ছিল! ঘরের চোরেই সর্ব্বনাশ কোল্লে! সে সব কথা তোমার শুনে কাজ নেই! মেয়েটা যে কোথায় গেল, সেই কথাটাই বড় শক্ত!"

জানবার জন্য আমার আগ্রহ হয়েছিল, যজ্ঞেশ্বরের পরিতাপবাক্যে সেই আগ্রহের সঙ্গে সন্দেহ বেড়ে গেল ; বিশেষ নির্ব্বন্ধ জানিয়ে বার বার জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেম। চক্ষে জল এনে যজ্ঞেশ্বর শেষকালে বোল্লে, "পিসীমাকে কাটতে গিয়েছিল, তিনি হাত তুলে কাটারিখানা ধোত্তে গিয়েছিলেন, গলাটী বেঁচে গিয়েছে, প্রাণ বেঁচে গিয়েছে, আঙ্গুল পাঁচটী কেটে গিয়েচে ; মেজো-বৌকে কাটতে গিয়েছিল, ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা হয়েচে, গহনার উপর দিয়েই আপদ চুকেচে! সে সব যা হোক, ছুঁড়ীটা এ কি কোল্লে!"

আবার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লোকটা কে? মেয়েদের উপর আক্রোশ কেন? কার উপর তুমি সন্দেহ কর?"

পুনরায় মস্তকে করাঘাত কোরে যজ্ঞেশ্বর উত্তর কোল্লে, "সন্দেহ আবার কিসের? লোকটা আবার কে? ঘরের শত্রুই ঘর মজালে! প্রকাশ কোরো না এ কথা, এ সংসারে ভদ্রস্থ নেই! পৃথক হবি পৃথক হ, এ সব কেলেঙ্কার করা কেন বাপু? দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে এই সব ঢলাঢলি, একে কি আর জাত-কুল রক্ষা হবে? ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়েচে! প্রাণ পর্য্যন্ত টানাটানি!"

সাপে যেমন গর্জ্জন করে, সেই রকমে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে যজ্ঞেশ্বর আমার কাছ থেকে উঠে গেল; ভিতরের কথা কিছুই ভাঙলে না। আভাষেই আমি বুঝলেম, মেজোবাবুরই ঐ কর্ম্ম! নবীনকালীর নিরুদ্দেশের মূলও মেজোবাবু! বাপের সহোদরা ভগ্নীর কন্যা! কি ভয়ানক লোক!

মন বড় অস্থির হলো। রামশঙ্করের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। আর আমার এ বাড়ীতে থাকা হয় না; কোন দিন কি ঘটে, কোন দিন আমারে কে কি বলে, আমার উপরে মেজোবাবুর রাগ, কোন দিন আমার নামেই বা কি কলঙ্ক রটায়, মানে মানে এই বেলা প্রস্থান করাই ভাল।

কাশীর নাম পুণ্যক্ষেত্র, কাশীক্ষেত্রে এত পাপ! বাবা বিশ্বেশ্বর এ পাপের ভার কেমন কোরে সহ্য করেন? অনেক বাড়ীতেই অনেক গোল! রসিকবাবু-টীকে প্রথম প্রথম ভাল বোলে বোধ হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে জানতে পাল্লেম, তিনিও কম পাত্র নন! তাঁর স্ত্রীটীকে আমি দেখেছি, রসিকের চেয়ে তিনি বয়সে বড় ভেবেছিলেম, মেয়েমানুষ বেশী মোটা হোলে অলপবয়সেও বড় দেখায়, সেইজন্যই বুঝি ঐ রকম, তাই আমি ভেবেছিলেম, কিন্তু তা নয়, কাণা-ঘুষায় শুনেছি, সেই মোটা গৃহিণীটী রসিকবাবুর মাতুলানী! জননীর কনিষ্ঠ সহোদরের কুললক্ষ্মী! সে রকম রসিকবাবু কাশীধামে কত আছে, ঠিক করা যায় না। যার মুখে শুনেছিলেম, স্বদেশে যারা ছাগল ছিল, কাশীতে তারা বাবু, সেই লোকের কথাই ঠিক। সবগুলি ছাগল না হোক অনেকগুলি তাই-ই বটে!

কিছুই ভাল লাগলো না; তখন বেলা ছিল, মনের চাঞ্চল্যে একবার ছাদে গিয়ে উঠলেম। বেড়াচ্ছি, যে বাড়ীর ছাদে সৌদামিনী বেড়ায়, এক একবার সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, কেহই নাই। অন্য অন্য ছাদেও দুটী পাঁচটী রঙ্গিনী হাওয়া খাচ্ছিলো, দুবার আমি তাদের দিকে চাইলেম না, একবার চেয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরালেম। আর একবার উত্তরদিকে চেয়ে দেখি, সেই ছাদে সৌদামিনী। সে দিন সৌদামিনীর হাতে রুমাল ছিল না, রুমালের বদলে মস্ত একটা ফুলের তোড়া। আমি বেড়াচ্ছি মাথা হেঁট কোরেই বেড়াচ্ছি, হঠাৎ আমার মাথার উপর কি একটা জিনিস এসে উড়ে পোড়লো, মাথায় ঠেকেই আমার পশ্চাদ্ভাগে পায়ের কাছে পোড়ে গেল, চেয়ে দেখি ফুলের তোড়া! সৌদামিনীর হাতে যে তোড়াটা ছিল, সেই তোড়াই আমার পদতলে!

একবার মনে কোল্লেম, ছোঁবো না; আবার ভাবলেম, ফুলের তোড়ার কি দোষ? কটাক্ষে একবার সৌদামিনীর দিকে চাইলেম। সৌদামিনী তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ছাদের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। ভাবভঙ্গী

ভাল নয়, আর তখন ছাদে থাকা ভাল নয়, তাই ভেবে, ফুলের তোড়াটী হাতে কোরে নিয়ে, দ্রুতগতিতে ছাদ থেকে আমি নেমে এলেম। অন্তঃকরণ অস্থির হলো।

বৈঠকখানা নির্জ্জন, একধারে বোসে তোড়াটী আমি ভাল কোরে দেখতে লাগলেম। তিন বর্ণের ফুল ;—শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ ; ফুলগুলির নীচে নীচে সবুজবর্ণের ছোট ছোট পাতা। ফুলগুলি সুগন্ধ ; স্তবকে স্তবকে সজ্জাও সুন্দর। নাসিকাগ্রে ধীরে ধীরে সঞ্চালন কোরে কোরে ফুলগুলির সুগন্ধ আমি আঘ্রাণ কোচ্ছি, ফুলের ভিতর থেকে একখানি কাগজ বিছানার উপর সোরে পোড়লো ; কাগজখানা মণ্ডলাকারে মোড়ককরা।

অন্তরে কৌতূহল প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। মোড়কটী আমি খুল্লেম ; দেখলেম, মণ্ডলাকারে লেখা একখানি পত্রিকা ; অক্ষরগুলি গোলাপী ;—আলতার জলে সুচিত্রিত। স্বাক্ষর ছিল না ;—বেনামী পত্রিকা।

অনিচ্ছায় সেই পত্রিকাখানি আমি পাঠ কোল্লেম। সম্বোধন নাই। কে কারে লিখছে, দুই-ই অপ্রকাশ। প্রথমেই লেখা আছে, "তুমি কে ?"—তার পর লেখা আছে, "তোমারে আমি তিরস্কার করিতে পারি।"—তিরস্কার করিতে পারে, এমন কথা যে লেখে, যাকেই লিখুক, যেই লিখুক, যে পত্রিকার আরম্ভে তিরস্কার, সে পত্রিকা কোন প্রকার মন্দ অভিপ্রায়ে লিখিত নয়, সে লেখক অথবা লেখিকা মন্দভাব মনে রাখে না, এইটুকু আমার অনুমানে এলো ; কেবল অনুমান নয়, সিদ্ধান্তও সেই রকম দাঁড়ালো। পত্রিকাখানি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ কোল্লেম। লজ্জাকে অন্তরে রেখে আমি অনুরোধ করি, পাঠকমহাশয়ও পাঠ করুন।

"তুমি কে ? তোমারে আমি তিরস্কার করিতে পারি। কেন তুমি আমারে দেখা দাও ? আমার নয়নের পিপাসা পরিতৃপ্ত হইতে না হইতে কেন তুমি আমার নয়নপথ হইতে অন্তর হইয়া যাও ? তোমার চক্ষু আমারে কেন দগ্ধ করে ? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি ? কেন আমারে যন্ত্রণা দাও ? তুমি চোর ! কেন তুমি আমার হৃদয়গৃহে সিঁধ কাটিয়া প্রাণ চুরি করিয়াছ ? উত্তর দাও ; নতুবা আমি তোমারে উচিতমত শাস্তি দিব।"

আমার হাত কেঁপে উঠলো ; পত্রখানা আর আমি হাতে কোরে রাখতে পাল্লেম না বড়বাবুর বড় তাকিয়াটার উপরে ছুড়ে ফেলে দিলেম। আমারেই লিখেছে, সৌদামিনীই লিখেছে, তাতে আর সন্দেহ রাখতে পাল্লেম না। উত্তর চায় ; উত্তর না দিলে শাস্তি দিবে, এই ভয় দেখিয়ে রেখেছে। কথা বড় ভয়ানক ! করা যায় কি ? স্বাক্ষর নাই কার নামে কার কাছে উত্তর পাঠাই ? চিন্তা কোচ্ছি, কোথা থেকে বাতাসের সঙ্গে যেন একটা কণ্ঠস্বর এসে আমার কাণের কাছে উপদেশ দিলে, "উত্তর দাও, স্বাক্ষর চাও ; সে স্বাক্ষর তোমার একটা বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

উপস্থিত বুদ্ধির সহায়তায় সেই বাতাসবাণীর মর্ম্ম আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পাল্লেম। স্বাক্ষর যদি আসে, সেই স্বাক্ষরের আখ্যা হবে একটী সুশাণিত বাণ। সেই বাণে জয়হরি পক্ষী বিদ্ধ হবে ;—একবাণেই বিঁধে ফেলবো !

উত্তর দিব। কি উত্তর দিব? প্রেম-পত্রিকা। কখনো আমি প্রেম-পত্রিকা দেখি নাই; প্রেম-পত্রিকার কি রকম উত্তর দিতে হয়, তাও আমি শিখি নাই, তবু আমি উত্তর দিব। উত্তরে লিখবো কি?—কবি যেমন কল্পনার উপদেশে অনেক মিথ্যাকথাকে সত্য-সাজে সাজান, আমার কবিত্বশক্তি নাই, কল্পনা আমার কাছে আসবেন না, দয়া কোরে সদুপদেশ দিবেন না, তবু আমি অভীষ্ট-সিদ্ধির বাসনায় গুটীকতক মিথ্যাকথাকে সত্য-সাজে সাজাবো।

তখনো বেলা ছিল। বড়বাবু তখন আসবেন না, কুৎসিত কাব্যরচনায় আমার তখন বাধা হবে না, সেই ভরসায় তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম নিয়ে আমি বোসলেম। আলতার উত্তরে আলতা হোলেই হোতো ভাল, কিন্তু আলতা তখন দুর্লভ, সুতরাং কালীই আমার অবলম্বন; কালী দিয়েই আলতার উত্তর দিব। যা করেন মা কালী।

সুশিক্ষা নাই, কল্পনা নাই, প্রেমশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য নাই, সাদাকথায় উত্তর লিখলেম। দোষাংশ বিস্মৃত হয়ে, মিথ্যারচনার অপরাধ মার্জ্জনা কোরে, পাঠকমহাশয় আমার এই পত্রিকাখানিও একবার পাঠ করুন।

'আকাশের দেবতা অকস্মাৎ আমার হস্তে একটী ফুলের তোড়া প্রদান করিয়াছেন। ফুলের তোড়া আমার হস্তে একখানি প্রেম-পত্রিকা অর্পণ করিল। পত্রিকা পাঠ করিতে করিতে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিল, প্রেম-পুলকে ক্ষুদ্র-কলেবর রোমাঞ্চিত হইল, আজ আমি অকস্মাৎ প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিলাম। তুমি আমারে তিরস্কার করিয়াছ, সে তিরস্কার আমার ভাগ্যে পুরস্কার। তোমারে আমি দর্শন করি, জ্ঞান হয়, যেন নয়নপটে পূর্ণচন্দ্র। চন্দ্র যখন অদৃশ্য হন, আমার নয়নপথে তখন মেঘোদয় হয়; সেই মেঘে আমি দেখিতে পাই, একটী সৌদামিনী।—হাঁ, সৌদামিনী! তুমিই কি সেই সৌদামিনী? তাহা যদি হও, তবে তো তোমার মিথ্যা তিরস্কার। তোমার প্রাণ আমি চুরি করি নাই। চাঁদের প্রাণ চুরি করা যায় না, সৌদামিনীর প্রাণও চুরি করা যায় না। সৌদামিনী! আমার নাম তুমি জান না, আমার নাম হরিদাস; হরিযুক্ত আর একটী নাম তোমার প্রিয়; সর্ব্বদা সেই হরির জয় তুমি গাও। সন্ন্যাসীরা সেই জয়কে পরাজয় করিতে পারেন না। জয়কে যদি তুমি বিসর্জ্জন করিতে পার, পূর্ণাক্ষরে তোমার নিজের স্বাক্ষর করিয়া, জয়-পরাজয়ের সকল কথা যদি তুমি আমারে লিখিয়া জানাইতে পার, তাহা হইলে বিশ্বেশ্বর তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। দোহাই বিশ্বেশ্বর, সত্যকথা একটীও গোপন করিও না, গোপন করিলে গোপন থাকিবে না; বিশ্বেশ্বর অন্তর্যামী, সমস্ত তিনি জানিতে পারিতেছেন। কোন কথা যদি তুমি গোপন কর, তাহা হইলে ফুলের তোড়ার সেই পত্রখানি আমি তোমার বর্ত্তমান বণিক-স্বামীকে দেখাইব, বিশ্বেশ্বরের সন্ন্যাসিগণের হস্ত হইতে কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। সাবধান! এই পত্রের উত্তর লেখা হইলে এই পত্রখানি ভস্ম করিয়া ফেলিও। অদ্য আর অধিক লিখিলাম না, তোমার উত্তর প্রাপ্ত হইলে মনের কথা জানাইব।"

পত্রখানি আমি দুই তিনবার পাঠ কোল্লেম, মনে মনে হাসলেম, 'মনস্কামনা পূর্ণ কর' বোলে বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত কোল্লেম। পত্রিকা তো প্রস্তুত

হলো, পাঠাই কিরূপে? এখনো যদি সৌদামিনী সেইখানে থাকে, নিজেই দৌত্য নির্ব্বাহ কোরবো, এইরূপ স্থির কোরে, পত্রখানি সেই ফুলের তোড়ার মধ্যে রেখে, তোড়াটী হাতে কোরে নিয়ে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আবার আমি ছাদে উঠলেম।

সবাই জানে, সৌদামিনী চপলা, সৌদামিনী ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী অস্থিরা, কিন্তু আমি দেখলেম, সুস্থিরা সৌদামিনী। যেখানকার সৌদামিনী, চিত্র-প্রতিমার ন্যায় ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। মুখের দিকে না চেয়েই, ফুলের তোড়াটা দৌদামিনীর মস্তক লক্ষ্য কোরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, সৌদামিনী-গতিতে আমি ছুটে পালালেম, বৈঠকখানার দরজায় এসে নিশ্বাস ফেল্লেম।

পূর্ব্বে একটী কথা বোলতে ভুল হয়েছে। মির্জাপুরের যে বাবুটীর সঙ্গে আমি বিন্ধ্যাচল দর্শনে গিয়েছিলেম, বড়বাবুর দ্বারা অনুরোধ কোরিয়ে প্রাচীনা কামিনীর মাকে আমি সেই বাবুর বাড়ীতে রাখিয়ে দিয়েছি, তার জায়গায় সৌদামিনী আর একজন নূতন দাই * নিযুক্ত কোরেছে। জয়হরির সঙ্গে সৌদা-মিনীর এখন কি প্রকার ভাব, সেটা আমি জানতে পারি না, কুলকলঙ্কিনীদের ভাবভক্তি জানবারও কোন আবশ্যক ছিল না, বিধাতার বিধানসূত্রে, পাপী-লোকের দণ্ডবিধানের কল্পনায় অগত্যা আমি আজকাল সেই আবশ্যকতা অনু-ভব কোচ্ছি। প্রতীক্ষা—পরিণাম।

নূতন দাই আমার কাছে অপরিচিতা, চেহারা পর্য্যন্ত অচেনা, তার দ্বারা কোন প্রকার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। জয়হরিকে আমি দেখেছি ; যে বাড়ীতে সৌদামিনী সে বাড়ীতে দেখি নাই, যে বাড়ীতে দেখা, পাঠকমহাশয় ইতি-পূর্ব্বে সেটী জানতে পেরেছেন। জয়হরিকে এখন আমার প্রয়োজনও হোচ্ছে না ; জয়হরির সঙ্গে সৌদামিনীর পূর্ব্বসম্বন্ধ ঠিক আছে কি না, সেইটুকু জানাই এখন আমার দরকার। সৌদামিনীর পত্রের উত্তর দিয়েছি, তদুত্তরে নূতনকথা কি কি জানতে পারি, সে উত্তরে জয়হরির নামের কোন উল্লেখ থাকে কি না, সে উল্লেখে জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আমি কিছু বুঝতে পারি কি না, এইবার জানা যাবে। সৌদামিনী আমার পত্রের উত্তর দিবে কি না, সেটাও একটা সংশয়ের কথা। প্রথমপত্রের আভাষ যে প্রকার, তাতে বোধ হয়, নিশ্চয়ই উত্তর পাওয়া যাবে। উদ্বিগ্নচিত্তে আমি সেই উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকলেম।

কাশীর বাসীন্দা কত, উপনিবেশী কত, সাময়িক যাত্রীসংখ্যাই বা কত, সেগুলি নিরূপণ করা আমার মত বালকের অসাধ্য। অনেক দেশের লোক কাশীতে আসে, কাশীতে থাকে, কাশীতে আছে, এ কথা আমি শুনেছি, রকম রকম লোক স্বচক্ষেও আমি দেখেছি, দর্শনে মনে হয়, খোট্টাই বেশী ; কিন্তু বাঙ্গালীর সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প, এমনটী মনে করা যায় না ; দিন দিন আরো বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে আসছে ; সংখ্যায় অধিক না হোলে বাঙ্গালীটোলা নামে স্বতন্ত্র একটা স্থান থাকতো না। হায় হায়! আমি বাঙ্গালী, কাশীধামের আমদানী বাঙ্গালীপরিবারের কলঙ্কের কথা শুনে

* পশ্চিম অঞ্চলে দাসীগুলিকে দাই কহে।

আমার প্রাণে বেদনা হয়। কাশীতে যাঁরা ভাল আছেন, বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তাঁরা সুখে থাকুন, যারা যারা ভ্রষ্টাচার হয়ে পড়েছে অথবা স্বদেশে ভ্রষ্টাচার হয়ে বিশ্বেশ্বরধামে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের ভাগ্যে যে কি আছে, তাদের দশা যে কি হবে, সেই ভাবনা আমার মনে নিরন্তর।

রবিবার না হোলে ছাদে উঠতে আমার ইচ্ছা হয় না, অবসর হয় না, ভরসাও হয় না। সৌদামিনীর পত্রের উত্তর প্রদান কোরে সাতদিন আমারে চিন্তাযুক্ত থাকতে হলো। এই সাতদিনের মধ্যে আরো কত কি নূতন নূতন কাণ্ড আমি দেখলেম, কত কি শুনলেম, সংস্রবশূন্য বিবেচনায় সে সকল কথা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন মনে কোল্লেম। মোহনলালবাবু কাশী থেকে চোলে গিয়েছেন, এই কথাই আমি জানতেম, কিন্তু এই সাতদিনের মধ্যে একদিন তাঁরে আমি মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে দেখেছি। ভ্রূপর্য্যন্ত পাগড়ীবাঁধা জমাট কৃষ্ণবর্ণ গুণ্ডাধরণের একটা লোকের সঙ্গে গঙ্গাতীরে তিনি বেড়াচ্ছিলেন ; দেখে আমার ভয় হয়েছে। কেবল তাঁরে দেখে ভয় নয়, ভয়ের কারণ আরো আছে। তিনি যখন কাশীতে আছেন, তখন বোধ হয়, রক্তদন্তটাও কাশীছাড়া হয় নাই। চিঠিখানা ভস্ম হয়ে গিয়েছে, মোহনবাবু আমার উপর জাতক্রোধ হয়েছেন, মোহনবাবুর বেতনভোগী গুণ্ডা সেই রক্তদন্ত ; যদিও ইতিমধ্যে রক্তদন্তকে আর আমি দেখি নাই, কিন্তু হয় তো রক্তদন্ত কাশীতেই আছে ; আমারে দেখতে পেলে সে আর আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কোরবে না ; যে পত্রের ভরসায় সেই রাক্ষসের হাতে আমি একটু দয়ার আশা কোরেছিলেম, আগুনে দগ্ধ হয়ে সেই পত্র এখন বিপরীত ফল প্রসব কোচ্ছে ! একজন সন্ন্যাসী আমাকে বোলেছিলেন, পর্ব্বতারণ্যে এমন একপ্রকার ফল আছে, সে ফল ভক্ষণ কোল্লে সপ্তাহকাল ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না, কিন্তু অগ্নি-সংস্পর্শে সেই ফল বিষতুল্য হয়। মোহন-বাবুর লিখিত সেই স্বাক্ষরশূন্য পত্রখানি আমার পক্ষে অনুকূল হয়েছিল, অগ্নি-সংস্পর্শে বিষতুল্য হয়ে উঠেছে ! আর আমার বেশীদিন কাশীধামে থাকা হবে না। একস্থানে নিরাপদে বাস আমার ভাগ্যলিপির মর্ম্ম নয় ; সংসারে নানাস্থানী করবার অভিপ্রায়েই যেন বিধাতা আমারে সৃজন কোরেছেন, ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে আবর্ত্তনে এইরূপ সিদ্ধান্তই যেন আমার মনে আসে। কাশী ছেড়ে আমাকে পালাতে হলো। পালাবো, কিন্তু জয়হরির মহাপাপের একটা হেস্ত-নেস্ত করবার উপায় না কোরে পালাতে আমার মন চায় না। দেখি, সৌদামিনী কিরূপ উত্তর দেয়।

আর কোন নূতনলোকের সঙ্গে আমি আলাপ করি না, কার্য্যালয় ছাড়া আর কোন স্থানে আমি যাই না ; বড়বাবুর সঙ্গে যাই, বড়বাবুর সঙ্গেই ঘরে আসি, ভয়ে ভয়ে পথের চারিদিকে চোমকে চোমকে চাইতে চাইতে যাই আসি ; এই ভাবেই দিন যায়। বাড়ীতেও নির্ভয়ে থাকি না ; মেজোবাবু যে রকম কাণ্ড আরম্ভ কোরেছেন, কখন কি ঘটে, কখন কি বিপদ উপস্থিত হয়, সেই ভয়ে আমি কাঁপি। আমার উপর মেজোবাবুর বড় রাগ, কোন দিন কোন কৌশলে আমারে তিনি কোন বিপদে ফেলেন, সর্ব্বক্ষণ সে ভয়টাও আমার মনে জাগে। এ বাড়ীতেও আমি আর নিরাপদ নই।

সাতদিন অতীত। রবিবার আগত। সূর্য্যদেব আকাশে থাকতে থাকতেই আমি ছাদে। সৌদামিনীর স্থানে সৌদামিনী নাই। অন্যমনস্ক হয়ে ছাদের উপর আমি বেড়াচ্ছি, এক একবার সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, সৌদামিনী এলো না। মনে কোল্লেম, আমার চিঠি পেয়ে রাগ কোরেছে, আসবে না, পত্রের উত্তরও দিবে না।

ভাবছি, এমন সময় দেখি, আমাদের ছাদের সিঁড়ির কাছে একটী গোলক ; বেশ চিত্রবিচিত্র করা, সুডৌল অতিসুন্দর একটী গোলক। দ্রুত সেই দিকে অগ্রসর হয়ে, কৌতুহল-কৌতুকে সেই গোলকটী আমি হাতে কোরে নিয়েই দ্রুত গতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেম ; বৈঠকখানায় এসে বোসলেম। কেহ কোথাও নাই। দিব্য সুবিধা। সাবধানে—সন্তর্পণে গোলকটীর মাঝামাঝি দু-খানা কোরে ভাঙলেম। ঠিক তাই। গোলকের গর্ভেই গুপ্তলিপি। বঙ্গ-মহি-লারা যেমন গুপ্তধনের ব্রত করে, সন্দেশের মধ্যে, চন্দ্রপুলির গর্ভে যেমন সিকি, আধুলি, টাকা রেখে ব্রাহ্মণকে দান করে, এ কৌশলটীও ঠিক সেই-রূপ ;—গোলকের গর্ভে গুপ্তলিপি। রক্তবর্ণ পত্রিকা, কৃষ্ণবর্ণ অক্ষর। মোড়ক খুলে সেই গুপ্তলিপি আমি পাঠ কোল্লেম। মূলপত্রিকা আর উত্তরপত্রিকা পাঠকমহাশয় দর্শন কোরেছেন, তৃতীয়বারের এই প্রত্যুত্তরপত্রিকাখানিও দর্শন করুন।

"হরিদাস! তোমার নাম হরিদাস? হা হা, নামটী বড়ই মিষ্ট লাগিল, বড়ই তুষ্ট করিল। তোমার সুললিত পত্রখানি আমি পাঠ করিলাম। তিনবার পাঠ করিয়াছি। তিনবার সেই পত্রের উপর অশ্রুপাত করিয়াছি। তুমি বুঝি মনে করিতেছ, পত্র পাঠ করিয়া আমি কাঁদিয়াছি?—না হরিদাস! আমি কাঁদি নাই, আমার সে অশ্রু রোদনের অশ্রু নয়,—আনন্দের অশ্রু, প্রেমানন্দের অশ্রু-ধারা!

হরিদাস! তুমি কেবল রবিবারে একটীবার মাত্র আমারে দেখা দাও। রবি-দেব শীঘ্র শীঘ্র অস্তাচলে চলিয়া যান, আর আমি তোমারে দেখিতে পাই না! কেন হরিদাস, অন্যদিন কি তুমি আমারে দেখা দিতে পার না? কেন পার না? দিও,—এখন অবধি সকল বারেই এক একবার তুমি আমারে দেখা দিও।—

দিও দেখা, প্রাণসখা, এ মম মিনতি।

হরিদাস! বড় আশ্চর্য্য কথা! তুমি আমার নাম জান! বিধাতার অনু-গ্রহ। বড় আশ্চর্য্য কথা! আমার ভাগ্যের অনেক কথাই তুমি জান! বয়স তোমার অল্প, কিন্তু কাব্যালঙ্কারে তুমি অলঙ্কৃত। পিতৃগৃহে অনেকদিন আমি রামেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নিকটে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, কি বলিব, কাব্যশাস্ত্রে তোমার যেমন অধিকার, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়েরও ততদূর অধি-কার ছিল না। রূপকে রূপকে জয়পরাজয়ের ধুয়া ধরিয়া আমার উপর তুমি যেরূপ শ্লেষবাণ সন্ধান করিয়াছ, তাহা পাঠ করিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি! ভয় নাই হরিদাস, ভয় নাই! সে পাপ আমি বিদায় করিয়া দিয়াছি। অজ্ঞানে

আমি সেই পাপিষ্ঠের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলাম, তাহার স্বভাবচরিত্র অগ্রে আমি জানিতে পারি নাই। তুমি সন্ন্যাসীর কথা তুলিয়াছ, সন্ন্যাসীরা অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, পুলিশের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ হইয়াছে, এ কথা আমিও শুনিয়াছি। আমার প্রাণে ভয় হইয়াছে। জয়হরি যখন আমারে কাশীতে লইয়া আসিবার মন্ত্রণা করে, তখন শীঘ্র আমি সম্মত হই নাই; শেষকালে জয়হরি আমারে ভয় দেখায়। আমার ঘরে সন্ন্যাসীর মাথা কাটা, আমি কলিকাতায় থাকিলে পুলিশের হাতে ধরা পড়িব, মহা বিপদ ঘটিবে, এই প্রকার নানা কথা। সে সকল কথা আমি পত্রে লিখিয়া জানাইতে ভয় করি ; তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা বলিব।

জয়হরির কথায় ভয় পাইয়া তাহার সঙ্গে আমি কাশীতে আসিয়াছিলাম। এখানে আনিয়া জয়হরি আমাকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল, প্রতারণা খেলিতে লাগিল। এখানে না কি অনেক রকম বাইজী থাকে, তাহাদের পাঁচ-জনের সঙ্গে জয়হরি মিলিয়া গেল ; সকল দিন তাহারে আমি দেখিতে পাই-তাম না ; এক একরাত্রে মদ খাইয়া আসিয়া আমাকে প্রহার করিত ; 'তুই সেই সন্ন্যাসীটাকে কাটিয়া ফেলিয়াছিস, পুলিশ তোরে ধরিতে আসিতেছে,' এই সব কথা বলিয়া কতই হাঙ্গামা করিত। আমার বাপের বাড়ীর এক দাসী আমার সঙ্গে ছিল. আমার আদেশে সন্ধানে সন্ধানে থাকিয়া সেই দাসী জানিয়া আসিয়া-ছিল, একটা বাইজীর নাম চন্দ্রকলা। আমি সেই চন্দ্রকলাকে একদিন বাড়ীতে আনাইয়াছিলাম, চন্দ্রকলা আমার সাক্ষাতে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে, দেখা হইলে সে সব কথাও আমি তোমাকে বলিব। রমাইসন্ন্যাসীকে খুন করিয়াছে কে? সে কথা কেবল আমি জানি আর আমার সেই দাসীটী জানে ; আর কেহ জানে না। সেই দাসী এখন এখান হইতে পলাইয়া গিয়াছে ; কোথায় গিয়াছে, তাহা আমি জানি না। তুমি এখন জানিয়া রাখ, খুন করিয়াছে, জয়হরি বড়াল। নিজে খুন করিয়া আমাকে ফাঁসাইতে চায়, বড় ভয়ানক লোক, ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আমি তাড়াইয়া দিয়াছি। পাপকর্ম্মের কি ফল, তাহা এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

বাবা বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করি, মা অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করি, দিনপতি সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি, মনের কপাট খুলিয়া অকপটে আমি বলিতেছি, আর আমার পাপকর্ম্মে মতি নাই। প্রথম পত্রে তোমারে আমি যে সব কথা লিখিয়াছিলাম, সে সব কেবল তোমার মন-পরীক্ষার জন্য ; বাস্তবিক একজন পুরুষমানুষের সহায়তা না পাইলে, দুষ্টলোককে দমন করিবার উপায় করা যায় না, সেইজন্য তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আমার অভিলাষ। বিদেশে আসিয়াছি, অপরপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দোষের কথা ; অনুতাপ আসিয়াছে বালক-বুদ্ধিতে লোভে পড়িয়া যদি তুমি দেখা দাও, সেই জন্যই সেই সব কথা আমার লেখা। কোন সন্দেহ করিও না, সত্য বলিতেছি হরিদাস! পাপকর্ম্মে আমার আর মতি নাই ; কোন সন্দেহ করিও না ; একটীবার দেখা দিও। পাপের ফল আমি বিলক্ষণ ভোগ করিয়াছি ; জয়হরি বড়াল আপনার পাপের ফল ভোগ করে, এখন কেবল আমার এই ইচ্ছা। তুমি

বুঝিয়াছিলে, আমার প্রথম-পত্রখানি প্রেম-পত্রিকা ; সত্যই সেই রকম ভাব। আমার হাসি পায়। তোমার মুখ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তোমার চরিত্র নির্ম্মল, কোন প্রকার ছলের কুহকে তুমি ভুলিবে না, তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম, কেবল পরীক্ষার জন্যই প্রেম-ভাবের কথাগুলি রচনা করিয়াছিলাম। সে সব কিছুই নহে, সে সব তুমি ভুলিয়া যাও ; একটীবার দেখা দিও, দুষ্টশাসনের পরামর্শ করিব। আবার আমি বলিতেছি, পাপকর্ম্মে আমার আর মতি নাই ; মায়ের পেটের ভাই যেমন স্নেহের সামগ্রী, সেই ভাবে তোমাকে আমি বিশুদ্ধ স্নেহদৃষ্টিতে দর্শন করি। আর বেশী কি লিখিব ? এ কথার উপর আর কি কোন সন্দেহের কথা আছে ? আর কি আমার উপর তোমার কোন প্রকার সন্দেহ আসিতে পারে ? কোন সন্দেহ রাখিও না, একটী-বার দেখা দিও। এই বাড়ীতে আসিতে যদি ইচ্ছা কর, যখন ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে আসিও ; এ বাড়ীতে আসিতে যদি সাহস না হয়, কোথায় দেখা হইবে, লিখিয়া জানাইও, দাসী সঙ্গে করিয়া আমি সেইখানেই যাইব।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।"

বাহবা—বাহবা! চমৎকার দলীল আমার হস্তে! সর্ব্ববিধির বিধাতা, সর্ব্বনিয়মের নিয়ন্তা, সর্ব্বকার্য্যের ফলদাতা, সর্ব্বপাপের সাক্ষী-শাস্তা, সর্ব্বময় মহাপুরুষ যিনি, তাঁহারে নমস্কার, জয়হরি বড়ালের দণ্ডবিধানের চমৎকার দলীল আমার হস্তে !

সৌদামিনী দেখা কোত্তে চায়। আছে কি দেখা করার প্রয়োজন ?—হানিই বা কি ? পত্রিকা বলে, পাপকর্ম্মে আর মতি নাই। অনুতাপিনী পাপিনীর সঙ্গে দেখা করাতে দোষ কি ? দেখা না কোল্লেও আসল কাজের কোন বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না। দুটী সাক্ষী মিলে গেল। দুজনেই প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এক সাক্ষী কামিনীর মা, এক সাক্ষী সৌদামিনী। উত্তম জোগাড় হয়েছে। যত্ন কোরে পত্রখানি আমি আপনার কাছেই রাখলেম, গবাক্ষপথ দিয়ে ভগ্নগোলকের খণ্ড-দুখানি রাস্তায় ফেলে দিলেম ; ঘরে আর কোন চিহ্নই থাকলো না। আমি একপ্রকার নিশ্চিন্ত হোলেম।

দুদিন গেল। সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা কোল্লেম না, পত্রের উত্তরও দিলেম না। এদিকে আমাদের মেজোবাবুটী অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ। চারি পাঁচদিন মেজোবাবু বাসাছাড়া ; কর্ম্মস্থলেও থাকেন না, বাসাতেও না। কেহই আর তাঁর দেখা পান না। কোথায় গিয়েছেন, কেহই কিছুই জানে না, কেহই কিছু বলে না।

বড়বাবু মহা উদ্বিগ্ন। এ উদ্বেগের অপেক্ষা নবীনকালীর নিরুদ্দেশের উদ্বেগটা আরও অধিক। নবীনকালী যুবতী, নবীনকালী বিধবা, রাত্রিকালে অদৃশ্য, উদ্বেগটা অধিক হবারই কথা। বাড়ীর সকলেই দুর্ভাবনায় ব্যাকুল। সকলেরই বদন বিষণ্ণ, কারো মুখে হাসি নাই, দুই একটী কথা ভিন্ন কারো মুখে বেশীকথা নাই, কারো মনে স্ফূর্ত্তি নাই, বাড়ী যেন বিষাদ-মেঘে সমা-

চ্ছন্ন। বড়বাবুর আফিসে যাওয়া বন্ধ হয় না, আমিও তাঁর সঙ্গে দস্তুরমত আফিসে যাই, নামমাত্র কাজকর্ম্ম করি, মন কিন্তু সর্ব্বদাই চঞ্চল। একদিন বড়বাবু সকাল সকাল কাজকর্ম্ম সমাধা কোরে চোলে এসেছেন, বাড়ী আসবার সময় আমি একা। আসছি, রাস্তার ধারে সারি সারি গোটাকতক গাছ। তখনো রৌদ্র ছিল, গাছের ছায়ায় ছায়ায় মৃদুগতিতে আমি চোলে আসছি, অন্য কোন দিকেই দৃষ্টি রাখছি না। দিনকতক আমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক। কেন অন্য-মনস্ক, এ প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে হবে না ; সাংসারিক ঘটনাবলী যাঁরা জানেন, তাঁরা সকলেই আমার মনের ভাব বুঝতে পাচ্ছেন। আসছি, অনেক দূর এসেছি, এক জায়গায় হঠাৎ আট দশজন লোক কি একটা পদার্থকে বেষ্টন কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হা-হুতাশ কোচ্ছে, একটু তফাৎ থেকে আমি দেখলেম। মনের ভিতর আতঙ্কই থাকুক, দুর্ভাবনাই থাকুক অথবা একটু স্ফূর্ত্তিই থাকুক, ঘটনার তত্ত্ব অন্বেষণ করবার ইচ্ছাটা আমার সর্ব্বদাই বলবতী থাকে ;—লোকেরা কেন সে রকম হা-হুতাশ কোচ্ছিল, জানবার জন্য পায়ে পায়ে সেই দিকে আমি অগ্র-সর হোলেম ; নিকটে গিয়ে দেখলেম, পদার্থটা নির্জীব নয়, একটা মানুষ ; —ঘাসের উপর চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পোড়ে আছে, দুজন লোক দুপাশে বোসে শুশ্রূষা কোচ্ছে ;—একজন বাতাস দিচ্ছে, আর একজন জল ঢালছে। মানুষটা অজ্ঞান। তখনো পর্য্যন্ত আমি তার চেহারাটা ভাল কোরে দেখতে পাই নাই, একজনকে জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, পথে চোলতে চোলতে অকস্মাৎ পোড়ে গিয়েছে, পোড়েই মূর্চ্ছা গিয়েছে, মুখ দিয়ে গাঁজা ভাঙছে, অস্পন্দ, অসাড় ; —জ্ঞান নাই, কিন্তু প্রাণ আছে। কেহ বোলছে মৃগীরোগ, কেহ বোলছে সর্পাঘাত, কেহ বোলছে সর্দ্দিগর্ম্মি। সম্মুখের দুজন লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে আমি দেখলেম, কি ব্যাপার। দেখেই অমনি পেছিয়ে দাঁড়া-লেম, আতঙ্কে শিউরে উঠলেম, আর সেখানে দাঁড়ালেম না ;—ধীরে ধীরে চোলছিলেম, ছুট দিলেম ; ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে উঠলেম ;—শীত এলো ;—শীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো ;—তথাপি ছুটছি ; কাঁপছি আর ছুটছি ;—পশ্চাদ্দিকে আর চেয়ে দেখছি না। কেন এত ভয় ? মানুষটা অজ্ঞান হয়ে পোড়ে আছে, তাই দেখেই কি আমি ভয় পেলেম ?—তা নয় ; মুখ দিয়ে গাঁজা ভাঙছে ! মোরবে না কি ?—মরে তো ভাল হয়। এখনি যদি মরে, মরার ভয়ে কি ভয় পেলেম ?—তাও নয়। তবে কি ? লোকটা কে ?—লোকটা সেই আমার বিভীষিকা রক্তদন্ত !—এ পাপটা এখনো কাশীতে আছে ! তবে তো আমার রক্ষা নাই, মোহনবাবুর নূতন রাগ,—এ লোক যদি বাঁচে, এবারে আর কোনো প্রকারেই রক্ষা নাই ! তাই ভেবেই আমার ভয়, তাই ভেবেই আমি ছুটে পালাচ্ছি ;—অস্পন্দ অসাড়, এখনি ছুটে এসে আমাকে ধোত্তে পারবে না, তবুও আমি ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছি। দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বাড়ীতে এসে পৌঁছিলেম।

বড়বাবু তখনো বাড়ীতে আসেন নাই। বৈঠকখানায় প্রবেশ কোরে, খানিক-ক্ষণ পাখার বাতাস খেয়ে, একটু সুস্থ হয়ে, কাপড় ছেড়ে, ভিতরদিকের বারান্দায় গিয়ে আমি দাঁড়ালেম ; আবার তখনি তখনি ঘরে ফিরে এলেম ;

আবার বারান্দায় গেলেম, আবার ফিরে এসে ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। বুকের ভিতর ভয়ের সঙ্গে চিন্তাতরঙ্গের খেলা। রক্তদন্ত কাশীতে আছে! হয় তো চোলে গিয়েছিল, মোহনবাবু হয় তো চিঠি লিখে আবার ওটাকে এখানে আনিয়েছেন। মরে তো ভালই হয়; বাঁচে যদি, তবে আর এবার আমার নিস্তার থাকবে না। মরুক, বাঁচুক, যা-ই হোক, আমি আর কাশীতে থাকবো না। বড়বাবুর সঙ্গে দেখা না হোলেও আজিই আমি পালাবো!

সঙ্কল্প স্থির। দোয়াত, কলম, কাগজ সম্মুখে এনে ব্যগ্রহস্তে দুখানা চিঠি লিখলেম; একখানা পুলিশের নামে, একখানা বড়বাবুর নামে। পুলিশের চিঠিখানা আমার কাছেই থাকলো, বড়বাবুর চিঠিখানা বিছানার উপর তাকিয়ার নীচে রাখলেম। পুলিশে লিখলেম, কলিকাতার বিশ্বেশ্বরবাবুর বাড়ীর সন্ন্যাসী-হত্যার কথা, হত্যাকারী জয়হরি বড়ালের সন্ধানের কথা, সৌদামিনীর ঠিকানার কথা, কামিনীর মার মনিববাড়ীর কথা। এই সকল কথার আনুসঙ্গিক যে যে কথা লেখা আবশ্যক, সংক্ষেপে সংক্ষেপে সে কথাগুলিও লিখলেম; সৌদামিনীর দ্বিতীয় চিঠিখানার নকলও পুলিশের চিঠির খামের মধ্যে রেখে দিলেম। বড়বাবুর চিঠিতে লিখলেমঃ—

"মহাশয়!

আপনার দয়ার আশ্রয়ে আমি পরমসুখে ছিলাম, বিধাতা বাদ সাধিলেন। আর আমি কাশীতে থাকিতে পারিলাম না। অকারণে আমার কতকগুলা শত্রু কাশীতে আসিয়াছে, রাস্তার ধারে অদ্য আমি একজনকে দেখিয়া আসিয়াছি, সে লোক অতি ভয়ঙ্কর, তাহার কবলে পড়িলেই আমার প্রাণ যাইবে; অতএব আমি অদ্যই কাশীধাম পরিত্যাগ করিলাম, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ভগবান বিশ্বেশ্বর আপনার পরিবারবর্গের মঙ্গলবিধান করুন। আমার শুভদিন সমাগত হইলে পুনরায় মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব। অদ্য বিদায় হইলাম।

আশ্রিত
শ্রীহরিদাস।"

চিঠি-দুখানি লেখা হোলে একবার আমি অন্দরমহলে প্রবেশ কোল্লেম। রমেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠা পত্নীকে বোল্লেম, মা! আপনার কাছে আমার যে টাকাগুলি গচ্ছিত আছে, হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজন, দয়া কোরে সেইগুলি আমারে প্রদান করুন। কি প্রয়োজন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জিজ্ঞাসা না কোরে স্নেহময়ী দয়াবতী তৎক্ষণাৎ আপনার বাক্স খুলে আমার টাকাগুলি আমার হাতে দিলেন, তাঁরে প্রণাম কোরে আমি বাহির হয়ে এলেম। এইখানে বলা উচিত, আমার বেতনের টাকাগুলি মাসে মাসে গৃহিণীর কাছেই আমি জমা রাখতেম, আমি চাইতেম না, তথাপি মাসে মাসে আমার নিজ খরচের নাম কোরে কিছু কিছু তিনি আমারে দিতেন, সেইগুলি আমি নিজের কাছে রাখতেম।

বন্দোবস্ত ঠিকঠাক। কার্য্যান্তরে যজ্ঞেশ্বরও সে সময়ে কোথায় গিয়েছিল, যজ্ঞেশ্বরের কাছেও বিদায় লওয়া হলো না, ঠিক গোধূলিলগ্নে সজলনয়নে সেই সুখাশ্রম থেকে আমি বেরুলেম। পুলিশের চিঠিখানি কাশী-পুলিশের ঠিকানায় নিজেই আমি ডাকঘরের ডাকবাক্সে দিলেম। চিঠিতে আমি নাম স্বাক্ষর করি নাই, সৌদামিনীর চিঠির স্থানে স্থানে আমার নাম লেখা ছিল, নকলে সেগুলি আমি বাদ দিয়েছিলেম। সৌদামিনীর আসল চিঠি আমার কাছেই থাকলো। পুলিশের চিঠিখানি বেনামী।

উদ্দেশে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম কোরে কাশীর গঙ্গায় আমি নৌকা আরোহণ কোল্লেম। কাশীতে আমার স্থান হলো না। কত লোক কাশীতে আছে, অন্নপূর্ণা সকল লোককেই অন্ন দেন, সকলেই নিরাপদে থাকে, আমি নিরাপদে কাশীধামে স্থান পেলেম না। কালভৈরব আমারে তাড়ালেন না, কর্ম্ম-দোষে যারা পাতকী, কালভৈরব সেই সকল পাতকীলোককেই তাড়ান ; আমার কর্ম্মদোষ ছিল না, কালভৈরব আমাকে তাড়ালেন না, দুরাচার, নিষ্ঠুর, পিশাচ রক্তদন্তই আমার ভাগ্যে কালভৈরব !

বিংশ কল্প

নূতন বন্ধু ;—কামরূপদর্শন

নৌকায় আরোহণ কোল্লেম। ভাগীরথী আপন মনে উত্তরমুখে ছুটেছেন, মহাবিপদে আমি নিপতিত, কাতর-হৃদয়ে আমার অবস্থার কথা তাঁরে আমি জানালেম। ভাগীরথীর দ্রব-হৃদয় আমার দুঃখে আর অধিক দ্রবীভূত হলো না, আমার কাতরবচনে দ্রবময়ী দেবী কিছুই উত্তর দিলেন না, আপন বেগে আপনিই নেচে নেচে আপন পথে চোলে যেতে লাগলেন। আমি এখন যাই কোথা ? মাঝীকে বোলেছিলেম, প্রয়াগে যাব। নৌকায় বোসে বোসে ভাবলেম, প্রয়াগে হয় তো মোহনলালবাবু আছেন, সেখানে গেলে হয় তো আমি তাঁর চক্ষে পোড়বো, আবার একটা নূতন বিপদ উপস্থিত হবে। বাতাস তখন উত্তরদিকে ফিরেছিল ; মলয়পর্ব্বতের বাতাস, সুখীজনের সুস্থ শরীরকে সুশীতল করে, আমার পক্ষে মলয়ানিল সুখপ্রদ বোধ হলো না ; কেন না, আমি অসুখী। বাতাসের দয়া আছে। আমি অসুখী হোলেও পবন যেন আমার কাণে কাণে পরামর্শ দিলেন, "তুমি প্রয়াগতীর্থে যাও ; যে লোকের ভয়ে তোমার মন বিচলিত হোচ্ছে, সে লোক এখন প্রয়াগে নাই, বাঙলাদেশে চোলে গিয়েছে।"

বাতাসের কথায় আমি ভরসা পেলেম ; মনেও প্রত্যয় জন্মিল, ঐ কথাই ঠিক। কাশীর বাইজীকে সহচরী কোরে মোহনলালবাবু স্বদেশেই ফিরে গিয়েছেন ; যদিও নিজদেশে নিজবাড়ীতে না গিয়ে থাকেন, সহচরী-সঙ্গে সখের রাজধানী কলিকাতায় গিয়েছেন, এইটীই সম্ভব ; প্রয়াগে নাই। তবে আমি

প্রয়াগেই যাব। কর্ণধারকে পূর্ব্বে সেইরূপ উপদেশ দেওয়াই ছিল, যথাসময়ে প্রয়াগের ঘাটে নৌকা পোঁছিল, আমি অবতীর্ণ হোলেম। প্রয়াগ একটী পুণ্য-তীর্থ : গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সংগম। গঙ্গাজল শ্বেতবর্ণ, যমুনার জল নীলবর্ণ। গঙ্গায় জোয়ারভাটা নাই, শুদ্ধ সময়ে সময়ে জলের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। যমুনা সর্ব্বদা সমভাব। যমুনাতীরে কেল্লা। একজন পাণ্ডা আমারে অধিকার কোরেছিল, তার সঙ্গে আমি দর্শনীয় পদার্থগুলি দর্শন কোল্লেম। মন্দির অনেক। মন্দিরগুলি স্তম্ভে স্তম্ভে খিলানকরা, দেখতে অতি সুন্দর। কেল্লার নিকটে প্রকাণ্ড মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তি : স্কন্ধে রাম-লক্ষ্মণ, করতলে দুটী পর্ব্বত। কেল্লার ভিতর গহ্বরমধ্যে অক্ষয়বট। অন্ধকার গহ্বরে আমি অক্ষয়-বট দর্শন কোল্লেম। পত্রগুলি শ্বেতবর্ণ। তার পর অপরাপর দেবদেবী-দর্শনে। সঙ্গমের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অনন্ত-নাগের প্রতিমূর্ত্তি ; অনন্ত-নাগের সহস্র ফণা। নিকটে ভরদ্বাজমুনির আশ্রম ; আশ্রমের অদূরে বড় বড় উদ্যানমধ্যে অনেক সাধুপুরুষ বাস করেন। প্রয়াগধাম অতি পবিত্র। মুসল-মান-রাজার আমলে প্রয়াগের নাম হয়েছে এলাহাবাদ।

আমার সঙ্গে অতি অল্পই টাকা ছিল, সামান্য একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে তিনদিন তিনরাত্রি আমি প্রয়াগবাস কোল্লেম। প্রয়াগে অনেকে মস্তকমুণ্ডন করে, আমি কিন্তু কোন নাপিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম না। আমার শুনা ছিল, তীর্থে তীর্থে বিস্তর বদমাসলোক থাকে : একটা জুয়াচোরের পাল্লায় আমি পোড়েছিলেম, সঙ্গে অধিক টাকা ছিল না, সেইটী জানতে পেরে জুয়া-চোরটা আমারে অল্পে অল্পে ছেড়ে দিয়েছিল।

টাকার অভাব, সঙ্গে কেহ নাই, প্রয়াগ থেকে কোথা যাব, সেই তিনদিন কেবল আমি সেই চিন্তাই কোরেছিলেম। চিন্তায় কোন ফল হয় নাই, দৈবানু-গ্রহে একটী শুভসংযোগ সংঘটিত। তৃতীয়রজনী-অবসানে চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে আমি সঙ্গমঘাটে স্নান কোত্তে গিয়েছি, অনেক লোক সেই ঘাটে স্নান কোচ্ছিলেন, সকলেই আমার চক্ষে নূতন। আমি যখন স্নান কোরে উঠ-লেম, সেই সময় একটী ভদ্রলোক আমার দিকে চাইতে চাইতে নিকটে এসে উপ-স্থিত হোলেন। বাঙালী ভদ্রলোক : লোকটীর চেহারা দিব্য সুন্দর ; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গঠন কিছু দীর্ঘ, বেশী মোটাও নয়, নিতান্ত কাহিলও নয়, মুখ-খানি প্রসন্ন ; কণ্ঠদেশে সোণার তারে গাঁথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষমালা, দক্ষিণ-বাহুতে স্বর্ণনির্ম্মিত একখানি ইষ্টকবচ ; বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। সঙ্গে একটী লোক ; চেহারায় আর পরিচ্ছদে বোধ হলো চাকর।

ভদ্রলোকটী খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে, কি জানি কি ভেবে, মিষ্টবচনে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "প্রয়াগেই কি তুমি থাকো ?"

ভয়ই থাক, ভাবনাই থাক, কিম্বা একটু স্ফূর্ত্তিই থাক, ভদ্রলোকের কাছে সর্ব্বক্ষণ আমি সপ্রতিভ। প্রশ্ন শ্রবণমাত্রই প্রশান্তনয়নে প্রশ্নকর্ত্তার মুখপানে চেয়ে সুস্থিরকণ্ঠে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, এখানে আমি থাকি না, কোথাও আমি থাকি না, আমার থাকবার স্থান নাই।"

উত্তরশ্রবণে বিস্ময় প্রকাশ কোরে সেই ভদ্রলোকটী একবার ভ্রূ কুঞ্চিত কোল্লেন, গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "বড় আশ্চর্য্য কথা! কোথাও তুমি থাকো না? কোথাও তোমার থাকবার স্থান নাই? এটা তোমার কি প্রকার কথা?"

তাঁর মুখের ভাব দেখে আমি যেন বুঝলেম, লোকটী আমারে পাগল মনে কোল্লেন. যা-ই মনে করুন, চুপ কোরে না থেকে সত্য সত্য গুটীকতক আত্ম-পরিচয় তাঁরে আমি জানালেম, জানিয়েই বিনা জিজ্ঞাসায় শীঘ্র শীঘ্র বোল্লেম, "বাঙলাদেশে আমি থাকতেম আমার নাম হরিদাস।"

এইবার সেই লোকটীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হলো। ভাব দেখে আমি বুঝলেম, পূর্ব্বসংশয়টা, পূর্ব্ববিস্ময়টা অথবা পূর্ব্ববিশ্বাসটা দূর হয়ে গেল; আমার প্রতি যেন তাঁর একটু দয়া জন্মিল। সদয়বচনে তিনি আমায় বোল্লেন, "আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে এসো, নিকটেই আমার বাসা, সেইখানে গিয়ে সকল কথা আমি শুনবো।"

আমি বোল্লেম, "তিনদিন হলো. আমি এখানে এসেছি, ছোট একটী বাসা নিয়েছি, সে বাসায় আমার কিছু কিছু জিনিসপত্র আছে, সেখানে ফিরে না গেলে—"

বোলছিলেম, বাধা দিয়ে তিনি বোল্লেন, "সে ব্যবস্থা পরে হবে, এখন তুমি আমার সঙ্গে আমার বাসায় চল।"—আর আমি দ্বিরুক্তি কোল্লেম না, তিনি দক্ষিণমুখে অগ্রসর হোলেন, কতক উল্লাসে, কতক সন্দেহে আমি অনুগামী; আমাদের পশ্চাতে চাকরটী।

অদূরেই তাঁর বাসা। সেই বাসায় আমরা উপস্থিত হোলেম। বাড়ীখানি দোতালা, দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, একমহল। উপরের একটী ঘরে আমারে তিনি নিয়ে গেলেন; স্নান কোরে সিক্তবস্ত্রে আমি গিয়েছিলেম, চাকরকে বোলে আমার জন্য একখানি শুষ্কবস্ত্র আনিয়ে দিলেন। আমি কাপড় ছাড়-লেম। চাকর আমারে কিছু মিঠাই এনে দিলে, জল খেয়ে, বাবুর আদেশে বাবুর কাছে বিছানার উপর আমি বোসলেম। বেলা অধিক হয় নাই. বাবু আমারে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন। যে কথাগুলি বল-বার নয়, যেগুলি বলবার দরকারও ছিল না, সেইগুলি ছাড়া তাঁর সকল প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর আমি প্রদান কোল্লেম; বিনা প্রশ্নেও নিজের অবস্থাকাহিনী অল্প অল্প জানালেম; শুনে তিনি খানিকক্ষণ চুপ কোরে থাকলেন, তার পর বোল্লেন, "অদ্ভুত ঘটনা বটে! তোমার মত বালকের এমন ঘটনা হয়, এমন আমি কোথাও শুনি নাই; উপকথায় লেখা থাকতে পারে, কিন্তু সত্যজীবনে বাঙালী বালকের এমন অবস্থা ঘটে, তোমার মুখে এই আমি নূতন শুনলেম। আচ্ছা. থাকো.—আমার কাছেই তুমি থাকো. আমি তোমার ভরণপোষণের সুব্যবস্থা কোরে দিব. যেখানে আমি যাব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, তার পর আমি তোমারে আমার স্বদেশে নিয়ে যাব। বেশ ছোকরা তুমি, তোমার উপর আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি. আমার কাছেই তুমি থাকো।"

যিনি অনাথবন্ধু, সংসারে তিনি চিরদিন অনাথের সহায়, নিরুপায়ের উপায়। আমি একটী আশ্রয় অন্বেষণ কোচ্ছিলেম, একটী আশ্রয় পাবার

প্রত্যাশায় লালায়িত হোচ্ছিলেম, সেই অন্তর্যামী অনাথবন্ধু আমার প্রতি কৃপা কোরে এই নূতন আশ্রয়টী মিলিয়ে দিলেন। বাবুর আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত হয়ে তাঁর কাছেই আমি থাকলেম।

বাবুটী ব্রাহ্মণ, নাম দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, নিবাস মুর্শিদাবাদ, সেখানকার এক বনিয়াদী-বংশে তাঁর জন্ম, ধনসম্পত্তিও প্রচুর, অল্পক্ষণের মধ্যে এই তত্ত্বগুলি আমার জানা হলো। আমি আনন্দিত হোলেম।

বেলা প্রায় দেড়প্রহর অতীত। বাসায় রসুইব্রাহ্মণ ছিল, রন্ধনাদি সমাপ্ত হোলে বাবুর অনুরোধে সেইখানে আমি আহার কোল্লেম। বৈকালে সেই চাকরটীকে সঙ্গে দিয়ে বাবু আমারে বাসায় পাঠালেন, তিন দিনের ভাড়া শোধ কোরে দিয়ে, জিনিসপত্রগুলি নিয়ে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবুর বাসায় আমি ফিরে এলেম।

পাঁচদিন সেই বাবুর বাসায় আমার থাকা হলো। পাঁচদিনে বাবু আমার চরিত্রের পরিচয় পেলেন, লেখাপড়ার পরিচয় পেলেন, দেশভ্রমণের কতক কতক পরিচয়ও পেলেন ; পেলেন না কেবল বংশপরিচয়। ধর্ম্মানুরাগে আর বিদ্যানুরাগে বাবুটী বঞ্চিত ছিলেন না, পাঁচদিনে সে পরিচয়টীও আমি পেলেম। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ জন্মিল, আমিও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হোলেম।

পাঁচদিনের পর বাবু আমারে বোল্লেন, "অনেকগুলি তীর্থ আমি দর্শন কোরেছি, সম্প্রতি কামরূপদর্শনের অভিলাষ হয়েছে, কামাখ্যাদেবী সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আসামপ্রদেশে কামরূপতীর্থ-সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনা যায় ; সেই তীর্থদর্শনে শীঘ্রই আমি যাব। তুমি কি আমার সঙ্গে সেখানে যেতে ইচ্ছা কর ? তোমারে সঙ্গে লওয়া আমার ইচ্ছা। কামরূপ কিন্তু এখান থেকে অনেক দূর।"

অনেক দূর, এই কথা শুনে আমার ইচ্ছা বলবতী হলো। যতদূরে যেতে পারি, ততই আমি নিরাপদে থাকবো. শত্রুরা শীঘ্র আমার সন্ধান পাবে না, সেই জন্যই ইচ্ছা বলবতী। ইচ্ছাকে পুরোবর্ত্তিনী কোরে, উল্লাসে উল্লাসে বাবুকে আমি বোল্লেম, "নূতন নূতন তীর্থদর্শনে আমার বড় সাধ, আপনি যদি অনুগ্রহ কোরে সঙ্গে নিয়ে যান, আমি চরিতার্থ হব।"

বাবু সন্তুষ্ট হোলেন। তিন দিন পরে কামরূপযাত্রার আয়োজন। নৌকাযোগেই আমরা যাত্রা কোল্লেম। বাবুর সেই চাকরটী আমাদের সঙ্গে থাকলো ; পাচক ব্রাহ্মণ ঠিকালোক, সে আমাদের সঙ্গে থাকলো না। ক্রমাগত জলপথে স্থলপথে কত দিনে আসামে আমরা পৌঁছিলেম, ঠিক মনে হয় না।

কামরূপে আমরা উপস্থিত হোলেম। আসামের একটী প্রধান নগর গৌহাটী। গৌহাটীর তিনমাইল দূরে কামরূপ। কামাখ্যাদেবী এখানে বিরাজিতা, এই কারণে কামরূপের দ্বিতীয় নাম কামাখ্যা। দেবীর অধিষ্ঠানের একটী পৌরাণিক প্রবাদ যে, দক্ষযজ্ঞে দক্ষমুখে শিবনিন্দা-শ্রবণে দক্ষকুমারী সতী-দেবী প্রাণত্যাগ করেন, দক্ষযজ্ঞভঙ্গের পর মহাদেব সতী-দেহ মস্তকে ধারণ কোরে উন্মত্তের ন্যায় নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন, বিষ্ণুচক্রে সেই দেহ একান্ন খণ্ডে বিখণ্ডিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হয় ; যেখানে যেখানে সতী-অঙ্গ নিপতিত, সেই সেই স্থানে এক এক নামে এক একটী দেবী

আছেন, মহাকাল মহেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে সেই সেই স্থানে ভৈরবরূপে বিরাজমান ; সেই একান্ন স্থান একান্নপীঠ। সতীর একাঙ্গ কামরূপে পতিত হয়েছিল, এই পীঠের দেবীর নাম কামাখ্যা। অম্বুবাচীর সময় সেখানে খুব ঘটা হয়।

কামরূপ একটী প্রাচীন তীর্থ। কি কারণে এই তীর্থের নাম কামরূপ, সে সম্বন্ধেও একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। হরকোপানলে কামদেব ভস্ম হয়েছিলেন, এই স্থানে পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন, সেই জন্যই এই স্থানের নাম কামরূপ ! এ প্রবাদের সত্যাসত্যতা ভূতকালের গর্ভগত।

এখানকার সকলের মুখেই শুনা যায়, অন্যান্য দেশেও বলে, কামরূপ-কামাখ্যায় মায়াবিদ্যার বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল ; কামাখ্যার ডাকিনীরা আশ্চর্য্য মায়াবিনী ; মন্ত্রবলে তারা অন্যস্থানের স্থাবরপদার্থ কামাখ্যায় নিয়ে যেতে পাত্তো। গাছচালা ডাকিনী একটা প্রসিদ্ধ কথা। অন্যদেশের পুরুষ কামাখ্যায় এলে আর স্বদেশে ফিরে যেতে পাত্তো না ; এখানকার মায়াবিনীরা সেই সকল পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখতো। ভেড়া বানিয়ে রাখা এ কথাটার তাৎপর্য্য বোধ হয়, জাদুমন্ত্রে ভুলিয়ে ভুলিয়ে বশীভূত কোরে রাখা। এখানকার লোকের মুখে আরো শুনা যায়, মায়াবিনীরা স্বেচ্ছাক্রমে পশুপক্ষীর রূপধারণ কোত্তে পাত্তো। এখনো পারে কি না, অপরাপর মায়ার খেলা এখনো চলে কি না, তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না ; কিন্তু ঐ সকল কথা যে একেবারেই মিথ্যা, এমনও বোধ হয় না। কারণ, বঙ্গদেশের বাজীকরেরা,--ভানুমতীরূপিণী বেদিনীরা যেমন ভোজরাজার দোহাই দেয়, আত্মারাম সরকারের দোহাই দেয়, সেইরূপ কামরূপ-কামাখ্যার আজ্ঞার দোহাই দিয়ে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে। জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব কামাখ্যায় ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না ; যতটা গুজোব, ততটা সত্য নয়, এইরূপ অনুমান হয়।

কামাখ্যাদেবীর মন্দিরটী অতি সুন্দর। একটা পর্ব্বতের উপর মন্দিরটী সংস্থাপিত। মন্দিরের প্রথম-নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে একটা অলৌকিক কিম্বদন্তী আছে। বিষ্ণু যখন বরাহমূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই সময় সেই বরাহের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে এক অসুরের জন্ম হয়, সেই অসুরের নাম নরকাসুর। এখানকার প্রাচীন রাজবংশ বিলুপ্ত হবার পর নরকাসুর রাজা হয়। নরকাসুর স্বভাবতঃ অত্যন্ত রিপুপরায়ণ ছিল ; কথিত আছে, ষোড়শ সহস্র সুন্দরী কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ কোরে এখানকার কর্ম্মনাশা নামে একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতের গহ্বরমধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সেই নরকাসুর একদা মূর্ত্তিমতী কামাখ্যাদেবীকে দর্শন কোরে, কামমোহিত হয়ে, তাঁরে বিবাহ কোত্তে চায়। দেবী তারে বলেন, 'তুমি যদি একরাত্রের মধ্যে আমার মন্দির, নাটমন্দির, সরোবর, পুষ্পোদ্যান, প্রশস্ত বর্ত্ম প্রস্তুত কোরে দিতে পার, তা হোলে আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ কোত্তে সম্মত আছি ; তোমার কার্য্য সমাপ্ত হবার অগ্রে, যদি রজনীপ্রভাত হয়, তা হোলে তোমার অস্তিত্বলোপ হবে।'

নরকাসুর মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিল, সে তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ কোল্লে, বিশ্বকর্ম্মা হাজির হোলেন। অসুর তাঁরে দেবীকথিত প্রাসা-

দাদি-নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিল ; বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র কার্য্য আরম্ভ কোরে দিলেন। দেবী দেখলেন, বিপত্তি। বিশ্বকর্ম্মার কার্য্য, রজনীপ্রভাত হোতে না হোতেই সে কার্য্য সমাপ্ত হয়ে যাবে, অসুরবিনাশ হবে না। যাতে ব্যাঘাত ঘটে, দেবী তখন সেই উপায় অবলম্বন কোল্লেন ; যে সকল ঊষাপক্ষীর কলরবে প্রভাত সূচিত হয়, রাত্রি অবশিষ্ট থাকতে থাকতে সেই সকল পক্ষীকে তিনি কলরব করবার আদেশ দিলেন ; পক্ষীগণ কলরব কোরে উঠলো। রজনী-প্রভাত বিবেচনা কোরে, বিশ্বকর্ম্মা সেই সময় অন্তরে অন্তরে হেসে, কার্য্য বন্ধ রেখে স্বস্থানে প্রস্থান কোল্লেন ; অসুরের ইষ্টসিদ্ধি হলো না, দুরাচার সেইখানেই দেবীর রোষানলে ভস্ম হয়ে গেল।

এখানকার লোকেরা বলে, বর্ত্তমান মন্দিরের নিম্নাংশ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত। দেবদ্বেষী কালাপাহাড় এই মন্দিরের কিয়দংশ নষ্ট কোরে দেয়, অনন্তর কোচ-বিহার-রাজবংশের আদিপুরুষ মহারাজ নরনারায়ণ ঐ মন্দিরের উপরাংশ নির্ম্মাণ কোরিয়ে দেন, সেই মন্দির এখনো বর্ত্তমান আছে। যে পর্ব্বতের উপর মন্দির, সেই পর্ব্বতে আরোহণ করবার চারিটী পথ। চারি পথের চারি ফল। উত্তরের পথ দিয়া আরোহণ কোল্লে যাত্রীলোকের মুক্তিলাভ হয়, পশ্চিমের পথে রাজ্যলাভ হয়, পূর্ব্বদিকের পথে ধনলাভ হয়, দক্ষিণের পথে মৃত্যুলাভ হয়। এই কারণে গৃহস্থলোকেরা দক্ষিণের পথে পদার্পণ করেন না ; সাধু-সন্ন্যাসীরা দক্ষিণ-পথের এই নিষেধ অমান্য করেন।

এখানকার পাণ্ডারা অতি ভদ্রলোক। যাত্রীলোকের উপর তারা কোন প্রকার পীড়ন করে না, ইচ্ছাপূর্ব্বক যে যা দেয়, তাতেই তারা সন্তুষ্ট। যাত্রীলোকের প্রতি পাণ্ডাদের উত্তম যত্ন ; যাত্রীগণকে যত্নপূর্ব্বক দেবদেবী দর্শন করায়, যত্নপূর্ব্বক আপনাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখে, পাণ্ডাদের প্রসাদে যাত্রী-লোকের কোন প্রকার কষ্ট হয় না। আমরা একটী পাণ্ডার বাড়ীতে আশ্রয় লয়েছিলেম। পাণ্ডাদের বাড়ীগুলি দিব্য পরিষ্কার।

এখানে অনেকগুলি কুণ্ড আছে। প্রধান কুণ্ডের নাম সৌভাগ্যকুণ্ড। মন্দিরের প্রবেশ করবার পূর্ব্বে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান কোত্তে হয়। লোকে বলে, দেবরাজ ইন্দ্র আপন বজ্রাস্ত্র দ্বারা এই কুণ্ডটী খনন কোরে দিয়েছেন। কুণ্ড-স্নানের ফলশ্রুতি পারলৌকিক মঙ্গলে পরিকীর্ত্তিত ; সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান কোল্লে ঊর্দ্ধ-নিম্ন দশ দশ পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় ; পাণ্ডাদের মুখে নূতন ফলশ্রুতি, স্নানফলে ভাগ্যহীন লোকের সৌভাগ্যের উদয় হয়ে থাকে ; এটী ইহকালের ফল। সৌভাগ্যকুণ্ডের অদূরে গঙ্গাকুণ্ড, বরাহকুণ্ড, অনন্তকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড আর লৌহিত্যকুণ্ড।

প্রথমতঃ সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান কোরে সমীপবর্ত্তী গণেশমূর্ত্তির পূজা করা আবশ্যক ; গণেশ-পূজার পর মন্দিরে প্রবেশ। সম্মুখেই কামাখ্যাদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি। পাণ্ডারা বলেন, এই মূর্ত্তির নাম ভোগমূর্ত্তি। প্রকাশ্যরূপে সেই মূর্ত্তির পূজা হয়। সেই মূর্ত্তির পূর্ব্বদিকে একটী গহ্বর ; পাথরের সিঁড়ি দিয়ে সেই গহ্বরে প্রবেশ কোত্তে হয় ; সেই গহ্বরে পীঠস্থান। সে স্থান ঘোর

অন্ধকারে আবৃত্ত ; দিবারাত্রি সেখানে ঘৃত-প্রদীপ জ্বলে। দুই স্থানেই পূজা হয়। পীঠস্থানে গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বটুকভৈরব, নরনারায়ণ, অন্নপূর্ণা ও চামুণ্ডাদেবী আছেন। পূজা সমাপ্ত হবার পর মন্দিরপ্রদক্ষিণের নিয়ম আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটা বৃহৎ জয়ঘণ্টা ঝুলছে ; বাহিরে আসবার সময় সেই জয়ঘণ্টা বাজাতে হয়। আমরা দর্শন কোল্লেম, পূজা দিলেম, প্রণাম কোল্লেম, ঘণ্টা বাজালেম, শেষকালে মন্দিরপ্রদক্ষিণ কোরে বাহিরে এসে দাঁড়ালেম।

এখানে কুমারীর ভিড়। "বাবু একটী পয়সা, বাবা একটী পয়সা, মা একটী পয়সা," এই রকম প্রার্থনা। সহজপ্রার্থনাও নয়, টানাটানিও আছে। কুমারী কম নয় ; আমরা দেখলেম, প্রায় অর্দ্ধ সহস্র। সকলকেই একটী একটী পয়সা দিয়ে আমরা বেরুলেম। যাত্রীরা পুণ্যকামনায় কুমারী-ভোজন করায়। কাশীতে দণ্ডী-ভোজনের যেরূপ ফল, কামাখ্যায় কুমারী-ভোজনেও সেইরূপ ফল, শুনা গেল।

কামাখ্যার অতি নিকটে একটা পর্ব্বতের উপর ভুবনেশ্বরীদেবীর মন্দির। এই স্থানে প্রকৃতির বিচিত্রশোভা নয়নগোচর হয়। এই স্থানে একজন ব্রহ্মচারী আছেন, কত দিন আছেন, কেহ বোলতে পারে না। ভুবনেশ্বরীর পাণ্ডারাও দিব্য শান্ত। অন্যান্য তীর্থের পাণ্ডাদের যেরূপ দৌরাত্ম্য শুনা যায়, কামাখ্যার পাণ্ডাদের সেরূপ দৌরাত্ম্য কিছুই নাই।

একদিন আমরা কামরূপ থেকে গৌহাটীতে বেড়াতে এলেম। গৌহাটীতেও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ব্রহ্মপুত্রতীরে স্বয়ম্ভু উমানন্দের মন্দির। শিবরাত্রির সময় এখানে একটা মহা মেলা হয়। সহরের মধ্যে শুক্রেশ্বর, উগ্রতারা, মঙ্গলচণ্ডী ও নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান। সহরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বশিষ্ঠদেবের আশ্রম। লোকের মুখে শুনা গেল, বশিষ্ঠাশ্রমে ব্রাহ্মণেরা ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দনা কোল্লে আর তাঁদের নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি কোত্তে হয় না, কোটিজন্ম সন্ধ্যাবন্দনা না করার পাপও এই ফলে ক্ষয় হয়ে যায়। আর একটী আশ্চর্য্য দেখা গেল। সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা, এই তিন নামে তিনটী স্রোত এখানে ক্রমাগত অবিরাম প্রবাহিত ; কোথা থেকে এই স্রোত চোলে আসছে, এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু নির্ণয় কোত্তে পারে নাই।

একদিন আমরা গৌহাটীতে থাকলেম, তার পর আবার কামরূপে ফিরে গেলেম। দীনবন্ধুবাবুর চাকরটীর নাম যুধিষ্ঠির। বয়সে প্রায় বৃদ্ধ, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ, কাজকর্ম্মে সবিশেষ নিপুণ, কথাবার্ত্তাও ভদ্রলোকের মত, এদিকে আবার ধর্ম্মভীরু ; কিন্তু ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্যের গল্পে তার বড় আমোদ। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ; যখন কোন কাজকর্ম্ম না থাকতো, বাবু যখন নিকটে না থাকতেন, সেই সময় যুধিষ্ঠির আমার কাছে বোসে বোসে অনেক রকম পুরাতন রূপকথা বোলতো ;—ভূতের গল্প, রাক্ষসের গল্প, যক্ষের গল্প, পরীর গল্প, তালপত্রের খাঁড়া, পক্ষীরাজ ঘোড়া, ছাঁদন-বাঁধনের দড়ী ইত্যাদি অনেক রকম নূতন নূতন কথা তার মুখে আমি শুনতেম ; শুনতেম আর হাসতেম ; হাসির কথাই বেশী, সেই জন্যই হাস্য।

বাবু একদিন একাকী কামাখ্যা-মন্দিরে সন্ধ্যাকালে আরতি দেখতে গিয়েছিলেন, পাণ্ডার বাড়ীতেই আমাদের বাসা, বাসার একটী ঘরে আমি আর যুধিষ্ঠির। কোন গল্পের ভূমিকা না কোরে, যুধিষ্ঠির আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কামরূপে আমরা কি কোত্তে এসেচি? এটা তো ডাকিনীর দেশ। এখানকার মাগীরা সকলেই ডাকিনী, দেশে আমরা ঐ কথাই শুনি, কিন্তু একটাও ডাকিনী তো এখানে চক্ষে দেখতে পেলেম না; ডাকিনীরা তবে থাকে কোথায়? অন্য-দেশের পুরুষমানুষ কামিখ্যেয় এলে ভেড়া হয়, সে সব ভেড়াই বা কোথায় থাকে? যে সকল ভেড়া মাঠে চরে, পূর্ব্বে তারা মানুষ ছিল, এমন কোন চিহ্ন দেখা যায় না, সে সব মানুষ-ভেড়া তবে কোথায় চরে?"

প্রত্যয় অপ্রত্যয়, এই দুইটী সংশয়ের কথা। আমি বিশ্বাস করি না, অনেক লোকে বিশ্বাস করে, এ সমস্যার মীমাংসা কি প্রকারে হয়? যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে অনেকক্ষণ আমি চুপ কোরে থাকলেম। কামরূপের স্ত্রীলোকেরা মায়াজালে বিদেশী পুরুষগণকে বিমুগ্ধ কোরে রাখে, মায়ায় যারা বদ্ধ হয়, তারা আর দেশে ফিরে যায় না, যেতেও পায় না, এই কথাটা কতক পরিমাণে বিশ্বাস-যোগ্য। পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন তেমন নাই, পাণ্ডারা এই কথা বলে। তারা আরো বলে, এখনো যে সকল বিদেশী পুরুষ একান্ত কামমোহিত, কামরূপের সুন্দরী সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখে, লোভে পোড়ে তারাই বাঁধা পোড়ে যায়। মনে মনে এই সব আলোচনা কোচ্ছি, হঠাৎ একটা শ্লোক আমার মনে পোড়ে গেল। কাশীর আদালতে একজন কেরাণীর মুখে একদিন আমি সেই শ্লোকটা শুনেছিলেম। শ্লোকটা প্রাচীন কি আধুনিক, সত্যচরিত্রদর্শী কোন কবির রচনা কিম্বা কোন রহস্যপ্রিয় নিন্দাকারী লোকের কুবুদ্ধি-রচনা, সে কথা আমি বোলতে পারি না, কিন্তু শ্লোক শুনে শুনে অনেক লোকে আমোদ করে। শ্লোকটা এই ঃ—

"সধবা বিধবা নাস্তি, নাস্তি নারী পতিব্রতা।
হংসা পারাবতা ভক্তা, কামরূপনিবাসিনা ॥"

এই শ্লোকের উপর আশুপ্রত্যয় রেখে, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে আমি উত্তর কোল্লেম, "গল্প-কথা অনেক রকম হয়। ভেল্কীবাজী চক্ষে দেখা যায়, দেখে দেখে আশ্চর্য্যজ্ঞান হয়, কিন্তু কিছুই সত্য হয় না। কামরূপের স্ত্রীলোকেরা মায়াবিদ্যা জানে, এটা সত্য হোতে পারে, মায়ার কুহকে কামুক পুরুষগণকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে রাখা, এটাও সত্য হোতে পারে, কিন্তু দ্বিপদ মনুষ্যকে চতুষ্পদ মেষরূপে পরিণত করা কখনই সত্য হোতে পারে না। কোন কোন লোকের মুখে আমি শুনেছি, কামরূপে ব্যভিচার কিছু প্রবল, এখানে পতিব্রতা সতী কম; সধবাও ব্যভিচারে রত হয়, বিধবারাও ব্যভিচারে রত হয়। তীর্থ-যাত্রীদলের ভিতর সুপুরুষ দর্শন কোল্লে এখানকার দুশ্চারিণীরা সেই সকল পুরুষকে হস্তগত করবার চেষ্টা করে, সম্ভবতঃ এই কথাই সত্য; সত্য-ডাকিনী কিম্বা সত্যভেড়া অসম্ভব কথা। মানুষেরা পশু হয়, পাখী হয়, বৃক্ষ হয়, পশুরা মানুষের মত কথা কয়, এ সকল অলৌকিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস হয় না।"

যুধিষ্ঠিরের মুখখানি একটু শুষ্ক শুষ্ক বোধ হোতে লাগলো ; তার কথায় আমি যদি সায় দিতে পাত্তেম, রং দিয়ে দিয়ে তার মনের কথা যদি আমি বোলতে পাত্তেম, তা হোলে যুধিষ্ঠির আমোদ পেতো, এইরূপ ভাব আমি বুঝতে পাল্লেম। আমোদ পেলে না বোলে বেচারা ক্ষুন্ন না হয়, এই ভেবে শেষকালে আমি বোল্লেম, "দেখ যুধিষ্ঠির, আমরা এখানে অল্পদিন এসেছি, ডাকিনীরা কোথায় থাকে, সন্ধান জানতে পারি নাই, বাবু যদি আর মাসখানেক এখানে থাকেন, তা হোলে চেষ্টা কোরে কোরে একদিন একটা মায়াডাকিনী আমি তোমারে দেখাব।"

আহ্লাদে বদন বিকাশ কোরে, আহ্লাদের স্বরে যুধিষ্ঠির বোলে উঠলো, "দেখিও দাদা, দেখিও ! ডাকিনী দেখতে আমার বড় সাধ ! ডাকিনী দেখবার আশাতেই এখানে আমার আসা। সে আশা যদি না থাকতো, তা হোলে এই বৃদ্ধবয়সে কখনই আমি বাবুর সঙ্গে এ দেশে আসতে রাজী হোতেম না। দেখিও দাদা, দেখিও ; বেশী না পারো, একটা ডাকিনী তুমি আমাকে দেখিও ! কামরূপ-কামিখ্যায় এসে ডাকিনী না দেখে যদি অমনি অমনি ফিরে যাই, দেশে গিয়ে তবে গল্প কোরবো কি ? দেশের লোকে আমাকে বোলবেই বা কি ? তারা হয় তো মনে কোরবে, মানুষের আকারে আমি ভেড়া হয়ে রোয়েছি, সেইজন্য কিছু বোলতে পাল্লেম না। বড়ই লজ্জা পাব। না দাদা, সে লজ্জা আমি রাখবার জায়গা পাব না। দেখিও তুমি, তোমার সোণার দোত-কলম হবে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে হবে, তুমি রাজা হবে, দয়া কোরে একটা ডাকিনী আমাকে দেখিও তুমি !"

মনে মনে হেসে তারে আমি কিছু বোলবো বোলবো মনে কোচ্ছি, এমন সময় গম্ভীরবদনে সে আবার তাড়াতাড়ি বোলতে লাগলো, "কি বোলছিলে তুমি ? বাবুর কথা ? বাবু যদি এখানে বেশীদিন থাকেন, সেই কথা ? সে জন্য ভাবনা নাই। বাবু আমার আশুতোষ ; যা যখন আমি বলি, দুই ঠোঁট একত্র না কোরে, বাবু আমার তাই শুনেন, তাই করেন ; আমার উপর বাবুর খুব অনুগ্রহ। তুমি বোলচো মাসখানেক, আমি তাঁকে ছ-মাস এখানে রাখতে পারবো, কোন ভাবনা নাই। তুমি যদি—"

বাবু এসে উপস্থিত। ব্যস্তসমস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির আমার কাছ থেকে উঠে পালালো। সহাস্যবদনে বাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "পাগল এখানে কি কোচ্ছিল ? রূপকথা বোলছিল বুঝি ? কেবল রূপকথা ! কেবল রূপকথা ! একজন শুনবার লোক পেলেই যুধিষ্ঠির অমনি রূপকথার জাহাজ খুলে দেয় ! তাই বুঝি হোচ্ছিল ?"

বাবু বোসলেন। অবকাশ পেয়ে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, রূপকথা হোচ্ছিল না ; যুধিষ্ঠির এখানে একটা ডাকিনী দেখতে চায় !"

উচ্চহাস্য কোরে বাবু বোল্লেন, "ভারী পাগল ! যেটা যখন খেয়াল ধরে, অল্পে ছাড়ে না ! তুমি কি বোলেছ ? ক্ষেপিয়ে দিয়েছ বুঝি ?"

নতমস্তকে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, ক্ষেপাই নাই, স্তোক দিয়ে রেখেছি ; একদিন একটা ডাকিনী দেখাবো, এইরূপ আশ্বাস দিয়ে ঠাণ্ডা

কোরেছি। বোলেছি, শীঘ্র দেখা যায় না, একমাস এখানে থাকলে একটা ডাকিনী ধরা যেতে পারে।"

"মনসার কাছে ধুনার গন্ধ!"—পূর্ব্ববৎ হাস্য কোরে বাবু বোল্লেন, "মনসার কাছে ধুনার গন্ধ!—সত্যই তবে তুমি ক্ষেপাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছ!"—এই কথা বোলেই বাবু সহসা গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লেন; গম্ভীরবদনে একটু একটু গুঞ্জন কোরে বোল্লেন, "কথা বড় মিথ্যা নয়; ডাকিনী এখানে আছে! পাঁচ সাতটা ডাকিনী এই মাত্র আমাকে পেয়ে বোসেছিল! আরতি দেখে মন্দির থেকে আমি বেরিয়ে আসছি, বাহিরে যেখানে কুমারীরা দাঁড়ায়, সেইখানে পাঁচ সাতজন যুবতী পয়সা পয়সা কোরে আমার পথ আগলেছিল। পয়সা আমি দিতে গেলেম তারা খিলখিল কোরে হেসে আমার দিকে চক্ষু ঘুরাতে আরম্ভ কোল্লে! ঠাট-ঠমক, ভাব-ভঙ্গী, বক্রকটাক্ষ নূতন প্রকার! যতই এগিয়ে এগিয়ে আসি, চারিদিক বেষ্টন কোরে তারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ছুটে আসে। বিপাকে ঠেকলেম! সাতজন;—সম্মুখে দুজন, দুপাশে দুজন দুজন চারজন, পশ্চাতে একজন। সকলেই যুবতী, সকলেই রূপবতী, সকলের চক্ষেই অনেক দূর পর্য্যন্ত কাজলের রেখা টানা, সকলের মাথায় এক প্রকার নূতন ধরণের খোঁপাবাঁধা, অঙ্গে বিচিত্র বসন, খোঁপাঘেরা ফুলের মালা, গায়ে কিছু কিছু গহনাও আছে; মনের ভাব ভাল নয়। পথে আমি একা ছিলেম না, আরো আট দশজন যাত্রীও আরতি দেখে বেরিয়েছিলেন। সকলের অগ্রেই আমি ছিলেম, তাঁরা কিছু পশ্চাতে ছিলেন, ডাকিনীরা আমারে ঘিরে ফেলেছে, আমাকে ধীরে ধীরে চোলতে হোচ্ছিল, যাত্রীরা পাশ কাটিয়ে চোলে যাবার পথ পাচ্ছিলেন না, পেলেও হয় তো তামাসা দেখবার জন্য ধীরে ধীরে আসছিলেন, আমি এক রকম সঙ্কটাপন্ন! পয়সা দিতে চাই, গ্রহণ করে না, সিকি দিতে চাইলেম, তবুও না; কেবল ফিক ফিক কোরে হাসে, কটাক্ষ হানে, আমার পথ আটকায়! কি যে তাদের মতলব, স্পষ্ট আমি বুঝতে পাল্লেম না। এই সময় সম্মুখদিক থেকে দুজন পান্ডা আমাদের নিকটে এসে উপস্থিত হোলেন। সে দুটী পান্ডা দিব্য সুশ্রী, দিব্য স্থূলাকার, দিব্য শান্ত। আমাকে তদবস্থ দর্শন কোরে তাঁদের মধ্যে একজন আসামের চলিতভাষায় উগ্রস্বরে কি গোটাকতক কথা বোল্লেন, ডাকিনীরা তখন কেমন এক রকম ভয় পেয়ে, আমাকে ছেড়ে অন্যদিকে ছুটে পালালো;—পয়সাও নিলে না, আমার দিকে আর ফিরেও চাইলে না। আমি পরিত্রাণ পেলেম।"

বাবুর কথা শুনে আমি হাসতে পাল্লেম না, তাঁর মুখের দিকেও ভাল কোরে চাইতে পাল্লেম না, কিন্তু তিনি রহস্যচ্ছলে গণিকাদলকেই ডাকিনী বোল্লেন, সেটা আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম। ডাইনী, ডাকিনী, রাক্ষসী, পেত্নী ইত্যাদি যে সকল কুৎসিত কুৎসিত উপাধি আছে, চক্ষে না দেখলেও সে সকল উপাধিধারিণীকে ভয়ঙ্করী মনে হয়। রাক্ষসী পেত্নী কি রকম, এখনকার দিনে সে দুই মূর্ত্তি দেখা যায় না; ডাইনী ডাকিনীর আকৃতি বিভিন্ন নয়; সাধারণ স্ত্রীলোকেরা যেমন, তাদের আকৃতিও সেই প্রকার; কেবল কার্য্য দ্বারা তাদের

পরিচয় হয় মাত্র ; কার্য্যশ্রবণে ভয়ের সঞ্চার হয়ে থাকে। বাবুর কথায় আমি কোন উত্তর দিলেম না, বাবুও আর সে প্রসঙ্গ তুল্লেন না।

সত্য সত্য একমাস আমাদের কামরূপে থাকা হলো। যুধিষ্ঠির মাঝে মাঝে আমারে উস্কে উস্কে দেয়, ডাকিনীদর্শনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, অন্যপ্রকার কথায় আমি তাকে প্রবোধ দিয়ে রাখি। একদিন বোল্লেম, "ডাকিনী আছে, ডাকলে তারা আসে না, যেখানে সেখানে বেড়ায়ও না, তাদের সব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আড্ডা আছে ; যখন তাদের ইচ্ছা হয়, তখন তারা লোকালয়ে দেখা দেয়।" আড্ডার নাম শুনে যুধিষ্ঠির পলকশূন্যনয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, বোধ হলো যেন একটু একটু কাঁপলো।

একদিন বৈকালে আমাদের বাসাঘরে বাবুর কাছে আমি বোসে আছি, যুধিষ্ঠির অন্যান্য কাজে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় ঝম ঝম শব্দে দুজন স্ত্রীলোক হাসতে হাসতে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। পাঁচরঙা ঘাগরা পরা, বুকে কাঁচুলি, গলায় মালা, নাকে কাণে সাদা সাদা গহনা, কপালে টীপুলি, চক্ষে কাজল, এলোকেশী ; সম্মুখদিকের দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ কাণের দুপাশ দিয়ে বুকের নীচে পর্য্যন্ত ঝুলেছে, মুখের আধখানা সেই চুলে ঢাকা পোড়ে গিয়েছে, দেখতে মন্দ নয়।

ভাষাশিক্ষায় আমার বড় অনুরাগ। বাঙলাদেশে বাঙলাশিক্ষা, টোল-বাড়ীতে কিছু কিছু সংস্কৃতশিক্ষা, বর্দ্ধমানে সর্ব্বানন্দবাবুর বাড়ীতে কতক কতক ইংরেজীশিক্ষা, কাশীতে চলনসই হিন্দিশিক্ষা, কামরূপে এসে কামরূপীদের কথা শুনে, এক একজন বাঙালী কামরূপীর উমেদারী কোরে ব্যাখ্যা শুনে, আসামী ভাষা কিছু কিছু আমি শিক্ষা কোরেছি। অনেক কথা বুঝতে পারি, ছোট ছোট দু-পাঁচটা কথা বোলতেও পারি, বাঙলা অক্ষরে পুঁথিলেখা কিছু কষ্টে ছত্র ছত্র পাঠ কোত্তেও পারি। বস্তুতঃ এক-মাসে যতটুকু হোতে পারে, তার চেয়ে বরং কিছু বেশী আমি শিখতে পেরেছি। যে দুটী স্ত্রীলোক আমাদের বাসায় এলো, চোক-মুখ ঘুরিয়ে মৃদু মৃদু হেসে, তাদের মধ্যে একজন আপনাদের জাতি ভাষায় বোল্লে, "খেলা দেখবে বাবু ?"

সাজগোজ দেখে আমি মনে কোরেছিলেম, নর্ত্তকী, কথা শুনে মনে কোল্লেম, খেলা দেখাবে। কি রকম খেলা ? না দেখলে বলা যায় না। কৌতুকে, আগ্রহে, কৌতূহলে, নীরবে বাবুর মুখপানে আমি চাইলেম। বাঙলাদেশের বাজীকরী বেদিনীদের যেমন সাজ, ঐ দুটী স্ত্রীলোকের সজ্জাতে তার কতক কতক ছায়া ছিল ; তাই দেখে আমি মনে কোল্লেম, ইন্দ্রজালের খেলা ; এরা কোন প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল আমাদের দেখাবে। ইতিপূর্ব্বে যুধি-ষ্ঠিরকে যে কথা আমি বোলেছিলেম, দৈবগতিকে সেই কথা যেন দৈববাণীর মত ফোলে গেল। ডাকলে ডাকিনী আসে না, ইচ্ছা হোলে আপনা হোতেই আসে, সেই স্তোকের কথাটাই ঠিক হলো ; আপনা হোতেই একজোড়া ডাকিনী হঠাৎ এসে উপস্থিত।

দুজনেই দীর্ঘাকার, কিছু রোগা, মুখ লম্বা, নাক চ্যাপ্টা, কপাল চওড়া, দাঁত সাদা, একটু বড় বড়, বর্ণ শ্যামোজ্জ্বল, মুখ হাঁসি হাসি। দেখলে ভয় হয় না, কিন্তু আকারের দীর্ঘতায় ডাকিনী বোলেই বোধ হয়। বাবু তাদের দিকে চেয়ে বাঙলাকথায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি খেলা তোমরা জানো? কি খেলা তোমরা দেখতে চাও?"

বাঙালী-সংসর্গে কামরূপের স্ত্রী-পুরুষেরা অনেকটা বাঙলাকথা শিখে-ছিল, সেই দুটী স্ত্রীলোক বাঙলাতেই উত্তর কোল্লে, "ভেল্কী খেলা ; অনেক রকম তামাসা।"—আমার অনুমান সত্য। খেলা দেখাও উপরপড়া হয়ে আমার এ কথাটা বলা ভাল দেখায় না, সতৃষ্ণনয়নে ঘন ঘন আমি বাবুর গম্ভীরবদন নিরীক্ষণ কোত্তে লাগলেম। বাবু তাদের হুকুম দিলেন, "আচ্ছা খেলো : কি খেলা দেখাতে চাও, দেখাও।" খোটা খেমটাওয়ালীরা যেমন নাচে, প্রথমে তারা হেলে-দুলে নানা ভঙ্গীতে সেইরকম নাচ আরম্ভ কোল্লে ; ঘুরে ঘুরে ঘাগরা তুলে তুলে খঞ্জনের মত নৃত্য কোত্তে লাগলো ; একবার বসে, একবার দাঁড়ায়, একবার পশ্চাদ্দিক মাথা নীচু কোরে, শরীরখানা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে, আধ-শোয়া হয়ে তালে তালে বক্ষঃস্থল উঁচু কোত্তে লাগলো। হস্তপদ ভূমিলগ্ন, পৃষ্ঠদেশ শূন্যে অবস্থিত ; আলুলায়িত দীর্ঘকুন্তল ভূমিস্পর্শী ; সেই কেশপাশ বাতাসে উড়ে উড়ে মুখে চক্ষে বক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নিক্ষিপ্ত হোতে লাগলো ; কুম্ভকারের চক্র যেমন ঘোরে, এই নর্ত্তকীদের অষ্টাঙ্গ সেইরূপ বন বন শব্দে ঘুরতে লাগলো ! আশ্চর্য্য শিক্ষা, আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ! দেখে দেখে আমি মনে কোল্লেম, তাদের সর্ব্বাঙ্গের অস্থিগুলি, সংযোগস্থলগুলি যেন ভেঙে ভেঙে শিথিল হয়ে গিয়েছে, যে অঙ্গ যে দিকে ঘুরাতে ইচ্ছা করে, সেই অঙ্গ সেই দিকে ঘোরে, কোথাও বাধন আছে, এমন মনে হয় না। একরূপ নাচের নাম, পায়রা-লোটন ; লক্কা-পায়রা যেমন পক্ষবিস্তার কোরে, গলা ফুলিয়ে, ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে, এই নর্ত্তকীরা একবার সেই রকমের পায়রালোটন দেখালে। সত্যই যেন লোটন-পায়রা। চক্রবৎ ঘূর্ণনে সেই দুটী সুন্দরী নারীমূর্ত্তি তখন আমাদের চক্ষে যথার্থই যেন পক্ষীমূর্ত্তি বোধ হোতে লাগলো ! চমৎকার অভ্যাস !

যুধিষ্ঠির কোথায় গেল ? এমন সময় যুধিষ্ঠির উপস্থিত নাই, এমন নূতন রঙ্গটা যুধিষ্ঠির দেখতে পেলে না, আমার মনে আপশোষ উপস্থিত হলো। নৃত্য-অবসানে নর্ত্তকীদের কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম। কপালে, নাসাগ্রে, ওষ্ঠ-পুটে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। বড় একখানা পাথরের উপরে তারা দুজনে বোসলো। তাদের বিরামকালে, বাবুর মুখের দিকে চেয়ে আমি একবার যুধিষ্ঠিরের অন্বেষণে উঠে গেলেম।

যুধিষ্ঠির তখন বাসায় ছিল না। কোথায় গিয়েছে, জানবার জন্য বাহির দরজার কাছ পর্য্যন্ত আমি গিয়েছি, দেখি, একখানা চিত্রপট হাতে কোরে যুধিষ্ঠির ছুটে ছুটে বাড়ীর দিকে আসছে। দরজাতেই দেখা হলো ! আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ কি যুধিষ্ঠির ! হাপাচ্ছ কেন ? ছুটেছিলে কেন ?

এখানি কিসের ছবি ?”—হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে যুধিষ্ঠির বোল্লে, “কা—কা—কা—কামিখ্যের ছবি ডা—ডা—ডা—ডাকিনীর ছবি।”

তালে তালে মিলে গেল। উৎসাহ জাগাবার উত্তম সুযোগ পেলেম। ছবিখানা তার হাত থেকে টেনে নিয়ে, একবারমাত্র চক্ষু দিয়ে, শীঘ্র শীঘ্র আমি বোল্লেম, 'এ সব তোমার আঁকা ডাকিনী ; জয়ন্তী ডাকিনী একজোড়া এসেছে ! একটা দেখবে বোলেছিলে, একেবারে একজোড়া ! কতকরকম রঙ্গ কোচ্ছে, কেমন ভঙ্গীতে কত রকমের নাচ দেখাচ্ছে, আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চল, চল, শীঘ্র চল, বাবুর কাছে তারা বোসে আছে, দেখবে এসো। ”

যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে নিয়ে নাচের আসরে আমি উপস্থিত হোলেম। নর্ত্তকীরা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বোসে বোসে বাবুর সঙ্গে কি সব কথা কোচ্ছিল। আমারে দেখে একটু হেসে বাবু বোল্লেন, “কোথা গিয়েছিলে হরিদাস ? তোমার নাচ-ওয়ালীরা ধৈর্য্য রাখতে পাচ্ছে না, এইবার খেলা দেখাবে বোসো।”—আড়চক্ষে একবার যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চুপি চুপি বাবু আবার বোল্লেন, “এই যে পাগলটাকে ধোরে এনেছ, বেশ হয়েছে। বোসো।”

আমি বোসলেম। নর্ত্তকীদের দিকে চেয়ে, যুধিষ্ঠির ফুল্লবদনে চুপটী কোরে একধারে দাঁড়িয়ে থাকলো ; ছবিখানি আমি আমার নিজের কাছেই রেখে দিলেম। নর্ত্তকীরা এখন আর নর্ত্তকী নয়, নিজমূর্ত্তি ধারণ কোল্লে। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ছিল না, করতালিতেই তালে তালে সঙ্গত কোরে মনের মত গীত ধোল্লে ; রাগিণীযুক্ত সঙ্গীত নয়, সুরে সুরে মন্ত্রপাঠ। প্রথম ক্রীড়া ক্ষুদ্র একটী সিংহশাবক। একজনের ঘাগরার ভিতর সেই শাবকটী লুকানো ছিল, মন্ত্রের আকর্ষণে সেই শাবক আমাদের সম্মুখে এসে নেচে নেচে খেলা কোত্তে আরম্ভ কোল্লে ; ভাল ভাল কাবুলী বেড়াল যত বড় হয়, এই সিংহশাবক ঠিক তত বড়। এক একবার বাজীকরীর দিকে ছুটে ছুটে যায়, লাফ দিয়ে দিয়ে বুকে উঠে, কাঁধে উঠে, মাথায় চড়ে, মাথার উপর থেকে হেঁট হয়ে বাজীকরীর কাণে কাণে মানুষের মত কথা কয়, আবার লাফিয়ে এসে আমাদের সম্মুখে নাচে। সকৌতুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “বাজীকরি ! তোমার এ সিংহশিশু তোমারে কামড়ায় না ?”—ফিক কোরে হেসে বাজীকরী বোল্লে, “কামিখ্যেদেবীর আজ্ঞায় এখানকার সিংহ-ব্যাঘ্রেরা কাকেও কামড়ায় না। দেখবে তুমি, নেবে তুমি, খেলবে তুমি ?—এই লও !”—এই কথা বোলেই বাজীকরী দুই হাতে সেই সিংহশিশু ধোরে আমার কোলে দিতে এলো। আমি একটু পেছিয়ে বোসলেম। কৌতুকের সঙ্গে একটু ভয়। নয়ন ঠেরে হাসতে হাসতে কি সব মন্ত্র বোলে নর্ত্তকী সেই ক্ষুদ্র সিংহশাবককে আমার গায়ে ফেলে দিলে, আতঙ্কে আমি লাফিয়ে উঠলেম। আশ্চর্য্য ব্যাপার ! কোথায় বা সিংহশাবক, কোথায় বা সেই যুগল নর্ত্তকী ! কোথাও কিছু নাই ; দিব্য একটী ময়ূর আমার স্কন্ধের উপর প্যাকম ধোরে বোসে আছে, এইরূপ দেখা গেল ! বাবুর কোলেও সেই রকম একটী, যুধিষ্ঠিরের মাথার উপরেও সেই রকম একটী ! বাবুর কোলের ময়ূরটীকে হস্ত দ্বারা বাবু একবার স্পর্শ

কোল্লেন, ময়ূর উড়ে গেল! একসঙ্গে তিনটীই উড়ে গেল! হতবুদ্ধি হয়ে আমরা চেয়ে থাকলেম!

তখনি তখনি সেই সহাস্যবদনা নর্ত্তকীরা হাসতে হাসতে আমাদের কাছে এসে, দুখানি দুখানি হাত পেতে, সুমিষ্টবচনে বোল্লে, "বাবু আমাদের ময়ূর দাও! আমাদের সিংহ দাও। তারা আমাদের খেলার জিনিস।"

আমি তো কথা কোইতে পাল্লেমই না, অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে বাবু বোল্লেন, "তোমাদের সিংহ পালিয়ে গিয়েছে, ময়ূরেরা উড়ে গিয়েছে।"

কটাক্ষ ঘুরিয়ে, ফিক ফিক কোরে হেসে, করতালি দিয়ে, একজন বাজীকরী বোল্লে, "সে কি কথা বাবু! তোমার কোলে ময়ূর, ছেলেবাবুর স্কন্ধে ময়ূর, বুড়ার মাথায় ময়ূর, তুমি বল উড়ে গিয়েছে?"

তাজ্জব ব্যাপার! সত্যই দেখি তাই, একটু পূর্ব্বে ছিল না, এখন আবার কোথা থেকে এসে সেই তিন ময়ূর সেই সেই জায়গায় প্যাকম ধোরে বোসে আছে! ময়ূর এলো, সিংহশিশু এলো না।

বাজীকরীরা এই সময় উভয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে, জোরে জোরে করতালি দিলে, জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ কোল্লে; সেই দিকে আমরা চেয়ে দেখি, নানাবর্ণের বৃক্ষলতা-শোভিত ছোট একটী বাগান গড় গড় কোরে আমাদের সম্মুখদিকে চোলে আসছে। বাগান এলো। অনেক রকম গাছ, অনেক রকম লতা, অনেক রকম ফল, অনেক রকম ফুল সেই বাগানের সম্পত্তি। গাছে গাছে কত প্রকার পক্ষী, বাজীকরীদের ইঙ্গিতে সেই সকল পক্ষী মধুরস্বরে গান ধোল্লে; নরকণ্ঠের সঙ্গীতে যে প্রকার স্পষ্ট স্পষ্ট বাক্য, সেই সকল মায়াতরুর শাখায় শাখায় পক্ষীকণ্ঠেও সেইরূপ স্পষ্টবাক্য আমরা শ্রবণ কোল্লেম। আমাদের অঙ্গের ময়ূরেরা সেই বাগানে উড়ে গেল। ময়ূরের কেকারব কর্কশ, কিন্তু আমরা শুনলেম, ময়ূরকণ্ঠে সুস্বর, মধুর সঙ্গীত!

ক্রমশই আমার মোহ উপস্থিত হোতে লাগলো। সত্য দেখছি কি ভেল্কী দেখছি সে ভাবটা মনেই এলো না। ডাকিনী-দর্শনাকাঙ্ক্ষী যুধিষ্ঠির গালে হাত দিয়ে স্থিরনয়নে এককালে নির্ব্বাক। বাবু কেবল মায়ার প্রভাব বিবেচনা কোরে নয়ন দ্বারা আশ্চর্য্য বিজ্ঞাপন কোচ্ছিলেন, আমার মত তাঁর মোহ জন্মে নাই।

আবার এ কি! কোথায় গেল বাগান, কোথায় গেল তরুলতা, কোথায় গেল ফুলকুল, কোথায় গেল পক্ষিকূলের সুস্বরলহরী! কিছুই নাই! কিছুই নাই! সম্মুখে এক পদ্মসরোবর! প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে সমস্ত জল ঢাকা; ভিতরের জল-হিল্লোলে পদ্মফুলগুলি কাঁপছে, কম্পিত পদ্মে পদ্মে চঞ্চল মধুকরেরা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, চতুর্দ্দিক সহসা সুগন্ধে আমোদিত। বাজীকরীরা আমাদের দৃষ্টিপথের অগোচর। সরোবরের যে কূলে আমরা, সেই কূলে শ্বেতপাথরের বাঁধা একটী মনোহর ঘাট; সেই ঘাটের চাতালে অপরূপ-রূপ-যৌবনসম্পন্ন যুগলমূর্ত্তি;—একটী যুবাপুরুষ, একটী যুবতী। সরোবরের দিকে আমরা চেয়ে আছি, সরোবরের জল পদ্মফুলে ঢাকা, দেখতে দেখতে অনেকগুলি পদ্মফুল ঘাটের সম্মুখ থেকে সোরে সোরে গেল, প্রায় পাঁচ হাত পরিমাণ স্থানে নির্ম্মল জল দেখা গেল; সেই যুগলমূর্ত্তি সেই

নির্ম্মলজলে অবগাহন কোল্লে। যখন তারা উঠলো, তখন দেখলেম, তারা নয়। আর একটী সুন্দর কামিনী ;—সেই কামিনীর এক হস্তে একগাছা নিম্ব-কাষ্ঠের যষ্টি, অন্য হস্তে একগাছা রজ্জু ; সেই রজ্জুপ্রান্তে মস্ত একটা ভেড়া বাঁধা !

কামরূপের কামিনীরা বিদেশী পুরুষকে ভেড়া করে, মায়ার কৌশলে কামরূপের কামিনীরা তাই-ই আমাদের দেখালে। যারা দেখালে, তারা কোথায় গেল, অনেকক্ষণ দেখতে পেলেম না ; সরোবরের দিকে চেয়ে থাক-লেম। সরোবর-সোপানে সেই সুন্দরী আর সেই রজ্জুবন্ধ ভেড়াটা। ঘাটের নিকট থেকে যে পদ্মফুলগুলি সোরে গিয়েছিল সেগুলি আবার ফিরে এসে অনাবৃত জলাংশ সমাবৃত কোরে দিলে। আর একটী আশ্চর্য্য দেখলেম। পদ্মপুকুরে পদ্মফুল আছে, পদ্মপত্র একটীও নাই! জলের উপর কেবল ফুলে ফুলে যেন মালাগাঁথা! অতি চমৎকার ইন্দ্রজাল !

আর নাই ! সরোবর নাই ! পদ্ম নাই ! মধুকর নাই ! সুন্দরী নাই ! সুন্দরীর হস্তে রজ্জুতে নিবদ্ধ ভেড়াটাও নাই ! সব ফাঁক !—সব শূন্য ! মনে মনে আমি অনেক রকম বিতর্ক কোচ্ছি, এমন সময় আর একদিক থেকে সেই দুই বাজীকরী হাসতে হাসতে সম্মুখে এসে দেখা দিলে। বাবুকে নমস্কার কোরে তারা একবার করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশপথ নিরীক্ষণ কোল্লে। একজন বোল্লে, "আমাদের আর একটী খেলা আছে ; সে খেলার নাম 'আপনা-দের ভবের খেলা।' যদি আজ্ঞা হয়, ভবের খেলটা খেলিয়ে যাই।"

ভবধামে মানুষেরা যে সব খেলা করে, সেই খেলাই তো ভবের খেলা ; সেই খেলাই তো ভেল্কীখেলা। পেশাদার ভেল্কীওয়ালীরা কোন ভাবে আবার ভবের খেলা দেখাতে চায়, ভাবটা সংগ্রহ কোত্তে আমার বড় কৌতুক জন্মিল ; বাবুও এই খেলায় ভবের খেলা দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কোরে বাজীকরী-দের আজ্ঞা দিলেন।

খেলা আরম্ভ। পাঠকমহাশয়েরা ছায়াবাজী দর্শন কোরেছেন, ছায়াবাজীর কৌশল বুঝতে পারা যায়, কিন্তু এই বাজীকরীরা যে রকমে ভবের খেলা দেখাল, সে খেলার কোন কৌশল বুঝতে পারা গেল না। তারা দুজনে লুকিয়ে গেল। আমাদের সম্মুখে কি যেন স্বচ্ছ আবরণ লম্বে লম্বে স্থাপিত হলো ;—দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ সেই আবরণের ভিতরদিকে সারি সারি নরনারী। পদাঙ্গুলী থেকে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত দর্শন কোরে আর যদি ঊর্দ্ধদিকে নেত্র উত্তোলন করা না যায়, তা হোলে ঠিক দেখা যায়, নরনারী, কিন্তু মুখগুলি দেখলে ভয়ে বিস্ময়ে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। বাঘের মুখ, সাপের মুখ, শেয়ালের মুখ, বানরের মুখ, ভল্লুকের মুখ, রাক্ষসের মুখ, কাকের মুখ, শকুনির মুখ, হাড়গিলার মুখ, পেঁচার মুখ ইত্যাদি নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর মুখ সেই সকল নরনারীর স্কন্ধের উপর সংলগ্ন। হাতী, ঘোড়া, গাধা, উট, বৃষ—তা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঁদুর, ছুঁচো, কাঠবিড়াল প্রভৃতির মুখও এক একটা অবয়বের উপর দেখা গেল। অচল পুতুল নয়, সকলগুলাই যেন সজীব—সচল। অত মুখের ভিতর সিংহের মুখ আর

কুকুরের মুখ দেখা গেল না। ভূত আমরা কখনো দেখি নাই, খানকতক মুখ কালো কালো বিকটাকার ; কিসের মুখ, আমরা চিনতে পাল্লেম না। যুধিষ্ঠির বোল্লে ভূত। যা-ই হোক, সেই সকল মূর্ত্তি এক একবার হাঁ করে, এক একবার কলহ করে, এক একবার নাচে, এক একবার লাফায়, এক একবার হাসে, এক একবার কাঁদে, এক একবার কথা কয় ;—মানুষের মতন কথা। একটু পরে দেখলেম, মূর্ত্তিরা সারিবন্দী ছিল, ছাড়িভঙ্গ হয়ে গেল। এক একটা পুরুষ এক একটা মেয়েমানুষ ধোরে টানাটানি আরম্ভ কোল্লে ; মেয়েমানুষগুলো এক একবার চেঁচিয়ে উঠলো, পরক্ষণেই আবার হাসি-তামাসা জুড়ে দিলো! দুই তিনজন একত্র হয়ে একজনের কাপড়ের গাঁঠরী চুরি কোরে নিয়ে ছুটলো, পুলিশের মত পোষাকপরা দুই মূর্ত্তি এসে তাদের বেঁধে ফেল্লে, তার পর কাণে কাণে কি পরামর্শ কোরে তখনি আবার ছেড়ে দিলে! সংসারী মানুষেরা সচরাচর যে সকল কাজ করে, খেলার ভিতর সবরকম আমরা দেখলেম ; চোর, ডাকাত, জুয়াচোর, গাঁটকাটা, যারা যারা সংসারের শত্রু, তাদেরও লীলাখেলা দেখলেম, হাসিখুসী দেখলেম, কি মন্ত্রে তারা পুলিসের লোককে বশ করে, তাও তাদের মুখে শুনলেম। যা যা দেখি, যা যা শুনি, সকলই যেন সত্য সত্য মনে হয়। রাজা দেখলেম, রাজমন্ত্রী দেখলেম, রাজার পোষাক দেখলেম, অলঙ্কার দেখলেম, মন্ত্রীর মন্ত্রণা শুনলেম। রাজার মুখখানা বাঘের মুখ, মন্ত্রীর মুখখানা শিয়ালের। দুই একবার ঘুরে এসে সেই রাজা আর একরকম হয়ে গেল। রাজবেশ কোথায় গেল, কটিতটে মলিন কোপীন, অঙ্গে খড়ি, তৈলাভাবে রুক্ষচুল, ক্ষৌরাভাবে শুষ্কমুখ, কদাকার ; হস্তে ভিক্ষাপাত্র! শৃগালমন্ত্রী রাজবেশে সমুজ্জ্বল!

প্রায় দুইঘণ্টা এইরকম খেলা। সকল মূর্ত্তি চোলে চোলে বেড়াচ্ছিল, পর পর পাঁচ সাতটা মূর্ত্তি শুয়ে পোড়লো, একটা বাঁশী বেজে উঠলো, বাঁশী গাইলে, "এই সব লোকের ভবের খেলা ফুরিয়ে গেল!" মৃত্যু!—ভবধামে মৃত্যু অহরহ ঘুরে বেড়ায়, জীবের কেশাকর্ষণ কোল্লেই জীবের ভবের খেলা ফুরিয়ে যায়।

ভবের খেলা সাঙ্গ হলো। খেলা আমি দেখলেম, সব খেলাতে কিন্তু সমান মনোযোগ থাকলো না। সংসারে কারে আমি বেশী ভয় করি, বাজীকরীরা সে তত্ত্ব জানতো না. কিন্তু আশ্চর্য্য! যে মূর্ত্তির মুখখানা বানরের মত, সেই মূর্ত্তি দর্শন কোরেই আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ;—মুখখানা ঠিক যেন সেই রক্তদন্তের মুখ! অপরাপর অংগপ্রত্যংগ রক্তদন্তের মত নয়, তবুও সেই মুখখানা দেখে আমার ভয় হয়েছিল। খেলা যখন সাঙ্গ হয়ে গেল, তখন আমি সেই দিকে চাইলেম। কোথাও কিছু নাই, যেমন ফাঁকা জায়গা, সেই রকম পরিষ্কার। কেবল সেই দুটী বাজীকরী হাত-ধরাধরি কোরে নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে আমাদের সম্মুখে এসে, নতমস্তকে অভিবাদন কোল্লে। একজন বোল্লে, "সংসার ফক্কিকার! ভবের খেলা এই প্রকার! ভবক্ষেত্রে যারা চরে, দেখতে মানুষের মতন গঠন হোলেও সকলে তারা মানুষ নয়। আমাদের ভবের খেলায় যার যে রকম মুখ দেখলেন, তারা সব সেই রকমের স্বভাব ধরে। সত্য যাঁরা

সত্যমানুষ, তাঁদের নাম সাধু-মানুষ ; আমাদের মায়ার ঘরে আমরা তাঁদের আনতে পারি না!"—এই কথা বোলেই দুজনে আবার নতমস্তকে বক্ষঃস্থলে অঞ্জলি বন্ধ কোরে আমাদের উভয়কে—বাবুকে আর আমাকে হাসতে হাসতে নমস্কার কোল্লে। বাবু তাদের বিস্তর তারিফ দিয়ে প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচটী টাকা বকসীস দিলেন। পুনরায় নমস্কার কোরে তারা বিদায় হয়ে গেল।

কি যেন বোলবে বোলবে মনে কোরে যুধিষ্ঠির ঘন ঘন আমার দিকে চাইতে লাগলো, বাবু নিকটে ছিলেন বোলে কিছু বোলতে পাল্লে না। একটু পরেই সন্ধ্যা হলো। জামা-চাদর গায়ে দিয়ে একগাছি ছড়ী হাতে কোরে বাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যাবে হরিদাস ?"—আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, আজ আর আমি কোথাও যাব না। খেলাটা দেখে মন কেমন বিচলিত হয়েছে, কেন জানি না, কিছুই যেন ভাল লাগছে না।" বাবু আর কিছু বোল্লেন না, ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে, একাকী কামাখ্যাদেবীর আরতি দেখতে চোলে গেলেন।

বাবুর সঙ্গে আমি গেলেম না, তার একটা কারণ ছিল। যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে একটু রঙ্গ করা যাবে, সেইটীই আমার ইচ্ছা, সেই জন্যই গেলেম না। সন্ধ্যাকালের কাজকর্ম্ম সমাপন কোরে, যুধিষ্ঠির এসে আমার কাছে বোসলো। যুধিষ্ঠির বড় আমুদেলোক ; সেদিন আমি কিন্তু তার স্বভাবে কিছু ভাবান্তর দেখলেম। অন্য অন্য দিন তার বদন যেমন প্রফুল্ল থাকে, সেদিন তখন তেমন নয় ; মুখখানি কিছু বিমর্ষ। বিনা আহ্বানে আপনা হোতে যখন এসে বোসেছে, তখন অবশ্যই কিছু বোলবে, এইটী স্থির বুঝে প্রথমে কোন কথা আমি উত্থাপন কোল্লেম না ; কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে যুধিষ্ঠির বোল্লে, "ডাকিনী তো বেশ সুন্দর হয়। দেশে আমি যখন ডাকিনীর গল্প শুনতেম, তখন ভাবতেম, ডাকিনী বুঝি রাক্ষসীদের মতন ভয়ঙ্করী ; তা তো নয়, কামিখ্যার ডাকিনী,—যে দুটী এখানে এসেছিল, তারা তো খুব ভাল! কেমন হাসলে কেমন নাচলে, কেমন নমস্কার কোল্লে, বেশ ডাকিনী! খেলাগুলিও খুব চমৎকার দেখিয়ে গেল। মানুষের শরীরে কতরকম জানোয়ারের মুখ! ওরা সব পারে! গাছচালা ডাকিনী, ভেড়া-করা ডাকিনী, ভূতধরা ডাকিনী, সব তবে ঠিক কথা! তুমি যদি আর একটু বড় হোতে, তা হোলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, খুব বাজনাবাদ্দি কোরে, ঐ রকমের একটা সুন্দরী ডাকিনীকে আমি দেশে নিয়ে যেতেম।"

যদি হাসি, যুধিষ্ঠির কি মনে কোরবে, অথচ না হেসেও থাকা যায় না, মাথা নীচু কোরে একটু হেসে, মুখ তুলে প্রশান্তস্বরে আমি বোল্লেম, তুমি তো আমার চেয়ে অনেক বড়, তুমি কেন একটী ডাকিনীকে বিয়ে কোরে, সঙ্গে নিয়ে দেশে চল না? সত্য যুধিষ্ঠির তাই তুমি কর ;—তুমিই একটা ডাকিনীকে বিয়ে কোরে ফেলো।"

অঙ্গসঞ্চালন কোরে শঙ্কিতবদনে যুধিষ্ঠির বোলে উঠলো, "বাপরে! সে কর্ম্ম ছিল আমার? রাম—রাম—রাম! ডাকিনীরা ভূত নামায়, ভূত চালে, আমি বুড়ো-মানুষ, কোন দিন একটা ভূত চেলে নিয়ে গিয়ে আমার ঘাড় ভেঙে ফেলবে,

আমার ছেলেপুলে অনাথ হয়ে পোড়বে! আমি পারবো না! তুমি নবীন ছোকরা, দিব্য সুন্দর, কার্ত্তিকের মতন রূপ, তোমার রূপে রূপসী ডাকিনী মোহিত হয়ে যাবে, তোমার কাছে আর ভূত চেলে আনবে না। তুমিই বিয়ে কর! যে দুটী এসেছিল, সে দুটী কিছু ডাগোর ডাগোর, তাদের চেয়ে একটু ছোট দেখে, আরো কিছু সুন্দরী দেখে, তুমি একটী ডাকিনীকে বিয়ে কর। বলো যদি, বাবুকেও আমি সুপারিস কোত্তে পারি।"

এইবার আমি যুধিষ্ঠিরের মুখের উপর হাস্য কোল্লেম ; তখনি আবার গম্ভীরভাব ধারণ কোরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা যুধিষ্ঠির, বার বার তুমি ভূতের কথা আনছো, ভূতের ভয়ে কাঁপছো, বাজীকরদের খেলার সময়েও ভূতের মুখ দেখতে পেয়েছিলে ; আচ্ছা যুধিষ্ঠির, ভূত কি তুমি দেখেছ ?"

একখানা হাত উঁচু কোরে তুলে, মুখখানি একটু বিকৃত কোরে, কম্পিত-কণ্ঠে যুধিষ্ঠির বোলে উঠলো, "রাম—রাম—রাম! তা আর আমি দেখিনি? একবার কি কতবার!—বেলগাছে ভূত থাকে, নিমগাছে ভূত থাকে, চাঁপা-ফুলের গাছে ভূত থাকে, শ্মশানঘাটের আশে পাশে ভূত থাকে, মুসলমানের গোরস্থানে বড় বড় মামদো থাকে, কতবার আমি দেখেছি! রাম—রাম—রাম! —একটা গল্প বলি শোনো!—একদিন ভোরবেলা আমি বাবুদের বাগানে ফুল তুলতে গিয়েছিলেম।—বাগানে একটা পুকুর আছে,—শাণবাঁধানো ঘাট ;—ঘাটের দুপাশে দুটো চাঁপাফুলের গাছ। যাচ্ছি, আর দশ-পা এগুলেই চাঁপাতলায় যেতে পারি,—রাম—রাম—রাম! এমন সময় দেখি, একটা চাঁপাগাছে থেকে একজন নামলো ;—বাপ রে!—মনে কোল্লে এখনো গা কাঁপে! রাম—রাম—রাম!—চাঁপাগাছ থেকে নামলো ;—পায়ে খড়ম, দিব্যি কোঁচানো তসর-কাপড় পরা, গলায় ধপধপে সাদা গোচ্ছা পৈতে, হাতে একটা গাড়ু ;—ব্রহ্মদত্তিভূত! রাম—রাম—রাম!—দিব্য গৌরবর্ণ, নাদুস-নুদুস ভুঁড়ি, ঘাড়ের দিকে খোঁপা কোরে চুলবাঁধা, গোঁফ-দাড়ী কামানো। ব্রহ্মদত্তিরা নাপতে কোথায় পায়, তা আমি বোলতে পারি না, কিন্তু কামানো!—খট খট কোরে খড়মের শব্দ হোতে লাগলো, ব্রহ্মদত্তিঠাকুর বাঁধাঘাটের সিঁড়ি দিয়ে জলের ধারে নামলো, খড়ম-জোড়াটা খুলে রাখলে না, খড়ম পায়ে দিয়েই একবুক জলে বারকতক ডুব দিলে। তফাৎ থেকে আমি দেখছি, গুর গুর কোরে বুক কাঁপচে, একটা কাঁঠাল-গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছি, এক একবার উঁকি মেরে দেখছি ;—ব্রহ্মদত্তি উঠলে ; তসরকাপড় একটুও ভিজলো না, মাথার চুলেও জল দেখা গেল না, হাতে সেই গাড়ু। তখনো ভোর ;—একটু একটু ফর্শা ;—বেশ দেখা যাচ্ছে ; —ব্রহ্মদত্তি একটা ধাপের উপর যোগাসনে বোসলো, হাতমুখ নেড়ে নেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক কোল্লে, তার পর আবার খট খট কোরে চোলে এসে চাঁপাগাছে উঠে গেল। আর আমি দেখতে পেলেম না ; গাছের সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেল! আর আমার ফুলতোলা! ভয়েই আমি আড়ষ্ট! সাজিটী হাতে কোরে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে পালালেম। ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পেলেম! ব্রহ্মদত্তি ভূতেরা ভাল-মানুষ হয়, না দোষে মানুষকে কিছু বলে না, অন্যভূত হোলে আমাকে আর

ঘরে ফিরে আসতে হতো না ; ঘাড় ভেঙে সেইখানেই আমার দফা নিকেশ কোরে দিতো !

মূর্ত্তিমান ব্রহ্মদৈত্যের গল্পে কৌতুকী হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আর কোথাও আর কোন রকম ভূত তুমি দেখেছ ?"

হাঁ কোরে আমার মুখের দিকে চেয়ে ভয়াতুর ভূতবক্তা বোলে উঠলো, "ও বাবা ! আবার বলে ভূতের কথা ! কি ডাকাবুকো ছেলে বাপু ! বোল্লেম তো, কতবার কত জায়গায় কত ভূত আমি দেখেছি, একটা বেহ্মদত্তির কথা শুনিয়ে দিলেম, তাতেও কি ভয় হলো না ? রাম—রাম—রাম !—ভূতের কথা কেন তোলো ? হচ্ছিল বিয়ের কথা, ভূতের কথা কেন এলো ? আর আমি বোলতে পারবো না ! আর বোল্লে রাত্রে আমার আর ঘুম হবে না ! বিয়ের কথা বলো। যা আমি বোলছিলেম, তাতেই রাজী হও ;—ভাল দেখে ছোটরকম একটা ডাকিনীকে তুমি বিয়ে কোরে ফেলো।"

ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে আরো কিছু আমি শুনবো, এই রকম ইচ্ছা ছিল, আর শুনা হলো না ; বাবু এসে পোড়লেন, যুধিষ্ঠির উঠে গেল।

জামা-চাদর খুলে রেখে, একটু স্থির হয়ে বোসে, বাবু হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আজ আবার কিসের গল্প জুড়েছিল ?"—আমি উত্তর কোল্লেম, ভূতের গল্প, ডাকিনীর গল্প আর বিয়ের গল্প। ডাকিনী দেখে যুধিষ্ঠির বড় খুসী হয়েছে, যারা এখানে নেচে গেল, ভেল্কী দেখিয়ে গেল, যুধিষ্ঠির তাদের ডাকিনী স্থির কোরেছে। একটু রঙ্গ করবার জন্য আমি তারে বোলেছিলেম, 'তুমি একটা ডাকিনী বিয়ে কোরে দেশে নিয়ে চল।' যুধিষ্ঠির বোল্লে, 'আমি বুড়োমানুষ, ডাকিনী আমাকে ভেড়া বানিয়ে ফেলবে, আর আমি দেশে যেতে পাব না, ছেলেপিলে অনাথ হবেন।"

বাবু একটু হাস্য কোরে বোল্লেন, "পাগলকে তুমি ও রকমে ক্ষেপাও কেন ? একটা কিছু সূত্র পেলেই পাগলেরা অনেক কথা এনে ফেলে। ভূতের গল্প যুধিষ্ঠির অনেক জানে আমরা তার মুখে অনেক রকম ভূতের গল্প শুনেছি। আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে, একজনের মুখে ভূতের কথা, বাঘের কথা, রোগের কথা কিম্বা সর্পাঘাতের কথা শুনলেই তারা সকলেই মুখে মুখে অনেক আজগুবী আজগুবী গল্প আরম্ভ করে। সকলেই যেন সর্ব্বজ্ঞ, সকলেই যেন ভূত দেখেছে, সকলেই যেন বাঘের মুখ থেকে মানুষ ছাড়িয়ে নিয়েছে, সকলেই যেন ধম্মাকাসযুক্ত রোগীকে চব্বিশঘণ্টায় আরাম কোরেছে, সকলেই যেন সর্পাঘাতে মরা মানুষকে বেঁচে উঠতে দেখেছে, এই রকম ভাব জানায় ; আমার যুধিষ্ঠিরটী সেই দলের একজন। তুমি আর তার কাছে ভূতের কথা তুলো না।"—এই পর্য্যন্ত বোলে, কি যেন ভেবে, বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা হরিদাস, ভূতের কথায় তোমার কি বিশ্বাস হয় ?"

বিনা চিন্তায় আমি উত্তর কোল্লেম, "কথায় বিশ্বাস হয় না, কিন্তু খানকতক পুস্তক পাঠে জানতে পেরেছি, পৃথিবীর সকল দেশেই ভূতের নাম, ভূতের অস্তিত্ব, ভূতের গল্প চিরদিন প্রচলিত আছে। গল্প আছে, কিন্তু

ভূতেরা আকার ধারণ কোরে মানুষকে পায় কিম্বা মানুষের ঘাড় ভাঙে, এরূপ গল্পে আমার বিশ্বাস হয় না।"

বাবু হাস্য কোল্লেন ; আবার কিয়ৎক্ষণ চুপ কোরে থেকে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন "ডাকিনী ?—ডাকিনীতে তোমার বিশ্বাস আছে ?"

কেন এ প্রকার প্রশ্ন, ভাব বুঝতে পাল্লেম না ; তথাপি উত্তর কোল্লেম, "কামাখ্যার ডাকিনীর কথা অনেক লোকেই বলে, আমিও কামাখ্যা দর্শন কোল্লেম, মূর্ত্তিমতী ডাকিনী—যাদের মূর্ত্তি দেখলে ভয় হয়, তেমন ডাকিনী একটাও দেখা গেল না, বোধ করি, সে রকম ডাকিনী এখন এখানে নাই ; পূর্ব্বে হয় তো ছিল, এখন হয় তো তাদের বংশলোপ হয়ে গিয়েছে। এখন যারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল দেখায়, লোকের মুখে তারাই হয় তো ডাকিনী।"

বাবুকে এই কথাগুলি বোল্লেম ; যুধিষ্ঠির আমারে ডাকিনী বিয়ে কোত্তে অনুরোধ কোরেছিল, সে কথাটা বাবুর কাছে ভাঙলেম না ; কেমন লজ্জা হলো। সে ভাবের যে সকল কথা হোচ্ছিল, সে সকল প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বাবুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আর কতদিন আমাদের এখানে থাকা হবে ?"

বাবু উত্তর কোল্লেন, "আর কেন ? তীর্থস্থান দর্শন করাই কার্য্য, সে কার্য্য সমাপ্ত হয়েছে, আসামের প্রধান সহর গৌহাটী, সে সহরটীও দেখা হয়েছে, ডাকিনীদের খেলা দেখবার কৌতূহল ছিল, সে কৌতূহলও আজ মিটে গেল, আর কেন ? আর এখানে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন দেখছি না ; যত শীঘ্র যেতে পারি, ততই ভাল ; একটা ভালদিন দেখে এস্থান থেকে প্রস্থান করা যাবে।"

নূতন কৌতূহলে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অন্য কোন তীর্থদর্শনের অভিলাষ আছে কি ?"—আলস্যে একটী হাই তুলে প্রশান্তবদনে বাবু বোল্লেন, "ছিল অভিলাষ, কিন্তু এ যাত্রা আর সে অভিলাষ পূর্ণ হলো না ; অনেকদিন বেরিয়েছি, নানা স্থানের নানা প্রকার জল-হাওয়াতে শরীর মধ্যে মধ্যে অসুস্থ হো'চ্ছে, এ যাত্রা আর অন্যতীর্থে যাব না। দক্ষিণে শ্রীক্ষেত্র আর গঙ্গাসাগর দুর্গম তীর্থ, ঐ দুটী বাকী থাকলো ; গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাটবী দর্শন করা হয়েছে, কামাখ্যাদেবীর পীঠস্থানটীও দর্শন করা হলো, এবার এই পর্য্যন্তই ভাল ; মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার আর পুষ্করতীর্থ-দর্শনের আশা থাকলো, যদি বেঁচে থাকি, ভগবানের যদি মনে থাকে, বারান্তরে সে আশা চরিতার্থ করবার চেষ্টা পাব ; এ যাত্রা এই স্থান থেকেই স্বদেশে যাত্রা করবার ইচ্ছা।"

বাবুর সঙ্গে পঞ্জিকা ছিল, সেই রাত্রেই পঞ্জিকা উদ্ঘাটন কোরে শুভদিন অন্বেষণ করা হলো, দশদিনের মধ্যে শুভদিন পাওয়া গেল না, দশদিন পরে শুক্লা ত্রয়োদশী পুষ্যানক্ষত্র, শুভযোগ, সেই দিনেই যাত্রা করা হবে, স্থির হয়ে থাকলো।

আমার গন্তব্যস্থান নির্ণীত ছিল না। প্রয়াগে দীনবন্ধুবাবু আমারে বোলে-ছিলেন, কামরূপদর্শনের পর তিনি আমারে তাঁর স্বদেশে নিয়ে যাবেন, সেই অঙ্গীকার স্মরণ কোরে আমি মনে কোল্লেম, সেইটাই এখন আমার গন্তব্যস্থান।

একটা নূতন জায়গায় যাওয়ার সংকল্প থাকলে উল্লাসে উৎসাহে শীঘ্র শীঘ্র দিন কেটে যায়, আমাদের সেই দশটী দিন শীঘ্র শীঘ্র অতিবাহিত হয়ে গেল ; শ্রাবণ-মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে তরণী আরোহণ, আমরা কামরূপ থেকে যাত্রা কোল্লেম।

একবিংশ কল্প

নূতন চাকরী

বাবু দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস মুর্শিদাবাদ, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যথাসময়ে আমরা মুর্শিদাবাদে উপনীত হোলেম। রক্তদন্তের ভয়ে এ অঞ্চলে শীঘ্র ফিরে আসবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায়, দীনবন্ধু-বাবুর যত্নে, অনুগ্রহে, অনুরোধে কাজে কাজেই মুর্শিদাবাদে আসতে হয়েছিল। দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীখানি অতি সুন্দর ; যেমন প্রশস্ত, তেমনি সুদৃশ্য। সদরবাড়ী দু-মহল। সম্মুখের মহলে তিনটী দেউড়ী, তাহার পরে প্রাঙ্গণ ; প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে তালগাছের খুঁটী-দেওয়া বৃহৎ এক আটচালা ; আটচালার বাহিরে ঈশানকোণে একটী বিল্ববৃক্ষ ; চারিধারে ইষ্টকের বেদীগাঁথা ; আট-চালার পূর্ব্ব-পশ্চিম-দক্ষিণে সারি সারি অনেকগুলি ঘর ; আটচালার উত্তরাংশে পূজার দালান ;—প্রাচীনপ্রণালীর বিবিধ কারুকর্ম্ম খচিত সাতফুকুরে দালান। সেই দালানের মাথার সঙ্গে রুজু রুজু অপর তিনদিকে দ্বিতল বৈঠকখানা। এটী পূজার মহল। এই মহলের পশ্চাতে দপ্তরমহল, এ মহলেও চকবন্দীকরা উপর-নীচে অনেকগুলি ঘর ; সেই সকল ঘরে দেওয়ান, নায়েব, তোঞ্জী, কারকুন, পেস্কার, মুন্সী, মুহুরী, সরকার প্রভৃতি আমলাবর্গ বাস করেন। নীচের ঘরগুলিতে দপ্তরখানা, উপরের ঘরগুলিতে আমলাদের বাসস্থান। তিন দেউড়ীতে ভিত্তিতে ভিত্তিতে বড় বড় ঢাল, তলোয়ার, কিরীচ সংলগ্ন ; প্রত্যেক দেউড়ীতেই খাটিয়া পাতা, মোট দশজন দরোয়ান সেই সকল খাটিয়ায় বিরাজ করে, দেউড়ীর কোণে কোণে লাঠী, বর্শা, মালকাৎ, মুগুর দণ্ডায়-মান। দেউড়ীর মাথায় নাচঘর ; সম্মুখে প্রায় শতহস্ত দীর্ঘ বারান্দা ; বারা-ন্দার ধারে ধারে জোড়া জোড়া গোল-থামের মাথায় সবুজবর্ণ ঝিলিমিলি ; নিম্ন-ভাগে ফোকরে ফোকরে লোহার রেল, তাতেও সবুজ রং দেওয়া ; বারান্দার সম্মুখে ঠিক মধ্যস্থলে সমচতুষ্কোণ গাড়ী-বারান্দা ;—বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, বিংশতি হস্ত প্রশস্ত ; নীচের চারি কোণে তিন তিনটী মোটা মোটা গোলথাম দণ্ডায়মান হয়ে সেই গাড়ীবারান্দাটী মাথায় কোরে রোয়েছে। বাড়ীর সম্মুখে প্রশস্ত ময়দান, চারিধার কাষ্ঠের রেল দিয়ে ঘেরা, চারিদিকেই রাস্তা ; রাস্তার দু-ধারে রেল দেওয়া ; রাস্তার পাশে পাশে ঢেউখেলানো প্রাচীরঘেরা মণ্ডলা-কার পুষ্পবাটিকা। প্রায় পঞ্চাশ হাত তফাতে বড় বড় থামদেওয়া সুবৃহৎ রঙ্গীন-কপাটযুক্ত ফটক ; ফটকের পশ্চিমধারে বৃহৎ এক সরোবর ; চারি

ধারে, বড় বড় বাঁধা ঘাট ; চারিটী ঘাটের দুই দুই ধারে আটটী শিবের মন্দির। সরোবরের দক্ষিণধারে সদর-রাস্তা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্তরদিকে চেয়ে দেখলে বাড়ীর শোভা অতি চমৎকার দেখায়। ফটকের দু-ধারে দুটী উচ্চ নহবৎখানা।

বাড়ীর আয়তন দেখে বোধ হলো, বাবুরা সেখানকার বুনিয়াদী বড়-মানুষ ; বাড়ীখানি বহুদিনের প্রাচীন ; বাহিরদিকে এলামাটীর রং দেওয়া ভিতরের ঘরগুলিতে শ্বেতপাথরের কাজ করা। নাচঘরটী প্রায় ষাট হাত দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ হাত প্রশস্ত ; মেজে কার্পেটমোড়া, দেয়ালে বড় বড় ছবি, ছবির মাথায় জোড়া দেয়ালগিরী, কড়িকাঠে বড় বড় বেলোয়ারী ঝাড় দোদুল্যমান ; কার্পেটের উপর সারি সারি অনেকগুলি তাকিয়া বালিশ, রক্তবর্ণ আবরণে সেই বালিশগুলি সমাবৃত ; আবরণবস্ত্রের উপর নানাপ্রকার ঝাড়বুটো কাটা ; আসবাবসজ্জায় বিশেষ-সমৃদ্ধির পরিচয় হয়।

বাবুদের জমীদারী অনেকগুলি ; নিজের বাসগ্রামখানিও তাঁদের জমী-দারীর অন্তর্গত। শুনা গেল, গৃহবিবাদে কতকগুলি জমীদারী নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কতকগুলি ভাগ হয়ে গিয়েছে, বংশবৃদ্ধি হওয়াতে বংশের কেহ কেহ পৈতৃক বাড়ী পরিত্যাগ কোরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়ে বাস কোরেছেন।

দীনবন্ধুবাবুর নিজাংশে যে কয়েকখানি জমীদারী আছে, তার বার্ষিক আয় সদর মালগুজারী বাদে প্রায় সত্তর আশী হাজার টাকা। দুঃখের বিষয়, দীনবন্ধুবাবুর পুত্র সন্তান নাই ; পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র তিনি ; পিতা বর্ত্তমান নাই, তিনিই এখন কর্ত্তা। পাঁচটী সহোদর ছিলেন, দেশব্যাপী মহামারীতে অপরাপর পরিবারের সহিত চারিটী সহোদর অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়ে-ছেন। একটী কনিষ্ঠ সহোদর বর্ত্তমান, তাঁর নাম পশুপতি, বয়স অনুমান পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর। দীনবন্ধুবাবু অপুত্রক, ভ্রাতৃবিয়োগী, মনের দুঃখে তিনি বিষয়কার্য্যে উদাসীন, ছোটবাবুই সমস্ত বিষয়কর্ম্ম দেখেন। যে সকল দলীলপত্রে দস্তখৎ না কোল্লে নয়, বড়বাবু কেবল সেইগুলিতে স্বাক্ষর মোহর কোরে দেন। জমীদারী-সম্বন্ধে এইমাত্র তাঁর কার্য্য ; তাঁর অধিকাংশ সময় ঠাকুরপূজাতে আর ইষ্টমন্ত্রজপে অতিবাহিত হয়। ভদ্রাসনবাড়ী থেকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী প্রশস্ত উদ্যানে বাবুদের পৈতৃক ব্রহ্মময়ী দেবী প্রতি-ষ্ঠিতা আছেন, ব্রহ্মময়ীর মন্দিরেই বেলা প্রায় আড়াইপ্রহর পর্য্যন্ত বড়বাবু প্রতিদিন উপস্থিত থাকেন, সেইখানেই পূজা-অর্চ্চনা হয়, সন্ধ্যাকালেও সেই মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখেন। বিষয়কার্য্যে ঔদাস্য জন্মেছে বোলেই তীর্থ-দর্শনে তাঁর অনুরাগ। তিনি আড়ম্বর ভালবাসেন না ; তীর্থভ্রমণকালেও কোন প্রকার আড়ম্বর থাকে না ; অত বড় একজন জমীদার কেবল একজন বৃদ্ধ চাকর সঙ্গে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলেন, এই পরিচয়েই পাঠক-মহাশয় দীনবন্ধুবাবুর আড়ম্বরশূন্যতার উত্তম প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। নিজের পোষাক-পরিচ্ছদেও বাবুগিরী নাই, প্রবাসে তাঁরে দর্শন কোল্লেও সামান্য এক-জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বোলে মনে হয়। প্রয়াগসঙ্গমে তাঁরে দর্শন কোরে আমিও বাস্তবিক সেইরূপ মনে কোরেছিলেম। তার নিজগ্রামে উপস্থিত হয়ে জানতে

পাল্লেম, ধনসম্পদে ও মানগৌরবে তিনি একজন রাজাবিশেষ ; বাড়ীখানিও যেন রাজবাড়ী।

গ্রামখানির নাম যদুপুর। গ্রামবাসীরা দীনবন্ধুবাবুর একান্ত ভক্ত। নাচ-ঘরের পাশে একটী ছোটঘর, সজ্জা পরিষ্কার, কিন্তু আড়ম্বরশূন্য ; সেই ঘরে বড়বাবু বসেন। গ্রামের ভদ্রলোকেরা দেখা কোত্তে এলে সেইখানেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়, বাবু তাঁদেরসঙ্গে দিব্য অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করেন, যাঁর যেমন মর্য্যাদা তদপেক্ষা বেশী সম্মান দেখান, এই কারণে সকল লোকেই তাঁর গুণগান করেন, যশোগান করেন, মঙ্গলকামনা করেন ; সকলেই তাঁর বাধ্য। কেবল এই কারণেই নয়, গ্রামের কেহ বিপদাপন্ন হোলে অর্থে সামর্থ্যে তিনি সাহায্যদান করেন, নিরুপায় দরিদ্র গৃহস্থের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কোরে দেন, পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায় প্রভৃতিতে দায়গ্রস্থ হয়ে কেহ তাঁর শরণাপন্ন হোলে, তিনি মুক্তহস্ত হয়ে সেই সকল কার্য্যের পূর্ণব্যয়ভার একাকী বহন করেন। এত গুণের অধিকারী সেই মহানুভব দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।

সদরবাড়ীর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আমি দিয়েছি, অন্দরমহলের কিছুই আমার দেখা হয় নাই। একমাস আমি সেই বাড়ীতে থাকলেম, অনেকের সঙ্গেই আলাপ হলো ; বড়বাবু আদর করেন, তাই দেখে আর আমার স্বভাবচরিত্র বুঝতে পেরে, ছোটবাবুও দিন দিন আমারে ভালবাসতে লাগলেন। সেই বাড়ীতে আমার চাকরী হলো। মাসিক বেতন কুড়ি টাকা। সেরেস্তায় বোসে লেখাপড়া করা আর বড়বাবুর নিজ খরচপত্রের হিসাব রাখা, কেবল এই পর্য্যন্তই আমার কার্য্য ; সময় অনেক পাই, সংস্কৃত আর ইংরেজী ভাষার চর্চ্চার কোন ব্যাঘাত হয় না।

বাড়ীর আমলারা দুই বেলা ব্রহ্মময়ীর বাড়ীতে গিয়ে ভোগের প্রসাদ পান, প্রথম প্রথম দিন পাঁচ ছয় আমারেও সেই দেবালয়ে আহার কোত্তে যেতে হয়েছিল, তার পর ছোটবাবুর আদেশে বাড়ীর মধ্যেই আমার আহারের ব্যবস্থা হয়। বাড়ীতেও নিত্য নিত্য ব্রহ্মময়ীর প্রসাদ আসে, ভোগের প্রসাদ পেতে আমিও বঞ্চিত থাকি না।

হাঁ, অন্দরমহলের কোন কথাই আমি বোলতে পারি নাই। যখন অন্দরে প্রবেশ করবার অনুমতি পেলেম, তখন দেখলেম, সদরমহল অপেক্ষাও অন্দর-মহল বড়। রন্ধনমহল, ভাণ্ডারমহল, ঘাটমহল, শয়নমহল, সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন। ঘাটমহল ব্যতীত আর তিনটী মহলে সুন্দর সুন্দর অনেক ঘর। সেই সকল ঘর বহুসামগ্রী-পরিপূর্ণ ; শয়নমহলের ঘরগুলি সুসজ্জিত। সব দেখ-লেম ভাল, কেবল একটী দৃশ্য আমার চক্ষে বড় শোচনীয় বোধ হলো। বাড়ীতে বিধবা রমণী অনেকগুলি। বড়-বৌঠাকুরাণী, ছোট-বৌঠাকুরাণী আর বাবুর একটী ভাইঝি ব্যতীত যাঁর দিকে চাই, তাঁরেই দেখি ম্রিয়মাণা ;—অলঙ্কারশূন্য, সিন্দূরশূন্য, মুণ্ডিতমস্তক, থানবস্ত্রপরিহিতা। স্ত্রীলোকেরা কেহই আমারে দেখে ঘোমটা দেন না, লজ্জা করেন না, সকলগুলির মুখ আমি দেখতে পাই : বিধবাগুলির ম্লানমুখ দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। গৃহিণী পরম সুন্দরী, বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর ; পুত্র হয় নাই, শুনলেম, একটী কন্যা হয়েছিল,

জন্মের এক বৎসর পরেই সেটী মারা গিয়েছে ; সেই দুঃখে এক একবার তিনি ম্লানমুখী হন, নতুবা সর্ব্বক্ষণ তাঁরে প্রসন্নমুখী দেখা যায়। ছোট-বৌটীও সুন্দরী ; বয়স অনুমান ১৮।১৯ বৎসর। তিনিও সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্লবদনে সংসারের কাজকর্ম্ম করেন, মিষ্টবচনে সকলকেই তুষ্ট রাখেন, আবশ্যক হোলে আমার সঙ্গেও অসঙ্কোচে ফুল্লবদনে কথা কন। বাবুর ভাইঝিটীর নাম নয়নতারা ; গত বৎসর বিবাহ হয়েছে ; বয়স অনুমান দ্বাদশবর্ষ ; বর্ণ শ্যামোজ্জ্বল, লাবণ্য চমৎকার ; নয়নতারার নয়ন দুটী পলকে পলকে যেন হাস্য করে। নয়নতারা আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা কন ; হাসিও মিষ্ট, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। বিধবাগুলির রূপ বর্ণনা কোত্তে ক্লেশবোধ হয়, সুতরাং সে বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকলেম। বাড়ীতে দাসী-চাকর অনেক ; পাচক-পাচিকা নাই, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাই রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন ; স্বয়ং গৃহিণীই রন্ধনশালার অধিক কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন কোরে থাকেন। ছোট-বৌটীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট স্নেহ। চক্ষেও দেখলেম, লোকের মুখেও শুনলেম, বড়-বৌঠাকুরাণী এ সংসারের লক্ষ্মী।

আমি চাকরী করি। মুর্শিদাবাদ প্রাচীন সহর, অবকাশকালে প্রকৃতি-দর্শনে আমি বহির্গত হই। ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে মুর্শিদাবাদ সহর, পশ্চিমকূলেও অনেকগুলি নগর ছিল, ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধিশূন্য হয়ে এসেছে। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন নাম ছিল, মুখশুধাবাদ, বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলীখান আপন নামে এই মুখশুধাবাদের নূতন নাম দেন মুর্শিদাবাদ। তদবধি সেই নামটীই চোলে আসছে।

পূর্ব্বেই বোলেছি, ভাগীরথীর উভয়কূলে মুর্শিদাবাদ। পূর্ব্বকূলে সহর, আদালতযুক্ত বহরমপুর, কাশীমবাজার, খাগড়া ইত্যাদি ; পশ্চিমকূলে আজিমগঞ্জ, কাণসোণা, কিরীটেশ্বরী ও রাঙামাটী প্রভৃতি অনেক স্থান আছে। আমি গরিব, কিন্তু যেখানে যখন যাই, সেখানকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করবার ইচ্ছা বলবতী হয়ে থাকে। মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরী নামে এক দেবী আছেন। লোকের মুখে শুনা গেল, এই দেবী ভগবতীর পীঠমালার একটী পীঠের অধিষ্ঠাত্রী। ভগবতীর মস্তকের কিরীট বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে এইখানে পতিত হয়, তাতেই কিরীটেশ্বরী নাম ; ভৈরব এখানে সম্বর্ত্তদেব। কিরীটেশ্বরীকে কেহ কেহ মুকুটেশ্বরী বলে, কেহ কেহ বিমলাও বলে ; বস্তুতঃ কিরীটপাতের পীঠেশ্বরী সাধারণতঃ কিরীটেশ্বরী নামেই প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে অনেক বড় বড় লোক এই তীর্থে সমাগত হোতেন, দেবীর সেবার ব্যবস্থা খুব ভালই ছিল, অনেক লোক এই তীর্থপ্রসাদে প্রতিপালিত হতো, সমারোহের সীমা ছিল না। ডাহাপাড়া গ্রামের দেড়ক্রোশ পশ্চিমে কিরীটেশ্বরী-পীঠ। কিরীটেশ্বরীর মন্দির অতি সুন্দর ছিল, এখন ভগ্নাবশেষ ; কালাপাহাড় সে মন্দিরে কোন অপকার করে নাই। আদিমন্দির ভগ্নস্তূপ, দ্বিতীয়বার আর একটী মন্দির নির্ম্মিত হয়, সংস্কারাভাবে সেটীও জীর্ণপ্রায়। আপনাদের সুবিধার জন্য পূজকেরা এখন গ্রামের মধ্যে একটী স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ কোরে সেইখানে কিরীটেশ্বরী স্থাপন কোরেছেন, সেইখানেই পূজা হয়। "কিরীটেশ্বরীর মেলা" নামে পৌষ-

মাসে মহাসমারোহে একটী মেলা হতো, আজিও হয়, কিন্তু এখন কেবল নাম মাত্র। মুর্শিদাবাদ যখন বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার রাজধানী হয়, মুসলমান-নবাবেরা সেই সময় কিরীটেশ্বরীর মহিমা স্বীকার কোত্তেন। কথিত আছে, মহারাজ নন্দকুমার যখন নবাবসরকারের দেওয়ান ছিলেন, সেই সময় নবাব মীরজাফর আপন জীবনের অন্তকালে মহারাজের অনুরোধে কিরীটেশ্বরী-দেবীর চরণামৃত পান কোরেছিলেন।

মুর্শিদাবাদের রাঙামাটী একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখন সেই রাঙামাটী কেবল প্রস্তর আর রক্তবর্ণ মৃত্তিকার স্তূপে পরিণত ; অধিকাংশ স্থান ভাগীরথী-গর্ভে প্রবেশ কোরেছে! রাঙামাটীর প্রাচীন নাম কর্ণসুবর্ণ,—অপভ্রংশে কাণসোণা। প্রবাদ এইরূপ যে, ঐ স্থানে দাতকর্ণের রাজধানী ছিল। কর্ণসুবর্ণ পুরাণপ্রসিদ্ধ অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত। মহাভারতের উদযোগপর্ব্বে বর্ণিত আছে, রাজা দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজপদে বরণ কোরে ভারতযুদ্ধে সেনাপতিত্ব প্রদান কোরেছিলেন, সেই অঙ্গরাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। স্থানের নাম রাঙামাটী কেন হয়েছিল, সে প্রসঙ্গেও একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কর্ণপুত্র বৃষকেতুর অন্নপ্রাশনের সময় লঙ্কেশ্বর বিভীষণের নিমন্ত্রণ হয়েছিল, রাজা বিভীষণ নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হয়ে স্বর্ণবৃষ্টি কোরেছিলেন, সেই স্বর্ণপ্রভায় কর্ণসুবর্ণের সমস্ত মৃত্তিকা স্বর্ণবর্ণ ধারণ কোরেছিল ; স্বর্ণবর্ণ রক্তবর্ণ নয়, তথাপি লোকমুখে সেই স্থানের নূতন নাম হয় রাঙামাটী। বহুলোকের মুখেই এই কথা শুনা যায়। বস্তুতঃ কর্ণসুবর্ণ একজন বড়রাজার রাজধানী ছিল, তার অনেক চিহ্ন দেখা যায় ; শোভাসমৃদ্ধি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তথাপি এখনো রাজডাঙ্গা, ঠাকুরডাঙ্গা, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, ভাণ্ডারডাঙ্গা প্রভৃতি কতকগুলি উচ্চ উচ্চ স্থান বিদ্যমান আছে। কর্ণসুবর্ণে অনেক অট্টালিকা ও অনেক দেবালয় ছিল, ইষ্টকপ্রস্তরাদি-স্তূপের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কিরীটেশ্বরীতেও অনেক মন্দির ও অনেক দেব-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

কিরীটেশ্বরীর ভৈরব প্রকৃতপক্ষে মহাদেবের ন্যায় মূর্ত্তিবিশিষ্ট কি না, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। মূর্ত্তি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, বাম হস্তখানি ক্রোড়সংলগ্ন, দক্ষিণ-হস্তখানি পাদসংলগ্ন, মস্তকে টোপর, গলদেশে যজ্ঞোপবীত। এই মূর্ত্তি দর্শন কোরে অনেকে অনুমান করেন, ভৈরবরূপী বুদ্ধমূর্ত্তি। বুদ্ধদেবের পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি : ধ্যানী বুদ্ধ, সমাধিস্থ বুদ্ধ, প্রচারক বুদ্ধ, যাত্রী বুদ্ধ, মুমূর্ষু বুদ্ধ। ঐ মূর্ত্তি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি বোলে অনুমিত হয়। ঐ মূর্ত্তি প্রাচীনকালাবধি ঐ স্থানে আছে কিম্বা কোন বুদ্ধতীর্থ থেকে ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি কিরীটেশ্বরীতে কেহ আনয়ন কোরেছেন, এখানকার লোকেরা সে কথা বোলতে পারেন না। বিজ্ঞলোকেরা বলেন, ভৈরবেরা ত্রিনেত্র, এ মূর্ত্তিতে ত্রিনয়ন নাই, অতএব ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি বোলেই সিদ্ধান্ত করা হয়।

এখানে মহীপাল নামে একটী স্থান আছে। স্থানটী গঙ্গাতীরে। রাজা মহীপাল এই স্থানের নাম দিয়েছিলেন মহীপাল নগর। অধুনা সেই নগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যামান। রাজা মহীপালের প্রাসাদ এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত।

রাজা মহীপাল এখানে একটী দীর্ঘিকা খনন করান, সেই দীর্ঘিকার নাম সাগর-দীঘী। প্রাচীনলোকের মুখে শুনা গেল, প্রায় একাদশ শতবর্ষ পূর্ব্বে এই দীঘী খনিত হয়। এই দীঘীর নাম কেন সাগরদীঘী, তৎসম্বন্ধে এখানে একটা গল্প আছে। খননকার্য্য সমাপ্ত হয়ে গেলেও দীঘীতে জল হয় নাই, রাজা মহীপালদেব স্বপ্নযোগে এইরূপ একটী দেবাদেশ প্রাপ্ত হন যে, "মহীপাল-নগরে সাগরপাল নামে এক কুম্ভকার বাস করে, সে যদি দীঘীর নিম্নভাগে এক কোদাল মাটী কেটে দেয়, তা হোলেই তৎক্ষণাৎ জল উঠবে।"

সেই প্রত্যাদেশে রাজা তৎপরদিবস সাগরপালকে ডাকান, সাগরপাল মাটী কাটে, দীঘী জলপূর্ণ হয়। এ গল্প কতদূর বিশ্বাস্য, সে কথা বলা যায় না। লোকে বলে, সাগরপালের নামেই দীঘীর নাম সাগরদীঘী। এই দীঘী পূর্ব্ব-পশ্চিমে অর্দ্ধক্রোশ দীর্ঘ, উত্তরদক্ষিণে প্রায় সহস্র হস্ত প্রশস্ত। দীঘীর উভয় তীরে দশটী বাঁধাঘাট ছিল ; ঘাটগুলির এখন ভগ্নাবস্থা, কেবল কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায় মাত্র। ঘাটের ধারে ধারে কতকগুলি পান্থাশ্রম ছিল, সে সকল আশ্রম এখন কেবল ইষ্টকস্তূপে পরিণত। একটা স্তূপের বর্ত্তমান নাম "বুড়ো পীরের দরগা।" রাজা মহীপালদেব ৭৪০ শকে এই দীঘী খনন করান। বঙ্গে-শ্বর লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌড়ে এই প্রকার একটী দীঘী খনিত হয়, সে দীঘীর নামও সাগরদীঘী। দিনাজপুরে রাজা মহীপালের কীর্ত্তিখ্যাতস্বরূপ একটী দাঘী আছে, সে দীঘীর নাম মহীপালদীঘী।

লোকের মুখেও কতক কতক শুনলেম, চক্ষেও কতক কতক আমি দেখ-লেম। ভাগীরথীর উভয়তীরে মুর্শিদাবাদের যে যে স্থান দর্শনযোগ্য, কতিপয় বিশেষজ্ঞ লোকের সঙ্গে এক একদিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে সেগুলিও আমি দর্শন কোল্লেম। পূর্ব্বতীরে নবাব নাজীমের বাড়ী, বাগান, চিত্রশালা, তোপখানা ইত্যাদি দিব্য সুন্দর ; কাশীমবাজারের রাজবাড়ী খুব প্রশস্ত, কিন্তু প্রাচীন ধরণের। বহরমপুরের আদালতগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাগড়ার পিত্তল-কাঁসার জিনিস বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। একে একে এই সব আমি দেখলেম। আমার চক্ষে সুন্দর বোধ হলো, কিন্তু এখানকার ভদ্রলোকেরা বলেন, মুর্শিদা-বাদের পূর্ব্বশ্রী এখন কিছুই নাই। মুর্শিদাবাদ যখন বাঙলার রাজধানী ছিল, তখন এ স্থানের শোভাসমৃদ্ধির সীমা ছিল না। চীন-পরিব্রাজক হিউয়েনশিয়াং ভারতভ্রমণ সময়ে মুর্শিদাবাদে এসেছিল, সেই দূরদর্শী ভ্রমণকারীর লিখিত বিবরণীতে মুর্শিদাবাদের উচ্চপ্রশংসা পরিকীর্ত্তিত আছে, এ কথাও আমি এখানকার পণ্ডিতলোকের মুখে শ্রবণ কোল্লেম।

তিনমাস আমি দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীতে অবস্থান কোল্লেম, চাকরী করি আর ভ্রমণ করি, এই আমার কার্য্য। বাবুর পরিবারবর্গের কাছে দিন দিন আমার আদর-যত্ন বাড়তে লাগলো ; বাবুর যথেষ্ট আদর-যত্ন তো ছিলই, বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতিবাবুও আমারে খুব ভালবাসলেন । পশুপতি-বাবুর স্বভাবচরিত্র নির্ম্মল, অল্পবয়সে বিষয়বুদ্ধিও বেশ পরিপক্ক, নীতিশাস্ত্র-জ্ঞানেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন না, তাঁর কথাবার্ত্তায় আর সদয়ব্যবহারে দিন দিন তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি আমার সঙ্গে সখ্যভাবে কথা কন,

ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস বলেন, বিষয়কর্ম্মের জটিলতা বুঝিয়ে দেন, এক এক-দিন সন্ধ্যাকালে তাঁর মুখে আমি আমোদপ্রমোদের খোসগল্প শুনে বড় সুখী হই। গল্পগুলি দোষাংশপরিশূন্য, তার উপর নীতিশাস্ত্রের অনুগত। আমলা-বর্গের সঙ্গেও আমার বেশ আলাপ হলো, বাবুদের আদর-যত্ন দেখে বাড়ীর চাকরেরাও আমার আজ্ঞাকারী হয়ে থাকলো, পল্লীবাসী ভদ্রসন্তানেরাও ক্রমে ক্রমে আমারে চিনলেন, তাঁদের কাছেও আমি স্নেহ-ভালবাসালাভে হতাশ হোলেম না।

যে বৎসরের কথা আমি বোলছি, সে বৎসর কার্ত্তিকমাসে দুর্গাপূজা হয়। বাবুর বাড়ীতে মহা সমারোহে মহামায়ার পূজা হলো। বৃহৎ প্রতিমা, চমৎকার গঠন, চমৎকার সজ্জা, সমস্তই চমৎকার। পূজার তিনদিন বিস্তর লোকের সমাগম, ভোজের ব্যাপার সমৃদ্ধিসম্পন্ন, নিমন্ত্রিতগণের আদর-অভ্যর্থনাও অনুপম। কলিকাতায় প্রতিমার নিকটে প্রণামী দিবার রীতি আছে, এখানে সে রীতি নাই। দিবারাত্রি উৎসব। বৈকালে চন্ডীর গান, রাত্রিকালে যাত্রা। এই গ্রামের অনেক বাড়ীতেই পূজা হয়, অনেক বাড়ীতেই ঘটা হয়, কিন্তু চন্ডীর গান আর যাত্রা ছাড়া কোন বাড়ীতেই খেমটানাচ কিম্বা বাইনাচের মজ-লীস দেখা গেল না। সকলেই ভাবেন, মহামায়ার আগমন-উৎসবে বাড়ীতে বেশ্যানর্ত্তন দূষণীয়।

দশমীতে ভাগীরথীগর্ভে মা দুর্গার নিরঞ্জন। অনেক লোকের সঙ্গে আমি নিরঞ্জন দেখতে গেলেম। ছোট বড় অনেকগুলি প্রতিমা এক জায়গায় জমা হলো, দুর্গামঙ্গলের গায়ক-সম্প্রদায় করুণরাগিণীতে গঙ্গাতীরে বিজয়া গাই-লেন, অনেক ভক্তের চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা গেল, তার পর বিসর্জ্জন। স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় মহামায়ার মৃন্ময়ী প্রতিমাগুলি একে একে হেলে হেলে গঙ্গা-জলে ডুবলেন, ভাগীরথীবক্ষে নৌকার উপর ৫।৭ খানি প্রতিমার বাচখেলা হলো, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিরঞ্জন সমাপ্ত। কলিকাতায় বিজয়োৎসবে যে যে অঙ্গ পালিত হয়, শান্তিজলগ্রহণ, দুর্গানাম লেখা, সিদ্ধিপান, পরস্পর আলিঙ্গন-সম্ভাষণ ইত্যাদি সেই সেই অঙ্গগুলি সমভাবেই প্রতিপালিত হলো। এখানে কেবল দুটী প্রথা আমি নূতন দেখলেম। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই প্রতিমা-বিসর্জ্জন হয়ে গেল, কিন্তু যতক্ষণ আকাশে নক্ষত্রোদয় না হলো, ততক্ষণ পূজাবাড়ীর কর্ত্তারা কেহই ঘরে ফিরে এলেন না, সন্ধ্যার সময় পূর্ণঘট সঙ্গে কোরে, নক্ষত্র দেখে দলবলসহ বাড়ী এলেন, এই একটী প্রথা ; আর,—যারা বনিয়াদী লোক, পুরুষানুক্রমে যাঁদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়, তাঁরা বাড়ীতে প্রবেশ করবার অগ্রে একটী লক্ষণ পরীক্ষা করেন। বাড়ীর কর্ত্তা সদরদরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে এক একটী নীলকণ্ঠপাখী উড়িয়ে দেন, পাখী যদি উড়ে উড়ে বাড়ীর ভিতর যায়, তবেই মঙ্গল, নতুবা পাখী যদি বাহিরদিকে উড়ে যায়, তবেই অমঙ্গল লক্ষণ বুঝায় : সেই অমঙ্গলের প্রতিবিধানার্থ আগামী বৎসরে মা দুর্গার উদ্দেশে স্বতন্ত্র মানসিক পূজার মানস কোত্তে হয়। দীনবন্ধুবাবুও তদনুসারে নীলকণ্ঠপাখী উড়ালেন, পাখীটী ফুর ফুর কোরে উড়ে পূজার দালানে গিয়ে বোসলো, উচ্চকণ্ঠে "জয় মা দুর্গা!" উচ্চারণ কোরে প্রহৃষ্টবদনে

সকলে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। বাবুদের কাছে কাছে আমি। দালানের যে চৌকীতে প্রতিমাস্থাপন হয়েছিল, সেই চৌকীর উপর দুটী বালিকা গৌরীকুমারী বোসেছিলেন, পার্শ্বে একটী ঘৃতপ্রদীপ জ্বোলছিল, সম্মুখে সেই নীলকণ্ঠ ; চৌকীর উপর পূর্ণঘটস্থাপন কোরে সকলে সেইখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কোল্লেন, আমিও প্রণাম কোল্লেম। তার পর বিজয়াকৃত্যের অপরাপর অঙ্গসমাধান। সে রাত্রে আর যাত্রাদি কোন প্রকার উৎসব হলো না, ঘটের কাছে আরতি হলো, আবার আমরা প্রণাম কোল্লেম। রাবণবধের অগ্রে সমুদ্রতীরে রামচন্দ্র অকালে শরৎকালে দুর্গাপূজা কোরেছিলেন, রামচন্দ্রের বিজয়োৎসবের অনুকরণে এই বিজয়োৎসবের প্রবর্ত্তন ; কিন্তু বিজয়ার অনেকগুলি অঙ্গ অধুনা নূতন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রামচন্দ্র সেকালে বানর-ভল্লুকাদির সঙ্গে কোলাকুলি কোরেছিলেন, একালে এখন মানুষে মানুষে মেলা।

বিজয়া-রজনী প্রভাত হলো, বাদ্যকরেরা মধুরতালে নানাপ্রকার রং বাজিয়ে বকসীস নিয়ে বিদায় হয়ে গেল, দক্ষিণা পেয়ে আশীর্ব্বাদ কোরে পুরোহিতেরাও বিদায় হোলেন, সংবৎসরের মত দুর্গোৎসবের আমোদ ফুরালো।

দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে গোলমাল থেমে গেল, পূজার পূর্ব্বাবধি শেষের পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত দপ্তরখানার কাজকর্ম্ম বন্ধ ছিল, বন্ধের অবসানে পুনরায় আমরা স্ব স্ব কর্ত্তব্যকার্য্যে মনোনিবেশ কোল্লেম।

দ্বাবিংশ কল্প

কৃষ্ণকামিনী

পূজার মঙ্গলাচরণে পূজার পূর্ব্বে আগমনীগীত হয় ; পূজাবাড়ীতেও আগমনী আনন্দ বর্দ্ধিত হয়ে থাকে ; সম্পর্কীয় নানাস্থান থেকে কুটুম্বসাক্ষাতের আগমন হয়। সচরাচর নারী-কুটুম্বিকাই অধিক। দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীতে প্রায় ২০।২৫টী কুটুম্বিকা এসেছিলেন, পূর্ণিমার পূর্ব্বেই কতকগুলি বিদায় হয়ে গিয়েছেন, কতকগুলি আছেন, শ্যামাপূজার পর শুক্লপক্ষে বিদায় হবেন, এইরূপ অবধারিত। কুটুম্বিকাগণের মধ্যে একটী আমাদের বড়বধূঠাকুরাণীর কনিষ্ঠা ভগিনী। সর্ব্বদা আমি বাড়ীর ভিতর যাওয়া-আসা করি, পরিবারেরা আমারে দেখে লজ্জা করেন না, নবাগতা কুটুম্বিকারাও অনাবৃতবদনে আমার সাক্ষাতে দেখা দিতেন, আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন, আবশ্যক হোলে দুটী একটী কথাও বোলতেন ; আবশ্যক হোলে আমিও তাঁদের দুই একজনকে দুটী একটী কথা জিজ্ঞাসা কোত্তেম। যাঁরা চোলে গিয়েছেন, তাঁদের তো কথাই নাই, যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার সেইরকম ভাব। যিনি আমাদের গৃহলক্ষ্মীর সহোদরা, কি জানি কেমন ঘটনা, সেইটীর সঙ্গে আমার কিছু বেশী ঘনিষ্ঠতা। সেটী দেখতে দিব্য সুন্দরী, বর্ণ যেন দুধে আলতা মাখা, মুখখানি যেন পদ্মফুল, চক্ষুদুটী যেন মৃগচক্ষু, ভ্রূ-

যুগল যেন তুলী দিয়ে আঁকা, নাসিকাটী সরল, ঠোঁট-দুখানি যেন বিম্ব-ফলের মত লাল টুকটুকে, গালদুটী পুরন্ত, কাণদুটী ছোট ছোট, কপাল-খানিও ছোট, মস্তকের কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চাতে গুচ্ছে গুচ্ছে আজানু-লম্বিত ; সম্মুখের কেশাগ্র ঈষৎ কুঞ্চিত, কর্ণের উভয়পার্শ্বে কুঞ্চিত অলক দোদুল্যমান ; বাতাসে উড়ে উড়ে সেই কুঞ্চিত কেশগুলি যখন কপালের উপরে এসে পড়ে, কপালখানি তখন প্রায় দেখা যায় না, সে সময় মুখখানি বড় সুন্দর দেখায় ; হস্তপদ মোলায়েম, গঠন অতি সুন্দর, কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার, সর্ব্বদা রঞ্জিতবস্ত্র পরিধান করা অভ্যাস ; অঙ্গে বিস্তর অলঙ্কার নাই ; নাসাগ্রে একটী বড়মুক্তার নোলক, দুকাণে দুটী দুল, গলায় একছড়া দু-নর-করা চিকণ হার, দু-হাতে দু-গাছি বালা, পায়ে পাইজোর ;—এই পর্য্যন্ত। কণ্ঠস্বর অতি মধুর, কথা কবার সময় চক্ষের পাতাগুলি যেন নেচে নেচে খেলা করে, বয়স অনুমান পঞ্চদশবর্ষ ; নাম কৃষ্ণকামিনী।

কৃষ্ণকামিনী অবিবাহিতা কুমারী। বাঙালীর ঘরে পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা অবিবাহিতা থাকে, এটা একটা অসম্ভব কথা ; আশ্চর্য্য বোল্লেও বলা যায়। কারণজিজ্ঞাসু হয়ে কারো কাছে সেই কথা আমি বোলবো, কারণটা কি, সেইটী জানবো, একবার এরূপ ইচ্ছা হয়েছিল, সেরূপ জিজ্ঞাসায় যদি কোন দোষ ঘটে, তাই ভেবে সে ইচ্ছাকে আমি দমন কোরে রেখেছিলেম। দৈবাৎ একদিন একটা কাজের জন্য গিন্নীর ঘরে আমি প্রবেশ কোরেছি, সেদিন ভূতচতুর্দ্দশী ; শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন। গিন্নীর ঘরে তখন তিনটী প্রতিবাসিনী প্রৌঢ়া রমণী উপস্থিত ছিলেন, একধারে কৃষ্ণকামিনীও চুপটী কোরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রতি-বাসিনীদের সঙ্গে গিন্নীর তখন কি সব কথাবার্ত্তা হোচ্ছিল, আমি গিয়ে দাঁড়া-লেম, কথায় ভঙ্গ দিয়ে গিন্নী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হরিদাস ? আমারে কি তুমি কিছু বোলতে চাও ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "বোলতে কিছু চাই না, বাবু পাঠিয়ে দিলেন, কোথায় তিনি যাবেন, আসতে রাত হবে, নীলরঙের শালের চাদরখানি—"

আর আমারে কিছু বোলতে হলো না ; ঠাকুরাণী আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টবচনে বোল্লেন, "আর বুঝি তিনি লোক পেলেন না ? সকল কাজেই হরিদাস :—বড় বড় কাজেও হরিদাস, সামান্য সামান্য ছোট-কাজেও হরিদাস ; আচ্ছা দাঁড়াও, দিচ্চি।"—আমারে দাঁড়াতে বোলে, একজন প্রতিবাসিনীর দিকে ফিরে, তিনি বোলতে লাগলেন, "ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর ? আমরা কুলীনের মেয়ে, ফুল কুল কোরেই দেশের লোকেরা সারা হন,—কি অশুভক্ষণেই যে আমাদের দেশে কুল এসে ঢুকেছে, কুলের কর্ত্তারাই তা বোলতে পারেন। ঘর-বর পাওয়া যায় না ; এই আমি,—আমার কথাই বোলচি, এই আমি এখন একটা সংসার মাথায় কোরে গিন্নীপনা কোত্তে বোসেচি, আমারই বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর উতরে গেলে ;—সে হিসাবে কৃষ্ণা তো এখনো ছেলেমানুষ, ষেটের কোলে এই সবে চোদ্দ উৎরে পোনেরোতে পা দিয়েচে,—কোথায় যে বিধাতা বর গোড়ে রেখেছেন, বিধাতাই জানেন। কুলের দেবতারা কুলের মেয়েদের মুখের দিকে তাকান না, পচা-বসা ফসলের দিকেই

তাঁদের ষোলআনা নজর। সময়ে বিয়ে হোলে কৃষ্ণা এতদিনে ছেলে কোলে কোরে ঘর আলো কোত্তো। কোথায় যে বর, কবে যে ফুল ফুটবে, প্রজাপতিই তা জানেন!" বোলতে বোলতে আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন, "দাঁড়াও হরিদাস, আমি আসচি।"

বোলেই ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, ঘরের ভিতরে একটা দরজা খুলে অন্য ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। এদিকে আর এক রঙ্গ। দিনের বেলা পদ্ম-ফুল মুদিত হয়ে গেল! দিদির কথাগুলি শুনে শুনে লজ্জাবতী কৃষ্ণকামিনী মুদিতনয়নে অধোমুখী হোলেন, সুন্দর কপোলযুগল সহসা আরক্তবর্ণ ধারণ কোল্লে। কুমারীর সলজ্জ বদনকমলে আমি যেন তখন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন কোল্লেম। কুলীনের মেয়ের বিবাহের কথাগুলি যাঁরা শুনছিলেন, তাঁরাও কৃষ্ণকামিনীর মুখের দিকে চেয়ে একসঙ্গে একনিশ্বাসে বোলে উঠলেন, "আহা! তা আর হবে না গা, হবেই তো! বয়েস হয়েচে, সব তো বুঝতে পারে, হবেই তো! আহা! বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেল! চক্ষুদুটী ছল ছল কোরে এলো! দেখে দেখে আমাদেরই বুক যেন ফেটে যাচ্চে! কুলীনের কুলের মুখে ছাই!"

আমি দেখলেম, কৃষ্ণকামিনীর মুখখানি আরক্ত, অবনত; নয়ন নিমীলিত; নারীগণ দেখলেন, কৃষ্ণকামিনীর মুখ শুষ্ক, চক্ষু ছলছল! নারীজাতির এই-রূপ রঞ্জিত মিথ্যা কথায় বড় আমোদ। কেবল একস্থানেও নয়, এক বিষয়েও নয়, সকল স্থানে সকল বিষয়েই সমভাব। ঐরূপ রঞ্জিতবাক্যে সহানুভূতি আসে না, ফল বরং বিপরীত দাঁড়ায়, রঞ্জনপ্রিয়া রমণীরা সেটা আসলেই বিবেচনা কোত্তে পারেন না।

ঠাকুরাণী ফিরে এলেন, রুমালবাঁধা শালের চাদরখানি আমার হাতে দিলেন। কটাক্ষে কৃষ্ণকামিনীর দিকে চাইতে চাইতে ঘর থেকে আমি বেরুলেম; কটাক্ষ-নিক্ষেপের সময় অনুভব কোল্লেম, কৃষ্ণকামিনীও বক্রনয়নে দু-বার আড়ে আড়ে আমার দিকে চাইলেন।

বেলা প্রায় অবসান। বেশপরিবর্ত্তন কোরে বড়বাবু একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেইদিন আমি জানতে পাল্লেম, কৃষ্ণ-কামিনী কি কারণে অত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা। স্ত্রীলোকেরা কৌলীন্যের দোষ দিলেন, আমি তখন কৌলীন্যের ইতিহাস জানতেম না, যথার্থ কৌলীন্য-প্রথা কিরূপ, সে প্রথায় বাস্তবিক দোষ ঘোটতে পারে কি না, বিবাহের যোগ্য-বয়সে এ দেশে কন্যাবিবাহে কৌলীন্যপ্রথা বাস্তবিক বাধা দেয় কি না, সে বিচারে আমি এখন অক্ষম। ঘর-বর পাওয়া যায় না, সমস্ত কুলীনের ঘরে যদি এইরূপ গোলযোগ ঘটে, তা হোলে তো কুলীনের মেয়েরা চিরজীবন অনূঢ়া থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা হয়ে দাঁড়ায়, এই বিতর্কটা তখন আমার মনোমধ্যে সমুদিত হলো।

সে বিতর্ক তখন অনর্থক, সুতরাং অন্যকথা আমার মনে আসতে লাগলো। বাড়ীর মেয়েরা সকলেই আমার সঙ্গে কথা কয়, কুটুম্বিকারাও আমারে দেখে লজ্জা করেন না, সকলের কাছেই আমি সপ্রতিভ; কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর চক্ষু সর্ব্বক্ষণ যেন আমার দিকে ঘোরে। সর্ব্বক্ষণ আমি অন্তঃপুরে থাকি না; যত-

ক্ষণ থাকি, যতক্ষণ দেখাশুনা হয়, ততক্ষণকেই আমি সর্ব্বক্ষণ বোলছি। কৃষ্ণকামিনীতে কেমন একরকম যেন নূতনভাব! কৃষ্ণকামিনী লজ্জা-শীলা, আমার সঙ্গে যখন দেখা হয়, কথা হয়, তখনো লজ্জা থাকে। লজ্জাশীলা কামিনীদের লজ্জাপ্রকাশের সময় মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হয়, যাদের সঙ্গে লজ্জার সম্পর্ক, হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা হোলে লজ্জা-বতীরা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকেন, ঘোমটা দিবার অগ্রে শীঘ্র শীঘ্র চক্ষের পাতা দিয়ে চক্ষুদুটী ঢেকে ফেলেন, এই তো লজ্জার লক্ষণ। কৃষ্ণকামিনীর সে প্রকার লজ্জা নয় ; আমারে দেখে লজ্জা করবার সম্পর্কও নয় ; তাঁর দিদিকে আমি মা বলি ; সে সম্পর্কে কৃষ্ণকামিনী আমার মাসী হন ; লজ্জা অনাবশ্যক ; তথাপি একটু একটু লজ্জা দেখা যায়। কৃষ্ণকামিনী যখন আমার সঙ্গে কথা কন, অধরে তখন অল্প অল্প হাসি থাকে, কিন্তু দৃষ্টি থাকে নীচু-দিকে ;—সরাসর আমার মুখের দিকে চক্ষু থাকে না ; এই এক প্রকার লজ্জা। আবার দেখি, আমি যখন অন্যদিকে চাই, কৃষ্ণকামিনী তখন সেই বিশালনেত্র বিস্ফারিত কোরে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। আড়ে আড়ে সেই ভাবটী আমি দেখতে পাই, জানতেও পারি, অল্প অল্প বুঝতেও পারি। কটাক্ষসন্ধানে কুমারী কৃষ্ণকামিনী একেবারেই অনভ্যস্ত, এমনটীও বোধ হয় না ; মাঝে মাঝে এক একবার সেই সুন্দর নয়নে বক্রকটাক্ষও আমি দর্শন করি। কেন তেমন ভাব, ঠিক ঠিক স্থির কোত্তে না পেরে আমারই বরং লজ্জা আসে। আশ্বিন কার্ত্তিক দু-মাস আমি কৃষ্ণকামিনীকে দেখছি,—পূজার পূর্ব্বেও দেখেছি, পূজার পরেও প্রায় মাসাবধি দেখে দেখে আসছি ; পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশই যেন সে নয়নের বেশী আকর্ষণ অনুভব হোচ্ছে। ভাবটা বড় ভাল নয় ; ইদানীং ঐ ভাব দেখে দেখে দিন দিন আমি সতর্ক হোতে শিক্ষা কোচ্ছি ;—তফাৎ তফাৎ থাকাই ভাল, মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত কোচ্ছি। নিতান্ত আব-শ্যক না হোলে কৃষ্ণকামিনীর কাছে আমি যাই না। কৃষ্ণকামিনী যখন একাকিনী থাকেন, তখন আমি সেখানে যেতে সঙ্কুচিত হই, তথাপি অদূরে আমারে দেখলেই কিঞ্চিৎ অধোবদনে, ঈষৎসলজ্জ-নয়নে, শান্ত মৃদুগতিতে কৃষ্ণকামিনী আমার কাছে এগিয়ে এগিয়ে আসেন, আমারে একটু অন্যমনস্ক দেখলেই অল-ক্ষিতে কটাক্ষপাত করেন, বিশেষ কোন কাজের কথা না থাকলেও সুমিষ্টস্বরে দুটী একটী কথা কন, আমার মুখের কোন প্রকার নূতনকথা শুনলেই,—হাসির কথা না হোলেও, ঈষৎ অবনতমস্তকে মৃদু মৃদু হাস্য করেন। দেখায় ভাল, কিন্তু আমার মনে কেমন একরকম সন্দেহ আসে, অঙ্গ যেন শিউরে শিউরে উঠে ; ইচ্ছা কোরেই সেখান থেকে আমি সোরে যাই।

পূর্ব্বে বোলেছি, আজ ভূতচতুর্দ্দশী। আগামী কল্য শ্যামাপূজা। দীন-বন্ধুবাবুর বাড়ীতে শ্যামাপূজা হয় না, ব্রহ্মময়ীর মন্দিরেই মহোৎসব হয়। ব্রহ্মময়ীপ্রতিমা প্রস্তরময়ী চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি ; স্বতন্ত্র মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয় না, ব্রহ্মময়ীর নিকটেই পূজা, হোম, বলিদান, ভোগ প্রভৃতি কালীপূজার সমস্ত অঙ্গ সংসাধিত হয়ে থাকে। চতুর্দ্দশীর রজনীপ্রভাতে ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে অনেক লোক সমবেত, সকলেই পূজার আয়োজনে ব্যস্ত।

মন্দিরের দুই ধারে সারিবন্দী অনেকগুলি ঘর, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা, প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিশেষ উৎসবে সেই সকল ঘরে উপস্থিত থাকেন। ঐ দিন অপরাহ্নসময়ে তাঁরা সকলেই সেখানে একত্র হয়েছেন। পূজার আয়োজনে, নৈবেদ্যের আয়োজনে, ভোগের আয়োজনে দিনমান কেটে গেল, সন্ধ্যাকালে সহস্র সহস্র দীপমালায় সমস্ত উদ্যান সমুজ্জ্বল করা হলো। দেবীর মন্দির, বাবুদের বৈঠকখানা, অবরোধবাসিনীদের গৃহশ্রেণী, উজ্জ্বল আলোকপ্রভায় সমস্তই যেন রত্নখচিত—স্বর্ণমণ্ডিত দেখাতে লাগলো। বৃক্ষে বৃক্ষেও দীপমালা। অমাবস্যা-রজনী ; জোনাকী-পোকার আধিপত্য, অসংখ্য দীপপ্রভায় একটীও জোনাকী তখন দেখা গেল না, বোধ হলো, যেন দীপমালার কাছে পরাস্ত হবার ভয়ে জোনাকীপোকারা তখন সেই বাগান ছেড়ে পালিয়ে গেল।

বাগানে দীপমালা, দেবালয়ে দীপমালা, গ্রামের গৃহস্থালয়ে দীপমালা, মাথার উপর অনন্তনীলাম্বরে অনন্ত দীপমালা : শোভা অপরূপ !

বাবুদের সঙ্গে আমিও দেবালয়ে গিয়েছি, স্ত্রীলোকেরাও গিয়েছেন, দাসীচাকরেরাও গিয়েছে, ক্রমে ক্রমে একে একে নিমন্ত্রিত লোকেরাও দেখা দিচ্ছেন। ঢোল, ঢক্কা, জগঝম্প, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের বিমিশ্রধ্বনিতে দেবালয় প্রতিধ্বনি হোচ্ছে, মহা সমারোহ ব্যাপার। রাত্রি দশদণ্ড। গুরু-পুরোহিতেরা দেবীপ্রতিমার সম্মুখভাগে বিচিত্র বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট হয়ে, তান্ত্রিকমন্ত্রে সঙ্কল্প কোরে, পূজায় বোসলেন ; এই সময় আর একবার ঘোরনিনাদে বাদ্যযন্ত্রগুলি বেজে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি হোতে লাগলো।

দশজনের সঙ্গে আলোকমালার শোভা দেখে দেখে উদ্যানের চারিধারে আমি ভ্রমণ কোচ্ছিলেম, প্রকৃতির শোভা অপেক্ষা তখনকার কৃত্রিম শোভা অনেক লোকের চক্ষে মনোমোহিনী বোধ হোচ্ছিল, অকস্মাৎ একটা হাওয়া উঠে উদ্যানের সমস্ত প্রদীপ্ত দীপমালা নির্ব্বাপিত কোরে দিলে ! তাদৃশ শোভাময় উদ্যান অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ! সেই অন্ধকারে আকাশপানে আমি চেয়ে দেখলেম, অকস্মাৎ উৎফুল্ল মানসে মহাতঙ্কের সঞ্চার। অহো ! কোথায় সেই নীলাম্বর ? নক্ষত্রভূষিত সন্ধ্যাকালের সেই নির্ম্মল নীলাকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ঘনঘটায় অন্ধকার,—নিবিড় অন্ধকার ! সন্ধ্যাকালের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা সেই নিবিড় অন্ধকারের অন্ধকারগুহায় লুক্কায়িত। মেঘাবৃত অন্ধকার আকাশে ঘন ঘন চঞ্চলা চপলার বিচিত্র খেলা ! হাস্যমুখী প্রকৃতিদেবীর বিভীষণ মূর্ত্তি ! দুর্জ্জয় বাতাসে উদ্যানের বড় বড় বৃক্ষেরা যেন মাতালের মত মাথা ঘুরিয়ে টোলতে টোলতে বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল ! গাছের উপর গাছ, ছাদের উপর গাছ, মন্দিরের উপর গাছ, ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ! লোকেরা কোলাহলশব্দে চীৎকার কোরে অন্ধকারে ইতস্ততঃ ধাবিত হোতে লাগলো ! ভয়ানক ঝড় ! একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি ! যাঁরা ঘরের ভিতর ছিলেন, ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টিতে তাঁরাও অঙ্গকম্পনে জড়সড় হয়ে আর্ত্তস্বরে চীৎকার কোত্তে লাগলেন। সকলের মুখেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গানাম। পুরোহিতেরা কম্পিতহস্তে পৈতা জোড়িয়ে ঘন ঘন দুর্গানামজপে প্রবৃত্ত হোলেন। হুলস্থূল ব্যাপার !

"মনি-অমাবস্যা!"—বঙ্গের ইতরশ্রেণীর লোকেরা শ্যামাপূজার অমাবস্যাকে মনি-অমাবস্যা বলে। সেই সকল লোক উন্মত্তের ন্যায় ছুটতে ছুটতে বোলতে লাগলো, "মনি-অমাবস্যার রাত্রে খণ্ডপ্রলয় হয়, আজ তাই হবে! আজ আর কারো নিস্তার নাই! পালা—পালা—পালা!"—সকলেই পলায়নতৎপর। পালিয়েই বা যায় কোথায়? দেবালয়ের মধ্যে যতগুলি ঘর, সবগুলিই জনপূর্ণ, ভোগের ঘরে সকল লোক প্রবেশ কোত্তে পারে না, ক্রমশই ঝড়বৃষ্টির বেগবৃদ্ধি, প্রকৃতির মহাকোপ, বাহিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কোপের বেগ সহ্য করা অতি বলবান পুরুষেরও অসাধ্য; যায় কোথা? বাগানে বাগানেই আরো ঝড়ের দৌরাত্ম্য বেশী। মড়মড় শব্দে ডাল ভেঙে পোড়ছে, গাছের গায়ে গাছ ভেঙে পোড়ছে, গাছে গাছে ডালে ডালে পাতায় পাতায় পথ দুর্গম হয়ে আছে, পথের উপর এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে, লোকেরা সব যায় কোথায়? ঠিক নাই, তথাপি অনেক লোক ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। হুড়াহুড়িতে অন্ধকারে কে কার গায়ে পোড়ছে, কে কারে মাড়িয়ে যাচ্ছে, কে কোথায় আছাড় খাচ্ছে, কেহই কিছু দেখছে না। গাছে গাছে কারো কারো মাথা ঠুকে যাচ্ছে, কেহই ভ্রূক্ষেপ কোচ্ছে না, প্রাণ হাতে কোরে সকলেই ছুটেছে! খোলা পথে আরো বেশী বিপদ, বেশী ভয়, সেটা যেন তারা ভুলে ভুলে যাচ্ছে। অনেক লোক পালালো, ভিড় অনেকটা পাতলা হয়ে এলো; দীনবন্ধুবাবুর গুরুবল, বাগান থেকে যারা পালালো, ঝড়ে তাদের কারো প্রাণহানি হলো না।

ঝাড়া দুই ঘণ্টা ঝড়-বৃষ্টি! রাত্রি দুইপ্রহর অতীত। ক্রমে ক্রমে ঝড়ের বেগ মন্দীভূত, বৃষ্টিও কম হয়ে এলো। রাত্রি দশ দণ্ডের পর পূজা আরম্ভ হয়েছিল, রাত্রি আড়াই প্রহরের পর সাঙ্গ। তিনপ্রহরের সময় ভোগ। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, শেষরাত্রে তাঁরা কিছু কিছু প্রসাদ পেলেন। সকলেই বাবুর বাড়ীর পাল্কী-বেহারা উপস্থিত হলো, প্রায় ঊষাকালে নারীবর্গ সঙ্গে নিয়ে আমরা বাড়ীতে ফিরে এলেম।

এইখানে আমার একটী কথা বলা আবশ্যক। না বোল্লেও চোলতো, কিন্তু অদৃষ্ট ঘটনার সামঞ্জস্য রাখবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও বোলতে হলো। প্রকৃতির যখন মহাকোপ, ঝড়-বৃষ্টির যখন নবযৌবন, সেই সময় ভোগঘরের পাশের একটী ছোটঘরে আমি আশ্রয় নিয়েছিলেম। সে ঘরের সঙ্গে ভোগঘরের কোন সংশ্রব ছিল না; ঘরের একটীমাত্র দ্বার, সেই দ্বারটী ভিন্ন কোনদিকে একটীও গবাক্ষ অথবা ছিদ্র ছিল না। দ্বারে শিকল দেওয়া ছিল, ধীরে ধীরে শিকল খুলে সেই ঘরে আমি প্রবেশ করি। খুব জোর জোর দমকা, ঘরে প্রবেশ কোরেই ভিতরদিকে আমি অর্গল বন্ধ কোরে দিই। একটী কুলুঙ্গীতে ছোট একটী লণ্ঠনে মোমবাতী জ্বোলছিল, কিন্তু মানুষ ছিল না। আলোটী তবে কেন ছিল, তা তখন আমি জানতে পাল্লেম না; দেয়ালে ঠেস দিয়ে একধারে আমি বোসে থাকলেম। সে রকম ঘরে ঝড়বৃষ্টির শব্দ কিছু কম শুনা যায়, বাহিরে পবনের সঙ্গে প্রকৃতির কি রকম যুদ্ধ হোচ্ছিল, সেখান থেকে তা আমি দেখতে পেলেম না, বড় একটা জানতেও পাল্লেম না।

চুপটী কোরে বোসে আছি, এমন সময়ে কে একজন এসে দরজার কপাটের

বাহিরের দিকে ধীরে ধীরে ঠুক ঠুক কোরে দুই তিনবার টোকা মাল্লে। আমি সাড়া দিলেম না ; মনে কোল্লেম, কে? এই দুর্যোগের সময় এমন নির্জ্জন ঘরের দিকে কে আসবে? কি কোত্তেই বা আসবে? চুপ কোরে থাকলেম। আবার টোকা ;—সেইরকম সতর্ক-হস্তে ধীরে ধীরে তিনবার টোকা। তথাপি আমি সাড়া দিলেম না। তৃতীয়বার সেইরকম শব্দ। তখন আমি ভাবলেম, যে-ই হোক, ঐ লোক হয় তো ইতিপূর্ব্বে এই ঘরে ছিল, আলো রেখে গিয়েছে, দ্বারে শিকল লাগিয়ে আর কোথাও গিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে ; শিকল খোলা, ভিতর বন্ধ, তাই দেখে অবশ্যই ভেবেছে, ভিতরে কেহ আছে। ভোগ-ঘরের সামিলঘর, স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহ এ ঘরে আসবে, সেটা অসম্ভব, তাই ভেবেই বার বার টোকা দিলে। ভাবতে ভাবতে আমি উঠে দাঁড়ালেম, কপাটের কাছে গিয়ে চুপ কোরে কাণ পেতে থাকলেম ; তখন আর টোকার আওয়াজ পেলেম না, একটু পরেই আবার টোকা। তখনি আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে?"

অতি কোমলকণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর হলো, "খুলে দাও ; আমি।"

স্বরে বুঝলেম, বামাস্বর। বাড়ীর কোন স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহ এখানে আসবে, এমন ভরসা হবে না ; নিশ্চয়ই বাড়ীর লোক ; তা না হোলে অত চুপি চুপি কথা কবে কেন? মনে এইরূপ স্থির কোরে আস্তে আস্তে দ্বার উদ্ঘাটন কোল্লেম। একটী অবগুণ্ঠনবতী বালিকা। প্রবেশ কোল্লেন ;—প্রবেশ কোরেই তৎক্ষণাৎ চঞ্চল-হস্তে দরজাটা বন্ধ কোরে দিলেন। কে এই অবগুণ্ঠনবতী?—প্রথমে বুঝতে পাল্লেম না। চঞ্চল-হস্তে অবগুণ্ঠন উন্মোচন কোরে, একটু হেসে, কোমল মৃদুস্বরে বালিকা বোল্লেন, "হরিদাস! ভারী ঝড়! তুমি এই ঘরে এসেচো, আমি দেখতে পেয়েছিলেম।"

কথা শুনে, মুখপানে চেয়ে, আমি শিউরে উঠলেম, নির্জ্জন ঘরে আমার চক্ষের সম্মুখে কৃষ্ণকামিনী! ক্ষণকাল আমি কথা কোইতে পাল্লেম না ; মনে কোল্লেম, দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ি। মনে কোরেই দরজার দিকে অগ্রসর হোচ্ছি, আবার একটু হেসে কৃষ্ণকামিনী আমার একটী হাত ধোরে ফেল্লেন ; সেইরূপ কোমলস্বরে চুপি চুপি বোল্লেন, "কি কর হরিদাস? কোথা যাও? ভয় পাচ্চো নাকি? ভয় তো বাহিরে, ঘরের ভিতর ভয় কি? বোসো!" দুজনে রয়েচি, কিসের ভয়?—বোসো!"

বালিকার করস্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল, হাত ছাড়িয়ে যদি পালাই, দোষের কথা হবে ; এই ভেবে কাঁপতে কাঁপতে পূর্ব্ববৎ দেয়ালের ধারে আমি বোসে পোড়লেম ; কৃষ্ণকামিনীও হাসতে হাসতে ঠিক সেইখানে এসে আমার গা ঘেঁসে বোসলেন। সঙ্কুচিত হয়ে আমি একটু সোরে বোসলেম। আবার একটু হেসে আমার মুখের দিকে একটু ঝুঁকে কুমারী বোল্লেন, "শীত পোড়েছে হরিদাস, বারান্দায় খুব শীত ; তাই জন্যে আমি সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে ঘোমটা দিয়ে এসেছিলেম।"

আমি নিরুত্তর। আবার একটু সোরে এসে, যেন একটু ভয়ে ভয়ে কুমারী

বোল্লেন, "বাপ রে, কি দুর্য্যণ! ঝাপটায় ঝাপটায় কাঁপুনি ধোরেছিল! এখনো শীত কোচ্চে! এই দেখ না আমার গায়ে হাত দিয়ে, এখনো আমি কাঁপচি!"

আবার একটু তফাতে আমি সোরে বোসলেম। কুমারীও আবার আমার কাছে সোরে এলেন। আমি যতই সোরে সোরে যাই, কৃষ্ণকামিনী ততই এগিয়ে এগিয়ে আসেন। বড় বিপাকেই ঠেকলেম। একবার আলোর দিকে চেয়ে, আমার মুখের দিকে ফিরে, যেন একটু চমকিতভাবে কুমারী বোল্লেন, "আচ্ছা হরিদাস, তুমি তখন সেখান থেকে পালিয়ে এলে কেন? বলিদানের উয্যুগ হোচ্ছিল, আমরা মন্দিরের ভিতর দাঁড়িয়ে ছিলেম, তুমি এইদিকে ছুটে পালিয়ে এলে, আমি বেশ দেখতে পেলেম। তেমন কোরে পালালে কেন?"

আমি।—বলিদান আমি দেখতে পারি না; ভয়ও হয়, মায়াও হয়।

কৃষ্ণ।—আমারো হয়। সকলে সেখানে ছিলেন, সেই জন্যই ছিলেম, কিন্তু সে দিকে চাইতে পারিনি, ঠাকুরের দিকেই চেয়ে ছিলেম। হাঁ, ভাল কথা। তুমি কি রোজ রোজ সন্ধ্যাকালে এখানে আরতি দেখতে আসো?

আমি।—রোজ পারি না, কাজের ঝঞ্ঝাটে এক এক দিন ফাঁক যায়।

কৃষ্ণ।—আমি রোজ আসি। যে দিন আমি এসেছি, তার পরদিন থেকে রোজ রোজ আমি দিদির সঙ্গে এসে আরতি দেখে যাই; কেবল চারটী দিন আসা হয় নাই;—পুজার তিন দিন আর বিজয়ার দিন। আরতির সময় মহামায়ার প্রতিমাখানি যেন সজীব সজীব দেখায়, সত্য সত্যই মা যেন জিভ বার কোরে হাসেন। এখন অবধি তুমি রোজ রোজ এসো, বেশ হবে,—দুজনে এখানে আরতি দেখবো, গল্প কোরবো, এক জায়গায় দেখা-শুনা হবে, বেশ থাকবো; রোজ রোজ তুমি এসো।

আমি।—এখানে না এলে কি তোমার সঙ্গে আমার দেখা-শুনা হয় না? বাড়ীতে কি আমার সঙ্গে তোমার কথাবার্ত্তা চলে না?

কৃষ্ণ।—তা চোলবে না কেন? সে কথা বোলচি না; দুটীতে নিজ্জর্নে মনের কথা বলাবলি করাতে যতটা আমোদ হয়, বাড়ীর ভিতর পাঁচজনের সামনে ততটা হয় না; মনের সকল কথা খুলে বলা যায় না;—কেমন বাধো বাধো ঠেকে, লজ্জা করে।

আমি।—লজ্জা করাই তো ভাল, লজ্জা তোমাদের নারী-জাতির ভূষণ।

কৃষ্ণ।—(কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া) আচ্ছা হরিদাস! একটী কথা তোমারে জিজ্ঞাসা করি, ঠিক বোলো: মা কালী সাক্ষী,—তুমি কি আমারে ভালবাস না?

আমি।—তা কি তুমি বুঝতে পার না? তোমারে দেখে অবধি, তোমার মধুর মধুর কথাগুলি শুনে অবধি, তোমার সঙ্গে কথা কোইতে আমি ভালবাসি, তোমারে দেখতে আমি ভালবাসি, তা কি তুমি বুঝতে পার না?

কৃষ্ণ।—বুঝতে আমি সব পারি।

আমি।—তবে জিজ্ঞাসা কোচ্ছো কেন?

কৃষ্ণ।—মানে আছে। ভালবাসা অনেক রকম। আমি তোমারে যেমন ভাল-

বাসি, তুমি আমারে সেইরকম ভালবাস কি না, তোমার মুখে সেইটুকু আমি শুনতে চাই।

আমি।—ভালবাসার আবার রকম কি?—এ রকম, ও রকম, সে রকম, অত শত আমি বুঝি না, ভালবাসার বস্তু দেখলেই ভালবাসতে হয়, সোজাসুজি এই তো আমি বুঝি, তার ভিতরে আবার রকম-সকম কি?

কৃষ্ণ।—(মৃদু হাস্য করিয়া) ঐ কথাই তো কথা! আচ্ছা, রোজ রোজ সন্ধ্যা-কালে তুমি এইখানে এসো, আমি তোমারে বুঝিয়ে দিব।

আমি।—আচ্ছা কৃষ্ণ, এ গ্রামে তুমি আর কতদিন থাকবে?

কৃষ্ণ।—দিদি যত দিন থাকতে বোলবেন, বাবু যত দিন যেতে না দিবেন, ততদিন আমি থাকবো। আমার এক পিসী এসেচেন, তিনি বলেন, রাস-পূর্ণিমার মধ্যেই আমারে নিয়ে যাবেন, আমি কিন্তু যাবো না। এখানে শ্রীপঞ্চমীতে খুব ঘটা হয়, এইখানেই আমি সরস্বতীপূজা দেখবো।

আমি।—(সচকিতে) ঝড়বৃষ্টি হয় তো থেমে গিয়েছে, লোকেরা সব গোল-মাল কোচ্ছে চল আমরা মন্দিরে যাই। আগে তুমি যাও, একটু পরেই আমি যাচ্ছি; দুজনে একসঙ্গে গেলে অন্যলোকে অন্য কিছু সন্দেহ কোত্তে পারে।

কৃষ্ণ।—তা আর কোত্তে হয় না! আমি তো অনেকক্ষণ একাকিনী এই ঘরেই ছিলেম, বাড়ীর মেয়েরা সকলেই তা জানেন। তোমার সঙ্গে যদি আমি বেরিয়ে যাই, কে কি মনে কোরবে?—কে কি মন্দ ভাববে? দরজাটা একটু খুলে আগে একবার দেখ, দুর্য্যগটা থেমেছে কি না; যদি থেমে থাকে, এক-সঙ্গেই দুজনে যাবো।

আমি উঠলেম; ধীরে ধীরে দরজা খুলে দেখলেম, প্রকৃতি অনেকপরিমাণে শান্ত; ঝড়েরও তত বেগ নাই, বৃষ্টির তত জোর নাই: হস্তসঙ্কেতে কৃষ্ণ-কামিনীকে ডাকলেম। বাহিরের লোকেরা গোলমাল কোরে গৃহগমনের উপ-ক্রম কোচ্ছিলেন, অগ্রেই আমি চৌকাঠের বাহিরে পদার্পণ কোল্লেম শশব্যস্তে আমার একখানি হাত ধোরে, আমার মুখের কাছে মুখ এনে সেই সময় কৃষ্ণ-কামিনী আমার কাণে কাণে বোল্লেন, "দেখো, ভুলো না, মাথা খাও, রোজ রোজ,—কাল সন্ধ্যাবেলা—"

শেষের কথা আর আমি শুনলেম না, দ্রুতপদে মন্দিরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেম। কৃষ্ণকামিনী গজগামিনী হয়ে ভোগঘরে প্রবেশ কোল্লেন। যে প্রকারে এই অভিনয়ের উপসংহার হলো, পাঠকমহাশয়কে পূর্ব্বেই সেটা বিজ্ঞাপন করা হয়েছে।

আমরা বাড়ী এলেম। রাত্রি ছিল না, শয্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষ্প্রয়োজন বোধ হলো; ভাগীরথীসলিলে প্রাতঃস্নান সমাধা কোরে, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হোলেন; এই দিন প্রতিপদ। গ্রামের অনেক বাড়ীতে মৃন্ময়ী কালীপ্রতিমার পূজা হয়েছিল, বৈকালে সেই প্রতিমাগুলির বিসর্জ্জন। ব্রহ্ম-ময়ীর বিসর্জ্জন নাই, আমরা নিশ্চিন্ত। পরদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। পূর্ব্বে বলা হয় নাই, বাবুদের একটী ভগ্নী আছেন, বৎসরের দশমাস তিনি শ্বশুরালয়েই থাকেন, পূজার পূর্ব্বে পিত্রালয়ে আসেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরেই চোলে যান।

এ বৎসরেও তিনি এসেছেন, পঞ্জিকার নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণে ভাই-দুটীর কপালে তিলকদান কোরে গণ্ডূষমন্ত্রে তিনি গণ্ডূষ দিলেন। বড়বাবু প্রথামত আশীর্ব্বাদ কোল্লেন, ছোটবাবু তাঁর চরণবন্দনা কোরে দস্তুরমত প্রণামী দিলেন। এই উপলক্ষে বাড়ীতে সেদিন দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ, দ্বাদশটী সধবা আর দ্বাদশটী কুমারীকে ভোজন করানো হলো। বলা বাহুল্য, সেই ভগ্নীটী বড়বাবুর অনুজা, ছোটবাবুর অগ্রজা।

প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, দুইদিন দুইরাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল। ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে এ দুদিন আমি আরতি দেখতে গেলেম না। অঙ্গীকার করি নাই, সুতরাং কৃষ্ণকামিনীর অনুরোধ রক্ষা হলো না বোলে অনুতাপ এলো না। তৃতীয়ার দিন বৈকালে বাবুদের ভগ্নীর শয়নকক্ষে কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। ভগ্নীর দুটী পুত্র, একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রটী বয়ঃপ্রাপ্ত, সেটী সঙ্গে আসে নাই ; কনিষ্ঠ পুত্রটী পঞ্চমবর্ষীয় ; সে একখানি ছবি কোলে কোরে ছবির মুখে চুমো খাচ্ছিল আর ছবির সঙ্গে কথা কোচ্ছিল। কন্যাটী খুব ছোট, ঠোঁটের উপর-নীচে পাঁচটী দাঁত উঠেছে, সেই দাঁতগুলি দেখিয়ে হেসে "হাঁটি হাঁটি পা পা" করে, আধো আধো কথা কয়, নিরবলম্বনে সোজা হয়ে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কৃষ্ণকামিনী তখন সেই মেয়েটীকে কাছে কোরে নিয়ে, হেসে হেসে খেলা দিচ্ছিলেন, আমারে সেইখানে দেখেই সেই হাসি-মুখখানি হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল ; একবারমাত্র আমার মুখের দিকে চেয়েই ম্লানমুখী বালিকা তৎক্ষণাৎ অধোমুখী হোলেন ; বাষ্পবেগে চক্ষুদুটী ছল ছল কোরে এলো। দেখে আমার কিছু কষ্ট হলো। ছোটমেয়েটীর মা তখন সে ঘরে ছিলেন না, তাঁরি কাছে আমার দরকার ছিল, ইচ্ছা হোলে কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে দুটী একটী কথা কোইতে পাত্তেম, কিন্তু পাল্লেম না ;—নীরবেই প্রবেশ কোরেছিলেম, নীরবেই বেরিয়ে এলেম।

মন কেমন চঞ্চল। কেন এমন চঞ্চল হয় ?—কৃষ্ণকামিনীর জন্য ?—না, কৃষ্ণকামিনীর জন্য আমার চাঞ্চল্যের বিশেষ কারণ কিছুই ছিল না। তবে কেন ?—কৃষ্ণকামিনীর অনুরোধবাক্য রক্ষা কোত্তে পারি নাই, সেইজন্যই কি চাঞ্চল্য ?—না, সেজন্যও নয়। তবে কি ?—আমারে দেখে কৃষ্ণকামিনীর ফুল্ল-মুখখানি ম্লান হলো, পদ্মনেত্র-দুটী বাষ্পপূর্ণ হয়ে এলো, সেইজন্যই আমার চাঞ্চল্য। দুদিন সন্ধ্যাকালে আমি দেবালয়ে যাই নাই, গেলেই কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে দেখা হোতো, তুষ্ট হোতেন ;—আমি যাই নাই, কৃষ্ণকামিনীর অভিমান। পূর্ণ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা, বালিকা-স্বভাবে এরূপ অভিমান আসতেই পারে। মনে মনে সঙ্কল্প কোল্লেম, বালিকার সে অভিমান স্থায়ী হোতে দেওয়া ভাল নয়। দোষ কি ?—আমার মনে তো কোন প্রকার পাপপ্রবৃত্তি আসছে না,—বাড়ীতে দেখা-শুনা হয়, কথাবার্ত্তা হয়, সকলেই দেখেন, সকলেই শুনেন, কারো মনে মন্দ সন্দেহ আসে না, দোষ কি ?—দেবালয়ে দেখা-সাক্ষাতে দোষ কি ? অবিবাহিতা নির্ম্মলা বালিকা, মনের ভিতর কোন প্রকার মন্দ মতলব থাকা এ বয়সের ধর্ম্ম নয়। দেবতার মন্দিরে দেখা দিলে বালিকাটী যদি তুষ্ট থাকে, তাতে আমি কেনই বা কৃপণ হই ? অকারণে অমন সরলা বালিকার মনে

ব্যথা দেওয়াতে বরং পাপ আছে। না,—কৃষ্ণকামিনীর প্রাণে আমি ব্যথা দিব না ; আজ সন্ধ্যাকালে আমি ব্রহ্মময়ীদেবীর আরতি দেখতে যাব, কৃষ্ণকামিনীর অভিমানটী ঘুচে যায় কি না, দেখবো ; যদি কিছু বদ-মতলবের আভাষ পাই, তৎক্ষণাৎ সোরে দাঁড়াবো। যাওয়াটা আজ অবশ্যই কর্ত্তব্য।

এই আমার তখনকার সঙ্কল্প। দিবাকর অস্তাচলে গেলেন, আকাশে একটী নক্ষত্র দেখা দিল, নক্ষত্রের মাথার উপর তৃতীয়ার তৃতীয়কলা ক্ষুদ্রচন্দ্রমা বক্রাবয়বে উদিত হোলেন, দুর্গানাম স্মরণ কোরে আমি আরতি-দর্শনবাসনায় ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে চোল্লেম।

অমাবস্যা-রজনীর মহা ঝটিকার উপদ্রবচিহ্ন উদ্যানভূমিতে—উদ্যানপন্থায় কিছুই দেখলেম না, কিন্তু উদ্যানটী শ্রীশূন্য হয়ে গিয়েছে ;—বড় বড় প্রাচীন বৃক্ষেরা শাখাপত্র পরিশূন্য হয়ে শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় স্তম্ভাকারে দাঁড়িয়ে আছে, ফুলগাছগুলি ভগ্নশাখ হয়ে কুসুমসজ্জাহারা হয়েছে, পতিত বৃক্ষপত্রে সরোবরের জল প্রায় ঢাকা পোড়ে গিয়েছে, মন্দিরের চূড়ার প্রতিষ্ঠিত চক্রফলকটী স্থানচ্যুত হয়ে পোড়েছে। শ্রীহীনতার এই সকল চিহ্ন-দর্শনে ঝড়ের নামেও আমি নমস্কার কোল্লেম। কত লোকের ঘর-বাড়ী পোড়ে গিয়েছে, কত লোকের বাগান বৃক্ষশূন্য হয়েছে, রাত্রিকালের ঝড়, কত গরিবলোক নিদ্রিতাবস্থায় ঘরচাপা পোড়ে প্রাণ হারিয়েছে, কত গৃহপালিত অবলাজীব বন্ধনাবস্থায় মারা গিয়েছে, দেবালয়ে দাঁড়িয়ে সেই সব চিন্তা কোরে ঝড়ের নামে আমি নমস্কার কোল্লেম ; যে সকল পণ্ডিত প্রকৃতিজ্ঞানপ্রভাবে ঝটিকার মঙ্গলফল কীর্ত্তন করেন, উদ্দেশে তাঁদের চরণেও নমস্কার কোল্লেম।

উদ্যানের মধ্যে দুখানি পাল্কী এলো। কলিকাতায় যেমন দেখেছি, একখানা পাল্কীর ভেতর গুড়ের কলসীর মত পাঁচ সাতটী স্ত্রীলোক, দুটী তিনটী ছেলেমেয়ে নিয়ে গাদাগাদি কোরে বসে সে রকম দস্তুর এখানে নাই ; এখানকার বেহারারা একখানি পাল্কীতে দুটীর অধিক স্ত্রীলোক লয় না, স্থূলাঙ্গী হোলে একটীমাত্র গ্রহণ করে। যে দুখানি পাল্কী এলো, এর একখানিতে বাড়ীর গৃহিণী আর ছোট-বৌ, দ্বিতীয়খানিতে বাবুর ভগ্নী আর কৃষ্ণকামিনী। উৎসবদিনে অনেকেই আসেন, কিন্তু অন্যদিন সকলে আসেন না।

এই দেবালয়ে ঠিক সন্ধ্যাকালে আরতি হয় না, ন্যূনকল্পে রাত্রি চারি দণ্ডের পর আরতি আরম্ভ হয় ; স্থিতিও প্রায় চারি দণ্ড। ব্রহ্মময়ীর আরতি দুই দণ্ড, মহাদেবের মন্দিরের আরতি একদণ্ড, আর একটী ক্ষুদ্রমন্দিরে একটী গণেশ আছেন, সেই গণপতির আরতিতেও একদণ্ড সময় লাগে ; সর্ব্বশুদ্ধ তিন মন্দিরে চারি দণ্ড।

লোকের ভিড় খুব কম। পুরোহিতেরা তিনজন, চাকর দুজন, দাসী একজন, দর্শক পুরুষ আট দশজন, স্ত্রীলোকও আট দশজন। সে রাত্রে আমি যতগুলি দর্শক দেখলেম, তাদেরই সংখ্যা এই।

বাড়ীর মেয়েরা মহাদেবীর মন্দিরে প্রবেশ কোল্লেন, আমিও অল্পক্ষণ মন্দিরের বারান্দায় বেড়ালেম, একটু পরে কৃষ্ণকামিনী একাকিনী বাহির হয়ে এলেন, কেহই তাঁকে নিষেধ কোল্লেন না।

ভোগঘরের শ্রেণীর দক্ষিণধারে সেই ক্ষুদ্র কামরা। সেই কামরার সম্মুখে গিয়ে কৃষ্ণকামিনী দাঁড়ালেন। মন্দিরের সম্মুখে পাঁচ সাতজন স্ত্রী-পুরুষ সময়-প্রতীক্ষায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল, কৃষ্ণকামিনী তাদের দিকে চাইতে চাইতে সেই ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। লোকেরা তাঁরে দেখতে পেলে কি না, আমি সেটা জানতে পাল্লেম না। মন্দিরের বারান্দায় আমি বেড়াচ্ছিলেম, এদিক ওদিক চাইতে চাইতে মৃদুগতিতে নেমে এলেম, কিছুই যেন লক্ষ্য নাই, সেই ভাবে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে ধীরে ধীরে সেই কক্ষসমীপে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। দ্বার অনাবৃত, ঘরে আলো ; দেবসেবার বন্দোবস্তর মধ্যে নিত্য-নিয়মিত ব্যবস্থা এইরূপ যে, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দেবালয়ে সমস্ত গৃহে এক একটী আলো দেওয়া হয়, আরতি-অবসানে চাকরেরা সেই আলোগুলি নির্ব্বাণ কোরে দ্বারে দ্বারে চাবী লাগায়।

কক্ষমধ্যে আমি প্রবেশ কোল্লেম। একধারে কৃষ্ণকামিনী জড়সড়। দ্বার অনাবৃত রাখা উচিত বোধ কোল্লেম না, অর্গলবন্ধও কোল্লেম না, ভেজিয়ে রাখলেম। কৃষ্ণকামিনীর মুখে কথা নাই ; সর্ব্বক্ষণ যে মুখে মৃদু মৃদু হাস্য-রেখা দৃষ্ট হয়, সে মুখে তখন হাসিও নাই। ভাব আমি বুঝতে পাল্লেম। অগ্রেই আমারে কথা কোইতে হলো। দুজনেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যেখানে আমি, তার তিন হাত তফাতে কৃষ্ণকামিনী। সম্মুখে একটু অগ্রসর হয়ে, কুণ্ঠিতভাবে মৃদুবচনে আমি বোল্লেম, "কৃষ্ণ! আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা কোত্তে পারি নাই, তোমার অভিমান হয়েছে, তা আমি বুঝতে পেরেছি।"

মৃদুস্বরে কৃষ্ণকামিনী বোল্লেন, "পেরেছ, ভালই হয়েছে, সে কথা শুনে আমি কি কোরবো? কার উপর আমার অভিমান? নিজের উপরেই আমি অভিমান করি, নিজের সঙ্গেই মনের কথা কোই, নিজের সঙ্গেই আমি নিজে বেড়াই, নিজের সঙ্গেই আমি হাসি খেলি, নিজের সঙ্গেই আমার সব!"

আমি।—ওঃ! এখন আমি বুঝেছি! তোমার মত বয়সে বাঙালীর মেয়ে-দের বিয়ে হয়ে যায়, সকলেই প্রজাপতির অনুগ্রহে এক একটী অন্তরঙ্গ সহচর পায়, তুমি আজিও একাকিনী আছ, অন্তরের সেই দুঃখেই ঐ সব কথা তুমি বোলছো ; মনের দুঃখেই তোমার মনে হয়, নিজের সঙ্গেই তোমার সব! কেমন, এই কথা নয়?

কৃষ্ণ।—(অন্যমনস্ক হইয়া) কোন কথা?

আমি।—আমি বোলছি, তোমার বিয়ের কথা! মা সে দিন বোলছিলেন,—তোমার দিদিকে আমি মা বলি, তা তুমি জানো,—মা সে দিন বোলছিলেন, "ঘর-বর পাওয়া যায় না, কবে যে ফুল ফুটবে, প্রজাপতিই জানেন।" কথাগুলি আমি শুনেছিলেম ; তার পর কি শুনেছি, মন দিয়ে শুন ; শুনে তোমার আহ্লাদ হবে।

কৃষ্ণ।—(ম্লানবদনে) আর আমার আহ্লাদে কাজ নাই! সেই সব কথা শুনেই আমার আহ্লাদ হয়েছে, আবার আমার কিসের আহ্লাদ?

আমি।—না না, সে রকম নয় ; সত্যই আহ্লাদের কথা। কুঁড়ি ধোরেছে,

শীঘ্রই ফুল ফুটবে, হয় তো এই অগ্রহায়ণ মাসেই ফুটে যাবে। প্রজাপতি প্রসন্ন হয়েছেন! শীঘ্রই তোমার বিয়ে হবে!

কৃষ্ণ।—(আরক্তবদনে) বিয়ের মুখে আগুন! তোমাদের প্রজাপতিরও মুখে আগুন! একটা কথা রক্ষা কোত্তে পার না তুমি, তুমি আবার প্রজাপতির দোহাই দিতে এসেচ! বিয়ে—বিয়ে—বিয়ে! এ রকম তামাসা কোত্তে তোমায় কে বলে?

আমি।—না না, তামাসা নয়; সত্য সত্যই তোমার বিয়ে। সম্বন্ধ স্থির হোচ্ছে। পিসীমার—বুঝতে পেরেছো?—তোমার দিদির ঠাকুরঝিকে আমি পিসী বলি, পিসীমার বড়ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। যাঁদের ঘরে পিসীমার বিয়ে হয়েছে, তাঁরা মস্ত কুলীন, তোমাদের ঘরের মেয়েরা সেই ঘরের ঘরণী হয়, এই কথাই আমি শুনেছি। এ দুদিন তোমার সঙ্গে এখানে আমি দেখা কোত্তে পারি নাই, কার্য্যগতিকে আটকা পোড়েছিলেম, এইমাত্র সে কথা তোমাকে আমি বোলেছি; কার্য্যগতিকটা আর কিছুই নয়, তোমারই শুভ-বিবাহের সম্বন্ধের মজলীস, ইচ্ছা কোরেই সে মজলীসে আমি উপস্থিত ছিলেম। একরকম ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে, বাবুও রাজী হয়েছেন; একমাসের মধ্যেই—

কৃষ্ণ।—(তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া চঞ্চলস্বরে) না ভাই,—না হরিদাস! ও সব কথা তুমি আমার কাছে বোলো না! সত্য যদি তুমি আমার ভাল চাও, মাথা খাও, সত্য কোরে বল, তুমি আমাকে ভালবাস কি না, দেখো ভাই, ছলনা কোরো না, মনের ভাব গোপন রেখো না, আমিও আমার প্রাণের কথা তোমার কাছে খুলে বোলচি, আমি তোমাকে বড্ড ভালবাসি! তুমি ভাই আমার প্রাণের চেয়েও—

আমি।—(বিস্ময়ে চমকিয়া) এ কি কর কৃষ্ণ! তুমি আমারে ভাই বোলছো? তোমার দিদিকে আমি মা বলি, সে কথাটা কি তুমি ভুলে যাচ্ছ? সে সম্পর্কে তুমি আমার মাসী হও; মাসী কি কখনো—

কৃষ্ণ।—(চঞ্চলা ভঙ্গীতে হস্তসঞ্চালন করিয়া) না ভাই না, ও সব সম্পর্কের কথা তুমি ছেড়ে দাও; কাজের কথা বল, বার বার যে কথা আমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, মন খুলে সেই আসলকথার উত্তর কর। সত্য সত্য তুমি আমাকে আমার মতন ভালবাস কি না?—আমার মনের মতন ভালবাসতে তুমি ইচ্ছা কর কি না? বল ভাই বল, মা কালীগঙ্গার দিব্যি, অকপটে সত্য বল ভাই! তুমি আমারে—

বিস্ময়ে—আতঙ্কে—দারুণ সংশয়ে আমি তখন অসাবধান ছিলেম, অন্য-মনস্ক হয়ে ঘন ঘন দরজার দিকে চাইতেছিলেম, অবসর বুঝে কৃষ্ণকামিনী ঐ সব কথা বোলতে বোলতে শীঘ্র শীঘ্র এগিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে আমার দুই কপোলে দুই চুম্বন কোল্লেন! আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো! চঞ্চলহস্তে বন্ধন ছাড়িয়ে দ্রুতপদে আমি দরজার কাছে ছুটে আসছি, এমন সময় মন্দিরমধ্যে শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠলো, সম্মুখের প্রাঙ্গণে ডঙ্কা বাজতে লাগলো, শশব্যস্তে দরজা খুলে সে ঘর থেকে আমি ছুটে বেরুলেম।

আরতি হোচ্ছিল, সমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোত্তে না পেরে, মন্দিরের নীচে থেকে ব্রহ্মময়ীকে প্রণাম কোরে, কোন দিকে না চেয়েই, দৌড় ;—এক দৌড়ে বাগান থেকে আমি বেরিয়ে পোড়লেম। কৃষ্ণকামিনী সেখান থেকে কখন বেরিয়ে এলেন, কি কোল্লেন, কিছুই আমি জানতে পাল্লেম না।

রজনীযোগে একাকী আমি একটী গৃহে শয়ন করি। মানুষ একাকী হোলেই চিন্তা করবার উত্তম অবকাশ পায়। এ রাত্রে কৃষ্ণকামিনী আমার চিন্তার সামগ্রী। সন্ধ্যাকালে সেই কান্ড হয়ে গিয়েছে, রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হোতে যায়, তখনো পর্য্যন্ত আমি সেই কথা মনে কোরে থেকে থেকে এক একবার কেঁপে কেঁপে উঠছি! হলো কি!—ভাবলেম, গতিক দেখ্‌ছি আর একরকম! কৃষ্ণকামিনী উচক্কা বয়সের লক্ষণ দেখাতে অভিলাষিণী, প্রকৃতি চঞ্চলা দেখায় না, ধীরা—সুধীরা দেখায় ; অবিবাহিতা কুমারী, নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল—কুমারীভাবে এই বিশেষণগুলি ঠিক থাকাই ভাল ; কৃষ্ণকামিনী কুমারীস্বভাবের সে পবিত্রতাটুকু রাখতে পাচ্ছেন না। সরলা নির্ম্মলা বোলেই আমি ততটা ঘনিষ্ঠতা কোচ্ছিলেম, এখন দেখ্‌ছি, বিপরীত দাঁড়ায়!—এ সব কথা কিছুই ভাঙবো না, শীঘ্র শীঘ্র মেয়েটার বিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য, বড়বাবুকে আমি এই কথা বোলবো।

এইরূপ আমার চিন্তা। সে চিন্তা ভবিষ্যৎ ; আমি এখন করি কি? অন্তঃপুরে যাব না, কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে কথা কব না, কৃষ্ণকামিনীকে দেখা দিব না, সেটাও তো ভাল কথা নয় ; হঠাৎ সে রকম ভাবান্তর দেখালেই দোষ হবে ; সকলেই এক এক প্রকার সন্দেহ কোরবেন। সেইরূপ সম্ভাবিত সন্দেহ-ক্ষেত্রে যদি আমি বড়বাবুর কাছে কৃষ্ণকামিনীর বিয়ের কথা তুলি, তা হোলে সে সন্দেহটা আরো বাড়বে ;—না, ভাবান্তর দেখানো হবে না, যেমন আছি, তেমনই থাকবো ; সকলের সঙ্গে যেমন মুখের কথায় সদ্ভাব রেখে আসছি, কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গেও সেইরূপ মৌখিক সদ্ভাব রাখবো ; ভাবান্তর দেখানো হবে না। দেখাতে গেলেই হয় তো আর একখানা দেখাবে। স্ত্রী-চরিত্র দেবতারাও বুঝে উঠতে পারেন না ; কৃষ্ণকামিনী বালিকা হোলেও স্ত্রী-চরিত্রের সীমা-বহির্ভূতা হোতে পারেন না। চতুরতার সঙ্গে খলতার যোগাযোগ আছে ; চতুরা স্ত্রীলোক নিজে দূষী হয়েও, আশাভঙ্গে নির্দ্দোষ পুরুষের নামেও কলঙ্ক রটায়। আশাভঙ্গে কৃষ্ণকামিনী যদি সেই পন্থা অবলম্বন করেন, তা হোলে আমি আর এখানে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না ;—ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হব না, কিন্তু মানুষের কাছে মুখ তুলে কথা কোইতে আমার ভয় হবে ; লজ্জা তো হবেই, ধরা কথা, মানুষেরা আমাকে ঘৃণা কোরবে। কাজ নাই, সে রকম স্বতন্ত্রতা দেখিয়ে কাজ নাই ; যেমন আছি, যেমন বেড়াচ্ছি, সদরে অন্দরে সকলের কাছে যেমন ভাব দেখাচ্ছি, ঠিক ঠিক সেই ভাব বজায় রাখবো ; আমার মনের ভাব কেহই কিছু জানতে পারবে না, কাহাকেও কিছু জানতে দিব না। কৃষ্ণকামিনীকে প্রশ্রয় দিব! দেখি দেখি, বালিকা-বুদ্ধি আমার বুদ্ধির উপর জয়লাভ কোত্তে পারে কি না!

নৈশ-চিন্তার উপদেশে এই সঙ্কল্পই আমার পাকা। রজনীপ্রভাত হলো,

কর্ত্তব্যকার্য্যে মনোনিবেশ কোল্লেম. সময়মত অন্দরমহলে গেলেম, যার সঙ্গে যে রকম কথা আবশ্যক, সেরকম কথাবার্ত্তা কোইলেম। কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে দেখা হলো।

নিত্য নিত্য যেরূপ ভাব. সেই ভাবে একটু হেসে, কৃষ্ণকামিনী একটা ঘরের দিকে চোলে গেলেন। আমি মনে কোল্লেম, ও হাসিটা লজ্জার হাসি ; গত রাত্রে মনের চাঞ্চল্যে একটা অন্যায় কাজ কোরে ফেলেছেন, তার পর সেটা বুঝতে পেরেছেন. সেইজন্যই লজ্জা এসেছে, ঐ হাসিতে সেই লজ্জার পরিচয় দিলেন. সেইজন্যই আমার সম্মুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পাল্লেন না, অন্যঘরে চোলে গেলেন।

ও পরমেশ্বর! তা নয়! আমার সিদ্ধান্ত অমূলক! সেই ঘরে প্রবেশ কোরে, কপাটের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে, হাতছানি দিয়ে কৃষ্ণকামিনী আমাকে ডাকলেন। স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত হয়ে মেয়েরা সকলেই তাড়াতাড়ি এঘর ওঘর কোচ্ছিলেন. দিনের বেলা, আমার প্রতি কেহই কোনরূপ সন্দেহ রাখেন না. আমিই বা তখন ইতস্ততঃ কেন কোরবো, কৃষ্ণকামিনীর সঙ্কেতে সেই ঘরের দিকে আমি চোলে গেলেম, ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। কপাটের কাছ থেকে সোরে এসে ঘরের একধারে দাঁড়িয়ে. করতালি দিয়ে খিলখিল কোরে হেসে. কামিনী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় বোলে উঠলেন, "কেমন হরিদাস! কেমন! দেখলে তো! কেমন ভালবেসেচি! তুমি কি আমাকে ঐ রকম ভালবাসতে পার?"

কৃষ্ণকামিনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে চঞ্চলস্বরে চুপি চুপি আমি বোল্লেম, "চুপ কর মাসি. চুপ কর! সকলে ওখানে রোয়েছেন. শুনতে পাবেন, তোমার মনে মন্দভাব নাই, তা হয় তো তাঁরা বুঝবেন না, কত কি গালাগালি কোরবেন. সেটা কি ভাল? আমাদের সরল প্রাণ, তুমি আমারে ভালবাস, আমি তোমারে ভালবাসি. সকলেই দেখতে পান, মুখে ততটা পরিচয় দেওয়া কেন? বয়সে সমান হোলেও তুমি আমার মাসী, আমি তোমার ছেলের মতন ; ছেলের মুখে হামু খেয়েছ. বেশ কোরেছ! ছেলের মুখে কে না হামু খায়? বেশ কোরেছ! সে পরিচয় আবার লোকে শুনবে কি? এখন সদরবাড়ীতে একটী কাজ আছে, আমি এখন চোল্লেম, আবার সময়মত দেখা হবে।"

দরজা পর্য্যন্ত এসে, আবার ফিরে গিয়ে পূর্ব্ববৎ চুপি চুপি আমি বোল্লেম. "দেখ কৃষ্ণ, রোজ রোজ সন্ধ্যাকালে ঠাকুরবাড়ীতে দেখা করা—সেটা বড় ভাল নয়। কেন, ঠাকুরবাড়ী না হোলে কি তোমাতে আমাতে দেখা-সাক্ষাতের আর স্থান নাই? সর্ব্বক্ষণ আমি বাড়ীতে আছি. তুমিও আছ, যখন ইচ্ছা, তখনি আমি দেখা কোত্তে পারি, যা যা তুমি বল, তারও ব্যবস্থা কোত্তে পারি, কি আমি না পারি? যেদিন সুবিধা হবে, সকলে যেদিন যাবেন, সেই দিন না হয় ঠাকুরবাড়ীতে দেখা করা যাবে, রোজ রোজ ঠাকুরবাড়ীতে সুবিধা হবে না, সুবিধা হোলেও সেটা ভাল দেখাবে না ; বুঝলে কি না? মনে মনে যা তুমি ভাবো, যা তুমি আমারে বোলবে বোলবে মনে কর, তা আমি বুঝতে পেরেছি. কাল সন্ধ্যার পর তার একটু আভাষও তোমারে আমি দিয়ে রেখেছি,

আজ আবার বড়বাবুকে সেই কথাটী বিশেষ কোরে বোলবো ভেবে রেখেছি। তুমি ভেবো না ; এক মাসের মধ্যেই তোমার বিয়ে হয়ে যাবে।"

শেষকথাটী বোলেই দ্রুতপদে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। কৃষ্ণকামিনীর মুখে উত্তর শুনবার প্রতীক্ষা কোল্লেম না।

তদবধি আমি রক্ষাকবচ ধারণ কোল্লেম। কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে সময়ে সময়ে আমি দেখা করি, হাসি-খেলা করি, সমানভাবে ভালবাসা জানাই, কৃষ্ণকামিনী মুখ ফুটে যা যা বলেন, সমানভাবে তাতেই আমি সায় দিয়ে যাই, কিছুতেই কিছু ব্যতিক্রম ঘটে না। সমস্তই কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাব। ঠাকুরবাড়ীতেও দেখা হয়, বাড়ীতেও দেখা হয়, কৃষ্ণকামিনীর আদর-বিলাসে এক একবার আমি হাস্য করি, এক একবার মুখ বুজে থাকি, কৃষ্ণকুমারী খুসী থাকেন। পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এইরূপ ভাব চোলতে লাগলো।

ত্রয়োবিংশ কল্প

আমার ভূতের ভয়

কার্ত্তিকমাসে দুর্গাপূজা হয়ে গিয়েছে, সুতরাং অগ্রহায়ণমাসে রাসযাত্রা। মাঝের রাসের দিন বৈকালে পশুপতিবাবু আমারে বোল্লেন, "হরিদাস, রাস দেখতে যাবে?" রাস কখনো আমি দেখি নাই ; কি রকম রাস, রাসে কি কি দেখা যায়, কেহ কখনো আমারে সে কথা বলেন নাই, ছোটবাবুর প্রশ্ন শুনে কৌতূহলে আমি উত্তর কোল্লেম, "যাব।"

মুর্শিদাবাদজেলায় 'বোরাকুলী' নামে একখানি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে সর্ব্বেশ্বর চৌধুরী নামে একজন ধনাঢ্য কায়স্থের বাড়ীতে রাসযাত্রা। খুব ঘটা হয়, বাজার বসে, অনেক লোক জমা হয়, অনেক রকম নাচ-তামাসা হয়, রাত্রিকালে আতসবাজী হয়, মহাসমারোহ ব্যাপার। এই সব পরিচয় পেয়ে, বাবুর মত পোষাক পোরে, ছোটবাবুর সঙ্গে আমি রাস দেখতে চোল্লেম। বোরাকুলী গ্রাম যদুপুর গ্রাম থেকে অনেকটা দূর। উপযুক্ত যানবাহনে রাত্রি প্রায় চারিদণ্ডের সময় সেই গ্রামে আমরা উপস্থিত হোলেম। সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাড়ীখানি প্রাচীনধরণে বিনির্ম্মিত। রাসোৎসবে বাড়ীখানি মেরামত করা হয়েছে, ফটকে ফটকে রং দেওয়া হয়েছে, ফটকের দু-ধারে মণ্ডলাকারে অনেকগুলি স্তম্ভগাঁথা ; মধ্যস্থলে কেয়ারীকরা ফুলবাগান ; স্তম্ভের মাথায় মাথায় রকম রকম পুতুল বোসেছে, নৃত্যভঙ্গীতে সারি সারি পাথরের পরী দাঁড়িয়েছে, পরীদের দুই হাতে দুটী দুটী কাচের ফানস, কাচের ফানসের ভিতর বাতী জ্বেলছে, বাড়ীর বাহিরের বারান্দাতেও নানা বর্ণের বেল-লণ্ঠন সমুজ্জ্বল বাতী ; ফটকের পশ্চিমদিকে রাসমঞ্চ ; চতুষ্কোণ বেদী, চারিধারে উচ্চ উচ্চ গোলথাম, থামে থামে নানা বর্ণের লতাপাতা কাটা, থামের মাথায় চতুষ্কোণ ছাদ, ছাদের নীচে রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ, সবুজবর্ণের ঝালর ; চন্দ্রাতপে হাতী, ঘোড়া, পক্ষী,

পদ্মফুল আর অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি চিত্রকরা। মঞ্চের থামের খাটালে খাটালে ছোট ছোট বেলোয়ারি ঝাড়, ঝাড়ের ফানস কতকগুলি নীলবর্ণ, কতকগুলি সবুজবর্ণ, কতকগুলি গোলাপীবর্ণ, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ। সকল ফানসেই বাতী জ্বলছে ; থামের গায়ে গায়ে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরী ; মঞ্চের নিম্ন-ভাগে বেদীর উপর বড় বড় পরী, তাদের হস্তেও জোড়া জোড়া লণ্ঠন; অপরূপ শোভা! রাসমঞ্চের দক্ষিণাংশে নহবৎখানা ; নহবৎখানার সম্মুখে প্রায় একবিঘা জমীতে বাজার। নানাদেশের নানাদ্রব্য সেই বাজারে বিক্রীত হোচ্ছে ; সহস্র সহস্র লোক চতুর্দ্দিকে ভিড় কোরে বেড়াচ্ছে, কোলাহলে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত ; দেখতে দেখতে রাত্রি এক প্রহর।

যাদের বাড়ীতে রাস, তাঁদের সঙ্গে পশুপতিবাবুর বেশ সদ্ভাব। দুই একজনের কাছে তিনি আমার পরিচয় দিয়ে দিলেন, তাঁরাও মিষ্টবচনে আমার সঙ্গে সম্ভাষণ কোল্লেন ; আমি তাঁদের নমস্কার কোল্লেম।

রাত্রি দেড় প্রহরের কিছু পূর্ব্বে ঠাকুরের বার। ঘোরঘটায় বিবিধ বাদ্যোদ্যম, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন, দুধারি রঙমশালের রোসনাই সর্ব্বপশ্চাতে ঠাকুরের সিংহাসন ;—সিংহাসনের পশ্চাতে ঢালতলোয়ারধারী প্রহরীশ্রেণী।

রাধামূর্ত্তিসহ রাসবিহারীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ রাসমঞ্চে এসে বার দিলেন ; মঙ্গল উপচারে শীতলসামগ্রী নিবেদনের পর আরতি হয়ে গেল। ভট্টাচার্য্য সবেমাত্র বাম-হস্তের ঘণ্টাটী আসনের কাছে নামিয়েছেন, ঠিক তৎক্ষণাৎ অমনি গুড়ুম গুড়ুম শব্দে শত শত ব্যোমবাজীর আওয়াজ আমাদের শ্রুতিগোচর হলো। বাজীক্ষেত্রটা রাসমঞ্চ থেকে শতাধিক হস্ত দূরে। রাসমঞ্চের উপর থেকে আমরা আতসবাজী দর্শন কোত্তে লাগলেম। আকাশমার্গগামী সুন্দর সুন্দর হাউইবাজী, উল্কাবাজী, তারাবাজী, ফুলকাটা বিমানবাজী, মধ্যে মধ্যে বোম-ধ্বনি ;—তা ছাড়া, হাতীবাজী, ঘোড়াবাজী, রাক্ষসবাজী, মল্লবাজী, লড়াই-বাজী, তুবড়ীবাজী, চোরকীবাজী, বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীবাজী ইত্যাদি কতরকম বাজী আমি দেখলেম, দেখে দেখে আশ্চর্য্যজ্ঞান হোতে লাগলো ; তাদৃশ অগ্নিক্রীড়া পূর্ব্বে কখনো আমি দেখি নাই।

আরো অনেকরকম বাজী আছে, লোকের মুখে সেই কথা আমি শুনলেম, কিন্তু ছোটবাবু আমারে আর বেশীক্ষণ সেখানে রাখলেন না ; বেশী রাত জাগলে অসুখ হবে, এই কথা বোলে রাসমঞ্চ থেকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। রাসবাড়ীতে অসম্ভব ভিড়, সারারাত গোলমাল, সেখানে নিদ্রা হবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তিনি আমারে সঙ্গে কোরে, খানিক তফাতে আর একখানি বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেই বাড়ীর একটী ছেলের সঙ্গে পশুপতিবাবুর পূর্ব্বাবধি আলাপ ছিল, সেই খাতিরেই সেই বাড়ীতে যাওয়া। সেই বাবুটীও আমাদের সঙ্গে। রাত্রি দুই প্রহর।

বাড়ীখানি একতালা, একমহল, চারিদিকে প্রাচীর, বাড়ীর ভিতর সাত আটটী কুঠুরী। রাসবাড়ী থেকে একজন ব্রাহ্মণ সেইখানে আমার জলখাবার দিয়ে গেল, ঠাকুরের প্রসাদ, বিবিধ মিষ্টসামগ্রী ভোজন কোরে একটী কুঠুরীতে আমি বোসলেম।

কায়স্থের বাড়ী। বাড়ীর কর্ত্তার নাম শান্তিরাম দত্ত। কর্ত্তার অনেক বয়স হয়েছে, মস্তকের কেশ, ভ্রূ, কর্ণলোম, বক্ষলোম সমস্তই শ্বেতবর্ণ, কিন্তু চলৎশক্তি আছে; ছেলেমেয়ে আট দশটী হয়েছিল, যৌবনে শৈশবে প্রায় সকলগুলি দুরন্ত কালকবলে কবলিত, কেবল একটী পুত্র আর দুটী বিধবা কন্যা বর্ত্তমান। পুত্রটীর নাম মণিভূষণ। সেই মণিভূষণের সঙ্গেই আমাদের পশুপতিবাবুর আলাপ। মণিভূষণ পশুপতিবাবুর সমবয়স্ক, পরিচয় পেয়ে মণিভূষণ আমারে বেশ আদর-যত্ন কোল্লেন। রাত্রে সেই বাড়ীতে আমার শয়নের ব্যবস্থা। আমার আহারের অবসরেই একটী কুঠুরীতে শয্যা প্রস্তুত হয়েছিল, বাড়ীতে দাসদাসী নাই, বাড়ীর মেয়েরাই শয্যা রচনা কোরেছিলেন, সেইখানে আমায় শয়ন কোত্তে বোলে, মণিভূষণের সঙ্গে ছোটবাবু আবার রাসবাড়ীতে ফিরে গেলেন।

গৃহিণীও লোকান্তরগতা। কর্ত্তার কন্যারাই সংসারের কাজকর্ম্ম করেন। আমি শয়ন কোল্লেম। শুনেছিলেম, কর্ত্তার বিধবা কন্যা দুটী, কিন্তু আমি যখন আহার করি, তখন একখানি কপাটের আড়ালে তিনখানি মুখ আমি দেখেছি; একখানি হস্তও একবার আমার নয়নপথে পতিত হয়েছিল; সে হস্তে অলঙ্কার আছে। একবার মাত্র দেখা ছায়ামাত্র বোল্লেও চলে; কেন না, একবার ভিন্ন দুবার আমি সেদিকে চাই নাই; নূতন জায়গায় সে রকম চাওয়াও আমার অভ্যাস নয়; কিন্তু হাতখানিতে গহনাও আমি দেখেছি। বিধবার অলঙ্কার থাকে না, তবে সে হাতখানি কার? তৃতীয়া কন্যাটীই বা কে? শয্যায় শয়ন কোরে মনে মনে আমার সেই বিতর্ক।

অগ্রহায়ণ মাস; আমার শয়নঘরের গবাক্ষগুলি বন্ধ। ঘরের ভিতর দিয়ে ঘরে ঘরে যাওয়া আসার পথ, সুতরাং দরজাটী খোলা থাকলো, ঘরে আলো জ্বলতে লাগলো। আলো জ্বেলে নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস নয়,—জ্বলছে তো জ্বলছে, সে আলো আমি নির্ব্বাণ কোল্লেম না।

একখানি তক্তপোষের উপরে আমার শয্যা; শয্যাতে সরুকাপড়ের মশারি-ফেলা। আমি শুয়ে আছি। রাত্রি অনেক হয়েছিল, শীঘ্র শীঘ্র নিদ্রা আসাই সম্ভব ছিল, কিন্তু শীঘ্র নিদ্রা এলো না। এক একবার অল্প অল্প তন্দ্রা আসে, আবার তখনি তখনি জেগে উঠি। কেন এমন হয়? ঘরে আলো আছে বোলেই কি নিদ্রা হোচ্ছে না? মনে কোল্লেম, আলোটা তবে নিবিয়ে দিয়ে আসি। মনে কোল্লেম, কিন্তু কেমন আলস্য হলো, উঠলেম না, উঠতে পাল্লেম না, চুপটী কোরে শুয়ে থাকলেম। এক একবার চক্ষু বুজি, এক একবার যেন তন্দ্রা আসে, কি যেন দেখছি, কি হোচ্ছে, কে যেন আসচে, তন্দ্রাবশে এই রকম ভেবে ভেবে আবার চেয়ে চেয়ে দেখি।

অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রি, দুই প্রহরের পর অনেক রাত্রি থাকে; আমি যখন শয়ন কোরেছি, তখন রাত্রি প্রায় ইংরেজীমতে একটা; বড়রাত্রি কি না, ঊষা আসবার তখনো অনেক বাকী। ঘুম হোচ্ছে না; এক একবার চক্ষু বুজে থাকছি, এক একবার চেয়ে চেয়ে দেখছি। এই ভাবে আরো একঘণ্টা। হঠাৎ একবার চেয়ে দেখি, অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত একটী স্ত্রীলোক যেন টিপি টিপি সেই

ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। মশারির ভিতর ছিলেম কি না, অবয়বটী ঠিক দেখতে পেলেম না,—তন্দ্রাঘোরও অল্প অল্প ছিল, তন্দ্রাঘোরেই স্বপ্ন আসে ; মনে কোল্লেম, স্বপ্ন। নেত্রমার্জ্জন কোরে ভাল কোরে চেয়ে দেখলেম, সত্যই একটী নারীমূর্ত্তি নিঃশব্দপদসঞ্চারে অতি মৃদুগতিতে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো ; আমার মশারির ধারে এসে দাঁড়ালো ; আমি ঘুমিয়ে আছি কি না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই যেন অল্পক্ষণ পরীক্ষা কোল্লে ; তার পর অল্পে অল্পে সোরে সোরে আমার শিয়রের দিকে তক্তপোষের ধারে এসে আবার দাঁড়ালো। তখনো আমি ভালরকম দেখতে পেলেম না। মূর্ত্তি তখন ক্রমে ক্রমে পায়ে পায়ে তক্তপোষখানা প্রদক্ষিণ কোরে এলো ; ঘুরে এসে আবার ঠিক আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়ালো, সেইবার আমি তার মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পেলেম ; দেখেই অন্তরে অন্তরে কেঁপে উঠলেম ; গাটা যেন ডুলি দিয়ে উঠলো ; অকস্মাৎ ভয় পেয়ে, চক্ষু বুজে, দুই হস্তে দুটী চক্ষু আবরণ কোল্লেম। মনের ভিতর ভয়ের সঙ্গে কতরকম তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হোতে লাগলো, আমার অন্তরাত্মাই তা জানতে পাল্লেন। যদিও সে মূর্ত্তি মশারির বাহিরে, তথাপি বোধ হোতে লাগলো যেন, মশারির ভিতর হাত বাড়িয়ে সে আমারে ধোত্তে আসছে! এইবার তাড়াবো। সাহসে ভর কোরে সেই সময় আবার আমি মুখ থেকে হাত সোরিয়ে সটান নয়ন উন্মীলন কোল্লেম। সে মূর্ত্তি আর তখন সেখানে নাই! তখন আমার প্রাণে যেন কত ভয়। অহো! এই ভবসংসারের কি এই গতি! নিশ্চয়ই ভূত! নিশ্চয়ই অমরকুমারি! অমরকুমারি! আহা! কাশীধামে দেহত্যাগ কোরে, শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েও কি তুমি আমারে ভুলতে পাচ্ছো না? পুনরায় ভৌতিক দেহ পরিগ্রহ কোরে এই মুর্শিদাবাদে এই নিশা-কালে তুমি আমারে দেখা দিতে এসেছ? কোথায় গেলে? ভয় দেখাতে এসেছিলে? অমরকুমারি! ভূতের ভয় আমি রাখি না, তোমারে দেখে কেন তবে আমার প্রাণে এত ভয়? হায় হায়! অমরকুমারি! তুমি আমারে কত ভালই বেসে-ছিলে, আমি তোমারে কত ভালই বেসেছিলেম, হায় হায়! সেই ভালবাসা কি এখন ভূতের ভয়ে পরিণত? না না, ভয় আমি কোরবো না, অমরকুমারীকে দেখে ভয় করা, এ কথাটা মনে কোল্লেও আমার চক্ষে জল আসে! অমরকুমারি! তুমি ভূতই হও, প্রেতই হও, পিশাচীই হও, এসো, তোমারে দেখে আমি ভয় পাব না ; সাক্ষাৎ দর্শনে অদর্শনে দেবীমূর্ত্তিরূপেই আমি ভাবনা কোরবো। এসো, এসেছিলে যদি, লুকালে কেন? একটীবার দেখা দিয়ে অলক্ষিতে আবার পালালে কেন? চিনেছি আমি তোমারে! অমরকুমারি! অল্পক্ষণ চক্ষের কাছে খেলা কোরে অকস্মাৎ তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলে? সেইরূপে আর এক-বার এসে দেখা দাও!

উদ্দেশে মনে মনে অমরকুমারীকে আমি এই রকম অনেক কথা বোল্লেম, অনেকবার ডাকলেম, অমরকুমারী এলেন না। বিছানার উপর উঠে বিছানা থেকে নামি, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্বেষণ কোরে দেখি, এইরূপ মনে কোল্লেম, কিন্তু উঠতে পাল্লেম না। ভূতের ভয় অমূলক, আশৈশব এই বিশ্বাস থাকলেও একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমি অভিভূত হোলেম। যুধিষ্ঠিরের কথা মনে

পোড়লো। কামরূপে যুধিষ্ঠির বোলেছিল, এই মুর্শিদাবাদের এক বাগানের চাঁপাতলায় মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচারীরূপী ব্রহ্মদৈত্য দর্শন কোরেছে, আমিও এই মুর্শিদাবাদের এক বাড়ীর একটী ঘরের ভিতর মূর্ত্তিমতী কুলকন্যারূপিণী অমরকুমারীর প্রেতমূর্ত্তি দর্শন কোল্লেম!

সে মূর্ত্তি আর এলো না। শুয়ে শুয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা আমি প্রতীক্ষা কোল্লেম, সে মূর্ত্তি দেখতে পেলেম না। ভয়কে হৃদয়ে ধারণ কোরে, মনে মনে আবার আমি ডাকলেম, অমরকুমারি! কোথায় তুমি গিয়েছ? এসো, আর একটীবার দেখা দাও! আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে চল! যেখানে তুমি গিয়েছ, সেইখানেই আমি যাব! বীরভূমের রাক্ষসকুটীরে তোমাতে আমাতে কদিন যেমন সুখে ছিলেম, চিরদিন চির-শান্তিধামে দুজনে আমরা সেইরকম সুখে থাকবো। এসো, দেখা দাও! দেখা দাও! নিয়ে চল! নিয়ে চল! তুমি আমারে শান্তিধামে নিয়ে চল!

দরজার দিকেই আমি চেয়ে আছি। চক্ষের পলক পোড়ছে না, বিলম্বে একটী একটী নিশ্বাস পোড়ছে, সটান চেয়ে আছি। সেই মূর্ত্তি পুনর্ব্বার! এবার দেখলে ভয় পাব না মনে কোচ্ছিলেম, কি জানি, সংসারের ভয়-প্রবাহের কেমন গতি, মূর্ত্তির পুনরাবির্ভাব মাত্রেই আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত! মূর্ত্তির গতি এবারে আর মৃদু নয়, হংসগতিতে নিঃশব্দে দ্রুত দ্রুত; মূর্ত্তি এবার আর সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে শয্যাসমীপে প্রতীক্ষা কোল্লে না, শয়নাসনটী প্রদক্ষিণও কোল্লে না, সরাসর নিকটে এসে, ধীরে ধীরে মশারিটী একটু তুলে, ভিতরদিকে মুখ বাড়িয়ে, আমারে সম্বোধন কোরে চুপি চুপি বোল্লে, "ঘুমিয়েচো হরিদাস?" চোমকে উঠে, এত হাত তফাতে সোরে গিয়ে চক্ষু বুজে আমি কাঁপতে লাগলেম। মূর্ত্তি আমারে পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আমারে দেখে তুমি কি ভয় পেয়েচ? আর একবার আমি এসেছিলেম, তা কি তুমি জানতে পেরেছিলে? ও কি! তুমি কাঁপচো কেন?" এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমার বক্ষঃস্থলে করস্পর্শ অনুভব কোরে, সহসা আমি বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হোলেম। এ কি! ভূতের স্পর্শ এমন কোমল, ভূতের কণ্ঠস্বর এমন সুমিষ্ট, এটা তো কল্পনাতেও আসতে পারে না; বিশেষতঃ অমরকুমারী যখন বেঁচে ছিলেন, অমরকুমারীর কণ্ঠস্বর তখন যেমন মধুমাখা ছিল, এ যে শুনি ঠিক তাই। তবে কি অমরকুমারী বেঁচে আছেন? কাশীধামে অমরকুমারীর শিবত্বপ্রাপ্তির কথাটা তবে কি মিথ্যা? মিথ্যা হওয়াই সম্ভব! মোহনলালের একটা কথাও যেন সত্য বোলে বোধ হয় না। অমরকুমারীর অমঙ্গল-সংবাদটা নিশ্চয়ই মিথ্যা। আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী সুন্দরীই সত্য সত্য সজীব অমরকুমারী! আনন্দের সঙ্গে, বিস্ময়ের সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে, অন্তরে আমার পূর্ণ-শান্তির উদয় হলো, আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হয়ে গেল, বোধ হলো যেন, আমি তখন শান্তিজলে স্নান কোল্লেম; পূর্ণানন্দে পূর্ণ-উৎসাহে শয্যার উপর তখন উঠে বোসলেম। অমরকুমারীর মুখখানি তখন আমার অতি নিকটেই ছিল, সাশ্রুনয়নে চেয়ে দেখলেম, অমরকুমারীর পদ্মনেত্রদুটীও অশ্রুপূর্ণ। কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অমর! সত্যই কি তুমি অমর?"

নেত্রমার্জ্জন কোরে, একটু মৃদু হেসে, অমরকুমারী বোল্লেন, "হাসালে হরিদাস, হাসালে! বড় দুঃখে আজ তুমি আমারে হাসালে! অমর কি মিথ্যা হয়?"

কথাগুলি বোলতে বোলতে অমরকুমারী অতি অনুপমভঙ্গীতে বিছানার উপর উঠে বোসলেন; বিকসিতনেত্রে আমার মুখপানে চাইতে চাইতে ঠিক আমার মুখের কাছে এসেই বোসলেন; মুখখানি আরো নিকটে এনে, অর্দ্ধ-মৃদু হাস্যে সুরঞ্জিত কোরে, স্বভাবসিদ্ধ মধুরকণ্ঠে বোল্লেন, "দেখ দেখি ভাল কোরে, সত্য অমর কি মিথ্যা অমর?"

আমিও বিকসিতনেত্রে দর্শন কোল্লেম, ঠিক সেই! কিছুমাত্র রূপান্তর হয় নাই! বিস্ময়ের উপর আমার মনে তখন আরো অধিক বিস্ময়। ভেলুয়াচটীতে অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার, মোহনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ, মোহনবাবুর বাক্য, মোহনবাবুর সঙ্গে বিবাহ, প্রয়াগধামে যাত্রা, কাশীর রসিক পিতুড়ীর বাড়ীতে কুমারী-ভোজনোৎসবে দর্শন, তার পর মোহনবাবুর সঙ্গে কাশীতে আগমন, জ্বরবিকার, শিবত্বপ্রাপ্তি, আগা-গোড়া সেই সব কথা একে একে অমরকুমারীকে আমি শুনালেম। শুনে শুনে অমরকুমারী কিয়ৎক্ষণ অচলা প্রতিমার ন্যায় নিস্পন্দ নির্ব্বাক হয়ে থাকলেন; অগ্রহায়ণমাসের শেষরাত্রের শীতেও কপালে দরদরধারে ঘাম ঝোরতে লাগলো। স্তম্ভিতবদনে খানিকক্ষণ সামলে, বসনা-ঞ্চলে ঘর্ম্ম মার্জ্জন কোরে, সুশীলা বালিকা তখন চমকিতকণ্ঠে বোল্লেন, "এ কি হরিদাস! তোমার কি রকম কথা? এ সব কথার বাষ্পও তো আমি জানি না! নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ? আচ্ছা, তুমি বোসো, আসছি; বাড়ীর সকলে ঘুমুচ্চে কি জেগে আছে, দেখে আসি; বিলম্ব হবে না, এখনি ফিরে আসবো; তুমি বোসো,—শুয়ো না।"

অমরকুমারী অন্যঘরে গেলেন, একটু পরেই ফিরে এলেন; এসেই উদাসনয়নে আমার দিকে চেয়ে, বিছানায় উঠতে উঠতে চকিতস্বরে বোল্লেন, "না হরিদাস! সে আমি নই!"—এই দুটী কথা বোলতে বোলতেই বালিকার নয়ন-কমলের জলে বদন-কমল ভেসে গেল! বিস্ময়ে অবাক হয়ে, শুষ্কনয়নে আমি সেই অশ্রু-সিক্ত মুখপানে অনিমেষে চেয়ে থাকলেম। নেত্র মার্জ্জন কোরে পদ্মমুখী আবার বোলতে লাগলেন, "না হরিদাস, সে আমি নই! তোমারে পূর্ব্বে আমি বোলেছিলেম, হয় তো তোমার মনে থাকতে পারে, আমার একটী দিদি ছিল। যাঁরে আমরা এতদিন বাবা বোলে জানতেম, সেই হতভাগা লোকটা আমার দিদিকে ঝাঁটাপেটা কোরে, একখানা ন্যাকড়া পোরিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। দিদি আমার ভিকারিণীর মতন পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল, কোথাকার এক মুখপোড়া মোহনবাবু এক জায়গায় তারে ধোরে দেশে দেশে নিয়ে বেড়ায়; শেষকালে কাশীতে নিয়ে গিয়েছিল;—বিয়েও নয়, সত্য ভালবাসাও নয়, সেরকমের কিছুই নয়;—তোমার কাছে সে দুঃখের কথাটা বোলতে এখন আমার বাধাই বা কি, মুখপোড়াটা আমার দিদির কুমারী-ধর্ম্ম নষ্ট কোরেছিল! দিদি আমার মনের দুঃখে একরকম বিষ খায়,—

বিষ খেলেই মানুষ মরে, কিন্তু সেটা সে রকম বিষ ছিল না; বিষ খাবার পর জ্বরের লক্ষণ দেখা দেয়। সেই সময় মুখপোড়ার অগোচরে আমার নামে দিদি ডাকযোগে একখানা পত্র পাঠায়। যারে আমি বাবা বোলতেম, পত্রখানা সেই লোকের হাতে পড়ে ;—মাতাল মানুষ কি না, এক জায়গায় ফেলে রেখেছিল, আমারে দেয় নাই। একদিন আমি আমাদের বাইরের ঘরের একটা কোণে জঞ্জালের ভিতর সেই পত্রখানা কুড়িয়ে পাই ; সেই পত্রে দিদির দুর্দ্দশার আগাগোড়া সব কথা লেখা ছিল ; নির্জ্জনে গিয়ে পোড়ে দেখি, সর্ব্বনাশ !”

এই পর্য্যন্ত বোলে, অমরকুমারী দুই হাতে মুখখানি ঢেকে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, বড় বড় নিশ্বাস পোড়তে লাগলো। বিষাদ-বিস্ময় চেপে রেখে, অনেক রকম সান্ত্বনা কোরে, বুঝিয়ে বুঝিয়ে একটু শান্ত কোরে, করুণবচনে আমি বোল্লেম, শেষের ঘটনা সব আমি জানি। আমিও তখন কাশীতে ছিলেম ; মোহনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁরই মুখে শুনে-ছিলেম, তাঁর পরিবারের জ্বরবিকার। আমি দেখতে গিয়েছিলেম ; পূর্ব্বেও দেখা ছিল, রুগ্ন-শয্যাতেও সেই চেহারা আমি দেখি। চেহারা দেখে আমার ধারণা হয়েছিল, তুমি। যে দিন মৃত্যুসংবাদ পাই, সে দিন আমার দুঃখের অন্ত ছিল না ; কি করা যায়, ঈশ্বরাধীন কার্য্য, আপনা আপনি কতকটা প্রবোধ পেয়েছিলেম ; গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন আর তুমি কেঁদো না ; শেষকথাগুলি আমারে বল। পত্রখানা পাঠ কোরে তার পর তুমি কি কোল্লে ?”

নিশ্বাস ফেলে, চক্ষের জল মুছে, বিষাদিনী বোল্লেন, “তার পর ? সেই সময় আমার মায়ের সেই রোগটা অতিশয় বেড়ে উঠেছিল ; মনে কোরেছিলেম, একজন লোক সঙ্গে কোরে কাশীতে আমি চোলে যাব, মায়ের পীড়ার জন্য যেতে পারি নাই। হায় হায় ! সেই রোগে মা আমার মায়া-মমতায় জলাঞ্জলি দিয়ে, আমারে অকূলপাথারে ভাসিয়ে, জন্মের মত পাপসংসার পরিত্যাগ কোরে চোলে যান ! মাতৃহারা হয়ে তিনদিন আমি অন্ন-জল ত্যাগ কোরে অজ্ঞান ছিলেম। তার পর কি হলো, বলি শুন। মায়ের শেষ অবস্থায় যিনি চিকিৎসা কোরেছিলেন, তাঁর পায়ে ধোরে কেঁদে কেঁদে কাশী যাবার জন্য ব্যগ্রতা জানাই, দয়া কোরে তিনি আমাকে কাশীতে নিয়ে যান ; অনেক অনুসন্ধানের পর ঠিকানাটা জানতে পেরে সেই সর্ব্বনাশের কথা আমি শুনি ; জগৎ-সংসার অন্ধকার দেখি ; দেশে ফিরে আসবো না, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের নাম কোরে কাশীর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দুঃখের জীবনের অবসান কোরবো, এই তখন আমার সঙ্কল্প হয় ; দেশে ফিরে আসবো না, কার কাছেই বা আসবো ? প্রাণবিসর্জ্জন করাই তখন একমাত্র গতি, এইটীই আমি স্থির ভাবলেম। ভাবলেম বটে, কিন্তু সিদ্ধ হলো না ; যিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, নানা প্রকার প্রবোধ দিয়ে তিনি আমাকে এই দেশে নিয়ে এসেছেন। যে বাড়ীতে এখন আমি আছি, তাঁরই এই বাড়ী ; তাঁরে আমি পিতা বলি, তিনি আমারে কন্যার মত স্নেহ করেন, তদবধি এইখানেই আমি রয়েছি। জাতিতে তিনি কায়স্থ, কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা জানেন, বীরভূমে কবিরাজী কোত্তেন, সেই সূত্রেই মায়ের চিকিৎসার জন্য তাঁরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।”

এই সব পরিচয় দিয়ে অমরকুমারী পুনর্ব্বার হা-হুতাশে অবিরল অশ্রু-বর্ষণ কোত্তে লাগলেন। আবার নানা প্রকারে সান্ত্বনা কোরে, কথার কৌশলে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আজ রাত্রে প্রথমে তোমারে এখানে দেখে, প্রেতমূর্ত্তি মনে কোরে আমি ভয় পেয়েছিলেম, সেটা কি তুমি আশ্চর্য্য মনে কর ?"

পুনরায় নেত্রমার্জ্জন কোরে অমরকুমারী বোল্লেন, "কিছুই আশ্চর্য্য নয়।— কেন ? সে কথা কি তুমি ভুলে গিয়েছ ? তোমারে আমি বোলেছিলেম, দিদি আর আমি, দুজনেই আমরা রূপে অভেদ। গঠনে, বর্ণে, অবয়বে কিছুই ভেদ ছিল না। দিদি আমার চেয়ে প্রায় দু-বছরের বড় ছিল, কিন্তু আমার গঠন কিছু দীর্ঘ, দিদি একটু বেঁটে, সেইজন্য মাথায় মাথায় সমান দেখাতো। দিদির নাম ছিল সমরকুমারী, সে কথাও তোমাকে আমি বোলেছি ;—দুজনে আমরা এক জায়গায় দাঁড়ালে, কে সমর, কে অমর, চেনা যেতো না ; একটীকে রেখে তার বদলে আর একটীকে এনে দিলে কেহই কিছু প্রভেদ বুঝতে পাত্তো না। অভেদ রূপ। গায়ের ছোট ছোট লোমগুলি পর্য্যন্ত, মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত ঠিক একসমান। হায়—হায়—হায় ! দিদি আমার কোথায় গেল !"

পাশকথা পেড়ে তখন আমি কুমারীকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা কোত্তে লাগলেম। আমার একটা বিষম ভ্রম, বিষম সন্দেহ এত দিনের পর দূর হয়ে গেল। দূরপথে সমরকুমারীকে দেখে বার বার আমি অমরকুমারী মনে কোরেছিলেম, এখানে—এই মুর্শিদাবাদে সজীব অমরকুমারীকে দেখে ভূত মনে কোরেছিলেম, সে দুর্জ্জয় ভ্রমটা আর থাকলো না ; ভ্রমের পরিবর্ত্তে, সন্দেহের পরিবর্ত্তে অভাবনীয় আনন্দের উদয়। আনন্দোদয় হলো বটে, কিন্তু অমরের জননীর মৃত্যু-সংবাদে প্রাণে বড় ব্যথা লাগলো ; দুষ্ট-লোকের চক্রে সমরকুমারী কুলকলঙ্কিনী হয়েছিল, তথাপি সেই অভাগিনীর শোচনীয় মৃত্যু-স্মরণে মন কেমন কাতর হলো। উঃ ! মোহনবাবু কি ভয়ঙ্কর লোক ! তাঁর গতি-ক্রিয়া দেখে যেরূপ আমি অনুমান কোরেছিলেম, কাশীধামে রমেন্দ্রবাবুর কাছে যে ভাবে তাঁর চিত্র এঁকেছিলেম, সমস্তই ঠিক ! সব আমি বুঝলেম।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। গ্রামের মধ্যে মহাসমারোহে রাসযাত্রা, বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই সকাল সকাল গাত্রোত্থান কোরবেন। অমরকুমারীর সঙ্গে নির্জ্জনে আর অধিকক্ষণ একগৃহে থাকা ভাল হয় না, অতএব চাঞ্চল্য জানিয়ে আমি বোল্লেম, "অমর ! তুমি এখন অন্যঘরে যাও, বাড়ীর লোকেরা যদি আমাদের দুজনকে এক জায়গায় দেখতে পান, আসল তত্ত্ব না বুঝে, অন্য প্রকার সন্দেহ কোত্তে পারেন।" ঊষাকাল উপস্থিত, এখন তুমি তোমার আপনার শয্যায় গিয়ে একটু শুয়ে থাকো।" অমরকুমারী বোল্লেন, "সন্দেহ করবার কোন কারণ থাকবে না, এখানে এসে অবধি এ বাড়ীর সকলের কাছে কতবার আমি তোমার গল্প কোরেছি, পরিচয় পেলে সন্দেহ করা দূরে থাকুক, সকলেই বরং তুষ্ট হবেন। আচ্ছা, তুমি বোলচো, আমি এখন যাই, কিন্তু আজ তোমার এখান থেকে যাওয়া হবে না ; তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

অমরকুমারী গেলেন, শয্যার উপর আমি বোসে থাকলেম। আমার সঙ্গে অমরকুমারীর অনেক কথা আছে, অমরকুমারীর মুখে এই কথা আমি শুনলেম ; আমার মুখে যদি কেহ শুনে, আমি বোলবো, অমরকুমারীর সঙ্গে আমারও অনেক কথা আছে। অমরকুমারীর কথা অপেক্ষা আমার কথার জোর বেশী। অমরকুমারী বোল্লেন, আজ তোমার যাওয়া হবে না। সে অনুরোধটা কি কোরে রক্ষা হয়? আমি তো এখানে স্বাধীন নই, পশুপতিবাবু যদি বলেন, "চল হরিদাস !" দ্বিরুক্তি কোত্তে না পেরে হরিদাস তখনি তখনি পালিত মেষশাবকের ন্যায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোলে যেতে বাধ্য হবে। থাকাটা কিরূপে হয়? না থাকলেও তো কথাগুলি শুনা হয় না, আমার কথাগুলিও বলা হয় না।

আমার ভাবনার অবসর না দিয়েই ঊষাসতী চোলে গেলেন ; কাননের বৃক্ষে বৃক্ষে সুগায়ক বিহগকুল নানাবিধ রাগিণীতে ঊষাকে বন্দনা কোরে, প্রভাতী-গীত আরম্ভ কোল্লেন। যে ঘরে আমি শুয়েছিলেম, সেই ঘরের বাহিরদিকে যত্ন-রোপিত গুটীকতক মল্লিকাফুলের গাছ ছিল, ঊষার শিশিরে পরিষিক্ত হয়ে, সেই গাছগুলি নব-প্রস্ফুটিত মল্লিকাভার মাথায় কোরে, প্রভাত-সমীরণকে মনোহর সুগন্ধ উপহার দিতে লাগলো ; গবাক্ষদ্বারগুলি উন্মুক্ত কোরে সেই সুবাস আঘ্রাণে স্বচ্ছন্দমনে আমি সেই নিশা-জাগরণের ক্লান্তি দূর কোত্তে লাগলেম ; কাকেরা কা কা রবে চতুর্দ্দিকে আহার অন্বেষণে উড়ে যেতে লাগলো। প্রভাত-কাল সমাগত ; শিশিরাচ্ছন্ন প্রভাত। যতক্ষণ পূর্ব্বাকাশে নব-প্রভাকর সমুদিত না হোলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘর থেকে আমি বেরুলেম না। গবাক্ষপথে প্রভাতআলোক সন্দর্শনে আমার হাসি এলো। ভূতের ভয় ! আমার ভূতের ভয় ভূতকালের গর্ভে নিহিত হয়ে গেল ; মনে মনে আমি হাস্য কোল্লেম। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুটী যুবাপুরুষ গৃহ-প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান ;—মণিভূষণ আর পশুপতি।

চতুর্ব্বিংশ কল্প

নূতন আনন্দ ;—নূতন ভয় !

ঘর থেকে বেরিয়ে ছোটবাবুর সম্মুখে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম। যে ঘরখানি আমার শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, সে ঘরে প্রবেশ না কোরে, মণিভূষণের সঙ্গে তিনি আর একটী ঘরে গিয়ে বোসলেন, আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরে গেলেম। ছোটবাবু আমারে প্রথমে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন না, দু-তিনবার আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল একটু হাস্য কোল্লেন মাত্র। অকারণে অকস্মাৎ কেন সেপ্রকার হাস্য, ভাবটা আমি বুঝতে পাল্লেম না ; হাস্যের দিকে চেয়ে আছি, সস্মিতবদনে মণিভূষণ আমাকে সম্বোধন কোরে

বোল্লেন, "পশুপতিবাবুর মুখে তোমার সম্ভবমত পরিচয় আমি শুনেছি, কিন্তু এ পরিচয় পাবার অগ্রে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা আমার শুনা হয়েছিল, তোমাকে দেখে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছি।" এই কথাগুলি বোলে শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রাত্রে এখানে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই তো?"

বিনীতবদনে উত্তরদান কোরে ছোটবাবুর মুখের দিকে আবার আমি চাইলেম। বাবুর মুখে হাসি মিলায় নাই। উপস্থিতবুদ্ধি অনেক সময়ে চপলতার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে, উপস্থিতবুদ্ধিতে আমি বুঝলেম, অমরকুমারীর মুখে মণিভূষণ আমার কথা শুনেছিলেন, তাঁদের বাড়ীর পরিবারেরাও শুনেছিলেন, মণিভূষণ হয় তো ছোটবাবুর কাছে সেই গল্প কোরেছেন, তাতেই আমার পানে চেয়ে ছোটবাবুর হাস্য, সেই অনুমান ঠিক; সুতরাং হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা কোরে আমারে আর চপলতা প্রকাশ কোত্তে হলো না; প্রথমবারের হাস্য দেখে মনে যেমন একটা ধোঁকা লেগেছিল, সে ধোঁকাও আর থাকলে না।

তাঁদের দুজনের কাছে আমি চুপ কোরে বোসে আছি, তাঁরা দুজনে পরস্পর এ কথা সে কথা পাঁচ কথা বলাবলি কোচ্ছেন, হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে ছোটবাবু বোল্লেন, "আজ আর যাওয়া হবে না হরিদাস, বাবুরা বিস্তর অনুরোধ কোরে ধোরে বোসেছেন, আজ শেষরাস অনেকরকম নূতন তামাসা হবে, না দেখে যাওয়া হবে না এইকথাই তাঁরা বোলেছেন। আমিও রাজী হয়েছি। দিনের বেলা তুমি এইখানেই থাকো, ব্রাহ্মণ এসে তোমাদের খাবার সামগ্রী দিয়ে যাবে, এইখানেই থাকো।" এই পর্য্যন্ত বোলে আবার একটু হেসে তিনি আরো বোল্লেন, "এ বাড়ী তোমার নিতান্ত পরের বাড়ী নয়, অনেক কথা আমি শুনেছি, স্বচ্ছন্দে তুমি এখানে থাকতে পারবে; তাই তুমি থাকো; কল্য প্রাতঃকালে বাড়ী যাওয়া যাবে।"

মাথা হেঁট কোরে ঐ কথাগুলি আমি শুনলেম। মনে বড়ই উল্লাস। ধন্য জগদীশ! নিজে আমি মুখ ফুটে যে কথাটী বোলতে পাত্তেম না, ছোটবাবু নিজেই সেই কথা বোলে আমার আশা পূর্ণ কোল্লেন। অমরকুমারীর অনুরোধ রক্ষা করবার পন্থাটী পরিষ্কার হোলো। মণিভূষণও ছোটবাবুর বাক্যে অনুমোদন কোল্লেন।

খানিকক্ষণ সেইখানে থেকে, নিকটস্থ সরোবরে স্নান-আহ্নিক সেরে, তাঁরা উভয়ে পুনরায় রাসবাড়ীতে চোলে গেলেন, আমি থাকলেম। বাড়ীর যিনি কর্ত্তা, যাঁর নাম শান্তিরাম দত্ত, যিনি অমরকুমারীর জননীর চিকিৎসা কোরেছিলেন, যিনি যত্ন কোরে অমরকুমারীকে আপন বাড়ীতে এনে রেখেছেন, তিনি আমারে যেন পুত্রতুল্য স্নেহ কোত্তে লাগলেন; তাঁর বিধবা কন্যা-দুটীও আমারে যেন মায়ের পেটের ভাই মনে কোল্লেন। আমার সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

রাত্রে যে ঘরে আমি শয়ন কোরেছিলেম, এই দিন বৈকালে সেই ঘরে নির্জ্জনে আমি আর অমরকুমারী। আমার মুখে প্রথমসংবাদ—"আজ আমার

থাকতে হবে, থাকবার জন্য তুমি আমারে অনুরোধ কোরেছিলে, হয় কি না হয় ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হোচ্ছিল্লেম, সে উদ্বেগের শান্তি হয়েছে, রাসবাড়ীর বাবুদের অনুরোধে পশুপাতিবাবু আজ সেইখানে থাকবেন, আমি এই বাড়ীতেই থাকবো। দেখ অমর! তোমার দিদির সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না, তীর্থপথের চটীতে আগুনের মুখ থেকে যখন তাঁরে আমি উদ্ধার করি, তখন ভেবেছিলেম তুমি ;—নাম ধোরে ডেকেছিলেম, মুখের কাছে বোসেছিলেম, নৌকা পর্য্যন্ত গিয়েছিলেম, তোমার দিদি আমারে চিনতে পারেন নাই। তার পর কাশীধামে জ্বরবিকারে তোমার দিদি যখন শয্যাশায়িনী, তখনো আমি ভেবেছিলেম তুমি ; তখনো তোমার দিদি আমারে চিনতে পারেন নাই ; কত কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, একটী কথারও উত্তর দেন নাই। বিস্ময়ে, সন্দেহে, অভিমানে আমি স্থির কোরেছিলেম, তুমি আমারে ভুলে গিয়েছ! সত্যই আমার অভিমান হয়েছিল! সে অভিমান আজ দূর হলো।"

যতক্ষণ আমি ঐ কথাগুলি বোল্লেম, ততক্ষণ অমরকুমারীর মুখখানি ক্রমে ক্রমে মলিন হয়ে আসছিল, আমার কথা শেষ হবা-মাত্র অশ্রু-প্রবাহে সেই মুখখানি অভিষিক্ত হলো। দুই হস্তে অশ্রু-মার্জ্জন কোরে গদগদস্বরে অমরকুমারী বোল্লেন, অভিমান তো আসতেই পারে!—অভেদরূপের প্রতারণা ঐ রকম! হরিদাস নয়, অথচ ঠিক হরিদাসের মতন আর একখানি মূর্ত্তি দৈবাৎ কোথাও যদি আমি দেখি, হরিদাস ভেবে তার সঙ্গে যদি আমি কথা কোই ; সে যদি কথা না কয়, তারে যদি আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, সে যদি উত্তর না দেয়, তা হোলে আমারও ঐ রকম অভিমান আসে! অভেদরূপের প্রতারণা ঐ রকম! —থাক, ও সব কথা যেতে দাও ; যতই মনে করা যায়, শৈশবস্মৃতির জাগরণে বুক ততই ভারী হয়। দুঃখী আমরা চিরদিন,—তবু—তবুও দুঃখের কথা মনে কোত্তে গেলে নূতন নূতন দুঃখের আগুনে মন-প্রাণ যেন দগ্ধ হয়ে যায়! —দুঃখের কথা এখন ছেড়ে দাও, এখনকার বক্তব্য কি, সেইটী স্থির কর। তুমি তো এই মুর্শিদাবাদে এক বাড়ীতে চাকরী কোচ্চো,, আমি তো এই বাড়ীতে একরকম মেয়ের মতন রয়েছি, এইরকমেই কি চিরদিন যাবে? চাকরী, —কখন আছে, কখন নাই ; চাকরীটা হয় তো ছুটেও যেতে পারে, ইচ্ছা হোলে তুমি নিজেই হয় তো চাকরী ছেড়ে অন্যদেশে চোলে যেতে পার। আমারও প্রায় সেইরকম ; যদিও চাকরী নয়, কিন্তু চিরদিন যে এই বাড়ীতে থাকবো কিম্বা থাকতে পাবো, এমন কথা কে বোলতে পারে? সেইজন্যই বোলচি, এখনকার কর্ত্তব্য কি, সেইটী স্থির কর।"

আমার মনের ভিতর তখন যে কিসের খেলা হোচ্ছিল, অমরকুমারী সেটা জানতেন না। অনেকরকমের অনেকগুলি কথা অমরকুমারীর মধুর রসনায় উদ্গীরিত হলো, গুটীকতক আমার কাণে গেল, কতকগুলি গেলই না! কথাই তো ঠিক, একটাও তখন কাজের কথা বোধ হলো না। উষাকাল থেকে মন আমার বড়ই চঞ্চল। কোন কথার উত্তর না দিয়ে, উদাসভাবে চেয়ে, অতি সাবধানে চুপি চুপি আমি বোল্লেম, "আচ্ছা অমর! কর্ত্তব্য স্থির করাটা তো পরের কথা, এখন স্পষ্ট কোরে বল দেখি, ব্যাপারখানা কি? রাত্রে তুমি বোলেছ,

যে লোকটাকে তুমি এতদিন বাবা বোলে জানতে, সেই লোকটা—ব্যাপারখানা কি? সত্য কি সে লোকটা তোমার বাবা নয়? কে সে? তার বাড়ীতে তবে তোমরা কেন ছিলে?”

“পোড়াকপাল আমাদের!”—মাথাটী উঁচু কোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অমরকুমারী বোল্লেন, “পোড়াকপাল আমাদের! কেন যে তার বাড়ীতে আমরা ছিলেম, আমাদের পোড়াকপালের লিখন লেখবার বিধাতা যিনি, তিনিই তা বোলতে পারেন! লোকটার চেহারা যেমন, দেখেচোই তুমি, ঠিক যেন একটা হনুমান, তেমন হনুমান কি ভাল-মানুষের ঘরে জন্মে?—তেমন হনুমান কি আমাদের বাবা হোতে পারে? ছোটবেলা থেকে ঐ রকম দেখে দেখে আসছিলেম, এক একবার বাবা বোলেও ডাকতেম, একটুখানি জ্ঞান হয়ে অবধি কেমন একটা ঘৃণা এসেছিল, দুরন্ত দুরন্ত সন্দেহ এসেছিল, সেটাকে বাবা বোলে ডাকতে আসলে প্রবৃত্তিই হোতো না! আহা! মা আমার দেবকন্যা, দেবলোকে প্রস্থান কোরেছেন, সেই স্বর্গবাসিনীর মুখে আমি শুনেছিলেম, বেশীদিন আমরা সেই হনুমানের বাড়ীতে ছিলেম না;—দিদি যখন দুবছরের, আমি যখন একমাসের, সেই সময় হনুমানটা আমাদের কোথা থেকে ধোরে এনে নিজের বাড়ীতে কয়েদ রেখেছিল! রাত্রে একদিনও বাড়ীতে থাকতো না, আমার মায়ের সঙ্গে একটাও ভালকথা হোতো না, মা আমার আমাদের দুটী বোনকে নিয়ে একখানা ছেঁড়ামাদুরে শুয়ে থাকতেন, তাঁর চক্ষের জলে রোজ রাত্রে সেই মাদুরখানা ভিজে যেতো! হনুমানটার আক্কেল যেমন, তাড়ন-পীড়ন যেমন, সব কথা তোমারে বোলেছি, কতক কতক চক্ষেও তুমি দেখেচো, মানুষে কি সেরকম পিশাচের কাজ কোত্তে পারে? মুণ্ডুটা ছাড়া হাত-পাগুলোর গড়ন কতকটা মানুষের মতন, কোন দেশের মানুষ, ঠিক পাওয়া যায় না! “আহা! মা যখন আমার শেষদশায় শয্যাগত হন, বেগতিক বুঝে হনুমানটা তখন কোথায় পালিয়ে গেল, উদ্দেশ হলো না! পাড়ার একটী লোকের হাতে পায়ে ধোরে আমিই কবিরাজ ডাকাই, পাড়ার লোকেরাই দয়া কোরে শেষের কাজগুলি নির্ব্বাহ কোরে দেন। যিনি কবিরাজ, তিনি এই বাড়ীর কর্ত্তা, তিনি আমার কত উপকার কোরেছেন, এখনো কোচ্চেন, সে সব তুমি শুনেচ। আর—” এইখানে একবার থেমে, চকিতা-কুরঙ্গিনীর ন্যায় চক্ষু ঘুরিয়ে চারিদিকে চেয়ে, আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে, শঙ্কিতকণ্ঠে অমরকুমারী বোল্লেন, “ও হরিদাস! বোলতে তোমারে ভুলে গিয়েছি! এখানেও আমি নিরাপদ নই! এখানেও সেই পাপ পিশাচটা আমার সন্ধানে সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কোন দেশে উধাও হয়ে উড়ে গিয়েছিল, মাসখানেক হলো, কে জানে, কি রকমে কোথা থেকে কি জানতে পেরে এই গ্রামে এসেচে! দিনের বেলা এদিকে আসে না কিম্বা হয় তো আসে, আমি দেখতে পাই না, লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একদিন সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরে আমি প্রদীপ জ্বালচি, একটা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েচি, দেখি, সেই বিকটমূর্ত্তি সেই জানলার বাইরে হাত পাঁচেক তফাতে একটা তেঁতুলগাছ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে! তার কাছেও একটা মানুষ! দুজনেই তখন অন্যদিকে চেয়ে ছিল, আমারে দেখতে পেলে না। আমি তাদের দেখতে পেলেম:

—ভাল কোরে না দেখে আগে ভেবেছিলেম, বুঝি চোর, তেঁতুলতলায় তেঁতুল চুরি কোত্তে এসেচে, তার পর যখন ঠাউরে ঠাউরে দেখলেম, তখন আমার সর্ব্ব-শরীর কেঁপে উঠলো। ঠিক সেই হনুমান!—দেখেই অমনি প্রদীপটা নিবিয়ে ফেলে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়লেম। তারা সেখানে কতক্ষণ ছিল, কি কোরেছিল, তার পর কোথায় গেল, আর কেহ তাদের দেখে-ছিল কি না, তা আমি জানি না। আর একদিন—না হরিদাস, আর আমি বোলতে পারবো না! এখানেও আমি নিরাপদ নই! সেই অবধি আর আমি বাড়ীর বাহির হই না! কখন আসে, কখন দেখে, কখন ধরে, সর্ব্বদাই আমার প্রাণে সেই ভয়; ঘরের ভিতর বোসেও আমি ভয়ে কাঁপি।"

এত কথা হোচ্ছিল, স্থির হয়ে নূতন কৌতুকে আমি শ্রবণ কোচ্ছিলেম, অমরকুমারীর শেষের কথায় আমি এককালে স্তম্ভিত হয়ে গেলেম। রক্তদন্ত মুর্শিদাবাদে!—সত্যই কি এ লোকটা সর্ব্বব্যাপী?—তাই তো দেখ্ছি! এ পাপ যেমন সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, বিপদও তেমনি পদে পদে আমার সঙ্গে সাথী হয়ে রয়েছে। এবারে আবার অমরকুমারীকে ধরবার চেষ্টা! অনেকক্ষণ আমি অমর-কুমারীর কথায় কোন উত্তর কোত্তে পাল্লেম না। সন্ধ্যা হয়ে গেল, মণিভূষণ একবার বাড়ীতে এলেন, অল্পক্ষণ থেকে আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে আবার রাসবাড়ীতে গেলেন। সেখানে পশুপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হলো, রাসোৎসবের দুটী পাঁচটী নূতন তামাসাও দেখলেম, আতসবাজী দেখবার জন্য আর উৎসুক থাকলো না, অমরকুমারীর সঙ্গে আরো অনেক কথা বাকী ছিল, ছোটবাবুকে বোলে শীঘ্র শীঘ্র আমি চোলে এলেম। রাস্তায় অনেক লোক যাওয়া-আসা কোচ্ছিল, দূরও বেশী নয়, জ্যোৎস্নারাত্রি, তথাপি আমি বাবুদের বাড়ীর এক-জন দরোয়ানকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হোলেম। রক্তদন্তের ভয়ে একা আসতে সাহস হলো না।

বাড়ীতে এসে পোঁছেই প্রথমে কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ। ওতে ঘাতে রক্ত-দন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কর্ত্তা সেটা শুনেছিলেন কি না, অমরের মুখে সে কথা আমি শুনি নাই, অমর হয় তো সে কথা তাঁদের বলেন নাই; তথাপি কর্ত্তা আমারে কাছে বোসিয়ে, অনেকরকম আদরের কথা বোলে, শেষকালে বোল্লেন, "তোমাকে দেখে আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। তুমি যখন বীরভূমে গিয়েছিলে, তখনো আমি বীরভূমে ছিলেম, চিকিৎসা কোত্তেম, শিউড়ীতেই আমার বাসা ছিল, আমার সঙ্গে তোমার সে সময় দেখা-সাক্ষাতের কোন সুযোগ ঘটে নাই; সম্প্রতি অমরকুমারীর মুখে তোমার অনেক কথা আমি শুনেছি। জননীর সঙ্গে অমর-কুমারী সেখানে যে লোকটার বাড়ীতে ছিলেন, সে লোকটা বড় ভয়ঙ্কর; কোথাকার লোক, কি জাতি, কোথা থেকে এসে বীরভূমে আড্ডা কোরেছিল, সেখানকার লোকেও সে সংবাদ জানেন না; কি তার কার্য্য, তাও কেহ বোলতে পারেন না। অমরের মুখে শুনলেম, সেই লোক তোমার উপর বিষম দৌরাত্ম্য কোরেছিল, অমরকুমারীর কৌশলে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে। সাবধানে থেকো, সে লোকের খপ্পরে পোড়লে সহজে নিষ্কৃতি পাবে না। আমি শুনতে পাচ্ছি, সে লোক এই গ্রামে এসেছে; নামটা শুনতে পাচ্ছি না,—নামটা এখানে জানবেই

বা কে, কিন্তু দুই একজন তাকে দেখেছে, চেহারাটাও বোলেছে। কেহ বলে বাঁদর, কেহ বলে রাক্ষস। তুমি সাবধান থেকো, অমরকুমারীকেও আমি খুব সাবধান কোরে রেখেছি ; লোকটা এ গ্রামে এসেছে, অমরকে আমি সে কথা বলি নাই, তোমাকে বোল্লেম ; খবরদার—খবরদার ! কদাপি তুমি রাত্রিকালে একাকী পথে বেরিয়ো না !"

কথাগুলি আমি শুনলেম, নূতন বোধ হলো না, কিন্তু কর্ত্তার কথায় সাবধানে থাকবো, এইরূপ উত্তর দিলেম। কর্ত্তা আমাকে আরো অনেক কথা বোল্লেন, সে সকল কথার সঙ্গে পাঠক-মহাশয়ের তাদৃশ কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বাগ্‌বিস্তার করা অনাবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম। এ সময় কাজের কথা অনেক।

গত রাত্রে যে ঘরে আমি শয়ন কোরেছিলেম, সেই ঘরে গিয়ে বোসলেম। মনের ভিতর আনন্দ আর ভয়। অমরকুমারী বেঁচে আছেন, মোহনলালের কাছে যারে আমি দেখেছিলেম, কাশীতে যার মৃত্যু হয়েছে, সে মেয়েটী অমরকুমারী নয়, অমরকুমারীর দিদি, অমরকুমারীর মুখে এত দিনের পর সেই রহস্যের মর্ম্ম আমি অবগত হোলেম ; অমরকুমারীর সঙ্গে আবার আমার দেখা হলো ; বিধাতা যদি অপ্রসন্ন না হন, কোন না কোন স্থানে আবার আমি অমরকুমারীর দেখা পাব, এই আমার আনন্দ ;—নূতন আনন্দ। ভয় তবে কিসের ?—রক্তদন্ত মুর্শিদাবাদে এসেছে, অমরকুমারী মুর্শিদাবাদে, আমিও মুর্শিদাবাদে আছি, কখন কি ঘটে, দুরন্ত চক্রী লোকটা কখন কি সূত্রে আমাদের উভয়কে কোন বিপদে ফেলে, সেই ভয় ;—এই আমার নূতন ভয় !

মনে মনে এই সব কথা ভাবছি, অমরকুমারী এলেন। মনে কোন প্রকার ভয় আছে, মুখ দেখে তেমন লক্ষণ আমি কিছুই বুঝলেম না। বেশ প্রফুল্ল-বদনে অমরকুমারী আমার কাছে এসে বোসলেন। কথা আরম্ভ হলো। প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক পাঁচ প্রকার কথার পর সন্দেহ-কৌতূহলে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা অমর, সেই জটাধর—যার নাম আমি রক্তদন্ত রেখেছি, সেই লোকটা তোমাদের কেহই নয়, তা তো শুনেছি। শুনাটা নূতন বটে, কিন্তু প্রথমদিন যখন তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখনি আমার মনে খটকা লেগেছিল, বিধাতার এটা কেমন সংঘটন ! তেমন সুরসুন্দরী দয়াময়ী রমণী রাক্ষসতুল্য রক্তদন্তের স্ত্রী, এমন সুরবালা পদ্মমুখী বালিকা সেই রক্তদন্তের কন্যা, কিছু-তেই আমার বিশ্বাস হয় না। সেই স্বভাবসিদ্ধ অনুমানটী এখন সত্য হয়ে দাঁড়ালো। আচ্ছা, রক্তদন্ত তোমাদের কেহই নয় ;—আচ্ছা, তবে তোমরা সত্য-পরিচয়ে কে, তোমার সত্য-পিতাই বা কে, কোথায় তোমার জন্ম, তোমার জননীই বা কোন দেশে ছিলেন, তা কি তুমি জানতে পেরেছ ?"

আমার মুখপানে চেয়ে অমরকুমারী উত্তর কোল্লেন, "কিছুই আমি জানি না। মা আমারে সে সব কথা একদিনও বলেন নাই ;—মরণকালে কেবল চক্ষের জলে ভেসে চুপি চুপি আমারে বোলেছিলেন, 'ঐ লোকটা আমাদের কেহই নয়, অন্যদেশ থেকে ধোরে এনে বীরভূমে আমাদের রেখেছিল।' কেবল এইটুকু

মাত্র ;—এইটুকু মাত্রই আমি শুনেছি। মা যখন ঐ কথা আমারে বলেন, কবিরাজ-মহাশয় তখন কাছে ছিলেন, তিনিও ঐটুকু শুনেছেন। সেই কবিরাজমহাশয় এই বাড়ীর কর্ত্তা, তা তুমি জানতে পেরেচো।"

গত রাত্রে যেমন একজন ব্রাহ্মণ এসে রাসবাড়ীর রাধাকৃষ্ণের প্রসাদ এনে দিয়ে গিয়েছিল, এ রাত্রেও সেই রকমে দিয়ে গেল, আমরা আহার কোল্লেম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে অমরকুমারী যখন শয়ন কোত্তে যান, সেই সময় ছলছলচক্ষে অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হরিদাস! তবে কি তুমি কল্য প্রভাতেই চোলে যাবে? না হরিদাস, যেয়ো না! যতদিন আমি এখানে থাকি, ততদিন তুমিও থাকো। আচ্ছা হরিদাস, আমি এখানে কতদিন থাকবো, তা কি তুমি বোলতে পার?"

বাষ্পবেগে আমারো চক্ষু ছল ছল কোরে এলো। অর্দ্ধরুদ্ধ-কণ্ঠে আমি উত্তর কোল্লেম, কতদিন তুমি এখানে থাকবে, বিধাতার ইচ্ছা, বিধাতাই সে কথা বোলতে পারেন : আমি কেমন কোরে বোলবো? আমায় তুমি এখানে থাকতে বোলছো, তাই বা কি কোরে হয়? আমি একজন বড়লোকের বাড়ীতে চাকরী কোচ্ছি, তাঁর ছোটভাই আমারে সঙ্গে কোরে এনেছেন, তিনি আমারে রেখে যাবেন কেন? যদিই বা বোলে কোয়ে আর দুই একদিন এখানে থাকবার অনুমতি নিতে পারি, তাতেই বা কি উপকার হবে? কল্যই আমি যাব। তুমি ভেবো না। যেখানে আমি থাকি, এখান থেকে সে স্থান বেশী দূর নয় ; মাঝে মাঝে এসে তোমারে আমি দেখে যাব। কর্ত্তা তোমারে খুব ভালবাসেন, মণিভূষণটীও দিব্য সৎ, পরিবারেরাও তোমারে ভালবাসেন, এখানে তোমার কোন প্রকার অযত্ন হবে না। ভয় কেবল রক্তদন্তের ;—সাবধানে থাকলে সে লোকটাও কিছু কোত্তে পারবে না। রক্তদন্ত যদি এখানে রাস দেখতে এসে থাকে, দুদিন পরেই চোলে যাবে, তা হোলেই তুমি নিরাপদ হবে। মাঝে মাঝে এসে আমি তোমারে দেখে যাব। বিধাতার যদি মনে থাকে, সময় যদি শুভ হয়, আমাদের ভাগ্য যদি ভাল হয়, কতবার দেখা হবে ; হয় তো চিরজীবন আমরা একবাড়ীতেই মনের সুখে থাকতে পারবো। চিন্তা কি?—ভেবো না, আশার আশ্বাসে অনেকেই ভবিষ্যৎ শুভদিনের মুখ চেয়ে থাকে, আশার আশ্বাসেই অনেক লোক প্রাণধারণ করে। চিন্তা কি?—এখন যাও, শয়ন কর গে।"

অঞ্চলে নেত্রমার্জ্জন কোরে, ধীরে ধীরে উঠে, আমার দিকে চাইতে চাইতে, অমরকুমারী মৃদুগতিতে গৃহান্তরে প্রবেশ কোল্লেন ; নেত্রমার্জ্জন কোরে আমিও শয়ন কোল্লেম। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পর ছোটবাবু এলেন, মণিভূষণ এলেন, আহারান্তে আমরা সেখান থেকে রওনা হব, এইরূপ স্থির হয়ে থাকলো। সে দিন আর রাসবাড়ীর প্রসাদের অপেক্ষা কোত্তে হলো না, একটী প্রতিবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যা সেই বাড়ীতেই রন্ধনাদি কোরে যত্নপূর্ব্বক পরিবেশন কোল্লেন, পরিতোষরূপে আমরা আহার কোল্লেম। আহারের পর স্বতন্ত্রগৃহে অমরকুমারীর সঙ্গে একবার দেখা কোরে, পূর্ব্ববৎ আশ্বাস দিয়ে, আমি বিদায় চাইলেম। অমরকুমারীর চক্ষের জল নীরবে নির্গত হয়ে বক্ষঃস্থল প্লাবিত কোল্লে। আমি সে সময় আর বেশী কথা বোলতে পাল্লেম না, অশ্রুবেগ সংবরণ কোত্তেও অক্ষম

হোলেম, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সংক্ষেপে কেবল চুপি চুপি বোল্লেম, "কেঁদো না!"

অমরকুমারীকে বোল্লেম কেঁদো না, আমি নিজে কিন্তু অধোবদনে নীরবে না কেঁদে থাকতে পাল্লেম না; অনেক কষ্টে মনোবেগ সংবরণ কোরে শুষ্ক-নয়নে সে ঘর থেকে বেরুলেম; তার পর বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পশুপতিবাবুর সঙ্গে রাসবাড়ীতে গেলেম; মণিভূষণটীও আমাদের সঙ্গে থাকলেন। বেলা আড়াইপ্রহরের পর বাবুদের নিজের শকটারোহণে আমরা দুজনে যদুপুর গ্রামে ফিরে এলেম।

রাধাকৃষ্ণের রাস; রাসাবসানে বোরাকুলীর রাধাকৃষ্ণ আপনাদের বারোমেসে মন্দিরে নিয়মিত নিত্যপূজায় পরিতুষ্ট থাকতে লাগলেন, আমি কিন্তু নিত্য নিয়মিত কার্য্যকলাপে পরিতুষ্ট থাকতে পাল্লেম না। আমার মনোমন্দিরে অভীষ্ট-দেবীরূপিণী অমরকুমারী অনুক্ষণ বিরাজ কোত্তে লাগলেন। সকল ভাবনা অপেক্ষা অমরকুমারীর ভাবনা আমার বেশী হয়ে উঠলো। সেই ভাবনার সঙ্গে রক্তদন্তের ভয়। সাঁ সাঁ কোরে হেমন্তের প্রথমমাস মার্গশীর্ষ বিদায় হয়ে গেল; ক্রমশই আমার চিত্ত অস্থির;—মাস বিদায় হলো আমার চিত্তের চিন্তা বিদায় হলো না। এইখানে একটী কথা বোলে রাখি। দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীতে অনেকগুলি দরোয়ান, অনেকগুলি পালোয়ান। তারা সকলেই অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণ, মল্লযুদ্ধে নিপুণ, পাঁচজন পালোয়ান বিলক্ষণ কুস্তিগীর। লাঠিখেলা, তলোয়ারখেলা, মুগুরভাঁজা, বন্দুকছোড়া, ধনুর্ব্বাণখেলা, এই সকল কার্য্যে অনেকেই দক্ষ। অবকাশকালে আমি বাবুদের অজ্ঞাতে ব্রহ্মময়ীর বাড়ীতে দুজন দরোয়ানের কাছে তলোয়ার, বন্দুক আর তীর ধনুকের ক্রীড়াকৌশল শিক্ষা কোরেছিলেম। অশ্বারোহণে পশুপতিবাবুর বড় সখ, তিনি আমার জন্য একটী ক্ষুদ্র টাট্টু নির্ব্বাচন কোরে দিয়েছিলেন, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কোরে অশ্বারোহণে আমি একরকম পটু হয়েছিলেম। পশুপতিবাবুর সঙ্গে প্রতি রবিবার সকাল বিকাল দুইবেলা অশ্বারোহণে দূরস্থ ময়দানে ভ্রমণ কোত্তে যেতেম। আমার ঘোড়া প্রথম প্রথম কদমে কদমে চোলতো; ক্রমশঃ উৎসাহ, ক্রমশঃ সাহস, ক্রমশঃ গতিবেগশিক্ষা;—ঘোড়াদৌড়ে ক্রমশই আমি পাকা হোলেম। ছোটবাবুর ঘোড়ার সঙ্গে আমার ঘোড়ার সমান দৌড়। এক একবার বরং দ্রুতধাবনে আমার ঘোড়ার জিত হয়, ছোটবাবুর ঘোড়া আট দশ হাত পেছিয়ে পড়ে। আহ্লাদ কোরে ছোটবাবু আমার উপাধি দিয়েছিলেন, "খোকা ঘোড়সওয়ার!"—দীনবন্ধুবাবুর পত্নী সময়ে সময়ে আমারে খোকা বোলে ডাকতেন, সেই আদরে ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ অবমাননা হোলেও, ঘোড়সওয়ার শব্দের পূর্ব্বে আমার "খোকা" বিশেষণ।

চিত্ত কেমন সর্ব্বদাই অস্থির। অমরকুমারীকে দর্শন করবার ইচ্ছা নিত্য নিত্য নূতনবেগে বলবতী। অমরকুমারী কে, সে পরিচয়টী অজানা থাকলেও, পশুপতিবাবু শুনে এসেছেন, অমরকুমারীর সঙ্গে আমার বিশেষরূপ জানা-শুনা, পরস্পর মমতা-বন্ধনও বিলক্ষণ;—পশুপতিবাবু সেটী জেনেছিলেন, কিন্তু বড়বাবু কিছু জানতেন না। পৌষমাসের পঞ্চম দিবসের প্রাতঃকালে বড়-

বাবুকে আমি বোল্লেম, "বোরাকুলী গ্রামে শান্তিরাম দত্তের বাড়ীতে একটী বালিকা এসেছে, সেই বালিকাটীকে আমি চিনি ; সমান বয়স, সেইজন্য তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব। বালিকার মা-বাপ নাই, বড় দুঃখিনী বালিকা। রাস দেখতে গিয়ে সেই বালিকাটাকে আমি দেখে এসেছি, আর একবার তারে দেখবার জন্য আমার মন কেমন করে। আপনি যদি অনুমতি করেন, আজ আমি সেই বালিকাটীকে একবার দেখে আসি।"

ঈষৎ হাস্য কোরে বড়বাবু তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ছোটবাবুকে সেই কথা জানিয়ে আমি একজন দরোয়ান সঙ্গী চাইলেম ; রাসের সময় সেই গ্রামে আমার একটা কালান্তক বৈরী এসেছিল, সেই কথাও তখন তারে জানালেম। সেই অকারণ বৈরীটা এখনো পর্য্যন্ত যদি সেখানে থাকে, একাকী যেতে ভয় হয়, সেইজন্যই একজন দরোয়ান মোতায়েন চাই, এ কথাটাও তাঁরে বোল্লেম। তিনিও ঈষৎ হাস্য কোরে আমার সঙ্গে একজন দরোয়ান দিলেন! বেলা দুই প্রহরের পুর্ব্বে আমরা বোরাকুলী গ্রামে যাত্রা কোল্লেম। দুজনেই আমরা ঘোড়-সওয়ার। আমার সঙ্গে একজোড়া গুলীভরা পিস্তল, দরোয়ানের স্কন্ধে বন্দুক, কটিবন্ধে তরবারি।

যথাসময়ে বোরাকুলীতে আমরা উপস্থিত হোলেম, শান্তিরাম দত্তের বাড়ীতে গিয়ে পোঁছিলেম। শুনলেম কি ?—ভীম নির্ঘাত বজ্রবাণী! অমরকুমারী নাই! আমারে দেখে বাড়ীর সকলে কেঁদে উঠলেন। অমরকুমারী নাই! আমার মাথায় যেন বিনা মেঘে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! বজ্রাহত হয়েই যেন বাড়ীর উঠানে আমি আছাড় খেয়ে পোড়লেম ;—ক্ষুদ্র বালকের মত কেঁদে ভাসিয়ে দিলেম! কর্ত্তা আর মণিভূষণ আমারে ধরাধরি কোরে তুলে বোসিয়ে, নানা প্রকারে সান্ত্বনা কোল্লেন। সান্ত্বনাবচনে কর্ত্তামহাশয় বোলতে লাগলেন, "এত ব্যাকুল হবার কোন কারণ নাই, কথাটা শুনেই অত অধীর হয়ে অমঙ্গল আশঙ্কা কোত্তে নাই ; অমরকুমারী বেঁচে আছেন, চোরে তাঁরে চুরি কোরে নিয়ে গিয়েছে! একটু ঠাণ্ডা হও, সকল কথা তোমাকে বিশেষ কোরে বোলছি। এককালে হতাশ হয়ে অমঙ্গল আশঙ্কা কোরো না।"

প্রথমে আমি যতটা অধীর হয়ে পোড়েছিলেম, কর্ত্তার কথা শুনে ততটা অধীরতা থাকলো না, চোরে চুরি করার তাৎপর্য্যটা কি, সেটাও তখনি বুঝতে পাল্লেম। মণিভূষণ আমার হাত ধোরে একটী ঘরে নিয়ে বসালেন, কর্ত্তাও সঙ্গে গেলেন, বাড়ীর মেয়েরাও সেইখানে এলেন। প্রথমে তাঁরা আমারে কিছু জল খেতে দিলেন। জল খাওয়ার কথা তখন আমার মনেই ছিল না, কিছুই ভাল লাগলো না, অস্থিরকণ্ঠে বোল্লেম, "এখন আমি কিছুই খাব না ; বৃত্তান্তটা কি, আগে শুনি, তার পর—"

আমারে আর কথা কোইতে না দিয়েই কর্ত্তামহাশয় বোলতে আরম্ভ কোল্লেন, "তোমার মনে থাকতে পারে, রাসের সময় তোমাকে আমি বোলেছিলেম, বীরভূমে যে লোকের বাড়ীতে অমরকুমারী ছিলেন, সেই চেহারার একটা লোক আমাদের গাঁয়ে এসেছিল, গ্রামের কেহ কেহ তাকে দেখেছিল, আমার কাছে

গল্প কোরেছিল, আমিও বুঝেছিলেম, সেই লোক,—সেই জটাধর তরফদার। সেই লোক একদিন—"

ঘৃণায়—ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে, কর্ত্তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে, তৎক্ষণাৎ আমি বোলে উঠলেম, "আমি সেই লোকের নাম রেখেছি রক্তদন্ত!—জটাধর তরফদার, সে নামটা হয় তো জালনাম! তাদৃশ নরাধমেরা কোথাও সত্য-নামে পরিচয় দেয় না। মুখের চেহারা দেখেই নাম রেখেছি রক্তদন্ত!"

যারা সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মুখের ভাব দেখে আমি বুঝলেম, আমার কথা শুনে তাঁদের সকলেরই যেন হাসি পেয়েছিল, কেহই কিন্তু হাসলেন না। কর্ত্তা বোলতে লাগলেন, "ঠিক নাম দিয়েছ বাবা! সে রকম লোকের ঐ রকম নামটাই ঠিক। সেই লোক একদিন আমাদের একটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অমরকুমারীকে দেখেছিল; যে দিন দেখে, সে দিন আমি জানতে পারি নাই, তার পর পাঁচ সাত দিন গোণে অমরকুমারীর মুখে শুনেছিলেম। তদবধি অমরকে আমি চক্ষে চক্ষে রাখতেম, একদিনও বাহির হোতে দিতেম না; তদবধি সে লোকের আর কোন খোঁজখবর ছিল না। সংক্রান্তির দুদিন পূর্ব্বে সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাড়ীতে দুজন অতিথি আসে; একজন ব্রাহ্মণ, একজন কায়স্থ। ব্রাহ্মণের নাম কুঞ্জবিহারী সান্ন্যাল, কায়স্থের নাম জনার্দ্দন মজুমদার; সেইখানে আহারাদি কোরে, সন্ধান জেনে বৈকালে আমাদের বাড়ীতে আসে। দুজনেরই লম্বা লম্বা চুল, লম্বা লম্বা গোঁফদাঁড়ি। তারা বলে, অমরকুমারী নামে একটী মেয়ে এই বাড়ীতে আছে, আমরা তার বিবাহের সম্বন্ধ কোত্তে এসেছি। যার নাম কুঞ্জবিহারী, সেই লোকটী ঘটক, যার নাম জনার্দ্দন, সেই লোকটী বরের কাকা। আমি তাদের—"

আমার মনের ভিতর যেন একটা ঝড় এলো; কত দিনের একটা পূর্ব্ব-কথা মনে পোড়ে গেল; কর্ত্তার কথার উপর কথা ফেলে আমি তখন বোলে উঠলেম, "রসুন মহাশয় রসুন, নাম-দুটো যেন আমার জানা জানা বোধ হচ্ছে। যদিও তাদের চেহারা আমি দেখি নাই, কিন্তু নাম শুনে বুঝতে পাচ্ছি, দুরাচার রক্তদন্তের সঙ্গে তাদের বিলক্ষণ যোগাযোগ! তারাই বুঝি অমর-কুমারীকে—"

না শুনেই শান্তিরাম কবিরাজ হস্তসঞ্চালন কোরে বোল্লেন, "না না, তারা অমরকুমারীকে হরণ করে নাই; বিবাহের সম্বন্ধ কোত্তে এসেছে, এই কথাই তারা বোলেছিল, পাত্রটী ভাল, বিষয়-আশয় আছে, বংশ বনিয়াদী, কন্যাপক্ষে কিছুই খরচপত্র লাগবে না, কন্যার গা-ঢাকা সমস্ত সোণার গহনা দেওয়া হবে, কন্যাটী চিরদিন রাজরাণীর মত সুখে থাকবে, এই সব কথাই তারা বোলেছে। আমি তাদের আড়ম্বরবাক্যের উত্তরে বোলেছিলেম, 'সম্প্রতি কন্যাটীর মাতৃবিয়োগ হয়েছে, কন্যা বলেন, পিতার সমাচার জানেন না, সে সমাচার না পাওয়া গেলে বিবাহের কোন কথাই স্থির হোতে পারে না, কন্যার জাতি পর্য্যন্ত এখন আমাদের অজ্ঞাত।' আমার এই সব কথা শুনে,—যার নাম জনার্দ্দন, সে লোকটী হাসতে হাসতে বোল্লে, 'সে কি মশাই, কি কথা কন? পিতার সমাচার নাই, সে কি কথা? কন্যার পিতার সঙ্গে আমাদের অতি নিকট-সম্বন্ধ, মাসখানেক

পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে, কন্যা এইখানে আছে, তাঁরই মুখে এই খবর আমরা পেয়েছি। তিনি এখন বড় কাজে ব্যস্ত, আমাদের সঙ্গে আসতে পাল্লেন না, আমাদেরই দুজনকে মেয়ে দেখতে পাঠালেন। বাপ জানেন না, জাতি জানেন না, কি কথা কন আপনি ? করণীয় ঘর, কন্যার পিতার বংশের সঙ্গে আমাদের তিনপুরুষের কুটুম্বিতা, কি কন আপনি ?'—কিছুতেই আমি বিশ্বাস কোল্লেম না, 'কন্যার পিতাকে হাজির কর, তা না হোলে কোন কথাই হবে না, এ বিবাহের কর্ত্তা আমি নই', কাটা কাটা এই সব কথা বোলেই আমি তাদের বিদায় কোরে দিই।"

ক্রমশই আমি উত্তেজিত হোতে লাগলেম। বৃদ্ধ শান্তিরাম শেষকালে যে সকল কথা বোলবেন, অগ্রেই তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলেম, তথাপি চঞ্চলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বিদায় কোরে দিলেন, তার পর কি হলো ?"

নিশ্বাস ফেলে কর্ত্তা বোলতে লাগলেন, "সে দিন তারা চোলে যায় ; অমরকুমারী ভয় পান। আমি তখন ততটা বুঝে উঠতে পারি নাই, সম্বন্ধটা হয় তো সত্য হোলেও হোতে পারে, অমরকুমারীর পিতাকে হয় তো তারা জানলেও জানতে পারে, এইরূপ তখন আমি ভেবেছিলেম। দুই তিন দিন গেল, তারা এলো না ; তার পর আর একজন লোক এসে পরিচয় দিলে, সে লোকটীও ব্রাহ্মণ, খুব রোগা, অস্থি-পঞ্জর সার, মাথাটী ন্যাড়া, মাথার মাঝখানে এক হাত লম্বা একটা টীকী, কপালে রক্তচন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা, কর্ণে, কণ্ঠে, বক্ষে শ্বেতচন্দনের ছাপকাটা, পরিধানে একখানা আধময়লা তসরের ধুতি, স্কন্ধে তসরের দোব্জা কোচানো ; নাম বোল্লে, নফরচন্দ্র ঘোষাল। সেই লোকের মুখেও অমরকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধের কথা। সেই লোক বরং আরো জোরে জোরে কথা কোইলো। সে বোল্লে 'অমরকুমারীর পিতা বহরমপুরের আদালতের একটা মোকদ্দমার তদ্বিরে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, আমি তাঁদের কুল-পুরোহিত, আমারে তিনি পাঠালেন, আমার সঙ্গে তাঁর কন্যাটীকে তুমি পাঠিয়ে দাও। ঘটক এসেছিল, তাকে তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছ, শুনে তিনি ভারী চোটেছেন ; আমি তাঁর প্রতিনিধি, বাড়ীর পুরোহিত, বংশের পুরোহিত, আমার সঙ্গে মেয়েটীকে তুমি পাঠিয়ে দাও : মেয়েটীকে তুমি বাপের বাড়ী থেকে চুরি কোরে এনেছ, ভালোয় ভালোয় আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও ; আজিই আমি নিয়ে যাবো ;—না যদি পাঠাও, তিনি তোমাদের নামে পুলিশকেস আনবেন।'—মণিভূষণ তখন বাড়ী ছিল না, আমি একবার উঠে গিয়ে অমরকুমারীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'পুরোহিত বোলে পরিচয় দিচ্ছে, ঐ লোকটীকে তুমি কি চিনতে পার ?' —অমরকুমারী বোল্লেন, জানালার ফাঁক দিয়ে আমি দেখেছি, ও রকম চেহারার লোক আর কখনো কোথাও আমার চক্ষে পড়ে নাই।'—অমরের কথা শুনে ফিরে এসে ঘোষালকে আমি বোল্লেম, 'তোমার সঙ্গে সে মেয়ে আমি কখনই পাঠাব না ; পুলিশকেস কোরে যে যা কোত্তে পারে, কোত্তে বলো গে।'—ঘোষালই হোক কিম্বা পুরোহিতই হোক, যেই হোক, ভাঙাগলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, অনেক রকম শাসিয়ে শাসিয়ে, সে লোক তখন বিদায় হয়ে গেল। দু-দিন পরে অমরকুমারী অদৃশ্য! আমার একটী মেয়ের সঙ্গে খিড়কীর ঘাটে অমরকুমারী স্নান কোত্তে

গিয়েছিলেন, কাঁচাবুদ্ধিতে আমার মেয়েটী ঘাটে তাঁরে একাকিনী রেখে একবার বাড়ীর ভিতর এসেছিল, তার পর ফিরে গিয়ে দেখে, অমরকুমারী সেখানে নাই। কোথায় গেল ? জলে ডুবে যাওয়া অসম্ভব ; সে পুকুরে পাঁচবছরের মেয়েরাও ডুবে যেতে পারে না, এত কম জল ; তবে অমরকুমারী কোথায় গেল ? বিস্তর অন্বেষণ করা হয়েছিল, কোথাও পাওয়া গেল না। সন্ধ্যাকালে গ্রামের একজন বালক এসে খবর দিলে, বেলা প্রায় দেড়প্রহরের সময় তিনজন লোক একখানা গাড়ী কোরে অমরকুমারীকে নিয়ে যাচ্ছে ; অমরকুমারীর মুখে কাপড়বাঁধা, কথা কোইতে পাচ্ছিল না, দুই চক্ষু দিয়ে জল পোড়ছিল, ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রয়েছিল, দুপাশে দুজন লোক তার দুই হাত ধোরে বোসেছিল ; বালক যদি সময়ে খবর দিতো, তা হোলে বোধ হয় সন্ধান হোতে পাত্তো, দিনের বেলায় গ্রামের ভিতর থেকে মেয়েচুরি, চোরেরা অল্পে অল্পে পার পেতো না। বালক আরো বোল্লে, সে যখন দেখে, তখন গাড়ীর একটা দরজা খোলা ছিল, তাকে দেখেই লোকেরা সে দরজাটা বন্ধ কোরে দিলে ; গাড়ীখানা ছুটেছে, প্রথমে অমরকুমারীকে সে ঠিক চিনতে পারে নাই, গাড়ীখানা অনেক দূর চোলে গেলে, চেহারা স্মরণ কোরে সে বুঝতে পারে, অমরকুমারী। দিনমানের মধ্যে খবর দেওয়া সে বালক আবশ্যক মনে করে নাই, অমরকুমারী হারিয়ে গিয়েছে, চারিদিকে খোঁজ পোড়েছে, সেই কথা শুনে সন্ধ্যাকালে খবর দিতে এসেছিল। তখন আর কি হয়,—কোথাকার গাড়ী কোথায় গেল, কে আর তার সন্ধান পায়, কাজেই আমরা কেবল হা-হুতাশ সার কোরে—”

হা-হুতাশ সার করা অপরের পক্ষে সংগত হোতে পারে, আমার পক্ষে কেবল তাই নয়, সব যেন আমি অন্ধকার দেখতে লাগলেম। কর্ত্তার কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই অস্থির হয়ে আমি বোল্লেম, “চোর ধরা দুঃসাধ্য হবে না। অমরকুমারী একদিন রক্তদন্তকে দেখেছিলেন, রক্তদন্তের সংগেও সে দিন একটা লোক ছিল ; তার পর তিনজন লোক এই বাড়ীতে আসে। সমস্তই রক্তদন্তের চক্র, সমস্তই আমি বুঝতে পাল্লেম, আর আমি এখানে বিলম্ব কোরবো না, আমি চোল্লেম ; যে বাড়ীতে আমি থাকি, সে বাড়ীর বাবুদের প্রতিপত্তি খুব, বিস্তর লোক বাধ্য, সত্য যদি রক্তদন্ত বহরমপুরে থাকে, শীঘ্রই ধরা পোড়বে ; পুলিশের সাহায্যে আদালতের ওয়ারীন বাহির কোরে অমরকুমারীকে আমি উদ্ধার কোরবোই কোরবো ;—এখন আমি চোল্লেম, ফলাফল শীঘ্রই আপনি জানতে পারবেন।”

দরোয়ানের সংগে অশ্বারোহণে আমি পথে বেরুলেম। তলোয়ার, বন্দুক, পিস্তল, এ সকল অস্ত্র সে দিন কোন কাজেই এলো না। পাপাত্মারা যে দিন সেই পবিত্রা কুমারীকে হরণ করে, সে দিন যদি আমি এ গ্রামে এই ভাবে সজ্জিত থাকতেম, পরিণাম চিন্তা না কোরে নিশ্চয়ই আমি দুই একটা মুণ্ডু এইখানে গড়াগড়ি যেতে দেখতেম ! সে সময় অতীত হয়ে গিয়েছে, সে দিন আমি ছিলেম না, এখন সে আক্ষেপ বৃথা। আমরা চোল্লেম। আমার প্রাণের ভিতর তখন যে প্রকার বিষাদ-বেগ প্রবাহিত, ভুক্তভোগী পাঠকমহাশয়েরা অনুভবেই সেটী

বুঝতে পারবেন, অক্ষরে লিখে ব্যক্ত করা যায় না। বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোলেম। ছোটবাবু অমরকুমারীকে দেখেছিলেন, অগ্রেই ছোটবাবুকে সেই দুঃখের কথা বোল্লেম, শেষকালে বড়বাবুও সেই বিষাদ-সমাচার শুনলেন। সেই দিনেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দ্বাদশজন মল্ল বড়বাবুর আদেশে বহরমপুরে চোলে গেল, আমিও তাদের সঙ্গে থাকলেম। কোথায় আছে রক্তদন্ত। প্রথমে আদালতে অন্বেষণ করা হলো, জটাধর তরফদার নামে কোন লোক সেখানে কোন মোকদ্দমা জোগাড় কোত্তে আসে কি না, জিজ্ঞাসা করা গেল, কেহই কিছু বোলতে পাল্লে না, তার পর উকীলদের বাসায় বাসায় অনুসন্ধান করা হলো, কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না ; বিদেশী লোকেরা যে সব জায়গায় বাসা কোরে থাকে, সে সব জায়গাতেও অন্বেষণ কোল্লেম, বিফল অন্বেষণ! রক্তদন্ত বহরমপুরে নাই। না থাকাই তো সম্ভব। এ রকম চক্রান্তকারীরা কদাচ সত্যকথা বলে না, এটা তাদের স্বভাবসিদ্ধ। চিত্তের আবেগে আমি অন্বেষণে গিয়েছিলেম, চিত্ত কিন্তু জেনেছিল, রক্তদন্তকে সেখানে পাওয়া যাবে না ; মুর্শিদাবাদজেলার মধ্যেই পাওয়া যাবে কি না, তাতেও সম্পূর্ণ সন্দেহ। বিফল অন্বেষণ! ইষ্টসিদ্ধ কোরে কোথায় তারা পালিয়ে গিয়েছে, ভগবান বোলে না দিলে, কে আর সে সন্ধান বোলে দিবে? আশায় হতাশ হয়ে আমরা ফিরে এলেম।

প্রবল হতাশের ভিতর আমার মনে আর একটা কূটতর্ক। ঘটক, বরের কাকা, পুরোহিত, সে তিনটে লোক কে?—কারা তারা?—কুঞ্জবিহারী সান্ন্যাল, জনার্দ্দন মজুমদার, নফরচন্দ্র ঘোষাল, কারা তারা? সেই সেই নামের কোন লোকের সঙ্গে কখনো কোথাও আমার দেখা হয়েছে, এমন তো মনে কোত্তে পাল্লেম না। কারা তারা?—নাম-তিনটে যেন পূর্ব্বে কোথাও আমি শুনেছি, শান্তিরামের মুখে শুনা নয়, অনেক পূর্ব্বে কোথায় যেন শুনেছি, এইরূপ মনে হোতে লাগলো, ঠিক স্মরণ কোত্তে পাল্লেম না। বাড়ীতে ফিরে এলেম। বিফল অন্বেষণের কথা ম্লানবদনে বাবুদের কাছে আমি বোল্লেম। সমবেদনা জানিয়ে তাঁরাও আমার দুঃখে দুঃখিত হোলেন।

রাত্রি এলো। রাত্রিকালেই চিন্তার পরাক্রম অধিক হয়। নামমাত্র ভোজনাবসানে আমি শয়ন কোল্লেম। কি নিমিত্ত শয়ন?—সুখীর সুখদায়িনী নিদ্রাদেবী দুঃখীর কাছে আসেন না, আমার কাছে আসবেন না, জানতেম, তথাপি শয়ন কোল্লেম। শয়নমাত্রেই চিন্তা আমাকে আক্রমণ কোল্লে।

ঘটক, পুরোহিত, বরের কাকা, এই তিনজন। নাম-তিনটী কোথায় আমি শুনেছি, অনেকক্ষণ মনে কোত্তে পাল্লেম না, কিন্তু শুনেছি কিম্বা কোথায় লেখা আছে, নিজের চক্ষে দেখেছি ; মানুষ দেখি নাই, নাম দেখেছি, এটী স্থির ; কিন্তু কোথায়?—অনেকক্ষণের পর স্মরণ হলো। কুঞ্জবিহারী সান্ন্যাল, নফরচন্দ্র ঘোষাল, জনার্দ্দন মজুমদার, এই তিন নাম। বর্দ্ধমানে সর্ব্বানন্দবাবুর খুনের পর যেদিন উইল পড়া হয়, সেই দিন ঐ তিনটী নাম সেই উইলের সাক্ষীর স্থলে স্বাক্ষরিত আমি দেখেছি। ঠিক তাই! উঃ! ভয়ানক চক্রান্ত! রক্তদন্তের সঙ্গে ঐ তিনজনের জানা-শুনা! সর্ব্বানন্দবাবুর বাড়ীতে ঐ তিনজনকে একদিনও আমি দেখি নাই। অকস্মাৎ মুর্শিদাবাদে দুইদিনে সেই তিন-

জন উপস্থিত। একদিন দুজন, একদিন একজন। অমরকুমারী যেদিন সন্ধ্যাকালে তেঁতুলতলায় রক্তদন্তকে দেখেন, রক্তদন্তের সঙ্গে সেদিনও একটা লোক ছিল। সে লোকটা কে? ঐ তিনজনের একজন কিম্বা আর কেহ সেটা আমি অনুমান কোত্তে পাল্লেম না।

যেখানে চক্রান্ত হয়, চক্রান্ত যেখানে অনেকদিন চলে, সেখানে দুই একটা লোক থাকে না, অনেক লোক থাকাই সম্ভব। ষড়যন্ত্রের মূল অধিনায়ক যে ব্যক্তি, সেই লোকের একটা দল থাকে; কোথাকার কত লোক সেই দলভুক্ত, সহজে নির্ণয় করা যায় না, কিছুই আমি নির্ণয় কোত্তে পাল্লেম না। যে লোকটার নাম ঘনশ্যাম বিশ্বাস, ওরফে ঘনশ্যাম সরস্বতী, সে লোকটার সঙ্গে রক্তদন্তের যোগ আছে. তা আমি জানতে পেরেছি; শেষের তিনজন সেই দলের লোক, সেটাও এখন বুঝতে পাল্লেম;—পেরেই বা করি কি? কোথায় তারা অমরকুমারীকে নিয়ে গিয়েছে, সে সন্ধান কেই বা বোলে দিবে?

ভাবনায় যন্ত্রণায় সমস্ত রজনী জাগরণ কোল্লেম। তার পর পাঁচদিন পাঁচরাত্রি কি অসুখেই যে আমি কাটালেম, ভগবান জানেন। ১১ই পৌষ। খৃষ্টান লোকগুলির বড় দিন;—প্রভু যীশুখৃষ্টের জন্মদিন। যে গ্রামে আমি আছি, সেই গ্রামে খৃষ্টানের উপাসনামন্দির ছিল না, খৃষ্টভক্ত ধার্ম্মিকলোকেরও অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং বড়দিনের উৎসব সেখানে আমি কিছুই দেখলেম না। কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে দস্তুরমত দেখা-সাক্ষাৎ হয়, কৃষ্ণকামিনী দিন দিন হাস্য-পরিহাসের নূতন নূতন অভিনয় দেখান, মনে আমার সুখ নাই. কুলকন্যার সে সকল রঙ্গভঙ্গ কিছুই আমার ভাল লাগে না।

বেলা প্রায় অবসান। বড়দিনের বেলা, কত বড় দিন. সকলেই জানেন; পৌষমাসের বেলা খুব ছোট, দুর্ভাবনায় আমি কাতর, সে ছোট বেলা আমার পক্ষে অনেক বড় বোধ হয়েছিল। বেলা প্রায় অবসান। বড়বাবু ছোটবাবু দুজনেই বাড়ী নাই, সেরেস্তায় লোকজন আছে. আমি কিন্তু সেদিন সেরেস্তায় বসি নাই; শেষবেলায় ব্রহ্মময়ীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছি। যে কোন রকমেই হোক, একটু অন্যমনস্ক থাকাই আমার চেষ্টা। পূর্ব্বে বলা হয় নাই, ব্রহ্মময়ীর বাড়ীর ফটকের ধারে দরোয়ানদের ঘর। দরোয়ান পালোয়ান সেই সকল ঘরেই বেশী; দেউড়ীর দরোয়ানেরাও মাঝে মাঝে সেইখানে গিয়ে সিদ্ধি খায়, গীত গায়. মাদোল বাজায়, মালকাট ঘুরায়, আমোদ করে। সেইখানে গিয়ে আমি তাদের খেলার কৌশল দেখছি, গানবাজনাও শুনছি, ঘরে প্রবেশ করি নাই, বাহিরেই দাঁড়িয়ে আছি. এক একবার রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছি, হঠাৎ দেখি মণিভূষণ সেইখানে উপস্থিত;—বোরাকুলীর শান্তিরাম দত্তের পুত্র মণিভূষণ।

আমারে দেখেই মণিভূষণ বোল্লেন, "বাড়ীতে আমি গিয়েছিলেম, শুনলেম, তুমি ঠাকুরবাড়ীতে এসেছ, শুনেই তাড়াতাড়ি এখানে আমি আসছি। শীঘ্র তুমি আমার সঙ্গে এসো। একটা সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

কিসের সন্ধান, কি বৃত্তান্ত, কিছুই বুঝতে না পেরে, চকিতনেত্রে মণিভূষণের মুখের দিকে আমি চেয়ে থাকলেম। মণিভূষণ বোল্লেন, "আমি কাশিম-

বাজারে গিয়েছিলেম, যেখানে নিমনাথের মন্দির, পরেশনাথের মন্দির, সেইখানে একটা লোককে আমি দেখতে পেয়েছি। সেই অস্থিসার, দীর্ঘস্বর, ন্যাড়ামাথা, টিকীওয়ালা,—যে লোকটা অমরকুমারীর বাপের পুরোহিত বোলে পরিচয় দিয়েছিল, অমরকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিল, সেই লোক। আমাকে দেখে সে হয় তো চিনতে পাল্লে না, একবারমাত্র চেয়েই আপন কাজে মন দিলে। কাজটা কি জানো?—হাঁস কিনছিল। একটা লোক গোটাকতক হাঁস বেচতে এসেছে,—হাঁস আর হাঁসী, দর কম, তাদের ভিতর যেগুলো খুব মোটা মোটা, খুব বড় বড়, টিকীওয়ালা ভট্টাচার্য্য সেই রকম বেছে বেছে দরদস্তুর কোচ্ছিল। হাঁসেদের পা বাঁধা, পালক বাঁধা লম্বা একটা বাঁশের লাঠীতে ঝুলোনো। আমার কেমন আশ্চর্য্য মনে হলো। জৈন-মন্দিরের কাছে নিরীহ পক্ষিজাতির প্রতি সেইরূপ নিষ্ঠুরতা; ক্রয়-বিক্রয়ের অবসানে সেই সকল পক্ষীর প্রাণান্ত হবে, জৈন-ধর্ম্মের পাণ্ডারা কিছুই বোলছে না, তাই ভেবেই আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান; তেমন একজন তিলকধারী, টিকীধারী ভট্টাচার্য্য হাঁস মেরে খাবে, তাই ভেবেই আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান!"

মণিভূষণের গৌরচন্দ্রিকার আড়ম্বরে তাচ্ছীল্যভাবে আমি বোল্লেম, "পরেশনাথদেবের মহিমা হয় তো কোমে গিয়েছে, সেই জন্যই মন্দিরের কাছে হাঁস-ব্যাপারীর নিষ্ঠুরতা, হাঁসখোর লোকের হর্ষবর্দ্ধন। ও কথা ছেড়ে দাও, সন্ধানের কথাটা কি বোলছিলে?"

হাতে একগাছা ছড়ি ছিল, সেই ছড়িগাছটা জোরে জোরে মাটীতে ঠুকে ঠুকে মণিভূষণ বোল্লেন, "ঐ তো সন্ধান। সেই লোকটা—সেই নফর ঘোষালটা যখন কাশিমবাজারে আছে, তখন হয় তো সেই ঘটক আর সেই বরের কাকাও সেখানে থাকতে পারে, তারাই অমরকুমারীকে চুরি কোরেছে, অমরকুমারীও সেইখানে আছেন, আমার যেন এই রকম মনে হোচ্ছে।"

অনিশ্চিত সন্ধান। তথাপি মনে কোল্লেম, তত্ত্ব লওয়ায় দোষ কি? আবার মনে হলো, তারা যদি থাকে, তবে হয় তো রক্তদন্তও সেখানে আছে। থাকে থাকুক অমরকুমারীর জন্য প্রাণ দিতেও আমার ভয় হয় না। কতক সংশয়ে কতক উল্লাসে চঞ্চলস্বরে আমি বোলে উঠলেম, "আমারে তুমি কাশিমবাজারে নিয়ে চলো! ভাল কোরে সেই সন্ধানটা একবার জানতে হয়েছে। অমরকুমারীকে যদি উদ্ধার কোত্তে পারি, তবেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তুমি আমারে নিয়ে চলো!"

মণিভূষণের সঙ্গে বাবুদের বাড়ীতে আমি উপস্থিত হোলেম। সময় ঠিক গোধূলি। ছোটবাবু তখন ফিরে এসেছেন। তাঁরে আমি ঐ কথা বোল্লেম; তখনি আমি কাশিমবাজারে যাব, বিশেষ আগ্রহে সেই ইচ্ছা জানালেম। তিনি বোল্লেন, "রাত্রে কোথায় যাবে? রাত্রে গিয়েই বা কি ফল হবে? কল্য প্রাতঃকালে বরং যেয়ো।"

আরো অধিক আগ্রহ জানিয়ে আমি বোল্লেম, "আজ্ঞে না, দেরী করা হবে না; দুষ্টলোকেরা কখন কোথায় থাকে, ঠিক পাওয়া যায় না, রাত্রেই আমি যাব।"

আমার ব্যগ্রতা দেখে ছোটবাবু তখন বোল্লেন, "আচ্ছা, একান্তই যদি যেতে চাও, আমি একখানা চিঠি দিচ্ছি, বহরমপুরের এক উকীলের বাসায় রাত্রি-যাপন কোরে প্রাতঃকালেই কাশিমবাজারে যেয়ো, তা হোলেই সুবিধা হোতে পারবে।"

উকীলের নামে ছোটবাবু একখানা চিঠি লিখে দিলেন, সঙ্গে দুজন দরোয়ান দিলেন, তৎক্ষণাৎ নৌকা স্থির হলো, মণিভূষণের সঙ্গে সন্ধ্যার পরেই আমি যাত্রা কোল্লেম। সঙ্গে দুজন অস্ত্রধারী দরোয়ান ; আমার সঙ্গেও এক-জোড়া পিস্তল। নৌকারোহণের পূর্ব্বে আমার মনে একটা বিতর্ক। অমর-কুমারীকে ধোরেছে, এইবার আমার পালা, আমারে দেখতে পেলেই রক্তদন্ত আমারে ধোরে ফেলবে। সত্যি যদি রক্তদন্ত কাশিমবাজারে থাকে, নিশ্চয়ই আমি ধরা পোড়বো। মনে মনে এইরূপ সাতঙ্ক সন্দেহ কোরে একটা বুদ্ধি স্থির কোল্লেম। ছোটবাবু মধ্যে মধ্যে সখের খাতিরে কৌতুকের জন্য রকম রকম বেশ পরিবর্ত্তন করেন। অনেক রকম মুখোস আছে, পরচুল আছে, পোষাক আছে ; আমিও ছদ্মবেশ-ধারণের সঙ্কল্প কোল্লেম ; মুখোস চাইলেম না, একপ্রস্থ পর-চুল গোঁফ-দাড়ী চেয়ে নিলেম। ছোটবাবু হাস্য কোল্লেন।

সন্ধ্যার পরেই নৌকায় আরোহণ কোরেছিলেম, অতি অল্প দূর এসেই পাড়ী ; এপার ওপার। সময় অধিক লাগলো না, রাত্রি চারিদণ্ডের পরেই বহরমপুরের স্নানের ঘাটে আমাদের নৌকা লাগলো।

যে উকীলের নামে পশুপতিবাবুর চিঠি, সেই উকীলের বাসার ঠিকানা মণি-ভূষণের জানা ছিল, অল্পক্ষণেই সেই ঠিকানায় গিয়ে আমরা পেঁছিলেম। পশু-পতিবাবুর চিঠি পেয়ে উকীলটী আমাদের সবিশেষ আদর-যত্ন কোল্লেন। উকী-লের নাম রজনীকান্ত রুদ্র ; তাঁর সদ্ব্যবহার-দর্শনে আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হোলেম। স্বচ্ছন্দে সেই বাসাতেই রাত্রিযাপন করা হলো। শয়নের অগ্রে রজনী-বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কাশিমবাজারে যাবার উদ্দেশ্য কি ? সংক্ষেপে তাঁর প্রশ্নের আমি উত্তর দিলেম। গম্ভীরবদনে তিনি বোল্লেন, "অমন কর্ম্ম কোরো না। যদি সন্ধান পাও, চুপি চুপি ফিরে এসে আমাকে জানিও। আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করবার বন্দোবস্ত আমি কোরে দিব। তা না হোলে, তুমি যেমন বোলছো, খামোকা একটা লোককে ধোরে বেঁধে নিয়ে যাওয়া বে-আইনী কাজ ; লোকের পশ্চাতে যদি কোন জবরদস্ত লোক থাকে, তুমি বালক, বিপদগ্রস্ত হবে। তেমন কর্ম্ম কোত্তে নাই। এখনকার আইন-কানুন বড় শক্ত ; কথাটাও বড় শক্ত ; সাক্ষী নাই, সাবুদ নাই, দলীল নাই, কেবল একটা মুখের কথা ; লোক যদি শান্তিরামের বাড়ীতে যাওয়া অস্বীকার করে, মেয়ে-চুরির কথা অস্বীকার করে, তবেই মোকদ্দমা বাধবে। মেয়েচুরি,—গুরুতর অভিযোগ, সে অভিযোগ প্রমাণ কোত্তে না পাল্লে বড়ই গোলযোগ। অমন কর্ম্ম কোরো না, সন্ধান পেলে আমাকে এসে খবর দিও, যে ক্ষেত্রে যেমন কোত্তে হয়, আমিই তার ব্যবস্থা কোরবো।"

আমি সম্মত হোলেম। রজনীপ্রভাতে আমার ছদ্মবেশধারণ। শীতকাল, জামাজোড়া পরিধান কোল্লেম, পরচুলে গোঁফ-দাড়ী সাজালেম, মাথায় একটী

বড়রকম টুপী দিলেম, দুদিকের দুই পকেটে দুটী পিস্তল থাকলো। এই রূপ আমার ছদ্মবেশ। উকীলবাবুর ঘরের দেয়ালে বড় একখানা দর্পণ ছিল, সেই দর্পণে আমি মুখ দেখলেম। হাসি পেলো। আপনার মুখ আপনি দেখে আপনাকে আমি চিনতে পাল্লেম না। রক্তদন্ত যদি সেখানে থাকে, আমি সেই হরিদাস, কিছুতেই চিনে উঠতে পারবে না।

সে পক্ষে নিশ্চিন্ত হোলেম। বাজারে একখানা গাড়ী ভাড়া কোরে আমরা চারিজনে কাশিমবাজারে যাত্রা কোল্লেম। এখন যাওয়া যায় কোথায়? নিম-নাথের মন্দিরের কাছে মণিভূষণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখেছিলেন, ব্রাহ্মণ যে সেই-খানে থাকে, সেইখানে গেলেই যে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে, এমন কিছু ঠিক করা যায় না, তথাপি সেই মন্দিরের কাছে অগ্রেই যাওয়া গেল। মন্দির দর্শন করা তখনকার কার্য্য নয়, ঘোষালের অন্বেষণ করাই প্রধান কার্য্য। কিরূপে অন্বেষণ করা যায়? মণিভূষণ যেখানে তারে দেখেছিলেন, গাড়ী থেকে নেমে সেইখানে আমরা গেলেম। কাছেই একখানা দোকান ছিল, দোকানীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, চেহারাটাও বোল্লেম। দোকানী উত্তর কোল্লে, "এসেছিল বটে, হাঁস কিনতে এসেছিল, একজোড়া হাঁস কিনে নিয়ে দক্ষিণদিকে চোলে গেল ; কোথায় গেল, কোথায় থাকে, তা আমি জানি না। পাঁচ সাতদিনের মধ্যে দুদিন তাকে আমি দেখেছি, বোধ হয়, নিকটেই কোথাও বাসা কোরে আছে।"

নিশ্চিত ঠিকানা পাওয়া গেল না, অনুমানের উপর নির্ভর কোরে দক্ষিণ-দিকে খানিক দূর আমরা চোলে গেলেম। ছোট একটা পল্লীতে এলেম। খান-কতক ঘর, খানকতক বাড়ী। ঘরগুলি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল না, বাড়ীগুলি ঘেরা। লোকজন যাওয়া-আসা কোচ্ছিল দুই একজন মেয়েমানুষও দেখলেম, বোধ হলো গৃহস্থ-পল্লী। একটি লোককে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, এই রকম চেহারার এক ব্রাহ্মণ এই পাড়ায় থাকে কি না? লোক উত্তর কোল্লে, "এ পাড়ায় যারা থাকে, সকলকেই আমি চিনি, বাসাড়ে লোক এ পাড়ায় থাকে না, তবে যে রকম চেহারা তুমি বোলচো, সেই রকম চেহারার একটা লোক মাঝে মাঝে এই পথে যাওয়া-আসা করে, সম্প্রতি এসেছে, পূর্ব্বে দেখি নাই, পাড়ার দিকে চাইতে চাইতে বনের দিকে চোলে যায়। সন্ন্যাসীরাই বনে থাকে, বোধ হয়, সন্ন্যাসী হবে, বনের ভিতর হয় তো তপস্যা করে।"

মনে মনে হেসে আমি ভাবলেম, তপস্যাই করে বটে! তপস্বীরা হাঁস খায়, মেয়েচুরির মন্ত্রণা করে, মেয়েচোরের পুরোহিত সাজে, এ তামাসা মন্দ নয়! তপস্বীকে ধোত্তে হবে ;—বনের ভিতরই ধোরবো ; বনের ভিতরেই থাকে ; তেমন স্বভাবের লোক লোকালয়ে থাকতে পারে না : বনেই লুকিয়ে আছে, এই কথাই ঠিক। লোকটীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না কোরে বনের দিকেই আমরা চোল্লেম। অদূরে একটী শিবের মন্দির দেখা গেল ; মন্দিরের পরেই বন। মণিভূষণকে সেই মন্দিরের কাছে রেখে দরোয়ান-দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বনপথে আমি তপস্বীর অন্বেষণে অগ্রসর হোলেম। দরোয়ানদের অস্ত্রশস্ত্র আর মাথার পাগড়ী-দুটি মণিভূষণের কাছেই থাকলো।

মণিভূষণকে সঙ্গে রাখলেম না, কারণ এই যে, সে লোক যে দিন পুরোহিত

সেজে যায়, সে দিন মণিভূষণকে দেখেছিল, মণিভূষণও তাকে দেখেছিলেন, হাঁস কেনার সময়েও হয় তো মণিভূষণ তার চক্ষে পোড়ে থাকবেন ; এখন সে যদি বনের ভিতর মণিভূষণকে দেখে, ধূর্ত্তলোক কি না, পাপীলোকের মনে সর্ব্বদাই ভয়, মণিভূষণকে যদি দেখে, তা হোলে সে নিশ্চয়ই গা-ঢাকা হয়ে পোড়বে, না হয় তো পালিয়ে যাবে, আমার কার্য্য-সিদ্ধ হবে না ; তাই ভেবেই মণিভূষণকে মন্দিরের কাছে রাখা।

বনমধ্যে আমি প্রবেশ কোল্লেম। আমার দেহরক্ষক সেই দুজন নিরস্ত্র দরোয়ান উজ্জ্বল দিনমান। বনে বনচর হিংস্র জন্তু একটাও দেখা গেল না। আমি নির্ভয়। বন পৌরাণিক তপোবনের ন্যায় পরিষ্কার নয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুনি-ঋষির আশ্রমের ন্যায় ছোট ছোট খানকতক কুটীর দেখতে পেলেম। সত্য হয় তো সেই সকল কুটীরে সন্ন্যাসী তপস্বী বাস করে, প্রথমে সেই ভাবটা আমার মনে উদয় হয়েছিল, একে একে আট দশখানি কুটীরের সমীপবর্ত্তী হয়ে দর্শন কোল্লেম, জনমানবের সঞ্চার নাই ;—কুটীর মধ্যে আছে কেবল শুষ্ক শুষ্ক বৃক্ষপত্র, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড, এক একখানা খেজুরপাতার চেটাই এক একটা গুড়ের নাগরীর মত ছোট ছোট জলের কলসী ; দুই একখানা কুটীরে কেবল অঙ্গার আর ভস্মরাশি ;—ভস্মের সঙ্গে এক একটা গেঁটে কোলকে আর তামাকপোড়া গুল। এই সকল আসবাব দেখে কিছুই আমি স্থির কোত্তে পাল্লেম না ; কারা সেই সকল কুটীরে থাকে, কখন থাকে, সেটাও আমার অনুমানে এলো না। যে দুজন দরোয়ান আমার সঙ্গে ছিল, তাদের মধ্যে একজন (নাম তার ভল্লু সিং) অনেকদিন মুর্শিদাবাদে আছে, মুর্শিদাবাদের অনেক বৃত্তান্ত সে জানতো। আমার তখনকার মুখের ভাব দেখে বিস্ময়ের কারণ অনুমান কোরে, ভল্লু সিং বোল্লে, "এই সকল ঘরে রেতের বেলা শীকারী লোকেরা লুকিয়ে থাকে, বনজন্তু শীকার করে ; দিনের বেলাও গরিবলোকেরা কাঠ কাটে, পাতা কুড়ায়, বনফল সংগ্রহ করে, তারাও মাঝে মাঝে ঐ সকল ঘরে আশ্রয় নিয়ে তামাক খেয়ে, গাঁজা খেয়ে, ক্লান্তি দূর করে।"

তখন আমার বিস্ময়ের কারণটা দূর হয়ে গেল। বনটা অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অনেক দূর অন্বেষণ কোল্লেম, যার অন্বেষণ, তার কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না !

বেলা প্রায় দেড় প্রহর অতীত। অন্তরে হতাশ, এ দিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্রেক। হতাশে ফিরে আসি আসি মনে কোচ্ছি, এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড। ঘন ঘন বৃক্ষে ঘন ঘন কণ্টকীলতা, এক একটা স্থান অল্প অল্প অন্ধকার ; নিবিড় বৃক্ষপত্র ভেদ কোরে সূর্য্যকিরণ সে সব জায়গায় সতেজে প্রবেশ কোত্তে পারে না, সেই জন্যই অন্ধকার। ফিরে আসি আসি মনে কোচ্ছি, হঠাৎ দেখি, সেই রকম অন্ধকার স্থানে একটা মুণ্ডু ! ঠিক যেন মাটী ফুঁড়ে সেই মুণ্ডুটা উপরদিকে উঠছে ! গলা পর্য্যন্ত উঠেছে ! ঝাউপাতার মত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অনেক চুল, মুখের বর্ণটা জোঁদা-কালো ; বোধ হলো যেন আলকাতরামাখা। মুণ্ডুটা আমাদের দিকে ঘুরে একবার চাইলো ; চক্ষু দুটো গোল গোল, ছোট ছোট; ভ্রূ নাই ;—চেয়েই অমনি তৎক্ষণাৎ মাটীর ভিতর ডুবে গেল !

মুণ্ডু অদৃশ্য! মাটী ফুঁড়ে উঠেছিল, মাটীর ভিতর লুকিয়ে গেল! এই বনে সুড়ঙ্গ আছে। বদমাসলোকেরা প্রচ্ছন্নভাবে ভূগর্ভে বাস করে। নিশ্চয় ডাকাত। কেবল ডাকাত কেন, যাবতীয় কুক্রিয়ার নায়ক-নায়িকারা এই প্রকার গহ্বরে লুকিয়ে থাকবার সুবিধা পেলে আর কোথাও থাকতে চায় না। যে লোকটার সন্ধানে আমরা বেরিয়েছি, এই গহ্বরমধ্যেই হয় তো সেই লোককে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ গহ্বরে কত লোক আছে, জানা যাচ্ছে না। সংখ্যায় যদি বেশী হয়, তা হোলে এখন ঘাঁটা দেওয়া একটা নূতন বিপদের হেতু হয়ে দাঁড়াবে। পূর্ব্বাপর বিবেচনা কোরেই কাজ করা কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যস্থির কোরে পায়ে পায়ে আমরা অগ্রসর হোলেম। যেখানে সেই মুণ্ডটা উঠেছিল, সাবধানে সেইখানে গিয়ে দেখলেম, কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না, কোথায় সুড়ঙ্গের দ্বার, বাহ্যদর্শনে স্থির করা দুরূহ। বনের অপরাপর স্থান যেমন সমতল, সে স্থলটাও সেইরূপ। ভিতরদিক থেকে কোন কৌশলে দ্বারপথ মুক্ত করা হয়, তার পর আবার সমভাবে ঢাকা দেওয়া হয়, এইরূপ আমি অবধারণ কোল্লেম। নিকটে অনেকগুলি বৃক্ষ। স্থাননিরূপণের সুবিধার জন্য একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে নিয়ে একটা বৃক্ষগাত্রে আমি দাগ দিয়ে রাখলেম ; সেই নিদর্শনে অক্লেশে সুড়ঙ্গস্থান নির্ণীত হোতে পারবে, সেই জন্যই দাগ দেওয়া। আরব্য উপন্যাসের সঙ্কেত।

বনে আর প্রতীক্ষা কোল্লেম না, শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে এলেম : পূর্ব্বকথিত মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হয়ে মণিভূষণকে সঙ্গে নিলেম। দরোয়ানেরা সেই-খানে পূর্ব্ববৎ সজ্জিত হলো। পল্লী পার হয়ে নিমনাথের মন্দির। এইবার সেই মন্দিরটী ভাল কোরে দর্শন কোল্লেম। স্থপতিকার্য্য অতি সুন্দর। মন্দির-মধ্যে জৈন-সম্প্রদায়ের চতুর্বিংশতি দেব-মূর্ত্তি ; প্রধান মূর্ত্তি নিমনাথ। নিমনাথ-বিগ্রহ প্রস্তর-নির্ম্মিত, পরেশনাথ অষ্টধাতুনির্ম্মিত। মূর্ত্তিগুলি দর্শন কোরে দেবালয় থেকে আমরা বেরুলেম। সেখানকার লোকের মুখে শুন-লেম, নিমনাথের মন্দিরের নীচেও এক সুড়ঙ্গ আছে। মুর্শিদাবাদ বহু প্রাচীন : বিশেষতঃ কাশিমবাজারে পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিস্তর অট্টালিকা ছিল, বড় বড় কুঠী ছিল, রেশমের কুঠী সর্ব্বপ্রধান। ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিণ, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্ত্তুগীজ, আরমানী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক জাতি এই কাশিম-বাজারে বিবিধ বাণিজ্যকার্য্যোপলক্ষে বাস কোত্তেন ; কে কোথায় কি অভিপ্রায়ে কত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত কোরেছিলেন, স্থির করা যায় না। বনমধ্যে যে সুড়ঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেল, সেইটীই আমাদের লক্ষ্য ; অন্য সুড়ঙ্গের তত্ত্বান্বেষণ করা আমাদের তখনকার কার্য্য নয়।

বহরমপুরে ফিরে এসে আমরা স্নানাহার কোল্লেম। রবিবার ছিল, উকীল-বাবু আদালতে যান নাই, অনুসন্ধানের ফলাফল তাঁকে জানালেম। সেদিন সেখানে থাকতে হবে, সোমবার আদালতে দরখাস্ত কোরে পুলিশের নামে পরোয়ানা বাহির কোত্তে হবে, রজনীবাবু এই কথা আমারে বোল্লেন।

রবিবার বহরমপুরেই আমাদের অবস্থান করা হলো। রাত্রিকালে কাশিম-বাজারের পূর্ব্বসম্বন্ধীয় অনেক কথা রজনীবাবুর মুখে আমি শুনলেম। কাশিমবাজারের রাজবাড়ী ইতিপূর্ব্বে আমি দর্শন কোরেছি, সেই রাজবংশ

কতদিনের, এই কথাটী আমি রজনীবাবুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম। রজনীবাবু বোল্লেন, "বংশ খুব বনিয়াদী নয়, কিন্তু একটী লোকের সৌভাগ্যের চমৎকার ইতিহাস আছে।" রজনীবাবুর মুখে সেই ইতিহাস আমি শুনি। মর্ম্ম এই-রূপ যে, কাশিমবাজার যখন খুব গুলজার, কাশিমবাজার যখন বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান বোলে গণ্য ছিল, সেই সময় তিলিজাতীয় কালী নন্দী নামে একটী কারবারী লোক বর্দ্ধমানজেলা থেকে কাশিমবাজারে কারবার কোত্তে আসেন। রেশমের কারবার আর সুপারির কারবার তাঁর অবলম্বন হয়। কারবার খুব ফ্যালাও ছিল না, সামান্যরকম দোকানেই কাজকর্ম্ম চোলতো। কালী নন্দীর পুত্র সীতারাম নন্দী ক্রমে ক্রমে কাজকর্ম্ম বৃদ্ধি করেন ; সীতা-রামের পুত্র রাধাকৃষ্ণ ; রাধাকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণকান্ত। এই কৃষ্ণকান্ত নন্দী পৈতৃক কারবারেই লিপ্ত ছিলেন। নবাবের হুকুমে জনকতক ইংরেজ যখন বন্দী হয়ে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হয়, সেই বন্দীদের ভিতর একটী সাহেব ছিলেন, তাঁর নাম হেষ্টিং। কোন প্রকারে পলায়ন কোরে সেই হেষ্টিং ঐ কৃষ্ণকান্ত নন্দীর দোকানে আশ্রয় লন। নবাবের প্রতাপে আপন জীবনকে সঙ্কটাপন্ন জেনেও কৃষ্ণকান্ত সেই সাহেবটীকে আশ্রয় দিয়ে, পান্তাভাত খাইয়ে, গুপ্তভাবে নিরা-পদে কলিকাতায় পাঠান। হেষ্টিং সাহেব কৃষ্ণকান্তের সেই উপকার স্মরণ কোরে রেখেছিলেন তিনি যখন সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার গবর্ণর জেনারেল হন, মহা-মান্য ওয়ারেন হেষ্টিং যখন তাঁর পদবী হয়, সেই সময় তিনি কৃষ্ণকান্তকে স্মরণ করেন ; ওয়ারেন হেষ্টিঙের কৃপায় কৃষ্ণকান্ত নন্দী ভাগ্যবন্ত হয়ে উঠেন ; সাহেবের মুখে তখন তাঁর নাম হয় কান্তবাবু। গবর্ণরী-পদ পাইবার পূর্ব্বেও হেষ্টিংসাহেব কান্তবাবুর উপকার কোরেছিলেন। হেষ্টিং যখন মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট, তৎকালে প্রথা অনুসারে তখন তিনি নিজের একটা স্বতন্ত্র কারবারী কুঠী খোলেন ; কান্তবাবুকে তিনি সেই কারবারে মুচ্ছুদ্দী নিযুক্ত করেন। তার পর হেষ্টিং সাহেব দেশে যান। দেশে গিয়ে তিনি এ দেশের উপার্জ্জিত টাকাগুলি নানাকার্য্যে খরচ কোরে নিঃসম্বল হন ; সেই অবস্থায় পতিত হয়ে কান্তবাবুর কাছে ১৯ হাজার টাকা ধার চেয়ে পাঠান। কান্তবাবু তাদৃশ ধনী ছিলেন না, সুতরাং সাহেবের সে প্রার্থনা পূর্ণ কোত্তে তিনি সমর্থ হন নাই ; তথাপি তাঁর প্রতি হেষ্টিং সাহেবের সমান অনুগ্রহ ছিল। আবার তিনি এ দেশে এসে কান্তবাবুকে আপন কারবারে মুচ্ছুদ্দীপদে বরণ করেন। সে সময় কোম্পানীর পদস্থ কর্ম্মচারীরা আপনাদের নিজ নামে কোন ব্যবসা চালাতে পারবেন না, এইরূপ শক্ত নিয়ম হয়েছিল ; বেনামীতে মুচ্ছুদ্দীর নামেই কারবার চোলতো, জমীদারী ইজারা লওয়া হোতো, নিমক-পোক্তানের কর্ত্তৃত্বও আয়ত্ত থাকতো। হেষ্টিং সাহেবের মুচ্ছুদ্দী কান্তবাবু ; তিনিও ঐরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন ; সেই সময় তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন, অনেক ভূমি-সম্পত্তিও তাঁর অধিকৃত হয়।

মুচ্ছুদ্দীদের উপাধি ছিল দেওয়ান। ওয়ারেন হেষ্টিং তাঁর দেওয়ান কান্ত-বাবুকে কতকগুলি ভাল ভাল জমীদারী ইজারা লওয়ান। কান্তবাবু সেই সময় কলিকাতায় এসে বাস করেন। বড়বাজারে আর জোড়াসাঁকোতে তাঁর বাড়ী হয়।

কান্তবাবুর উপকারকল্পে ওয়ারেন হেষ্টিং বঙ্গের কতকগুলি নিরীহ জমীদারের উপর বিষম দৌরাত্ম্য কোরেছিলেন ; একজনের জমীদারী কেড়ে নিয়ে আর একজনকে দান করা, এটা যেমন সৎকার্য্য, প্রত্যুপকারে সেরূপ কৃতজ্ঞতা দেখানো তদনুরূপ সৎকার্য্য।

রজনীবাবুর মুখে আমি শুনলেম, কান্তবাবুর উপকারার্থ হেষ্টিংসাহেব সেইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত হয়েছিলেন। যতগুলি জমীদারী তিনি কান্তবাবুকে দেন, তন্মধ্যে রংপুরজেলার বাহারবন্দ পরগণাটী সর্ব্বপ্রধান। বাহারবন্দ পরগণা পূর্ব্বে রাণী সত্যবতীর সম্পত্তি ছিল, তিনি যখন কাশীবাসিনী হন, সেই সময় ঐ জমীদারীটী আপন ভগ্নী কুমারী বঙ্গগৌরবিণী রাণীভবানীকে দান কোরে যান। গবর্ণরী ক্ষমতায় ওয়ারেন হেষ্টিং সেই বিশাল জমীদারীটী বলপূর্ব্বক রাণীভবানীর অধিকার থেকে আকর্ষণ কোরে কান্তবাবুর নাবালক পুত্র লোকনাথ নন্দীকে প্রদান করেন। লোকনাথের বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হয় না। হেষ্টিং সাহেবের হেতুবাদ ছিল, রাণীভবানী স্ত্রীলোক, তিনি অত বড় জমীদারী শাসন কোত্তে অক্ষম, অতএব যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করা গেল। পাঠকমহাশয় বুঝলেন, যোগ্যপাত্র একটী নাবালক!

ওয়ারেন হেষ্টিং প্রত্যুপকার কোল্লেন, মহত্ত্ব প্রকাশ পেলে, কিন্তু সত্যধর্ম্মানুসারে প্রত্যুপকার কোত্তে পাল্লে সে মহত্ত্ব শতগুণে উজ্জ্বল হোতো। যা-ই হোক, কান্তবাবুর ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সাহেবের অনুগ্রহে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। বাহারবন্দ পরগণা রাণীভবানীর হস্তচ্যুত হওয়াতে সেখানকার প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, বহুকষ্টে সে বিদ্রোহ উপশমিত হয়।

কান্তবাবুর পুত্রের নাম লোকনাথ। অতি অল্পবয়সে লোকনাথের মৃত্যু হয়। কান্তবাবু রাজা উপাধি পান নাই, লোকনাথ রাজা হয়েছিলেন। কান্তবাবুর মৃত্যুর পর রাজা লোকনাথ অল্পদিন জীবিত ছিলেন। লোকনাথের পত্নীর নাম সুসারমোহিনী। দ্বাদশমাসবয়স্ক একটী শিশু-পুত্র নিয়ে সুসারমোহিনী বিধবা হন। পুত্রের নাম হরিনাথ বাহাদুর। হরিনাথের পুত্র কৃষ্ণনাথ। হরিনাথও রাজা, কৃষ্ণনাথও রাজা। হরিনাথের পত্নী হরসুন্দরী, কন্যা গোবিন্দসুন্দরী। রাজা হরিনাথের মৃত্যুর পর রাজ-সম্পত্তি ওয়ার্ডকোরে যায়, কুমার কৃষ্ণনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়ে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা হরিনাথের ন্যায় রাজা কৃষ্ণনাথেরও অনেক সদ্‌গুণ ছিল। একটী মোকদ্দমায় আদালতে হাজির হবার অপমানের ভয়ে রাজা কৃষ্ণনাথ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আত্মহত্যা করেন। কৃষ্ণনাথের মহিষী পুণ্যবতী রাণী স্বর্ণময়ী কাশিমবাজার-রাজ্যের অধীশ্বরী হন। নফর ঘোষালের অনুসন্ধানে যখন আমি কাশিমবাজারে যাই, তখন কাশিমবাজারের রাজলক্ষ্মী সেই যশস্বিনী রাণী স্বর্ণময়ী।

রাত্রের গল্প এই পর্য্যন্ত। রাত্রিপ্রভাতে নিয়মিত কার্য্য সমাপন কোরে যথাসময়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে রজনীবাবু আদালতে গেলেন। প্রথম কার্য্য আমাদের দরখাস্ত। দরখাস্তে আমি দস্তখৎ কোল্লেম না, দস্তখৎ কোল্লেন

মণিভূষণ দত্ত। সেইটীই পরামর্শসিদ্ধ। কেন না, তাঁদের বাড়ীতেই অমরকুমারী ছিলেন, তাঁদের বাড়ী থেকেই চুরি হয়েছে, মণিভূষণের দরখাস্ত করাই ঠিক। দরখাস্তের বয়ানে স্থলে স্থলে বিবরণগুলি লেখা থাকলো, কাশিমবাজারের কাননমধ্যে সুড়ঙ্গ, সম্ভবতঃ সে সুড়ঙ্গে মেয়ে-চোরেরা থাকতে পারে, এই হেতুবাদে পুলিশের দ্বারা তদন্তের প্রার্থনা থাকলো, রজনীবাবু আমাদের পক্ষে পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল থাকলেন।

দরখাস্ত পেশ হবার পর মাজিষ্ট্রেটসাহেব আমাদের প্রার্থনামত পুলিশ-তদন্তের হুকুম দিলেন। কালবিলম্ব না কোরে কথিত বনমধ্যে আমরা উপস্থিত হোলেম ; সঙ্গে থাকলো পুলিশের দ্বাদশজন চাপরাসী ; থানার নায়েব-দারোগা থাকলেন সর্দ্দার।

একমুখো সুড়ঙ্গ থাকা সম্ভব ; কিন্তু যে সকল সুড়ঙ্গে বদমাসলোক বাস করে কিম্বা সময়ে সময়ে প্রচ্ছন্নভাবে ওৎ কোরে থাকে, সে সকল সুড়ঙ্গের একটা মুখ থাকে না ; দুই মুখ, তিন মুখ, কোন কোন স্থলে আগম-নিগমের বহু মুখ থাকে, পুলিশের লোকের সে সন্ধানটা জানা ছিল। পুলিশ-প্রহরীরা আমার নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হয়ে নায়েবদারোগার আদেশে ছড়িভঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো ; দূরে দূরে ঘাঁটী ; সেই রকমের আটটা ঘাঁটীতে আটজন চাপরাসী ; সকলের স্কন্ধেই এক এক বন্দুক। সুড়ঙ্গের যে মুখটা আমরা দেখেছিলেম, যে মুখে মুণ্ডু উঠেছিল, সেই মুখের কাছে আমরা :—আমি, মণিভূষণ, নায়েব-দারোগা আর চারিজন চাপরাসী। এইখানে বলা উচিত, পূর্ব্বদিবসের ন্যায় আমার তখন ছদ্মবেশ ; দুই পকেটে দুই পিস্তল।

পূর্ব্বে বলা আছে, ধূর্ত্তলোকেরা সুড়ঙ্গের প্রবেশ-মুখটা সাবধানে সমতল কোরে রাখে, ছিলও সমতল, অপরাপর মুখেও সেইরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমার মুখে বৃত্তান্ত শুনে নায়েব-দারোগা মহাশয় মৃত্তিকাখননের খন্তা, কোদালী সঙ্গে এনেছিলেন। যে বৃক্ষগাত্রে পূর্ব্বদিন আমি চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেম, সেই বৃক্ষতলের ভূমিখননে একজন চাপরাসী নিযুক্ত। ভূমিখনন হোচ্ছে, সেই সময় একটু হেসে নায়েবদারোগা আমারে বোল্লেন, "একটা মজা কোল্লে হয়। সুড়ঙ্গ-মুখে বৃক্ষপত্র জমা কোরে আগুন ধোরিয়ে দেওয়া যাক, খুব ধোঁয়া হবে, সুড়ঙ্গে যারাই থাকুক, ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে, অধিকক্ষণ গর্ত্তমধ্যে তিষ্ঠিতে পারবে না, ছটফট কোরে বেরিয়ে পোড়বে।"

হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "উত্তম পরামর্শ। সুড়ঙ্গে একজন থাকুক, দশ-জন থাকুক অথবা বেশীই থাকুক, পুলিশের লোক সুড়ঙ্গে প্রবেশ কোল্লে, নিশ্চয়ই তারা মোরিয়া হবে হাতাহাতি যুদ্ধ বাধাবে, রক্তারক্তি সম্ভব ; সেটা ভাল নয় ; ধোঁয়া দেওয়াই ভাল।"

পরামর্শ ঠিকঠাক। খন্তা-কোদালীরা গহ্বর-মুখ প্রকাশ কোরে দিলে ; উঁকি মেরে দেখা গেল, অন্ধকার গহ্বর। নায়েবদারোগার নির্দেশমতে চাপ-রাসীরা বনভূমির শুষ্কপত্র সংগ্রহ কোরে সুড়ঙ্গ-মুখে নিক্ষেপ কোল্লে, আগুন ধোরিয়ে দেওয়া হলো। শীতকাল রাত্রে শিশির পড়ে, পতিত বৃক্ষপত্র শিশির-

জলে সিক্ত থাকে, বিশেষতঃ নিবিড় তরুপল্লবাকীর্ণস্থলে পৌষমাসের সূর্য্যরশ্মি প্রায়ই প্রবেশ কোত্তে পারে না ;—পত্রস্তূপে আগুন ধোরিয়ে দেওয়া হলো, জ্বালে উঠলো না ; ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ! সুড়ঙ্গের ভিতরেও ধোঁয়া, বাহিরেও ধোঁয়া।

ধোঁয়াতেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি। পাতাগুলি জ্বালে জ্বালে বিধূমে ভস্ম হয়ে গেলে তাদৃশ ফল কিছুই হোতো না, সুড়ঙ্গমধ্যে ধোঁয়া প্রবেশ করাতে সুড়ঙ্গবাসী অবশ্যই বেরিয়ে পোড়বে, এইটী স্থির কোরে, সকলেই তখন সতর্ক-নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ কোত্তে লাগলো। যে মুখে আগুন, সুড়ঙ্গবাসীরা সেই মুখে বাহির হয় কিম্বা অন্য মুখ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, সেইটী দেখবার নিমিত্তই সকলে সতর্ক। সুড়ঙ্গমুখের চাপরাসীর দীর্ঘ দীর্ঘ লাঠীর সাহায্যে ক্রমাগতই পাতা সংগ্রহ কোরে গহ্বরমধ্যে ঠেসে ঠেসে দিচ্ছে, ক্রমাগতই কুণ্ডলাকারে ধূমচক্র আবর্ত্তিত হোচ্ছে। কেহই বাহির হয় না। আমি চিন্তাযুক্ত হোলেম ; ভাবলেম, আজ কি তবে এ সুড়ঙ্গে কেহই নাই ?

দরখাস্তখানা তবে কি মিথ্যা হয়ে দাঁড়াবে ? মিথ্যা দরখাস্ত, পুলিশ হায়রাণ, এই দুই অভিযোগে মণিভূষণ কি তবে বিপদ-গ্রস্ত হবেন ? বোধ হয়, গহ্বরে কেহ নাই ! যদি থাকতো, এত ধোঁয়া কখনই সহ্য কোত্তে পাত্তো না, অবশ্যই বেরিয়ে পোড়তো। বোধ হয়, কেহ নাই ! কল্য সেই মুণ্ডুটা উঠেছিল, আমাদের দেখতে পেয়ে লুকিয়ে গিয়েছিল, পাছে ধরা পড়ে, পাছে আমরা সন্ধান বোলে দিই, মুণ্ডুটা তাই ভেবেই হয় তো দলের লোকগুলাকে পালাবার পরামর্শ দিয়েছিল, রাতারাতি হয় তো পালিয়ে গিয়েছে। অনেক দেশের বনদুর্গের দস্যু-তস্করেরা এই রকম করে ; একজায়গায় তারা বেশীদিন থাকে না ; একটু কিছু সন্দেহ বুঝতে পাল্লেই সোরে সোরে পালায়। এ সুড়ঙ্গের তস্করেরাও হয় তো তাই কোরেছে। হায় হায় ! আদালতে সত্যকথা জানিয়ে আমার উপকারী বন্ধু মণিভূষণ অকারণে বিপদে পোড়বেন, সেই ভাবনাই আমার।

ভাবছি, এমন সময় পূর্ব্বদিকের ঘাঁটীর দুজন চাপরাসী হল্লা কোরে চেঁচিয়ে উঠলো ; উত্তরদিকেও সেইরূপ চীৎকার ! ধন্য জগদীশ্বর ! দুই মুখের দুই দিকে দুটো লোক ধরা পোড়েছে ! যে মুখের কাছে আমরা ছিলেম, সেটা দক্ষিণের মুখ ;—সেই মুখে আগুন দেওয়া হয়েছিল, সে মুখে কেহই আসবে না, নিশ্চয় এইটী অবধারণ কোরে আমরা সকলেই উত্তরদিকে ছুটে গেলেম। নায়েব-দারোগা পূর্ব্বমুখের কাছে দাঁড়ালেন। সে মুখে যেটা ধরা পোড়েছিল, সেটা পূর্ব্বদিনের মুণ্ডুওয়ালা ; সেটাকে আমার তত আবশ্যক ছিল না, সেই জন্য আমি সেখানে দাঁড়ালেম না। উত্তরমুখে যেটা ধরা পোড়েছিল, শান্তিরাম দত্তের বর্ণিত চেহারার মিলনে সেই লোকটাই নফর ঘোষাল, সেই অস্থিচর্ম্মসার দীর্ঘাকার টিকীওয়ালা ব্রাহ্মণ, তাই দেখেই উল্লাসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সেই দিকেই আমি ধাবিত হোলেম। একটু পরেই জানা গেল, সুড়ঙ্গাটার ঐ তিন মুখ ; উত্তরদিকে একমুখ, পূর্ব্বদিকে একমুখ, দক্ষিণদিকে একমুখ ; এই তিন মুখ ছাড়া আর মুখ ছিল না। পূর্ব্বমুখের লোকটাকে

বন্ধন করবার হুকুম দিয়ে, তিনজন প্রহরীকে সেইখানে মোতায়েন রেখে, নায়েব-দারোগাও আমাদের কাছে উত্তরমুখে উপস্থিত হোলেন ; অপরাপর প্রহরীরাও সেইখানে এসে জমা হলো। ঘোষাল মহাশয় অবিলম্বেই পুলিশের প্রদত্ত লৌহ-বলয়ে সজ্জিত হোলেন।

সুড়ঙ্গমধ্যে আর কে কে আছে, তোরা এখানে ক-জন থাকিস, ক-জন ছিলি, ঐ দুজন বন্দীকে বার বার এই প্রশ্ন করাতে একজন বোল্লে, ষোলজন, একজন বোল্লে পাঁচজন। বাকি লোকেরা রাত্রি-কালে শীকারে বেরিয়ে গিয়েছে, দিনমানে ফিরে আসবে না, দিনমানে তারা কেবল দুজনেই ছিল, আর কেহ নাই।

আটজন প্রহরী বনমধ্যে পাহারা থাকলো। নায়েব-দারোগা তাদের বৃক্ষা-রোহণে প্রচ্ছন্ন থাকবার হুকুম দিলেন, সন্ধ্যার সময় তারা ছুটী পাবে, আর আটজন বদলী এসে তাদের জায়গায় ভর্ত্তি হবে, এইরূপ কথা থাকলো।

দুজন বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে নায়েব-দারোগা মহাশয় থানায় ফিরে এলেন। তাঁর গাড়ীতে আমরা উঠলেম না, আমি আর মণিভূষণ স্বতন্ত্র গাড়ীতে এলেম। নায়েব-দারোগার গাড়ীর কোচবাক্সে দুজন, আমাদের গাড়ীর কোচবাক্সে দুজন চাপরাসী থাকলো।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা থানায় গিয়ে পেঁছিলেম। যে আটজন প্রহরী বনের সুড়ঙ্গসমীপে মোতায়েন ছিল, তাদের বদলে রাত্রিকালে আর আটজন যাবে, সেই বন্দবস্ত ঠিক কোরে নায়েব-দারোগা মহাশয় থানার বারান্দায় বার দিলেন। আমি আর মণিভূষণ দুখানি চেয়ারে উপবেশন কোল্লেম। তখন আর আমার ছদ্মবেশ থাকলো না। বন্দীদ্বয়কে প্রাঙ্গণে দাঁড় কোরিয়ে নায়েব-দারোগামহাশয আমারে উপলক্ষ্য কোরে দস্তুরমত সওয়াল আরম্ভ কোল্লেন। বন্দীদের কাছে দুজন দণ্ডহস্ত প্রহরী দণ্ডায়মান থাকলো।

সুড়ঙ্গপথে যে লোকটার মুণ্ডু আমি দেখেছিলেম, সেই লোকটার প্রতিই প্রথম সওয়াল। দারোগারাই পুলিশ থানার কর্ত্তা। এখানে দারোগার পরিবর্ত্তে নায়েব-দারোগা এই সকল কার্য্য কোচ্ছেন কারণ কি ?—কারণ, একটা খুনী মামলার তদারকের ভারপ্রাপ্ত হয়ে প্রধান দারোগা মফস্বলে গিয়েছেন, নায়েব-দারোগার উপরেই এখন থানার সমস্ত কার্য্যভার সমর্পিত ; অতএব নায়েব-দারোগাই সওয়াল কোত্তে লাগলেন।

সওয়াল।—তোর নাম কি ?

জবাব।—নবীনচাঁদ নাগ।

সওয়াল।—বাড়ী কোথায় ?

জবাব।—মেদনীপুর।

সওয়াল।—পেশা কি ?

জবাব।—চাষবাস করা।

সওয়াল।—কাশিমবাজারের বনের সুড়ঙ্গের ভিতর কি রকম চাষবাস করিস ?

জবাব।—তা—তা—তা—

সওয়াল।—তা—তা—তা—দা—দা—দা—এ রকম এন্তাহাম দিবার জায়গা এ নয়, ঠিক কথা বল, সুড়ঙ্গের ভিতর তুই কি করিস ?

জবাব।—তা বাবা—আমি বাবা—আমি—

সওয়াল।—তা তো বুঝেছি ! আমি বাবা, তুই বাবা, সে বাবা, সকলেই তোর বাবা, তা তো বুঝেছি ! কালাচাঁদের গুঁতো জানিস ? (একজন প্রহরীর প্রতি ইঙ্গিত, প্রহরীর দ্বারা নবীনচাঁদের উরুদেশে দুই দণ্ডাঘাত।)

জবাব।—(কাঁদিয়া—নাচিয়া) ও বাবা !—ও বাবা !—বলি বাবা !—বোলছি বাবা ! সুড়ঙ্গে আমার—(নিস্তব্ধ।)

সওয়াল।—হাঁ হাঁ, সুড়ঙ্গে তোর কি ?

জবাব।—সুড়ঙ্গে আমার দাদাঠাকুর আমাকে যা যা বলে, আমি তাই করি।

সওয়াল।—কে তোর দাদাঠাকুর ? তোর দাদাঠাকুর তোকে কি কি বলে ? কি কি কাজ তুই করিস ?

জবাব।—দাদাঠাকুরের নাম আমি বোলতে পারবো না ; মানা আছে।

সওয়াল।—মানা আছে ? আচ্ছা কালাচাঁদ মানাবে। তোর দাদাঠাকুরকে আমি জানি। তোর দাদাঠাকুর ডাকাতী করে, মানুষ মারে, রাহাজানী করে, মেয়ে চুরি করে, নৌকা মারে। দাদাঠাকুরের হুকুমে তুইও কি সেই সব কাজ করিস ?

জবাব।—অতো কথা আমি বোলতে পারবো না। মানুষমারা, লোকামারা, মেয়ে চুরি, ডাকা—না না, ও সব কথা আমি বোলতে পারবো না। আমি—(নিস্তব্ধ)

নায়েব-দারোগা দেখলেন, লোকটা পাকা, সহজে তাকে বাগে আনা যাবে না। এইরূপ স্থির কোরে তিনি প্রহরীদের হুকুম দিলেন, "ঠাণ্ডা গারদে নিয়ে যাও, দস্তুমত ঠাণ্ডা কর ! একঘণ্টা বাদে ফের হাজির কোরো !"

আদেশমাত্র প্রহরীরা জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে নবীনচাঁদকে ঠাণ্ডা-গারদে নিয়ে গেল ! ঠাণ্ডাগারদ কি রকম জায়গা, ঠাণ্ডাগারদে কি হয়, দণ্ড-ধারীরা কি রকমে আসামীলোককে ঠাণ্ডা করে, পুলিশের প্রতাপ আর পুলি-শের কার্য্যকলাপ যাঁরা জ্ঞাত আছেন, তাঁদের কাছে সে বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

নবীনচাঁদ নাগ ঠাণ্ডাগারদে গেল। দ্বিতীয় বন্দী পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান। নামধাম জিজ্ঞাসা কোরে নায়েবদারোগা তারে আমার উপদেশমত প্রশ্ন কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। নামধামের পরিচয়ে আমি বুঝতে পাল্লেম লোকটা নিতান্ত বোকাধরণের নয় ; টিকীওয়ালা ভট্টাচার্য্যের ন্যায় কতকটা ভ্যাবাগঙ্গারাম। নামধাম ঠিক বোল্লে ; ভাঁড়ালেও না, গোপনও কোল্লে না। নাম নফরচন্দ্র ঘোষাল, নিবাস বর্দ্ধমান। আমার দিকে একবার চেয়ে নায়েবদারোগা মহাশয় গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লেন। সে ক্ষেত্রে যেরূপ অনুষ্ঠান আবশ্যক, ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে আমিও তাঁরে জানিয়ে দিলেম। তার পর কার্য্যারম্ভ।

সওয়াল।—কি গো ঠাকুর ! কি তোমার কার্য্য ?

জবাব।—পু—পু—পু—পুরোহিত। ঠা—ঠা—ঠা—ঠাকুরপুজো করি।

সওয়াল।—কি ঠাকুর? নবীনচাঁদ যেমন দাদাঠাকুরের হুকুমবরদার, তুমি যে ঠাকুরের পূজা কর, তোমার সে ঠাকুরটী কি সেইরকম দাদাঠাকুর? দেখো, খবরদার! মিথ্যা বোলো না, কালাচাঁদের কথা যেন মনে থাকে, ঠাণ্ডাগারদের নামটা যেন ভুলো না! বলো এখন, কি ঠাকুরের পূজা কর?

জবাব।—কা—কা—কা—কালীঠাকুর।

সওয়াল।—(আমার ইঙ্গিতে) আচ্ছা, বোরাকুলীগ্রামের শান্তিরাম দত্তের বাড়ী থেকে একটী মেয়ে চুরি গিয়েছে, সে খবর তুমি কিছু জানো?

জবাব।—মে—মে—মে—মেয়েচুরি? শা—শা—শা—শান্তিরাম?

সওয়াল।—ঠাকুর যে দেখ্‌ছি আমার উপরেও টেক্কা দেন! আমি দিচ্ছি সওয়াল, আমার উপরেই ঠাকুরের সওয়াল! হাঁ গো ঠাকুর, হাঁ হাঁ হাঁ, মেয়েচুরি,—শান্তিরাম দত্তের বাড়ী থেকে মেয়েচুরি!—মেয়ের নাম অমরকুমারী। খবর কিছু রাখো?

জবাব।—আ—আ—আ—আমি তো কিছু—

সওয়াল।—জানো না? তাই বুঝি তুমি বোলছো? তুমি কিছু জানো না?—না গো ঠাকুর, ও কথা নয়, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, কিছু কিছু তুমি জানো। মেয়ের বাপের পুরোহিত হয়ে অগ্রহায়ণমাসের একদিন তুমি সেই মেয়েটিকে আনতে গিয়েছিলে, শান্তিরাম দত্তের বাড়ীতেই গিয়েছিলে; মনে পড়ে? (মণিভূষণকে দেখাইয়া) এই বাবুটীকে তুমি চিনতে পারো?

জবাব।—(মণিভূষণকে দেখিয়া) বা—বা—বা—বাবু? আ—আ—আ—আমি? শা—শা—শা—শান্তি?

সওয়াল।—(আমার ইঙ্গিতে) আচ্ছা, বাবুর কথা এখন থাক, অমরকুমারীর পিতার পুরোহিত তুমি,—একপুরুষের নয়, তিনপুরুষের কুলপুরোহিত, আচ্ছা, অমরকুমারীর পিতার নামটী কি, বল দেখি ঠাকুর?

জবাব।—(যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া) জ—জ—জ—জটাধর তরফদার।

সওয়াল।—বাঃ! এইবার ঠিক হয়েছে! কুলপুরোহিত কি কখনো মিথ্যা-কথা কয়? ঠিক হয়েছে! সব কথা সত্য বল, মিথ্যা বোল্লে কি হয়, জানো তো?

জবাব।—মি—মি—মি—মিথ্যাকথা আমি জানি না।

সওয়াল।—আমিও তো সেই কথা বোলছি। মিথ্যা তুমি জানো না। আচ্ছা, সেই জটাধর এখন কোথায়? যে সুড়ঙ্গের ভিতর তোমরা ছিলে, জটাধর তরফদার কি সেই গহ্বরে থাকে?

জবাব।—থা—থা—থা—থাকে না।

সওয়াল।—তবে কোথায়?

জবাব।—গু—গু—গু—গুজরাটে।

সওয়াল।—রে বাপ্পা! একচোটে মুর্শিদাবাদ থেকে গুজরাটে? একেবারেই দেশছাড়া? আচ্ছা, অমরকুমারী কোথায়?

জবাব।—তা—তা—তা—তা আমি কি কোরে জানবো?

সওয়াল।—হাঁ হাঁ, তাও তো বটে! তা তুমি কেমন কোরে জানবে! আচ্ছা, শান্তিরামের বাড়ী থেকে অমরকুমারীকে যারা চুরি কোরে আনে, তাদের নাম জানো?

জবাব।—চু—চু—চু—চুরিকরা?

সওয়াল।—হাঁ হাঁ, সওয়ালটা হয় তো আমার ভুল হয়েছে,—চুরি নয়, ভুলিয়ে ভালিয়ে গাড়ী কোরে নিয়ে এসেছে। যারা এনেছে তাদের তুমি চেনো?

জবাব।—জ—জ—জ—জনার্দ্দন।

সওয়াল।—হাঁ, সে তো একজন, আর দুজন?

জবাব।—মু—মু—মু—মুর্শিদাবাদে তারা—

সওয়াল।—তাদের সঙ্গে কি তুমি ছিলে? মুর্শিদাবাদে তুমি কত দিন এসেছ?

জবাব।—বা—বা—বা—বাপের কথা বোলছিলে,—

সওয়াল।—বোলছিলেম, এখন আর সে কথা বোলছি না, এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েটিকে যারা নিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে তুমি ছিলে?

জবাব।—তা—তা—তা—তারা আমাকে—

সওয়াল।—হাঁ, আমিও সেই রকম বুঝতে পাচ্ছি। তারা তোমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়েছিল, তাই তুমি গিয়েছিলে, আপন ইচ্ছায় যাও নাই। ভাল-মানুষ তুমি বাপের বাড়ীর পুরোহিত, লোকেরা জোর কোরে তোমাকে না নিয়ে গেলে কখনই তুমি যেতে না। কেমন,—এই কথা নয়?

জবাব।—হিঁ গো।

সওয়াল।—হাঁ, তুমি গিয়েছিলে। চুরিকরা তোমার কাজ নয়, তারাই চুরি কোরেছে তুমি কেবল তাদের সঙ্গে ছিলে মাত্র।—কেমন?

জবাব।—চু—চু—চু—চুরি—

সওয়াল।—আর কেন বাবা ঢাকা দিবার চেষ্টা পাও? খুলে ফেলো। চুরি করা যদি নয়, তবে মেয়েটির মুখে চোকে কাপড় বেঁধে এনেছিলে কেন?

জবাব।—কা—কা—কা—কাপড় আমি—

সওয়াল।—হাঁ, তা হোতে পারে। পুরোহিত তুমি, যজমানের মেয়েটির মুখে কাপড় বাঁধতে তুমি বল নাই, তারাই বেঁধেছিল, এ কথা ঠিক হোতে পারে, কিন্তু তারা কে কে? তিনজন;—একজন জনার্দ্দন, একজন তুমি, আর এক-জন কে? ঠিক বোলো ঠাকুর! ভয় নাই! ইচ্ছা কোরে তুমি যাও নাই, তোমার ভয় কি? সব সত্যকথা বোল্লেই আমি তোমাকে ছেড়ে দিব, হাকিমের মুখ পর্য্যন্ত তোমাকে দেখতে হবে না। মিথ্যা যদি বল, রাত্রিপ্রভাতেই তোমাকে আমি হুজুরে চালান কোরবো। খবরদার! মিথ্যা বোলো না। সত্য কোরে বোলে ফেলো, আর একটা লোক কে?

জবাব।—(খালাস পাইবার আহ্লাদে) কু—কু—কু—কুঞ্জবিহারী।

সওয়াল।—কুঞ্জবিহারী সাণ্ডেল?

জবাব।—হিঁ গো।

সওয়াল।—কুঞ্জবিহারী কোথায় ?

জবাব।—জানি না।

সওয়াল।—তুমি বোলছো, জটাধর তরফদার গুজরাটে গিয়েছে। অকস্মাৎ গুজরাটে গেল কেন ? গুজরাটে তার কি দরকার ?

জবাব।—জানি না।

সওয়াল।—অমরকুমারীকে কি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে ?

জবাব।—জানি না।

সওয়াল।—ব্রাহ্মণ তুমি, পুরোহিত তুমি, সকল কথাই তুমি সত্য বোলছো, এইরূপ আমি বিবেচনা কোচ্ছি ; উত্তম, সত্যকথা বোল্লেই বেকসুর খালাস পাবে। আচ্ছা, সত্য কোরে বল দেখি, অমরকুমারী—

বাধা পোড়ে গেল। থানার বাহিরে একটা গোলমাল উঠলো। কি সংবাদ, কি সংবাদ, জিজ্ঞাসা কোত্তে নায়েব-দারোগামহাশয় আসন ছেড়ে উঠছিলেন, উঠতে হলো না, সংবাদ জানবার জন্য লোক পাঠাতেও হলো না, প্রহরীবেষ্টিত তিনজন নূতন বন্দী পুলিশ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত।

রাত্রি ৯টা। কে এই তিনজন বন্দী, অগ্রে একটু পরিচয় আবশ্যক। ঘোষালকে আর নবীনচাঁদ নাগকে বন্দী কোরে আনবার সময় বনমধ্যে আটজন প্রহরী রেখে আসা হয়েছিল, প্রহরীরা আপনাদের বুদ্ধি খাটিয়ে সুড়ঙ্গের তিনটি দ্বার যথাপ্রাপ্ত উপকরণে বন্ধ কোরে দিয়েছিল। ভূতলে পরিভ্রমণ না কোরে বৃক্ষারোহণে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাদের প্রতি নায়েব-দারোগার এরূপ আদেশ ছিল, সে আদেশ তারা অমান্য করে নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার বনভূমিকে সমাচ্ছন্ন করবার একটু পরেই সেই প্রহরীদের বদলী আর আটজন নূতন প্রহরী থানা থেকে প্রেরিত হয় ; সেই আটজন বনস্থলীতে উপস্থিত হবার অগ্রে পাঁচ সাত-জন ছদ্মবেশী লোক সেই সুড়ঙ্গের পথে আসে, সুড়ঙ্গ-মুখ অন্বেষণ করে, সেই সময় গাছের উপর থেকে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে দু-তিনবার বন্দুকের আও-য়াজ হয়। বৃক্ষারূঢ় প্রহরীরা লম্ফে লম্ফে নেমে পড়ে, পুনরায় বন্দুকের আওয়াজ। যারা সুড়ঙ্গ-পথ অন্বেষণ কোচ্ছিল, তারাও বন্দুকধারী ; কিন্তু হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শুনে তারা যেন হতবুদ্ধি হয়ে যায়, বন্দুকে বন্দুকে যুদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল, চোরেরা সে চেষ্টা পরিত্যাগ কোরে ইতস্ততঃ পলায়নের উপক্রম করে ; পাকড়ো পাকড়ো বোলতে বোলতে প্রহরীরা তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। চোরেরা অন্ধকারে পলায়ন কোত্তে পাত্তো ; কিন্তু সেই সময় বদলী আটজন উপস্থিত হওয়াতে পলায়নের ব্যাঘাত ঘটে। প্রহরী ষোল-জন, আসামী সাতজন। প্রহরীরা তাদের সাতজনকেই ঘিরে ফেলেছিল, তখন তারা পশ্চাতে হোটে হোটে বন্দুকের আওয়াজ কোত্তে কোত্তে খানিকদূর এগিয়ে যায় ; চারিজন পালিয়ে গিয়েছে, তিনজন ধরা পোড়েছে ; সেই তিনজন এই। গ্রেপ্তারকারী সমাগত প্রহরীদের মুখেই এই সকল বৃত্তান্ত আমরা জানতে পাল্লেম।

এই তিনজনের মধ্যেই একজন কুঞ্জবিহারী সান্ন্যাল। বাকী দুজনকেই আমি চিনতে পাল্লেম না ; কুঞ্জবিহারীকেও চিনলেম না, কেবল নাম শুনেই

বুঝতে পাল্লেম। ঘোষালের মুখে যতদূর ব্যক্ত হবার, ততদূর ব্যক্ত হয়েছে, যে সকল কথা ঘোষাল বোলতে চায় না, পুলিশের প্রহারে সে সকল কথা পাওয়া যাবে কি না, তাতেও আমার সন্দেহ থাকলো।

নায়েব-দারোগার অনুমতি নিয়ে, কুঞ্জবিহারীকে আমি নিজেই সওয়াল কোত্তে লাগলেম। যে উপলক্ষ্যে এই সকল লোককে ধরা, সেই উপলক্ষ্যটি একটু অন্তরে রেখে, অগ্রেই আমি কুঞ্জবিহারীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তুমি বর্দ্ধমানে ছিলে, বর্দ্ধমানেই আমি সে সংবাদ শুনেছিলেম, মুর্শিদাবাদে কেন এসেছ ?

কুঞ্জবিহারী উত্তর কোল্লে, "কার্য্যগতিকে কত দেশের কত লোক কত দেশে যায়, সে নিকাশ আমি কি দিব ?"

সওয়াল।—নিকাশ তোমাকে দিতেই হবে, আমার কাছে না দাও, যাঁদের কাছে এসেছ, একদিন পরে অথবা দুদিন পরে তাঁদের কাছে সব নিকাশ দিতেই হবে। আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, বর্দ্ধমানের সর্ব্বানন্দবাবুকে তুমি চিনতে কি না ? সর্ব্বানন্দবাবুর উইলে তুমি সাক্ষী ছিলে কি না ?

জবাব।—ছিলেম। তুমি কেন সে কথা জিজ্ঞাসা কর ?

সওয়াল।—জিজ্ঞাসা না কোল্লে উপস্থিত মোকদ্দমার গোড়া ধরা যাবে না, সেই জন্যই ঐ কথাটা আমি আগে জানতে চাই। সাক্ষী তুমি ছিলে। আচ্ছা, উইলখানি তোমার নিজের হাতে লেখা কি না ?

জবাব।—সে কথা আমার মনে পড়ে না!

সওয়াল।—উইলের ইসাদী স্থলে যেখানে তুমি নিজ নাম দস্তখৎ কোরেছ, সেখানে তোমার নামের নীচে নবিসিন্দা কথাটা লেখা আছে কি না, তা তোমার মনে পড়ে ?

জবাব।—তা যদি মনে পড়ে, তবে উইলখানা আমারই হাতের লেখা, সে কথাও তো মনে পোড়তে পারে। আমিই হয় তো লিখেছিলেম।

সওয়াল।—আচ্ছা, সে উইলে আর কে কে সাক্ষী ছিল ?

জবাব।—অতো আমার মনে নাই।

সওয়াল।—আচ্ছা, (ঘোষালকে দেখাইয়া) এ লোকটীকে তুমি চেনো ?

জবাব।—চিনি। এই লোকটীও সেই উইলের একজন সাক্ষী।

সওয়াল।—আচ্ছা, উইল যখন লেখা হয়, তখন সর্ব্বানন্দবাবু কোথায় ছিলেন ?

জবাব।—কোথায় ছিলেন, আমি কিরূপে জানবো ? মোহনবাবু—না না, সর্ব্বানন্দবাবুর জামাইবাবু আমাকে যেমন যেমন লিখতে বলেন, তাই আমি লিখেছিলেম।

নায়েব-দারোগার সওয়াল, আসামীদের জবাব, আমার সওয়াল, কুঞ্জবিহারীর জবাব, এই সকল জবাবের প্রত্যেক কথাই থানার একজন মুহুরী লিখে নিচ্ছেলেন, কুঞ্জবিহারীর শেষকথাগুলি লেখা হবার পর আর আমি কোন সওয়াল কোল্লেম না। নায়েব-দারোগা সেই সময়-অমরকুমারীর কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। কুঞ্জবিহারী বোল্লে, "অমরকুমারীর পিতা অমরকুমারীকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়েছেন, এই কথা আমি শুনেছি।"

সওয়াল।—কোথা থেকে নিয়ে গিয়েছে, তা তুমি কিছু শুনেছো ?

জবাব।—সে কথা শুনবার দরকার ছিল না। বাপের সঙ্গে মেয়ে যায়, কোথা থেকে কোথায় যায়, অপরলোকে সেটা কিরূপেই বা জানবে ?

সওয়াল।—(আমার ইঙ্গিতে) অমরকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ করবার জন্য বোরাকুলীগ্রামে শান্তিরাম দত্তের বাড়ীতে কখনো তুমি গিয়েছিলে ?

জবাব।—আমি ?—বিবাহের সম্বন্ধ কোত্তে আমি যাব ? আমি হোলেম ব্রাহ্মণ, তারা হলো শূদ্র, তাদের বিবাহের সম্বন্ধে আমি কেন যাব ?

সওয়াল।—ঘটক হয়ে গিয়েছিলে, তোমার সঙ্গে আর একজন ছিল, তার নাম জনার্দ্দন মজুমদার, সে জনার্দ্দনকে তুমি চেনো ?

জবাব।—পূর্ব্বে জানাশুনা ছিল, এখন আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না।

সওয়াল।—কাশিমবাজারে সুড়ঙ্গের ভিতরে তোমরা কি কর ? (অপর দুইজন আসামীকে দেখাইয়া) এরা তোমার কে হয় ?

জবাব।—এরা আমাদের সঙ্গে থাকে। আমাদের যিনি কর্ত্তা, তিনি আমাদের কাছে যে সকল লোককে এনে দেন, তারাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়।

সওয়াল।—(ঘোষালকে দেখাইয়া) তোমার এই সঙ্গী লোকটী বোলছিল, অমরকুমারীর পিতা জটাধর তরফদার গুজরাটে চোলে গিয়েছে, তুমি বোলছো কলিকাতায়, কোন কথাটা সত্য ?

জবাব।—জটাধরের মুখে যেমন আমি শুনেছি, তাই আমি বোলছি, সত্য-মিথ্যার বিচার আমি করি নাই।

সওয়াল।—আচ্ছা, জটাধর যখন কলিকাতায় যায়, তখন সেখানে কোথায় কোন বাড়ীতে থাকে, অমরকুমারীকে কোথায় কোন বাড়ীতে নিয়ে রেখেছে, কোথায় গেলে তাদের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, সে ঠিকানাটা তুমি বোলতে পার ?

জবাব।—কলিকাতায় জটাধরের নিজের বাড়ী নাই, যখন যায়, তখন যেখানে সুবিধা পায়, সেইখানেই বাসা করে, মেয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় রেখেছে, সে খবর আমি বোলতে পারি না। কি রকমেই বা জানবো ?

নায়েব-দারোগা আসন থেকে গাত্রোত্থান কোরে, চাপরাসীদের দিকে চেয়ে গর্জ্জনস্বরে বোল্লেন, "পাকা ডাকাত ! একটাকে ঠান্ডা-গারদে দেওয়া গিয়েছে, এই নূতন তিন বেটাকেও ঠান্ডা-গারদ দেখাও ; আর এই নফরচন্দ্র ঘোষালটাকে হাজত-গারদে নিয়ে রাখ।"

রাত্রি প্রায় ১১টা। আর আমরা সেখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোল্লেম না, পাঁচজন আসামী থানার গারদে আটক থাকলো, পরদিন আদালতে চালান হবে, আমরাও আদালতে উপস্থিত থাকবো, এইরূপ অবধারণ কোরে, নায়েব-দারোগার কাছে আমরা বিদায় চাইলেম। থানার মুহুরী যে সকল কাগজে সওয়াল-জবাবগুলি লিখে নিয়েছিলেন, নায়েব-দারোগা মহাশয় সেই সকল কাগজে আমাদের দুজনের দস্তখৎ কোরিয়ে নিলেন, আমাদের মোকাবেলায়

সওয়াল-জবাব হয়েছিল, সেইটী জানাবার নিমিত্তই আমার আর মণিভূষণের দস্তখৎ দলীলস্বরূপ তিনি রাখলেন। আমরা বিদায় হোলেম।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় রজনীবাবুর বাসায় আমরা পৌঁছিলেম। বাসার চাকরদের বলা ছিল, চাকরেরা সজাগ ছিল, আমরা প্রবেশ কোল্লেম। বাবুর সঙ্গে তখন দেখা হলো না, আহারাদি কোরে আমরা শয়ন কোল্লেম। প্রভাতে রজনীবাবুর কাছে সুড়ঙ্গ-সন্ধানের ফলাফল বিজ্ঞাপন কোরে বেলা ১১টার পর আমরা আদালতে উপস্থিত হোলেম। থানার চালানী আসামীরা উপযুক্ত সময়ে হাজির হলো, দস্তুরমত তাদের জবাব লওয়া হলো, কতক কতক কথা থানার কাগজের সঙ্গে মিল্লো, কতক কতক মিল্লো না। মেয়েচুরির এজেহারটা যথার্থ, আদালতের এই বিশ্বাস হলো ; বাকী আসামীদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাজারী, মণিভূষণের মানিত সাক্ষীগণের নামে শমনজারী, আসামীদের হাজত-বাসের হুকুম, সে দিন এই পর্য্যন্ত হয়ে থাকলো। পশুপতিবাবুর নামে চিঠি লিখে, লোক পাঠিয়ে শনিবার পর্য্যন্ত আমরা বহরমপুরেই থাকলেম।

দিন দিন আদালতে যাই, দিন দিন আমরা নূতন নূতন তত্ত্ব জানতে পারি, কিন্তু অমরকুমারী কোথায় আছেন, ঠিক সন্ধান জানতে পারি না। মন বড় অস্থির। অমরকুমারীর সন্ধানের জন্য থানায় থানায় পরোয়ানা গেল, কলিকাতা-পুলিশেও সংবাদ দেওয়া হলো, জটাধরের নামে ওয়ারীন বেরুলো, মোকদ্দমা ক্রমশই মুলতুবী।

পঞ্চবিংশ কল্প

নূতন তীর্থ

বহরমপুরের আদালতে মোকদ্দমা। কতদিনে সে মোকদ্দমা শেষ হবে, কতদিনে অমরকুমারীকে পাওয়া যাবে, কতদিনে আমি আবার অমরকুমারীর দর্শন পাবো, দর্শনের আশা কতদিনে আমারে শান্তি দান কোরবে, সমস্তই ভবিষ্যতের গর্ভগত। নিষ্কর্ম্মা হয়ে বহরমপুরে বোসে থাকা আমি আর উচিত বিবেচনা কোল্লেম না, এক সপ্তাহ পরেই বাবুদের বাড়ীতে ফিরে এলেম।

পৌষমাসের শেষ। যে দিন আমি এলেম, তার পরদিন দীনবন্ধুবাবু আমাকে বোল্লেন, "ইংরেজী আদালতের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হোতে অনেক বিলম্ব হয়। আমি একবার দ্বারকাতীর্থে যাত্রা করবার অভিলাষ কোরেছি, তুমি দেশ-ভ্রমণ ভালবাস, যাবে কি আমার সঙ্গে? পৌষমাসে যাব না, মাঘমাস পুণ্য-মাস, মাঘমাসের ১০ই ১২ই একটী দিন দেখে যাত্রা করাই আমার ইচ্ছা। যাবে কি তুমি?"

দ্বারকাতীর্থ। গুর্জ্জরদেশে দ্বারকাপুরী। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। দ্বারকা-দর্শনে আমার কৌতুহল জন্মিল, বড়বাবুর প্রশ্নে সম্মতিসূচক উত্তর দিয়ে,

মনে মনে আমি বিবেচনা কোল্লেম, মোকদ্দমার কোন পক্ষেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার সংস্রব নাই ; বুদ্ধির কাজ হয়েছে ; দরখাস্তকারী ফরিয়াদী মণি-ভূষণ দত্ত ; সাক্ষী-সাবুদ ঠিক পাওয়া যাবে ; আমি একজন সাক্ষী হোতে পারি, কিন্তু চোরেরা অমরকুমারীকে চুরি কোরেছে, চক্ষে আমি দেখি নাই; লোকের মুখে শুনা কথা ; আমার সাক্ষ্যবাক্যের উপর বেশী জোর দাঁড়াবে না, হাকিমও আমারে হাজির করবার জন্য পীড়াপীড়ি কোরবেন না ; যা কিছু আমার বক্তব্য, রজনীবাবুকে সমস্তই আমি বোলেছি, নায়েব-দারোগাকেও বোলেছি, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁরাই যথাকর্ত্তব্য বিবেচনা কোরবেন ; আমি গুজরাট-দর্শনে যাব। নফর ঘোষাল বোলেছে, রক্তদন্ত গুজরাটে ; কথাটা বোধ হয় ঠিক নয় ; কুঞ্জবিহারীর জবাবে সে কথাটার মিল নাই। যদিই সত্য হয়, সত্যই যদি রক্তদন্ত গুজরাটে গিয়ে থাকে, তা হোলে তো একরকম ভালই হবে। বঙ্গদেশের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের, সর্দ্দার আসামী রক্তদন্ত, তারে যদি আমি সেখানে দেখতে পাই, সেখানকার আদালতে সংবাদ দিয়ে বহরম-পুরে সংবাদ পাঠিয়ে অচিরেই তারে আমি ধোরিয়ে দিতে পারবো। রক্তদন্ত এখন আমার হাতের ভিতর ; এতদিন তারে আমি ভয় কোরে চোলেছি, এখন অবধি সে আমারে ভয় কোরে চলুক। গুজরাটে তারে দেখতে পেলেই আমি ধোরিয়ে দিব, তাতে আর কিছুমাত্র ভুল নাই। ভালই হবে। আমি গুজরাটে যাব।

পৌষমাসের ৭ দিন বাকী ; মাঘমাসের ১০ই ১২ই যাত্রা করবার কথা ; প্রায় কুড়ি দিন মুর্শিদাবাদে আমার থাকা হবে। মুর্শিদাবাদের একটী প্রসিদ্ধ স্থান পলাশী-ক্ষেত্র। এই অবকাশে পলাশীক্ষেত্রটি আমি একবার দর্শন কোরে আসবো, এই আমার নূতন সঙ্কল্প।

সঙ্কল্পের কথা পশুপতিবাবুকে জানালেম। একা আমি যাব কিম্বা অন্য কোন লোক আমার সঙ্গে যাবে, ছোটবাবু আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন ; আমি সে কথার কোন উত্তর দিতে পারি না। শেষকালে ছোটবাবু নিজেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, এইরূপ স্থির হয়। দুদিন পরেই আমরা বেরুলেম। আমাদের সঙ্গে আরো ৮।১০ জন লোক থাকলো ; বেশীর ভাগ দরোয়ান।

মুর্শিদাবাদ সহরের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে পলাশী-প্রান্তর। নিকটে পলাশী-গ্রাম। সেই গ্রামের নামেই প্রান্তরের নামকরণ। প্রবাদ এইরূপ যে, পূর্ব্বে এই স্থানে বিস্তর পলাশবৃক্ষ ছিল, সেই সকল বৃক্ষের নামেই স্থানের নাম পলাশী। প্রান্তরের পশ্চিমপার্শ্বে ভাগীরথী। মুর্শিদাবাদ থেকে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যে একটী রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ঐ প্রান্তরের মধ্য দিয়া চোলে গিয়েছে।

পলাশী-প্রান্তর দীর্ঘে দুই ক্রোশ, প্রস্থে এক কোশ, এইরূপ সীমা ছিল, এখন স্থানে নূতন নূতন গ্রাম বোসেছে, কতক স্থান ভাগীরথীগর্ভে প্রবেশ কোরেছে, সুতরাং প্রান্তরের পূর্ব্ববিস্তৃতি অনেকটা কম হয়ে এসেছে। যে যে অংশ ভাগীরথী-গর্ভে প্রবিষ্ট, সেই সেই অংশের এক এক স্থানে অধুনা এক একটা চর দেখা যায় ; বর্ষাকালে সেই সকল চর-ভূমি জলমগ্ন হয়, ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গ খেলায়।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে এই পলাশীক্ষেত্রে বঙ্গের রাজলক্ষ্মী ব্রিটিশ-প্রতাপের অঙ্কশায়িনী হন। নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ-সৈন্যের যুদ্ধ। বঙ্গের ইতিহাসে এই যুদ্ধই পলাশীযুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ছোটবাবুর সঙ্গে যে সকল লোক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বয়ঃপ্রবীণ এবং ইতিহাস-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁদের মুখে শুনলেম, ইংরেজেরা যতই গৌরব করুন, পলাশী-যুদ্ধ বাস্তবিক ন্যায়যুদ্ধ অথবা মহাযুদ্ধ নামে কদাচ গণ্য হোতে পারে না ; ফাঁকা আওয়াজে বিজয়ঘোষণা।

মীর জাফর প্রভৃতি মন্ত্রিগণের বিশ্বাসঘাতকতাই ইংরেজ-বিজয়ের প্রধান হেতু। ইতিহাসে আছে, পলাশীর আম্রকাননে জগৎশেঠ প্রভৃতির পরামর্শ হয়েছিল, আম্রকাননে কর্ণেল ক্লাইব শিবির স্থাপন কোরেছিলেন, আম্রকাননের শীকার-মঞ্চে দণ্ডায়মান থেকে নবাব-সৈন্যের বিক্রম-দর্শনে ক্লাইব প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন, সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত হোতে আদেশ দিয়েছিলেন। পরিশেষে ভাগ্যবলে ক্লাইবের পক্ষে জয়লাভ, গুপ্ত-হন্তার হস্তে সিরাজদ্দৌলার মৃত্যু, মুসলমানের বলক্ষয়, ইংরেজের বঙ্গাধিকার। পলাশী-বিজয়ের অগ্রে জাহাজের কেরাণী ক্লাইব কর্ণেল ক্লাইব হয়েছিলেন, পলাশী-বিজয়ের পর কর্ণেল ক্লাইব বারণ ক্লাইব হন। সেই ক্লাইব আমাদের ইতিহাসের লড ক্লাইব।

হাঁ, বোলছিলেম আম্রকাননের কথা। মুর্শিদাবাদের আম্রকাননগুলি আম্রকুঞ্জ নামে বিখ্যাত ছিল। এক একটী কুঞ্জে একলক্ষ আম্রবৃক্ষ বিদ্যমান থাকতো, সেই কারণে তাদৃশ উদ্যানের নাম লক্ষবাগ। এখন আর সে প্রকার আম্রকুঞ্জও দেখা যায় না, লাখবাগও দেখা যায় না, নামমাত্র অবশিষ্ট। শুনা গেল, পলাশীকুঞ্জের একটী প্রাচীন আম্রবৃক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রের নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে বিদীর্ণগাত্র হয়েছিল, শাখাপত্র-পরিভ্রষ্ট হয়ে শুষ্ক অবস্থায় যুদ্ধের সাক্ষী-স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল, ইংরেজেরা সেই শেষবৃক্ষটী সমূলে উৎপাটন কোরে বিলাতে প্রেরণ কোরেছেন। পলাশী-যুদ্ধের আর একটী নিদর্শন এখানে মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় শুনা গেল। প্রান্তরের পূর্ব্বে বৃক্ষলতা অথবা তৃণাদি কিছুই জন্মিত না, এখন এক একদিকে চাষ হয় ; ভূমি-কর্ষণের সময় লাঙ্গলমুখে কখন কখন গোলাগুলী উত্থিত হয়ে থাকে। ভাগীরথীর চরেও ঐরূপ।

পলাশীক্ষেত্রে যা কিছু দেখা গেল, তদপেক্ষা অধিক কথা শুনা গেল। তাদৃশ দর্শনযোগ্য আর কিছুই নাই। দুই একটী সমাধিস্তম্ভ দুই একজন বীর-পুরুষের নামের স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে, এই মাত্র। পলাশী-দর্শনের আশা পরিতৃপ্ত, কৌতূহল নিবৃত্ত, কৌতুক প্রশমিত ; আর আমরা সেখানে বিলম্ব কোল্লেম না, স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ কোরে ছোটবাবুর সঙ্গে দলবলসহ ফিরে এলেম। পথে আসতে আসতে আমাদের সঙ্গীগণের মধ্যে একজন ইংরেজীনবীস ভদ্রলোক বোল্লেন, "বিলাতে সাহেব-বিবিরা এ পথে যখন আসে, জলপথেই আসুক আর স্থলপথেই আসুক, পলাশীপ্রান্তরে উত্তীর্ণ হয়, পলাশীকে তারা তীর্থস্থান বলে, পলাশী-তীর্থে পদার্পণ কোরে উচ্চকণ্ঠে তারা জয়ধ্বনি করে ; তাদের চীৎকারধ্বনি-শ্রবণে কাননের পাখীরা আতঙ্কে কলরব কোত্তে কোত্তে উড়ে উড়ে পালায়।" এই-পরিচয় শ্রবণে আমি হাস্য কোল্লেম।

আমরা বাড়ী এলেম। পূর্ব্বেই বোলেছি, পৌষমাস সমাপ্তপ্রায়। নিত্য নিত্য আমি বহরমপুরে যাই, মোকদ্দমা কোন দিন কতটুকু অগ্রসর, সংবাদ রাখি, রজনীবাবুকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি, যেগুলি তাঁর জানা দরকার, পূর্ব্বে যা আমি বলি নাই, সেগুলি জানিয়ে জানিয়ে দিই, এক একরাত্রি তাঁর বাসাতেও আমি থাকি, এই রকমে দিন যায়।

থানার চালানী আসামীদের মধ্যে নফর ঘোষাল আর কুঞ্জ সান্ন্যাল আমার জানা ; নাম জানা ছিল, চেহারাতেও এখন জানা। অমরকুমারীর সন্ধান তারাই জানে, তাদের মুখেই ব্যক্ত হবে, নিত্য নিত্য এই আশা আমি পোষণ করি। নবীন নাগ আর সেই দুজন নূতন বন্দী অন্য যে খবর বোলতে পারে, সে খবরে কেবল পুলিশের দরকার, আমার সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, নফরের আর কুঞ্জ-বিহারীর মুখে নূতনকথা আর কি কি প্রকাশ পেয়েছে, রজনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, রজনীবাবু বলেন, "সব গোলমাল।" তিনি আরো বলেন, "মূল আসামী আছে। মূল আসামী গ্রেপ্তার না হোলে, এ মোকদ্দমার কোন কিনারা হবে না। অমরকুমারী মুর্শিদাবাদে নাই, সেটা একরকম বুঝতে পারা গিয়েছে। যেখানে মূল আসামী, সেইখানেই অমরকুমারী অথবা সেই জটাধর অন্য উপায়ে অমর-কুমারীকে আর কোথাও সোরিয়ে ফেলেছে, সেটা এখনো ঠিক হোচ্ছে না ; জটাধরকে ধোত্তে পাল্লেই সব কথা জানা যাবে। জটাধরটাই এ মোকদ্দমার গোড়া।"

যে রাত্রে আমাদের এই সব কথা, তার পরদিন আমি একবার আদালতে উপস্থিত হোলেম। মণিভূষণ ইতিপূর্ব্বে পূর্ণক্ষমতা প্রদান কোরে রজনীবাবুর নামে ওকালৎ-নামা দিয়ে রেখেছেন, নিত্য নিত্য মণিভূষণের হাজির হওয়া আবশ্যক হয় না, আমার তো হয়ই না, তবু আমি আসি। যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। আমারও তাই। অমরকুমারীর অদর্শনে আমি কাতর, সেইজন্যই আদালতে আমি আসি।

একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে সেই মোকদ্দমা সেদিন উঠেছে। পুলিশে যেমন যেমন জবাব দিয়েছিল, চালানী আসামীরা হাকিমের কাছে সে রকম বলে নাই, অনেক কথার উলোট-পালোট হয়ে যায়। ইতিমধ্যে একদিন নফর ঘোষাল বোলেছিল, "প্যাম্‌চাঁদ মিত্তি, হ্যামচাঁদ পালুই, বজো ভশ্চাজ্জি, এই তিনজন মুরুব্বী আমাদের দলপতির কন্যাকে কলিকাতায় নিয়ে রেখেছে।"

সুড়ঙ্গে যারা যারা থাকে, তাদের সঙ্গে ঐ তিনজনের কি সম্বন্ধ, তারাও সুড়ঙ্গবাসী কি না, সরকারের পক্ষ থেকে এইরূপ জেরা হয়েছিল, নফর ঘোষাল সে জেরার সন্তোষকর উত্তর দিতে পারে নাই। সুড়ঙ্গে যারা থাকে, তাদের পেশা চুরি, ডাকাতী, রাহাজানী, হাকিমের সম্মুখে নফরের মুখে এই কথা প্রকাশ পেয়েছে, ঐ তিনজন মুরুব্বীর বিশেষ পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। প্রেমচাঁদ মিত্র, হেমচন্দ্র পালধি, ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য, তিনটে নামই আমার কর্ণে নূতন। তারা কলিকাতায় থাকে, কিন্তু কে ? [illegible] তারা কেন নিয়ে

যাবে? তবে কি রক্তদন্তের সঙ্গে—মোহনলালের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে? তাই থাকাই হয় তো সম্ভব। তা না হোলে নফর ঘোষাল তাদের নাম কোরবে কেন? নফর ঘোষালেরা মোহনলালের লোক, তবেই অবশ্য রক্তদন্তের পেটাও লোক, কুঞ্জবিহারীর জবাবে উইলে সাক্ষী হওয়া প্রসঙ্গে সেই তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ক্রমে ক্রমে একে একে কত তত্ত্ব প্রকাশ পাবে, একসঙ্গে কতলোক জড়াবে, কাণ্ডটা কতদূর গড়াবে, এক দড়ীতে কত লোক বাঁধা যাবে, অনুমানে কিছুই আমি স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

আমি আদালতে উপস্থিত। একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস। কুঞ্জবিহারী সান্যালের সঙ্গে যে দুজন নূতন ডাকাত রাত্রিকালে বনমধ্যে ধরা পড়ে, হাতকড়ী-বাঁধা সেই দুজন সেই সময় হুজুরে হাজির। একজনের নাম ধুন্দুরাম, নিবাস ফরিদপুর; দ্বিতীয়জনের নাম কেফায়ৎ, নিবাস চট্টগ্রাম। দুজনেই খর্ব্বাকার, কৃষ্ণবর্ণ, মাথা ছোট, চক্ষু গোল, দুজনেরই সর্ব্বাঙ্গে দাদ্। গাঁট গাঁট গড়নে খুব বলবান বোলেই বোধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় দুই তিনবার তারা ডাকাতী মোকদ্দমায় ধরা পোড়েছে, দুই তিনবার জেল খেটে এসেছে, কাশিমবাজারের সুড়ঙ্গে বাস করা অস্বীকার করে বাজারে কুঞ্জবিহারীর সঙ্গে পূর্ব্বের জানাশুনা হয়েছিল, সেই জন্যই বনের ভিতর এসেছিল, এসেই ধরা পোড়েছে। তারা ছ-জন, চারিজন পালিয়েছে, তারা দুজনে পালাতে পারে নাই। কুঞ্জবিহারীটা পালাবার চেষ্টা কোরেছিল, পারে নাই।

আসামীরা আবার হাজতে প্রেরিত হলো, আমিও আদালত থেকে বেরিয়ে এলেম; সন্ধ্যাকালে উকীলের বাসায় গিয়ে, আপন মনে পূর্ব্বাপর অনেক ঘটনা আলোচনা কোল্লেম। সে রাত্রেও আমারে বহরমপুরে থাকতে হোলো।

রাত্রিকালে রজনীবাবুকে আমি বোল্লেম, "মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হবার অনেক বিলম্ব; এখনো পর্য্যন্ত মূল আসামীর কোন সন্ধান হলো না; দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে শীঘ্রই আমারে দ্বারকাতীর্থে যেতে হোচ্ছে। আপনি থাকলেন, মণিভূষণ থাকলেন, সকল ভার আপনার উপর। মোকদ্দমার আসামীরা সাজা পায়, সেটা অবশ্য বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অমরকুমারীকে উদ্ধার করাই আমার প্রধান কার্য্য। ইতিমধ্যে যদি—গুজরাট থেকে আমার ফিরে আসবার পূর্ব্বেই যদি অমরকুমারীর সন্ধান হয়, অমরকুমারীকে যদি পাওয়া যায়, অনুগ্রহ কোরে মণিভূষণের হস্তে তাঁরে আপনি সমর্পণ কোরবেন।"

রজনীবাবু সম্মত হোলেন। পরদিন প্রভাতে আমি যদুপুরে ফিরে গেল্লেম। তিন চারিদিন অতীত হয়ে গেল। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি; সূর্য্যের মকররাশিসঞ্চার। মাঘমাসের ১০ই ১২ই দ্বারকাযাত্রা করা বড়বাবুর ইচ্ছা ছিল, ১০ই ১২ই শুভদিন পাওয়া গেল না. ৫ই মাঘ শুভদিন, সেই দিনেই যাত্রা করা স্থির। আর দিন নাই। ছোটবাবুকে আমি বোল্লেম, "মোকদ্দমা থাকলো, আপনি থাকলেন, রজনীবাবু থাকলেন, মণিভূষণ থাকলেন, অমরকুমারীকে যদি পাওয়া যায়, এবারে আর মণিভূষণের বাড়ীতে না রেখে, আপনি দয়া কোরে এই বাড়ীতেই আশ্রয় দিবেন, তা হোলেই নিরাপদ হবে। দুষ্ট-

লোকে এখানে আর কোন প্রকার উপদ্রব কোত্তে পারবে না, সকলদিকেই ভাল হবে।"

ছোটবাবু আহ্লাদ পূর্ব্বক আমার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ কোল্লেন। সেই দিন মণিভূষণকে আনয়ন করা হলো, তাঁকেও আমি ঐ কথা বোল্লেম, তিনিও সম্মত হোলেন।

৫ই মাঘ সমাগত। বড়বাবুর যেমন অভ্যাস, তদনুসারে বিনা আড়ম্বরে তিনি প্রস্তুত হোলেন, একজনের পরিবর্ত্তে দু-জন চাকর আর একজন পাচক-ব্রাহ্মণ সঙ্গে থাকলো, দুর্গানাম স্মরণ কোরে আমরা যাত্রা কোল্লেম। দ্বারে মঙ্গলঘট, কদলীতরু, আম্রশাখা ; সেইগুলিকে প্রণাম কোরে উপযুক্ত যানা-রোহণে আমরা তীর্থভ্রমণে চোল্লেম। সে সময় এ দেশে কলের গাড়ী ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন যানে যত সময়ে গুজরাটে উপস্থিত হওয়া যায়, ততদিনে আমরা গুজরাটে গিয়ে পোঁছিলেম।

প্রথমে আহমদনগর। নগরটি দিব্য পরিপাটি, দেবালয়ও অনেকগুলি, তন্মধ্যে ভদ্রকালী প্রধান। আমরা ভদ্রকালী দর্শন কোল্লেম, পূজা দিলেম, তিন রাত্রি সেখানে বাস কোরে দ্বারকায় উপনীত হোলেম। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল, চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে, মন্দিরে বিগ্রহ আছেন, বিগ্রহগুলি আমরা দর্শন কোল্লেম, শরীর পুলকিত হলো। লোকের মুখে শুনলেম, দ্বারকার পূর্ব্ব-শ্রী এক্ষণে কিছুই নাই।

ব্যাধবীর কালকেতু মঙ্গলচন্ডীর কৃপায় গুজরাটের বন কেটে নগর পত্তন কোরেছিলেন, সেই গুজরাট এখন আর একপ্রকার শ্রীসম্পন্ন। সৌরাষ্ট্র প্রদেশ পরিভ্রমণ কোরে আমরা বরদারাজ্যে উপনীত হোলেম। বরদা হিন্দুরাজত্ব। বরদার মহারাজ স্বাধীন। তিনি স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁর নিজের ব্যবস্থানুসারে রাজ্য শাসিত হয়, প্রজাপুঞ্জ সুখে বাস করে। বরদায় ভবানীদেবীর একটি মন্দির আছে। ভবানী-মন্দিরে সাময়িক উৎসব হয়, নূতন প্রণালীতে নৃত্যগীত হয়, কুলকামিনীরাও উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধান কোরে নৃত্যগীত করেন, দর্শনে শ্রবণে মনের প্রীতি জন্মে। যে সময় আমরা গিয়েছিলেম, সে সময় একটি উৎসব ছিল, উৎসবস্থলে মহারাজ উপস্থিত ছিলেন, দেবীদর্শন উপলক্ষে মহারাজকেও আমরা দর্শন কোল্লেম। সপ্তাহ-কাল বেশ আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত হলো।

নগরের একপ্রান্তে আমাদের বাসা হয়েছিল। ভ্রমণে আমার বেশী অনু-রাগ, যেখানে যখন যাই, স্থানগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করি। সেই অনু-রাগে বরদারাজ্যের অনেক স্থান আমি দর্শন কোল্লেম ; একাকী বেরুতেম না, সঙ্গে লোকজন থাকতো, নির্ব্বিঘ্নে বাসায় ফিরে আসতেম।

ষড়্বিংশ কল্প

নূতন বিপত্তি!

বরদায় জঙ্গল অনেক। বুদ্ধির ভ্রমে একদিন আমি একাকী সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভ্রমণে বাহির্গত হই, পথেই সন্ধ্যা হয়, পথ ভুলে আমি বনের দিকে গিয়ে পড়ি। বরদা বাস্তবিক তীর্থস্থান নয়, কিন্তু অনেক দেশের অনেক লোক নানা কার্য্যে এই রাজ্যে অবস্থান করে। আমি যেন বরদাকে নূতন তীর্থ মনে কোল্লেম। স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ভারতে তখন অতি কম, এই হিন্দু-রাজ্যকে পবিত্র তীর্থস্থান মনে করা আমার পক্ষে বিচিত্র বোধ হয় নাই। সাহেব-বিবিরা মুর্শিদাবাদের পলাশী-প্রান্তরকে তীর্থস্থান জ্ঞান করেন, হিন্দুরা বিপরীত ভাবেন। কথিত আছে, পলাশীযুদ্ধের শেষদিন আকাশে মেঘ ছিল, সমস্ত দিন বৃষ্টি হয়েছিল, যুদ্ধের পরিণাম দর্শন করা কষ্টকর বিবেচনা কোরেই যেন সূর্য্যদেব সেদিন একবারও আকাশে দেখা দেন নাই। চারিযুগের সাক্ষী চন্দ্র-সূর্য্য, পলাশীযুদ্ধের শেষদিন সূর্যদেব সাক্ষী ছিলেন না, বরদার জঙ্গলের দিকে আমি যখন পথ-ভ্রান্ত হয়ে বিপাকে পড়ি, তখনো আকাশে সূর্য্য ছিলেন না। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার, কোন দিকে পথ, কোন দিকে আমাদের বাসা, অন্ধকারে কিছুই আমি ঠিক কোত্তে পাল্লেম না, নিত্য নিত্য যেমন অন্ধকার হয়, সে দিনের অন্ধকার তদপেক্ষা গাঢ়-প্রগাঢ় ;—নিবিড় অন্ধকার!

কি কারণে নৈশ অন্ধকার প্রগাঢ়, সে কথাও বলা আবশ্যক। সমস্ত দিন সূর্য্য ছিলেন, আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না। সন্ধ্যার পরেই মেঘাড়ম্বর, অল্প অল্প বৃষ্টি, নক্ষত্রমালা অদৃশ্য, সেই কারণেই ঘোর অন্ধকার। আমার ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তন অনেক প্রকারেই পরীক্ষিত, এ রাত্রে আবার কিরূপ পরীক্ষা হয়, অন্তরে সেই ভাবনাই প্রবল। বিদেশে অজানা পথে আমি একাকী ; যে দিকে গিয়ে পোড়েছি, সে দিকে জনমানবের চলাচল নাই, নিরবচ্ছিন্ন আমি একাকী।

বনপথ। বনমধ্যেই আমি প্রবেশ কোরেছি। নিবিড় বন, বনের নিবিড়তায় অন্ধকারের নিবিড়তাও অধিক। যে দিকে অগ্রসর হই, সেই দিকেই বন, সেই দিকেই অন্ধকার। এক একবার মনে কোচ্ছি, এই দিকে গেলেই হয় তো পথ পাব, মনে করাই ভুল, পলকে পলকে ধাঁধাঁ লাগতে লাগলো ; যে দিকে মুখ ফিরাই, যে দিকে পদচালনা করি, সেই দিকেই অরণ্য। ভ্রান্তিবশে বনের ভিতর আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যদি কোন বিপদ ঘটে, যদি কোন বন্যজন্তুর সম্মুখে পড়ি, প্রাণ যাবে, মনোমধ্যে কেবল সেই ভয় ; অন্য কোন ভয় তখন আমার কল্পনায় আসে নাই। রক্ষক কে?—সজীব রক্ষক কেহই না, নির্জীব রক্ষক দুটি পিস্তল। ব্যাঘ্রভল্লুকাদি সম্মুখে এলে, সে অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হবে

না, পিস্তল তখন কোন কাজে আসবে না, সেটাও মনে মনে ভাবছি ; ভয় ক্রমশই বেশী হয়ে আসছে।

কতদূরে গিয়ে পোড়েছি, কিছুই ঠিক পাচ্ছি না। হঠাৎ বনমধ্যে যেন অশ্বপদধ্বনি শুনতে পেলেম। বনের ভিতর রাত্রিকালে ঘোড়া বেড়ায়, এটাই বা কি ? এ রাজ্যে কি নিশাকালে বন্য অশ্ব বিচরণ করে ?—মনে মনে তর্ক আসছে, কিন্তু অশ্বের পদধ্বনি বন্য অশ্বের পদধ্বনির মত নয় ; খুরে নাল-বাঁধা থাকলে যে প্রকার শব্দ হয়, সেই প্রকার শব্দ ; বন্য অশ্ব নয়, সওয়ারের অশ্ব। মেঘাবৃত অন্ধকার রাত্রে এ রকম নিবিড় বনে ঘোড়সওয়ার কি কোত্তে এসেছে ?—একবার ভাবলেম, হয় তো শীকারী, অন্ধকারে শীকারীরাই বা কি রকমে শীকার লক্ষ্য কোরবে, তাও বুঝতে পাচ্ছি না। ক্রমাগতই চোলেছি ; ভাবছি আর চোলছি, পদে পদেই গতিরোধ হোচ্ছে ; গাছে গাছে এক একবার মাথা ঠুকে যাচ্ছে, অতি সাবধানে খুব ধীরে ধীরেই চোলেছি।

অকস্মাৎ ঘোর বিপদ্ ! দু-দিক থেকে দু-জন লোক ছুটে এসে, আমার দুখানা হাত ধোরে ফেল্লে. ধোরেই অমনি শূন্যে শূন্যে আমাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে চোল্লো, বোধ হলো যেন, মাটির নীচে মানুষ ছিল, মাটি ফুঁড়ে উঠেছে, উঠেই আমাকে ধোরেছে ! ভুঁইফোঁড় মানুষ ! কেন আমাকে ধোল্লে ? অন্ধকারে নিঃশব্দে আমি যাচ্ছি, কেমন কোরেই বা দেখতে পেলে ? কেমন কোরেই বা জানতে পাল্লে ? কারা এরা ? নিশ্চয়ই ডাকাত ! বনের মাঝে ডাকাতের হাতে আমি পোড়েছি।

অশ্বের পদধ্বনি আর শুনা যায় না। লোকেরা আমাকে শূন্যে শূন্যে নিয়ে চোলেছে, ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে, কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরবো, কথা ফুটছে না। মনে হোচ্ছে, এরাই হয় তো ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল, বনপথ এদের জানা আছে, বনের ভিতর হয়তো ফাঁকা জায়গা আছে, সেই জায়গাতেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ হোচ্ছিল, সেইখানেই ঘোড়া থেকে নেমে, এরা হয় তো আমাকে ধোরে ফেলেছে। কারে হয় তো খুঁজছিল, কে হয় তো এদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছে, বাঘ-বিড়ালের মত অন্ধকারে হয় তো এদের চক্ষু জ্বলে, তফাৎ থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই ধোরেছে।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এই সকল ভাবনা আমার মনে এলো, বেশীক্ষণ ভাবতে হলো না, লোকেরা আমাকে এক জায়গায় নামিয়ে দিলে, দাঁড় করালে, কিন্তু হাত ছেড়ে দিলে না. তখনি আবার শূন্যে তুলে একটা ঘোড়ার উপর বোসিয়ে দিলে, আমার কোমরে একগাছা দড়ি বেঁধে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিলে, আমার হাত দুখানিও বেঁধে ফেল্লে। একটা লোক লাফ দিয়ে সেই ঘোড়ার উপর আমার ঠিক সম্মুখে বোসলো, আর একটা লোক সেই ঘোড়ার লাগাম ধোরে দাঁড়িয়ে রইলো।

বড় বড় কথা ; জড়ান জড়ান অনেক রকম আস্ফালনের কথা ; তখন আমি বুঝলেম, দুটো একটা লোক নয়, অনেক লোক। পিস্তল সঙ্গে আছে, কিন্তু আমি নিশ্চেষ্ট, হাত-পা বাঁধা, কোন উপায় ছিল না। চকিতমাত্রে একটা মশাল

জেবালে উঠলো, মশালের আলোতে দেখলেম, দশ জন লোক, সকলের মুখেই যেন মুখোস ঢাকা, কালো কালো মুখোস। বনের ভিতর সে রকম ছদ্মবেশ কেন, তারাই জানে, আমি কিন্তু অনুমান কোত্তে পাল্লেম না। পূর্ব্বে যেটা অনুমান কোরেছিলেম, সে অনুমান ঠিক। খানিকটা ফাঁকা জায়গা, চারিদিকে বন, মধ্যস্থলে সেই জায়গা। সেইখানেই আমাকে ঘোড়ার উপর তুলেছে, আরো আট দশটা ঘোড়া সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে আমার প্রায় বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণ একটি কথাও আমার রসনা থেকে নির্গত হোচ্ছিল না, এই সময় সাহসে ভর কোরে, আমার সম্মুখের সওয়ারটাকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন তোমরা আমাকে ধোরেছ ? আমি পথিক, আমি বিদেশী, আমার সঙ্গে টাকা নাই, পথ ভুলে অন্ধকারে বনের ভিতর এসে পোড়েছিলেম, কেন তোমরা আমাকে ধোরেছ ?"

বজ্রগর্জ্জনে লোকটা উত্তর কোল্লে, "চোপরাও ! ফের যদি কথা কবি, এক গুলীতে তোর মাথার খুলী উড়িয়ে দিব !" সমান গর্জ্জনে আর একটা লোক বোলে উঠলো, "মুখ বেঁধে ফেল, দম বন্ধ কোরে দে !"

যেমন হুকুম, তেমনি কার্য্য। আমাব উত্তরীয়বস্ত্রে আমার সম্মুখবর্ত্তী সওয়ার তৎক্ষণাৎ আমার মুখ-চক্ষু বেঁধে ফেল্লে, আর আমি কিছু দেখতেও পেলেম না, একটি কথা বোলতেও পাল্লেম না ; অনুভবে বুঝতে পাল্লেম, লম্ফে লম্ফে লোকেরা এক একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার হলো। যে ঘোড়াতে আমি ছিলেম, সেই ঘোড়া অগ্রে, পশ্চাতে সওয়ারেরা সারিবন্দী হয়ে দাঁড়ালো ; দুপাশে দুজন মোতায়েন থাকলো, মৃদুকদমে ঘোড়ারা চোলতে আরম্ভ কোল্লে। প্রায় দুই শত হস্ত দূরে ঘোড়া থেকে নামিয়ে লোকেরা আমাকে একটা গহ্বরের মধ্যে নিয়ে গেল, বাকী সওয়ারেরাও ঘোড়া থেকে নেমে নেমে আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চোল্লো। ডাকাতের হাতে আমি বন্দী।

গহ্বরের মধ্যে ঘর, ঠিক যেন ছোট রকম কেল্লা। একটা ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে তারা আমার মুখের বাঁধন খুলে দিলে, হাত-পা যেমন বাঁধা, তেমনি থাকলো। আমার মুখের কাছে তলোয়ার নাচিয়ে নাচিয়ে একজন বোলতে লাগলো, "মুখ বুজে চুপ কোরে থাক ; এখানে তোর রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। চেঁচিয়ে মোরে গেলেও কেহ উত্তর দিবে না, যদি চেঁচাস, এক কোপে টপ কোরে তোর মাথাটা কেটে ফেলবো !"

মাথা যাবে, তা আমি বুঝলেম, চীৎকার করাও বিফল, সেটাও আমি বুঝলেম, তবু কিন্তু চুপ কোরে থাকতে পাল্লেম না। যমদূতের মত দশজন ডাকাত আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, কাহার হস্তে বন্দুক, কাহার হস্তে তলোয়ার ; মুর্ত্তি দেখেই আমার প্রাণ উড়ে গেল। ঘরময় মশালের আলো, কথা কোইলেই প্রাণ যাবে, বুঝতে পেরেও মৃদুস্বরে মিনতি কোরে আমি বোল্লেম, "অকারণে তোমরা আমাকে ধোরেছ, আমার সঙ্গে টাকা নাই, দয়া কর, বন্ধন খুলে দাও, আমি পালাবো না, এই অন্ধকারে কোথায় বা আমি পালাতে পারবো ? খুলে দাও। রাত্রে আর কোথাও আমি যাব না, আমার সঙ্গে টাকা নাই, তোমরা বরং

আমার অঙ্গবস্ত্র অন্বেষণ কর ; দেখ—" অঙ্গবস্ত্র অন্বেষণের কথা আমি বোল্লেম বটে, কিন্তু ভয় হলো। সত্য যদি তারা অন্বেষণ করে, পিস্তল পাবে, তা হোলেই বিপদ বাড়বে ; সেই ভয়েই কথা বোলতে বোলতে থেমে গেলেম। লোকগুলো হো হো কোরে হেসে উঠলো, "ছোঁড়াটা ভারী ধড়ীবাজ, ঐ কথাই তো বার বার বোলছে। টাকা নাই, ঐ কথাই তো কথা! টাকার জন্যই আমরা ধোরেছি! লেখ চিঠি, দেখতে এমন ফুটফুটে দামী দামী কাপড়পরা, মুখেও বেশ টগরা, বার বার বোলছে টাকা নাই। লেখ চিঠি! কারা তোর মুরুব্বী, কাদের কাছে তুই থাকিস, তাদের নামে তুই চিঠি লেখ! খালাসীপণ দশ হাজার টাকা, তোর মুরুব্বীরা আমাদের লোকের হাতে যদি নগদ দশ হাজার টাকা দিতে পারে, তা হোলেই খালাস পাবি, তা না হোলে—হুঁ—হুঁ—হুঁ—"

এই সব কথা বোলতে বোলতে সকলেই এককালে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তলোয়ার নাচালে, বন্দুক নাচালে, রণবেশে যেন ধেই ধেই কোরে নাচতে লাগলো।

ভয়েই আমি আড়ষ্ট। খালাসীপণ দশ হাজার টাকা! হায় হায়! নিশ্চয় প্রাণ গেল! দশ হাজার টাকা! এ টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ হবে? আমার প্রাণের জন্য দশ হাজার টাকা কে দিবে? টাকা না পেলেই ডাকাতেরা আমাকে মেরে ফেলবে! জীবনে হতাশ হয়ে মুখটি বুজে সেইখানেই আমি বোসে থাকলেম, থর থর কোরে কাঁপতে লাগলেম, আর একটিও বাঙনিষ্পত্তি কোল্লেম না ; দারুণ পিপাসায় কণ্ঠ-তালু বিশুষ্ক, একবিন্দু জল চাইতেও সাহস হলো না।

ডাকাতেরা আমাকে ঘিরে আছে ; মাঝে মাঝে ধমক দিচ্ছে, দশ হাজার টাকার জন্য চিঠি লিখে দিতে বোলছে, কোন কথারই আমি উত্তর দিচ্ছি না। লোকেরা আপনাদের ভাষায় কাঁই-মাই কোরে কত কথা বলাবলি কোল্লে, মাঝে মাঝে হো হো রবে হেসে উঠলো। ভয়ে আমি আড়ষ্ট, শরীরে ঘন ঘন কম্প, কম্পের সঙ্গে ঘর্ম্ম।

এইভাবে আমিই আছি, হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। লোকেরাও গোলমাল কোত্তে কোত্তে একে একে বেরিয়ে পোড়লো। আমার হাত-পা বাঁধা, পালাতে পারবো না, তবু তারা ঘরের দরজায় চাবী বন্ধ কোরে দিয়ে গেল। সেই অন্ধকারে সেই ঘরের ভিতর আমি কয়েদ থাকলেম! সঙ্গী কেবল ভয় আর হতাশ।

প্রাণ যাবে! বিদেশে বেঘোরে ডাকাতের হাতে আমার প্রাণ যাবে! খালাসীপণ দশ হাজার টাকা। সে টাকা সংগ্রহ করা আমার অসাধ্য! আর উপায় নাই! কোথায় আমি এসেছি, কোথায় গেলেম, কোথায় আমি থাকলেম, দীনবন্ধুবাবু কিছুই জানতে পাল্লেন না। কতই যে তিনি উতলা হোচ্ছেন, কতই যে অন্বেষণ কোচ্ছেন, কিছুই ঠিক নাই। আকাশ-পাতাল চিন্তা! আমার হৃদয়ের দেবীপ্রতিমা অমরকুমারী! হায় হায়! চোরেরা অমরকুমারীকে চুরি কোরেছে, বহরমপুরে মোকদ্দমা হোচ্ছে, এতদিনে সে মোকদ্দমা কতদূর হলো, কিছুই জানতে পাল্লেম না। গুজরাটের জঙ্গলে ডাকাতের অন্ধকূপে আমি বন্দী, অন্ধকূপে আমার প্রাণ যায়, অমরকুমারী কিছুই জানতে পাচ্ছেন না!

এ জীবনে আর দেখা হবে কি না, তারো কোন নিশ্চয়তা নাই। এই রাত্রের মধ্যে যদি আমার মরণ হয়, তা হোলেও এ যন্ত্রণার হাত আমি এড়িয়ে যাই। মৃত্যুকামনায় পাপ হয় জানি, কিন্তু যন্ত্রণা অসহ্য! এ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাব না, সর্ব্বক্ষণ সেইরূপ হতাশ আমার মনে আসছিল। উদ্দেশে বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ কোল্লেম, সেই নামের সঙ্গে অমরকুমারীর নাম একবার আমার রসনা থেকে পরিস্ফুট উচ্চারিত হলো।

আশ্চর্য্য! ভগবানের নামের কি চমৎকার মহিমা! প্রাণে যারে ভালবাসা যায়, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীরূপে যারে বরণ করা যায়, তার পবিত্র নামেরই বা কি আশ্চর্য্য সঞ্জীবনী-শক্তি! ভগবানের নামে আর অমরকুমারীর নামে অকস্মাৎ আমার সেই তাপিত অন্তরে তৎকালে মঙ্গলময়ী শান্তির আবির্ভাব হলো! সে অন্ধকার কারাকূপে আমি যেন তখন মূর্ত্তিমতী শান্তির অপরূপ প্রতিমা-দর্শন কোল্লেম। প্রতিমা জ্যোতির্ম্ময়ী! ঠিক যেন দেখলেম, একটি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীপ্রতিমা আমার চক্ষের সম্মুখে বিরাজিতা। দেবী যেন কর-পদ্ম-সঞ্চালনে আমাকে অভয় দিলেন। সভয় অন্তরে আমি যেন সাহস পেলেম। অন্ধকার গৃহ অকস্মাৎ যেন জ্যোতির্ম্ময়! গৃহ যেন পদ্মগন্ধে আমোদিত।

কি আশ্চর্য্য! পুরাণশাস্ত্রে আমি পাঠ কোরেছি, সরল অন্তরে সেই মঙ্গলময়কে স্মরণ কোল্লে, আপদ-বিপদ দূরে হয়ে যায়, ঘোর বিপদেও নির্ভয় হওয়া যায়। সত্যই সে কথা। জন্মাবধি আমি কখনো কারো কোন অনিষ্ট করি নাই, উপকার করবার ইচ্ছায় যথাশক্তি নিঃসম্পর্কীয় লোকেরো উপকারের চেষ্টা পেয়েছি; সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর আমার অন্তঃকরণ জানেন, বিপদে পোড়ে আমি ডাকলেম, তিনি শ্রবণ কোল্লেন, আমাকে অভয় দিবার জন্য এই অভয়ামূর্ত্তিকে কারাকূপে পাঠালেন! তবে বোধ হয়, আমি রক্ষা পাব! তবে বোধ হয়, এ বিপদ আমার থাকবে না! হতাশ-প্রাণে আশার সঞ্চার! ভক্তি-ভাবে মনে মনে সেই ভক্তবৎসল ভগবানকে আমি প্রণিপাত কোল্লেম।

জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা-দর্শনে আমি নয়ন মুদিত কোরেছিলেম, এই সময় চেয়ে দেখি কোথাও কিছু নাই! ডাকাতের সেই অন্ধকূপ! যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার! সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমি সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হরিদাস! সে চিরদরিদ্র—চিরনিঃসহায়—জগতের অপরিচিত—নির্ব্বান্ধব সেই অভাগা হরিদাস!

অনুমানে বুঝলেম, রাত্রি দুই প্রহর। সেই সময় কটকটশব্দে দরজার চাবী খুলে কে একজন আমার কারাকূপে প্রবেশ কোল্লে। তার এক হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল, এক হাতে একটা আধার। চেয়ে দেখলেম, স্ত্রীলোক; ডাকাতের আড্ডায় স্ত্রীলোক থাকে, ডাকাতেরা স্ত্রীলোক সঙ্গে কোরে ঘর-সংসার করে, এটাও আমি নূতন বুঝলেম। স্ত্রীলোকটি দরজা ভেজিয়ে ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে মশালটা একধারে রেখে দিলে, হস্তস্থিত আধারটাও আমার সম্মুখে রাখলে; রেখে, ফিক ফিক কোরে হেসে আমার কাছে এসে বোসলো। এক-

বার মাত্র তার মুখের দিকে চেয়ে, আমি মস্তক অবনত কোল্লেম। স্ত্রীলোকের মুখের চেহারা যেন কুলকন্যার মুখের ন্যায়, দুরন্ত ডাকাতের ঘরে এমন সুন্দরী কন্যা থাকে, এটাও অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! স্ত্রীলোক কৃশাঙ্গী, গাত্র অলঙ্কার-বর্জ্জিত, মস্তকের কেশ রুক্ষ রুক্ষ, তথাপি সেই অবয়বে দিব্য লাবণ্য বিদ্যমান। মুখ বিশুষ্ক নয়, একটু হাসি হাসি ; সেই হাসি দেখেই আমার মস্তক অবনত।

স্ত্রীলোকটি চুপি চুপি আমাকে বোল্লে, "এই তোমার খাবার সামগ্রী এনেছি, এইগুলি খাও ; ডাকাতের আড্ডা, এই রকম খাবার এখানে পাওয়া যায়।"

কথাগুলি বেশ মিষ্ট মিষ্ট। মুখখানি উঁচু কোরে আবার আমি সেই স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন কোল্লেম। এইবার ভাবান্তর। সে মুখে আর সে হাসি নাই, বড় বড় চক্ষু-দুটি অশ্রুপূর্ণ। ক্ষণেকের মধ্যেই কেন এরূপ ভাবান্তর, শীঘ্র বুঝতে পাল্লেম না ; কারণ জিজ্ঞাসা না কোরে, আপন অবস্থা-স্মরণে তারে আমি বোল্লেম, এ রকম ছলনা কিসের জন্য ? দেখতেই পাচ্ছ, আমার হাত-দুখানি শৃঙ্খলাবদ্ধ, আমার সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী, এ ছলনা কিসের জন্য ?"

স্ত্রীলোক বোল্লে "শিকল আমি খুলে দিচ্চি, খুলে দিবার হুকুম আছে, তোমার খাওয়া হোলে আবার আমি—"

এই সময় আবার আমি সেই স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাইলেম ; চেয়েই একবার সেই আধারের দিকে নয়ন ফিরালেম। আধারে আছে কি ? দু-খানি আধপোড়া রুটি আর একটি মাটির ভাঁড়ে আধভাঁড় জল। দেখেই আমার ক্ষুধা উড়ে গেল। অত্যন্ত পিপাসা হয়েছিল, স্ত্রীলোকটিকে বোল্লেম, "আবার যদি বেঁধে রেখে যাবে, তবে আর শিকল খুলে কাজ নাই, কিছুই আমি খাব না, দয়া কোরে ঐ ভাঁড়টি তুমি আমার মুখের কাছে ধর, আমি একটু জল খাই।"

"খাও, খাও" বোলে স্ত্রীলোকটি দু-তিনবার অনুরোধ কোল্লে, অনুরোধ বিফল হলো। অগত্যা সে আমার মুখের কাছে সেই জলের ভাঁড়টি তুলে ধোল্লে, আমি একচুমুক জল খেলেম ; তাতেই যেন কত তৃপ্তি। জল খেয়ে একটি নিশ্বাস ফেলে সেই স্ত্রীলোককে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি এখানে কতক্ষণ থাকবে ?"

স্ত্রী।—যতক্ষণ তুমি বলো।

আমি।—সে কি কথা ? আমি যতক্ষণ বোলবো ; ততক্ষণ থাকবে, এ কথার অর্থ কি ? তুমি কে ? এইখানেই কি তুমি থাকো ?

স্ত্রী।—আমি কে ?—তুমি আমারে জিজ্ঞাসা কোচ্চ আমি কে ?—হা অদৃষ্ট ! দেখেও কি কিছু বুঝতে পাচ্চো না ? তোমারো যে দশা, আমারো সেই দশা !

আমি—(সবিস্ময়ে) ভাল বুঝলেম না, স্পষ্ট কোরে বল।

স্ত্রী।—আরো স্পষ্ট শুনতে চাও ?—(কপাটের দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে) আমি এদের শীকার। বনের ভিতর তোমারে যেমন ধোরেচে, আমারেও তেমনি কোরে ধোরে রেখেচে ! আমার সঙ্গে লোক ছিল, পাল্কী ছিল, বনের ভিতর ধরে নাই, বনের বাইরে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলেম, সন্ধ্যা হয়েছিল,

আমার সঙ্গের লোকগ‍ুলিকে মেরে ধোরে তাড়িয়ে দিয়ে কেবল আমারেই এরা কয়েদ কোরে রেখেচে। আটমাস আমি এখানে আছি। হাজার টাকা চায়। হাজার টাকা পেলে ছেড়ে দিবে বলে। আমার গায়ে অলঙ্কার ছিল, তার দাম হাজার টাকার বেশী। তা এরা সব খ‍ুলে নিয়েচে, তা বলে, হাজার টাকা চাই। কোথায় আমি পাবো? কাজেকাজেই কয়েদ আছি! এরা আমারে দাসী কোরে রেখেচে! এদের সর্দ্দার আমার—আমার—ধর্ম্ম—

আমি।—(শিহরিয়া) উঃ! কি নরাধম! সে সর্দ্দার এখন কোথায়?

স্ত্রী।—সর্দ্দার এখানে নাই, শীকারে গিয়েচে। শীকার ব‍ুঝতে পারো? —লোকের যেটা সর্ব্বনাশ, সেইটিই এদের শীকার।

আমি।—সর্দ্দারটা আসবে কখন?

স্ত্রী।—সকল দিন যায় না, যেদিন যেদিন যায়, শেষরাত্রে ফিরে আসে। সর্দ্দার এখানে থাকলে—ডাকাতেরা যে সব কথা বোলছিল, সে সব আমি শ‍ুনেচি। চিঠি লিখতে বোলছিল। সর্দ্দার এখানে থাকলে চিঠিখানা লিখিয়ে নিয়ে তবে ছাড়তো। দশ হাজার টাকা দিতে পারে, সত্য কি তেমন কোন বন্ধ‍ু-লোক এখানে আছেন?

আমি।—আমার বন্ধ‍ু জগদীশ্বর! জগতের বন্ধ‍ু যিনি, তিনি ভিন্ন আমার জীবনের বন্ধ‍ু আর কেহই নাই!

স্ত্রী।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) তবেই তো! আহা! তোমার মতন কতজনকে এরা ধরে, এক একজন টাকা দিয়ে খালাস পায়, এক একজন চাকর হয়ে দলে মিশে যায়, দলে যারা না মেশে কিম্বা টাকা দিতে না পারে, তাদের বেঁধে রাখে, কুকুর দিয়ে খাওয়ায়, না হয় তো প্রাণে মেরে রাতারাতি দরিয়ার জলে ভাসিয়ে দেয়! সত্য কি তোমার উদ্ধার করবার কেহই নাই?

আমি।—কেন থাকবে না? ঐ যে বোল্লেম, জগতের বন্ধ‍ু যিনি, তিনিই আমার উদ্ধারকর্ত্তা।—দীনবন্ধ‍ু, অনাথবন্ধ‍ু, জগবন্ধ‍ু!

স্ত্রী।—(সচকিতে) আর একটি লোক,—তিনি—না বাপ‍ু! আর আমি এখানে দেরী কোরবো না, চোল্লেম, জগবন্ধ‍ু তোমারে রক্ষা কোরবেন!

স্ত্রীলোকটি আর থাকলো না, মশালটা হাতে কোরে নিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে, প‍ুর্ব্ববৎ দ্বারে চাবী দিয়ে চোলে গেল। পোড়া র‍ুটি দ‍ুখানা আমার কাছেই পোড়ে থাকলো। আমি আবার অন্ধকারে ড‍ুবে থাকলেম।

স্ত্রীলোক তবে ডাকাতের মেয়ে নয়। আপন ম‍ুখেই বোলে গেল, 'তোমারো যে দশা, আমারো সেই দশা!' কথা ঠিক! ভদ্রলোকের কন্যা; প্রাণে দয়া আছে; আমার কল্যাণকামনা কোরে গেল। উঃ! পিশাচের প‍ুরী! সর্দ্দার ডাকাতটা এই কন্যাটির ধর্ম্ম নষ্ট কোরেছে! টাকা না পেলে নরহত্যা করে! এ সকল লোকের এই সকল মহাপাতকের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

এই সকল আমি ভাবছি, প্রায় চারিদণ্ডকাল ভাবনাসাগরে ড‍ুবে অন্ধক‍ুপে বোসে আছি, এমন সময়ে আবার দ্বারের বাহিরে কটকট কোরে চাবী খোলার শব্দ। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। এবার আর স্ত্রীলোক নয়, এবার

নিশ্চয়ই ডাকাত! হয় তো সর্দ্দারটাই স্বয়ং! এইবার হয় তো আমার ভাগ্য-ফলের শেষপরীক্ষা।

নিঃশব্দে একটি লোক প্রবেশ কোল্লে; আলো নাই, অন্ধকারেই প্রবেশ কোল্লে। শব্দে বুঝলেম, দরজাটা ভিতরদিকে বন্ধ কোরে দিলে। আন্দাজে আন্দাজে চুপি চুপি আমার দিকে এগিয়ে এলো। অনুভবে বুঝলেম, বোসলো; —সাবধানে মৃদুস্বরে আমারে উদ্দেশ কোরে বোল্লে, "ভয় পেয়ো না, যেমন আছ, ঠিক ঐ ভাবে চুপ কোরে থাকো· কোন ভয় নাই!"

বেশ স্পষ্ট কথাগুলি আমি শুনলেম। স্বরে বুঝলেম, দয়ামিশ্রিত কোমলস্বর। ডাকাত নয়। ডাকাতের কণ্ঠস্বর এরকম হয় না। স্বর আমারে অভয় দিচ্ছে। ধন্য জগদীশ্বর! কোন মহাপুরুষ আমারে অভয় দান করবার নিমিত্ত ডাকাতের অন্ধকূপে উপস্থিত? চুপ কোরে থাকবার আদেশ,—চুপ কোরেই তো আছি, আছি তো সত্য, কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা না কোরেও তো স্থির থাকা যায় না, প্রাণ হাঁইফাঁই কোত্তে লাগলো, মনে মনে অনেক রকম তোলাপড়া কোরে, যা থাকে ভাগ্যে, এইরূপ ভেবে, পূর্ণসাহসে এক-নিশ্বাসে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি কে?"

পূর্ব্ববৎ সতর্কবাক্যে সেই সদয় স্বর আমারে আদেশ কোল্লে, "চুপ! নিস্তব্ধ থাকাই নিরাপদ! কোন ভয় নাই!—আমি—এখানকার ডাকাতেরা যে সকল লোককে ধরে, আমি তাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করি, ডাকাতের সঙ্গে ছদ্মবেশে বেড়াই। একটা নিগূঢ় বিষয়ের অনুসন্ধানে আমি আছি, যত দিন সে কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তত দিন ডাকাতের দলকে ধোরিয়ে দিতে পাচ্ছি না। যে সকল নিরীহ লোক এদের কবলে ধরা পড়ে, সঙ্গোপনে আমি তাদের বন্ধুর কাজ করি, ডাকাতেরা কিছুই জানতে পারে না। তুমি যেই হও, মনে কর, মনে রাখ, তোমারো বন্ধু আমি।"

কথাগুলি আমার কর্ণে যেন অমৃতবর্ষণ বোধ হলো। সত্য সত্য শঠতা কি কপটতা, নিঃসংশয়ে সেটি তখন স্থির কোত্তে না পাল্লেও, ঈশ্বরকে স্মরণ কোরে আমি আশ্বস্ত হোলেম। আশ্বাসের ধর্ম্ম শান্তভাব, আমি তখন শান্তভাবকে হৃদয়ে ধারণ কোরেও কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য দেখালেম; দুর্ণিবার আগ্রহে ধীরস্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোন মহাপুরুষের অভয়বাক্য আমি—"

অন্ধকারে অঙ্গস্পর্শে বাধা দিয়ে সেই স্বর উত্তর কোল্লে, "পরিচয়ের সময় আছে। উতলা হয়ো না। ডাকাতেরা যা তোমারে বোলবে, উত্তর দিয়ো না, ভয় পেয়ো না, সময়োচিত ব্যবস্থা করা আমার ভার, এখন আমি চোল্লেম। পুন-রায় তোমাকে আমি নিশ্চয় কোরে বোলে যাচ্চি, কোন ভয় নাই! কোন ভয় নাই!"

মূর্ত্তি বোসে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। অনুমানে আমি বুঝলেম, দ্বারের নিকটে গিয়ে ধীরহস্তে অর্গল মুক্ত কোরে ঘর থেকে বেরুলেন, তার পর দ্বারে চাবী বন্ধ কোরে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান কোল্লেন।

ইনি কে? যে সব কথা বোলে গেলেন, সেগুলি কি সত্য? কপটতা কোরে আমারে স্তোক দিবার জন্য ঐ সব কথার রচনা, এমনও তো বোধ হোচ্ছে না। কথাগুলি সত্য ডাকাতের দলে কেন আছেন, তিনি নিজেই একটু আভাষ দিয়ে গিয়েছেন। দেবতারা যদি আমার প্রতি সদয় হন, ঐ ছদ্মবেশী লোকটির দ্বারাই আমার উদ্ধার হোতে পারবে, মনে এইরূপ আশা জন্মিল; উদ্দেশে ঈশ্বরকে নমস্কার কোল্লেম।

রজনী প্রভাত। কারাকূপ অন্ধকার। কোন দিকের দেয়ালে একটিও গবাক্ষ ছিল না, দ্বারে পাষাণবৎ সুদৃঢ় সুবৃহৎ কপাট, ছিদ্রপথপরিশূন্য, কোন দিকেই আলো দেখা গেল না। মানুষের কলরবে আর কাননের পক্ষীকুলের ঝংকারে আমি অনুভব কোল্লেম, রজনী প্রভাত। আমার আর প্রভাত-সন্ধ্যায় প্রভেদ কি? প্রভাতে কেহই সে কারাগারে প্রবেশ কোল্লে না, আমি একাকী বোসে বোসে আপন অদৃষ্টের ভাবনা ভাবতে লাগলেম। অনেক বিলম্বে এক-জন লোক এলো। রাত্রিকালে যে সকল লোকের মুখে মুখোস দেখেছিলেম, তাদের মধ্যে কেহ কি না, বুঝতে পাল্লেম না। লোকটার মুখোস মুখে ছিল না, বড় বড় গোঁফদাড়ীযুক্ত ভীষণ বিকট মুখ, মাথার চুলে পৃষ্ঠদেশের অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত ঢাকা; চুলগুলো ঝাঁকড়া ফাঁকড়া, তাম্রবর্ণ; দেখলেই ভয় হয়।

ভয় আমার সহচর; ভয় আমারে বেশী ভয় দেখাতে পারে না; ভয়কে আমি একরকম ঘরপোষা ভেবে নিয়েছি। লোকটাকে দেখে ভয় হলো, কিন্তু সেই লোক আমাকে একটি কথাও বোল্লে না, ইসারায় মুখভঙ্গী কোরে ডাকলে। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় যে ভাবে চলা যায়, সেই ভাবে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। কোন দিকে কি দেখছি, কোন দিকে বাহিরে যাবার পথ, কিছুই জানতে পাচ্ছি না। ইতস্তত আরো জনকত লোক ঠাঁই ঠাঁই বোসে আপনাদের কাজে অন্যমনস্ক ছিল, আমি যখন বেরুলেম, তারা সেইসময় এক একবার ঘূর্ণিত-নয়নে আমার দিকে চেয়ে দেখলে, চেয়েই আবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। দিনের বেলায় এরা মুখোস পরে না, খোলামুখে থাকে; তাদেরো মুখে তখন মুখোস ছিল না। রেতের বেলা মুখোস পরে, এটাইবা কি রকম? বোধ হয়, আপনাদের আড্ডা বোলেই নির্ভয়। সবগুলো খোলামুখ আমি দেখলেম।

যে লোক আমারে সঙ্গে কোরে এনেছিল, তার ইঙ্গিতে আমি একটা অন্যঘরে প্রবেশ কোল্লেম। লোক আমার হাতের হাতকড়ী খুলে দিলে। একটু স্বাধীনভাবে সেইখানে আমি নিত্যক্রিয়াদি সমাপ্ত কোল্লেম, ঘরের একধারে বড় বড় গামলায় জল ছিল, স্নান কোল্লেম; শরীর একটু স্নিগ্ধ হলো। বন্দীর আবার স্নান! গায়ের জল গায়ে থাকলো, মাথার জল দরদরধারে গায়ে পোড়তে লাগলো, ভিজে কাপড়েই আমি কাঁপতে লাগলেম। স্নানের অগ্রে গায়ের জামাগুলি খুলে রেখেছিলেম, সিক্তবস্ত্রের উপর সিক্তগাত্রে সে জামা-গুলি গায়ে দিলেম। লোক আমারে সঙ্গে কোরে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। কোনদিকেই রৌদ্র দেখতে পেলেম না, ভূগর্ভ-গহ্বরে রবিকর প্রবেশ

করে না, কেবল অল্প অল্প আলো হয়, এইমাত্র বুঝা যায়। বেলা কত, নির্ণয় করবার উপায় ছিল না, লোক আমারে সেই ঘরে রেখে, দ্বারে চাবী দিয়ে অন্যদিকে চোলে গেল। অনুগ্রহের মধ্যে কেবল এই থাকলো, আমার হাত-দুখানি বেঁধে রেখে গেল না। আর একটি অনুগ্রহের কথা বলি। বার বার আমি বোলেছিলেম, আমার সঙ্গে টাকা নাই ; কথায় তাদের বিশ্বাস হয়েছিল কি না হয়েছিল, বোলতে পারি না, কিন্তু তারা আমার অঙ্গবস্ত্র অন্বেষণ করে নাই। পকেটে দুটি পিস্তল ছিল, তাও তারা জানতে পারে নাই।

ক্ষণকাল পরেই দ্বার উদ্ঘাটিত। সেই স্ত্রীলোক। রাত্রে যে স্ত্রীলোকটি আমারে রুটী দিয়ে গিয়েছিল, কতক কতক আত্মপরিচয় প্রকাশ কোরেছিল, সেই স্ত্রীলোক।

সেই রকম আধপোড়া রুটি, সেইরকম জলের ভাঁড় সেই স্ত্রীলোকের হস্তে ছিল, "খাও খাও" বোলে আমার সম্মুখে ধোরে দিলে। বিগ্রহের কাছে ভোগ দেওয়া যে প্রকার, ডাকাতের আড্ডায় আমার সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী ধরাও সেই-প্রকার। একবার চেয়ে দেখলেম মাত্র, খেলেমও না, স্পর্শও কোল্লেম না। স্নানের পূর্ব্বে পিপাসা ছিল, স্নানান্তে সে পিপাসারও শান্তি হয়েছিল, জলের ভাঁড়ের দিকে একবার চাইলেম, ছুঁলেম না ; ভাঁড়ের জল, ভাঁড়েই থাকলো।

রাত্রে মশালের আলো থাকলেও স্ত্রীলোকের মুখখানি আমার ভাল কোরে দেখা হয় নাই, এই সময় দেখলেম ; অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে ভাল কোরে দেখলেম। হঠাৎ আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হলো! এই স্ত্রীলোককে কোথায় যেন আমি দেখেছি, এই ভাব মনে পোড়লো। বেশীদিন দেখি নাই, দূরে থেকে একবারমাত্র দেখা, এইরূপ যেন অনুমান কোল্লেম। এ স্ত্রীলোক গুজরাটে কেমন কোরে এলো, কেনই বা এসেছে, অনুমান কোত্তে পাল্লেম না। রাত্রে শুনেছি, স্ত্রীলোক বোলেছে, সঙ্গে লোকজন ছিল পাল্কী ছিল, গায়ে গহনা ছিল, কথাগুলি মিথ্যা বোধ হয় না, কিন্তু কারা সেই সব লোকজন?

স্বপ্নের ন্যায় একটু একটু মনে কোত্তে লাগলেম, নিঃসংশয় হোতে পাল্লেম না। পরিচয় দিতে দিতে অর্দ্ধোক্তিতে স্ত্রীলোক একবার বোলেছিল, "ডাকাতের সর্দ্দার আমার—ধর্ম্ম—" স্ত্রীলোকের মুখ দেখে দেখে, সেই অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যই আমার মনের উপর তখন যেন বেশী আধিপত্য কোত্তে লাগলো।

মনের ভাব মনের ভিতর গোপন কোরে স্ত্রীলোককে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমাদের সেই সর্দ্দারটি কত রাত্রে ফিরে এসেছে?"

স্ত্রী।—আসে নাই। মাঝে মাঝে তার এইরকম হয়। যে রাত্রে শীকার ধোত্তে পারে না, সে রাত্রে ফিরে আসে না। চেষ্টা নিষ্ফল হোলে দু-তিন রাত্রি আসে না। আরো কোথায় কি তার কাজ আছে, পরমেশ্বর জানেন, সেই সব কাজেই মাঝে মাঝে তার অনেক সময় যায়।

আমি।—আটমাস তুমি এখানে আছ, এই আটমাসের মধ্যে তার অপরাপর কার্য্যের কোন সূত্রই কি তুমি জানতে পার নাই?

স্ত্রী।—তা আমি কেমন কোরে জানবো? ডাকাতের কাজ ডাকাতী করা। এখানকার ডাকাতেরা কেবল দল বেঁধে বেঁধে লোকের বাড়ী বাড়ী ডাকাতী কোরে বেড়ায় না; বনের ধারে রাস্তার ধারে ওৎ কোরে থেকে, সুবিধামত শীকার পেলেই ধোরে ফেলে। এই,—আমারে যেমন ধোরেচে, তোমারে যেমন ধোরেচে, সেইরকমই শীকার ধরে। তা ছাড়া আরো কতরকম শীকারধরা ফন্দী আছে, কে বোলবে?

আমি।—আচ্ছা, সর্দ্দার তোমারে এখানে আটক কোরে রেখেছে, সে যখন উপস্থিত থাকে না, তখন অন্য ডাকাতেরা তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে?

স্ত্রী।—(লজ্জায় নতমুখী হইয়া) ও কথা কেন তুমি জিজ্ঞাসা কোচ্চো? ডাকাতদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ডাকাতেরাই জানে, আমার সঙ্গে অন্য ডাকাতের কথা-বার্ত্তা হয়, এক একজন ডাকাত হাসি-তামাসাও জোড়ে, সর্দ্দারের ভয়ে—ধর্ম্মের ভয়ে নয়, সর্দ্দারের ভয়ে কেহ কিছু বোলতে পারে না।

আমি।—হাঁ, বুঝলেম. ডাকাতের আড্ডায় তুমি আছ, আটমাস আছ, যাদের সঙ্গে তুমি এসেছিলে, ডাকাতেরা সকলকেই কি মেরে ফেলেছে? একজনও কি বেঁচে নাই?

স্ত্রী।—তা হয় তো থাকতে পারে। পথে যখন যুদ্ধ হয়, তখন দুই এক-জন পালিয়ে গিয়েছে, তা আমি দেখেচি।

আমি।—তবে?—তারা কি তোমার অন্বেষণ করে না? এই আটমাসের মধ্যে তারা কি তোমার উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করে নাই?

স্ত্রী।—প্রাণের ভয় সকলেরই আছে। বাঘের ঘরে আমি রোয়েচি, ক্ষুদ্রপ্রাণে বাঘের ঘরে প্রবেশ কোত্তে কার তেমন সাহস হবে?

আমি।—হাঁ, সে কথা সত্য, কিন্তু দেশ তো অরাজক নয়, কোন উপায়ে—কোন কৌশলে রাজ-দরবারের সংবাদ দিলেও তো—

স্ত্রী।—রাজ-দরবার? রাজাকে এরা গ্রাহ্য করে না! রাজাও এদের নামে ভয় পান! একটি লোক—না বাপু!—সেই কথাই বার বার আমার মনে পড়ে, সে কথা আমি বোলবো না; বলি বলি মনে করি, ভয় হয়।

আমি।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি, তুমি তো গুজরাটি মেয়ে নও, চেহারাতেও দেখছি, কথা শুনেও জানতে পাচ্ছি, তুমি বাঙালী। আচ্ছা, বোলতে যদি কোন বাধা না থাকে, সত্য কোরে আমাকে বল দেখি, কোন দেশে তোমাদের বাড়ি?

স্ত্রীলোকটি বোসে ছিল, আমার ঐ প্রশ্ন শুনেই অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালো; তাড়াতাড়ি বোল্লে, "খাও তো খাও, আর আমারে বোসিয়ে রেখো না; ও সব কথার উত্তর দিতে আমি পারবো না! বাড়ী কোথায়, ঘর কোথায়, জম্মো কোথায়,

সে সব খবর আর কেন ? সে সব কথা শুনলে আমার কেবল কান্না পায় ! ধর্ম্ম-কর্ম্ম যখন জলাঞ্জলি হয়ে গিয়েছে, তখন আর ও সকল খবরে কি ফল ? খাও তো খাও, আমি চোল্লেম।”

ঊর্দ্ধমুখে আমি চেয়ে দেখলেম, সত্যই অভাগিনীর চক্ষে জল এসেছে। সে প্রসঙ্গ আর আমি উত্থাপন কোল্লেম না, আর তার মুখের দিকে না চেয়েই মৃদুস্বরে বোল্লেম, “কিছুই আমি খাব না, এ সকল তুমি নিয়ে যাও।”

সজলনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে স্ত্রীলোকটি বোল্লে, “না খেয়ে কি রকমে বাঁচবে ? কত দিন যে এখানে কষ্টভোগ কোত্তে হবে, তাই বা কে বোলতে পারে ? কিছু খাও। রাত্রে বরং আমি খানকতক ভাল রুটি এনে দিব, এখন দু-একখানি এই রুটি খেয়ে একটু জল খাও ; না খেলে বাঁচবে কেন ?”

সে সব কথা আমি শুনলেম না, কিছুই খেলেম না, জল-রুটি সেইখানে ফেলে রেখে স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেল, দস্তুরমত কপাটে চাবী পোড়লো।

যে ঘরে এখন আমি আছি, এটা নূতন ঘর ; দেয়ালের দুই ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই তিনটি ছিদ্র, সেই সকল ছিদ্রে অল্প অল্প আলো আসে, অল্প অল্প হাওয়া আসে, একটু আরামে নিশ্বাস ফেলা যায়। ছিদ্রগুলি কিছু উচ্চে উচ্চে অবস্থিত ; সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত মানবদেহ বাহু উত্তোলন কোরে সেই সকল ছিদ্রপথ স্পর্শ কোত্তে পারে না, তথাপি একটু আরাম পায়। সেই ঘরে আমি বোসে আছি, ডাকাতেরা কেহই আসছে না। খালাসী টাকার জন্য চিঠি লিখে দিতে হবে, টাকা না পেলে তারা আমাকে ছেড়ে দিবে না। কার নামেই বা চিঠি লিখবো ? কারেই বা আমি চিনি ? দীনবন্ধুবাবু দয়া কোরে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমার খালাসের জন্য ডাকাতকে তিনি দশ হাজার টাকা দিবেন, এমন তো কিছুতেই সম্ভব বোলে বোধ হয় না, তেমন আশাও করা যায় না ; তাঁরে আমি এ কথা লিখতেই পারবো না। পরমেশ্বর যদি রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা হবে, না হয় তো এইখানেই প্রাণ যাবে। ডাকাতেরা যদি মারে, তা হোলেও প্রাণ যাবে, তারা যদি না মারে, অনাহারেই মারা যাব, এই আমার তখনকার সিদ্ধান্ত।

বেলা হোচ্ছে, বেলা যাচ্ছে, সংস্কারবশে বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু বাস্তবিক কত বেলা, সেটা ঠিক জানতে পাচ্ছি না। নিষ্কর্ম্মা বোসে বোসে ছিদ্রপথে চেয়ে আছি, মন কিন্তু চিন্তাশূন্য নয়। চিন্তা অনেক প্রকার, তার উপর নিজের প্রাণরক্ষার চিন্তা। সকল চিন্তাকে অতিক্রম কোরে আড্ডার ঐ স্ত্রী-লোকটির চিন্তা তখন আমারে কিছু অধিক চঞ্চল কোরে তুল্লে। কে এই স্ত্রীলোক ? কোথাকার স্ত্রীলোক ?

কে ঐ স্ত্রীলোক ? পূর্ব্বে কোথায় তারে আমি দেখেছি ?—দেখেছি নিশ্চয়, কিন্তু কোথায় ? যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এ জীবনে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের কথা মনে আছে। তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্ত্তা চোলেছে, তাদের চেহারা যেন, নিত্য সর্ব্বক্ষণ আমার চক্ষের কাছে উপস্থিত

হয়। এ স্ত্রীলোকটিকে সে ভাবে আমি দেখি নাই, কেমন যেন নূতন নূতন মনে হয়। এখানে দেখলেম নূতন, গত রাত্রে ভেবেছিলেম নূতন, আজ মনে হচ্ছে, পূর্ব্বের দেখা ; কিন্তু কোথায় ?

দিনমানের মধ্যে মনে আনতে পাল্লেম না। সন্ধ্যা সমাগত। দেয়ালের ছিদ্র-পথে একটু একটু আলো আসছিল, সে আলো তিরোহিত ; সেই লক্ষণেই জানতে পাল্লেম, সন্ধ্যাকাল। আমি কয়েদী। ডাকাতেরা আমার উপকারের জন্য ঘরে আলো জেবলে দিবে না, আলো আমি চাইও না, ভাগ্য যখন অন্ধ-কার, তখন এ জায়গায় অন্ধকারে থাকাই ভাল ; অন্ধকারেই আমি থাকলেম। চঞ্চলা চিন্তা অন্ধকারে একটু যেন শান্তভাব ধারণ করে। স্ত্রীলোকটি কে, সেই চিন্তা সেদিন আমার প্রধান হয়েছিল, স্থির কোত্তে পাল্লে তাদৃশ ফল কিছুই হবে না, তাও বুঝতে পেরেছিলেম, তবু কিন্তু সেই চিন্তা প্রধান।

অনেক ভাবলেম। অন্ধকারকে জিজ্ঞাসা করি, কে ঐ স্ত্রীলোক ? অন্ধকার উত্তর দেয় না ; শূন্যকে জিজ্ঞাসা করি, কে ঐ স্ত্রীলোক ? শূন্য উত্তর দেয় না ; বাতাসকে জিজ্ঞাসা করি, কে ঐ স্ত্রীলোক ? বাতাস উত্তর করে না। তাদের কাছে উত্তর পাওয়া গেল না। মনের প্রতিই বারম্বার প্রশ্ন। মন আমার প্রাণের সঙ্গে কথা কয়। মনের কাছেই উত্তর পেলেম। ঠিক—ঠিক—ঠিক !—কাশীরাম !

এই বটে সেই ! এই সেই কুল-কলঙ্কিনী। কাশীর রসিক পিতুড়ীর বাড়ীতে কুমারী-ভোজন হোতে যে যুবতী ব্রতবতী হয়েছিল, এই সেই ব্রত-বতী ! বীরভূমের কানাইবাবুর পরিবার ! কি সম্পর্কে পরিবার, পাঠকমহাশয় সে তত্ত্ব অবগত আছেন। পরিবারটি কানাইবাবুর মাতুল-কন্যা ! এই কলঙ্কিনী অম্লানমুখে আমার কাছে বোলে গেল, ডাকাতের সর্দ্দার তারে দাসী কোরে রেখেছে, একটু লজ্জা জানিয়ে ধর্ম্ম-কথাটাও প্রকাশ কোচ্ছিল, স্পষ্ট আভাষও দিয়েছিল, বোলতে বোলতে থেমে গেল। যাদের ইহকাল নাই, পরকাল নাই, তাদের এই রকম দশা হওয়াই ধর্ম্মের ইচ্ছা। কিন্তু এ কলঙ্কিনী গুজরাটে কেন এসেছিল ? প্রেমের নায়ক কানাইবাবু। বীরভূমে সুবিধা হলো না, কলিকাতায় নিরাপদ হোলেন না, কাশীর তুল্য পতিতপাবন পীঠ-স্থানেও বোধ হয় ধরা পড়বার ভয় হয়েছিল, সেই জন্যই কি কানাইবাবু এই পরিবারটিকে নিয়ে গুজ-রাটে এসেছিলেন ? তাই বোধ হয় সত্য। এত দূরদেশে এসেও কানাইবাবু এই পরিবারটিকে রক্ষা কোত্তে পাল্লেন না ; ডাকাতেরা কেড়ে নিলে ! কানাইবাবু গেলেন কোথা ? ডাকাতেরা কি তাঁকে খুন কোরেছে ? তা যদি হয়, প্রায়শ্চিত্ত ঠিক হয় নাই। তাদৃশ পাপে এ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত জন-সাধারণের শিক্ষাস্থল হয় না। দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে সেই প্রকারের পাপীরা যদি ইহ-সংসারে নিরন্তর কষ্টভোগ করে অথবা ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে প্রাণ হারায়, তা হোলেই ঠিক হয়।

মনে মনে এইগুলিই আমি ভাবলেম। সত্য নির্ণয় কোত্তে পেরেছি কি না, সেই স্ত্রীলোক যদি আবার আজ রাত্রে আমার খাবার দিতে আসে, ইঙ্গিতে কৌশলে জিজ্ঞাসা কোরে জানবো, এইটি তখন স্থির কোরে রাখলেম।

ডাকাতের সর্দ্দার ফিরে আসে নাই। গত রাত্রে অভাবনীয়রূপে যিনি আমার কারাকূপে প্রবেশ কোরেছিলেন, বন্ধুভাবে কথা কোরেছিলেন, আজ যদি তিনি আসেন, তা হোলে তাঁরে আমি রক্ষাকর্ত্তা পিতা বোলে তাঁর কাছে কৃপা ভিক্ষা কোরবো।

ইংরেজী বড়দিনের পর একটু একটু দিন বাড়ে, চৈত্রমাসে দিবা-রাত্রি সমান হয়, তার পর ক্রমশঃ দিন দীর্ঘ, রাত্রি খর্ব্ব। আমি গুজরাটের ডাকাতের অন্ধকার কারাগারে। কখন দিন হয়, কখন রাত হয়, দিন বড়, কি রাত বড়, সেটা স্থির করবার উপায় নাই ; রাত-দিন আমার পক্ষে সমান। অন্ধের যেমন দিবারাত্রিজ্ঞান থাকা অসম্ভব, আমারও প্রায় সেইরূপ। কয়েদ থাকা যে কি যন্ত্রণা, কয়েদীরাই তা জানে। তার মধ্যেও—আমার অবস্থার সঙ্গে মিলনে, তার মধ্যেও অনেকটা প্রভেদ। রাজ-কারাগারের কয়েদীরা অপরাধী, তাদের কারা-যন্ত্রণা অনিবার্য্য, সেটা তারা বুঝে ; আমি নিরপরাধ, রাজ-কারাগারের পরিবর্ত্তে ডাকাতের কারাগারে আমি বন্দী ; সাধারণ কয়েদীর যন্ত্রণা অপেক্ষা আমার যন্ত্রণা সহস্রগুণে অধিক। সময়টা দীর্ঘ বোধ হয়, কিন্তু রাত-দিন কোথা দিয়ে চোলে যায়, কখন যায়, কখন আসে, সেটা আমি কিছুই জানতে পারি না।

যখন আমি এই সকল ভাবছি, তখন রাত্রি কত, তাও আমি জানি না। বাহিরে দরজাখোলার শব্দ হলো ; মশালহস্তা পাত্রহস্তা সেই স্ত্রীলোকটি প্রবেশ কোল্লে। বেশ সাবধান। মশালটি যথাস্থানে রেখে, সাবধানে সেই স্ত্রীলোক এক হস্তে দরজাটা খুব চেপে ভেজিয়ে দিলে, তার পর হস্তের পাত্রটি আমার সম্মুখে নামিয়ে ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বোসলো। আমি তখন দেখলেম, তার বদন দিব্য গম্ভীর। পূর্ব্বে দুইবার প্রকৃতিতে যেমন একটু একটু চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল, এ রাত্রে সে চাঞ্চল্য ছিল না। বারাণসী শাড়ীপরা, গললগ্নবসনা, কাশীর কুমারী-পূজায় ব্রতবতী অবস্থায় মুখের যেরূপ শান্তভাব ছিল, আজ রাত্রেও যেন সেই ভাব ; তফাতের মধ্যে মুখখানি কিছু কাহিল, কিছু শুষ্ক শুষ্ক।

অগ্রে আমি কথা কোইলেম না। অল্পক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে, ধীরস্বরে স্ত্রীলোক বোল্লে, “আজ আমি তোমার জন্যে ভাল ভাল রুটি এনেছি, গুড় এনেছি, খাও। দুদিন কিছু খাও নাই, না খেয়ে বাঁচবে কিরূপে ?—খাও !”

আমি।—(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বাঁচবো ?—বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই কি এরা আমাকে ধোরেছে ? বাঁচায় আর আমার দরকার নাই !

স্ত্রী।—(বিস্ময়ে) ও কি কথা বলো ? এই ছেলেমানুষ তুমি, এই কোমল শরীর, তোমার মনে এতো নিরাশা ? বাঁচার দরকার নাই ! অমন কথা কি বোলতে আছে ? এই দেখো না কেন, আমারেও তো এরা ধোরে এনেচে, ধোরে এনে আটক কোরে রেখেচে, কষ্ট অনেক পাচ্চি বটে, তবু তো আমি খাচ্চি, শুচ্চি, বেড়াচ্চি, বেঁচে রোয়েচি, অমন কথা তো আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না !

আমি।—(চিন্তা করিয়া) তুমি বেঁচে রয়েছ, খাচ্ছ, শুচ্ছ, বেড়াচ্ছ, তোমার

মনে একটু সুখ আছে ; আমার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। যারা কয়েদ থাকে, তারা চোর-ডাকাত, খুনে বদমাস। কোন দোষে দোষী আমি নই, বিনা দোষে আমার ভাগ্যে এই কারাযন্ত্রণা! এ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাব কি না, তাও আমি জানি না ; তবেই ভাব দেখি, এই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য কোরে বেঁচে থাকতে কি ইচ্ছা হয়? জগতের জীবের জীবনদাতা যিনি, তাঁর সেই পবিত্র নাম স্মরণ কোরে অনাহারে তাঁর দত্ত জীবন তাঁরেই আমি ফিরিয়ে দিব ; কিছুই আমি খাব না!

স্ত্রী।—(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ বড় অস্থির হোচ্চে! দোষ তুমি কর নাই, দোষী লোকেরাই বিনা দোষে তোমারে ধোরেচে. এটাও এক রকম প্রবোধ বোলে মনে হয়, তাই কেন তুমি ভাবো না! পরমেশ্বরের বিচারে দোষীলোকের সাজা হয়, নির্দ্দোষীর সাজা হয় না ; আমার মনে নিচ্চে, শীঘ্র তুমি খালাস পাবে; পরমেশ্বর তোমারে রক্ষা কোরবেন!

আমি।—(চমকিত হইয়া) আমিও ইচ্ছা করি, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! পরমেশ্বরে তোমার ভক্তি আছে, শুনেও আমি তুষ্ট হোলেম। (পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া) আচ্ছা, একটি কথা তোমারে আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই। আজ দিনের বেলা যখন তুমি এসেছিলে, তখনি জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হয়েছিল, সন্দেহ ভেবে চুপ কোরে ছিলেম। কিছু মনে কোরো না তুমি, দোষের কথা কিছুই নয়, জিজ্ঞাসা কোরবো ; ঠিক উত্তর পাব কি?

স্ত্রী।—(ম্লানমুখে শান্তনয়নে চাহিয়া) কি জিজ্ঞাসা কোত্তে চাও, কর, যদি আমার জানা থাকে, যদি উত্তর দিবার হয়, অবশ্যই উত্তর দিব। কি কথা তোমার?

আমি।—(পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই) বীরভূমে কি তুমি কখনো ছিলে?

ওঃ হরি!—অকস্মাৎ এ কি মূর্ত্তি! প্রশ্ন শ্রবণমাত্রেই সেই স্ত্রীলোক অকস্মাৎ চমকিয়া বিস্তৃত-নয়নে আমার মুখের দিকে স্থির হয়ে চেয়ে রোইলো! পলক পড়ে না! একে সেই চক্ষুদুটি খুব বড় বড়, এই সময় আমার চক্ষে যেন আরো বড় বড় বোধ হোতে লাগলো! স্ত্রীলাক যেন পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলা! ভাব দেখে যেন আমি মনে কোল্লেম, ঠিক—ঠিক—ঠিক!—আমার অনুমান তবে নিশ্চয়ই ঠিক!—সত্য না হোলে এ মূর্ত্তির এ ভাব কেন হবে? এমন কোরে চোমকেই বা কেন যাবে? মনে এইরূপ ঠিক অবধারণ কোরে. দুই কথায় আমি পুনঃ প্রশ্ন কোল্লেম, "কৈ, উত্তর দিলে না?"

স্ত্রী।—(সেই রকমে চাহিয়া) কোন কথার উত্তর দিব? বীরভূম?—বীর-ভূমের কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কোচ্চো?

আমি।—বীরভূমে আমি একবার গিয়েছিলেম। সেইখানে—

কথা বোলতে বোলতে চেয়ে দেখলেম, স্ত্রীলোকের মুখের চক্ষের সে ভাব আর নাই! শুষ্কমুখ অকস্মাৎ রক্তবর্ণ, বিশালনয়নে অকস্মাৎ কপোলবাহিনী জলধারা! অবধারণের উপায় অবধারণ যদি স্বভাবসঙ্গত হয়, সেই দ্বিগুণ অবধারণ আমার চিত্তকে প্রদীপ্ত কোরে তুল্লে। আমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম, "বীরভূমের নাম শুনে, তোমার চক্ষে—"

আর জিজ্ঞাসা করা হলো না। সহসা কারাদ্বার উদ্ঘাটিত ; একমূর্ত্তির

দ্রুত প্রবেশ। মুখে মুখোস, কিন্তু চক্ষু বেশ দেখা যায়। দ্বারে চাবী বন্ধ ছিল না, তা দেখেই সেই মূর্ত্তির সন্দেহ বিস্ময় একত্র হয়েছিল, চক্ষের ভাব দেখে সেইটিই আমি অগ্রে স্থির কোল্লেম ; দ্বার আবৃত কোরে দিয়ে সেই নব-প্রবিষ্ট মূর্ত্তি মুখোস ঢাকা মুখখানা ইতস্ততঃ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন কোত্তে লাগলো ; আমার সমীপবর্ত্তিনী স্ত্রীলোকের উপর সেই দৃষ্টি নিপতিত হলো ; বিস্ময় প্রকাশ কোরে মূর্ত্তিটি—সেই লোককে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি রে রঙ্গিণি! এখানে বোসে বোসে তুই কিসের গল্প কোচ্চিস ? শীকারের সঙ্গে গল্প ? রূপের চটক দেখে ভুলে গিয়েছিস বুঝি ? আসুক তোর সর্দ্দার আগে, সব ভুর আমি ভেঙ্গে দিব!"

রঙ্গিণী আর বোসে থাকতে পাল্লে না, চক্ষের জল মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় কোরে কাতরস্বরে বোলতে লাগলো, "দোহাই তোমার!—দোহাই তোমার ভূষণলাল. সে সব কথা কিছুই নয়, ছেলেটি দুদিন কিছুই খায় না, তাই জন্যে ত তুমি এখন এসেচো, তোমার তলোয়ারখানা চকমক কোচ্চে. তলোয়ার দেখেই ভয়ে ভয়ে খাবে এখন! আমি তবে—তবে—"

বোলতে বোলতে মূর্ত্তির দিকে একবার চেয়ে চক্ষু ঘুরিয়ে আমার দিকে চাইতে চাইতে স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি কপাট খুলে বেরিয়ে গেল ; দ্বারে চাবী দিবার প্রয়োজন হলো না ; পূর্ব্ববৎ ভেজিয়ে রেখেই চোলে গেল। ঘরে তখন সেই মূর্ত্তি আর আমি।

মশাল জ্বোলছিল। ঘরে বেশ আলো। মূর্ত্তি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ডাকাত এসেছে, অন্তরে অন্তরে আমার কাঁপুনী ধোরেছে ; রঙ্গিণী বোলে গেল, তলোয়ার চকমক। সত্যই সেই মূর্ত্তির হস্তে খাপখোলা সুশাণিত সুদীর্ঘ তলোয়ার। রঙ্গিণী তো পালালো এইবার আমার পালা! না জানি, আমার কপালে কি ঘটে!

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই মূর্ত্তি সেই তলোয়ারখানি কোষবদ্ধ কোরে দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে রাখলে, মশালটা যেখানে জ্বোলছিল, সেইদিকে একটু একটু এগিয়ে এগিয়ে চোল্লো। ঠিক আমি সেইদিকে চেয়ে আছি। মূর্ত্তি চোলেছে ; চোলতে চোলতে আপনার মুখে একবার হাত দিলে ; দৈবের কর্ম্ম, সেই সময় তার মুখের মুখোসটা হঠাৎ অসাবধানে খোসে পোড়ছিল, বুক পর্য্যন্ত আসতে আসতেই অধিকারী ব্যস্তভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চঞ্চল-হস্তে পুনর্ব্বার সেই মুখোসে মুখখানা ঢেকে ফেল্লে, বড় বড় ফুৎকার দিয়ে জ্বলন্ত মশালটা নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। তখন আমি বুঝলেম, মুখে মুখোস থাকলে ফুৎকার দেওয়া যায় না, সেই জন্যই মুখোসধারী হয় তো মুখোসটা একটু সোরিয়ে দিবার চেষ্টা কোচ্ছিল, সেই চেষ্টাতেই মুখোসটা খুলে যায়, আসল মূর্ত্তি প্রকাশ পায় ; দীর্ঘ মূর্ত্তি সুপ্রকাশ।

এই লোকটি কি ডাকাত ? কি আশ্চর্য্য! আহা! কি চমৎকার রূপ! মুখখানি আমি দেখেছি ; যদিও অতি অল্পক্ষণ মাত্র দেখা, তবু কিন্তু দেখেছি, বেশ পরিস্কার দেখেছি ; কি চমৎকার মুখ! যেমন সুন্দর গৌরবর্ণ. তেমনি

সুন্দর মনোহর লাবণ্য, দিব্য দীর্ঘ দীর্ঘ সমুজ্জ্বল চক্ষু, দিব্য লোমযুক্ত টানা ভ্রূ, ললাট প্রশস্ত, নিটোল ; সেই ললাটের উভয়পার্শ্বে কুঞ্চিত কুঞ্চিত সুচিক্কণ কেশ, কর্ণমূলে সুশোভন জুলপী ; সুদীর্ঘ নাসিকা, নাসিকার নিম্নভাগে ওষ্ঠের উপর নবীন গোঁফের রেখা ; ওষ্ঠাধর তরুণ অরুণের ন্যায় আলোহিত ; চিবুকখানি কিছু খৰ্ব্ব ; পরম সুন্দর মুখমণ্ডল ; মুখে যেন গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বীরগর্ব্ব সুপ্রকাশ ! এমন সুপুরুষ কি ডাকাত হয় ?—না না, ডাকাত নয় ! তবে কে ?—তবে কি ? ডাকাতের দলে এ মূর্ত্তি কেন ?

মনে এই রকম তোলাপাড়া কোচ্ছি, সেই লোকটি সেই অন্ধকারে আমার কাছে এসে বোসলো। না না, ইতরজ্ঞানে সম্ভাষণ করা হবে না, ডাকাত নয় ; লোকটি আমার কাছে এসে বোসলেন। পূর্ব্বে আমার যতটা ভয় হয়েছিল, চেহারা মনে কোরে ততটা ভয় আর থাকলো না। কে ইনি, মনে মনে কেবল সেই তর্ক। রঙ্গিণী বোলে গেছে, ভূষণলাল ; এই লোকটির নাম তবে ভূষণলাল। নামটিও দিব্য-সুন্দর। গুজরাটি নাম ; বুঝতে পাচ্ছি, ইনি গুজরাট নিবাসী। ইনি আমারে ভয় দেখাবেন না, মনে মনে এইরূপে বিশ্বাস আসতে লাগলো।

ভূষণলাল আমার কাছে বোসে সতর্কস্বরে প্রথমেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হে ছোকরা ! তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ ?"—প্রশ্ন শুনেই আমি ভাবলেম, মুখোসখোলা মুখখানি আমি দেখেছি, সেটি হয় তো ইনি জানতে পেরেছেন, সেইজন্যই হয় তো ঐরূপ প্রশ্ন। আবার ভাবলেম, তাই বা কিরূপে সম্ভবে ? আর তো কখনো সে চেহারা আমি দেখি নাই, মুখখানি আমার পূর্ব্বের চেনা নয়, চিনতে পারার প্রশ্নটা তবে কিরূপে সঙ্গত হোতে পারে ? মুখখানি আমি দেখেছি, তা হয় তো ইনি জানতে পারেন নাই, ডাকাত মনে কোরেই আমি বোসে আছি ; দশজন ডাকাত কাল রাত্রে একত্র হয়েছিল, ইনিও তাদের মধ্যে একজন, তাই হয় তো আমি ভেবে নিয়েছি, এইরূপ মনে কোরেই হয় তো ঐরূপ প্রশ্ন । মনের ভিতর আমার এই প্রকার তর্ক-বিতর্ক ; উত্তর দিবার আমার ইচ্ছা হলো না, কাজেই আমি নিরুত্তর।

আমাকে নিরুত্তর দেখে, ভূষণলাল পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "চুপ কোরে রইলে কেন ? কথা কও ; চুপি চুপি কথা কও। তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ ? গত রাত্রে আমি এসেছিলেম, ভয় নাই বোলে অভয় দিয়েছিলেম, মনে হয় ? এখনো বোলছি, ভয় নাই। কথা কও ; নির্ভয়ে মনের কথা বল। যা তুমি আমাকে দেখছো, তা আমি নই। আমি তোমার বন্ধুলোক।"

ধন্যবাদ দিয়ে সাগ্রহ আনন্দে আমি বোল্লেম, "আপনি মহাপুরুষ, আমি বুঝতে পেরেছি। ডাকাতের দলে আপনি আছেন, আপনার কোন প্রকার সদভিসন্ধি আছে, গত রজনীতে ইঙ্গিতে সেই কথা আপনি আমাকে বোলে-ছিলেন, ইঙ্গিতটি অতি জটিল, সেটি আমি বুঝতে পারি নাই। পরমেশ্বর করুন আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হোক। আপনি আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা

কোচ্ছেন, এখানে আর আমার মনের কথা কি থাকতে পারে? আশা কেবল মুক্তিলাভ। আপনি আমাকে অভয়দান কোচ্ছেন, তাতেই আমি চরিতার্থ হয়েছি ; আপনার প্রসাদে আমি এই নরককুন্ড থেকে মুক্ত হোতে পারবো, আশা আমাকে এইরূপ উল্লাস বিতরণ কোচ্ছে।"

আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে ছদ্মবেশী ভূষণলাল পুনর্ব্বার আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে. "গুজরাটে তুমি কবে এসেছ ? কেন এসেছ ? দেখছি, তুমি বাঙালীর সন্তান, বালক, কার সঙ্গে তুমি এসেছ ? তোমার সঙ্গে কে কে আছে ?"

আমি।—আমার দুঃখের কথা শুনলে পাষাণও দ্রব হয়! নিতান্ত শিশু-কাল থেকে আমি নিরাশ্রয় নির্ব্বান্ধব ; মাতা-পিতাও আমার অপরিজ্ঞাত। এই বালক-জীবনেই যত কষ্ট আমি ভোগ কোরেছি, যত বিপদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, পরম শত্রুও যেন তত কষ্টে—তত বিপদে কখনো না পড়ে। স্বপ্নেও আমি কোন লোকের কোন মন্দ ভাবনা করি নাই, তথাপি আমার অনেক শত্রু হয়েছে ; যেমন তেমন শত্রু নয়, প্রাণঘাতক শত্রু। সেই সকল শত্রুর ভয়ে দেশে বিদেশে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি!"

ভূষণ।—তোমার শত্রু ? চেহারা দেখে আমার মনে হোচ্ছে, জগৎ-সংসার তোমাকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন কোত্তে আনন্দ বোধ করে। তোমার আবার শত্রু ? দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, শুনে আমি বড় দুঃখিত হোলেম। এখানে কি কেহই তোমার সঙ্গে নাই ? গুজরাটে তবে কি তুমি একাই এসেছ ?"

আমি।—আজ্ঞা না, একাকী আসি নাই ; বঙ্গের মুর্শিদাবাদজেলার একটি ভদ্রলোক দ্বারকা-দর্শনে এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই আমি এসেছি ; বেশী দিন আসি নাই, অল্পদিনের মধ্যেই আমার এই বিপদ!

ভূষণ।—এ বিপদ তোমার থাকবে না ; পরমেশ্বরের কৃপায় আমি তোমাকে এই প্রেত-পুরী থেকে উদ্ধার করবার সহায় হোতে পারবো। চিন্তা কোরো না, কোন ভয় নাই। উপবাসী থেকো না, কিছু কিছু আহার কোরো। রঙ্গিণীকে আমি বোলে দিব, সে তোমাকে ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী এনে দিবে। রঙ্গিণী বাঙালী-ব্রাহ্মণের মেয়ে, অন্য পরিচয় জানি না, তার মুখে কেবল এইটুকু আমি শুনেছি। রঙ্গিণী স্বহস্তে খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করে, আহারে তাদৃশ দোষ হবে না ; যে অবস্থায় সে এখন আছে, তার হস্তে অন্ন গ্রহণে দোষ হোতে পারে, রুটিতে দোষ নাই। কিছু কিছু আহার কোরো।"

আমি।—আহারে আমার প্রবৃত্তি হয় না ; ক্ষুধা যেন আমারে পরিত্যাগ কোরে গিয়েছে, কিছুতেই আর রুচি নাই। মন বড় উতলা। যাঁর সঙ্গে আমি এসেছি, তিনি একজন জমীদার, টাকা দিয়ে তিনি আমাকে খালাস কোত্তে পাত্তেন, যদি কম টাকা হোতো, তা হোলে নিশ্চয়ই তিনি দিতেন, তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন, নিশ্চয়ই দিতেন, কিন্তু ডাকাতেরা দশ হাজার টাকা চায়, তত টাকার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা আমার মত আশ্রিত গরিবের উচিত হয় না, বিশেষতঃ কেই বা তাঁকে সংবাদ দিবে ? আমি এখানে কয়েদ আছি, কিরূপেই বা তিনি জানবেন ?

ভূষণ।—টাকা তোমার প্রয়োজন হবে না, আমি বরং তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার কোরে প্রচুর অর্থদান কোরবো, এখানকার রাজবংশের সঙ্গে আমার অতি নিকট সম্বন্ধ ; সময় যখন আসবে, সে পরিচয় তখন তুমি জানতে পারবে। যে বাবুটির সঙ্গে তুমি এসেছ, তোমার জন্য অবশ্যই তিনি উদ্বিগ্ন হোচ্ছেন ; নাম বোলে দাও, ঠিকানা বোলে দাও, কালই তাঁর কাছে আমি তোমার নিরাপদের সংবাদ পাঠাব।

আমি।—আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ! গরিবের প্রতি আপনার এত দয়া, ভগবান আপনার এই দয়ার কার্য্যের উচিত পুরস্কার প্রদান কোরবেন। যাঁর সঙ্গে আমি এসেছি, তাঁর নাম দীনবন্ধুবাবু, শ্রীশ্রীভবানীদেবীর মন্দিরের পশ্চিমাংশে অদূরে একখানি দোতালা বাড়ীতে তাঁর বাসা, তিনি আমার জন্য মহা উদ্বিগ্ন, এটি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, দীনবন্ধুবাবুর উদ্বেগ-শান্তির নিমিত্ত শীঘ্র মুক্তিলাভে আমি অভিলাষী।

ভূষণ।—অশীঘ্র যাতে না হয়, সে চেষ্টায় আমি থাকলেম ; উর্দ্ধসংখ্যা এক সপ্তাহ। ডাকাতেরা এখন প্রায়ই দূরে দূরে ডাকাতী কোত্তে যায় ; সর্দ্দার ডাকাত বীরমল্ল অনেক দূরে গিয়ে পোড়েছে, এখানে এখন প্রায় সকল কাজেই আমার হুকুম চলে ; ডাকাতের বিশ্বাসে আমিও একজন তাদের মত ডাকাত, সুতরাং এখানকার প্রহরীরা—চাকরেরা সকলেই আমার বাধ্য। অবসর উপস্থিত হোলেই আমি তোমাকে নিরাপদে দীনবন্ধুবাবুর বাসায় পেঁছে দিব। বড় জোর এক সপ্তাহ।

আমি।—(নমস্কার করিয়া) ভগবান আপনাকে সংসারে সর্ব্বপ্রকারে সুখে রাখুন। যত শীঘ্র আপনি আমাকে খোলা বাতাসে ছেড়ে দিতে পারেন, তত শীঘ্রই আমি স্বদেশে প্রস্থান করবার জন্য প্রস্তুত হব। কেবল দীনবন্ধুবাবুর উদ্বেগ দূর করা আমার আশু মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য নয়, আরো একটি গুরুতর কর্ত্তব্য আমার মাথার উপর বিলম্বিত। মহা বিপদে একটি দয়াবতী বালিকা আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, আমার শত্রুপক্ষের দস্যুতস্করেরা সেই বালিকা-টিকে হরণ কোরে কোথায় নিয়ে গিয়েছে, সন্ধান নাই। মুর্শিদাবাদের আদা-লতে আমি মোকদ্দমা দায়ের কোরেছি, প্রাণদায়িনীর উদ্ধারসাধন আমার ধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্য ; মোকদ্দমা-স্থলে আমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

ভূষণ।—হাঁ, তোমার হৃদয়ের ধর্ম্মভাব তোমার বদনেই প্রকাশ পায়। সব আমি বুঝতে পাচ্ছি ; শীঘ্রই আমি তোমাকে মুক্ত কোরে দিব ; নিশ্চিন্ত হয়ে সপ্তাহকাল এইখানে তুমি অপেক্ষা কর। হাঁ, জিজ্ঞাসা কোত্তে ভুল হয়েছে, তোমার নামটি কি ?

আমি।—আমার নাম হরিদাস। যাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, আলাপ হয়, যাঁদের কাছে আমি আশ্রয় পাই, তাঁরা সকলেই আমারে হরিদাস বোলে জানেন ; যারা আমার প্রতি বৈরী, তারাও জানে, আমার নাম হরিদাস।

ভূষণ।—আচ্ছা, দেখ হরিদাস, বোলেছি আমি তোমাকে, ডাকাতের সর্দ্দারের নাম বীরমল্ল ; যে ঘরে তুমি এখন রয়েছ, এটা সেই বীরমল্লের ভাঁড়ার-ঘর।

এ ঘরে অনেক রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কলা-কৌশল আছে। বীরমল্লের যত সব মণি-মুক্তাদি মহামূল্য পদার্থ, যত সব গুপ্তক্রীড়ার গুপ্ত উপকরণ, এই ঘরের স্থানে স্থানে এক এক প্রকার কল-সংযোগে তৎসমস্ত লুক্কায়িত আছে ; কতক কতক পোতা আছে, কতক কতক দেয়ালে গাঁথা আছে। ঘরে প্রবেশ কোল্লে কোন চিহ্নই জানতে পারা যায় না। এই ঘরটায় সর্ব্বক্ষণ চাবি বন্ধ থাকে। সর্দ্দার ছাড়া অপরাপর ডাকাতেরা কেহই সে সকল গুপ্ত-সন্ধান জানে না। ঘরের বাহিরেও আর এক প্রকার কল। সে কল যারা জানে, তারাই কাজে এ ঘরে প্রবেশ কোত্তে পারে, ইচ্ছামাত্রেই বেরিয়ে যেতে পারে ; নূতন লোকে পারে না। স্থানটা এক প্রকার নূতন ধরণের গোলকধাঁধা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যে দিকেই যাও, ঘুরে ঘুরে এই ঘরে এসেই উপস্থিত হোতে হবে। যাদের হাতে তুমি ধরা পোড়েছ, উচিত বিবেচনা কোরেই তারা এই গোলকধাঁধার ভিতরে তোমাকে এনে আটক রেখেছে। তোমার হস্ত-পদের বন্ধন না থাকলেও—দ্বারে চাবীবন্ধ না থাকলেও গোলকধাঁধা ভেদ কোরে তুমি পালাতে পারবে না, এটা তারা বেশ জানে ; সেইজন্য এ ঘরের দ্বারে অথবা নিকটে নিকটে পাহারা থাকে না।

আমি।—বীরমল্লের দলে সর্ব্বশুদ্ধ কত লোক আছে ?

ভূষণ।—সহস্র অপেক্ষাও অধিক। সব লোক এক জায়গায় থাকে না। ঠাঁই ঠাঁই এইরকমের আরো অনেক বনদুর্গ আছে। সব জায়গায় সমান কায়দা। মানুষ ছাড়া বীরমল্লের দলে শতাধিক পাহাড়ী কুকুর আছে, বীরমল্লের পছন্দ মন্দ নয়, সব কুকুরগুলোই কালো কালো।

আমি।—অত কুকুর আছে, ডাক শুনা যায় না, এটাও তো বড় আশ্চর্য্য !

ভূষণ।—সর্দ্দার যখন শীকারে যায়, কুকুরেরা তখন তার সঙ্গে থাকে, এখন এ দুর্গে একটাও কুকুর নাই, সেইজন্যই ডাক শুনতে পাও না। ডাক শুনলে নূতন লোকের অর্দ্ধেক প্রাণ উড়ে যায়। সব মানুষ যেমন এক দুর্গে থাকে না, ডাকাতের কুকুরেরাও সেইরূপ এক দুর্গে বাস করে না। ও সব কথা এখন থাক, আমি একটা আলো জেবলে দিচ্ছি, তুমি কিঞ্চিৎ আহার কর।

নূতন কৌশলে ভূষণলাল একটি আলো জ্বাললেন, অনুরোধ এড়াতে না পেরে নিতান্ত অনিচ্ছায় একখানি রুটি আমি ভক্ষণ কোল্লেম, মাটির ভাঁড়ে জল খেয়ে দেয়াল ঠেস দিয়া আমি বোসলেম। ভূষণলাল সেই সময় আমার বন্ধনমোচন কোরে আদেশ কোল্লেন, "শয়ন কর, স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাও, কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই, কল্য রাত্রে আবার আমি আসবো, কল্য আবার দেখা হবে।"

আমি শয়ন কোল্লেম, আলোটি নির্ব্বাণ কোরে ভিত্তিলম্বিত তলোয়ারখানি নিয়ে, দ্বারে চাবী দিয়ে ভূষণলাল অন্য স্থানে চোলে গেলেন।

পাঁচদিন পাঁচরাত্রি অতিবাহিত। ভূষণলাল বোলে রেখেছেন, সপ্তাহ ; আর দুটি দিন অতীত হোলেই সপ্তাহ পূর্ণ হয়। নিত্য রজনীতে তিনি আসেন, রঙ্গিণীও দিবা-রাত্রের মধ্যে দুবার আমার খাবার দিয়ে যায়। রঙ্গিণীর সঙ্গে আমার অনেক রকম কথাবার্ত্তা হয়, ভূষণলালও নূতন নূতন অনেক কথা বলেন,

সে আলাপে আমি একরকম থাকি ভাল। ছয়দিনের দিন সন্ধ্যার পর আমার অনেকগুলি ভাবনা একত্র।

সপ্তবিংশ কল্প

এ সকল কি ব্যাপার?

ডাকাতের আড্ডায় একটি দয়াময় সাধুপুরুষ। তিনি ডাকাত নন, সে কথা ঠিক। ডাকাতের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়, ডাকাতেরা কালো হয়, এটা যেন একরকম বাঁধাকথার মধ্যেই গণ্য। যে সকল মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাই না, অথচ যাদের নাম শুনলে, কার্য্য ভাবলে, প্রাণের ভিতর মহাতঙ্কের উদয় হয়, কল্পনাতে সকলেই বলেন, সে সকল মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ। অসুরেরা কালো; সেই অসুর অনেক প্রকারের বুঝায়; দানব, দৈত্য, রাক্ষস, দস্যু ইত্যাদি। এগুলি পৌরাণিক সংবাদ। যিনি আমাদের ধর্ম্মরাজ, কালে-অকালে সকালে বিকালে যিনি জগতের জীবকুলের জীবন হরণ করেন, আমাদের দেশে যিনি যম নামে বিখ্যাত, তাঁরে কেহ দেখে নাই, কিন্তু চিত্রপটে দেখা যায়, ভীষণাকার যমমূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ। লৌকিক প্রবাদ ভূত; সকলেই বলে, ভূতেরা সকলেই কালো! মানুষের ছেলে যদি কালো হয়, দৃষ্টান্ত দিয়ে লোকেরা বলে, কালো ভূত! এই প্রকারে দুষ্কর্ম্মকারী দস্যুগণকেও কালো বলা যায়। দানব কালো, যম কালো, ভূত কালো, ডাকাত কালো, এই প্রকার সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তে বর্জ্জিত আছেন করালবদনা মা কালী আর বৃন্দাবনের গোপিনীমোহন শ্রীকৃষ্ণ।

বিদ্যুতের গতির মত এই সকল কথা আমার মনে হলো। মনে হবার সূত্র ডাকাতের দল। সব ডাকাত কালো না হোলেও ডাকাতী করবার সময় তেলকালী মেখে কালো হয়: কালো সাজে। যিনি আমারে রাত্রিকালে অভয় দিতে আসেন, ডাকাতের দলে তিনি ডাকাত নামে পরিচিত; মুখোসটা কিন্তু ঘোর কৃষ্ণ। সত্য তিনি ডাকাত নন, একবারমাত্র চেহারা দেখে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। রাজপুত্রের মত চেহারা। বাস্তবিক কে তিনি, এ প্রেতপুরী থেকে মুক্তি না পেলে সে নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ পাবে না, সেটাও আমি জানতে পাচ্ছি। গোলকধাঁধায় গোলকধাঁধার ঘোর অন্ধকারে আমি কয়েদ; এই গোলকধাঁধার ঘরে অনেকরকম কল-কৌশল আছে, বিশ্বাস কোরে সেই গুপ্তকথা তিনি আমারে বোলে গিয়েছেন, কি যে সেই কল-কৌশল, শেষকালে তাও হয় তো আমি জানতে পারবো। তিনি আমার বন্ধু, আমার মুক্তির জন্য আমার বন্ধুর কাজ কোরবেন, এইরূপ অঙ্গীকার। যদি আমার ভাগ্যে থাকে, যদি আমি খালাস পাই, সংসারে তাঁরে আমি বন্ধু পাব, এই আমার আশা।

মেয়েটার নাম রঙ্গিণী। সত্যনাম রঙ্গিণী নয়, ডাকাতেরা রঙ্গিণী নাম

দিয়ে রেখেছে। রঙ্গিণী বোলেছে, আমার ঐ বন্ধুর নাম ভূষণলাল। নামটি শুনতে ভাল, কিন্তু এ নামটিও বোধ হয় সত্য নয়। ডাকাতেরা যে নাম জেনে রেখেছে, সে নাম যদি সত্য হোতো, তা হোলে তিনি কদাচ নির্ব্বিঘ্নে ডাকাতের দলে থাকতে পাত্তেন না। সমস্তই রহস্যপূর্ণ। যেটা ভাবি, সেইটাই ঘোর অন্ধকার-রহস্যে ঢাকা ; আমার এই কয়েদঘর যেমন অন্ধকার, এই সকল রহস্যেও সেই রকম ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কতদিনে যে অন্ধকার দূর হবে, সৃষ্টিসংসারের বিধাতা যিনি, একমাত্র তিনিই সে তত্ত্ব পরিজ্ঞাত। মেয়েটির নাম রঙ্গিণী। আমার মনে হোচ্চে রঙ্গিণী দুবার বোলেছিল কিম্বা হয় তো বলবার ইচ্ছা কোরেছিল, "ডাকাতের দলের একটি লোক"—বোলতে বোলতে থেমে গিয়েছিল। বোধ হয়, যিনি আমার উপকারী বন্ধু, তাঁর কথাই রঙ্গিণী কিছু বোলতে চায় ; বোলতে পারে না। আজ একবার জিজ্ঞাসা কোরে দেখবো। রঙ্গিণীর সত্যপরিচয় কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না, আমি যেটা মনে মনে স্থির কোরেছি, সত্যই তাই, কিন্তু রঙ্গিণী মুখ ফুটে কিছুই বলে না। বীরভূমের নাম শুনেই রঙ্গিণী কাল চোমকে গিয়েছিল ; তাতেই এক-রকম ধরা পোড়েছে, আজ আবার একবার সেই সুরটা আমি তুলবো।

বনের ভিতর শেয়াল ডেকে উঠলো। এককালে বহু শৃগালের কলরব। সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ ; এতক্ষণের পর শেয়ালের ডাক, এটাও একপ্রকার প্রকৃতির খেলা। এ দেশে যাঁদের স্বধর্ম্মে বিশ্বাস, তাঁরা সকলেই সন্ধ্যা-বন্দনা করেন। শেয়ালেরা যেমন সন্ধ্যাবন্দনা জানে, মানুষ তেমন জানে না। হুয়া হুয়া, ক্যা হুয়া, সন্ধ্যা হুয়া, রাত্রি হুয়া, উয়া হুয়া এই রবে তারা প্রকৃতির স্তব করে। যে সময়ে যে ভাবে স্তব কোত্তে হয়, সেই সময় সেই সেই রব তারা মানুষের কর্ণে শুনায় ; আমারেও শুনালে। শৃগালের রব শ্রবণ কোরে করযোড়ে প্রকৃতিদেবীকে আমি নমস্কার কোল্লেম।

শেয়ালেরা নিস্তব্ধ হলো, আমার কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল, রঙ্গিণীর প্রবেশ। অন্ধকার ঘরে আলো হলো। মশালটা নামিয়ে রেখে, পাত্র-খানি আমার সম্মুখে ধোরে দিয়ে, অভ্যাসমত সাবধানে রঙ্গিণী আমার নিকটে বোসলো। অন্য অন্য দিন রঙ্গিণী আগে কথা কয়, সেদিন আমি ততক্ষণ অপেক্ষা কোত্তে না পেরে অগ্রেই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আজ যে তুমি এত সকাল সকাল? সে রাত্রের সেই কথা শুনে বুঝি তোমার ভয় হয়েছে? যিনি তোমারে তিরস্কার কোরেছিলেন, করপুটে যার কাছে তুমি দয়া প্রার্থনা কোরেছিলে, যাঁরে তুমি ভূষণলাল বোলে সম্বোধন কোরেছিলে, তিনি এখানে আসবেন, তাই বুঝি তুমি তাঁর আসবার আগেই এসে উপস্থিত হয়েছ?

উদাসভাবে একটু হেসে রঙ্গিণী উত্তর কোল্লে, "না না, সে জন্য নয় ; আজ আমাদের সর্দ্দারের ফিরে আসবার কথা, সেই জন্যই—"

আমি।—আচ্ছা, রঙ্গিণী! সর্দ্দার তো আসবে, আসুক, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সেই ভূষণলাল, যিনি তোমারে সর্দ্দারের নামে ভয় দেখিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে কি তোমার ঘরসংসারের কথাবার্ত্তা চলে?

রঙ্গিণী।—ঘরসংসারের কথা এখানে কারো সঙ্গে আমার চলে না, সে সব কথা কেহই কিছু আমারে জিজ্ঞাসাও করে না।

আমি।—করে না যদি, ঘরসংসারের কথা চলে না যদি, তবে সেই ভূষণলাল কি কোরে তোমার পরিচয় জানতে পাল্লেন ?

রঙ্গিণী।—কি পরিচয় তিনি জানতে পেরেছেন ?

আমি।—তুমি বাঙালীর মেয়ে, ব্রাহ্মণের কন্যা।

রঙ্গিণী।—ওঃ! এইটুকু ?—ওটুকু এখানকার অনেক লোকেই জেনেছে। যে রাত্রে আমারে এরা ধোরে আনে, সেই রাত্রে আমি তো কেঁদে কেঁদে সারা, আমার গহনাগুলি এরা খুলে নিয়ে, কত রকম ভয় দেখিয়ে জোরে জোরে ধমক দিলে, সেই সময় আমি বোলেছিলেম, আমি গরিব, বাঙলাদেশে আমার বাড়ী, ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি, আমারে তোমরা বে-ইজ্জৎ কোরো না, দয়া কোরে ছেড়ে দাও। যত কথা আমি বোলেছিলেম, সমস্তই ভেসে গিয়েছিল, এখন আমার এই দশা! যে দুর্দশায় আমি আছি, সমস্তই তোমার কাছে বোলেছি।

আমি। তবে ঐ পরিচয়টুকু তুমি দিয়েছিলে, এখন আমি বুঝলেম। আচ্ছা, আর একটি কথা। দুদিন দুবার তুমি একটু একটু ইঙ্গিতে আমার কাছে বোলেছিলে, এখানকার একটি লোক—একটি লোক—সেটি তোমার কি কথা ? কোন লোকটিকে লক্ষ্য কোরে তুমি সেইরূপ আভাষ দিবার ইচ্ছা কোরেছিলে, আমার বড় কৌতূহল জন্মেছে, কথাটি আমি শুনতে চাই ; কেন লোকটি ?

রঙ্গিণী।—(একটু কি ভাবিয়া) কেন ? সে কথা শুনে তোমার কি হবে ? সেই কথা তুমি মনে কোরে রেখেছ ? আমি ভেবেছিলেম, ভুলে গিয়েছ। সে লোকটির কথায় তোমার প্রয়োজন কি ?

আমি।—আছে কিছু প্রয়োজন। বিনা প্রয়োজনে কেন আমি তোমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা কোরবো ? প্রয়োজন আছে। স্পষ্ট কোরে বল দেখি, কে সেই লোকটি ?

রঙ্গিণী।—তাঁরে ত তুমি দেখেছ, তবে আর কেন জিজ্ঞাসা কর ? তিনি ত তোমার কাছে এসেছিলেন ; রোজ রাত্রেই হয় ত আসেন, তাঁরে তুমি দেখেছ, তাঁর কথাবার্ত্তাও শুনেছ, তাঁর সঙ্গে কথাও তুমি কোয়েছ, তবে আবার কেন জিজ্ঞাসা ?

আমি।—(সত্য গোপনের ছলে) কার কথা বোলছো ? কারে আমি দেখেছি ? কোন লোকটি ?

রঙ্গিণী।—আহা হা! কিছুই যেন জানেন না! সেই যে,—সেই—যাঁরে আমি ভূষণলাল বোলে—

আমি।—ও হো হো! তিনি ? তাঁরই কথা তুমি বোলবে মনে কোরেছিলে ? ডাকাতের দলে এত লোক থাকতে কেবল সেই লোকটির কথা আমার কাছে বোলতে কেন তোমার ইচ্ছা হয়েছিল, তাই আমি জানতে চাই।

রঙ্গিণী। চাও? জানতে কি পার নাই? দেখেছ, কথা শুনেছ, কথা কোয়েছ, এখনো কি জানতে বাকী আছে?

আমি। দেখ রঙ্গিণি, ও সব ঘোরফের ছেড়ে দাও, তর্কবিতর্কে কথা কাটাকাটি কর আমি ভালবাসি না। সোজা কথা কও। কি কারণে সেই লোক-টির কথা আমার কাছে বলবার জন্য তুমি ইচ্ছা কোরেছিলে, সেই কারণটি আমারে জানিয়ে দাও।

রঙ্গিণী।—কারণটি তুমি জানবে? তবে জানো। লোকটির শরীরে খুব দয়া। কথা শুনে মনে হয়, তাঁর সমস্ত শরীর যেন দয়ামায়া-মাখা; বুকের ভিতর—প্রাণের ভিতর যেন দয়ার নদী! কেন, তুমি কি তাঁর দয়ার পরিচয় পাও নাই? যে রাত্রে আমি এখানে ছিলেম, তিনি এলেন, তার পরদিন আমারে তিনি বোলে দিলেন, সেই দিন তাঁর মুখে আমি তোমার নামটি পর্য্যন্ত শুনলেন;—তিনি আমারে বোলে দিলেন, হরিদাসের জন্য ভাল ভাল খাবার সামগ্রী—

আমি।—হাঁ হাঁ, সে কথা আমি শুনেছি, তিনি আমাকে সে কথা বোলে-ছেন; দয়ার পরিচয়ও আমি পেয়েছি। তিনি আমাকে এখান থেকে মুক্ত কোরে—না না, সে কথা তোমাকে বলা হবে না, তুমি তোমার সর্দ্দারের কাছে লাগাবে, দয়ালু লোকটি বিপদে পোড়বেন, আমিও চিরকাল এখানে বন্দী থাকবো, কিম্বা হয় ত মাথা হারাবো। সে কথা থাক। আচ্ছা, তাঁর শরীরে দয়া আছে, সেই কথাটি বলবার জন্য তোমার ততটা আগ্রহ হয়েছিল কি কারণে?

রঙ্গিণী। কেবল সেই কথাটি নয়, আরো আছে। ডাকাত-মানুষ ও রকম হয়, ডাকাতের প্রাণে ও রকম দয়া থাকে, কখনো আমি কারো মুখে এমন কথা শুনি নাই। ডাকাতেরা মশালের আগুনে মানুষ পোড়ায়, মেয়েদের নাক-কান ছিঁড়ে গহনা খুলে নেয়, খাটের খুরোতে মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখে, তলোয়ার দিয়ে মানুষ কাটে, বন্দুকের গুলি মেরে মানুষ মারে, এই সব কথাই ত শুনে এসেছি, মানুষের উপর ডাকাতেরা দয়া করে, এটা কি আশ্চর্য্য কথা নয়? তুমি ছেলেমানুষ, হও ছেলেমানুষ, তবু ত এ সব কথা বুঝতে পারো; সেই জন্যই তোমার কাছে ঐ আশ্চর্য্য কথা বলবার ইচ্ছা হয়েছিল।

আমি। ইচ্ছা তোমার হোতে পারে বটে, কিন্তু তোমার প্রতি কি রকম দয়া তিনি দেখিয়েছিলেন? বিপদে পোড়ে ডাকাতের হাতে তুমি বন্দিনী হয়ে আছো, একটা ডাকাত তোমার ধর্ম্ম নষ্ট কোরেছে বোলেছ, ততটা অত্যাচার। জানতে পেরেও যে সেই দয়ালু ডাকাতটি তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন নাই, এটা তুমি কি রকম ভাবো?

রঙ্গিণী। (সজলনয়নে) দয়া প্রকাশ? আমার প্রতি? আমার তুল্য অভাগিনীর প্রতি তাঁর দয়া? বিধাতা যার প্রতি নির্দ্দয়, মানুষে কি তার প্রতি দয়া কোরে কোন উপকার কোত্তে পারে? বিশেষতঃ যে লোকটা আমার উপর দৌরাত্ম্য করে, সে হোচ্ছে এখানকার সর্দ্দার, এখানকার সব ডাকাত সেই সর্দ্দারের অধীন; সকলেই সর্দ্দারের ভয় করে, সকলেই সর্দ্দারের হুকুমে চলে, সর্দ্দারের যাতে মনোরঞ্জন হয়, সমস্ত ডাকাত সেই চেষ্টা কোরে থাকে,

তা কি তুমি বুঝতে পাচ্ছ না? কপালের লিখন কে খণ্ডায়? আমার কপালে ছিল, আমি ডাকাতের—(হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অশ্রুপাত)

আমি। বুঝেছি বুঝেছি। তুমি চুপ্ কর! কেঁদো না! কপালের লিখন খণ্ডন করা যায় না, তা আমি বুঝতে পারি; বেশ পারি; আমি নিজেই তার একজন বিলক্ষণ ভুক্তভোগী সাক্ষী। তুমি কেঁদো না; যে সব কথায় দুঃখের আগুনে আহুতি হয়, সে সব কথায় দরকার নাই, চুপ কর, ও সব কথা ছেড়ে দাও; আমি আর ও সব কথা তুলবো না। আচ্ছা রুক্মিণী, তুমি কি কাশীতে গিয়েছিলে?

রুক্মিণী। (অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে চকিতনেত্রে আমার মুখপানে চাহিয়া) কাশীতে? কি সব কথা তুমি বলো? সেদিন বোলছিলে বীরভূম, আজ আবার বোলছ কাশী, এ সব তোমার কি রকম কথা? ডাকাতেরা যাদের ধরে, তাদের মাথার ঠিক থাকে না, তারা যেন সব জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে, খেয়াল দেখে; তোমারও কি সব কথা সেই রকমের খেয়াল না কি?

আমি। না রুক্মিণী, খেয়াল নয়; স্বপ্নও নয়; সত্যকথা। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তুমি কাশীতে। অষ্টালঙ্কারভূষিতা বারাণসী শাড়ী-পরা এই তুমি—ঠিক যেন এই তুমি সেই কাশীধামে রসিকলাল পিতুড়ীর বাড়ীতে কুমারী-পূজায় ব্রতবতী হয়ে আছ: ডাকাতের এই কারাকূপে তোমার আগমনে আমি যেন সেই রসিকের বাড়ীর বারাণ্ডাগুলি সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি! কেন ভাঁড়াও? কেন মিথ্যাকথা কও? ভাগ্যে যা ঘটবার, ঘোটে গেছে, আর কেন মিথ্যাকথা বোলে পাপ বাড়াও? কাশীপুরী পুণ্যক্ষেত্র, সেই পুণ্যক্ষেত্রে তুমি বড় বড় কুমারী-পূজায় পুণ্যসঞ্চয় কোরে এসেছ, সেই কুমারীগুলিকেও আমি যেন এই কূপের মধ্যে দর্শন কোচ্ছি; ভাল ভাল কুমারী পুত্রবতী-কুমারী, গর্ভবতী-কুমারী, পুণ্যবতী-বিধবা-সতীলক্ষ্মী-কুমারী, কত রকম কুমারী যে আমি এইখানে দেখছি, একমুখে ব্যাখ্যা কোত্তে পাচ্ছি না। আচ্ছা, রুক্মিণী, যিনি তখন তোমার স্বামীরূপে বারাণসীধাম উজ্জ্বল কোরেছিলেন, যখন তুমি গুজরাটে আসো, তখন কি সেই কানাই বাবু তোমার সঙ্গে এসেছিলেন?

রুক্মিণী আর বোসে থাকতে পাল্লে না; সাপের ন্যাজে পদার্পণ কোল্লে সাপ যেমন তিরবির কোরে ফণা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়, সেই রকমে দাঁড়িয়ে উঠে, শুষ্কনয়নে আমার দিকে চেয়ে জড়িতস্বরে বোল্লে, "থাও তুমি, থাও তুমি! কোথা-কার পাগল! ভালোর জন্য আমি এখানে আসি, পাগলের মুখে পাপকথা শুনতে হবে, এমন জানলে কখনই আমি আসতেম না! কোথাকার ছোঁড়া গো! খেতে হয় খাও, না হয় তো মরো! আর আমি আসবো না;—চোল্লেম!"

রেগে রেগে আমারে গালাগালি দিতে দিতে, রুক্মিণী চঞ্চলপদে দরজার দিকে অগ্রসর হোতে লাগলো; বোসে বোসেই আমি একটু উচ্চকণ্ঠে ডেকে ডেকে বোলতে লাগলেম, "দাঁড়াও, রুক্মিণী, দাঁড়াও, যেয়ো না, দুটো কথা শুনে যাও—সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী তুমি, রাগ কোরো না; দুটো কথা শুনে যাও।

কানাইবাবু তোমার সঙ্গে গুজরাটে এসেছিলেন,—এখনকার প্রবলপ্রতাপ দস্যুচক্রের সর্দ্দার ডাকাত মহারাজ বীরমল্লের মহিষী তুমি,—কানাইবাবু গুজরাটে এসেছিলেন, এখন তিনি বেঁচে আছেন কিম্বা ডাকাতের হাতে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কোরেছেন, সেই কথাটি আমারে বোলে যাও ;—আমি তাঁর মাতুলকে—কে তাঁর মাতুল, তা হয় ত তোমার মনে হয়,—কানাইবাবুর মাতুল তোমার জন্মদাতা পিতা,—বীরভূমে তোমার পিতাকে পত্র লিখে কানাইবাবুর ভাগ্যের কথা জানাবো, তোমার এই দুর্দ্দশার কথা জানাবো, এ পাপের যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তোমারে সেই প্রায়শ্চিত্ত আমি করাবো, কানাইবাবুর জন্যও আমি একবার কাঁদবো ! দাঁড়াও, দাঁড়াও,—বোলে যাও, কানাইবাবু—"

রঙ্গিণী আর দাঁড়ালো না, যতগুলি কথা আমি বোল্লেম, শুনলে কি না শুনলে, বোলতে পারি না, আমার শেষ কথাগুলিও বলা হলো না,—ঝনাৎ, ঝনাৎ শব্দে দরজা খুলে, দরজা বন্ধ কোরে, চাবী দিয়ে পলায়ন কোল্লে।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেম, রঙ্গিণীর পলায়নের পর একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমি বিবেচনা কোল্লেম, কাজটা ভালো হলো না। রঙ্গিণীকে চটিয়ে দিয়ে ভাল কোল্লেম না ; আমার মুক্তিলাভ নিশ্চিত কি অনিশ্চিত, কিছুই জানি না ; সেই ছদ্মবেশী বন্ধুটি তাঁর অঙ্গীকারপালনে শীঘ্র কৃতকার্য্য হবেন কি না, পরমেশ্বর জানেন ; শীঘ্র যদি কৃতকার্য্য না হন, এই অবস্থায় আর আমারে কতদিন এখানে থাকতে হবে, কে বোলতে পারে ? রঙ্গিণী চোটে গেল, বীরমল্ল আজ রাত্রে ফিরে আসবে, পাপীয়সী আমার নামে তার কাছে কত রকম চুকলি গাইবে, বীরমল্ল আমারে এখানে নূতন দেখবে, আরো কত রকম যন্ত্রণা বাড়াবে ভাবতে ভাবতে প্রাণ কেমন আকুল হলো।

রাগের তেজে রঙ্গিণী সেই মশালটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল, ঘরে আলো ছিল, আমি তখন কিছু আহার কোল্লেম না, অস্থিরমনে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ কোত্তে লাগলেম। কি যেন দুষ্কর্ম্ম কোরেছি, মনের ভিতর এই রকম সন্দিগ্ধ ভাব ; কিছুতেই চিত্তস্থির হোচ্ছে না ; ঘরের ভিতর বেড়াচ্ছি, গতি ঠিক রাখতে পাচ্ছি না, মাতালের মত পা যেন টোলে টোলে আসছে, মাথা যেন ভোঁ ভোঁ কোরে ঘুরছে, চক্ষেও যেন ক্ষণে ক্ষণে ধাঁধা লাগছে। কেন এমন হয় ? দুশ্চারিণী পাপিনীর মুখের উপর গোটাকতক সত্যকথা বোলেছি, সেটা কিছু অসৎকার্য নয়, তবে কেন এমন হয় ? বিনা অবলম্বনে বেড়াতে পাল্লেম না, দেয়াল ধোরে ধোরে, এক এক জায়গায় থেমে থেমে, অন্যমনস্কভাবেই পাইচারী কোত্তে লাগলেম। দেয়ালের সর্ব্বত্রই মসৃণ, এক জায়গায় হাত ঠিক রাখতে পাচ্ছি না, পিছলে পিছলে সোরে সোরে পোড়ছে ; এক জায়গায় কি যেন একটা হাতে ঠেকলো। জায়গাটা উত্তরদিকের একটা কেন্দ্র। সেইখানে আমি থোমকে দাঁড়ালেম। তাদৃশ মসৃণ ভিত্তিগাত্রে কি এমন পদার্থ আছে, ঘর অন্ধকার থাকলে সেটা আমি নিশ্চয় কোত্তে পাত্তেম না, আলো ছিল, বিশেষরূপে নিরীক্ষণ কোরে দেখলেম, দেয়ালের বর্ণের সঙ্গে সমবর্ণের একটা সরু তার আমার নয়নগোচর হলো। কিসের তার ?

দেয়ালের গায়ে তার বসানো ; এ তারে কি কাজ হয় ? ভূষণলালের সঙ্কেত-কথা মনে পোড়লো। ঘরে অনেক রকম কল-কৌশল আছে ; এটা হয় ত তারি কোন রকম কলের তার।

দুইবার তিনবার সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ কোল্লেম। খুব সরু তার। প্রাচীন ইমারতের গায়ে নবীন নবীন তরু উৎপন্ন হোলে যেমন সূতার ন্যায় শ্বেতবর্ণ সরু সরু শিকড় দৃষ্ট হয়, যেটা দেখলেম, যেটাকে "তার" অনুমান কোল্লেম, সেটাও ঠিক সেই রকম। একবার মনে হলো, হয় ত দ্বার, বেমালুম দ্বার ; অঙ্গুলি-স্পর্শে একটু একটু সন্দেহ জন্মিল। কি এ ? সন্দেহভঞ্জনের ইচ্ছায় মশালটা তুলে নিকটে নিয়ে গিয়ে আরো ভাল কোরে পরীক্ষা কোল্লেম ; দ্বার নয়, সত্য সত্যই একগাছি সূক্ষ্ম তার। কিসের তার, এমন পরিষ্কার দেয়ালে এত সরু তার কি জন্য ? এ তারে কি কার্য হয় ?

মশালটা যেখানে ছিল, সেইখানে রেখে এলেম ; আবার সেই তারগাছটি আস্তে আস্তে খুঁটে খুঁটে দেখলেম ; একটু যেন সোরে এলো ; কৌতুকে কৌতুকে আবার খুঁটতে আরম্ভ কোল্লেম ; তারগাছটি যতদূর দেখা যাচ্ছিল, ঐ রকমে ততদূর পর্যন্ত নখদ্বারা স্পর্শ কোল্লেম ; যেখানে শেষ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সেই জায়গাটা একটু টিপে দিলেম।

আশ্চর্য ! যেমন টিপেছি, অমনি ক্ষুদ্র ঘটিকা-যন্ত্রের চক্র-ঘর্ষণের শব্দের ন্যায় খর খর শব্দে তারগাছটি কেঁপে উঠলো, দেয়ালের গায়ে একটু ফাঁক হলো। আর আমারে কিছুই কোত্তে হলো না ; ভিত্তিগাত্রের গুপ্তভাক যত বড় হয়,—ঠিক যেন একখানি শ্বেত পাথরের পাতলা টালি, তত বড় একটি তাক প্রকাশ পেলে ; উঁকি মেরে দেখলেম, তাকটা শূন্যগর্ভ নয়, বিবরমধ্যে কি একটা শ্বেতবর্ণের পদার্থ। হস্তদ্বারা সেই পদার্থটা স্পর্শ কোল্লেম, গাঁথা নয়, সন্তর্পণে বসানো। একবার স্পর্শ করি, একবার হাতখানি সোরিয়ে নিই ; হাত কাঁপে ; কি কোত্তে কি হবে, মনে যেন কেমন একপ্রকার ভয় আসে। কেনই বা ভয় পাই, বুঝতে পারি না। ভয়ের অগ্রে সাহস থাকে, ভয়ের পরেও একটু একটু সাহস আসে ; আমার হৃদয়ে তখন অল্পে অল্পে সেইরূপ সাহসের সঞ্চার ; ভয়ের সঙ্গে সাহস ; সেই সাহসকে সহায় কোরে পদার্থটি আমি হাতে কোরে তুল্লেম, বাহির কোরে আনলেম। ক্ষুদ্র একটি বাক্স ; রজত-নির্মিত দিব্য একটি চিত্র করা বাক্স ; চিত্রের মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অক্ষর খোদা ; দেবনাগরের ন্যায় আকার, কিন্তু ঠিক দেবনাগর অক্ষর নয় ; পোড়তে পাল্লেম না ; বাক্সে চাবী বন্ধ ; গা-চাবী নয়, তালা-চাবী। তালাটিও রৌপ্য-নির্মিত। কি এ ?—কিসের বাক্স ? এমন কোরে লুকিয়ে রেখেছে কেন ? একে ত এই জীবনসঙ্কট, তার উপর এ সব উৎপাতে কাজ নাই ; অনধিকারচর্চ্চা না করাই ভাল। এইরূপ স্থির কোরে, যেখানকার বাক্স, সেইখানেই রেখে দিলেম ; দেয়ালের আবরণটা বন্ধ করবার চেষ্টা কোল্লেম, পাল্লেম না। খোলাই থাকলো। নূতন ভয় ! মন কেমন ধুকপুক কোত্তে লাগলো। আর সেখানে দাঁড়ালেম না, সেখান থেকে সোরে এসে মহাসন্দিগ্ধ অন্তরে আপনার পূর্বস্থানে চুপটি কোরে বোসলেম।

কত চিন্তায় প্রাণ আকুল, তার উপর আবার এই এক অভাবনীয় চিন্তা! কল-কোশল ; এ ঘরে অনেক প্রকার কল-কৌশল আছে, একটা কল আমি ধোরে ফেল্লেম ; আশ্চর্য কল! এমন চমৎকার কল কখন কোথাও আমি দেখি নাই. ঘরের ভিতর এমন সূক্ষ্ম কল থাকতে পারে, লোকের মুখেও কখন শুনি নাই। নানাখানা ভাবছি. রাত্রি কত, অনুভব কোত্তে পাচ্ছি না, দ্বারে চাবি খোলা শব্দ। অবিলম্বেই দরজা খুলে গেল, আমার সম্মুখে ভূষণলাল।

প্রবেশ কোরেই এদিক ওদিক চেয়ে, যেন একটু চমকিতস্বরে ভূষণলাল আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "এ কি হরিদাস? ঘরে আলো কেন? কে দিয়ে গেল?"

ক্ষণেকের জন্য ভাবনাটা চেপে রেখে সসম্ভ্রমে আমি উত্তর কোল্লেম. রঙ্গিণী রেখে গিয়েছে। তারে আমি গোটা দুই গুপ্তকথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, তাই শুনে আমার উপর রাগ কোরে, রাগ কোরে কি ভয় পেয়ে রঙ্গিণীটা তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়েছে, মশালটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে।

হাস্য কোরে ভূষণলাল পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এমন কথা কি তারে তুমি জিজ্ঞাসা কোরেছিলে. যাতে সে রাগ করে. ভয় পায়, এখানকার নিয়ম অমান্য কোরে, মশাল নিয়ে যেতে ভুলে যায়, এমন গুপ্তকথা কি তোমার?"

শশব্যস্তে আমি বোল্লেম. "সে কথা পরে বোলছি. আগে একটা আশ্চর্য কথা বলি। এই ঘরের ভিতর আমি একটা আশ্চর্য পদার্থ দর্শন কোরেছি। আপনি বোলেছিলেন, এ ঘরে অনেক প্রকার কল-কৌ—"

কথা সমাপ্ত করবার অবসর না দিয়েই মহা আগ্রহে চঞ্চলকণ্ঠে ভূষণলাল আবার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন. "কি—কি—কি. আশ্চর্য পদার্থ? কি পদার্থ তুমি এখানে দেখেছ? শীঘ্র বল. শীঘ্র বল! আশ্চর্য পদার্থের অন্বেষণেই আমি ডাকাতের সঙ্গে ডাকাত হয়ে বেড়াচ্ছি, শীঘ্র বল. কি আশ্চার্য পদার্থ?"

আমি দাঁড়ালেম যে খোপের ভিতর সেই রজত-বাক্স সেই খোপের কাছে ছুটে গিয়ে সেই বাক্সটি হাতে কোরে আনলেম : শীকার দেখে বাজপক্ষীরা যেমন ছোঁ মারে. সেই রকমে ছোঁ মেরে ভূষণলাল সেই বাক্সটি আমার হাত থেকে আকর্ষণ কোরে নিলেন ; তাঁর বদনমণ্ডল অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হয়ে এলো ; উলটে পালটে বাক্সটি ভাল কোরে দেখে, আহ্লাদে আমার মস্তকে হস্তার্পণ কোরে. তিনি গদগদস্বরে বোলে উঠলেন. "আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়া! তুমি দীর্ঘ-জীবী হও! বোলেছিলেম. আমি তোমার বন্ধু : এখন জানতে পাল্লেম, তুমি হরিদাস. তুমিই আমার পরম প্রিয়তম মহোপকারী বন্ধু! এই বস্তুর নিমিত্তই আমি এই ভয়ঙ্কর স্থানে বহুদিন আত্মগোপন কোরে আছি।"

আহ্লাদে এই সকল কথা বোলতে বোলতে দুই বাহু প্রসারণ কোরে সস্নেহে ভূষণলাল আমারে আলিঙ্গন কোল্লেন। আলিঙ্গন করবার সময় বাক্সটি তিনি ভূতলে রেখেছিলেন, ভূতলেই থাকলো, অগ্রে তিনি সে কলের কাছে গিয়ে সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা কোরে কোরে সেই কলটি যথাস্থানে সংলগ্ন কোল্লেন। যেমন দেয়াল, তেমনি হলো। অতঃপর তিনি ভিতরদিক থেকে কারাদ্বার অব-

রুদ্ধ কোরে দিলেন, মশালটা নির্ব্বাণ কোল্লেন না, বাক্সটি হাতে কোরে নিয়ে প্রফুল্লবদনে উপবেশন কোল্লেন, আমিও তাঁর সম্মুখে গিয়ে বোসলেম।

বাক্সটি কোলের উপর রেখে, ফুল্লনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে, ভূষণলাল বোলতে লাগলেন, "আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়া! এই কার্য হবে বোলেই ভগবান তোমাকে ডাকাতের কবলে নিক্ষেপ কোরেছিলেন! ধন্য ভগবান!"

আমিও তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি কোল্লেম, "ধন্য ভগবান! ভগবানের ইচ্ছায় বিশ্বসংসার বিঘূর্ণিত হোচ্ছে। ভগবান স্বয়ং মঙ্গলময়, তাঁর সমস্ত ইচ্ছাও মঙ্গলময়ী। আমি ডাকাতের হাতে পোড়েছি, এটিও তাঁর ইচ্ছা ছিল। ডাকাতের গুহামধ্যে আপনার তুল্য মহাপুরুষকে আমি বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হব, এটিও সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা; তিনিই আপনাকে আমার রক্ষাকর্তারূপে এই বিপদক্ষেত্রে এনে দিয়েছেন! আপনি যদি—"

আমার কথা সমাপ্ত হবার অগ্রেই প্রসন্নবদনে প্রশান্তস্বরে ভূষণলাল বোল্লেন, "তার আর সন্দেহ কি? সমস্তই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। এই যে রজতাধারটি তুমি আবিষ্কার কোরেছ, এটি যে আমার পক্ষে কত মূল্যবান, কত উপকারসূচক, তা তুমি এখন জানতে পাচ্ছ না; একটু পরেই জানতে পারবে। এখনো আমাদের অনেক কাজ বাকী। এখন একবার আমাকে স্থানান্তরে যেতে হবে, শীঘ্রই ফিরে আসবো, অল্পক্ষণ তুমি নিশ্চিন্তমনে এইখানেই বোসে থাকো; আজ রাত্রেই আমি তোমাকে উদ্ধার কোরে দিব। তোমার হয় ত মনে আছে, আজ রাত্রে বীরমল্লের ফিরে আসবার কথা; দলবল সমস্তই তার সঙ্গে ফিরবে,—মানুষ, কুকুর, লাঠি, সড়্কি, ঢাল, তলোয়ার, সমস্তই তার সঙ্গে থাকবে; তারা ফিরে আসবার অগ্রেই আমি বেরিয়ে যাব, তারা এসে উপস্থিত হবার পর আমি ফিরে এসে তাদের সঙ্গে দেখা কোরবো। দেখ হরিদাস, মানুষের মন যে কেবল বিপদেই অস্থির হয়, তা নয়, আনন্দেও মানবচিত্ত অস্থির হয়ে থাকে। আমার হৃদয়ে এখন পূর্ণানন্দের আবির্ভাব, সেই আনন্দে আমার মন এখন বড় অস্থির। মশাল ফেলে রঙ্গিণীটা পালিয়ে গিয়েছে, কি গুপ্তকথা তারে তুমি জিজ্ঞাসা কোরেছিলে, সেটি জানবার জন্য আমার বড় কৌতূহল, আবিষ্ক্রিয়ার আনন্দে সেই রহস্য-শ্রবণে একটু বাধা জন্মিল, কিছু বিলম্ব হলো, তা হোক, মশালটা ফেলে গিয়ে ছুঁড়িটা আমাদের বিশেষ উপকার কোরেছে; মশালটা না থাকলে তুমি ঐ আশ্চর্য আবিষ্কারে সমর্থ হোতে না। আচ্ছা, সে সব কথা পরে হবে, এখন আমি চোল্লেম, অল্পক্ষণের জন্যই চোল্লেম; তুমি থাকো,—নির্ভয়ে বোসে থাকো, কোন ভয় নাই!"

এইবার মশালটা নিবিয়ে দিয়ে, অঙ্গবস্ত্রমধ্যে বাক্সটি লুকিয়ে নিয়ে, ভূষণলাল বেরিয়ে গেলেন, দ্বারে দস্তুরমত চাবি পোড়লো। আমি অন্ধকারে একাকী বোসে রইলেম। ভূষণলালের আনন্দের হেতু অনুভব কোত্তে পাল্লেম না, কিন্তু ঐ বাক্সটি যে তাঁর উপকারে আসবে, তাঁর কথা শুনে সেটি আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম। কি উপকার, যদিও সেটি আমার অজ্ঞাত, তথাপি আমার উদ্ধারের পথে সেই নিৰ্জ্জীব বাক্স অনুকূল, সে অংশে আমার কোন সংশয় থাকলো না; কারাকূপে আনন্দ আমি ভুলে গিয়েছিলেম, নির্ভাজ আনন্দ

কোন কালেই বা আমি উপভোগ কোরেছি, সে কথা নয়, তবুও মুক্ত বাতাসে নিষ্পাপ অন্তরে যে একটু একটু আনন্দের উদয় হোতো, ডাকাতের গহ্বরে সে আনন্দটুকুও আমি ভুলে গিয়েছিলেম, এই রাত্রে সেই আনন্দের অল্প অল্প আলো আমার হৃদয়ে বিভাসিত হলো। ভূষণলাল আমার বন্ধু,—নিজ মুখেই তিনি বোলেছেন, তিনি আমার বন্ধু ; বন্ধুর আনন্দেই আনন্দ সম্ভোগ করা যায়, এটি মানুষের স্বভাবসংগত : ভূষণলালের আনন্দেই আজ আমার আনন্দ। ফল এখনো অনিশ্চিত, তথাপি বন্ধুর আনন্দেই আমার আনন্দ।

দুশ্চিন্তার রঙ্গভূমিতে আনন্দের স্থান অতি অল্প হয়। আমার অন্তরে সে সময় আনন্দসঞ্চার হোলেও দুশ্চিন্তা দূরে গেল না। সর্দার ডাকাত ফিরে আসছে, সে আমাকে দেখে নাই, এই রাত্রে নিশ্চয়ই দেখবে, দশহাজার টাকা দিতে আমি অক্ষম, এই কথাও শুনবে, কোন লোকের নামে টাকার জন্য চিঠি লিখতেও আমি নারাজ, দলের লোকেরা সে কথাও তাহাকে বোলবে, এই সব তত্ত্ব জানতে পেরে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীরমল্ল নিশ্চয়ই আমার উপর দৌরাত্ম্য কোত্তে আসবে, তখন আমি কি কোরবো ? বিশেষতঃ সেই রঙ্গিণী ;—সেই রঙ্গিণী আমার উপর রেগে আছে, সর্দ্দার বীরমল্ল সেই রঙ্গিণীর প্রণয়-পাশে বাঁধা, রঙ্গিণী অবশ্যই তার কাছে আমার নিন্দা কোরবে, মনগড়া অপরাধের কথা জানাবে, রঙ্গিণীর উত্তেজনায় রঙ্গলাল বীরমল্ল আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, সে সময় আমার রক্ষাকর্ত্তা কে হবে ? ভূষণলাল ফিরে আসবার অগ্রেই বীরমল্ল আসবে, ভূষণলাল নিজেই সে কথা আমাকে বোলে গিয়েছেন। বীরমল্ল যখন আমাকে তাড়না কোরবে, ভূষণলাল—তিনি যিনিই হউন, ভূষণলাল যদি তখন এখানে উপস্থিত থাকেন, সর্দ্দারের অধীন তিনি, তিনিই বা তখন আমার কি উপকার কোত্তে পারবেন ? সেই ভাবনায় আমি অধীর হোলেম। এই সময় আর একটা চিন্তা এলো। বিদেশে একজন পথিক আমি, অপরিচিত পথিক বালক ; পথ ভুলে বনের ভিতর এসে পোড়েছিলেম, বনের ডাকাত অতর্কিতে আমাকে ধোরে ফেলেছিল, এটাও যেন মনে লয় না। বোধ হয়, বনপথে আমি আসছি, এই সংবাদটা কোন লোক ডাকাতের দলে বহন কোরে থাকবে। তেমন লোকই বা কে ? এখানে তেমন শত্রুই বা আমার কে আছে ? ঠিক ! রক্তদন্ত ! নফর ঘোষাল বোলেছিল, রক্তদন্ত গুজরাটে এসেছে। সেই কথাই হয় ত ঠিক ! তা না হোলে ততদূর শত্রুতা করে, তেমন লোক গুজরাটে থাকা অসম্ভব। রক্তদন্ত গুজরাটে এসেছে। তার সঙ্গেও হয় ত আরো লোক থাকতে পারে ; সেই সকল লোকও হয় ত এই ডাকাতের দলে ভর্ত্তি হয়ে আছে। রক্তদন্ত আমার জাতশত্রু ! রক্তদন্ত আমার জীবনদায়িনী কোমলাঙ্গী নির্ম্মলাকুমারী অমরকুমারীকে চুরি কোরেছে, আমাকেও ডাকাতের দলে ধোরিয়ে দিয়েছে, বিবিধ দুশ্চিন্তার সঙ্গে এই ভাবটাও তখন আমার মনের ভিতর উদয় হলো। বিপত্তিকাণ্ডারী হরি শ্রীমধুসূদন ! তিনিই আমার আশা, তিনিই ভরসা তিনিই সম্বল, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব। ঘোর বিপত্তিকালে সেই শ্রীমধুসূদনের নাম স্মরণ কোরে ঘোর অন্ধকারে আমি নয়ন মুদে বোসে থাকলেম। ভূষণলাল এলেন না।

অষ্টাবিংশ কল্প

গ্রহ সুপ্রসন্ন

গভীর নিশীথকালেও বনবাসী শৃগালেরা রব করে। নিশাকালে প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব শুনা যায়। আমাদের সংগীত-শাস্ত্রের গুরুমহাশয়েরা দিবা-রজনীর কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণীর ভেদ নির্দ্ধারণ কোরে রেখে-ছেন, শৃগালের রবেও সেইরূপ কালভেদ স্বরভেদ বুঝা যায় ; কিঞ্চিৎ অভি-নিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কোল্লে, ভাবুকলোক মাত্রেই সেই ভেদাভেদ অনুভব কোত্তে পারেন। বোসে বোসে নিস্তব্ধ হয়ে আমি ভাবছি, দূরে দূরে শেয়াল ডেকে উঠলো। স্বরে বুঝলেম, রাত্রি শেষ ; ঊষা আগমনের অতি অল্পমাত্র বিলম্ব।

শৃগালেরা নীরব হোতে না হোতেই ডাকাতের দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল-ধ্বনি সমুত্থিত। এককালে বহুলোকের কণ্ঠমিশ্রিত চীৎকারধ্বনি! গর্জন, আস্ফালন, হুহুঙ্কার, বিভীষণ চীৎকারমিশ্র চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে এক এক-বার সভয় চীৎকারও শ্রুতিগোচর হোতে লাগলো। এই বুঝি সর্দ্দার এসেছে, এই বুঝি সব দলবল এসেছে, এই বুঝি দলের লোকেরা সর্দ্দারের কাছে আমার কথা বোলে দিচ্ছে, এইবার বুঝি আমার উপরেই বজ্রবর্ষণ হবে, এই সকল ভাবনা উপর্য্যুপরি আমার শঙ্কাকুল হৃদয়ে সমুদিত। বোসে ছিলেম, থাকতে পাল্লেম না, ভয়ঙ্কর কলরব শুনে চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেম ; ভয়ঙ্কর জলদ-গর্জ্জনের ন্যায় ক্রমশই সেই ভীষণ চীৎকারের প্রবলতা! দূরবনে ব্যাঘ্র-গর্জ্জন শ্রবণ কোরে বনবাসী নিরীহ কুরঙ্গ যেমন প্রাণভয়ে ব্যাকুল হয়, ঘরের বাহিরে দস্যুদলের ভীষণ গর্জ্জন-শ্রবণে, প্রাণের ভয়ে আমিও সেইরূপ ব্যাকুল হোলেম।

ঘেউ ঘেউ রবে অনেকগুলো কুকুর ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে গোটাকতক বন্দুকের আওয়াজ। কুকুরের ডাক সেই সকল বন্দু-কের আওয়াজের উপর দিয়ে ছাপিয়ে ছাপিয়ে যেতে লাগলো। সে রকম কুকুরের ডাক অন্য কোন স্থানে আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই ; ভীষণ জলদ-গম্ভীর নিনাদ! নিরেট ঘর, প্রকাণ্ড কপাটে চাবি বন্ধ, সেই ঘরের ভিতর থেকে সেই ভীষণরব শ্রবণ কোরে সত্যই যেন আমার অর্দ্ধেক প্রাণ উড়ে গেল। পুন-র্ব্বার বন্দুকের আওয়াজ। উভয় গর্জ্জনে যেন খণ্ড-প্রলয় বোধ হোতে লাগলো! অনেকদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনি! এক একটা আওয়াজে আমি থর থর কোরে কাঁপতে লাগলেম, ঘর পর্যন্ত যেন কাঁপতে লাগলো। প্রবল ভূমিকম্পে ধরণী যেমন কাঁপে, ঘন ঘন সেই প্রকার কম্প! সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের কলরব। বিভীষণ চীৎকার! উভয়দলে যুদ্ধ উপস্থিত হোলে যে প্রকার হুহুঙ্কার শুনা যায়, সেই প্রকার বিমিশ্র চীৎকার। অবিরাম বন্দুকের ধ্বনি। মনুষ্যের চীৎকার, কুকুরের চীৎকার, বন্দুকের চীৎকার, প্রলয়কাণ্ড!

ব্যাপার কি! সর্দ্দার ডাকাত ফিরে এসেছে, কুকুরের দল ফিরে এসেছে, সেই কারণেই কি ঐরূপ জয়ধ্বনি হোচ্ছে? পরদ্রব্য লুণ্ঠনে পূর্ণমনরথ হয়ে ডাকাতেরাই কি ঘন ঘন তোপধ্বনি কোরে আনন্দ প্রকাশ কোচ্ছে? অব্যক্ত চীৎকারে কুকুরেরাও কি প্রভুবর্গের আনন্দে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে?—না, সে রকম কলরব নয়; জয়ধ্বনির সঙ্গে যেন ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ এক একবার মিশিয়ে মিশিয়ে যাচ্ছে! ব্যাপার কি?

প্রায় আধঘণ্টাকাল আমি ঐ প্রকার প্রলয়-কলরব শ্রবণ কোল্লেম। তার পর উচ্চধ্বনি নিস্তব্ধ, দূর থেকে বহুজনপূর্ণ মেলাস্থলের মিশ্রকলরব যেমন শুনা যায়, কথা বুঝা যায় না, অর্থ-বোধ হয় না, কেবল যেন মহাঝড়ের অথবা দূরস্থ সমুদ্রগর্জ্জনের হুঙ্কারশব্দের ন্যায় গাত্র-কম্পন ভীমরব শ্রবণ কোত্তে লাগলেম। অকস্মাৎ আমার কারাগারের রুদ্ধদ্বার বিমুক্ত হয়ে গেল, প্রভাতের অল্প অল্প আলো গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে, সমুজ্জ্বল উষ্ণীষধারী একটি দিব্য-মূর্ত্তি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। যুগল হস্তে যুগল অসি, বদনমণ্ডল দিব্য প্রফুল্ল, দিব্য মহাবীর-মূর্ত্তি!

অসি-দুখানি ভূতলে সংস্থাপন কোরে সেই মূর্ত্তি পরমানন্দে আমারে আলিঙ্গন কোল্লেন; আনন্দবর্দ্ধন, সুমধুর গম্ভীরস্বরে শীঘ্র শীঘ্র বোল্লেন, "হরিদাস! হরিদাস! গ্রহদেবতা সুপ্রসন্ন! আর তুমি এখানকার বন্দী নও, মুক্ত পুরুষ! তোমার আবিষ্কৃত সেই ক্ষুদ্র বাক্সটির কল্যাণে বহুদিনের পর আজ আমি সিদ্ধমনোরথ হয়েছি। সব ডাকাত ধরা পোড়েছে! এসো, এসো, শীঘ্র এসো, দেখবে, গড়া গড়া পোড়ে আছে। দেখবে এসো!"

এই কথাগুলি তিনি বোল্লেন; যতক্ষণ বোল্লেন, ততক্ষণ আমি তাঁর মুখ-পানে অনিমেষে চেয়ে থাকলেম। মহারোগে বাকরোধ হয়, মহাশোকে বাক-রোধ হয়, মহা আনন্দেও বাকরোধ হয়ে যায়; ক্ষণেকের জন্য মহানন্দে আমার বাকরোধ! যে মুখে ঐ আনন্দবার্ত্তা বিঘোষিত, সেই মুখখানি একরাত্রে অল্প-ক্ষণের জন্য আমার দেখা হয়েছিল; পাঠকমহাশয় স্মরণ কোত্তে পারবেন। অসাবধানে মুখোসটি খোসে পড়বার উপক্রমে পলকমাত্র যে মুখ আমি দেখি, সেই মুখ! সে রাত্রে কেবল মুখখানি মাত্র দর্শন কোরেছিলেম, এই প্রাতঃকালে —এই সুপ্রভাতে সেই মুখের অধিকারীর পূর্ণ অবয়ব আমি দর্শন কোল্লেম। দর্শনে নয়ন চরিতার্থ, হৃদয় পুলকিত, অন্তরানন্দে মন-প্রাণ প্রফুল্ল; সম্মুখে আমার পরমোপকারী প্রিয়বন্ধু ভূষণলাল।

আমি তখন কথা কইতে পাল্লেম না, আনন্দ-প্রমোদিত ভূষণলাল, সস্নেহে আমার হস্ত আকর্ষণ কোরে ঘরের বাহিরে নিয়ে চোল্লেন। আকর্ষণ বোল্লেম কেন, যথার্থই আকর্ষণ! আনন্দে আমার অঙ্গ অবশ, রসনা নির্ব্বাক, গতি-শক্তি স্তম্ভিত। ভূষণলাল আমারে যথার্থই টেনে টেনে নিয়ে চোল্লেন; কলের ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যেন তখন কলে কলেই চোলে যেতে লাগলেম।

পূর্ব্বে শুনে রেখেছি, শুনে শুনে বোলে রেখেছি, ডাকাতের বনদুর্গ। সেই দুর্গমধ্যে এক সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণে বিকট বিকট চেহারার শতাধিক লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পোড়ে আছে। হস্ত-পদে শৃঙ্খল, কটিদেশে

শৃঙ্খল, গলদেশে শৃঙ্খল ; নড়ন-চড়নের শক্তি নাই। রণবেশধারী প্রায় দুইশত সিপাহী চারিদিকে শ্রেণীবন্ধ দণ্ডায়মান ; অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ; বদন গম্ভীর, নিৰ্ব্বাক ; হঠাৎ দর্শনে হৃদয়ে আশঙ্কার সঞ্চার হয়। একটু দূরে দেখলেম, একপাল কুকুর বাঁধা ; জনকতক সিপাহী সেই সকল কুকুরের মুখে জাল বেঁধে বৃহৎ একটা শৃঙ্খলে সবগুলোকে একত্র বন্ধন কোরে আটকে রেখেছে। শৃঙ্খলবদ্ধ ডাকাতেরা মিট মিট কোরে চেয়ে দেখছে, রাগে রাগে ফুলছে, এক একটা লোক মুখ খিঁচিয়ে দাঁত কড়মড় কোরে আস্ফালন দেখাচ্ছে, বাক্য নাই। কোনটা তাদের মধ্যে বীরমল্ল, অনেকক্ষণের পর বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়ে ভূষণলালকে আমি সেই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। হাস্য কোরে ভূষণলাল বোল্লেন, "সে একটা রাজা লোক, নিজের দলের ভিতর তার মহারাজ খেতাব, তারে কি এই রকম খোলা জায়গায় এমন অযত্নে রাখা যায় ? তার বিলাসঘরেই সুকোমল শয্যার উপর তারে রক্ষা করা হয়েছে। তার বিলাসিনী রঙ্গিণীটিও সেইখানে আছে ; চল, দেখবে চল !"

ডাকাতের বিলাসগৃহে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। বিলাসগৃহে বিলাস-শয্যা। সেই শয্যার উপর বীরমল্ল উপবিষ্ট। স্বেচ্ছায় উপবিষ্ট নয়, চতুর্ব্বিধ বন্ধনের কায়দায় কাজেই তারে বোসে থাকতে হয়েছিল। গলার সঙ্গে, কোমরের সঙ্গে, হাতের কব্জীর সঙ্গে, পায়ের সঙ্গে এক শৃঙ্খলের যোগ, শয়নের কথা দূরে থাকুক, হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরামে নিঃশ্বাস ফেলাও অসাধ্য। আমি সেই ডাকাতের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ কোল্লেম। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে, তথাপি সেই শয্যার নিকটবর্তী হোতে আমার সাহস হলো না। ভয়ঙ্কর চেহারা ' বেঁটে, ঘাড়ে-গর্দ্দানে এক, বুক চওড়া, কোমর মোটা, উরুদেশ যেন শালকাঠের মত প্রকাণ্ড, হাতের গুল ঘুরাণো ঘুরাণো, পায়ের গোছ খুব মোটা, নাকটা লম্বা, আগার দিকটা চ্যাপ্টা, চোখ খুব ছোট ছোট, কিন্তু তারা-দুটো বড় বড়, ভাল কোরে দেখলে বোধ হয় যেন জ্বেলছে, জ্বেলছে আর ঘুরছে, চক্ষের পাতায় লোম নাই, ভ্রূতেও অতি অল্প লোম ; আছে কি না মালুম হয় না, কপালখানা প্রকাণ্ড, মাথার সম্মুখদিকে কপাল পর্যন্ত টাক, তাতে কোরেই কপালখানা আরো প্রকাণ্ড দেখায় ; টাকের ধারে ধারে পাতলা পাতলা লম্বা লম্বা চুল ; গোঁপ চোমরা, দাড়ি কামানো ; গায়ের রং আধপোড়া ইটের মত, রোদ-পোড়া শুষ্ক বেল যে রকম, মুখের বর্ণটা সেই প্রকার। আমাদের দেখে সেই ক্ষুদ্র চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে ডাকাতটা তখন বড় বড় দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন কোত্তে লাগলো। দশভুজা মা দুর্গার পদতলে সিংহাক্রান্ত নাগপাশবদ্ধ মহিষাসুরের যেরূপ গঠন, যেরূপ ভয়ঙ্কর আকৃতি লৌহশৃঙ্খলবদ্ধ বীরমল্লকে আমি তখন সেইরূপ দেখলেম। ঘরের কোণে করযোড়ে রঙ্গিণীরও হাত-পা বাঁধা, বিশেষের মধ্যে শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে দড়ি দিয়ে বাঁধা ;—দুখানা পা বাঁধা ছিল না, একখানা পায়ে দড়ি বেঁধে একটা জানালার গরাদের সঙ্গে টানা দেওয়া। আমাদের দেখে রঙ্গিণী কাঁদতে লাগলো।

সে ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে এলেম। চাতালের ডাকাতগুলোকে প্রথমে যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিলেম, ঠিক সেই অবস্থায় তারা পোড়ে আছে ; চারি-

দ্বারে সিপাহী পাহারা। এক একবার সকলের দিকে চাইতে চাইতে গহ্বর থেকে আমরা বাহিরে আসছি, সেই সময় দেখি, প্রবেশ পথের দুই পাশে দুটো আস্তাবল ; প্রায় ৪০।৫০টা বড় বড় ঘোড়া সেই দুই আস্তাবলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে নাসাগর্জ্জন কোচ্ছে আর খট খট কোরে পা ঠুকছে।

আমরা বেরিয়ে এলেম। সম্মুখে সেই কানন-বেষ্টিত প্রান্তর ; ডাকাতেরা প্রথম রাত্রে সেই প্রান্তরমধ্যে আমারে ঘোড়ার উপর তুলে বন্ধন কোরেছিল, সেই কথা তখন স্মরণ হলো। দেখতে দেখতে আমরা উভয়ে পদব্রজে সেই নিবিড় বনভূমি অতিক্রম কোল্লেম। প্রাণে তখন আমার কতদূর আনন্দ, আমার মুখে না শুনলেও সকলেই সেটি অনুভব কোত্তে পারবেন।

আমি খালাস পেলেম। পাপ ডাকাতের পাপ-নিবাসের দুর্গন্ধময় বাতাস আর আমারে যন্ত্রণা দিতে পাচ্ছে না, নির্ম্মল পবিত্রবায়ু সেবনে সুস্থ হয়ে আমি তখন স্বাধীনতাসুখ উপভোগ কোত্তে লাগলেম। অরণ্যসীমা পার হয়ে প্রশস্ত রাজপথে আমরা উপস্থিত। দুজন লোক দুটি সুসজ্জিত অশ্ব নিয়ে সেইখানে হাজির ছিল, ভূষণলাল আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ঘোড়ায় চড়া তোমার অভ্যাস আছে ?" মুখে উত্তর না দিয়ে, একলম্ফে একটি ঘোড়ার উপর আমি সওয়ার হয়ে বোসলেম ; বোসেই মনে মনে মুর্শিদাবাদের পশুপতি-বাবুকে ধন্যবাদ দিলেম ; তিনিই আমার অশ্বারোহণবিদ্যার গুরু। আমি সওয়ার হোলেম, ভূষণলাল একলম্ফে দ্বিতীয় অশ্বে আরোহণ কোল্লেন, ঘোড়ারা কদমে কদমে চলতে লাগলো। দুটি ঘোড়া পাশাপাশি। মুখ বুজে আমরা আসছি না, ভূষণলাল অনেক কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন, অনেক কথার আমি উত্তর দিচ্ছি। আমার তখন দিব্য স্ফূর্ত্তি, ভূষণলালও নূতন আনন্দে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, কথোপকথনে সেই একরকম নূতন আমোদ।

কথার অবসরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "স্ত্রীলোকটা বন্ধনদশায় কেন ? স্ত্রীলোক ডাকাতী করে না, ডাকাতেরা তারে ধরে রেখেছিল, তার অপরাধ কি ? সে পালাবে না তার পালিয়ে যাবার স্থান নাই, তারে বন্ধন করা হয়েছে কি জন্য ?"

ঈষৎ হাস্য কোরে ভূষণলাল উত্তর দিলেন, "রঙ্গিণীকে আমার দরকার আছে। বীরমল্লের সঙ্গে এই রাজ্য-সংক্রান্ত তার কি কি কথা হয়েছিল, সেই-গুলি আমি শুনবো আরো, বাঙ্গালীর মেয়ে গুজরাটে এসেছিল কেন, তার জীবনের সে পরিচয়টিও আমার অবগত হবার ইচ্ছা আছে।"

ভূষণলালের ইচ্ছার কথা শুনেই চমকিতভাবে আমি বোল্লেম, "রঙ্গিণীর জীবনের কথা ? জীবনের পরিচয় ? রঙ্গিণী আমার উপর ভারী রেগে আছে। তার জীবনের দুটি একটি কথা আমি জানি, দুটি একটি জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তাতেই তার রাগ।"

যতক্ষণ আমরা এই সকল কথা বলাবলি কোল্লেম, ততক্ষণে আমাদের অশ্বেরা নগরের একখানি সুরম্য অট্টালিকার নিকটে এসে পোঁছিল। স্নিগ্ধ-স্বরে ভূষণলাল বোল্লেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সে সব কথা আমি শুনবো ; এই

বাড়ীতেই আমি এখন থাকি, আমার সঙ্গে এই বাড়ীতেই তুমি এখন চল, এই-খানেই তোমার আহারাদি হবে, অপরাহ্নে লোক সঙ্গে দিয়ে দীনবন্ধুবাবুর বাসাতে তোমাকে পাঠিয়ে দিব। তুমি নিরাপদে আছ, তিনি সংবাদ পেয়েছেন, তাদৃশ উদ্বেগের কোন কারণ নাই।"

আমরা উভয়ে ঘোড়া থেকে নামলেম, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, অশ্বপালেরা অশ্বদুটিকে যথাস্থানে নিয়ে রাখলেন। বাড়িখানি ছোট, কিন্তু দিব্য পরিপাটী। দূরে থেকে দেখায় যেন ছবিখানি। গৃহের সজ্জাগুলিও সুন্দর সুন্দর, দাস-দাসী আছে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প। সেই স্থানে আমি স্নান আহার কোল্লেম। অপরাহ্নে আমার দীনবন্ধুবাবুর বাসায় যাবার কথা। অপরাহ্ণ আগমনের অগ্রে ভূষণলাল আমারে একটি সুসজ্জিত ঘরে আহ্বান কোল্লেন, সেই ঘরে আমি গেলেম। দেখলেম, তিনি একাকী ; মুখে মৃদু মৃদু হাস্য।

হাস্যের কারণ উপস্থিত ছিল না, তাদৃশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক একাকী আপন মনে আপনা আপনি হাস্য করেন, বোধ হয়, কোন নিগূঢ় কারণ থাকতে পারে। কারণ জিজ্ঞাসা করা আমি আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম না, তিনি আমারে বোসতে বোল্লেন, একধারে আমি উপবেশন কোল্লেম।

পূর্ব্ববৎ মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে ভূষণলাল আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন হরিদাস, ডাকাতের দলের পরিণামটা দর্শন কোল্লে? পরিণামের পরিণাম এখনো বাকী কিন্তু তুমি আমার যতদূর উপকার কোরেছ, সেটি আমার বহুদিনের বহুশ্রমের উচ্চ পুরস্কার!"

একটু কুণ্ঠিত হয়ে বিনীতবচনে আমি বোল্লেম, "সে কি মহাশয়। ও কি কথা আপনি বলেন? ডাকাতের অন্ধকূপে আমি মারা যাচ্ছিলেম, আপনি সদয় হয়ে পরিত্রাণ কোল্লেন, চিরজীবনের জন্য আমিই আপনার কাছে উপকৃত ; আপনি বোলছেন, আমি আপনার উপকার কোরেছি, এটি কি প্রকার কথা?"

ভূষণ।—যে উপকারটি তুমি আমার কোরেছ, সেটি তুমি জান না। মহা উপকার! পূর্ব্বে তোমারে আমি বোলেছি, যা তুমি দেখেছো, বাস্তবিক তা আমি নই, আমার সত্য পরিচয় অবগত হও। এখানকার মহারাজ আমার পিতৃব্য, আমার নাম ভূষণলাল নয়, ছদ্মবেশ ধারণ কোরে ঐ নামে আমি ডাকাতের দলে মিশে ছিলেম।

আমি।—ছদ্মবেশ ধারণ কোরে ডাকাতের দলে আপনি মিশেছিলেন, আমার তুল্য অনেক অভাগাকে আপনি উদ্ধার কোরেছেন, আমারেও উদ্ধার কোল্লেন, আপনার বীরত্ব-প্রভাবেই ভয়ঙ্কর ডাকাতের দল ধরা পোড়লো, এ সকল কার্য্যে আমি আপনার কি উপকার কোল্লেম?

যারে আমি ভূষণলাল বোলে জানছিলেম, অট্ট হাস্য কোরে তিনি বোল্লেন, "আমার প্রকৃত নাম রণেন্দ্র রাও, আমি এখানকার মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ; দস্যুদলপতি বীরমল্ল আমাদের এই রাজ্যটিকে বিপদগ্রস্ত কোরে তুলেছিল, দলটাকে গ্রেপ্তার করবার নিমিত্ত অনেক দিন আমি অশেষ-বিশেষ চেষ্টা কোচ্ছিলেম, কৃতকার্য্য হোতে পারি নাই, আমার পক্ষে যেটা অসাধ্য বোধ হয়েছিল, সেই গুরুতর কার্য্য তোমার দ্বারাই সুসিদ্ধ হলো!"

সাগ্রহে আমি বোলে উঠলেম, "আমার দ্বারা সুসিদ্ধ, আমি ত এ কথার কিছুই তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পাল্লেম না। মহত্ত্বগুণে আপনি আমারে ভাল-বেসেছেন, পৃথিবীর আমি কেহই নই, আমারে বন্ধু বোলে আপনি আমার গৌরব বাড়িয়েছেন, মহাবিপদ থেকে আপনি আমারে রক্ষা কোল্লেন, আপনার অনুগ্রহেই আমি প্রাণ পেলেম, আপনারে শত নমস্কার, শত ধন্যবাদ।

এখন আর এই মহাপুরুষকে ভূষণলাল বলবার আবশ্যক নাই, আমার ঐরূপ উক্তি শ্রবণ কোরে গম্ভীরবদনে রাজপুত্র বোল্লেন, "কি প্রকারে তোমার দ্বারা কার্যসিদ্ধ, সে সব অনেক কথা, এখন তুমি তোমার সেই আশ্রয়দাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাবে, সন্ধ্যার পর আবার এখানে এসো, সেই সময় সমস্ত ব্যাপার তুমি জানতে পারবে।"

অপরাহ্ণে দুটি অশ্ব সজ্জিত হলো, রাজপুত্র একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে আমার সঙ্গে দিলেন, আমরা উভয়ে অশ্বারোহণে ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে চোল্লেম। দীনবন্ধুবাবুর বাসায় উপস্থিত হোলেম। তাঁর চরণে প্রণিপাত কোরে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে আমি নিবেদন কোল্লেম। শুনে তিনি বিস্তর দুঃখ প্রকাশ কোরে শেষকালে বিস্ময় সহকারে আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। যিনি আমার সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁর পরিচয় পেয়ে দীনবন্ধুবাবু তাঁরে যথেষ্ট সমাদর কোল্লেন। সে সময় আমাদের যে কত আনন্দ, লেখনী-মুখে সে আনন্দ ব্যক্ত করা যায় না। কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাজপুত্রের আমন্ত্রণ, দীনবন্ধুবাবুকে সেই কথা জানিয়ে রাত্রের মত আমি বিদায় চাইলেম। বাবু বোল্লেন, "ভয় হয়! আবার তুমি অন্ধকারে রাস্তায় বাহির হবে, কোথা থেকে কারা এসে আবার তোমারে ধোরে ফেলবে, আবার কত কষ্ট পাবে, রাত্রিকালে তোমারে ছেড়ে দিতে আমার প্রাণ চায় না।"

প্রাণের উৎসাহে পূর্ণ সাহসে আমি বোল্লেম, "এখন আর এখানে কাহাকেও আমি ভয় করি না। অকারণে যারা আমার ভয়ের কারণ হয়েছিল, তাদের বিষ-দাঁত ভেঙে গিয়েছে, লৌহ-শৃংখল পরিধান কোরে তারা এখন জীবনের আশা পরিত্যাগ কোরেছে, আমার আর কোন ভয় নাই। আমি বিপদের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেম, তথাপি অতি নিরাপদে আছি, আপনার কাছে এইরূপ সংবাদ পাঠিয়ে যিনি আপনার উদ্বেগ শান্তির চেষ্টা কোরেছিলেন, তিনিই আমার অভয়দাতা, তিনিই আমার রক্ষাকর্তা। তাঁরই আমন্ত্রণে তাঁরই কাছে আমারে যেতে হোচ্ছে। আপনি চিন্তিত হবেন না, কোন ভয় নাই, নিরাপদেই আমি ফিরে আসবো?"

রাজপুত্রের প্রেরিত লোকটি আমার সঙ্গেই ছিলেন, তিনিও আমার বাক্যের পোষকতা কোল্লেন। দীনবন্ধুবাবু আর কোন আপত্তি উত্থাপন কোল্লেন না; আমরা উভয়ে উপর থেকে নেমে এসে পূর্ব্ববৎ অশ্বারোহণে কুমার রণেন্দ্র বাহা-দুরের নিকেতনাভিমুখে যাত্রা কোল্লেম।

ঊনবিংশ কল্প

রহস্য প্রকাশ

রাজপুত্রের নিকেতনে আমি উপস্থিত। যে ঘরে গিয়ে আমি প্রবেশ কোল্লেম, কুমার বাহাদুর তখন সে ঘরে ছিলেন না। দেখলেম, একটি নূতন লোক। সেই লোক আমারে অভ্যর্থনা কোরে সেইখানে বসালেন। আমি হরিদাস, আমার অসাক্ষাতে সে কথা তিনি শুনেছিলেন, আমার মুখে নামটি আর একবার শ্রবণ কোরে ঘনিষ্ঠভাবে বোল্লেন, "রাজকুমার এখনি আসবেন। ডাকাতেরা চালান হয়ে এসেছে, বিচারের অগ্রে হাজতী আসামীরা যে বাড়ীতে থাকে, সেই বাড়ীতেই তাদের রাখা হয়েছে। পাহারার সুবন্দোবস্তের জন্য রাজপুত্র সেখানেই গিয়েছেন। আপনি কিয়ৎক্ষণ এইখানে অপেক্ষা করুন, অবিলম্বেই তিনি আসবেন।"

কথাগুলি যিনি বোল্লেন, তিনি ভদ্রলোক। নাম শুনলেম, মঙ্গলচাঁদ। রাজসংসারের তিনি কর্ম করেন, রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর সখ্যভাব। মঙ্গলচাঁদের সঙ্গে আমার অনেক রকম কথাবার্তা হোতে লাগলো। ডাকাত ধরার কথাও তিনি কতক কতক বোল্লেন। প্রধান দুর্গে বীরমল্ল থাকতো, তার অধীনস্থ অপরাপর দুর্গে অপরাপর ডাকাতেরা থাকতো, বীরমল্ল বন্দী হবার পর সেই সকল দুর্গেও সিপাহী প্রেরিত হয়েছিল, কোতোয়ালীর লোকেরাও সিপাহীদের সঙ্গে ছিল, সে সকল দুর্গের ডাকাতেরাও ধরা পোড়েছে। শুনলেম, জনকত পালিয়ে গিয়েছে। দুর্গমধ্যে যারা ছিল না, তারা এখনও নিরাপদে আছে। অবসর-প্রতীক্ষায় কোতোয়ালীর লোকেরা সেই সকল পলাতকের অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছে।

এই সকল কথা হোচ্ছে, এমন সময় রাজপুত্র এলেন। উঠে দাঁড়িয়ে করপুটে আমি তাঁরে অভিবাদন কোল্লেম। স্মিতবদনে রাজপুত্র বোল্লেন, "বেশী রাত্রি কর নাই, শীঘ্র শীঘ্র এসেছ, ভালই হয়েছে। এদিকে অনেক কাজ ফর্সা হয়ে এসেছে! ডাকাতের কেল্লা পরিষ্কার। কেল্লার সজ্জিত ধন-রত্ন, অস্ত্র-শস্ত্র, গুপ্তযন্ত্র ইত্যাদি যতক্ষণ স্থানান্তরিত করা না হয়, ততক্ষণের জন্য কেল্লার মুখে পাহারা রাখা হয়েছে। অশ্বগুলোকে আর কুকুরগুলোকে আমাদের বাগান বাড়িতে এনে রাখা হয়েছে। সব একরকম পরিষ্কার। হাঁ, তুমি বোলছিলে, তোমার দ্বারা আমার কি মহোপকার সাধিত হয়েছে, সেটি তুমি বুঝতে পাচ্ছো না। যাতে কোরে বুঝতে পার, তাই আমি তোমাকে শুনাবো।"

নবীন আগ্রহে আমি বোল্লেম, "হাঁ রাজকুমার! কিছুই আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আমি গরিব, নিরাশ্রয়, নির্ব্বান্ধব, বিদেশী, ডাকাতের হাতে বন্দী, আমি একজন মহা প্রতাপশালী রাজপুত্রের উপকারে আসবো, ভেবে চিন্তে কিছুই ত ঠিক কোত্তে পাচ্ছি না। পরিহাসের সম্পর্ক নয়; পরিহাসের সম্পর্ক যদি হতো, তা হোলে আমি মনে কোত্তেম, পরিহাস।

হাস্য কোরে রাজপুত্র বোল্লেন, "না হরিদাস, পরিহাস নয় ; যথার্থই তুমি আমার মহোপকার সাধন কোরেছ ; তোমার কল্যাণে আমাদের এই সুবিস্তৃত রাজ্যটি নিষ্কণ্টক হয়েছে। ঐ বীরমল্ল রাজসংসারে চাকরী কোর্ত্তো ; পূর্ব্বে একটা ছোট চাকরী ছিল, মহারাজের অনুগ্রহে শেষকালে ঐ বীরমল্ল রাজ সেনাদলের হাবিলদার হয়। মহারাজ তাকে অকপটে বিশ্বাস কোত্তেন, বিশ্বাসঘাতক সেই বিশ্বাসের অহঙ্কারে নানা প্রকার দুষ্কার্য করে, গৃহবিবাদের ষড়যন্ত্রের সহায় হয়, প্রজামণ্ডলীকে বিদ্রহোন্মাদে মাতিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। গোপনে গোপনে এই সকল কার্য চোলতে থাকে। সরকারী মালখানায় বীরমল্লের প্রবেশাধিকার ছিল, রাজ্যের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় দলীলপত্র সঙ্গোপনে সেই মালখানায় থাকত, বীরমল্ল সে সন্ধান জানতো ; সেনাদলের হাবিলদার, যখন ইচ্ছা তখনই সে ব্যক্তি মালখানায় যাওয়া আসা কোত্তে পাত্তো, মহারাজের বিশ্বাস পাত্র, কেহই তার প্রবেশে বাধা দিত না, ঘর যখন জনশূন্য থাকত, কেহই যখন সেখানে উপস্থিত থাকতো না, প্রহরীরা পর্যন্ত দূরে দূরে বেড়াতে, কিম্বা নিদ্রাসুখ উপভোগ কোত্তো, সে সময়ও বীরমল্ল সেই ঘরে যেতো। কতদিন ঐ ভাব চোলেছিল, কেহই আমরা জানতেম না। হঠাৎ একদিন শুনা গেল, বীরমল্ল নিরুদ্দেশ! অনুসন্ধানে প্রকাশ পেলে, রাজ্যের সেই সকল প্রয়োজনীয় দলীলপত্র যে বাক্সটিতে ছিল, সেই বাক্সটিও অদৃশ্য!"

এই পর্যন্ত শ্রবণ কোরে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত কলেবরে নির্ণিমেষ নয়নে রাজপুত্রের মুখের দিকে আমি চাইলেম। রাজপুত্র বোলতে লাগলেন, "বীরমল্ল নিরুদ্দেশ! কতস্থানে কত অন্বেষণ করা গেল, কতদিকে কতস্থানে কতলোক প্রেরিত হলো, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তার পর দেশ বিদেশের দুরাচার দুর্দ্দান্তলোক সংগ্রহ কোরে, বীরমল্ল একটা ডাকাতের দল বাঁধলে, বনের ভিতর কোথায় কত গুপ্তদুর্গ ভূগর্ভমধ্যে অবস্থিত, বীরমল্লের সে সকল সন্ধান জানা ছিল ; সেই সকল দুর্গেই ডাকাতেরা আড্ডা কোল্লে ; প্রায় প্রতি রজনীতেই প্রজালোকের গৃহাদি লুণ্ঠন কোত্তে আরম্ভ কোল্লে ; রাজপুরী আক্রমণেরও দুরভিসন্ধি তাদের ছিল, পেরে উঠে নাই। যে দলীলগুলি বীরমল্লের হস্তগত, সেইগুলির উপর রাজসিংহাসনের নিরাপদ নির্ভর করে ; সেগুলির অভাবে মহারাজকেও সর্বক্ষণ শঙ্কিত থাকতে হয়েছিল ; সিংহাসনের জন্য জ্ঞাতিবিরোধের সম্ভাবনা হয়ে উঠেছিল ; সকলেই শঙ্কিত। আমি সেই সময় নানা প্রকার উপায় অবলম্বনে অভীষ্টসিদ্ধিতে বিফলচেষ্ট হয়ে ডাকাতের মত ছদ্মবেশ ধারণ কোরে, বীরমল্লের সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে আলাপ কোরে, তাদের দলের সঙ্গে মিশি ; লুটপাটের সময় দস্যুদলের সঙ্গী হই নাই, দুর্গমধ্যেই সর্ব্বদা অবস্থান কোত্তেম ; রাহাজানীসূত্রে ডাকাতেরা যে সকল পথিক লোককে ধোরে নিয়ে যেতো, ডাকাতেরা যেমন করে, সেই রকমে আমিও সেই সকল নিরীহ পথিক লোককে জোরে জোরে ধমক দিতেম, মুখের কাছে সঙ্গীন ধোরে ধোরে, তলোয়ার নাচিয়ে নাচিয়ে, গর্জ্জন কোরে ভয় দেখাতেম ; ডাকাতের যেমন ধর্ম্ম, মুখে মুখে সেই রকম ধর্ম্মই আমি পালন কোত্তেম, সমস্তই আমার

মুখে মুখে ; তর্জ্জন, গর্জ্জন, আস্ফালন, ভয়-প্রদর্শন, সমস্তই আমার মুখের কথায়, একটি লোকের উপরেও কাজে আমি কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা দেখাই নাই, দুর্গমধ্যে আমার জ্ঞাতসারে ডাকাতেরাও কোন নিরীহ শীকারের কেশস্পর্শ কোত্তে পারে নাই ; মুখোসে মুখাবৃত কোরে বিপন্নের উপকারের জন্য, ডাকাতের মনস্তুষ্টির জন্য ঐরূপ কার্য্যই আমি কোত্তেম ; আর কি কি কোত্তেম, সে কথা সেই কারাকূপের মধ্যেই আমি তোমাকে বোলেছি, একটু চিন্তা কোল্লেই সে সব কথা তোমার স্মরণ হোতে পারবে।"

চিন্তার প্রয়োজন হলো না, কুমারের মহত্ত্বের কথাগুলি স্পষ্টই আমার মনে ছিল, ভক্তিভাবে অভিবাদন কোরে ত্বরিতস্বরেই আমি বোল্লেম, দেবচরিত্রের সঙ্গে আপনার চরিত্রের তুলনা করা যায়! আপনার কৃপায় অনেক নিরীহ লোক দুরন্ত ডাকাতের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ কোরেছে, সে সব আমি শুনেছি, রাজভোগলালিত সুখের শরীর আপনি কেবল পরোপকারে ক্লিষ্ট কোরেছেন, পরোপকারের জন্য ডাকাতের বেশ ধোরেছেন, এটি সাধারণ ঔদার্য্যের কার্য্য নয়।

প্রফুল্ল নয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে রাজপুত্র বোল্লেন, "হাঁ, শরীর আমি ক্লিষ্ট কোরেছি, কিন্তু কাজ কিছুই কোত্তে পারি নাই ; তোমার কল্যাণেই কার্য্যসিদ্ধি। রাজার মালখানা থেকে বীরমল্ল যে বাক্সটা চুরি কোরেছিল, তোমার আবিষ্কৃত রজত-বাক্সটিই সেই দুর্ল্লভ বাক্স। ঐ বাক্স যতদিন বীরমল্লের দখলে ছিল, বীরমল্ল ততদিন আমাদের মহারাজের উপরেও আধিপত্য কোত্তে সমর্থ ছিল, ইচ্ছা কোল্লেই রাজাকে রাজ্যচ্যুত কোরে অন্য একজন রাজাকে রাজ-সিংহাসনে বসাতে পাত্তো, কিম্বা হয়ত বীরমল্ল নিজেই সিংহাসন অধিকার কোরে স্বাধীন রাজক্ষমতা পরিচালন কোরবে, মনে মনে তাঁর এই ইচ্ছা ছিল। এই সকল কারণেই মহারাজ এতদিন ভীমরুলের চাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেন নাই। তোমার কল্যাণে,—সাধু হরিদাস, তোমার কল্যাণে আমরা সকলেই নিঃশংক হোলেম, প্রজাগণ নিরাপদ হলো, রাজ্য নিরুপদ্রব হলো, কুচক্রী দস্যুদল ধরা পোড়লো। এই মহোপকারের জন্য তোমার কাছে আমি চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকলেম। জীবনকালের মধ্যে এ উপকার কদাচ আমি বিস্মৃত হব না। যাতে তুমি চিরজীবন পরমসুখে অতিবাহিত কোত্তে পার, অবশ্যই আমি উপায় কোরবো। যাতে কোরে তুমি বহু মান—বহু সম্পদের অধিকারী হও, অঙ্গীকার কোচ্ছি,—ঈশ্বরের নামে শপথ কোরে বোলছি, অবশ্য আমি সে চেষ্টা কোরবোই কোরবো।"

করযোড়ে আমি তাঁরে নমস্কার কোল্লেম। কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে থেকে, অল্প অল্প হাস্য কোরে রাজপুত্র বোল্লেন, "এসো হরিদাস, একটা মজা দেখবে এসো!"

এই দুটি কথা বোলেই তিনি দাঁড়ালেন। ঘরের উত্তরদিকে একটা দরজা খোলা ছিল, আমাকে অনুগামী হবার ইঙ্গিত কোরে সেই দরজার দিকে তিনি অগ্রসর হোতে লাগলেন, সকৌতুকে আমিও অনুগামী। মজা দেখতে চোলেছি, রাজপুত্র আমাকে কি মজা দেখাবেন, অনুমানে কিছু ভেবে পেলেম

না। জাদুঘর নয়, চিত্রশালা নয়, পশুশালা নয়, একজন রাজপুত্রের বাসভবন, এর মধ্যে মজার জিনিস কি থাকতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার কৌতূহল বেড়ে উঠলো।

আমরা চোলেছি, অগ্রে অগ্রে রাজকুমার, পশ্চাতে আমি। দরজাটা পার হয়ে আর একটা ঘর। সে ঘরে জিনিষপত্র ছিল, মানুষ ছিল না ; জিনিষের মধ্যে মজার জিনিষও কিছু নয়নগোচর হলো না ; রাজপুত্রও কোন দিকে চাইলেন না ; সম্মুখদিকে চক্ষু রেখে সমান চোলে যেতে লাগলেন। পর পর ঐ রকমের তিনটি ঘর আমরা অতিক্রম কোল্লেম। চতুর্থ গৃহে প্রবেশ। সকল ঘরেই আলো ছিল, এ ঘরেও বেশ আলো। ঘরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে রাজপুত্র একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ফুল্লনয়নে আমার দিকে চাইলেন। দৃষ্টির ভাবে আমি অনুমান কোল্লেম, এই ঘরেই হয় ত কোন রকম মজা থাকতে পারে।

ঘরের তিনদিকে তিনটি দরজা ; দরজার ধারে ধারে বড় বড় গবাক্ষ ; রাজপুত্র একে একে সেই সকল দ্বার গবাক্ষ বন্ধ কোরে দিলেন। আমি দেখলেম, ঘরের পূর্ব্বধারে একটা যবনিকা ফেলা :—নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্বে যেমন যবনিকা ফেলা থাকে, সেই রকম যবনিকা ;—তিন হস্ত দীর্ঘ ও প্রশস্ত একটি স্থান সেই যবনিকায় ঢাকা।

রাজপুত্র ধীরে ধীরে যবনিকার নিকটবর্তী হয়ে যুগলহস্তে একধারের একগাছি রজ্জু আকর্ষণ কোল্লেন, খড়্খড় শব্দে যবনিকা উত্তোলিত হলো। একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে হাসতে হাসতে তিনি বোল্লেন, "দেখ!"

কি আমি দেখলেম ?—ক্ষুদ্র একখানি চৌকী, সেই চৌকীর উপর একটি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি আপনার হাত দুখানি কোলের উপর রেখে পা ঝুলিয়ে বোসে আছে। মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পেলেম না, নাসাগ্র পর্যন্ত ঘোমটা-ঢাকা।

এইটিতেই তবে মজা আছে, এইরূপ অনুমান কোরে সতৃষ্ণ-নয়নে রাজপুত্রের মুখপানে আমি চাইলেম ; রাজপুত্র মৃদু হাস্য কোল্লেন। স্ত্রীলোকটি যেন একখানি গঠিত প্রতিমা ; নড়েও না, চড়েও না, কোল থেকে হাত দুখানিও সরায় না, অচলা।

গম্ভীর-বদনে রাজপুত্র আমাকে বোল্লেন, "এই পুত্তলিকার সঙ্গে তুমি আলাপ কর!" পুত্তলিকাকে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন, "পুত্তলিকে! ঘোমটা খোলো!"

পুত্তলিকা সমভাব নিশ্চলা। রাজপুত্রের মুখপানে আমি চেয়ে আছি, আমার মুখপানে রাজপুত্র চেয়ে আছেন ; এই সময় আমাদের নির্ব্বাক অভিনয়। পুত্তলিকা নড়ে না, রাজকুমার আরো দুই তিন পদ অগ্রসর হয়ে, ধীর হস্তে তার মুখের ঘোমটা খুলে দিলেন, মূর্ত্তি তখন যেন লজ্জা পেয়ে উজ্জ্বল নয়ন-দুটি নিমীলিত কোরে ফেল্লে। তখন আমি বুঝলেম, পুতুল নয়, প্রতিমা নয়, মূর্ত্তি সজীব!

হঠাৎ বিস্ময়ে আমার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ। কে এ? আমার বিস্ময়ের সঙ্গে পাঠকমহাশয়কে বিস্মিত হোতে হবে না, এ মূর্তি পাঠকমহাশয়ের চক্ষে নূতন নয়, পূর্ব্বের পরিচিতা। মূর্তি সেই রঙ্গিণী!

পুনর্ব্বার মৃদু হাস্য কোরে রাজপুত্র আমাকে বোল্লেন, "আলাপ কর হরিদাস, আলাপ কর! বীরমল্লের মহিষী রঙ্গিণীর সঙ্গে মন খুলে তুমি আলাপ কর!"

আমি একটু লজ্জা পেলেম। আমার লজ্জা অপেক্ষা রঙ্গিণীর লজ্জা যেন অনেক বেশী বোধ হলো। রাজপুত্র তার ঘোমটা খুলে দিলেন, হাত তুলে সে আর সে ঘোমটা টেনে মুখখানি ঢাকলে না, চক্ষু মুদে মৌনবতী হয়ে বোসে থাকলো, মস্তক ঈষৎ অবনত আমি দেখছি, রঙ্গকুশলা রঙ্গিণীর লজ্জাটার রঙ্গ কেমন, তাই আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি।

অকস্মাৎ যেন মেঘোদয়। সেই মেঘে অকস্মাৎ বৃষ্টি! রঙ্গিণীর নয়নে মেঘ নয়ন নিমীলিত, অথচ সেই নিমীলিত নেত্রের প্রান্ত ভেদ কোরে অশ্রুধারা প্রবাহিত।

রঙ্গিণী কাঁদছে। বীরমল্লের সঙ্গছাড়া হয়ে বিরহের ক্রন্দন কিম্বা পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ কোরে অনুতাপের ক্রন্দন, তখন সেটা ঠিক বুঝতে পারা গেল না। যাই কেন হোক না, যেই কেন হোক না, লোকের চক্ষে জল দেখলে আমার চক্ষে জল আসে, এটি যেন আমার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার ; নিজের দুঃখে নিজের বিপদে শৈশবাবধি অনেকবার আমি কেঁদেছি, নির্জ্জন হোলে এখনো আমি গুমরে গুমরে কাঁদি ; আমি যত কেঁদেছি, সংসারে কেহই হয় ত তত কাঁদে নাই ; আমি যত কাঁদি, কেহই হয় ত তত কাঁদে না, তথাপি পরের চক্ষে জল দেখলে আমার প্রাণে অতিশয় বেদনা অনুভূত হয়। "কেঁদো না রঙ্গিণী, কেঁদো না! চিত্তের আবেগে সে রাত্রে গোটাকতক কথা বোলে, আমি বড় অন্যায় কোরেছি, তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তুমি আমারে ক্ষমা কর!"

রাজপুত্র স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, রঙ্গিণীকে যে কথা আমি বোল্লেম, রাজপুত্রের কর্ণে সে কথাগুলি নূতন ; রঙ্গিণীকে কি কথা আমি বোলেছিলেম, রাজপুত্র তার কিছুই জানতেন না, এখনো জানেন না, আমার মুখে ঐ কটি কথা শুনে, চকিত-নেত্রে আমার পানে চেয়ে, ক্ষণকাল তিনি অবাক হয়ে থাকলেন। অনন্তর মৌনভঙ্গ কোরে তিনিও রঙ্গিণীকে বোল্লেন, "কেঁদো না রঙ্গিণী, কেঁদো না ; চুপ কর ; শান্ত হয়ে হরিদাসের সঙ্গে মনের কথা কও ; মন খুলে আলাপ কর।"

রঙ্গিণী কথা কয় না ;—নীরবে কেবল কাঁদে আর ফোঁস ফোঁস কোরে নিশ্বাস ফেলে। মনে মনে কি অনুধাবন কোরে রাজপুত্র তখন আমারে বোল্লেন, "আচ্ছা থাক হরিদাস, আমার সাক্ষাতে তোমার সঙ্গে কথা কোইতে রঙ্গিণী বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছে, আমি এখন এখান থেকে চোল্লেম, রঙ্গিণীর মনের কথাগুলি তুমি শ্রবণ কর।"

যে দিকের দরজা দিয়ে সে ঘরে আমরা প্রবেশ কোরেছিলেম, সেই দিকের

দরজাটি খুলে রাজকুমার বেরিয়ে গেলেন ; শব্দে বুঝলেম, বাহিরদিকে শিকল দিলেন। তখন সেই অবরুদ্ধগৃহে কেবল আমি আর রঙ্গিণী।

কি কথা প্রথমে আমি জিজ্ঞাসা কোরবো, অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্থির কোত্তেই পাল্লেম না। রাজপুত্রকে দেখে রঙ্গিণীর লজ্জা হোচ্ছিল, তিনি ত তাই ভেবেই সোরে গেলেন, কিন্তু লজ্জা আর রোদন সচরাচর একসঙ্গে আসে না। রঙ্গিণী কাঁদে কেন? আমারি হয় ত ভুল হয়েছে। এ রঙ্গিণী হয় ত বীরভূমের সে রঙ্গিণী নয় ;—ঠিক হয় ত আমি চিনতে পারি নাই, ;—অল্পক্ষণ একবার মাত্র দেখা, ঠিক চিনতে না পারাই সম্ভব ; সেই রঙ্গিণী মনে করে সে রাত্রে যত-গুলি কথা আমি বোলেছি, যত তিরস্কার কোরেছি, রঙ্গিণীর বুকে শেলসম সে সব কথা বেজেছে ; কথাগুলো বোলে আমি ভাল করি নাই। আমার অনুমান হয় ত ভুল। চেহারার মিলনে অনেক সময় অনেক অনর্থ ঘটে। অমরকুমারী মনে কোরে সমরকুমারীর কার্যকলাপে আমি অভিমান কোরেছিলেম, অমরকুমারী মনে কোরে সমরকুমারীর মরণে আমি শোক পেয়েছিলেম, চেহারার মিলনে শান্তিরাম দত্তের বাড়ীতে সজীব অমরকুমারীকে ভূত ভেবে আমি ভয় পেয়ে-ছিলেম ; শেষকালে সত্য তত্ত্ব প্রকাশ পায়। এই রঙ্গিণী-সম্বন্ধেও হয় ত আমার সেই রকম ভ্রম ঘোটেছে ; এ রঙ্গিণী আর বীরভূমের সে রঙ্গিণী হয় ত এক নয়।

অনুতাপের সঙ্গে মনে মনে এই সব আলোচনা কোরে, আমি স্বহস্তে রঙ্গিণীর চক্ষের জল মুছিয়ে দিলেম, ক্ষমা প্রার্থনা কোরে পুনরায় বোল্লেম, "সে কথাগুলো বলা আমার ভাল হয় নাই, কিছু মনে কোরো না তুমি, আমার ভুল হয়েছিল। তোমার মত চেহারার একটি স্ত্রীলোককে আমি একদিন এক-বার মাত্র কাশীধামে দেখেছিলেম, তাই ভেবে মনে কোরেছিলেম, হয় ত তুমিই সেই। এখন যেন বুঝতে পাচ্ছি, তুমি নও। আর কেঁদো না, শান্ত হও, সে সব কথা ভুলে যাও। আমার সাক্ষাতে তোমার কি কথা বলবার আছে, যদি কিছু থাকে, স্বচ্ছন্দে বল। বিপাকে পোড়ে ধর্ম্ম হারিয়েছ, তোমার দোষ কি? পাপাচার দস্যু বলপূর্ব্বক তোমার জাতিকুল নষ্ট কোরেছে, তোমার দোষ কি? যা কিছু তোমার বলবার থাকে, নির্ভয়ে বল, রাজপুত্রকে অনুরোধ কোরে আমি তোমার ভাল করবার চেষ্টা পাব। রাজপুত্রটি পরম দয়ালু।"

আবার রঙ্গিণীর চক্ষে জলধারা। আবার আমি নানাপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান কোল্লেম। অবশেষে নেত্রমার্জ্জনা কোরে স্তম্ভিতস্বরে রঙ্গিণী বোলতে লাগলো, "না হরিদাস, তা নয়, তোমার ভুল নয় ; আমিই সেই পাপীয়সী! আমিই সেই অভাগিনী কুলকলঙ্কিনী! তোমার ভুল নয় ; ঠিক তুমি ধোরেছ! মতি-ভ্রমে কুৎসিত প্রলোভনে ভুলে আমি কুলের বাহির হয়েছিলেম! কপালের লিখন, কপালে যা ছিল, ঘোটে গেল! পাষণ্ড ডাকাতের ঘরণী হয়ে পর-কালের পথে কাঁটা দিলেম! আমি মহাপাতকী! এ "মহাপাতকে আর কি আমার নিস্তার আছে? ইহকাল পরকাল কিছুই আমার নাই। আমি যদি—"

বোলতে বোলতে অভাগিনী আবার চক্ষের জলে ভেসে গেল। বসনাঞ্চলে

অশ্রুমার্জ্জন কোরে দিয়ে বিবিধ প্রবোধবাক্যে আমি বোল্লেম, "অত কাতরা হোচ্ছ কেন? ভাগ্যফল মানো, ভাগ্যলিপি খণ্ডন হয় না জানো, তবে কেন অধীরা হও? সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, প্রায়শ্চিত্তে সর্ব্বপাপ-বিমোচন হয়। স্বেচ্ছায় তুমি পাপপথে পদার্পণ কর নাই; একবার দুষ্টের প্রলোভনে, দ্বিতীয়বার পিশাচের আক্রমণে তুমি স্বপথ ভ্রষ্ট হোয়েছিলে. অবশ্যই সে পাপের খণ্ডন আছে। অনুতাপ এসেছে, শান্তি পাবে; অনুতাপ এক মহা প্রায়শ্চিত্ত। কাতরতা পরিত্যাগ কর। যে সব কথার আন্দোলনে প্রাণে ব্যথা লাগে, সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও; মন যাতে অন্যদিকে ফেরে, সেই সব কথা বল। সে সব গত কথা ছেড়ে দাও!"

"কি কোরে ছেড়ে দিব হরিদাস?"—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, অনুতাপিনী বোলতে লাগলো. "সে সব কথা কি কোরে ছেড়ে দিব হরিদাস?—কেমন কোরে ভুলে যাবো? প্রাণ যে কেমন হু হু করে! বুক যেন পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যায়! উঃ! পাপের আগুনের এত তেজ! কানাই! উঃ!—সেই সর্ব্বনেশে কানাই আমার পরকালের পথে বিষবৃক্ষ রোপণ কোরেছে!—মোলো না!—ডাকাতে ধোরেছিল, মশাল জেবলে জেবলে মুখে আগুন দিয়েছিল, কান কেটে নিয়েছিল, তবুও মোলো না! পালিয়ে গেল! ভোঁ ভোঁ কোরে ছুটে পালালো!—অত বড় পাপীর কি শীঘ্র মরণ আছে? আমার মরণ কবে হবে হরিদাস?—মরণটা হোলেই জুড়িয়ে যাই!—ইচ্ছা হয়, জলে অনলে ঝাঁপ দিয়ে এ পাপ-প্রাণ বিসর্জ্জন করি!"

তীব্রস্বরে আমি বোল্লেম, "আবার ঐ সব কথা? আত্মহত্যা মহাপাপ! আত্মহত্যার ইচ্ছা করাও অনন্ত নরকবাসের হেতু। ও সব কথা ভুলে যাও! আমি যে সব কথা জিজ্ঞাসা করি, শান্ত হয়ে সেই সব কথার উত্তর কর। আচ্ছা রঙ্গিণী, ডাকাতের আড্ডায় দুরাত্রে দুবার তুমি কি একটি কথা বলবার উপক্রম কোরেছিলে,—একটি লোক—কিন্তু একটি লোক—এই রকম চাপা চাপা কথা। সে কথাটি কি এখন তুমি স্মরণ কোত্তে পার? কার কথা সেটি? কোন লোকটি?—স্মরণ হয় কি?"

রঙ্গিণী।—স্মরণ?—ও হোঃ!—স্মরণ আমার সব হয়।—তবে কি না—তবে কি না—কোন রাত্রে—

আমি।—যে যে রাত্রে দস্যুদলের ভয়ানক ভয়ানক নিষ্ঠুরতার কথা বোলতে বোলতে—একটি লোক—একটি লোক—

রঙ্গিণী।—ওঃ হোঃ!—সেই কথা?—সে কথা আর এখন কেন? সে দিন তো ফুরিয়ে গিয়েছে! ডাকাতেরা যখন ধরা পোড়েছে, তখন আর—

আমি।—কার কথা তুমি বোলবে মনে কোরেছিলে, সেই কথাই আমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছি। সে লোকটিও কি ধরা পোড়েছে? নাম কর দেখি, বুঝি আমি, কোন লোকটিকে—

রঙ্গিণী।—আহা হা!—তা কি আর তুমি জানো না?—সে লোকটির সঙ্গে তোমার কত কথা, কত ভাব, তাকে আর তুমি জানো না?

আমি।—তবু?—তবু?—নামটি একবার শুনতে পেলে—

রঙ্গিণী।—(চুপি চুপি) সেই ভূষণলাল—ভূষণলাল!—আহা!—ডাকাতের দলে থাকতো, ডাকাত নিশ্চয়, কিন্তু—এদিকে কিন্তু দয়ার সাগর! দত্তকুলের পেল্লাদ!

আমি।—(মনোবেগ সংবরণ করিয়া) হাঁ, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, সে কথা সত্য, নিকৃষ্ট কুলের কথা তুমি বোলছ, সে কুলে তাঁর উদ্ভব নয়, দৈত্যকুলের যম তিনি! তথায় পদতলে বহু দৈত্য বিমর্দ্দিত।

রঙ্গিণী।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁ!—অ্যাঁ—তাই না কি? জানো তুমি? জানো? বলো,—বলো,—আহা! বলো হরিদাস,—কে তিনি? কোন কুলে—

আমি।—কুলের পরিচয় শীঘ্রই তুমি জানতে পারবে। আমার মুখে এখনকার কথায়, দৈত্যকুলে তাঁর জন্ম নয়। যেমন তুমি বুঝেছ, যেমন তুমি দেখেছ, বাস্তবিক তাই তিনি,—গরিবের বন্ধু,—দয়ার সাগর!

রঙ্গিণী—(সজলনয়নে চাহিয়া) আহা! তিনিও কি তবে ধরা পোড়েছেন?

আমি।—তা আমি এখন কেমন কোরে বোলব? দলের ভিতরের সকলকেই কি আমি চিনে রেখেছি? সকলেরই কি আমি মুখ দেখেছি?

রঙ্গিণী।—তবে এই যে তুমি বোলছিলে, দত্তকুলের যম তিনি। যম কি কখনো ধরা পড়ে?

আমি।—(অধোমুখে হাস্য করিয়া) তবে হয় ত পড়েন নাই!

রঙ্গিণী—(আহ্লাদে হস্ত তুলিয়া) আহা! বেঁচে থাকো হরিদাস, বেঁচে থাকো! তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! তুমি রাজা হও!

রঙ্গিণীর মুখে ঐ আশীর্ব্বচন বিনির্গত হবামাত্র দ্বারের শৃঙ্খল উদ্ঘাটিত হয়ে গেল, সেই দিব্যমূর্ত্তি প্রবেশ কোল্লেন;—প্রবেশ কোরেই প্রসন্নবদনে সুমধুরস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হরিদাস, তোমার রঙ্গিণীটির লজ্জা এখন ভেঙ্গেছে?"

সমস্বরেই আমি উত্তর দিলেম, "পরীক্ষাকর্ত্তা আমি নই, আপনি পরীক্ষা করুন। রঙ্গিণী আমাকে জিজ্ঞাসা কোচ্ছিল, ডাকাতের দলে যে একটি ভূষণলাল ছিল, দলের সঙ্গে সেই ভূষণলালটি কি ধরা পোড়েছে?"

গম্ভীরবদনে রাজপুত্র পুনঃ প্রশ্ন কোল্লেন, "সে প্রশ্নে তুমি কিরূপ উত্তর দিয়েছ?"

আমি বোল্লেম, "সব তত্ত্ব আমার জানা নাই, রঙ্গিণীর প্রশ্নের ঠিক উত্তর আমি দিতে পারি নাই, আপনি যদি জানেন, রঙ্গিণীর সংশয় দূর করুন। অনুমানে আমি বোলেছি, ভূষণলাল হয় ত ধরা পড়েন নাই; অনুমানের জোরেই রঙ্গিণীর মুখে আমি বড় বড় আশীর্ব্বাদ পেয়েছি। আপনি যদি নিঃসংশয়ে উত্তর দিতে পারেন, তা হোলে আমার অপেক্ষা সহস্রগুণে বড় বড় আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হবেন।"

রঙ্গিণী এই সময় বিস্ফারিত-নেত্রে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে থাকলো। রাজপুত্র বোল্লেন, "বীরমল্লের মহিষী ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের কন্যার আশীর্ব্বাদ

আমি মস্তকে ধারণ কোত্তে প্রস্তুত ; কিন্তু দস্যুদলের বিচারের অগ্রে আশীর্ব্বাদপ্রাপ্তির হেতুবাদটি আমি প্রকাশ কোত্তে সঙ্কুচিত হোচ্ছি। তুমি সেই ভূষণলালের একটি নূতন আখ্যা দিয়েছ, দৈত্যকুলের যম ; সত্য যদি ভূষণলালের ঐ আখ্যা হয়, তবে ত ডাকাতের সঙ্গে ধরা না পড়াই সম্ভব।"

আমি চমকিত হোলেম ; মনে কোল্লেম, রাজকুমারের বাহিরে যাওয়া কেবল ছলনা। দ্বারে শৃঙ্খলাবদ্ধ কোরে দ্বারের নিকটেই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, রঙ্গিণীর সঙ্গে আমার যতগুলি কথা হয়েছে, সমস্তই তিনি শ্রবণ কোরেছেন। একপ্রকার ভালই হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার মনোভাব, ভূষণলালের প্রতি রঙ্গিণীর মনোভাব, উত্তমরূপেই তিনি জানতে পেরেছেন। আরো একটা কষ্ট-কর কৈফিয়তের দায় থেকে আমি অব্যাহতি পেয়েছি। বীরমল্লের দ্বারা সর্ব-প্রথম রঙ্গিণীর ধর্ম্মনষ্ট হয় নাই, ধরা পড়বার পূর্ব্বে রঙ্গিণীর সতীত্বধর্ম্ম ছিল না, সেটুকু রঙ্গিণীর নিজের মুখেই ব্যক্ত হয়ে গেল। গোপনে দাঁড়িয়ে রাজকুমার আপন কর্ণে ঐ পাপিনীর পাপস্বীকারবাক্যগুলি শ্রবণ কোল্লেন : কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বর্ণনা যদি আবশ্যক হয়,—আছেও কিছু আবশ্যক,—কেবল সেইটুকু আমার বর্ণনার জন্য অবশিষ্ট থাকলো।

রঙ্গিণী মৌনবতী। যিনিই সেই ভূষণলাল, তিনিই এই রাজকুমার, রঙ্গিণী সেটি বুঝতে পাল্লে না। ডাকাতের দুর্গে ভূষণলালের খোলামুখ রঙ্গিণী একবারও দেখে নাই, সুতরাং রাজপুত্রকে চিনতে পারা অবশ্যই তার পক্ষে অসম্ভব। রঙ্গিণী সেই ঘরেই থাকলো, রাজপুত্রের সঙ্গে আমি অন্য ঘরে চোলে এলেম। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবার অগ্রে রাজপুত্র আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "পাপের জন্য রঙ্গিণী অনুতাপ কোচ্ছিল, ডাকাতের হাতে পোড়ে-ছিল, ডাকাত তার ধর্ম্ম নষ্ট কোরেছিল, সেই পাপের জন্য অনুতাপ এটাই বা কি রকম কথা ? একবার বোলেছিল কানাই ; কানায়ের নামে গালাগালি দিয়েছিল ; কানাইটা কে ? রঙ্গিণীর পাপের সঙ্গে কানায়ের কি সম্বন্ধ ? সাধারণ স্ত্রীলোকের মনে পাপের জন্য অনুতাপ আসে, সেটা কি প্রকার পাপ ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "পুরুষ যতপ্রকার পাপকর্ম্ম কোত্তে পারে, সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকেও তাই পারে ; রঙ্গিণী অন্য পাপে পাপিনী নয়, রঙ্গিণীর পাপ কেবল ব্যভিচার।" এই পর্যন্ত বোলে, রঙ্গিণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী রাজপুত্রের কাছে আমি বিবৃত কোল্লেম। কর্ণে অঙ্গুলী দিয়ে, সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন কোরে রাজপুত্র শিউরে উঠলেন। অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে উদাসনয়নে আমার দিকে চেয়ে, প্রশান্তস্বরে তিনি বোল্লেন, "সে কার্যে রঙ্গিণীর তাদৃশ দোষ দৃষ্ট হোচ্ছে না ; প্রথম-পাপের মূলে ছলনা আর প্রলোভন, দ্বিতীয় ঘটনায় প্রবল পক্ষের বলপ্রকাশ ; এ দুটি আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম। রঙ্গিণী স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক ব্যভিচার-পাপে লিপ্ত হয় না, প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তিও অবলম্বন করে নাই, রঙ্গিণীর সে পাপের ক্ষমা আছে ;—এখানেও আছে, উপরেও আছে। রঙ্গিণী দুঃখিনী, পাপের জন্য রঙ্গিণী অনুতাপিনী, রঙ্গিণীকে আমি আশ্রয়

দিব। বুদ্ধির দোষে কুলোকের সংগে কুলের বাহির হয়ে এসেছে, কলঙ্কিনী আর স্বদেশে মা-বাপের কাছে ফিরে যেতে পারবে না, পথে পথে কেঁদে কেঁদে ভিখারিণী হয়ে বেড়াবে, সেটাও বড় কষ্টের কথা : আমার যখন জ্ঞাতসার হয়েছে, পাপিনীর যখন অনুতাপ এসেছে, তখন আর বাজারের সাধারণ বেশ্যাবৃত্তির পথ মুক্ত থাকছে না, রঙ্গিণীকে আমি আশ্রয় দিব। সামান্য দাসী হয়ে থাকতে হবে না, নূতন পাপেও লিপ্ত হোতে পাবে না, আমার আশ্রয়ে রঙ্গিণী এখন একপ্রকার সম্ভবমত সুখে এখানে অবস্থান কোত্তে পারবে। রঙ্গিণীকে তুমি এই কথা বোলো, অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা কোরো, যে রকম উত্তর পাও, আমাকে জানিও।"

সন্তুষ্ট হয়ে রাজকুমারকে আমি অভিবাদন কোল্লেম। সে রাত্রে রাজকুমারের নিকেতনেই আমারে থাকতে হলো, পরদিন প্রভাতে কুমারদত্ত অশ্বারোহণে দীনবন্ধুবাবুর বাসায় গেলেম। পূর্ব্বদিন সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেম, এই দিন দীনবন্ধুবাবুকে আগাগোড়া সকল কথা বিশেষরূপে জানালেম। আমার প্রতি একজন সদাশয় স্বাধীন রাজকুমারের অনুগ্রহ, এই পরিচয় পেয়ে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। তিন দিন পরে রাজপুত্রের এক চিঠি নিয়ে একজন অশ্বারোহী বার্ত্তাবহ দূত আমাদের বাসায় এলো। তার সংগে আমি পুনর্ব্বার রাজপুত্রের আবাসে উপস্থিত হোলেম। সেই দিন শুনলেম, রাজদরবারে দস্যুদলের বিচার আরম্ভ হয়েছে, তাদের সব বনদুর্গ সমূলে ধ্বংস কোরে সমভূমি করা হয়েছে, দস্যুভাণ্ডারের সমস্ত ধনরত্ন, পশুপক্ষী, অস্ত্রশস্ত্র রাজবাড়ীতে আনয়ন করা হয়েছে, পলাতক ডাকাতেরা সে রাজ্যের সীমা ত্যাগ কোরে পালিয়ে গিয়েছে, রাজ্য এক প্রকার নিষ্কণ্টক।

ক্রমে ক্রমে আরো আমি শুনলেম, ডাকাতের দলে অনেক দেশের লোক আছে। হিন্দু, মুসলমান, ফিরিংগী, পর্ত্তুগীজ, পাহাড়ী, ভীল, পাঞ্জাবী, তিব্বতী, ভুটিয়া, পেশোয়ারী, এই প্রকার নানা দেশের নানা জাতি একসংগে মিলিত ; বীরমল্লের কুমন্ত্রণায় রাজ্যের যে সকল প্রজা রাজবিদ্রোহী হয়েছিল, তারাও ঐ দলভুক্ত। এই সব আমি শুনলেম। মনের ভিতর একটা সংশয় উপস্থিত হলো। যে সংশয়টা পূর্ব্বে একবার এসেছিল, সেই সংশয় আবার। অত দেশের অত লোক দস্যুচক্রে সম্মিলিত, তাদের ভিতর বাংগালী কেহ আছে কি না, সেই সংশয়। রাজপুত্রকে আমি বোল্লেম, "ডাকাতেরা যখন সকলে দলবদ্ধ হয়ে বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়ায়, তাদের প্রতি সওয়াল হয়, সেই সময় আমি একবার তাদের সকলকার মুখ দেখবো।"

রাজপুত্র হাস্য কোল্লেন। ছেলেমানুষ আমি, সং-তামাসা দেখতে ছেলেমানুষের বড় আমোদ, সেইটি বিবেচনা কোরেই হয় ত রাজপুত্রের হাস্য, এই ভেবে আমি একটু লজ্জিত হোলেম। রাজপুত্র বোল্লেন, "ডাকাতের মুখ দেখা কি তোমার বাকি আছে ? কেল্লার ভিতর কয়েদ ছিলে, খালাস পেয়ে বন্ধনগ্রস্ত ডাকাতের দলকে নিশ্চেষ্ট দর্শন কোরেছ, তবুও কি সে তোমার সাধ মিটে নাই ?"

কি উত্তর করি, মনে মনে খানিকক্ষণ ভাবলেম ;—ভেবে চিনতে শেষে বোল্লেম, "সাধ মিটাবার ইচ্ছায় নয়, কৌতুহল মিটাবার ইচ্ছা। বন্ধনদশায় যাদের আমি দেখেছি, তারা এক জায়গায় ছিল, আপনি বোলেছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে ভিন্ন ভিন্ন দল ; বিচারস্থলে সব দলের সবগুলো একত্র, এই সময় সব মুখ আমি এক জায়গায় দর্শন কোত্তে ইচ্ছা করি। কেন করি, সে কথাও আমি আপনার কাছে অপ্রকাশ রাখবো না। গুজরাটের জঙ্গলে অন্ধকারের ভিতর ডাকাতেরা আমারে ধোরেছিল, সে দিন সেই সময় সেই পথে আমি যাব, ডাকাতেরা সে সংবাদটা কিরূপে জানতে পেরেছিল, প্রথম রাত্রি থেকেই সেই তর্ক আমার মনে মনে জাগছিল, এখনো জাগছে। আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে, একরাত্রে আপনারে আমি বোলেছি, অকারণে স্বদেশে আমার অনেক শত্রু হয়েছে, বিদেশে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই, সে সব জায়গাতেও সেই সব শত্রুপক্ষের এক একটা মূর্ত্তি আমার চক্ষে পড়ে ; এখানে—এই দস্যুদলের মধ্যে সেই দলের কোন গুপ্তচর আছে কি না, মুখ দেখে দেখে তাই আমি পরীক্ষা কোরবো, চিনতে পারি ত চিনবো, এই আমার ইচ্ছা।"

গম্ভীরবদনে রাজপুত্র বোল্লেন, "কোন বাধা নাই। বিচারস্থল অবারিত ; বিশেষতঃ বড় বড় মোকদ্দমার বিচার যেখানে হয়, বহুলোক সেইখানে উপস্থিত থেকে আসামীদের মূর্ত্তি দর্শন করে, বাক্য শ্রবণ করে, দণ্ডাজ্ঞা অবগত হয় ; প্রজাহিতৈষী নিরপেক্ষ বিচারপতিগণের বাস্তবিক সেটি অভিপ্রেত। কল্যই আমি তোমারে সঙ্গে কোরে ডাকাতগণের মুখ দেখাবো ; কেবল ডাকাতের মুখ দেখিয়েই আমি তোমারে ফিরিয়ে আনবো না, দরবারের কার্য্যাবসানে মহারাজের মুখখানিও তোমারে দেখাবো। তুমি আমাদের যে উপকার কোরেছ, মহারাজকে আমি সে সব কথা বোলেছি, মহারাজ বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ কোরে তোমারে দেখতে চেয়েছেন।"

মহানন্দে আমার অন্তঃকরণ পরিপ্লুত। কল্য আমি ডাকাত দেখবো, দেশের গৌরব আর্য্যবংশের স্বাধীন রাজা, সেই রাজমুখ আমি দর্শন কোরবো, অন্তরসাগরে বিপুল আনন্দের প্রবল তরঙ্গ। ভবানীদেবীর মন্দিরে উৎসবস্থলে মহারাজকে একবার আমি দর্শন কোরেছি, সে দর্শনে তাদৃশী তৃপ্তিলাভ হয় নাই, নিকটে গিয়ে দর্শন কোরবো, শ্রীমুখের দুই একটি বাক্যও হয় ত শ্রবণ কোরবো, এই আমার আশা, এই আমার আনন্দ পরম সৌভাগ্য আমার !

দিন গেল, রাত্রি গেল, পরদিন প্রভাতের নব-প্রভাকর সুপ্রকাশ ; আমার আশাগগনেও নবসূর্য্য সমুদিত। অগ্রেই প্রস্তুত হয়ে থাকলেম, যথাসময়ে কুমার রণেন্দ্র বাহাদুর আমারে সঙ্গে নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হোলেন। বিচারালয় লোকারণ্য। বিচারাসনের সম্মুখে সুপরিচ্ছদধারী সুন্দর সুন্দর পাত্র, মিত্র, অমাত্য প্রভৃতি পরিষদবর্গ, তিনদিকে নানাবর্ণের পরিচ্ছদ-পরিহিত অগণিত দর্শকবর্গ, মধ্যস্থলে সুদৃঢ় লৌহনিগড়বদ্ধ হ্রস্বদীর্ঘ বিকটবদন দস্যুবর্গ। রাজপুত্র আমারে রাজকায়দায় সুসজ্জিত সভাসমীপে নিয়ে গেলেন, রাজকায়দায়

সদস্য-পরিবেষ্টিত, রাজমুকুটশোভিত মহারাজের সিংহাসনতলে সসম্ভ্রমে আমি প্রণিপাত কোল্লেম। তার পর দস্যু-দর্শন।

পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকল মনুষ্যের গঠনে হস্তপদাদি সমান অবয়ব দৃষ্ট হয়ে থাকে; তথাপি স্বাতন্ত্র্যের কেমন একপ্রকার সুন্দর নিদর্শন, বিশেষরূপে মুখদর্শন কোল্লেই কোন দেশের কোন লোক, অনুভবে বেশ বুঝা যায়। সকল দেশের সকল লোককে আমি দর্শন করি নাই, তথাপি যে দেশের যত লোক আমি দেখেছি, মুখের গঠনে সে সকল লোককে পৃথক পৃথকরূপে আমি চিনতে পারি; বিশেষতঃ বাঙ্গালী চিনতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না, সন্দেহ আসে না, চক্ষে একটু ধাঁধাও লাগে না। একে একে শ্রেণীবন্ধ সমস্ত ডাকাতকে আমি দর্শন কোল্লেম, প্রত্যেকের সম্মুখে গিয়ে গিয়ে বিশেষরূপে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সকলের মুখগুলি আমি নিরীক্ষণ কোল্লেম; অন্তরে অবশ্য ভয় হোতে লাগলো, বিকটাকার দুরন্ত লোকের মুখ দেখলেই স্বভাবতঃ হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়,—ভয় হোতে লাগলো; চতুর্দ্দিকে তত লোক, তত লোকের ভিতর আমি ঐ সব ডাকাত দেখছি, তবুও মনে মনে ভয়। বাঁধা ডাকাত, নিরস্ত্র, তারা আমারে ধোরে ফেলতে পারবে না, ভয়কে একটু পশ্চাতে রেখে সাহসে সাহসে সকলগুলার মুখ আমি দেখতে লাগলেম। খানকতক মুখ আমারে দেখে যেন ফুলে ফুলে উঠলো, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কোল্লে, চক্ষুগুলো পাকল কোরে বিকটদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে, তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না; একে একে সব মুখগুলো আমি দেখলেম,—দেখে দেখে স্থির কোল্লেম, দুখানা বাঙালীর মুখ; দলের ভিতর দুজনমাত্র বঙ্গবাসী।

বিচারস্থলে ডাকাতের সঙ্গে যাঁদের কথা হয়, ডাকাতকে যারা কথা জিজ্ঞাসা করেন, কুমার রণেন্দ্র বাহাদুরের দ্বারা অনুরোধ কোরিয়ে তাঁদের মধ্যে একজনকে আমি আমার মনের কথা জানালেম। বাঙালী বোলে যে দুজনকে আমি চিনলেম, তাদের বাড়ী কোথায়, নাম কি, এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে অনুরোধ কোল্লেম; প্রশ্নকর্তা আমার অনুরোধ রাখলেন। জিজ্ঞাসায় জানা হলো, একজনের নাম ব্রজনাথ ভট্টাচার্য, একজনের নাম হেমচন্দ্র পালধি।

বাহবা বাহবা! বঙ্গদেশের ভট্টাচার্য একজন ডাকাত! বহরমপুরের আদালতের মেদিনীপুরের নূতন আসামীটা যে তিনজন লোকের নাম কোরেছিল, তাদের মধ্যেই এই দুজন। হ্যামচাঁদ পালুই, বজো ভশ্চাজ্জি, এই দুই নামে হেমচন্দ্র পালধি আর ব্রজনাথ ভট্টাচার্য পাওয়া যাচ্ছে। নামেই কেবল পাওয়া যাচ্ছে, তাদের চেহারা আমি পূর্ব্বে দেখি নাই, আমার জানত পক্ষে কোথাও তারা ধরাও পড়ে নাই, আমারে তারা কোথাও দেখেছিল কি না, তাও আমি জানি না;—বোধ হয় দেখে থাকবে; অন্ধকারে পথ ভুলে গুজরাটের জঙ্গলে আমি প্রবেশ কোরেছিলেম, তারাই হয় ত বীরমল্লের দলে সংবাদ দিয়েছিল; পূর্ব্বের দেখা না থাকলে তারা আমারে চিনতে পাত্তো না; বোধ হয় পূর্ব্বে কোথায় দেখে থাকবে। নিশ্চয়ই তারা রক্তদন্তের দলের লোক। বাহাদুর রক্ত-

দন্ত! বলিহারি প্রতাপ! অভিশপ্ত য়িহুদীর বংশনাশের মতলবে ফরাসী যে শত পাদরী-মহাশয়েরা যে প্রকারে পৃথিবীর সর্ব্বস্থলে গুপ্তচরের বাজার বোসিয়েছিলেন, রক্তদন্তও যেন সেইরূপ ক্ষমতা ধরে বোধ হয়! বাহাদুর রক্ত-দন্ত! রক্তদন্ত বাহাদুর অথবা মোহনলালবাবু বাহাদুর, আমার ভাগ্যনাটকের যবনিকাপতনের পূর্ব্বে হয় ত সেটি নির্ণয় করবার উপায় হবে না!

হেমচন্দ্র পালধি আর ব্রজনাথ ভট্টাচার্য, এই দুটি নাম পূর্ব্বে আমার শুনা হয়েছিল, মানুষদুটি এখন দেখা হলো। কে তারা, কোথায় থাকে, কি করে, রক্তদন্ত ওরফে জটাধর-নামধারী কোন লোককে তারা চিনে কি না, সে সব কথা জিজ্ঞাসা করবার স্থান নয়; গুজরাটের ডাকাতী মোকদ্দমার সঙ্গে সে সব কথার কিছুমাত্র সংস্রব নাই, কাজে কাজেই নাম-দুটি জেনে আর মানুষ-দুটি দেখেই সে ক্ষেত্রে আমাকে তুষ্ট থাকতে হলো।

কুমার রণেন্দ্র বাহাদুর আমার মুখপানে চাইলেন, আমিও তাঁর মুখপানে চাইলেম; সসম্ভ্রমে আমি অভিবাদন কোল্লেম। দরবার-স্থল থেকে কুমার বাহা-দুর আমাকে রাজপ্রাসাদের একটি বহির্কক্ষে নিয়ে বসালেন।

রাজকার্যাবসানে মহারাজ যখন আপন বিরামকক্ষে নির্জ্জনে উপবিষ্ট, কুমার বাহাদুর সেই সময় আমাকে মহারাজ-সমীপে পেস কোরে দিলেন; বিনম্রবদনে বিনীতস্বরে বোল্লেন, "মহারাজ! যে বালকের কথা আমি নিবেদন কোরেছিলেম, বিশ্বাসঘাতক বীরমল্লের গুপ্তগৃহে যে বালক সেই অপহৃত বাক্সটির উদ্ধার কোরেছে, এই সেই বালক; এই বালকের নাম হরিদাস, বঙ্গ-দেশে নিবাস, শৈশবাবধি নিরাশ্রয়।"

প্রসন্নদৃষ্টিতে মহারাজ আমার মুখের দিকে নেত্রপাত কোল্লেন; আমি অভিবাদন কোল্লেম। করযোড়ে মহারাজের অনুমতিক্রমে আমি যখন ভূজানু-হয়ে রাজাসনের সন্নিকটে নতমস্তকে উপবিষ্ট হোলেম, মহারাজ তখন আমার মস্তকে করার্পণ কোরে প্রশংসাসূচক, আশীর্ব্বাদসূচক, আশ্বাসসূচক গুটি-কতক অনুকূলবাক্যে উচ্চারণ কোল্লেন; চরিতার্থ জ্ঞান কোরে পুনরায় আমি অভিবাদন কোল্লেম।

সে দিন আমার এই পর্যন্ত রাজদর্শন। ভ্রাতুষ্পুত্রের কর্ণে মহারাজ সেই সময় চুপি চুপি কি উপদেশ দিলেন, শুনতে পেলেম না। অতঃপর রাজপুত্র গাত্রোত্থান কোরে সদয়নয়নে আমার দিকে চাইলেন, তৃতীয়বার মহারাজকে অভিবাদন কোরে রাজপুত্রের সঙ্গে সে ঘর থেকে আমি বেরুলেম; এক অভি-নব উল্লাসে আমার কলেবর রোমাঞ্চিত।

রাজপুত্রের নিকেতনে আমরা উপস্থিত। সে রাত্রেও সেই স্থানে আমার অবস্থান। পরদিন রাজকুমার আমাকে রাজদত্ত সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ মূল্য-বান শিরোপা প্রদান কোল্লেন। জন্মে কখনো যেরূপ চমৎকার পরিচ্ছদ আমার নয়নগোচর হয় নাই, সেই পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে দীনবন্ধুবাবুর বাসায় আমি এলেম; রাজদরবারে, রাজগৃহে যা যা আমি দর্শন কোরেছি, যে সব কথা শ্রবণ

কোরেছি, মহারাজের নিকটে যেরূপ সমাদর প্রাপ্ত হয়েছি, দীনবন্ধুবাবুকে সেই সব কথা বোল্লেম ; বিস্মিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে দীনবন্ধুবাবু পরমানন্দ প্রকাশ কোল্লেন।

সাতদিন অতিবাহিত। রাজভবনে আমি যাই, বাসাতেও আসি, উভয়-স্থানেই আমার সমান আদর, সমান যত্ন। মনের ভিতর নানা উদ্বেগের যন্ত্রণা থাকলেও আমি যেন তখন নির্ভয়হৃদয়ে নিত্য নিত্য নূতন আনন্দ উপভোগ কোত্তে লাগ্লেম। কুমার বাহাদুরের সাগ্রহ অনুরোধে একদিন আমি দীনবন্ধুকে রাজ-ভবনে নিয়ে যাই, মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না, রাজপুত্রের সঙ্গেই কথোপ-কথন, রাজপুত্রের পরম সন্তোষ, কুমার বাহাদুরের অমায়িক ব্যবহারে দীনবন্ধু-বাবুও আপ্যায়িত। মর্যাদাপন্ন লোকের সামাজিক ব্যবহার সর্ব্ব-সমাজের আদর্শ : সে ব্যবহারে দম্ভ থাকে না, অভিমান থাকে না, ছোট-বড় বিচার থাকে না, সেই এক অপূর্ব্ব ভাব। কুমার বাহাদুর একদিন অপরাহ্নকালে একখানি শোভন যানে আরোহণ কোরে আমাদের বাসায় উপস্থিত হন, আমরা নিতান্ত সংকুচিত হয়ে যথাসম্ভব সমাদরে তাঁর অভ্যর্থনা করি। প্রায় একঘণ্টা থেকে, সখ্যভাবে দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে আলাপ কোরে রাজপুত্র বিদায় হোলেন। আমি কে, সেটি যদি তখন আমার জানা থাকতো, আমার মন তখন যদি নিশ্চিন্ত থাকতো, অজ্ঞাত বৈরীদলের ভয়ে আমার অন্তঃকরণ যদি সর্ব্বক্ষণ অভিভূত না থাকতো, তা হোলে আমি তখন ঐ সকল আনন্দকে স্বর্গসুখ বিবেচনা কোত্তেম।

আরো এক সপ্তাহ। রাজদরবারে দস্যুদলের বিচার-কার্য সমাপ্ত। সাক্ষী-সাবুদের প্রয়োজন ছিল না, জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ, সুবিচারেই দণ্ডাজ্ঞা। দল-পতি বীরমল্ল। এই ব্যক্তি রাজসংসারের চাকর, বিশ্বাসঘাতক, দলীল-অপহারক, রাজবিদ্রোহী, বিদ্রোহ-উত্তেজক, তাহার উপর প্রজালোকের ধনপ্রাণ-হরণকারী সাংঘাতিক ডাকাত ; এই সকল অপরাধে বীরমল্লের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। জল্লাদের খড়্গে মস্তকচ্ছেদন কিম্বা ফাঁসরজ্জুতে বন্ধন, তাদৃশ অপরাধীর পক্ষে উপযুক্ত বোধ হয় নাই, মত্তহস্তীর পদতলে নিক্ষেপ কোরে সেই পাপাত্মার পাপজীবনের অবসান করা হয় ; অবশিষ্ট ডাকাতেরা চিরজীবনের জন্য রাজ-কারাগারে অবরুদ্ধ থাকবার দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ; এই বিচারে রাজ্যের সমস্ত লোক পরিতুষ্ট,—সমস্ত লোক নিরাপদ।

আমিও পরিতুষ্ট : সে রাজ্যে আমিও তখন নিরাপদ ; কিন্তু পরিতোষের একাংশ যেন কিছু শূন্য শূন্য। ব্রজনাথ ভট্টাচার্য আর হেমচন্দ্র পালধি এই দস্যুদলে ছিল : পূর্ব্বে যদি ঐ দুটো নাম আমার শুনা না থাকত, তা হোলে আমি অন্য কোন কথাই ভাবতেম না, যারা আমার শত্রুদলের সহচর, তাদের মধ্যে একজনের মুখেই ঐ নাম আমার শুনা। বিচারস্থলে আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করবার সুবিধা ঘটে নাই এখন যদি কোন রকমে সুযোগ পাই, কারাগারে প্রবেশ কোরে লোকদুটোকে জিজ্ঞাসা করি, জটাধর তরফদার নামে কোন লোককে তারা জানে কি না, চিনে কি না, জটাধরের সঙ্গে তাদের কোন সংস্রব আছে কি না, অমরকুমারী নামে একটি কুমারী কুলবালাকে জটাধরের

লোকেরা চুরি কোরেছে, সে সংবাদ তারা কিছু রাখে কি না, অমরকুমারীর সংবাদ তারা কিছু জানে কি না?

যদি সুযোগ পাই, সেই দুটো লোককে ঐ কথাগুলি আমি জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ আমার ইচ্ছা। সে সুযোগ কি প্রকারে ঘটে, অনেক চিন্তা কোল্লেম; শেষকালে কুমার রণেন্দ্র বাহাদুরকে মনের ইচ্ছা জানালেম। ইচ্ছা যদি একাগ্র হয়, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেই ইচ্ছা ফলবতী হয়ে থাকে, কোন কোন লোকের মুখে এই কথা আমি শুনেছি। কুমার রণেন্দ্র বাহাদুর আমার ইচ্ছায় অনুমোদন কোল্লেন। সময় অবধারিত হলো। কারাগারের অধ্যক্ষকে অগ্রে উপদেশ দিয়ে, কুমার বাহাদুর আমারে একদিন প্রাতঃকালে কারাগারের মধ্যে নিয়ে গেলেন; বহুলোকের ভিতর চিনে চিনে সেই দুটো লোককে আমি ধোল্লেম। আমার বামদিকে কারাধ্যক্ষ, দক্ষিণে রাজকুমার, মধ্যস্থলে আমি। তিনজনেই আমরা সশস্ত্র। হেমচন্দ্র পালধি, রজনাথ ভট্টাচার্য। দুজনে অবশ্যই এক জায়গায় ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথকরূপে আমার প্রশ্নগুলি আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কিছুই ফল হলো না;—আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তারা কেবল চক্ষু ঘুরুলে, দাঁত খিঁচুলে, হাতকড়ী-বাঁধা হাতগুলো জোরে জোরে নাচালে, একটিও কথা কোইলে না,—কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলে না। কেবল আমার প্রশ্ন নয়, কারাধ্যক্ষও আমার প্রশ্নের প্রতিধ্বনি কোরে সেই সব কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। সমান ফল;—একটিমাত্র উত্তরও প্রাপ্ত হওয়া গেল না; অগত্যা আমরা হতাশ হয়ে ফিরে এলেম।

হতাশে আমরা ফিরে এলেম, কিন্তু মনে মনে বুঝা গেল, অনেক কথা তারা জানে; পাকা ডাকাত! রক্তদন্তের বন্ধুলোক! প্রশ্ন শুনে শুনে মুখ-চক্ষের ভাব যে রকম তারা দেখালে, তাতে কোরেই বুঝতে পারা গেল, দলের লোক। সত্য সত্য জানা-শুনা না থাকলে ওরকম তারা কোত্তো না; চুপ কোরেও থাকতো না; একটা না একটা সোজা সোজা উত্তর দিতো। তা যখন দিলে না, তখন কি আর নিশ্চয় কোত্তে কিছু বাকী থাকে? নিশ্চয় আমি স্থির কোল্লেম। স্থির করাই সার!

দেশে আসবার জন্য দীনবন্ধুবাবু ব্যস্ত হোলেন, বহরমপুরের মোকদ্দমার ফলাফল জানবার জন্য আমারও অত্যন্ত উদ্বেগ, কুমার বাহাদুরের কাছে বিদায় চাইলেম। প্রার্থনা শীঘ্র মঞ্জুর হলো না। হোচ্ছে হবে, যাচ্ছে যাবে, এই রকম গতরজমায় ক্রমশই দিন কেটে যেতে লাগলো। একদিন আমি বিশেষ আগ্রহ জানিয়ে, বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ কোরে রাজপুত্রকে বোল্লেম, "আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, আমার জীবনের সব কথা আপনাকে আমি বোলেছি। বিপদে আমার প্রাণদায়িনী সেই বালিকাটি,—অমরকুমারী নামে সেই স্নেহময়ী কুলকন্যাটি চুরি গিয়েছে, মোকদ্দমা হোচ্ছে, সন্ধান হলো কি না, কিছুই জানতে পাচ্ছি না, চিত্ত বড় অস্থির হয়েছে; অনুমতি করুন, আমরা দেশে যাই। আপনার অনুগ্রহ, আপনার দয়া, চিরজীবনে আমি বিস্মৃত হব না, উদ্দিষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য হয়ে আবার আমি এই রাজ্যে আসবো; ভগবান করুন, আপ-

নারা সুখে থাকুন, রাজলক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হোন, আবার আমি আপনাদের দর্শন কোরে চরিতার্থ হব ; এখন অনুগ্রহ কোরে কিছু দিনের জন্য বিদায় প্রদান করুন, এই আমার প্রার্থনা।"

তথাপি বিলম্ব। আজকাল কোরে কোরে রাজপুত্রের অনুরোধে আর এক মাসকাল বরদায় থাকতে আমরা বাধ্য হোলেম। একমাস পরে অনুমতিপ্রাপ্তি। রাজপুত্র আমারে একসহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাথেয়স্বরূপ প্রদান কোল্লেন, মিষ্টবচনে বোল্লেন, "এটা তোমার পক্ষে কিছুই নয় : যে উপকার তুমি কোরেছ, তার সঙ্গে তুলনায় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা কিছুই নয় ; অন্তরের কৃতজ্ঞতার যৎসামান্য নিদর্শন মাত্র ; ঈশ্বরেচ্ছায় স্বদেশে পূর্ণমনোরথ হয়ে এখানে তুমি ফিরে এসো, মহারাজের ইচ্ছামত পুরস্কারদানে আমি তোমার সম্মানবন্ধন কোরবো।"

কি করি, গ্রহণ কোত্তেও সঙ্কোচ আসে, গ্রহণ না কোল্লেও রাজপুত্র ক্ষুণ্ণ হন, কাজে কাজেই নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়ে, কথাগুলি শুনে লজ্জা পেয়ে, সেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আমারে গ্রহণ কোত্তে হলো। রাজদত্ত পুরস্কার গ্রহণ কোরে, ধন্যবাদ দিয়ে, রাজপুত্রকে আমি নমস্কার কোল্লেম।

স্বদেশযাত্রার দিনস্থির। দীনবন্ধুবাবু প্রস্তুত। যে দিন আসা হবে, তার পূর্ব্বদিন আমি একবার রঙ্গিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম ; রঙ্গিণীকে বোল্লেম, "পাপকর্ম্ম কোরেছিলে, ফলভোগ হয়েছে, সে সব কথা আর মনে কোরো না, পাপের দিকে আর মন দিও না, ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রেখে এই রাজ্যেই তুমি থাকো। ডাকাতের দুর্গে যাঁরে তুমি ভূষণলাল বোলে জানতে, তিনিই এই রাজ্যের মহারাজের প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র, রাজকুমার রণেন্দ্র রাও। রাজকুমার তোমারে আশ্রয় দিবেন অঙ্গীকার কোরেছেন, এখানে তুমি স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে সুখে থাকতে পারবে। অনেক দিন হলো এ রাজ্যে আমি এসেছি, দেশে চোল্লেম, পুনর্ব্বার ফিরে এসে তোমার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোরবো।"

রঙ্গিণী কাঁদতে লাগলো। আমি তারে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়ে সান্ত্বনা কোরে বোল্লেম, "তোমার অপেক্ষা অনেক বেশী বেশী বিপদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, পাপকর্ম্ম কোরে তুমি বিপদে পোড়েছ, নিষ্পাপশরীরে নানা বিপদে আমি বহুকষ্ট ভোগ কোরেছি, কিন্তু একদিনের জন্যও বিচলিত হই নাই। মনকে তুমি বিচলিত কোরো না, শান্ত হয়ে এইখানেই থাক, মহৎলোকের আশ্রয়ে সুখী হোতে পারবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পাপিষ্ঠ বীরমল্ল হস্তীপদতলে বিদলিত হয়ে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরেছে, ইহলোকে পাপকর্ম্মের স্মৃতি ভিন্ন আর তার অস্তিত্বের কোন চিহ্নই থাকলো না। সেই কানকাটা কানাই এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে, আমি দেশে যাচ্ছি, সে যদি দেশে গিয়ে থাকে, তাকেও আমি উপযুক্ত বিচারালয়ে হাজির করবার চেষ্টা পাবো। যারা তোমার সরল প্রাণে আঘাত কোরেছে, ধর্ম্মের বিচারে কেহই তারা নিষ্কৃতি পাবে না, এটি তুমি নিশ্চয় জেনে রেখো। কেঁদো না ; রাজপুত্রের আশ্রয়ে ক্রমে ক্রমে তুমি পুনরায় পবিত্র ধর্ম্মভাব অভ্যাস কোত্তে পারবে ; পরমেশ্বর তোমারে সুমতি প্রদান করুন ; ধর্ম্মপথে তোমার মতি হোক।"

কি যেন বোলবে বোলবে মনে কোরে চঞ্চলনয়নে রঙ্গিণী বারম্বার আমার মুখের দিকে চাইতে লাগলো, আর আমি সেখানে দাঁড়ালেম না, আর তার কোন কথা শুনবার ইচ্ছাও হলো না, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঈশ্বরের নাম কোত্তে কোত্তে সে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পোড়লেম। শীতল বায়ু আমার অঙ্গ স্পর্শ কোল্লে।

দিন সমাগত। শুভদিনে শুভক্ষণে সুসজ্জিত শকটারোহণে আমরা বরদা-রাজ্য পরিত্যাগ কোল্লেম। রাজকুমার রণেন্দ্র বাহাদুর আমাদের যাত্রাকালে শকট-সমীপে উপস্থিত থেকে আমাদের মঙ্গলকামনা কোল্লেন ; নমস্কার-বিনিময়ের পর শকটের অশ্বেরা দ্রুতধাবনে আমাদিগকে রাজকুমারের নয়নের অগোচর কোরে শকটখানা যেন উড়িয়ে নিয়ে চোল্লো।

হরিদাসের গুপ্তকথা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম কল্প

বঙ্গে প্রত্যাগমন

পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হলো না, যথাযোগ্য যানবাহনে আমরা যথা-সময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হোলেম। বাড়ীর কর্ত্তার অদর্শনে সকলেই উদ্বিগ্ন ছিলেন, যদিও মধ্যে মধ্যে ডাকবাহকেরা উদ্বেগশান্তির দৌত্যকার্য কোরেছিল, তথাপি প্রভু সশরীরে উপস্থিত না থাকলে পরিবারবর্গের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি পূর্ণাংশে মূর্ত্তিমতী হয় না। দীনবন্ধুবাবুর প্রত্যাগমনে সকলেই সুখী হোলেন, সকলের মনের উদ্বেগ দূর হলো ; আমারে যাঁরা যাঁরা ভালবেসেছিলেন, আমারে দেখে তাঁরাও তুষ্ট হোলেন।

দেশভ্রমণের পরিচয় দিবার ভূমিকা আনয়নের অগ্রে পশুপতিবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমার মোকদ্দমা কতদূর? অমরকুমারীর সন্ধান হয়েছে কি না?"

পশুপতিবাবু উত্তর কোল্লেন, "বিশেষ সংবাদ আমি কিছু বোলতে পারবো না, আদালতে আমি যাই না, মণিভূষণের মুখে কেবল এইমাত্র শুনেছি, যে সকল ডাকাত ধরা পোড়েছিল, তাদের মধ্যে যে দুজন অমরকুমারীর চুরিমামলায় সংশ্লিষ্ট, তারা এখনো হাজতে আছে, বাকী লোকগুলোর ডাকাতী অপরাধে সাজা হয়ে গিয়েছে। তোমরা এখান থেকে চোলে যাবার পর আরো জনকতক ডাকাত ধরা পোড়েছিল, বমাল গ্রেপ্তার। তারাও যথাবিধি দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে। আর একজন—"

ধৈর্য রাখতে না পেরে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে চঞ্চলস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ও সব আইন-আদালতের কথা এখন আমি শুনতে চাচ্ছি না, অমরকুমারীর সংবাদ কি, সেইটি আপনি আগে বলুন, তার পর অন্য কথা।"

আমারে নিতান্ত অস্থির দেখে ছোটবাবু বোল্লেন, "শুনেছি না কি অমরকুমারীর সন্ধান হয়েছে, কিন্তু তাঁরে এখনো উদ্ধার করা হয় নাই। অমরকুমারী কোথায় আছেন, সেই সন্ধানটি জানা হয়েছে, যারা তাঁরে সেইখানে রেখে দিয়েছে, তারা উপস্থিত না হোলে নূতন আশ্রয়ের অধিকারীরা অমরকুমারীকে ছেড়ে দিতে চায় না, এই পর্যন্ত আমি শুনেছি।"

জলমগ্ন ব্যক্তি সম্মুখে একগাছি তৃণ দেখতে পেলে সেই তৃণ অবলম্বনে যেমন প্রাণে বাঁচবার আশা করে, অর্দ্ধ উল্লাসে আমার হতাশময় চিত্তে সেই

প্রকার আশার সঞ্চার। ছোটবাবুর সঙ্গে যখন আমার কথা হয়, তখন রাত্রি-কাল, কতক্ষণে রাত্রিপ্রভাত হবে, কতক্ষণে আমি বহরমপুরে যাব, সেই ভাবনায় অধীর হোলেম, একবারও নিদ্রা হলো না, জেগে জেগেই রাত্রি প্রভাত কোল্লেম।

প্রভাতে স্নানাহার না কোরেই তরণী আরোহণে আমার বহরমপুর-যাত্রা। উকীলবাবুর বাসায় গিয়ে স্নানাহার কোল্লেম, মোকদ্দমার স্থূলে স্থূলে বিবরণ শুনলেম, মনে তখন অনেকদূর আশ্বাসের উদয় হলো।

রক্তদন্তের সন্ধান হয় নাই। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, পরোয়ানাতে হুলিয়া লেখা আছে, পুলিশের লোকেরাও স্থানে স্থানে সন্ধানে সন্ধানে ফিরছে, গ্রেপ্তার করবার সুবিধা হোচ্ছে না। নফর ঘোষাল পূর্ব্বে বোলেছিল, জটাধর গুজরাটে ; জেরার মুখে অনেক তর্কবিতর্কের পর শেষকালে বোলেছে কলিকাতায়। জেরার মুখে কুঞ্জবিহারীও খেলাপ। কুঞ্জবিহারী প্রথমেই বোলেছিল কলিকাতা, জেরায় বোলেছে ঢাকা। ঢাকার পুলিশে পরোয়ানা গিয়েছে, ঢাকার মাজিস্ট্রেট দস্তখৎ কোরেছেন, ঢাকার পুলিশ সেই আসামীটাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছে, সমস্ত যত্ন বিফল। রক্তদন্ত ঢাকায় নাই। সম্ভবতঃ অমরকুমারীর ঢাকায় থাকা সত্য হোতে পারে, কিন্তু ঢাকা একটি ক্ষুদ্রস্থান নয়, মুখের কথায় ঢাকা বোল্লেই অত বড় একটা জেলার ভিতর একটা লোককে খুঁজে বাহির করা সহজসাধ্য হয় না। নগরে কি উপনগরে, মহকুমায় কি পল্লীগ্রামে, তার একটা নিশ্চিত ঠিকানা চাই। সে ঠিকানা কে দিবে ? হাজতী আসামীরা যদি জানে, জানে কি জানে, ঠিক নাই—যদি জানে, কখনই সত্যকথা বোলবে না, কাজেকাজেই পুলিশের যত্ন বিফল।

আমার আর আদালতে যাওয়া আবশ্যক হলো না। মোকদ্দমা দায়ের আছে, মূল আসামী হাজির নাই, দরখাস্ত, রিপোর্ট, কৈফিয়ৎ, ইতিমধ্যে যা কিছু আদালতে দাখিল হোচ্ছে, সমস্তই নথীর সামীল হয়ে যাচ্ছে ; নথীর সঙ্গে পেস হবে, দস্তুরমত এই হুকুম। মোকদ্দমা কেবল দায়ের আছে মাত্র। সে অবস্থায় আমার এখন আদালতে উপস্থিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। হাজতী আসামীরা চুপচাপ ; এখন আর তারা নূতন কথা কিছুই বলে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ পর্যন্ত বহরমপুরে আমি থাকলেম, রজনীবাবু বাসায় এলে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলেম। কি করা কর্ত্তব্য ? আমি যদি ঢাকায় যাই, কোথায় যাব ? কোথায় অন্বেষণ কোরবো ?—সহরে কি মফস্বলে অমরকুমারী আছেন, চোরেরা তাঁরে কোথায় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় করা অসম্ভব ; চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। আমার এখন কি করা কর্তব্য ?

রাত্রেও আমি রজনীবাবুর বাসায় থাকলেম। রজনীবাবু একটি পরামর্শ বোল্লেন। ঢাকাজেলার অনেকগুলি লোক বহরমপুরে থাকেন, মধ্যে মধ্যে তাঁরা বাড়ী যান, দুই একমাস বাড়ীতে বাস করেন, তার পর আবার অসেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ সতজন প্রতিপত্তিশালী ভদ্রলোক। রক্তদন্তের চেহারাটা তাঁদের কাছে যদি বিশেষ কোরে বলা যায়, সে চেহারার কোন লোককে ঢাকার কোন স্থানে

তাঁরা দেখেছেন কি না, এ কথা যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তা হোলে হয় তো কিছু না কিছু সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে।

প্রভাতে আমি সেই পরামর্শ অনুসারে কার্য কোল্লেম। রজনীবাবু নিজেও আমার সহায় হোলেন। যেখানে যেখানে সেই সকল ঢাকাই বাবুর বাসা, সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে, প্রত্যেককে আমরা রক্তদন্তের উদ্দেশের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম ; কেহই কিছু ঠিক বোলতে পাল্লেন না ; কেবল একটি লোক বোল্লেন, অনেক দিন হলো, মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ঐরূপ চেহারার একটা লোককে তিনি একদিন দেখেছিলেন। কে তো কে, খবরেই আনেন নাই, এখনো পর্যন্ত সে লোক সেখানে আছে কি না, সে কথাও তিনি বোলতে পাল্লেন না।

এ সংবাদটাও অনিশ্চিত। শুনে রাখলেম, মাণিকগঞ্জ। যা হোক, তবু একটা সীমা পাওয়া গেল। উকীলের সঙ্গে উকীলের বাসায় আমি ফিরে এলেম। আহারান্তে রজনীবাবু আদালতে গেলেন, গঙ্গাপার হয়ে আমি আপনার মনিববাড়ীতে উপস্থিত হোলেম ; যে যে কথা শুনে এলেম, বড়-বাবুকে আর ছোটবাবুকে সেই সব কথা বোল্লেম। শুনে তাঁরা উভয়েই বিষন্ন-বদনে বোল্লেন, "তাই তো !"

তাঁরা বোল্লেন, তাই তো ! আমিও ভাবলেম, তাই তো ! কেবল "তাই তো" শুনেই, "তাই তো" ভেবেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারা গেল না ; বৈকালে আমি বোরাকুলি গ্রামে শান্তিরাম দত্তের বাড়ীতে গেলেম, মণিভূষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম, তীর্থদর্শন কোরে আমি ফিরে এসেছি, দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট হোলেন। আমি তাঁদের সন্তোষ বিতরণ কোত্তে যাই নাই, যেটি আমার বলবার কথা, দুজনের সাক্ষাতেই সেটি আমি বোল্লেম। বৃদ্ধ শান্তিরাম পরিণামদর্শী বিজ্ঞলোক, অনেকক্ষণ চিন্তা কোরে তিনি বলিলেন, "ওটা যেন বাতাসের কথা মনে হোচ্ছে, কবে কোন দিন সেই চেহারার একটা লোককে মাণিকগঞ্জে দেখে-ছিলেন, এই কথা শুনে মাণিকগঞ্জে ছুটে যাওয়া পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা হয় না। তবে হাঁ, এমনটি যদি নিশ্চয় জানা যায় যে, অমরকুমারী মাণিকগঞ্জে আছেন,—রক্তদন্ত এখন সেখানে থাকুক আর না থাকুক, তাতে আমাদের এখন কিছু আসে যায় না,—পরোয়ানা আছে, যখন হোক, যতদিনে হোক, যেখানেই হোক, পুলিশের হাতে রক্তদন্তটা ধরা পোড়বেই পোড়বে। এখন তারে আমরা চাই না। অমরকুমারী মাণিকগঞ্জে আছেন, এ কথা যদি নিশ্চয় হয়, তা হোলে তো তোমরা কেন, আমি পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে সেখানে যেতে প্রস্তুত।"

আমি বিবেচনা কোল্লেম, বৃদ্ধের এই পরামর্শই যুক্তিযুক্ত। খানিকক্ষণ সেখানে থেকে মণিভূষণের সঙ্গে আমি ফিরে এলেম। সেই রাত্রেই শুনলেম, কৃষ্ণকামিনীর বিবাহ। যে পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা শুনে গিয়েছিলেম, সেই পাত্রের সঙ্গেই বিবাহ। বিবাহের আর দশদিন বাকী। সেই দশদিনের মধ্যে কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে আটদিন আমার এক একবার দেখা হয়েছিল। হর্ষপ্রকাশ কোরে আমি বোলেছিলেম, "প্রজাপতি সুপ্রসন্ন ; তোমার বিবাহের নিমিত্ত

সকলেই উদ্বিগ্ন ছিলেন, তুমিও ছিলে, আমিও ছিলেম ; শুভদিন স্থির হয়েছে, শুনে আমি সুখী হোলেম।"

আমি তো বোল্লেম, সুখী হোলেম, কৃষ্ণকামিনী কিন্তু সে কথায় একটিও উত্তর দিলেন না ; ম্লানবদনে ম্লাননয়নে খানিকক্ষণ কেবল আমার মুখপানে চেয়ে থাকলেন মাত্র। দুটি পাঁচটি অন্যকথা হলো, সে সব কথায় কুমারীকে বেশ সপ্রতিভ দেখলেম ; কেবল বিবাহের কথায় কৃষ্ণকামিনী মৌনবতী ; লজ্জায় মৌনবতী, তেমন লক্ষণ কিছু বুঝা গেল না, যেন কোন অন্যভাবে অন্যমনস্ক ; বদন বিবর্ণ,—বিষন্ন।

কথা আমি বাড়ালেম না, কুমারীর ঐ ভাব দেখেই শীঘ্র শীঘ্র সোরে এলেম। গাত্রে হরিদ্রা, আইবুড়ো ভাত, অধিবাস যথারীতি সুসম্পন্ন ; বিবাহরজনী সমাগত। বাবুদের উপরের নাচঘর সুসজ্জিত ;—চিত্রপটে, পুষ্পমাল্যে, সুন্দর সুন্দর আলোকমালায় বিভূষিত, অনেকগুলি বরযাত্র সমাগত; বরযাত্রে কন্যাযাত্রে সে সময় বিদ্যার বিচারের প্রচলন ছিল, রহস্যে রহস্যে—গাম্ভীর্যে গাম্ভীর্যে সে সব পরীক্ষা হয়ে গেল। শুভলগ্নে কন্যাসম্প্রদান, তার পর বাসর-কৌতুক। কৃষ্ণ-কামিনীর বাসরবর্ণনা করা আমার কার্য নয়, এ বর্ণনায় আমি ক্ষান্ত থাকলেম।

কৃষ্ণকামিনী সুখে থাকুন, কৃষ্ণকামিনীর বিবাহোৎসবে আমার একটি বিশেষ মনস্কামনা পূর্ণ হলো। বরকর্তা-মহাশয় ঢাকা মাণিকগঞ্জে একটা বড়রকম চাকরী করেন। মাণিকগঞ্জ থেকেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে মুর্শিদাবাদে এসেছেন, সেখানকার পাঁচসাতটি বন্ধুকেও সমভিব্যাহারে এনেছেন। পরিচয় পেয়ে বিবাহের পরদিন উপযুক্ত অবসরে বরকর্তার চরণে আমি গিয়ে প্রণাম কোল্লেম। পাঠকমহাশয় শুনে রেখেছেন, এই বরকর্তাটি দীনবন্ধুবাবুর ভগ্নী-পতি, নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। দিব্য মিষ্টভাষী, সদালাপী, বদন সর্ব্বক্ষণ প্রফুল্ল, অমায়িক ভদ্রলোক। কৃষ্ণকামিনীর পিতাও কন্যাসম্প্রদানের নিমিত্ত এই বাড়ীতে এসেছিলেন ; বিবাহের অগ্রে তাঁদের উভয়ের কাছেই দীনবন্ধু-বাবু আমার পরিচয় দিয়েছিলেন ; পরিচয় শ্রবণ কোরে তাঁরা উভয়েই ক্ষণেক আশ্চর্যজ্ঞান কোরে আমার প্রতি সস্নেহ-ভাব জানিয়েছিলেন।

বিবাহের পরদিন হরিহরবাবুর সঙ্গে যখন আমি সাক্ষাৎ করি, একটি ঘরে তখন তিনি একাকী ছিলেন, প্রণাম কোরে একটু তফাতে গিয়ে আমি বোস-লেম। প্রসন্নবদনে তিনি আমার সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ কোল্লেন। এ কথা, সে কথা, পাঁচ কথার পর ঠিক অবসর বুঝে আমি আমার মনের কথা তুল্লেম। বিনীতবদনে ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "শুনেছি আপনি মাণিকগঞ্জে থাকেন ; আমি একবার মাণিকগঞ্জে যাব।" বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি নিমিত্ত ?"

নিমিত্তটা আমি কি প্রকারে ব্যাখ্যা করি, কিয়ৎক্ষণ নীরব থেকে একটু চিন্তা কোল্লেম : শেষে বোল্লেম, "বিশেষ প্রয়োজন। একটা বানরমুখো কুব্জা-কার লোক—নাম তার জটাধর তরফদার ;—সর্ব্বাঙ্গে ভল্লুকের মত অনেক লোম ; সেই লোকটা মাণিকগঞ্জে গিয়েছিল ; সম্প্রতি এই তত্ত্ব আমি জানতে পেরেছি ; আপনি কি সেই লোককে সেখানে দেখেছেন ?"

চমকিত-নয়নে আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর-বদনে হরিহরবাবু বোল্লেন, "লোম? বানরের মত মুখ?—কুব্জাঙ্গ?—জটাধর?—কেন গা?—সে লোকের সঙ্গে তোমার কি?—মাণিকগঞ্জে একটা আড়ৎ-জায়গা; কত লোক যায়, কত লোক আসে,—হোতেও পারে,—হয় তো দেখে থাকবো, ঠিক স্মরণ কোত্তে পাচ্ছি না, কিন্তু কেন গা; সে লোকটিকে কি তোমার দরকার আছে?"

"আমার দরকার নাই, আদালতের দরকার, তারে এখন আমি অন্বেষণ কোচ্ছি না, অন্বেষণ কোচ্ছি একটি বালিকাকে। সেই বানরমুখো লোকটা একটি কুমারী বালিকাকে এই মুর্শিদাবাদ থেকে চুরি কোরে নিয়ে পালিয়েছে; শুনতে পাচ্ছি, মাণিকগঞ্জে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে; বালিকাটির নাম অমরকুমারী। আপনি কি সে সংবাদ—"

একনিশ্বাসে তাড়াতাড়ি আমি ঐ সব কথা বোলছিলেম, ঐ পর্যন্ত শুনেই —যেন কি পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে, বিস্মিত-বদনে হরিহরবাবু বোল্লেন, "ও হো হো! বটে—বটে! একটি বিদেশিনী বালিকা আমাদের বাসার নিকটেই এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই আছে বটে। মেয়েটিকে আমি দেখি নাই, লোকে কাণাকাণি করে, কোথা থেকে এসেছে, কে সেটিকে সেইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছে, বাড়ীর বাহির হোতে দেয় না, দেখতে দিব্য সুন্দরী, যারা দেখেছে, তারা বলে, মেয়েটি কেবল কাঁদে আর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। কি নামটি তুমি বোল্লে "—হাঁ হাঁ,—অমরকুমারী। আমিও শুনেছি, সেই মেয়েটির নাম অমরকুমারী। কেন গা?—সে মেয়েটি তোমার কে হয়?"

"কে হয়, সে কথা আমি এখন ঠিক বোলতে পারবো না; সকল পরিচয়ই আমার গোলমাল:—সে সব গোলমাল যদি আপনি শুনেন, অবাক হবেন; সে সব কথা বলবার এখন সময় নয়; সেই অমরকুমারী এক মহাসঙ্কটে একবার আমার প্রাণরক্ষা কোরেছিলেন। চোরেরা সেটিকে চুরি কোরে নিয়ে গিয়েছে, আমি সেটিকে উদ্ধার কোরে আদালতে উপস্থিত কোরবো, এই আমার পণ, এই আমার সংকল্প, এই আমার অভিলাষ।"

অত্যন্ত উৎসাহে, অত্যন্ত উল্লাসে, অত্যন্ত আগ্রহে এইগুলি আমার উত্তর। আমার কণ্ঠস্বরের কম্পন অনুভব কোরে হরিহরবাবু বেশ বুঝতে পাল্লেন, যথার্থই অমরকুমারীর জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। তিনিও বুঝতে পাল্লেন, আমিও সেই সময় উত্তেজিত-স্বরে বোলে উঠলেম, "অমরকুমারীর অন্বেষণে আমি মাণিক-গঞ্জে যাব।"

আমার কাতরতা দেখে, অধীরতা দেখে, সদয়-বচনে বাবু বোল্লেন, "আচ্ছা, আমি দেখছি। আমার আর বেশীদিন ছুটি নাই, সপ্তাহ পরেই আমি যাব, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গেই তুমি যেতে পার।"

আনন্দে আমার অন্তরাত্মা যেন নেচে উঠলো, অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, দুই হস্তে বাবুর পদধূলি গ্রহণ কোরে মস্তকে ধারণ কোল্লেম। আমার উভয় নেত্রে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগলো। কে একজন এসে সেই সময় বড়-বাবুর নাম কোরে হরিহরবাবুকে ডাকলে, আমারে সেইখানে বোসতে বোলে,

সেই লোকের সঙ্গে হরিহরবাবু শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে গেলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা সেইখানে আমি অপেক্ষা কোল্লেম, তিনি এলেন না, ক্রমশই বিলম্ব হোতে লাগলো, ধৈর্য রেখে আমি আর বেশীক্ষণ সেখানে একাকী বোসে থাকতে পাল্লেম না, আমিও সেখান থেকে উঠে এলেম। আনন্দের এক প্রকার উচ্ছ্বাস আছে, সেই উচ্ছ্বাসের সময় নাসাগ্রে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দেয় ; বক্ষঃস্থল কম্পিত হয়। খোলা বাতাসে ভ্রমণ করবার ইচ্ছা আছে ; খোলা বাতাসে আমি বাহির হোলেম। অনেক দিনের পর অন্তরে আমার বিমল আনন্দ।

আমি মাণিকগঞ্জে যাব, মাণিকগঞ্জে আমি অমরকুমারীকে দেখতে পাব, অমরকুমারীকে আমি উদ্ধার কোরে আনবো, আমার অন্তর-সাগরে এই সকল উল্লাস-তরঙ্গের ঘন ঘন ক্রীড়া। কি আছে আমার মনে, কি কারণে আমার উল্লাস, কি সব কথা আমি শুনেছি, জনপ্রাণীর কাছেও তখন সে সব কথা আমি প্রকাশ কোল্লেম না ; আপনার আনন্দে আপনিই আমি বিভোর হয়ে থাকলেম।

বিবাহের পরদিন বর-কন্যা বিদায় হয়, কুলাচারে অনেক পরিবারের এই প্রকার প্রথা; কিন্তু দীনবন্ধুবাবুর যত্নে হরিহরবাবুর সম্মতিক্রমে এই বাড়িতেই কুশণ্ডিকা, ফুলশয্যা সম্পাদিত হবে, বরকন্যা তিন দিন তিন রাত্রি এইখানেই থাকবেন, বরযাত্রীরাও সেই উৎসবে সাক্ষী হবেন, এইরূপ স্থির হলো। সে তিন দিন সকলেই ব্যস্ত, চোলে যেতে যেতে হরিহরবাবু যখন আমারে দেখতে পান, প্রসন্ন-নয়নে চেয়ে চেয়ে একটু একটু হাসেন, আমিও নতবদনে একটু একটু হাস্য করি, এই প্রকার ভাব। ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যাকালে একটা কাজের অছিলায় আমি একবার অন্দরমহলে প্রবেশ কোরেছি ; পাড়ার স্ত্রীলোকেরা, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা, এক একটা ঘরের ভিতর মজলীস কোরে নানা রকম গোলমাল কোচ্ছেন, কেহ কেহ করতালি দিয়ে হাস্য-কৌতুক আরম্ভ কোরেছেন, চক্ষু-কর্ণকে সে দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বড়বৌমার ঘরেই আমি প্রবেশ কোল্লেম। সে ঘরে তখন কেহই ছিলেন না ; শূন্যঘরে প্রবেশ কোরে সন্দেহের আতঙ্কে তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে আসছি, একদিক থেকে ছুটে এসে কৃষ্ণকামিনী আমার পথ আগলালেন : হাত ধোরে ঘরের ভিতর আমারে টেনে নিয়ে গিয়ে, সজোরে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন ; দুই হাতে আমার দুখানি হাত ধোরে সম্মুখে দাঁড়িয়ে, সুন্দর মুখখানির সঙ্গে সুন্দর চক্ষুদুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, নববিবাহিতা নবসুন্দরী কেমন এক প্রকার নূতন সুরে বোল্লেন, "আর কি হরিদাস! আমার বিয়ে হয়ে গেল! মনে আছে তোমার? কি তোমারে আমি বোলেছিলেন, সে কথা তোমার মনে পড়ে? বিবাহে আমি সুখী হব না, তোমারে ভালবাসা দিয়েছিলেম, তুমি আমারে দিলে না, এ বিবাহে আমি সুখী হব না! মনে হয় যেন বেশী দিন আমি আর এ পৃথিবীতে খেলা করবার জন্য বেঁচে থাকবো না! এসো ভাই এইবার!—এসো ভাই! এই লও!—এই আমার সাধের ভালবাসার শেষ চুম্বন!—সানুরাগে এই সব কথা বোলেই চপলা কৃষ্ণকামিনী আমার উভয় কপোলে চারিবার উষ্ণচুম্বন কোল্লেন! হরিদ্রা, চন্দন, চম্পক আর আতর-গোলাপের মিশ্র সুবাস আমার নাসারন্ধ্রে যেন অগ্নিবর্ষণ

কোত্তে লাগলো ! কৃষ্ণকামিনী আপনার সুকোমল বাহুযুগলে আমার কণ্ঠ বেষ্টন কোরে, খানিকক্ষণ আমারে গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ রাখলেন। জোরে হস্তবন্ধন ছাড়িয়ে, চঞ্চল হস্তে দরজা খুলে, রুদ্ধশ্বাসে আমি চম্পট দিলেম ; বাইরে এসে নিশ্বাস ফেল্লেম !

কৃষ্ণকামিনীর ফুলশয্যার সুখযামিনী অবসান। চতুর্থদিবসের প্রাতঃকালে বরকন্যা বিদায় হোলেন, বরযাত্রেরা আপনাদের বংশানুরূপ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়ে বিদায় গ্রহণ কোল্লেন, বাবুদের সদরবাড়ী তখন যেন জনশূন্য হয়ে গেল। বাহিরের লোকের মধ্যে থাকলেন কেবল হরিহরবাবু আর তাঁর সমভিব্যাহারী বন্ধু সাতটি। বরের সঙ্গে বরকর্তা নিজবাড়িতে গেলেন না, কর্ম্মস্থলে ছুটি কম, মুর্শিদাবাদ থেকেই সরাসরি মাণিকগঞ্জে চোলে যাওয়া তাঁর পক্ষে সুবিধা, সেই কারণেই তিনি মুর্শিদাবাদে থাকলেন। আর তিন দিন পরেই তিনি রওনা হবেন, এইরূপ কথাবার্তা স্থির।

দ্বিতীয় কল্প

কুমারী-অন্বেষণ

আমি মাণিকগঞ্জে যাব। হেতু কি, দীনবন্ধুবাবুকে আর পশুপতিবাবুকে সেটি জানালেম ; নিশ্চয় অমরকুমারীকে সেখানে পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে তাঁদের প্রতীতি জন্মিল না, তথাপি অন্বেষণ করা কর্তব্য, এই বিবেচনায় তাঁরা আমারে অনুমতি দিলেন। মণিভূষণকে সংবাদ দেওয়া গেল, মণিভূষণ এলেন ; তাঁরে সঙ্গে কোরে একবার আমি বহরমপুরের আদালতে গেলেম। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করা হলো যে, অপহৃতা অমরকুমারীর কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, ঢাকাজেলার এলাকায় অমরকুমারী আছেন, কোন বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদটি শুনা হয়েছে, সন্ধানের জন্য আমি ঢাকায় চোল্লেম, সন্ধান যদি ঠিক হয়, ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ঢাকার পুলিশ তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা করেন, এইরূপ হুকুম প্রার্থনা।

আমি দরখাস্ত কোল্লেম না, মণিভূষণ দরখাস্ত কোল্লেন ; আমাদের উকীল রজনীবাবু সেই দরখাস্তে তাঁর নিজের নামটিও দস্তখৎ কোরে দিলেন। পেস হবার পর দরখাস্তে এই হুকুম হলো যে, "দরখাস্তের মর্ম্মানুসারে ঢাকা-জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে অত্রাদালতে রুবকারি প্রেরণ করা যায় ইতি।"

ঢাকায় রুবকারি যাবে, মুর্শিদাবাদ পুলিশের কোন লোককে সঙ্গে লওয়া আবশ্যক হবে না। ম্যাজিস্ট্রেটকে সেলাম দিয়ে, রজনীবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে,

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা গঙ্গা পার হোলেম। নিরূপিত দিবস উপস্থিত হলো, হরিহরবাবু প্রস্তুত, দুর্গানাম স্মরণ কোরে আমরা তরণী-আরোহণ কোল্লেম। হরিহরবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুলোকেরা, আমার সঙ্গে মণিভূষণ দত্ত। ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনে পথে যত দিন যায়. তত দিন গেল, আমরা মাণিকগঞ্জে উপস্থিত হোলেম।

আমি অদৃষ্টবাদী ; ভাগ্যে আমার অখণ্ড বিশ্বাস ; ভাগ্য আমার মন্দ, শৈশবাবধি পদে পদে তার প্রমাণ আমি প্রাপ্ত হয়ে আসছি, কিন্তু একটি বিষয়ে আমার কিছু শ্রদ্ধা আছে। যেখানে যখন যে কোন ভদ্রলোকের কাছে আমি আশ্রয় পাই, সেইখানেই তখন আমার আদর হয়। কেন জানি না, সত্য পরিচয় না পেয়েও,—বংশপরিচয় না জেনেও ভদ্রলোকেরা আমারে যত্ন করেন। হরিহরবাবুর বাসাবাড়ীতে আমরা আশ্রয় পেলেম, আদর পেলেম, যত্ন পেলেম, সম্পূর্ণ মনের সুখে না হোক, কায়িক সুখে সেইখানে আমরা থাকলেম। আমি আর মণিভূষণ।

বরদার রাজকুমার রণেন্দ্র রায় বাহাদুর আমাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়েছিলেন। সেই টাকাগুলি আমি দীনবন্ধুবাবুর কাছে গচ্ছিত রাখি : মাণিকগঞ্জে আসবার সময় প্রয়োজনমত খরচপত্রের জন্য সেই টাকার মধ্যে দুই-শত রজতমুদ্রা আমি সঙ্গে রেখেছিলেম ; এই দূরপথে সেই টাকাগুলি আমার সম্বল। অন্বেষণ আরম্ভ কোল্লেম। হরিহরবাবুর মুখে শুনা হয়েছিল, মাণিকগঞ্জে একজনের বাড়িতে অমরকুমারী নামে একটি সুন্দরী বালিকা আছে, কোন কোন লোকের কাণাঘুষায় এই তত্ত্বটুকু তিনি অবগত হন : অজ্ঞাত-কুলশীলা একটি বিদেশিনী কুমারী এই স্থানে একজনের বাড়িতে আছেন, কে সেই একজন, কোথায় তার বাড়ি, ঘর ঘর জিজ্ঞাসা কোরে সে সন্ধানটি ঠিক প্রাপ্ত হওয়া সহজ নয় ; যে সকল লোকের কাণাকাণিতে হরিহরবাবু সেই কথা শুনেছিলেন, সেই সকল লোকের নামগুলিও তিনি মনে কোরে রাখেন নাই ; রাখবার কোন আবশ্যকও ছিল না। কে অমরকুমারী, কোথা থেকে কার বাড়িতে এসেছে, কেন এসেছে, কে এনেছে, একজন নিঃসম্পর্কীয় ভদ্রলোক ততদূর বিশেষ কথা পরিজ্ঞাত হবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ কোরবেন, এটাও সম্ভব নয়। ফল কথা, অমরকুমারীর ঠিক ঠিকানা শীঘ্র জানা গেল না। মোটামুটি অন্বেষণ কোল্লেম, কেহ কেহ হাস্য কোল্লে, কেহ কেহ চক্ষু পাকালে, কেহ কেহ মুখ বাঁকালে, কেহ কেহ যেন রঙ্গ করবার অভিলাষে "আয় গো নবীন বিদেশিনী, ডাকচে মোদের কমলিনী," এই রকম গান গেয়ে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে চোলে গেল।

সমস্তই যেন তামাসা। আমার প্রাণের কতদূর উদ্বেগ, কেহই সেটা অনুভব কোল্লে না। অনুভবের আশা করাও দুরাশা। এ অবস্থায় হয় কি ? এক-পক্ষ অতীত। ঢাকার ফৌজদারী কাছারীতে অবশ্যই বহরমপুরের রুবকারি এসেছে, হাকিমের হুকুম, আইনসিদ্ধ সরাসরি কার্য, হুকুম তামিলে আমলারা বিলম্ব কোত্তে পারে নাই, এ কথা ঠিক, কিন্তু সে রুবকারির তত্ত্ব লওয়াতে এখন

আমার ফল কি ? একবার মনে কোরেছিলেম, ঢাকার সদর আদালতে যাব, রুব-কারির খবরটা জানবো, নিষ্ফল বিবেচনা কোরে সে সংকল্প ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

মুখে মুখে লোকের কাছে কথা ফেলি, কেহ কিছু জানে কি না, জিজ্ঞাসা করি, যথাসম্ভব যথাশক্তি অন্বেষণ করি, সমস্তই বিফল হয়। যে দিন যেখানে যে রকম ফল হয়, রোজ রোজ হরিহরবাবুকে সেই সব কথা বলি, গম্ভীর-ভাবে তিনি চুপ কোরে থাকেন। মুখের ভাব দেখে আমার মনে হয়, তিনি যেন ভাবেন, তাঁর পূর্ব্বের কথাগুলি হয় তো মিথ্যা রটনা। হরিহরবাবুর ভাব-নার সঙ্গে আমার ভাবনার সম্বন্ধ কি ? যে ভাবনা আমার হৃদয়-পোষিত, সেই ভাবনাই আমি ভাবি। সে ভাবনার অংশী নাই ;—একটি ভগ্নাংশের অংশী মণি-ভূষণ দত্ত।

একমাস পূর্ণ হোতে যায়, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না ; এক প্রকার নিরাশ হয়ে মনে আমি স্থির কোল্লেম, অমরকুমারী মাণিকগঞ্জে নাই। বৃথা শ্রম, বৃথা কষ্ট, বৃথা ব্যয়, বৃথা একজন ভদ্রলোকের গলগ্রহ হওয়া, বৃথা কতক-গুলি অচেনা লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হওয়া। সন্ধান পাওয়া গেল না ভেবে মুর্শিদাবাদে যদি ফিরে যাই, সেখানে গিয়েও যদি ঐরূপ ভাবি, তাতেই বা কি হবে ?

অনেক রকম আমি ভাবলেম ; সে সকল ভাবনার কথা মণিভূষণকেও জানতে দিলেম না। একরাত্রে একটি নির্জ্জন ঘরে শয়ন কোরে পর পর নানা ঘটনা আমি স্মরণ কোচ্ছি, হঠাৎ মনে হলো, মাণিকগঞ্জ কতটুকু স্থান ? সদরে মফঃস্বলে এমন অনেক স্থান আছে, একটা কোন প্রসিদ্ধ স্থানের নামে নিকটস্থ অনেকদূর পর্যন্ত বুঝায় ; সেই ভাবটাই হঠাৎ আমার মনে উদয় ; —সেই গভীর রজনীতে কে যেন আমার কাণে কাণে বোলে দিলো "ঐ কথাই ঠিক ; মানসিক ভূগোলের মানসিক মানচিত্রের ঐরূপ মনঃকল্পিত অঙ্ক-রেখা প্রমাণে তুমি সেই পন্থা অবলম্বন কর !"

আমি ঘুমাই নাই, জাগিয়া জাগিয়া যেন ঐরূপ স্বপ্ন দর্শন কোল্লেম ; স্বপ্নে যেন ঐরূপ দৈববাণী শ্রবণ কোল্লেম। পরীক্ষা করা আবশ্যক। প্রভাতে গাত্রোত্থান কোরে নিয়মিত নিত্যকর্ম্মসমাপনান্তে বাসা থেকে আমি বেরুলেম ; —একাকীই বেরুলেম ; মণিভূষণকেও সঙ্গে নিলেম না। মানসিক ভূগোলের মানসিক মানচিত্র ! হাঁ, মুদিতনয়নে সেই মানচিত্র আমি দর্শন কোরবো।

প্রতিজ্ঞা ;—প্রতিজ্ঞা-পালনে আমি সর্ব্বদাই তৎপর। মাণিকগঞ্জের লোকেরা যে স্থানটিকে মাণিকগঞ্জ বলে, যে পর্যন্ত মাণিকগঞ্জ সীমা দেয়, অনন্যমনে পরিক্রমণ কোত্তে কোত্তে পূর্ব্বদিকের সেই সীমা আমি অতিক্রম কোল্লেম ; চোলেছি,—আপন মনেই চোলেছি ;—পথের লোকেরাও চোলেছে, কোন লোককেই কোন কথা আমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছি না, লোকেরাও কেহ কোন কথা আমারে জিজ্ঞাসা কোচ্ছে না ; এক একজন কেবল আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, আমি তাদের দেখছি, সেটাও জানতে দিচ্ছি না ; আড়ে আড়ে

একটু একটু কটাক্ষপাত কোচ্ছি মাত্র। ঘর-বাড়ী দেখ্‌ছি, বৃক্ষলতা দেখ্‌ছি, ছোট বড় উদ্যান দেখ্‌ছি, ছোট বড় সরোবর দেখ্‌ছি, রকমারি মনুষ্য দর্শন কোচ্ছি, গরু, বাছুর, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি নানাপ্রকার জীবজন্তুও দর্শন কোচ্ছি, মনে কোন প্রকার নূতন ভাবের উদয় হোচ্ছে না। অনেকদূর গিয়ে একটি লোককে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ গ্রামের নাম কি ?" লোক উত্তর কোল্লে, "মাণিকগঞ্জ।" তখন আমি মনে কোল্লেম, এই বটে সেই কথা। মানসিক ভূগোলের মানসিক মানচিত্র। এই বটে সেই কথা।

বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে বাসায় ফিরে এলেম। কোথায় গিয়েছিলেম, কাহাকেও বোল্লেম না ;—মণিভূষণকেও না। ক্লান্ত হয়েছিলেম, বৈকালে আর কোথাও গেলেম না ; রাত্রে আমার কোথাও যাওয়া ছিল না, বাবুদের সঙ্গে খানিকক্ষণ খোসগল্প কোরে নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন কোল্লেম।

দ্বিতীয় প্রভাতে স্থানের দক্ষিণসীমায় পরিভ্রমণ। পূর্ব্বদিনের যে ভাব, এ দিনেও সেইরূপ। তৃতীয় দিবসে পশ্চিমসীমা, চতুর্থ দিবসে উত্তরসীমা উলঙ্ঘন। ডাকের কথায় যতদূর যাই, ততদূর মাণিকগঞ্জ। মানসিক ভূগোলের মানসিক মানচিত্র।

তৃতীয় কল্প

আর এক আবর্ত্তন

ভারতবর্ষের উত্তরে গিরিরাজ হিমালয় : পুরাণে পাওয়া যায়, হিমালয়ের উপর দিয়ে স্বর্গে যাবার পথ। আমি মাণিকগঞ্জের উত্তরে এসেছি ; এখানে স্বর্গের পথ নাই ; এখানে যদি আমি অমরকুমারীর সন্ধান পাই, এখানে যদি আমি অমরকুমারীর দর্শন পাই, তা হোলে এই স্থানকেই আমি স্বর্গধাম বিবেচনা কোরবো। যেখানে অমরকুমারী আছেন, সেই স্থানটি আমার পক্ষে স্বর্গ। কেন না, অমরকুমারী আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবী। যেখানে দেবীর অধিষ্ঠান, সেই স্থানটিই সুপবিত্র স্বর্গধাম।

মাণিকগঞ্জের উত্তরসীমা অতিক্রম কোরে অনেকদূর আমি এসেছি ; সীমা অতিক্রম হয়ে গেছে, তথাচ আমি মাণিকগঞ্জে। উত্তরদিকের এই অংশে পথের ধারে ধারে বড় বড় প্রাচীন বৃক্ষ, স্থানে স্থানে বড় বড় বাগান ; এক একটা বাগানের মাটি আচোট : বোধ হয়, সে মাটিতে হল-লাঙ্গল বিদ্ধ হয় না ; বৃক্ষগুলিও নিস্তেজ ; প্রায় সমস্ত বৃক্ষের পত্রগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,—রৌদ্রপক্ক,—অধিকাংশ পীতবর্ণ। এক একটি বৃক্ষ এককালে পত্রশূন্য ; সর্ব্বাঙ্গে অর্দ্ধ-শুষ্ক মোটা মোটা গুলঞ্চলতা পরিবেষ্টিত ; হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন দীর্ঘবাহু দীর্ঘকায় দৈত্যকলেবরে বড় বড় অজাগর সর্প বেষ্টন কোরে রয়েছে।

বৃক্ষরাজির তলভাগ অপরিষ্কার নয় ; কেবল এক এক স্থানে বায়ুপ্রেরিত অর্দ্ধ-শুষ্ক পক্কপত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ, অন্য কোনপ্রকার তৃণকণ্টকাদি সেখানে দৃষ্ট হয় না। স্থানে স্থানে বড় বড় পুষ্করিণী ; অবস্থাদর্শনে বোধ হয়, বহুদিন বিনা সংস্কারে অল্পতোয়া, ঠাঁই ঠাঁই চড়া পড়া, ঠাঁই ঠাঁই হেলঞ্চ-কলম্বী দল জমাট-বাঁধা ; চড়ার উপর গরু চরে, ছাগল চরে, মৎস্যশীকারী দীর্ঘচঞ্চু সতর্ক সতর্ক বিহঙ্গেরা দামের ঝোপে গা-ঢাকা হয়ে একটু দূরস্থ নির্ম্মল জলে শীকার লক্ষ্য করে ; অনেকগুলি দীর্ঘ সরোবরের এইরূপ অবস্থা। সময়ে দুই তিন দিক দিয়ে ভাল ভাল ঘাট বাঁধা ছিল, সে সকল ঘাট এখন ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়ে বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীরের চর্ম্মশূন্য দন্তপাতির ন্যায় বিকটদর্শন হয়ে আছে ; এক এক সরোবর তীরে ভগ্নচূড়, ভগ্নগাত্র, ভগ্নসোপান বড় বড় শিবমন্দির, মন্দিরের নিকটে নিকটে ছোট ছোট পুষ্পকুঞ্জ,—কেবল কুঞ্জ-গুলিই ছোট ছোট, তাই নয়, কুঞ্জতরুগুলিতে যে সকল ফুল ফুটে আছে, সেই সকল ফুলগুলিও ছোট ছোট, বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা-বিধবার ম্লানমুখের প্রায় অর্দ্ধশুষ্ক মলিন মলিন। একটু দূরে থেকে সে সকল ফুলের আঘ্রাণও পথিকলোকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে না। মাণিকগঞ্জের এই অংশে প্রকৃতির এই-রূপ মলিনমূর্ত্তি দর্শনে মনে হয়, স্থানের পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচয় দিবার জন্যই ঐ নিদর্শনগুলি এখনো জেগে আছে, পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে। দেখলেই কষ্ট হয়।

গ্রামের মধ্যে আমি প্রবেশ কোল্লেম। গ্রাম নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী জনশূন্য হয়ে খাঁ খাঁ কোচ্ছে। ইমারতের উপর বৃক্ষলতার সঙ্গে বনজন্তু বাসা কোরেছে। দেয়াল, খিলান, প্রাচীর ঠাঁই ঠাঁই ভেঙে ভেঙে পোড়েছে ; এক একখানি বাড়ীতে দুটি পাঁচটি নরনারী দৃষ্ট হয়, সে সকল বাড়ীর পূর্ব্বাবস্থা নাই, দেখলেই বোধ হয়, ভূতের বাসা ; কিন্তু অধিকারীরা সজীব। স্থানে স্থানে তৃণাচ্ছাদিত কুটীর। সে সকল কুটীরে গৃহস্থ আছে, কিন্তু সকলেই ম্রিয়মাণ, গ্রাম্য কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না, বালক-বালিকার আনন্দধ্বনি শুনা যায় না, যদি কিছু শুনা যায়, সে কেবল সায়ং-শৃগালের চীৎকারধ্বনির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুর ক্রন্দনধ্বনি।

বিষণ্ণনয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন কোত্তে কোত্তে বিষণ্ণবদনে বিষণ্ণহৃদয়ে মন্থরগতিতে আমি অগ্রসর হোতে লাগলেম। পথে এতক্ষণ একটিও মনুষ্য দৃষ্ট হয় নাই, এই সময় আমার সম্মুখে দুটি লোক। গ্রামের যেরূপ দুরবস্থা দর্শন কোল্লেম, লোক-দুটির পরিচ্ছদে, চেহারায়, কথোপকথনে সে অবস্থার প্রতিরূপ দৃষ্ট হলো না। লোকেরা পরস্পর বলাবলি কোচ্ছে, শুষ্কমালঞ্চে এমন সুন্দর ফুল কেমন কোরে ফুটেছে ? একজন বোল্লে, "প্রকৃতির খেলা। এক একটি ফুলগাছে যখন ফুল হয়, তখন সে সকল গাছে একটিও পাতা থাকে না ; শুষ্কবৃক্ষে সুবাসিত সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে সুগন্ধে দশদিক আমোদিত করে। অমন যে দেবদুর্ল্লভ পদ্মফুল, ঘৃণাকর কর্দর্য পঙ্কে সেই পদ্মফুলের জন্ম !" যে মুখের এই কথা, বিস্মিত নয়নে সেই মুখের দিকে

চেয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি বোল্লে, "তাই ত ভাই! তুমি ঠিক কথা বোলেছো! শুষ্ক-বৃক্ষে সুন্দর ফল! পঙ্কহ্রদে পদ্মফুল! তেমন সুন্দরী মেয়েটি এমন জায়গায় কেমন কোরে এলো? যারা এনেছে, তারা কম লোক নয়! যেমন জায়গায় শোভা পায়, তেমন জায়গায় রাখলে দশজনের চক্ষে পোড়বে, দশজনের চক্ষে পড়ে, সেটা তাদের মতলব নয়, নিশ্চয়ই দুষ্ট মতলব!"

প্রথম ব্যক্তি একটু দম্ভ কোরে বোল্লে, "সে কথা আর বোলতে? ভয়ানক দুষ্ট মতলব! জান না বুঝি তুমি? শুনোনি বুঝি কিছু? মেয়েটিকে তারা বেচে ফেলবে! দাম ধার্য হয়েছে দু হাজার টাকা! ও পাড়ার সেই বংশী পোদ্দার দু হাজার টাকা পণ দিয়ে সেই মেয়েটিকে কিনে নিবে! কথাবার্তা সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে, কেবল লেখাপড়া বাকী। লোকে যেমন দলীল লিখে দিয়ে জমি-জায়গা বিক্রী করে, সেই মেয়েটিও সেই রকমে খোস-কওলায় বিক্রী হবে! বংশী পোদ্দারের বড়ই কপালজোর! দু হাজার টাকায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নিয়ে ঘরে বাঁধবে!"

এই সব কথা বলাবলি কোত্তে কোত্তে সেই দুটি লোক সরাসর পশ্চিমদিকে চোলে গেল। আমি বোলেছি, দুটি লোক আমার সম্মুখে। ঠিক সম্মুখে নয়, তারা যখন আসে, আমি তখন একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে ছিলেম, লোক-দুটিকে দেখে আরও একটু সাবধান হয়ে লুকিয়ে ছিলেম; তারা আমারে দেখতে পায় নাই, আমি কিন্তু তাদের ঐ কথাগুলি স্পষ্ট শুনে রেখেছি। আমার চক্ষু বরং সকলদিকে ঘোরে না, কর্ণ কিন্তু সকলদিকেই থাকে। একটু নিকটে দু-তিনজনে ফুসফুস কোবে কথা বোল্লে আমি শুনতে পাই; তাদের সব কথা আমি শুনতে পেয়েছি। তারা চোলে গেল; কথা বলাবলি কোত্তে কোত্তে অনেকদূরে এগিয়ে গেল; শেষে তারা আর কি কি কথা বোল্লে, সেগুলি শুনতে পেলেম না।

পঙ্কজলে পদ্মফুল! কোন পদ্মের কথা এরা বোলে গেল?—বোধ হোচ্ছে যেন আমারি হৃদয়-সরোবরের পদ্মফুল! আমি যেন জানতে পাচ্ছি, এইখানেই আমার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে; আমার মন যেন আমারে বোলছে, এই গ্রামেই অমরকুমারী আছেন। একবার মনে হলো, পশ্চাতে ছুটে গিয়ে লোক-দুটিকে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় সেই পদ্মফুল;—কতদিন হলো সে পদ্ম এখানে ফুটেছে, বাহিরের লোকে যদি একবার সেই পদ্মটি দর্শন কোত্তে অভিলাষী হয়, অভিলাষ পূর্ণ হোতে পারে কি না?

মনে হলো এই রকম, কিন্তু তাড়াতাড়ি কার্য করা ভাল নয়, এই বিবেচনায় লোক দুটির সঙ্গ আমি নিলেম না; গ্রামে যখন এসেছি, একটু সূত্র যখন পেয়েছি, তখন অবশ্যই অন্য কোন সূত্রে বিশেষ বৃত্তান্ত জানতে পারা যাবে, এইরূপ স্থির কোরে, বৃক্ষান্তরাল থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে আরো খানিকদূর অগ্রসর হোলেম। সেদিকে ভাঙাবাড়ী কম, খানকতক ছোট ছোট নূতন বাড়ী কতক কতক ইষ্টকালয়, কতক কতক তৃণপত্রালয়। রাস্তার বামদিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা একখানা বৃহৎ বাড়ী দেখতে পেলেম, সেই বাড়ী-

খানা বহুদিনের পুরাতন, অর্দ্ধেকের অধিকাংশ অব্যবহার্য, পূর্ব্বদিকের অল্পাংশ মাত্র। নূতন মেরামত করা হয়েছে, কপাট-জানালা বদল করা হয় নাই, এক একটা জানালা গরাদে-শূন্য, কীট-জীর্ণ, ভগ্নকপাটে ঢাকা। বোধ হলো, সেই অংশে মানুষ আছে। ছাদের উপর থেকে লম্বিতভাবে খানকতক ধুতি-শাড়ী রবিতাপে বিস্তৃত ছিল, সেই নিদর্শনেই আমি বুঝলেম, সেই অংশে মানুষ আছে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সেই বাড়ীখানার দিকে আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেম। দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি একজন অর্দ্ধবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি গাভীর বন্ধনরজ্জু ধারণ কোরে সেই পথ দিয়ে চোলে আসছে, আমার নিকটবর্তী হোলে কথা কবার ইচ্ছায় সেই ব্রাহ্মণকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ বাড়ীখানি কার ?"

ব্রাহ্মণ খানিকক্ষণ নীরবে আমার মুখপানে চেয়ে থাকলেন, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা, পূর্ব্ববঙ্গের সুর সর্ব্বদা শ্রবণ করা আমার অভ্যাস ছিল না, অনুকরণ করাও আমার পক্ষে কঠিন ছিল, সুতরাং সেই ব্রাহ্মণ আমারে হয় তো পশ্চিম-দেশী বোলে অবধারণ কোল্লেন ; আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তার পর যখন আমি দ্বিতীয়বার সেই ভাবে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তখন তিনি দেশীয় সুরে একটু শীঘ্র শীঘ্র বোল্লেন, "বাবুদের বাড়ী। বাবুরা পূর্ব্বে এখানকার বিখ্যাত জমিদার ছিলেন, প্রজা-লোকেরা এই বাড়ীর কর্ত্তাকে রাজা বোলে গৌরব কোত্তো, বাড়ীখানারও নাম ছিল রাজবাড়ী। বাবুদের বহু গোষ্ঠী, ক্রমে ক্রমে যমদণ্ডে বংশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, জমিদারীও বিক্রি হয়ে গিয়েছে, এখন আছে কেবল তিনটি বাবু আর গুটিকতক বিধবা। অতি কষ্টে দিন চলে। বাবু তিনটির মধ্যে দুটি এখনো নাবালক, যিনি এখন কর্ত্তা, তিনিই ঐ নাবালক ভাইদুটির অভিভাবক। কর্ত্তার নাম রমণীবল্লভ ভৌমিক।"

ঐ পর্যন্ত পরিচয় শ্রবণ কোরে, ব্রাহ্মণের হাত থেকে গরুর দড়িগাছটি গ্রহণ কোরে, পথের ধারের একটা গাছের ডালে আমি বেঁধে রাখলেম ; মনে কেমন এক প্রকার নূতন রকম উৎসাহ এলো। ব্রাহ্মণকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বংশী পোদ্দারের বাড়ী এখান থেকে কত দূর ?"

আমার প্রথম প্রশ্ন শ্রবণে ব্রাহ্মণ যেমন চকিতনেত্রে আমার বদন নিরীক্ষণ কোরেছিলেন, এবারেও সেই ভাব। ব্রাহ্মণ নিরুত্তর। ভাবের ভাব শীঘ্র আমি বুঝতে পাল্লেম না। সেই পুরাতন বাড়ীর ছাদের কাপড়গুলি বাতাসে উড়ে উড়ে নৌকার পালের মত ফুলে ফুলে উঠছিল, অন্যমনে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে, জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে ব্রাহ্মণ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তুমি বুঝি হুগলীজেলার ছেলে ?"

আমার প্রতি এই প্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন হবে, ঐরূপ উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর আমারে দিতে হবে, সে জন্য আমি প্রস্তুত ছিলেম না ; কাজেই ছাড়া ছাড়া উত্তর দিলেম, "কোন জেলার ছেলে আমি, তা আমি বোলতে জানি না ; থাকি এখন [illegible] ; বহরমপুর থেকে এসেছি, মাণিকগঞ্জের বংশী পোদ্দারের বাড়ী এখান থেকে কতদূর ”

দুই তিনবার মস্তকসঞ্চালন কোরে ব্রাহ্মণঠাকুর বোল্লেন "হুঁ—হুঁ—হুঁ! বংশী পোদ্দারকে এখন অনেক ছেলেই খুঁজবে! বংশী পোদ্দারের এখন জোরকপাল!

আমি।—কেন মহাশয়? বংশী পোদ্দারের জোরকপাল কি জন্য?

ব্রাহ্মণ।—জন্যটা আমি এ জায়গায় বোলতে ইচ্ছা করি না। পথের মাঝখানে সব কথা গল্প করা ভাল নয়। তুমি দেখছি বংশীর একজন কুটুম্বের ছেলে হবে, তোমার কাছে বোলতে পারি, কিন্তু এখানে পারি না। ঐ বাগানের ভিতর একখানি আটচালা ঘর আছে, সেইখানে চল। গরুটি আমার এইখানেই বাঁধা থাক।

আমি।—(ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাগানের আটচালার বারান্দায় গিয়া) কি মহাশয়, বংশীর কপালের কথা কি রকম?

ব্রাহ্মণ।—কে জানে বাপু, কপালের কথা কেহই বোলতে পারে না। বংশী পোদ্দার যতদিন সোণা-রূপা বিক্রি কোত্তো, চোরেদের কাছে চোরামাল কিনে কিনে রাখতো, সেই বংশী এবার একটি মা-লক্ষ্মী কিনে ফেলবে!

আমি।—মা-লক্ষ্মী কেনা কি রকম?

ব্রাহ্মণ।—কে জানে বাপু! কোথাকার কারা আমাদের এই গ্রামে একটি মা-লক্ষ্মী এনে রেখেছে, মা-লক্ষ্মীর হাতে পায়ে পদ্মফুল থাকে, এ লক্ষ্মীটির আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ পদ্মফুলে গড়া!

আমি।—বংশী পোদ্দার সেই পদ্মফুলের লক্ষ্মীটিকে কার কাছে কিনলে?

ব্রাহ্মণ।—কে জানে বাপু! কারা সব এসেছিল, তারা সব লক্ষ্মী-ব্যাপারী দরদস্তুর হয়ে গিয়েছে, দু হাজার টাকা পণ!

আমি।—ব্যাপারীরা এখন আছে কোথা?

ব্রাহ্মণ।—কে জানে বাপু! কোথা তারা চোলে গিয়েছে, এই মাসের শেষাশেষি এসে কাজটা নির্ব্বাহ কোরে দিয়ে যাবে, এই রকম আমি শুনেছি।

আমি।—লক্ষ্মীটি এখন আছেন কোথায়?

ব্রাহ্মণ।—তা আমি তোমায় বোলবো না।

আমি।—লক্ষ্মীটির নাম কি?

ব্রাহ্মণ।—তাও আমি বোলতে পারবো না। আমি একজন সাক্ষী আছি। কেনা-বেচার কথা যখন স্থির হয়, বাড়ীর লোকেরা সেই সময় আমায় ডেকেছিল, আমি একজন ঘটক ব্রাহ্মণ, ঐ রকম কাজ আমার, তাই জন্য আমায় ডেকেছিল, ব্যাপারীরা আমাকে দুটি টাকা প্রণামী দিয়ে গিয়েছে, কথা প্রকাশ করা নিষেধ।

আমি।—(প্রণাম করিয়া) ঘটকঠাকুর আপনি? আপনাকে দণ্ডবৎ! দুটি টাকা তারা দিয়ে গিয়েছে, আমি আপনাকে পাঁচটি টাকা দিচ্ছি, দয়া কোরে সেই লক্ষ্মীর নামটি আমাকে বলুন।

ব্রাহ্মণ।—নাম আমি কিছুতেই বোলবো না। শেষব্যাপারের দিন ব্যাপারীরা আমাকে আরও দশ টাকা দিয়ে যাবে, অঙ্গীকার আছে।

আমি।—আচ্ছা, দশ টাকাই আমি দিচ্ছি, নামটি আপনি বলুন।

ব্রাহ্মণ।—বাপ্‌রে! তাও কি হয়? ঘটক আমি হোতে পারি, বিশ্বাস-ঘাতক হোতে পারি না।

আমি।—আচ্ছা, লক্ষ্মীটি কোথায় আছেন, সে কথা আপনি বোলতে পারেন! তাতে আপনার কোন আপত্তি নাই? নাম দিলেও আপনি দশটাকা পাবেন, ঠিকানা দিলেও আপনি দশটাকা পাবেন, এখনি হাতে হাতে নগদ পাবেন; দুদিকেই আপনার লাভ; ঠিকানাটি আপনি বলুন।

ব্রাহ্মণ।—(হস্ত বিস্তার করিয়া) অগ্রে দক্ষিণা দাও, তার পর—

ক্রমশই বেলা বাড়তে লাগলো, ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৃথা আর কথা-কাটাকাটি কোত্তে ইচ্ছা হলো না; টাকা আমার সঙ্গেই ছিল, ব্রাহ্মণের হস্তে তৎক্ষণাৎ আমি দশটি টাকা প্রদান কোল্লেম, প্রদান কোরেই ঠিকানাটি আবার জানতে চাইলেম।

টাকাগুলি খুব শক্ত কোরে কোঁচার কাপড়ে বেঁধে রেখে, প্রফুল্লবদনে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "ঠিকানাটি তুমি তো জানতে পেরেছ; তবে আর আমার মুখে নূতন শুনবার আকিঞ্চন কেন? বর্ণ অপেক্ষা চক্ষের গুণ বেশী।"

সবিস্ময়ে আমি মনে কোল্লেম, ঠকালে! ঠকালে!—ব্রাহ্মণ আমারে ঠকালে! ভারী ধূর্ত্ত! টাকাগুলি আগে হস্তগত কোরে এখন উলটো কথা বলে! বিস্ময় প্রকাশ কোরে তৎক্ষণাৎ তাঁবে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে কি মহাশয়! ঠিকানা আমি জানতে পেরেছি, এটা আপনি কি রকম কথা বলেন? কি আমি জানতে পেরেছি? বংশী পোদ্দারের বাড়ী?"

ব্রাহ্মণ বোল্লেন "তা কেন? বংশী পোদ্দারের বাড়ী এ পাড়ায় নয়, সে বাড়ী এইখান থেকে দু তিন রশী দক্ষিণে। মা লক্ষ্মী এখন তত দূরে কেন যাবেন? নিকটেই আছেন।"

অধিক আগ্রহে তৎক্ষণাৎ আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "নিকটে কোথায় মহাশয়?"

ব্রাহ্মণ তখন যেন চঞ্চল হয়ে উত্তর কোল্লেন, "কেন? যে বাড়ীর সম্মুখে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে, যে বাড়ীর ছাদে সেই সকল কাপড় শুকুচ্ছে, সেই বাড়ী, সেই বাড়ীতেই এখন মা-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। যাই আমি,—আমার মা-লক্ষ্মীর হয় তো জলতৃষ্ণা পেয়েছে, অনেকক্ষণ জল দেখানো হয় নাই, দু-বেলা দু-সের দুধ হয়, তৃষ্ণার সময় জল খেতে না পেলে, দুধ কম হবে। আমি একটু একটু আফিং সেবা করি, দুগ্ধ বিহনে দম ফেটে মারা যাব! চোল্লেম।"

চঞ্চল হয়ে বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, একটু থাকুন, আমার আর একটি জিজ্ঞাসা আছে, একটি মাত্র কথা। আপনার নামটি আমি জেনে রাখতে ইচ্ছা করি। যদি কোন বিশেষ আপত্তি না থাকে, অনুগ্রহ কোরে বলুন, আপনার নামটি কি?"

"শ্রীধনঞ্জয় ঘটক ন্যায়ভূষণ।"—সংক্ষেপে এইমাত্র উত্তর দিয়েই ঘটকমহাশয় বাগান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন, বৃক্ষশাখা থেকে দড়িগাছটি খুলে,

গাভীটি নিয়ে অন্যদিকে চোলে গেলেন। ঐ গাভীটি তাঁর মা-লক্ষ্মী। আফিং-খোর গো-স্বামীদের কাছে দুগ্ধবতী গাভীগুলির যথেষ্ট আদর। আমি সন্তুষ্ট হোলেম। আশার অতিরিক্ত ফল আমি লাভ কোল্লেম। বংশী পোদ্দারের বাড়ীর তত্ত্ব লওয়া তখন আর অবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম না; বেলা অধিক হয়েছিল, বাসায় ফিরে চোল্লেম।

বাসায় আমি পোঁছিলেম। নিত্যই আমি বেড়াতে যাই। কোথায় গিয়েছিলেম, কি কি কাজ কোরে এলেম, কেহই কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেন না, কাহারও কাছে আমারে কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হলো না, অধিক বেলায় স্নান আহার কোরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কোল্লেম, বৈকালে আর কোথাও বেড়াতে বেরুলেম না, সামান্য সামান্য কার্যে দিনমান কেটে গেল।

রাত্রে আমার দৈনিক কার্যের আলোচনা। পতিতপ্রায় গ্রামে দুটি গ্রাম্য-লোকের কথোপকথন। "কদর্য পঙ্কে পদ্মফুল," এই কথা যখন তাঁরা বলেন, আক্ষেপ কোরে যখন তাঁরা সেই কথাটির একটু একটু ব্যাখ্যা করেন, তখনি আমি বুঝেছিলেম, আমার পদ্মমুখী অমরকুমারীই তাঁদের সেই রূপক-বর্ণিত পদ্মফুল। কোথায় সেই পদ্মফুল, সে ক্ষেত্রে সেটি আমি নির্ণয় কোত্তে পারি নাই। গ্রামের মধ্যে ফুটেছে, পূর্ব্বে ফুটে নাই, নূতন ফুটেছে, এইটুকু মাত্র বুঝেছিলেম; বিধাতার অনুগ্রহ, গো-স্বামী-ঘটকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পূর্ব্বের দুটি ভদ্রলোকের বাক্যসঙ্কেতে বংশী পোদ্দারের নাম পাওয়া গিয়েছিল, বংশী পোদ্দারের নামের উল্লেখ ধনঞ্জয় ঘটকের বাক্যঝুলীর গ্রন্থি শিথিল। অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া গেল। এখন যদি—কল্যই যদি আমি ঢাকায় চোলে যাই বহরমপুরের রুবকারি অবশ্যই এসেছে,—এখন যদি আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দাম কোরে মণিভূষণের দ্বারা পুলিস মোতায়েনের প্রার্থনা করি, মঞ্জুর হোতে পারে, অবশ্যই সে প্রার্থনা মঞ্জুর হবে, কিন্তু এখনো আমার সব অনুমানের উপর নির্ভর; আনুসঙ্গিক কতকগুলি তত্ত্ব যদিও এখন আমার পরিজ্ঞাত, তথাপি নামটি পাওয়া গেল না। পুলিশ মোতায়েন নিয়ে যদি আমি এখন সেই অর্দ্ধভগ্ন বাড়ীতে রমণীবল্লভের অন্দরমহলে অমরকুমারীর অন্বেষণে যাই, সেই পদ্মফুলটি—ঘটকমহাশয়ের সেই লক্ষ্মী-দেবীটি সত্য যদি অমরকুমারী না হন, তা হোলে পরিণাম কি দাঁড়াবে! পুলিসের লোকেরা ফিরে যাবে, ম্যাজিষ্ট্রেটের হুজুরে রিপোর্ট দিবে, দরখাস্তকারী মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে, চক্রঘূর্ণনে শুভকল্পনা পেষিত হয়ে যাবে!—না, সে কার্য ভাল নয়। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে মূলতত্ত্বটি জানা উচিত। রমণীবল্লভের বাড়ীর সেই পদ্মফুলটি সত্য সত্য আমাদের অমরকুমারী কি না, সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রযত্নে সেই তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা আবশ্যক।

নির্ণয় করবার উপায় কি?—হয় স্বচক্ষে অমরকুমারীকে দর্শন করা, না হয় অন্য কোন উপায়ে অন্য কাহার দ্বারা সেই বিদেশিনী কন্যার নামটি অবগত হওয়া। এই দুটি উপায় আছে; কিন্তু আপাততঃ ঐ দুইটি আমার পক্ষে অসম্ভব হোচ্ছে। আমি একজন অপরিচিত, নূতনলোকের বাড়ীর

অন্দরে প্রবেশ কোরে একটি বিদেশিনী কুমারীকে দেখে আসবো, এ কথা মনে করাও পাগলামী ; আমার হয়ে আর একজন সেই নামটি জেনে এসে আমারে জানাবে, এমন আশাই বা কি প্রকারে করা যায় ? এ অঞ্চলে কেহই আমারে জানে না, কেহই আমারে চিনে না, কারেই বা আমি অনুরোধ কোরবো ? কেই বা আমার কথা রাখবে ? কেনই বা রাখবে ? বড়ই গোলমালে ঠেকলেম। একগাছি সূক্ষ্ম সূতার উপর আমার তখনকার আশা-ভরসা ঝুলতে থাকলো।

আদালতের সাহায্য নিয়ে অমরকুমারীর অনুসন্ধানে আমি এসেছি, ক্রমশই দিন গত হোচ্ছে, আসল কাজ কিছুই হোচ্ছে না। মনে মনে আমি জানতে পেরেছি, তিনটি লোকের মুখে অবস্থাগত-প্রমাণে মনে মনে আমি বুঝতেও পেরেছি, অমরকুমারী এইখানে আছেন ; কিন্তু আমার মনের সঙ্গে আইন-আদালতের সম্পর্ক নাই। আইনের মানরক্ষা, আদালতের সন্তোষবিধান আর আমার অন্তরের শান্তিবিধান, এই তিনটি একত্র না হোলে কার্য সিদ্ধ হবে না, সকলেই এটি বুঝতে পাচ্ছেন। সে সিদ্ধি কত দূর ?

আর তিন দিন অতিবাহিত। সে তিন দিন আমি কেবল উপায় অবধারণে ব্যাপৃত থাকলেম ; বাসা থেকে কোথায়ও বাহির হোলেম না ; যা কিছু জানতে পাচ্ছি, আপনার মনে মনেই রাখছি ; হরিহরবাবুকেও জানাচ্ছি না, মণিভূষণকেও কিছু বোলছি না। এ ভাবটাও ভাল নয়। একজনের বুদ্ধিতে সকল যুক্তি যোগায় না, তন্নিমিত্তই অপরের পরামর্শগ্রহণ আবশ্যক হয়। আমি মনে কোল্লেম, যতটুকু জেনেছি, হরিহরবাবুকে বলি ; আবার ভাবলেম, কাঁচাকথার উপর জোর দাঁড়াবে না, হরিহরবাবু আমার কথার উপর বিশ্বাসস্থাপন কোরবেন না, আমার কেবল কাঁচাবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে মাত্র ; আর একটু অগ্রসর হওয়া ভাল ; কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, সেটিও মনে মনে অবধারণ কোল্লেম।

মুর্শিদাবাদ থেকে যখন আমরা আসি, তখন তিন প্রস্থ ছদ্মবেশ, দুই যোড়া পিস্তল, আর গুলীবারুদ আমার সঙ্গে ছিল, এইবার ছদ্মবেশ-ধারণের প্রয়োজন উপস্থিত। চতুর্থদিবসে অপরাহ্ণে বাসা থেকে আমি বেরুলেম, একপ্রস্থ ছদ্মবেশ আমার সঙ্গে থাকলো। যে বাগানের আটচালায় ধনঞ্জয় ঘটকের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল, সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় সেই বাগানে গিয়ে আমি পৌঁছিলেম। আটচালায় উঠলেম না, যে দিকে সারি সারি অনেকগুলি আম্রবৃক্ষ, সেই দিকে গিয়ে অতি সাবধানে বসন-পরিবর্ত্তন কোল্লেম। স্ত্রীলোকের বেশ। বক্ষ-আবরণের যোগ্য কাঁচুলি-ধরনের ছোট একটি জামা ; যেন অনেকদিনের ব্যবহার করা, একটু একটু মলিন, ঠাঁই ঠাঁই একটু একটু দাগ ; পরিধান একখানি আধময়লা শাড়ী ; মাথায় পরচুল-কবরী ; অলঙ্কারের মধ্যে কেবল দুহাতে দুগাছি পিতলের বালা।

বেশ পরিবর্ত্তন বেশ হলো, রূপ পরিবর্ত্তনে কতদূর কৃতকার্য হোলেম, সেটি আমি নিজে জানতে পাল্লেম না। সন্ধ্যার পরেই আকাশে চন্দ্রোদয় হলো,

আমার পুরুষবেশের সজ্জাগুলি একখণ্ড ক্ষুদ্রবস্ত্রে বন্ধন কোরে একটি পুঁটুলি প্রস্তুত কোল্লেম ; সেই পুঁটুলিটি কক্ষে রেখে, বাগান থেকে বেরিয়ে, বাগানের ফটকের ধারে এসে দাঁড়ালেম। সম্মুখেই রাস্তা ; রাস্তার পরেই একটা পুস্করিণী। সবে মাত্র সন্ধ্যা অতীত হয়েছে, রাত্রি হয় নাই, দিব্য জ্যোৎস্না, গ্রামের দুটি একটি স্ত্রীলোক সেই সময় সেই পুস্করিণীতে জল নিতে এলো, তফাৎ থেকে আমি দেখলেম ; পায়ে পায়ে এগিয়ে এগিয়ে ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম। ঘাটে তখন একটি মাত্র স্ত্রীলোক ; গাত্রপ্রক্ষালন কোরে জলকুম্ভ-কক্ষে সিক্তবদনে সেই স্ত্রীলোকটি ঘাটের চাতালে এসে উঠলো ; ঠিক চাতালের ধারেই আমি ; আমারে দেখে সেই স্ত্রীলোক আমার মুখের কাছে একটু হেঁট হয়ে কেমন একরকম নূতন সুরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে গা তুমি ?"

মুখে আমার ঘোমটা ছিল না, বুকে আমার কাঁচুলি ছিল, মুখের কথা না শুনে, চেহারা দেখে, পরিচ্ছদ দেখে, হঠাৎ কাহারো মনে হোতে পারে খোট্টার মেয়ে। সেই স্ত্রীলোক আমারে বাস্তবিক খোট্টার মেয়ে বিবেচনা কোরেছিল কি না, তা আমি বোলতে পারি না ; বাংলা কথাতেই আমি উত্তর দিলেম, "আমি বিদেশিনী, এই গ্রামে নূতন এসেছি, আশ্রয় পাচ্ছি না, পথে শুনলেম, এইখানে একখানি রাজবাড়ী আছে, বিদেশী গরিব-দুঃখী দৈবাৎ এখানে এসে উপস্থিত হোলে সেই বাড়ীতে আশ্রয় পায়। তাই শুনেই আমি এদিকে আসছি, কোথায় সেই রাজবাড়ী, কোন দিকে যেতে হবে, তুমি যদি বোলে দাও, তবেই—"

স্ত্রীলোকটি অর্দ্ধ-বয়সী। আমার কথা শুনে সে যেন একটু কাতরভাবে বোল্লে, "আর বাছা রাজবাড়ী। রাজাদের কি আর সে কাল আছে? যমদণ্ডে সব গিয়েছে, সব গিয়েছে ! বিধাতা সব কোত্তে পারেন ! রাজলক্ষ্মীও ছেড়ে গিয়েছেন ! তা তুমি এসেচো, থাকতে পাবে, এসো আমার সঙ্গে। সেই বাড়ীতেই আমি থাকি, কাজকর্ম্ম করি, বড়-বৌমা ভালবাসেন, সেই খাতিরেই থাকি ; অনেক দিন আছি, ছেড়ে যেতেও মন চায় না। এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

আমি বুঝতে পাল্লেম, ঐ স্ত্রীলোক সেই রাজবাড়ীর দাসী। সে দিন আমি যে বাড়ীখানা দেখে গিয়েছিলেম, আধখানা ভাঙ্গা, আধখানা নূতন মেরামত করা, দাসী আমারে সঙ্গে কোরে সেই বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল, প্রথমেই বৌমার কাছে নিয়ে হাজির কোল্লে।

ধনঞ্জয় ঘটকের মুখে শুনেছিলেম, তিনটি ভাই এখন এই বাড়ীর মালিক। ছোট দুটি নাবালক, বড়টি এখন কর্ত্তা। সেই কর্ত্তাটির গৃহলক্ষ্মী ঐ বৌমা। দাসীর মুখে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শুনে বৌমা আমারে কত কথাই জিজ্ঞাসা কোল্লেন, দুঃখিনী দেখে কতই দয়ার কথা বোল্লেন, মুখটি বুজে চুপটি কোরে সব কথাগুলি আমি শুনলেম ; প্রত্যয় জন্মিল, যথার্থই এটি গৃহলক্ষ্মী ; কথাগুলিও যেমন মিষ্ট, ব্যবহারও সেইরূপ কোমল। বৌমা আমারে নিশাকালে সেই বাড়ীতে আশ্রয় দিতে সম্মত হোলেন, মনে মনে আনন্দ অনুভব কোরে আমি আশ্বাস প্রাপ্ত হোলেম।

শুনেছিলেম ভৌমিক ; ভৌমিকেরা ব্রাহ্মণ হয়, সে কথাও শুনেছিলেম ; আহারাদি সম্বন্ধে মনে কোন দ্বিধা রাখলেম না, বৌমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প কোরে একটি শূন্য ঘরের মধ্যে খানিক আমি বিশ্রাম কোত্তে লাগলেম ; বৌমা সেই সময় কার্যান্তরে অন্য ঘরে চোলে গেলেন।

ব্যাকরণ ভুল হবে না, সেই শূন্য ঘরে আমি একাকী। যাঁরা ব্যাকরণ জানেন "একাকিনী" কেন বোল্লেম না, সেই তর্ক উপস্থিত কোরে তাঁরা আমারে তিরস্কার করুন, সেই শূন্যঘরে আমি একাকী। বৌমার আদেশে সেই দাসী আমারে কিছু জলখাবার এনে দিলে, আমি জল খেলেম। পাত্রগুলি নিয়ে দাসী যখন চোলে যায়, তখন আমি মনে কোল্লেম তারে কিছু জিজ্ঞাসা করি, জিজ্ঞাসা করবার উপক্রম কোচ্ছিলেম, দুটি একটি কথা মুখে এনেও ছিলেম, আমার মুখের দিকে চেয়ে দাসী বোলে গেল, "বোসো বাছা ! বোসো বাছা ! আমি আসছি।"

দাসীটির নাম রেবতী। কথাবার্ত্তায় রেবতীকে নিতান্ত ছোটলোকের মেয়ে বোলে বোধ হয় না। রেবতীর সততার কথা মনে মনে আমি ভাবছি, বৌমার দয়ার কথা মনে আমি আলোচনা কোচ্ছি, দশটাকা দিয়ে ধনঞ্জয় ঘটকের কাছে যে কথাটি আমি কিনে নিয়েছি, সেই কথাটি সত্য কি না, সেই ব্যাপারে আমি ঠোকেছি কি না, সন্দেহে সন্দেহে তাই তোলা-পাড়া কোচ্ছি, রেবতী এলো। ইসারায় আমি তারে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে বোল্লেম, ইসারা অনুসারে কার্য কোরে রেবতী আমার কাছে এসে বোসলো।

আমি চাই রেবতীর মুখপানে, রেবতী চায়, আমার মুখপানে, কথা হয় না। অগ্রে কি আমি বোলবো, চিন্তা কোরে অবধারণ কোচ্ছি, মনের আসল কথাটি প্রথমেই প্রকাশ করা উচিত কি না, ভাবছি, মৌনভঙ্গ কোরে রেবতী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি তুমি আমারে তখন বোলবে বোলছিলে ? বল দেখি শুনি কথাটি কি ?"

আমি ভাবলেম, তাই ত ! কি বলি ? নূতন এসেছি, আশ্রয় চেয়েছি, আশ্রয় পেয়েছি, হঠাৎ যদি আমার সেই মনের কথা ভেঙে দিই, আমার কৌশল-টিও হয় তো ভেঙে যাবে ! বলি কি ?—ভেবে চিন্তে সহসা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বাবু "কোথায় ?"

রেবতী।—ছোট বাবুদুটি তাঁদের ঘরেই আছেন, বড়বাবু বাড়ী নাই।

আমি।—কোথায় তিনি ?

রেবতী।—তিন দিন হলো, সহরে বেরিয়েছেন, নূতন একটা কারবার কর-বার ইচ্ছা আছে, সেই চেষ্টাতেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চেন।

আমি।—রাজপুত্র তিনি, কারবারের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়, এতই কি হীনাবল হয়েছে ?

রেবতী।—অবস্থার শেষ নাই। তিনি তো তিনি, আমি—আমি তো একজন চাকরানী আমি যখন এই বাড়ীর অবস্থার কথা মনে করি চক্ষের জলে ভেসে যাই !

আমি।—অকস্মাৎ এত দুরবস্থা হবার কারণ কি?

রেবতী।—অকস্মাৎ নয়, ক্রমে ক্রমে দুর্দশা দাঁড়িয়েছে। মারীভয়ে বংশশেষ, বংশের সঙ্গে বিষয় শেষ। কর্ত্তা যখন মারা পড়েন, ছোট ছেলে-দুটি তখন খুব ছোট ছোট; বড়টির বয়স তখন বড় জোর ১৬।১৭ বছর; কর্ত্তাবাবুর শত্রুপক্ষ অনেক ছিল, সুযোগ পেয়ে বিষয়-আশয় সব তারা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল,—পরের হাতে মামলা, তাতেই অনেক টাকা বৃথা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কেবল মা-গিন্নীর নামে ছোট একখানি তালুক ছিল, সেইখানি আছে, তাতেই একরকম চলে, ক্রিয়া-কর্ম্ম চলে না, খাওয়া-পরা চলে, কাজে কাজেই এক আধটা নূতন নূতন কারবার না কোল্লে ঠাঁট বজায় রাখা ভার হয়।

আমি।—তা তো বটেই! তা তো বটেই! কিন্তু লক্ষ্মীর সংসারে ততটা কষ্ট হয় না। যদিও কিছু কিছু হয়, লোকে সেটা টের পায় না। বিশেষ, এই বৌমাটি দেখছি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; ঐ লক্ষ্মীর দয়াগুণে দুঃখিনী বিদেশিনীরা আজিও এ সংসারে আশ্রয় পায়।

রেবতী।—(বিস্ময়ে চাহিয়া) কেন তুমি এমন কথা বোল্লে? তুমি বিদেশিনী, তুমি আজ রাত্রে এই বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েচো, সেই জন্যই কি?

আমি।—না না না, শুধু সেই জন্যই নয়। আমি একটা দুঃখিনী বিদেশিনী, এমন দুঃখিনী বিদেশিনী কোথায় কত আছে, কে জানে? এ রকম অবস্থায় যে বিদেশিনী এখানে আসে, অক্লেশে এই বাড়ীতে আশ্রয় পায়।

রেবতী।—এ সব তুমি কি কথা বোলচো? নাম আছে পদ্মপুকুর, পদ্মফুল নাই। এ বাড়ীতে এখন বিদেশিনীর অক্লেশে আশ্রয় পাওয়া, এটা তোমার কি রকম অনুমান?

আমি।—অনুমান বল কেন, তোমাদের মা-লক্ষ্মী সুখে থাকুন, ঠিক কথাই আমি বোলছি; পদ্মপুকুরে পদ্মফুল আছে; সম্প্রতি একটি বিদেশিনী কুমারীও—

রেবতী।—(বিস্ময়ে) ও মা গো! সেই কথা বুঝি তুমি বোলচো? সে কথা তুমি কেমন কোরে জানলে?

আমি।—(অজ্ঞানতা জানাইয়া) কোন কথা? পদ্মফুলের কথা?

রেবতী।—বল যদি, পদ্মফুল বোলতে পারো, বটেও একটি পদ্মফুল,—পদ্মর মত একটি বিদেশিনী সম্প্রতি এই বাড়ীতে এসেছে।

আমি।—আমি ত তবে ঠিক কথা ধোরেছি। পদ্মফুলটি কি রকমে এসেছে?

রেবতী।—পশ্চিমদেশের তিনজন লোক একটি সুন্দরী মেয়েকে এই বাড়ীতে রেখে গিয়েছে।

আমি।—রেখে তারা কোথায় গিয়েছে, সে কথা তুমি কিছু শুনেছো?

রেবতী।—বাবু হয় তো শুনে থাকবেন, আমি কেমন কোরে শুনবো? দাসীর সঙ্গে তাদের সে সব কথা কেন হবে?

আমি।—তবে সেই বিদেশীনা মেয়েটি এখানে কি অবস্থায় আছে?

রেবতী।—আহা হা! বাছা কেবল বোসে বোসে রাতদিন কাঁদে, খায় না, ঘুমায় না, কথা কয় না, কেবল কাঁদে, কেবল কাঁদে!

আমি।—আহা হা! আমি তোমাদের সেই বিদেশিনী মেয়েটিকে একবার দেখতে পাই না?

রেবতী।—কেন পাবে না? মেয়েমানুষ তুমি, বিদেশিনী তুমি, বিদেশিনী মেয়েমানুষে দেখতে পাবে না কেন?

আমি।—দেখাও মা, একবার তবে দেখাও, কেবল কাঁদে? আহা হা! সেই দুঃখিনীটিকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ কেমন আকুল হয়ে উঠছে!

রেবতী।—দেখে তুমি কি কোরবে?

আমি।—কে কার কি করে তা তো তুমি জান। সেটাও বিদেশিনী, আমিও বিদেশিনী; সেটিও দুঃখিনী, আমিও দুঃখিনী, দুটিতে এক ঠাঁই মুখামুখি কোরে বোসবো, দুঃখের দুঃখিনী। সমান সমান কষ্টভাগিনী একটি সঙ্গিনী হব, একরাত্রের জন্যও তোমাদের সেই বিদেশিনীটিকে একটু সান্ত্বনা দিব।

রেবতী।—তা তুমি পারবে। তোমার যে রকম মধুরবচন, তোমার যে রকম দয়ার প্রাণ, তোমার যে রকম দুঃখের দশা, তাতে কোরে তুমি সেই দুঃখিনীর সঙ্গিনী হোতেও পারবে, মিষ্টকথায় সান্ত্বনা দিতেও পারবে। আনবো তারে এইখানে না তুমি সেই ঘরে যাবে?

আমি।—হঠাৎ সেখানে আমার যাওয়াটা ভাল দেখাবে না, সেই বিদেশিনী যদি আমার কাছে আসতে ইচ্ছা করে, তারে বরং একবার এইখানেই এনে দাও, পার যদি এনে দিতে, তা হোলে তোমার কাছে আমি চিরজীবনের মত কেনা হয়ে থাকবো।

রেবতী গেল। আমি তখন মনে মনে কত রকমের কত কথা আন্দোলন কোত্তে লাগলেম। নারীবেশে এসেছি, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়বার ভয় ছিল। বিধাতা আমার প্রতি সদয় হয়ে আমার কণ্ঠে যেরূপ বর দিয়েছেন, বেশী-বয়সে কি রকম হয় বলা যায় না, কিন্তু এই পঞ্চদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত স্বদেশের অল্পবয়স্কা বালিকাদের স্বরের সঙ্গে সেই স্বরে—আমার এই কণ্ঠস্বরের সুন্দর মিলন হয়, হরিদাস কথা কোচ্ছে, কিম্বা হরিদাসী কথা কোচ্ছে, প্রভেদ বুঝে কেহই কিছু ধোত্তে পারে না। অমরকুমারী আসছেন, এইবার জানা যাবে; আমার কণ্ঠস্বর শুনে অমরকুমারী আমারে হরিদাস বোলে চিনতে পারেন কি না, এইবার পরীক্ষা হবে। আগে আমি মুখ দেখাব না;—স্থির কোরে রাখলেম, আগে আমি অমরকুমারীকে আমার মুখ দেখতে দিব না;—পরীক্ষা কোরে দেখবো, আজ রাত্রে অমরকুমারী আমারে চিনতে পারেন কিনা। এই সঙ্কল্পে চিত্ত দৃঢ় কোরে, চিবুকদেশ পর্যন্ত আমি ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখলেম।

বৌ সেজে আমি বোসে আছি, পুটুলীটি আমার সামনেই ধরা আছে, ঘরের দেয়াল আমার পৃষ্ঠের অবলম্বন। সে বাড়ীতে আমি নূতন গিয়েছি,

বৌমা ছাড়া আর আর যাঁরা যাঁরা বাড়ীতে আছেন, তাঁরা সকলেই বিধবা, সে কথা আমার শুনা হয়েছে; কিন্তু বৌমা ছাড়া আর কাহারো সঙ্গে আমার দেখা হলো না; কেহই আমারে দেখতে এলেন না। বঙ্গদেশের বিধাবাদের নারীজন্মের সমস্ত সাধ আহ্লাদ ফুরায়; সেই সঙ্গে হৃদয়ের কৌতূহল-প্রবৃত্তিও বিলুপ্ত হয়; ইহাই কি ঠিক? আমি নূতন গিয়েছি, কি রকম আমি, কৌতূহলবশে স্ত্রীলোকেরা অবশ্যই একবার দেখতে ইচ্ছা করেন; বাড়ীতে নূতন মানুষ গেলেই নারীমহলে সেই রকম হয়; আমি কিন্তু সেখানে সে রকম লক্ষণ কিছুই দেখলেম না, কেহই আমারে দেখতে এলেন না। আমাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, বিদেশিনী তো বিদেশিনী, হয় তো ভিখারিণী হোলেও হোতে পারি, এই ভেবেই হয় তো কেহ এলেন না। আমি যদি বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে সে বাড়ীতে প্রবেশ কোত্তেম, উৎকলী বেহারারা যদি বিচিত্র পাল্কীর উপর বসাইয়া সেখানে আমারে নিয়ে যেতো, পাল্কীর আগে আগে যদি ঢালতলোয়ারধারী দুজন ব্রজবাসী দরোয়ান ছুটতো, ঘর্ম্মাক্তকলেবরা, গাছ-কোমর-বাঁধা দুজন দাসী যদি পাল্কীর পাছু পাছু দৌড়িত, তা হোলে বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটাছুটি কোরে আমারে দেখতে আসতো; কেবল বাড়ীর লোক কেন, পাড়া-প্রতিবাসিনীরাও কৌতুকে কৌতুকে আমার কাছে এসে জমা হতো; সে জিনিস আমি নই, একজন দুঃখিনী বিদেশিনী মাত্র, কাজেই কেহ আমারে দেখতে এলো না; এলো না তো এলো না; না আসাই বরং আমার পক্ষে ভাল।

বোসে আছি, ঘরের একধারে একটি প্রদীপ জ্বলছে, আর একটি বিদে-শিনী আসবেন, সেই আশায় ঘোমটা তুলে দরজার দিকে এক একবার চেয়ে দেখছি, বিদেশিনী এলেন; সঙ্গে সঙ্গে রেবতী।

আমি অবগুণ্ঠনবতী। প্রবেশ কোরেই রেবতী যেন একটু চোমকে উঠে থোমকে দাঁড়ালো; চিবুকে অঙ্গুলীস্পর্শ কোরে বিস্ময়োক্তিতে সহসা বোলে উঠলো, "ও মা! এ কি গো! মেয়েমানুষকে দেখে মেয়েমানুষের লজ্জা! কি রকম বিদেশিনী। ঘোমটা-ঢাকা কলা-বৌ!"

আমার মুখাবরণ বস্ত্রখানি তাদৃশ স্থূলে ছিল না, দীপালোকে অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে বাহিরের বস্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলেম, বিদেশিনী এলেন। বিদেশিনীর মুখখানি আমি দেখলেম; রেবতীকে পূর্ব্বে দেখা ছিল, রেবতীর বিস্ময়-প্রকাশক মুখখানিও আমি দেখলেম, আমার দিকে চাইতে চাইতে বিদে-শিনী আমার কাছে বোসলেন; হাতখানেক তফাতে রেবতীও চুপটি কোরে বোসলো। প্রায় পাঁচ মিনিটকাল তিনজনেই আমরা নিস্তব্ধ।

বিদেশিনীর বিস্ময়, রেবতীর বিস্ময়, আমার আনন্দ। বিদেশিনীর মুখ-খানি আমি দেখেছি, অন্তরানন্দে অন্তরে অন্তরে আমি আশার আনন্দময়ী মূর্ত্তি আমি সন্দর্শন কোচ্ছি, বিদেশিনী আমার মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। রেবতী দুই তিনবার আমার অবগুণ্ঠন-মোচনের জন্য অনুরোধ কোল্লে, সে অনুরোধে আমি বধির থাকলেম, রেবতী পাছে নিজেই খুলে দেয়, তাই ভেবে

দুই হাতে অবগুণ্ঠনের অঞ্চলভাগ আমি টেনে টেনে চেপে রাখলেম। সুবিধা হলো। চাপামুখের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই কিছু গম্ভীর হবে, কণ্ঠস্বর যাদের পরিচিত, কথা শুনে তারাও ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না, সেইটি অবধারণ কোরে ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "বিদেশিনী! আমি গণনা জানি ; তুমি এখানে আছ, তাও জানি ; তুমি আমার কাছে আসবে, তাও জেনেছিলেম ; কেমন কোরে তুমি এখানে এসেছো, কারা তোমারে এখানে এনেছে, গণনা কোরে তাও আমি জানতে পেরেছি।"

বিদেশিনীর মুখে এতক্ষণ কথা ছিল না, আমার কথাগুলি শুনে, সুমধুরস্বরে, সুমধুর মৃদু-কম্পিতস্বরে বোল্লেন, "আমার দুর্ভাগ্যের কথা তুমি জানতে পেরেছো, আমি তোমারে জানতে পাচ্ছি না, তোমার মুখখানিও দেখতে পাচ্ছি না : মুখখানি একবার খোলো, তোমার মুখখানি একবার আমি দেখি, তার পর তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে।"

অন্তরের ভাব অন্তরে রেখে পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে আমি বোল্লেম, "যে সকল স্ত্রীলোক গণনা-বিদ্যা জানে, গণনার শেষফল পর্যন্ত সুসিদ্ধ না হোলে স্ত্রীলোকের কাছেও তারা মুখের কাপড় খোলে না ; আমিও এখন মুখের কাপড় খুলবো না। আমার সঙ্গে তোমার কথা হবে। বিদেশিনী! কি কথা জানতে আমার বাকী আছে ? এখানে এসে অবধি রাত-দিন তুমি কেবল কাঁদো ; যারা এনেছে, এইখানে তোমারে রেখে তারা সোরে গিয়েছে, আবার তারা আসবে, সেইবার তোমার ভাগ্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হবে। কেমন, এই সব কথাই ত তুমি বোলতে চাও ?"

ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বিদেশিনী বোল্লেন, "পরমেশ্বর সাক্ষী, ঐ সব কথা আমি বোলবো না। আমার ভাগ্যের সঙ্গে সেই সকল লোকের কি রকম যুদ্ধ হবে, কেন আমি রাত-দিন কাঁদি, তোমার গণনা এই দুই প্রশ্নের কি রকম উত্তর দিতে পারে ?"

আর আমি বাগাড়ম্বর কোল্লেম না ; দুই প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টই আমি বোলে দিলেম, "তারা তিনজন। তারা তোমারে বেচে ফেলবার মন্ত্রণা কোরেছে। দু হাজার টাকা পণ ধার্য হয়েছে। খরিদ্দার এখানকার একজন বংশী পোদ্দার। সেই খরিদ-বিক্রয় উপলক্ষেই তোমার ভাগ্যযুদ্ধ। এই গেল এক কথা, দ্বিতীয়তঃ কোথায় তুমি ছিলে, কোথায় তুমি এসেছ, কারে তুমি হারিয়েছ, আর তার সঙ্গে দেখা হবে কি না, এর পর তোমার কি হবে, এই সব ভেবে ভেবেই রাতদিন তুমি কাঁদো। কেমন, এই সব কথার সঙ্গে তোমার মনের কথার মিলন হয় ? এই সব কথাতেই তো তোমার ঐ দুই প্রশ্নের উত্তর হয় ? আমার গণনা এই সব কথা বলে।"

অবাক হয়ে রেবতী আমার ঐ সব গণনার কথা শুনছিল, আমি চুপ করবামাত্র অকস্মাৎ একটু উচ্চকণ্ঠে রেবতী বোলে উঠলো, "ও বাপু! এ মেয়ে তো কম মেয়ে নয়! এ মেয়ে তো কম গণনা জানে না! যা যা বোলে দিলে, সব ঠিক! সব ঠিক! সব যেন—"

রেবতীর কথাগুলি বিদেশিনীর কর্ণে গেল কি না, ঠিক আমি বুঝতে পাল্লেম না ; রেবতীর মন্তব্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ হোতে না হোতেই আমার মুখের অবগুণ্ঠনের দিকে চেয়ে বিদেশিনী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার গণনা ঐ সব কথা বলে ? বেশ গণনা তোমার ! তোমার গণনা আর কি কথা বলে ?"

"আর কি বলে, শুনবে ?" ঠিক আমার মনের কথাই বিদেশিনীর প্রশ্নে ব্যক্ত হলো, তাই বুঝেই মহোল্লাসে আমি প্রশ্ন কোল্লেম, "আমার গণনা আর কি বলে, শুনবে ? আমার গণনা আরো বলে, তুমি মুক্ত হবে। বন্দিনী আছ, এ অবস্থায় তোমারে আর বেশীদিন এখানে থাকতে হবে না। তোমার ভাগ্যের সংগে যারা যুদ্ধ কোত্তে চায়, যুদ্ধ তাদের হবে, কিন্তু এখানে হবে না ; শীঘ্রই তুমি এখানকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।"

রেবতীর মুখের দিকে বিদেশিনী চাইলেন, বিদেশিনীর মুখের দিকে অনিমেষে রেবতী চেয়ে রইল ; রেবতীর চক্ষের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিয়ে, মুখ বেয়ে বুকের উপর গোড়িয়ে পোড়লো ; রেবতী বোলছিল, "আজ আমাদের বাবু এখানে থাকলে—"

বৌমা এসে দেখা দিলেন। রেবতীর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। ঘরের এধার ওধার নেত্র-সঞ্চালন কোরে ঈষৎ প্রফুল্লবদনে বৌমা বোল্লেন, "এই যে বেশ হয়েছে ! দুটি বিদেশিনীই একঠাঁই ! রেবতী আমাদের যোগাযোগটা জানে ভাল ! নূতন বিদেশিনীর মুখখানি কেমন ঘোমটা-ঢাকা ! বাঃ—ঘোমটাতে ঐ রূপখানি বেশ মানিয়েছে ! কি গো বিদেশিনী !—তোমাদের দুটি বিদেশিনী-কেই জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, তোমাদের আলাপ-পরিচয় কেমন হলো ?"

দুটি বিদেশিনীই নিরুত্তর। বিস্ময়বিহ্বলা রেবতীর মুখেই ঐ প্রশ্নের উত্তর। বিস্ময়চমকে চেয়ে রেবতী বোল্লে, "মা গো মা ! এমন বিদেশিনী দেখি নাই ! এই নূতন বিদেশিনী চমৎকার গণনা জানে ! এই ব্রজকিশোরীর আগা-গোড়া সকল কথা এই নূতন বিদেশিনী একে একে গণনা কোরে বোলে দিলে ! কজন এসেছিল, কত দাম হলো, কে খরিদ্দার হলো, এখানে থাকা হবে কি না হবে, সব কথাই নূতন বিদেশিনীর গণনায় উঠেছে ! মেয়েটি দেখতে ছোট, কিন্তু গণনা বড় আশ্চর্য !—আশ্চর্য গণৎকার !"

বৌমা খানিকক্ষণ সুস্থির-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে থাকলেন, চেয়ে চেয়ে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সত্যই কি তুমি গণনা শিখেচ ? বল দেখি, আমাদের সংসারের এ দুর্দ্দশা আর কতদিন থাকবে ?"

বিবেচনা না কোরেই আমি উত্তর দিলেম, "যে দিনে এই ব্রজকিশোরীর ভাগ্যদুঃখের অবসান হবে, সেইদিন আমি এই বাড়ীতে আর একবার আসবো, রাজলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি দর্শন কোরবো। গণনায় আমি জানতে পেরেছি, বাবু যদি পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মপথ পরিহার না করেন, যারা বিপদে পড়ে, তাদের যদি সহায় হন, অবস্থাচক্রে মানুষের যেমন কুমতি ঘটে, বাবু যদি সেরূপ

কুমতির দাসত্ব না করেন, তা হোলেই আপনার এই ধর্ম্মের সংসারে এ দুর্দ্দিন কখনই স্থায়ী হবে না। আপনার তুল্য দয়াময়ী যে সংসারের লক্ষ্মী, সে সংসার অবশ্যই সর্ব্বসৌভাগ্যে সমুজ্জ্বল হবে।"

কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে বৌমা একটু বিস্ময় ভাব প্রকাশ কোল্লেন, মুখের ভাবেই সেই ভাবটি প্রকাশ পেলে, বাক্যদ্বারা কিছুই প্রকাশ হলো না। অনুমানে আমি বুঝলেম, ব্রজকিশোরীর ভাগ্যযুদ্ধের উদযোগপর্ব্বে হয় তো বাবু রমণীবল্লভ ভৌমিকের অপর পক্ষে সেনাপতিত্ব গ্রহণের উৎসাহ আছে, সেটা অধর্ম্ম, সেই কথাটা হয় তো সেই সময় বৌমার স্মরণ হলো, সেই স্মরণেই তাঁর বদনমণ্ডলে ঐরূপ বিস্ময়ভাব চিহ্নিত।

প্রসঙ্গ চাপা পোড়ে গেল। রেবতীকে গৃহান্তরে প্রেরণ কোরে বৌমা আমাদের দুজনকে দুটি একটি কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, ব্রজকিশোরীর মুখে একটিও তো উত্তর পেলেন না, অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে আমি তাঁর জটিল প্রশ্নের অস্পষ্ট উত্তর দান কোল্লেম। তার পর আহারের আয়োজন। আহারান্তে শয়নের ব্যবস্থা। স্বতন্ত্র গৃহে আমি একাকী স্বতন্ত্র আহার কোল্লেম, স্বতন্ত্র গৃহে স্বতন্ত্র শয্যায় আমি একাকী স্বতন্ত্র শয়ন কোল্লেম। ব্রজকিশোরীর সঙ্গে সে রাত্রে আর আমার সাক্ষাৎ হলো না। মনে মনে যা আমি জেনে রাখলেম, তাই আমার ইষ্টমন্ত্র হয়ে থাকলো।

কি ?—পাঠকমহাশয় জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, ইষ্টমন্ত্র হয়ে থাকলো কি ? দেশের প্রথানুসারে লোকেরা লোকের কাছে ইষ্টমন্ত্র প্রকাশ করে না, আমিও প্রকাশ কোরবো না। ঠারে ঠারে এইটুকু মাত্র প্রকাশ থাকুক, যে পদ্মফুলটির অনুসন্ধানে এই ভগ্ন বাড়ীতে আমি প্রবেশ কোরেছি, এখানে সেই পদ্মফুলের নাম ব্রজকিশোরী। কারা দিয়েছে এই নাম, তা আমি জানতে পাল্লেম না। লোকেরা দিয়েছে কিম্বা পদ্মফুলটি নিজেই ঐ নামে পরিচয় দিয়েছেন, সে কথা কাহাকে জিজ্ঞাসাও কোল্লেম না ; শুনে রাখলেম ব্রজকিশোরী। সে রাত্রে আমারে যদি কেহ আমার নাম জিজ্ঞাসা কোত্তেন, ঐ রকমে আমিও বোলতেম, আমার নাম সূর্য্যকিশোরী। পল্লীগ্রামে সকলেই প্রায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শয্যাত্যাগ করে, নিতান্ত শিশুকাল থেকে আমার চির-অভ্যাস ঊষাকালে গাত্রোত্থান করা। ঊষা-আগমনের অগ্রেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। বাড়ীর কেহই যখন জাগরণ করেন নাই, সেই সময় আমি আমার কাপড়ের পুঁটুলীটি কক্ষে লয়ে উপর থেকে নেমে এলেম। রেবতী উঠেছিল, নীচের প্রাঙ্গণে রেবতীর সঙ্গে দেখা হলো ; রেবতীকে বোল্লেম, "দেবতারা এ সংসারের মঙ্গল করুন, এই আশ্রমে নিরাপদে এক রাত্রি আমি আশ্রয় পেলেম, কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হব না ; এখন বিদায় হোলেম। ভাগ্যে যদি থাকে, পুনরায় আর একবার সাক্ষাৎ হবে, বৌমাকে এই কথাগুলি তুমি বোলে রেখো। সূর্য্যোদয়ের পর রাস্তায় আমি বাহির হব না, ঊষার আবরণ থাকতে থাকতেই অন্য আশ্রয়ে আমি চোলে যাব। চোল্লেম।"

খানিকক্ষণ থাকবার জন্য রেবতী আমারে বিস্তর অনুরোধ কোল্লে, সে

অনুরোধ আমি শুনলেম না, রাজবাড়ীকে নমস্কার কোরে রাস্তায় বেরুলেম। তখন ঘোমটা ছিল না, ঊষা আমারে ঢাকা দিয়ে নিয়ে চোল্লো। যে বাগানে নারীবেশ ধারণ কোরেছিলেম, সেই বাগানে গিয়ে বেশপরিবর্ত্তন কোল্লেম। আর তখন প্রচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজন হলো না, গন্তব্যপথে যাত্রা কোল্লেম। তখনও ঊষা পূর্ব্বদিকে অল্প অল্প আরক্তপ্রভা। মনে আমার নূতন উৎসাহ, নূতন আশা, নূতন আনন্দ।

চতুর্থ কল্প

চণ্ডেশ্বর

আমি চোলেছি ;—কি সন্ধান কোরে এলেম, লক্ষ্য বস্তু পেলেম কি না, ভাবতে ভাবতে চোলেছি। অমরকুমারীর নাম এখনো ব্রজকিশোরী। আমার মুখে অবগুণ্ঠন না থাকলে ব্রজকিশোরী আমারে চিনতেন ; অবগুণ্ঠন রেখে আমি এক প্রকার ভালই কোরেছিলেম ; আমার চেনাই দরকার ছিল, আমারে সেখানে চেনা অমরকুমারীর পক্ষে এখন ততটা দরকার ছিল না। যদি আমি প্রকাশ হোতেম, খোলা মুখে যদি অমরকুমারীর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা চোলতো, তা হোলে রাতারাতি অমরকুমারীকে আমি উদ্ধার কোরে আনতে পাত্তেম। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকবার অগ্রে সেইটি একবার আমি ভেবেছিলেম ; সে ভাবের উদয় হবামাত্রই পরিণামবিবেচনার নূতন উপদেশ আমি প্রাপ্ত হই ; সেই উপদেশেই সতর্কতা আসে, সেই সতর্কতায় অবগুণ্ঠনে মুখাবরণ।

"আমি হরিদাস, গুপ্তসন্ধানে তোমার তত্ত্ব অবগত হয়ে আমি তোমাকে উদ্ধার কোত্তে এসেছি," খোলা-মুখে দেখা দিয়ে, নির্জ্জনে অমরকুমারীকে এই কথা যদি আমি বোলতেম, অমরকুমারী অবশ্যই রাত্রিকালে গুপ্তভাবে আমার সঙ্গে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতেন, বাড়ীর কেহই কিছু জানতে পাত্তো না। সে উপায় আমি অবলম্বন কোল্লেম না কেন, তার একটি কারণ ছিল।

চোরেরা অমরকুমারীকে চুরি কোরেছে, দূরদেশে এনে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছে, কাহাকেও কিছু না জানিয়ে গোপনে আমি যদি অমরকুমারীকে বাহির কোরে আনতেম, চোরের উপর বাটপাড়ী করা হতো, সেটা নিশ্চয়, কিন্তু প্রকারান্তরে আমিই চোর হোতেম। চোরের মত কাজ আমি কোরবো না, বীরের মত পরাক্রম দেখাবো, এই আমার প্রতিজ্ঞা ; গুপ্ত-ভাবে চোরা জিনিস চুরি কোরে আনলে সে প্রতিজ্ঞারক্ষা হতো না, সেই কারণেই অমরকুমারীর কাছে আত্মপ্রকাশ করি নাই।

বাসায় এসে আমি পৌঁছিলেম। সূর্য তখন স্বর্ণবর্ণ পরিত্যাগ কোরে রজতবর্ণ ধারণ কোরেছেন, বেলা অনুমান আটটা। রাত্রে আমি কোথায় ছিলেম,

হরিহরবাবুর এই প্রশ্নে আমি উত্তর দিলেম, "কার্যগতিকে স্থানান্তরে আটক থাকতে হয়েছিল, ফলাফল একটু পরেই আপনি জানতে পারবেন।"

হরিহরবাবুর প্রশ্নে যখন আমি ঐ উত্তর দিই, মণিভূষণ তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন ; আমার মুখের ভাব দেখে মণিভূষণ কিরূপ অনুমান কোল্লেন, তখন আমি ঠিক বুঝতে পাল্লেম না, মণিভূষণ কিন্তু অধিকক্ষণ ধৈর্যধারণ কোত্তে না পেরে ইঙ্গিতে আমারে নিকটে ডাকলেন, আমি তাঁর কাছে সোরে গেলেম ; যে ঘরে মণিভূষণের রাত্রিযাপন হয়, আমার হাত ধোরে সেই ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সাগ্রহস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোথায় তুমি আটক পোড়েছিলে ? কারা তোমাকে আটক কোরেছিল ? একরাত্রি আটক রেখে অমনি অমনি ছেড়ে দিলে, তবে বোধ হয়, তারা তোমার শত্রুপক্ষের কেহ নয় ?"

মৃদুহাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "সকাল সকাল প্রস্তুত হও, কালবিলম্ব না কোরে ঢাকা যেতে হবে ; শত্রু-মিত্রের পরিচয় সেইখানেই পাবে।"

আমার হাতের উপর মণিভূষণের হাত, আমার চক্ষের দিকে মণিভূষণের চক্ষু, নির্নিমেষচক্ষে আমার চক্ষু নিরীক্ষণ কোরে, মণিভূষণ মুহূর্ত্তকাল নীরব হয়ে থাকলেন ; কি তিনি বুঝলেন, কি তিনি বোলবেন, তৎক্ষণাৎ সেটি আমি অনুমান কোত্তে অক্ষম হোলেম না। একটু পরেই মণিভূষণ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সন্ধান কিছু পেয়েছ কি ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "হাতের বস্তু যতক্ষণ হাতে না আসে, সন্ধান হয়েছে বোলে ততক্ষণ শ্লাঘা প্রকাশ করা উচিত হয় না। তুমি ঢাকায় চল, সন্ধানের ফলাফল—আশার ফলাফল—আমাদের পরিশ্রমের ফলাফল ঢাকা সহরেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে ;—ফলের পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে ;—ফলের পূর্ণতার নাম পরিপক্কতা ;—তুমি ঢাকায় চল ; বাঙ্গলায় একটা কথা আছে, "বেরাল কাঁধে কোরে শীকার করা."—আমারে কাঁধে কোরে শীকার করবার অনুমতিলাভের জন্য তুমি ঢাকায় চল। উভয়েই আমরা উভয়ের কথা বুঝলেম, সময়মত স্নানাহার সমাপন করা হলো, হরিহরবাবু কর্ম্মস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হোচ্ছেন, সেই সময় আমি সম্মুখে গিয়ে জানালেম, "অমরকুমারীর সন্ধান হয়েছে ; দুদিন একটু একটু উড়াভাষা সন্ধান, গত রজনীতে নিঃসংশয়। হরণকর্ত্তারা আপাততঃ অদৃশ্য, কিন্তু অমরকুমারীকে আমরা যখন হস্তগত কোত্তে পারবো, করালমূর্ত্তি ধারণ কোরে তারা তখন রঙ্গস্থলে দর্শন দিবে, ঘোরসংগ্রাম উপস্থিত করবার উপক্রম কোরবে, ভবিষ্যৎ জানতে পেরেও আমি ভয় পাচ্ছি না ; আমারে আক্রমণ করবার জন্য যারা করালমূর্ত্তি ধারণ কোরে আসবে, উত্তম অবসরে সেই ক্ষেত্রে আমিই তাদের করালতর করালমূর্ত্তির করাল হস্তে সমর্পণ কোরে দিব ; তাদের দেখে আমি ভয় পাব না, তারাই বরং আমারে দেখে প্রাণের ভয়ে কম্পিত হবে ; শীঘ্রই আপনি আমার এই সকল বাক্যের সার্থকতা অনুভব কোরবেন, অধিক বাক্যব্যয় এখন নিষ্প্রয়োজন। আমরা ঢাকায় যাব ; আমি আর মণিভূষণ। আপনি অনুগ্রহ কোরে দুটি লোক আমাদের

সঙ্গে দিন, অচেনা জায়গায় আমরা যেন ফাঁপরে না পড়ি। এখন আপনি কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, এই মাণিকগঞ্জের উত্তরপ্রান্তে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে অমরকুমারী আছে।"

হরিহরবাবুর বদন প্রফুল্ল, ধীরে ধীরে আমার পৃষ্ঠদেশে করার্পণ কোরে প্রফুল্লবদনে তিনি বোল্লেন, "বাহাদুর তুমি! এত অল্পবয়সে এতদূর কার্য-পটুতা তুমি অভ্যাস কোরেছ, আশ্চর্যের কথা বটে! ঈশ্বর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। দেখো, ঢাকায় যাচ্ছ, সাবধান;—সাবধানে সাবধানে সকল কাজ কোরো। ঠোকো না!"

নতমস্তকে আমি নমস্কার কোল্লেম। আমাদের ঢাকা-যাত্রার বন্দোবস্ত কোরে দিয়ে, শেষকালে হরিহরবাবু বোল্লেন, "ঢাকা-কোর্টের অনেকগুলি উকীলের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শিবশঙ্কর মল্লিক; তিনি বিদ্বান, বহুদর্শী, বিশেষরূপ আইনজ্ঞ; আমার নাম কোরে তাঁরে তুমি বোলো, মোকদ্দমার বিবরণ ভাল কোরে বুঝিয়ে দিও, শীঘ্র শীঘ্র সুচারুরূপে কার্য নির্ব্বাহ হবে।"

শিবশঙ্কর মল্লিকের নামটি আমি মুখস্থ কোরে রাখলেম। ইংরাজী আদালতের কাজ, পাঁচরকমে খরচপত্র অধিক হয়, শতাধিক মুদ্রা আমি সঙ্গে রাখলেম, হরিহরবাবুর একজন সরকার আর একজন চাপরাসী আমাদের সঙ্গে থাকলো; কি জানি, কখন কি রকম বাতাস ফেরে, ছদ্মবেশ সঙ্গে রাখতেও বিস্মৃত হোলেম না: চাপকানের পকেটে থাকলো দুটি গুলীভরা পিস্তল। হাসি পায়। অস্ত্রশিক্ষা হয়ে অবধি পিস্তল আমি সঙ্গে রাখি; নখিন্দরের পিতা চাঁদ সদাগর সর্ব্বক্ষণ যেমন হেঁতালের লাঠিকে আপন সঙ্গের সাথী কোরে রাখতেন, কোন প্রকার সঙ্কটস্থলে যাত্রা করবার সময় আমিও সেই রকমে জোড়া জোড়া পিস্তল সঙ্গে রাখি; কেবল রাখি, এই মাত্র, ব্যবহারে আসে না; তথাপি রাখি; আপদস্থলে নিরাপদের জন্য সাবধান থাকা ভাল।

হরিহরবাবু কর্ম্মস্থলে গেলেন, তাঁর চাপরাসী আমাদের জন্য একখানি নৌকা ঠিক কোরে দিলে, আবশ্যকমত জিনিসপত্র সঙ্গে লয়ে আমরা নৌকা-আরোহণ কোল্লেম; আমি, মণিভূষণ, সরকার আর চাপরাসী। শীঘ্র গমনের বন্দোবস্ত। নৌকায় আটজন দাঁড়ী, একজন মাঝি।

বুড়ীগঙ্গার উপরে ঢাকা সহর। পূর্ব্বে আমি আর কখনো ঢাকায় যাই নাই, ঢাকা আমি নূতন দেখলেম। বুড়ীগঙ্গার পূর্ব্বতীরে সহর, পশ্চিমতীরে প্রসিদ্ধ মিয়া সাহেবের সুন্দর অট্টালিকা, গঙ্গাবক্ষ থেকে সেই অট্টালিকার সুদৃশ্য সুপ্রশস্ত সোপানাবলী দৃষ্ট হয়। উত্তম শোভা। নগরের শোভা দর্শন করা আমার তখনকার কার্য ছিল না, নগরে উপস্থিত হয়েই অগ্রে আমরা আদালতে উপস্থিত হোলেম। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস ভঙ্গ হবার পূর্ব্বেই দরখাস্ত করা চাই, শিবশঙ্কর মল্লিকের অন্বেষণ কোল্লেম; ফৌজদারী কোর্টে তখন তিনি ছিলেন না, দেওয়ানী কোর্টেই সাক্ষাৎ কোল্লেম, মাণিকগঞ্জের হরিহরবাবুর নাম কোরে আমার বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে তাঁরে

বোল্লেম ; হরিহরবাবু বলেন নাই, আপন ইচ্ছায় আমি শিববাবুকে যোলটি টাকা ফী দিলেম, তিনি উদযোগী হয়ে তৎক্ষণাৎ দরখাস্তের মুসাবিদা কোরে দিলেন, এক টাকা তহরী নিয়ে তাঁর মুহুরি শীঘ্র শীঘ্র সেই দরখাস্তখানি পরিষ্কার কোরে নকল কোল্লেন, মণিভূষণ সেই দরখাস্তে আপন নাম দস্তখৎ কোরে দিলেন, উকীলের দ্বারা দরখাস্ত দাখিল হলো। বহরমপুরের আদালতের কথাও সেই দরখাস্তে লেখা ছিল, দরখাস্তের সঙ্গে বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রেরিত রুবকারিখানি পেস হলো, উকীলের সঙ্গে ইতিমধ্যে সেরেস্তাদার পেস্কারের গুপ্তবন্দোবস্ত হয়েছিল, তাঁদের সহায়তায় সেইদিনেই হাকিমের হুকুমমত পুলিশের নামে পরোয়ানা বাহির হয়ে গেল। এজলাস ভঙ্গ হয় হয়, এমন সময় শিবশঙ্করবাবুকে আমি চুপি চুপি বোল্লেম, "কেবল পুলিশের দ্বারা সে কার্য সুসিদ্ধ হওয়া সন্দেহস্থল, মেয়েটিকে উদ্ধার করবার সময় একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেইখানে উপস্থিত থাকলে ভাল হয়।" মুখে মুখে সেই কথাটি হাকিমকে জানিয়ে শিবশঙ্করবাবু সেরেস্তাদারের মুখের দিকে চাইলেন, হাকিমও সেই প্রার্থনা মঞ্জুর কোল্লেন, মণিভূষণের মূল দরখাস্তের পৃষ্ঠে সেইরকম হুকুম লেখা হলো, হাকিম সাহেব আসনত্যাগ কোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেই হুকুমের নীচে স্বাক্ষর কোরে দিলেন। আমার উদ্বেগ দূর হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হলো। রাত্রিকালে কোথায় থাকি ? নৌকায় বাস করা সুবিধাজনক বোধ হলো না ; বিশেষতঃ লোকের মুখে শুনলেম, বুড়ীগঙ্গার উত্তরাংশে ডাকাতের ভয় আছে, রাত্রিকালে তারা সময়ে সময়ে নৌকা মারে, নৌকায় বাস করা সুবিধাজনক বোধ হলো না, শিবশঙ্করবাবুর বাসাতেই রাত্রিবাস করা গেল।

পুলিশের দারোগা যাবেন, জমাদার যাবেন, বরকন্দাজ যাবে, সকলের উপর একজন ডেপুটিবাবু। একজন উকীল সঙ্গে থাকলে ভাল হয়, আমার মনে এই ভাবের উদয় হলো ; শিবশঙ্করবাবুকে সেই কথা আমি বোল্লেম ; যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা কোরে সহানুভূতিপ্রাপ্ত নিম্নশ্রেণীর একজন উকীলকে তিনি আমাদের সঙ্গে দিলেন, আমরা মাণিকগঞ্জে যাত্রা কোল্লেম।

যত সময়ে যাওয়া যায়, নৌকাতে দাঁড়ীর সংখ্যা অধিক থাকাতে তদপেক্ষা অল্পসময়ে আমরা মাণিকগঞ্জে পৌঁছিলেম। অসময়ে হরিহরবাবু তখন বাসায় ছিলেন না তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো না, কোর্টের ফলাফলের কথা বলাও হলো না, সুতরাং লক্ষ্যস্থলেই অগ্রে আমরা উপস্থিত হোলেম। যে বাগানে আমি ধনঞ্জয় ঘটকের সঙ্গে পরামর্শ কোরেছিলেম, সেই বাগানের আটচালাঘরে আমরা সকলেই খানিকক্ষণ বিশ্রাম কোল্লেম। বিশ্রামকালে ডেপুটিবাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "যে মেয়েটি এখানে আছে, যেটিকে উদ্ধার কোত্তে হবে, সেটি যে সেই মেয়ে, এমন সনাক্ত করবার লোক কেহ এখানে আছে ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "সনাক্ত করবার লোক এই দরখাস্তকারী মণিভূষণ

দত্ত, আর একজন সনাক্ত করবার লোক আমি স্বয়ং, আমরা এই দুজন ভিন্ন এখানকার আর কেহ সে বালিকাকে চিনবে না। যে বাড়ীতে আছে, সে বাড়ীর লোকেরা কেবল চেহারা চিনতে পারবে, আসল পরিচয় দিতে পারবে না। আপনি হাকিম, আপনার কাছে যদি কিছু বেয়াদবী হয়, অনুগ্রহ কোরে মাপ কোরবেন, সনাক্তের বদলে আমি একটি নূতন কথা বোলতে চাই। সেই বাড়ীতে আপনি চলুন ; আপনার কাছে সেই বালিকাকে যখন আনা হবে, আমি আর মণিভূষণ সেই সময় আপনার কাছে গিয়ে দাঁড়াব, আমরা বেশ জানি, বালিকার নাম অমরকুমারী ; এখানে যারা এনেছে, তারা নাম দিয়েছে ব্রজকিশোরী। নামের কথা এখন থাকুক, আপনার কাছে আমরা দুজনে দাঁড়াব ; অমরকুমারীই হোক অথবা ব্রজকিশোরীই হোক, সেই বালিকা যদি আমাদের দুজনকে চিনতে পারে, তা হোলে আপনার হৃদ-প্রত্যয় জন্মিবে কি না ?"

বিকশিতনেত্রে আমার মুখপানে চেয়ে ডেপুটিবাবু একটু হাস্য কোল্লেন। দারোগামহাশয় মুখ ভারী কোরে আমার দিকে চেয়ে থাকলেন। মণিভূষণকে কোন কথা আমি শিখিয়ে না দিই, সেইরূপ ভাব জানিয়ে দারোগা আমারে তাঁর নিজের কাছে ডাকলেন, তাঁর কাছে আমি গেলেম, মণিভূষণ ডেপুটিবাবুর নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। দারোগা আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে মেয়েটি চুরি গিয়েছে কতদিন ? তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ? মণিভূষণের সঙ্গে কি সম্পর্ক ? সে মেয়ে এই গ্রামে আছে, কেমন কোরে তুমি জানতে পেরেছ ? কত দিন হলো, এই গ্রামে তুমি এসেছো ? মেয়েটির বয়স কত ? তোমার সঙ্গে জানা-শুনা কত দিন ?"

এই প্রকারের অসংখ্য প্রশ্ন। সকল প্রশ্নই নিরর্থক। ভাব আমি কিছু বুঝতে পাল্লেম না। পুলিশের লোকেরা এক এক সময়ে ফরিয়াদীকে, আসামীকে, সাক্ষীগণকে এই রকম অনর্থক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করেন, আসলকথায় কাহারো কাহারো ভুল হয়ে যায়, কেহ কেহ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, গল্প-প্রসঙ্গে অনেক ভাল ভাল লোকের মুখে এই রকম আমি শুনেছি। দারোগার প্রশ্নাবলীর উত্তরে ডেপুটিবাবুর অলক্ষিতে—অগোচরে চুপি চুপি আমি বোল্লেম, "রসনাকে বিরাম দিতে আপনি কি ইচ্ছা করেন না ? ও সকল প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক হোলে হুকুমের অগ্রে ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্যই আমারে জিজ্ঞাসা কোত্তেন, আমারে না করুন, দরখাস্তকারী এই মণিভূষণ, এই মণিভূষণকেও তিনি এই সব কথা জিজ্ঞাসা কোত্তেন। আবশ্যক ছিল না, আবশ্যক নাই, এই কারণেই আদালতে ও সকল কথা উত্থাপিত হয় নাই। কেন আপনি মাথা বকান ? কেন আপনি মুখ ব্যথা করান ? আপনার পূজার উপকরণ আমার কাছেই আছে, ষোড়শোপচারে না পারি, পঞ্চোপচারে পূজা দিব।"

দারোগা তখন হাস্য কোল্লেন। বন্দোবস্ত সব ঠিক। প্রাতঃকালে এসে মাণিকগঞ্জে আমরা পেঁছিলেম, সেই উদ্যানেই আহারাদি করা হলো, বিশ্রামের পর আমরা সকলে একত্র হয়ে বাবু রমণীবল্লভের বাড়ীর নিকটে গিয়ে উপ-

স্থিত হোলেম। পুলিশের লোকের পুলিশের সাজপরা, পুলিশ দেখলেই ভদ্রলোকের ভয় হয় ; বিশেষতঃ গ্রাম্যলোকেরা অধিক ভয় পায়। নিকটে নিকটে যাদের বাড়ী, তারা সব ভয়ের কথা বলাবলি কোত্তে কোত্তে আপনাদের বাড়ীর দরজা বন্ধ কোরে দিলে ; রাস্তা দিয়ে যারা চোলে যাচ্ছিল তারাও মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে হন হন কোরে অন্যদিকে চোলে যেত লাগলো : "কোথায় কার বাড়ীতে চুরি হয়েছে, কোথায় ডাকাতী হয়েছে, কোথায় বুঝি দাঙ্গা হয়েছে, কে কারে বুঝি খুন কোরেছে, কার কি সর্ব্বনাশ হয় দেখ, গাঁয়ের ভিতর পুলিশ প্রবেশ কোরেছে!" পথে পথে যারা ছিল, তাদের সকলের মুখেই এই রকম কথা ; মনে মনে আপনাদের যেন কোন বিপদ গণনা কোরে সকলেই সেই দিক থেকে সোরে গেল ; রমণী-বল্লভের বাড়ীর মধ্যে আমরা প্রবেশ কোল্লেম।

বাড়ীর ভগ্নদশা, একাংশমাত্র সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে, সেই অংশই সদর ছিল। এখন সেই সদরমহলকেই দুই অংশে ভাগ কোরে সদর মফঃস্বল চিহ্নিত করা হয়েছে। পুজার দালানের খাটালে খাটালে জানালা-দরজা বোসিয়ে মধ্যে মধ্যে প্রাচীর দেওয়া ; এখন আর দালান বোলে চেনা যায় না, ঘরগুলি এখন বৈঠকখানা। প্রাঙ্গণের দুইধারে পূর্ব্বে বৈঠকখানা ছিল, সে সব এখন নাই, সমভূমি : সেই সকল ভূমিতে ছোট ছোট ফুলের গাছ, বেগুনগাছ, লাউগাছ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। দালানের পশ্চিম অংশে ছোট রকম অন্দর-মহল। বৈঠকখানার মধ্যদরজাটি খোলা ছিল, সদর-বাড়িতে লোকজন কেহ ছিল না, আমরা সেই বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ কোরে দেখলেম, বাবুলোকের বৈঠক-খানার উপযুক্ত আসবাবপত্র কিছুই ছিল না, সেকেলে ধরনের পুরাতন এক-খানা কেদারা আর দু-ধারে বড় বড় দু-খানা বেঞ্চ পাতা ; মেজেতে বহু পুরা-তন একখানা সপ মোড়া, সেই সপের উপর দুটি পিতলের বৈঠকে দুটি কলী হুঁকা : বৈঠকের নিকটে ছোট ছোট খোপ কাটা কাটা একটা মাটির বাক্স ; খোপে খোপে চকমকীর পাথর ইস্পাত, আধপোড়া সোলা, কয়লা, এক জোড়া কলিকা আর তামাকপোড়া ছাই। এই পর্য্যন্ত বৈঠকখানার আসবাব। কেদারা-খানিতে ডেপুটিবাবুর আসন দিয়ে আমরা সেই দুইখানি বেঞ্চে সারি সারি উপবেশন কোল্লেম, পুলিশের বরকন্দাজেরা আর হরিহরবাবুর চাপরাসিটি বাহিরের বারান্দায় হাজির থাকলো।

আমি জানতেম, বাবু রমণীবল্লভ বাড়ীতে ছিলেন না ; কাহাকে সংবাদ দেওয়া যায়, কি রকমেই বা কার্য্য হয়, পুলিশের সম্মুখে কেই বা মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ায়, এই সব আমি ভাবছি, এমন সময় ভিতরমহল থেকে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলো। দেখেই আমি চিনলেম, সেই রেবতী। ঢাকায় যাওয়াতে আদা-লতের কাজকর্ম্মে তিন চারদিন আমার বিলম্ব হয়েছিল, ইতিমধ্যে হয় তো রমণীবল্লভবাবু ফিরে এসে থাকবেন, এইরূপ অনুমান কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে রেবতীকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা কোরবো মনে কোচ্ছি, সময় হলো না। দালানের উপর পুলিশের লোক দেখেই রেবতী আঁৎকে উঠলো, "ও

মা! এরা সব কে গো! এখানে এ সব থানা-পুলিশ কেন গো!" আতঙ্কে এই সব কথা বোলতে বোলতে রেবতী বাড়ীর ভিতর ছুটে পালালো।

"ভয় নাই রেবতী, ভয় নাই, পালিয়ো না, শুনে যাও, বড়বাবু বাড়ী এসেছেন কি না, সেই কথা আমরা জানতে এসেছি।"—অভয়বাক্যে নরম সুরে বার বার আমি এই সব কথা বোলে পাছু ডাকতে লাগলেম, রেবতী সাড়া দিলে না।

নাম ধোরে আমি ডেকেছি, তবে হয় তো আমি চেনা, যথার্থ চেনা কি না, সেইটি জানবার অভিপ্রায়ে রেবতী একবার ভিতরদিকে অঙ্গ লুকিয়ে দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে আমারে দেখলে, চিনতে পাল্লে না, তখনি আবার মুখখানি লুকিয়ে নিলে। রেবতী তখন পালায় নাই, দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল; উঁকি মেরে যখন মুখ লুকালে, সে সময় আবার আমি নাম ধোরে ডেকে উদ্দেশে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বাবুরা কেহ বাড়ী আছেন কি?"

উত্তর পেলেম না। একটু পরে ছোট ছোট দুটি বাবু আদুড়-গায়ে বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেন। দিব্য চেহারা, একটির বয়স অনুমান ষোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয়টি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশবর্ষীয়। দেখেই আমি বুঝতে পাল্লেম, কারা তাঁরা। সত্যই যেন কতদিনের চেনা, সেই ভাবে বড়টিকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার দাদাবাবু কি বাড়ী এসেছেন?"

যেন একটু চোমকে উঠে বাবুটি উত্তর কোল্লেন, "এসেছেন। শেষরাত্রে এসেছেন, একটু অসুখ আছে, আহার করেন নাই, ঘুমুচ্ছেন।"

রেবতীর উদ্দেশেও আমার কথা, এই বাবুটির সঙ্গেও আমার কথা; হাকিম অথবা দারোগা ততক্ষণ পর্যন্ত একটিও কথা কোইলেন না। বাবুটিকে সম্বোধন কোরে আমি আবার বোল্লেম, "বেলা এখন শেষ হয়ে এসেছে, অসুখ-শরীরে এতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়, সংবাদ দাও।" এই পর্যন্ত বোলে, ডেপুটিবাবুর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ কোরে সেই বাবুটিকে পুনর্ব্বার আমি বোল্লেম, "বড়বাবুকে গিয়ে বল, এই ডেপুটিবাবু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন, ঢাকা সদর-ষ্টেসনের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ইনি, বিশেষ প্রয়োজন আছে, সাক্ষাৎ করা নিতান্ত আবশ্যক, সংবাদ দাও।"

ডেপুটিবাবুর দিকে চাইতে চাইতে বাবুটি বাড়ীর ভিতর চোলে গেলেন, ছোটবাবুটি আমাদের কাছে থাকলেন; আমার কাছেই এসে বোসলেন। মুখপানে চেয়ে চেয়ে আমার মনে একটি নূতন বুদ্ধি যোগালো। ছোট ছোট ছেলেরা মিথ্যাকথা জানে না, মিথ্যাকথা বলে না: এই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা কোল্লে অনেক দূর সত্যকথা বাহির হোতে পারে। পারে বটে, কিন্তু আমি কে? উপস্থিত ব্যাপারে উপরপড়া হয়ে আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অধিকারবহির্ভূত। ডেপুটিবাবুর মুখের দিকে আমি চাইলেম, ডেপুটিবাবু আমার মনের ভাব বুঝলেন, চেয়ারখানি আমাদের দিকে একটু সোরিয়ে এনে বালকটিকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ব্রজকিশোরী নামে একটি মেয়ে তোমাদের বাড়ীতে আছে?"

বালক।—আছে।

ডেপুটি।—কোথা থেকে এসেছে?

বালক।—তিনজন লোক আমার দাদার কাছে তাঁরে রেখে গিয়েছে। বিয়ে হবে।

ডেপুটি।—মেয়েটি এখানে কি করে?

বালক।—কাঁদে।

ডেপুটি।—কার সঙ্গে বিয়ে হবে?

বালক।—(প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া) ঐ দাদা আসছেন।

দুই হস্তে নয়নমার্জ্জন কোত্তে কোত্তে বালকের দাদাটি সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। পূর্ব্বে আমার দেখা ছিল না, তথাপি স্থির বুঝলেম, তিনিই বাবু রমণীবল্লভ। ঘরে প্রবেশ কোরেই চঞ্চলনেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত কোত্তে কোত্তে বিরক্তবদনে বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনারা কে? আপনারা এখানে কেন এসেছেন? বাহিরে পুলিশের লোক খাড়া আছে, ওরাই বা এখানে কেন?"

ও সকল প্রশ্নে আমার উত্তর করা ভাল হয় না, আমি চুপ কোরে থাক্‌লেম; ডেপুটিবাবু স্বয়ং উত্তর দিলেন, "আপনি বসুন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে আমরা এখানে এসেছি, পুলিশও এসেছে। আপনাকে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা করা আমাদের দরকার। আপনি বসুন।"

বেঞ্চে আমরা বোসে ছিলেম, একটু সোরে সোরে স্থান দিলেম, বড়বাবু বোসলেন। অতঃপর প্রশ্নোত্তর।

ডেপুটি।—ব্রজকিশোরী নামে একটি বালিকা আপনার বাড়ীতে আছে, যারা সেটিকে এখানে এনে রেখে গিয়েছে, তাদের আপনি জানেন কি না?

রমণীবাবু।—আমার উপর এরূপ প্রশ্ন করবার আপনার কি অধিকার?

ডেপুটি।—অধিকারের কথা পূর্ব্বেই আপনাকে বলা হয়েছে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার মুখে ঐ প্রশ্নের উত্তর চান। আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতিনিধি; আমার কাছেই উত্তর দিতে আপনি বাধ্য। বলুন, তাদের আপনি জানেন কি না?

রমণীবাবু।—পূর্ব্বের জানা-শুনা ছিল না, হঠাৎ একদিন একটি মেয়ে সঙ্গে কোরে তিনটি ভদ্রলোক এখানে আসেন। সেই তিনজনের মধ্যে একজন সেই মেয়েটির পিতা। তিনি গরিব, এই গ্রামে একজন ধনবান পাত্রে মেয়েটি তিনি সম্প্রদান কোরবেন।

ডেপুটি।—আপনি যে তিনজনকে ভদ্রলোক বোলছেন, হুজুরে দরখাস্ত হয়েছে, সেই তিনজন লোক একটা ভয়ানক কুচক্রের দলভুক্ত চোর, জুয়াচোর, বিখ্যাত বদমাস। মেয়েটিকে তারা মুর্শিদাবাদ থেকে চুরি কোরে এনেছে। মেয়েটির নাম ব্রজকিশোরী নয়, সত্যনাম অপ্রকাশ আছে। মেয়েটিকে আপনি আমার কাছে একবার আনয়ন করুন, সত্যতত্ত্ব আমার অবগত হওয়া অগ্রে আবশ্যক।

রমণী।—তা আমি পারি না। পিতা যারে বিশ্বাস কোরে আমার কাছে গোছিয়ে রেখে গিয়েছেন, তারে আমি পুলিশের কাছে হাজির কোত্তে অসম্মত; তাতে আমার লজ্জা আছে; তেমন কার্য্যে বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিপন্ন হোতে পারে।

ডেপুটি।—হাঁ, তা হোতে পারে বটে, বিশ্বাসঘাতক হওয়া ভদ্রলোকের উচিত নয়। আচ্ছা, সেই তিনজন লোককে আপনি হাজির করুন।

রমণী।—যতদিন পরে তাঁদের আসবার কথা, ততদিন পরে যদি আবশ্যক হয়, তবে আমি তাঁদের হাজির কোত্তে পারবো; এখন পারি না।

ডেপুটি।—উত্তম। ততদিনের মধ্যে পুলিশ যদি পারে, হাজির করবার চেষ্টা পাবে; এখন আপনি সেই মেয়েটিকে আমার কাছে হাজির করুন। অবিবাহিতা কুমারী, বয়স অল্প; তথাপি হিন্দু পরিবারের ব্যবহার অনুসারে পরদানসীন মহিলাগণের রীত্যনুসারে সেই মেয়েটির মুখের কথাগুলি আমি শ্রবণ কোরবো।

রমণী।—তা আপনি পারেন না। আমার কাছে ইজ্জত রেখে যিনি নিশ্চিন্ত হয়ে কেহরে গিয়েছেন, তাঁর কন্যাকে আপনার কাছে উপস্থিত কোরে আমি তাঁর ইজ্জতের কেউ কোত্তে পারবো না।

ডেপুটি।—উত্তম। আপনার নিজ পরিবারের রমণীগণকে আপনি অন্য গৃহে সোরে থাকতে বলুন, আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ কোরে সেই কুমারীর এজাহার গ্রহণ কোরবো।

রমণী।—আমি খুন করি নাই, ডাকাতী করি নাই, আমার নামে কোন নালিশ নাই, আপনি আমার বাটীতে খানা-তল্লাসী কোত্তে চান, এটা আইনের মর্ম্ম নয়।

ডেপুটি।—আপনি একটু সাবধান হয়ে কথা কবেন। মেয়ে-চুরি মামলা, আপনি সেই মামলার আসামীগণের বানিকার, খুনী-ডাকাতী মামলার তাদারকে আইন যেরূপ উপদেশ দেয়, এ মামলাতেও আইনের সেইরূপ উপদেশ। আমি বে-আইনী কার্য কোত্তে এসেছি কিম্বা বে-আইনী কার্য কোত্তে উদ্যত হোচ্ছি, এমন কথা যদি পুনরায় আপনি বলেন, তা হোলে—

রমণী।—তা হোলে আপনি কি কোরবেন?

ডেপুটি।—কুইন ভিকটোরিয়ার নামে আমি আপনাকে পুলিশের হেপাজাতে সমর্পণ কোরবো।

রমণী।—করুন, আমি প্রস্তুত আছি।

ডেপুটি।—অধিকক্ষণের কার্য নয়। মনে করুন, তাই আপনি আছেন। এখনো আমি ভালকথায় বোলছি, মেয়েটিকে আপনি এইখানে হাজির করুন।

দালানের মাঝে মাঝে প্রাচীর দিয়ে ঘর করা হয়েছিল, পশ্চাদ্দিকে খড়খড়ি ছিল, সেই খড়খড়ির পশ্চাতে অন্দরের দিকে দর-দালান; ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখে ঐরূপ বাক্য উচ্চারিত হবামাত্র সেই দর-দালানে কতকগুলি স্ত্রীলোকের বসনের খসখস শব্দ আর বদনে ভয়গুঞ্জনসূচক অস্ফুট শব্দ শ্রুতিগোচর হলো।

সেই দিকে চেয়ে ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "মা সকল! আপনারা ভয় পাবেন না, ভয় দেখাবার মত কোন কার্য আমি কোরবো না ; ভদ্রলোকের পরিবারের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার কোত্তে হয়, আমিও ভদ্রসন্তান, তা আমি ভাল জানি। আমি আইনের চাকর, আইন কাহারও মান-মর্যাদা নষ্ট করে না। ব্রজ-কিশোরী নামে যে মেয়েটি এই বাড়িতে আছে, সেটির সত্যনাম ব্রজকিশোরী কি না, কোন পরিচিত লোককে ব্রজকিশোরী এখানে চিনতে পারেন কি না, সেইটি আমি জানবো ; মেয়েটিকে একবার আমি দেখবো।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রমণীবল্লভ বোলে উঠলেন, "এ আপনার বেজায় জুলুম। ভদ্রলোকের কন্যা ভদ্রলোকের বাড়িতে রয়েছে, তার আবার সত্যনাম মিথ্যানাম আছে, এ সব কথা আপনি কি বলেন?"

ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "সত্যমিথ্যা নাম নিশ্চয়ই আছে। শুধু তাই নয় ; মেয়েটি কি জাতি, তাও আপনি জানেন না ; অথচ একজন সুবর্ণ-বণিকের সঙ্গে সেই মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির কোরেছেন, মধ্যস্থ হয়ে মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছেন, দু-হাজার টাকায় বিক্রয় করবার বন্দোবস্ত হয়েছে, এ সব কথা কি আপনি অস্বীকার কোত্তে পারেন?"

বাবু রমণীবল্লভের আরক্তবদন অকস্মাৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এলো, আমতা আমতা কোরে কি যেন বোলবেন, চেষ্টা পেলেন, স্পষ্টকথা ফুটলো না। কাছেই তিনি বোসে ছিলেন, আমি বেশ দেখলেম, তিনি যেন একটু একটু কাঁপতে লাগলেন। সেই সময় দারোগাকে সম্বোধন কোরে ডেপুটিবাবু হুকুম দিলেন, "এই গ্রামে ধনঞ্জয় ঘটক, আর বংশী পোদ্দার নামে দুটি লোক আছে, আপনার বরকন্দাজদের বলুন, অবিলম্বে সেই দুইজনকে এখানে হাজির করে।"

রমণীবল্লভের কাঁপুনি বাড়লো। মাথা হেঁট কোরে তখন তিনি কম্পিত-স্বরে বোল্লেন, "অত ফ্যাঁসাদে কাজ নাই, তাদের তলব দিবার দরকার নাই, ব্রজকিশোরীকে আপনি দেখতে চাচ্ছেন, ব্রজকিশোরীকে আমি আনিয়ে দিচ্ছি, ব্রজকিশোরীকে দেখুন, যে যে কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে ইচ্ছা হয়, করুন, ঘটককে, পোদ্দারকে তলব দিবার দরকার নাই।"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাস্য কোরে ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "তিনটিই আমার দরকার ;—ব্রজকিশোরীকেও দরকার, ধনঞ্জয়কেও দরকার, বংশীকেও দরকার। ব্রজকিশোরীকে যারা এখানে রেখে গিয়েছে, তারা চোর ; যারা যারা চোরের সহায়তা করে,—জ্ঞানেই হোক, অজ্ঞানেই হোক, যারা যারা চোরের সহায়তা করে, বিচারস্থলে তাদের সকলকেই আকর্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

রমণীবল্লভের মুখে আর বাক্য থাকিল না ; আসন থেকে উঠে ম্লানবদনে তিনি একবার অন্দরের দিকে গেলেন : দারোগার আদেশে দুইজন বরকন্দাজ পূর্ব্বকথিত দুইব্যক্তির অন্বেষণে গেল। যে বেঞ্চখানিতে আমরা বোসে ছিলেম, তারই ঠিক পশ্চাতে এক সুদীর্ঘ বাতায়ন ; সম্মুখদিকে খড়খড়ির পাখি বন্ধ,

ভিতরদিকে অর্গল বন্ধ ছিল ; আমি জানতে পাল্লেম, ভিতরদিক থেকে ধীরে ধীরে সেই অর্গল উদঘাটিত হলো। দ্বার উন্মুক্ত। যখন বন্ধ থাকে, তখন দেখায় যেন গবাক্ষ ; বাস্তবিক সেটা খড়খড়িযুক্ত দরজা ; সদরে অন্দরে গতি-বিধির একটা দ্বিতীয় দ্বার। ভিতরদিকে দর-দালান ; সেই দর-দালানে স্ত্রী-লোকেরা ছিলেন. দ্বার উন্মুক্ত হবামাত্র তাঁরা সকলেই দুইধারে সোরে সোরে দাঁড়ালেন, চৌকাঠের উপর রমণীবল্লভ। তাঁর পশ্চাতে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনবতী একটি বালিকা ; সকলে বুঝতে না পারুক, আমি বুঝলেম, কে সেই বালিকা। বালিকার দর্শন কোরেই আমার নয়নযুগল উৎফুল্ল।

বাবু রমণীবল্লভ আমাদের দিকে সোরে এলেন, স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেখতে না পান, সেই রকমে আমরাও একটু সোরে সোরে বোসলেম ; খড়খড়ির কপাটে হস্তার্পণ কোরে বালিকাটি সেই চৌকাঠের ধারে নতমুখী হয়ে দাঁড়ালেন।

ডেপুটিবাবু সেই সময় আপনার চেয়ারখানি সেই খড়খড়ির দিকে সোরিয়ে নিয়ে, স্থিরনয়নে একবার বালিকাটির আপাদমস্তকে নিরীক্ষণ কোল্লেন ; কুমারীকন্যা, অবগুণ্ঠনবসনে পূর্ণ বদনমণ্ডল আবৃত ছিল না, মুখখানিও তিনি দেখলেন ; আমরা একটু তফাতে তফাতে গা-ঢাকা ছিলেম, কুমারী আমাদের দেখতে পেলেন না। সুধীর বিনম্রবচনে কুমারীকে সম্বোধন কোরে ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "মা ! আমি এখানকার মেজেষ্টার, তোমার কোন ভয় নাই, যে যে কথা আমি তোমারে জিজ্ঞাসা কোরবো, কাহারো উপরোধ অনুরোধ মনে না কোরে নির্ভয়ে তুমি সেই কথাগুলির উত্তর দিও।"

কুমারীকে আমরা তখন দেখতে পাচ্ছিলেম না, ডেপুটিবাবুর কথায় কুমারী কি প্রকার সংকেত জানালেন, তাও আমরা দেখতে পেলেম না, একটি কথাও শুনতে পেলেম না, ডেপুটিবাবু প্রশ্ন আরম্ভ কোল্লেন।

প্রথম প্রশ্ন।—তোমার নাম কি ?

কুমারী।—(ধীরস্বরে) অমরকুমারী।

ডেপুটি।—তোমার আর কোন নাম আছে ?

কুমারী।—না।

ডেপুটি।—এখানে ব্রজকিশোরী নামে আর কোন বালিকা আছে ?

কুমারী।—এই বাড়ীর লোকেরা আমারেই ব্রজকিশোরী বলেন।

ডেপুটি।—কেন বলেন ?

কুমারী।—যারা আমারে এখানে এনে এই বাবুর বাড়ীতে রেখে গিয়েছে, তারা আমার সত্যনামটি গোপন কোরে ঐ নামে পরিচয় দিয়েছে।

ডেপুটি।—কারা তোমাকে এখানে এনেছে ?

কুমারী।—তাদের সকলকে আমি চিনি না। একজনকে চিনি, সে লোকটিও তার নিজের নাম প্রকাশ করে নাই।

ডেপুটি।—তুমি তার আসল নাম জান ?

কুমারী।—জানি।

ডেপুটি।—কি?

কুমারী।—জটাধর।

ডেপুটি।—সেই জটাধর এখানে কি নামে পরিচয় দিয়েছে?

কুমারী।—চণ্ডেশ্বর।

ডেপুটি।—চণ্ডেশ্বরের সঙ্গে আর কে কে ছিল?

কুমারী।—চিনি না।

ডেপুটি।—হাঁ তা তো শুনেছি, কিন্তু তারা কজন? তাদের নাম তুমি জানতে পেরেছ?

কুমারী।—চণ্ডেশ্বর ছাড়া আর দু-জন; একজনের নাম গণেশ্বর, আর একজনের নাম মিয়াজান।

ডেপুটি।—তাদের সঙ্গে তুমি এখানে কেন এসেছিলে?

কুমারী।—চোখ-মুখ বেঁধে তারা আমারে চুরি কোরে এনেছে।

ডেপুটি।—কোথা থেকে এনেছে?

কুমারী।—মুর্শিদাবাদ থেকে।

ডেপুটি।—যাদের নাম তুমি বোল্লে, তারাই তোমারে চুরি কোরেছে? সে কথা তুমি ঠিক বোলতে পার?

কুমারী।—না, তারা চুরি করে নাই, চোরেরা এক জায়গায় এনে জটাধরের হাতে—যে লোক এখন চণ্ডেশ্বর সেজেছে, সেই জটাধরের হাতে ধোরে দেয়। গণেশ্বর আর মিয়াজান সেইখানে এসে জোটে।

ডেপুটি।—যারা চুরি কোরেছিল, তাদের নাম তুমি জানতে পেরেছিলে?

কুমারী।—চোরের নাম কেমন কোরে জানবো?

ডেপুটি।—এ বাড়ীর বাবুকে তুমি আর কখন দেখেছিলে?

কুমারী।—না।

ডেপুটি।—এ বাড়ীতে এখন তুমি থাকতে ইচ্ছা কর?

কুমারী।—না থেকে আর কোথায় যাবো? আমার কেহ নাই।

ডেপুটি।—তবে যে শুনছি, তোমার পিতা তোমার এই বাবুর কাছে গোছিয়ে রেখে গিয়েছেন।

কুমারী।—মিথ্যাকথা। আমার জন্মের পর অবধি পিতা আমার নিরুদ্দেশ। মা ছিলেন, সম্প্রতি তিনিও স্বর্গে গিয়েছেন। যে লোক আমারে তাঁর মেয়ে বোলে পরিচয় দেয়, সে আমাদের কেহই নয়।

এইখানে রমণীবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত কোরে ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "কেমন বাবুজী! মেয়েটির কথাগুলি শুনলেন? চোরে চুরি কোরে এনেছে, একটা দুষ্টলোক এই মেয়ের পিতা বোলে পরিচয় দিচ্ছে, সেই লোকের কথায় বিশ্বাস কোরে এই বালিকাকে আপনি আপন বাড়ীতে আটক রেখেছেন, আইনের ক্ষমতায় আমরা এই অপহৃতা বালিকাকে উদ্ধার কোত্তে চাই, আপনি আমল দিতে চান না। আইনের চক্ষে আপনিও অপরাধী হোতে পারেন।"

রমণীবাবুর মুখে বাক্য নাই। আমার দিকে আর মণিভূষণের দিকে নেত্র-সঙ্কেত কোরে ডেপুটিবাবু আমাদের উভয়কেই নিকটে আহ্বান কোল্লেন ; সওয়াল-জবাব শ্রবণের নবীন উৎসাহে আমার হৃদয় তখন পূর্ণ হোচ্ছিল, পূর্ণ উৎসাহে তৎক্ষণাৎ আমরা তাঁহার নিকটবর্তী হোলেম। আমাদের ঠিক সম্মুখে অমরকুমারী।

আমাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ কোরে, সস্নেহ সম্বোধনে ডেপুটিবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "দেখ দেখি অমরকুমারি, দেখ দেখি মা, ভাল কোরে চেয়ে দেখ দেখি, এই দুটি বাবুকে তুমি চিনতে পার কি না ?"

অমরকুমারীর সজল পদ্মনেত্র আমাদের উভয়ের মুখের দিকে উত্তোলিত, নেত্রপুট সজল উজ্জ্বল। এক একবার এমন হয়, আকাশে মেঘ থাকে না, অথচ অকস্মাৎ বৃষ্টি আসে। অমরকুমারীর চক্ষে আমি সেই ভাব দর্শন কোল্লেম। সজল পদ্মনেত্র ; লাবণ্য-হিল্লোলে স্বভাবতঃ সর্ব্বক্ষণ ঢল ঢল করে; আমাদের প্রতি সেই নেত্র নিক্ষিপ্ত হবামাত্রই দর দরধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো, সমদৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মৃদুগুঞ্জনে অশ্রুমুখী কুমারী তিনবার উচ্চারণ কোল্লেন, "হরিদাস ! মণিভূষণ ! দাদা !"

ক্ষণেকের জন্য হাকিমিত্ব বিস্মৃত হয়ে বন্ধুত্বের অমৃতস্বরে ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "কেঁদো না মা, কেঁদো না ! অবস্থা আমি সমস্তই বুঝলেম। এই দুটি বালক তোমার আত্মীয়, এই দুটি বালক তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত বিস্তর আয়াস, বিস্তর কষ্ট, বিস্তর অর্থব্যয় স্বীকার কোচ্ছেন, তোমারে উদ্ধার কোরে এই দুই বালকের হস্তেই সমর্পণ করা হবে, তুমি কেঁদো না।"

অমরকুমারীর চক্ষে জল দেখে আমার চক্ষুও শুষ্ক থাকলো না, কুমারীর অলক্ষিতে আমিও ঘন ঘন আমার সিক্তনেত্র মার্জ্জন কোত্তে লাগলেম ; বিনা প্রশ্নে ডেপুটিবাবুর দিকে চেয়ে অমরকুমারী বোলতে লাগলেন "চণ্ডেশ্বর পাষণ্ড, তার অসাধ্য দুষ্কর্ম্ম নাই। এই হরিদাস আমার পরম বন্ধু ; এই মণিভূষণ আমার দাদা হন, মণিভূষণের পিতা শান্তিরাম দত্ত আমার পিতৃতুল্য, রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা ; তাঁর আশ্রয় থেকেই চোরেরা আমাকে চুরি কোরেছে ! সেইখানেই আমি ফিরে যাবো ! আপনি দয়া করুন, হরিদাসের সঙ্গে—মণিভূষণের সঙ্গে মুর্শিদাবাদেই আমি ফিরে যাবো।"

হাকিমের সঙ্গে অমরকুমারীর কথা হোচ্ছিল, সে সময় আমার কথা কওয়া উচিত বিবেচনা করি নাই, কিন্তু কুমারীর কাতরতা দেখে আমি আর চুপ কোরে থাকতে পাল্লেম না, হাকিমের অনুমতি নিয়ে আশ্বাসবচনে বোল্লেম, "কেঁদো না, অমরকুমারি ! সেই জন্যই আমরা এসেছি ; কত ঠাঁই ঘুরে ঘুরে, অজ্ঞাত-লোকমুখে বার্ত্তা পেয়ে এ অঞ্চলে আমরা এসেছি, বহরমপুরে মোকদ্দমা হোচ্ছে, তোমারে যারা চুরি কোরেছিল, তাদের মধ্যে দুজন চোর সেইখানে ধরা পোড়েছে, হাজতে আছে, সর্দ্দার আসামীটা ধরা পোড়লেই চূড়ান্ত বিচার হবে। এই ডেপুটিবাবুর অনুগ্রহে তোমারে আমরা উদ্ধার কোরে নিয়ে

যাব। সর্দ্দার আসামীটা কে জান? এখানকার চণ্ডেশ্বর, ওরফে জটাধর, ওরফে রক্তদন্ত। সেই লোকটা নিরুদ্দেশ। আমি সেই—"

কথা আমার শেষ হলো না। থানার বরকন্দাজেরা দৌত্যকার্য সমাধা কোরে ফিরে এলো, সঙ্গে এলো ধনঞ্জয় ঘটক আর বংশীধর পোদ্দার। ডেপুটিবাবু সেই দুজনকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেন, সেই সকল প্রশ্নে যে প্রকার উত্তর পেলেন, তাতে কোরে আমার উক্তিগুলিই সপ্রমাণ হলো। রমণীবাবুর সহধর্ম্মিণীর সততা স্মরণ কোরে রমণীবাবুকে দোষমুক্ত করবার ইচ্ছা আমার মনে মনে জাগছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের কথাপ্রমাণে সেই ইচ্ছাকে ফলবতী করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। ধনঞ্জয় বোল্লে, "বাবু রমণীবল্লভ একদিন আমারে ডেকে অনুরোধ করেন, 'একটা বর দেখ। টাকাওয়ালা হওয়া চাই। পরমসুন্দরী কন্যা, কুমারীকাল উত্তীর্ণ, জাতি-কুল-বিচার আবশ্যক করে না, টাকাওয়ালা বর দেখ।' সেই অনুরোধে আমি এই বংশী পোদ্দারকে যোগ্যপাত্র ঠিক কোরেছি। বংশী পোদ্দার নগদ দুহাজার টাকা পণ দিবে, আমি আর রমণীবাবু উভয়েই ঘটক, উভয়ে আমরা ৫০০৲ টাকা পাব, মেয়েটি যারা এনেছে, তারা পাবে দেড় হাজার, এইরূপ বন্দোবস্ত। কথা যখন ধার্য হয়, কন্যাপক্ষের লোকেরা তখন এই বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা তিনজন, কন্যার পিতার নাম চণ্ডেশ্বর।"

তদন্তের আর কোন অঙ্গ বাকী থাকলো না। হাকিম তখন রমণীবাবুকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ সম্বন্ধে আপনার আর কি বক্তব্য আছে? বুঝতে পাল্লেন, সমস্তই জাল, পূর্ব্বেই বুঝেছিলেন, টাকার খাতিরে জুয়াচোর লোকের মুরুব্বিগিরী কোত্তে হবে; সেটি না বুঝলে 'জাতিকুলের আবশ্যক করে না' ঘটকের প্রতি এমন আম-হুকুম দিতে কখনই আপনার সাহস হতো না। আপনি ভদ্র-সন্তান, বংশ-মর্যাদা আছে, মান-সম্ভ্রম আছে, এমন ঘৃণিত কার্যে আপনার প্রবৃত্তি, বড়ই আশ্চর্য! অমরকুমারীকে আমরা ঢাকায় নিয়ে চোল্লেম, আপনাকেও সেখানে যেতে হোচ্ছে, ঘটকালী কোরেছেন ধনঞ্জয়, বর হয়েছেন বংশী পোদ্দার এ দুজনকেও আমি ছাড়তে পাচ্ছি না, আপনারা তিনজনে পুলিশের নজরবন্দীতে থাকবেন। যারা এই অমরকুমারীকে আপনার বাড়ীতে রেখে গিয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি তাদের হাজির কোরে দিবেন, এই মর্ম্মে একবার লিখে দিতে হবে।"

অন্দরের দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত। বৌমার সদ্ব্যবহার স্মরণ কোরে, মা-লক্ষ্মীর মত শান্তমূর্ত্তি মনে কোরে মনে মনে আমি কাতর হোলেম। বুদ্ধির দোষে, অর্থ-লোভে রমণীবাবু আপন ফাঁদে আপনি জোড়িয়ে পোড়েছেন, হাকিমের সাক্ষাতে জাল-জুয়াচুরি প্রকাশ হয়ে পোড়লো, রক্ষা করা দুঃসাধ্য, তথাপি পুলিশের হস্তে বাবু যাতে বে-ইজ্জৎ না হন, সে বিষয়ে আমি বিশেষ যত্নবান থাকবো, এইরূপ স্থির কোল্লেম।

আর সেখানে কালবিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন। ডেপুটিবাবু প্রস্তুত হোলেন। ঢাকা থেকে দুখানি নৌকা এসেছিল, আর একখানি বজরা ভাড়া করা হলো,

বজরাতে অমরকুমারীকে তুলে দিবার সময় ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "বালিকার সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক রাখা চাই।" সে স্ত্রীলোক কোথায় পাওয়া যায়, অনেক বিবেচনা কোরে রমণীবাবুকে আমি বোল্লেম, "আপনার বাড়ীর সেই দাসীটি, যার নাম রেবতী, সেই রেবতীকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলুন ; অমরকুমারীকে রেবতী ভালবাসে, বিদেশিনী ব্রজকিশোরী এখন অমরকুমারী হয়েছেন, এ পরিচয়ে, রেবতী অবশ্য আমোদিনী হয়েছে, অমরকুমারীর সঙ্গে রেবতী থাকলেই ঠিক হবে।"

ললাটে সর্ব্বশিরা বকুঞ্চিত কোরে বাবু রমণীবল্লভ তীব্রদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমি রেবতীর নাম জানি, এটা অবশ্য তাঁর পক্ষে বিষম বিস্ময়কর বোধ হলো। আরো আমি কাণ পেতে শুনলেম, বাড়ীর মেয়েরাও সেই কথা নিয়ে বিস্ময়ে বিস্ময়ে চুপি চুপি গুঞ্জন কোত্তে লাগলেন। একজন বোল্লেন, "এ ছেলে কে গো! এ ছেলে আমাদের রেবতীর নাম কেমন কোরে জানলে ?"

আর কেমন কোরে জানলে। এ ছেলে কোথাকার কত কথা জানে, কৈফিয়ৎ দিবার সময় ঘটে না ; এ ক্ষেত্রেও সময় ঘোটলো না, ডেপুটিবাবুর অনুরোধে রমণীবাবুর সম্মতিতে রেবতী আমাদের সঙ্গিনী হলো। বজরাতে আমি, মণিভূষণ, অমরকুমারী, রেবতী, আর একজন পুলিশ-প্রহরী ; একখানি নৌকায় ডেপুটিবাবু, রমণীবাবু, আর একজন পুলিশ-প্রহরী, আর একখানি নৌকায় দারোগার সঙ্গে বাকী লোকগুলি সব ; হরিহরবাবুর সরকার আর চাপরাসীও সেই নৌকায় থাকলো।

আমরা ঢাকায় চোল্লেম। একবার ইচ্ছা হয়েছিল, একখানি চিঠি লিখে হরিহরবাবুকে এই কার্য্যের ফলাফল জ্ঞাপন করি, অমরকুমারীর উদ্ধারসংবাদে হরিহরবাবু তুষ্ট হবেন, মনে মনে সেটি আমি বুঝেছিলেম, কিন্তু চিঠি লেখা হলো না। আমি কোথায় গেলেম, কি কোল্লেম, ঢাকার আদালতে কার্য্যফল কি প্রকার দাঁড়ালো, কিছুই তিনি জানতে পাল্লেন না, অবসর অভাবে চিঠি লেখা হলো না। এইবার ঢাকা পেঁছে চিঠি লিখবো। দরিয়ায় আমাদের তরণী ভাসলো।

বহু শ্রম, বহু আয়াস, বহু বাদানুবাদ, বহু চিন্তা, আর বহুতর নীরস বিষয়ের আলোচনার পর, মানুষের মনে স্বভাবতই একটু আমোদ-কৌতুকের ভাব উদয় হয়। নূতন উৎসাহে জলপথে তরণী-আরোহণযাত্রা ; বারিসিক্ত সুশীতল সমীরণ-সেবনে চিত্ত প্রফুল্ল ; অনেকদিন অদর্শনের পর অমরকুমারীর দর্শনলাভ ; এই সকল সুখসংযোগে আমার মনে একটু আমোদকৌতুকের ভাবোদয়। মৃদু বাতাসে হেলে দুলে তরণী চোলেছে ; দাঁড়ীমাঝীরা অভ্যাসমত জাতীয়সুরে জংলা রাগিণীতে গান ধোরেছে ; আমরা অনেক দূরে এসে পোড়েছি। সেই সময় রেবতীকে নিয়ে একটু কৌতুক করবার ইচ্ছা হলো। যতক্ষণ আমরা তরণীতে আছি, ততক্ষণ রেবতী একটিও কথা কয় নাই, অমরকুমারীও নীরব, মণিভূষণের সঙ্গে আমার দুটি একটি কথা

চোলছিল, সে কথার প্রসঙ্গ অন্য প্রকার। অমরকুমারীর সঙ্গে সত্য কি আমার একটিও কথা হয় নাই?—হয়েছিল, কথা কিন্তু ওষ্ঠরসনায় নয়, চক্ষে চক্ষে। রেবতীর সঙ্গেও সেই রকম চক্ষে চক্ষে কথা।

এইবার আমি রেবতীর মুখের কথা শুনবো। রেবতীর দিকে একটু সোরে গিয়ে তার মুখপানে চেয়ে সকৌতুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা রেবতি! সেই চণ্ডেশ্বর! নামটি কিন্তু বেশ। শুনলে একটু একটু ভয় হয়, কিন্তু দেখলে বোধ হয় ততটা ভয় থাকে না। রেবতি! তুমি সেই চণ্ডেশ্বরকে দেখেছ; বাড়ীতে এসেছিল, নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কথা কোয়েছ; আচ্ছা বল দেখি, চণ্ডেশ্বরের চেহারা কেমন? চণ্ডেশ্বরের গলার আওয়াজ কেমন?"

একদৃষ্টে আমার নয়ন নিরীক্ষণ কোরে রেবতী কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ হয়ে থাকলো। পুনরায় যখন আমি ঐ দুই প্রশ্ন কোল্লেম, তখন আমার আগ্রহ বুঝতে পেরে রেবতী উত্তর কোল্লে "চণ্ডেশ্বর?—চণ্ডেশ্বরের চেহারা তুমি শুনবে? কেন গা? তুমি কি রামায়ণ পড় নাই? লঙ্কাকাণ্ড?—পড় নাই? —নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, হনুমান, জাম্বুমান, এ সব কি তুমি পড় নাই? চণ্ডেশ্বরের চেহারাটা ঠিক সেই রকম। একবার মনে হয় বাঁদর, একবার মনে হয় ভালুক। চণ্ডেশ্বর দু-পায়ে চলে; দু-পায়ে না চোলে চণ্ডেশ্বর যদি চারপায়ে চোলতো, তা হোলেই ঠিক মানাতো; পিঠের উপর মস্ত একটা ঢিবি, চারি পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ালে তাকে আর মানুষ বোলে চিনতে হতো না। আধখানা বাঁদর, আধখানা ভালুক। গলার আওয়াজটাও ভালুকের মতন।"

কিছুই সন্দেহ ছিল না, তথাপি রেবতীর মুখের বর্ণনা শুনে, সম্পূর্ণ সংশয়শূন্য হোলেম। রেবতীর বর্ণনায় কবিত্বের ভাব অনুভূত হলো। চণ্ডেশ্বরকে যদি ঢাকায় পাওয়া যায়, গলায় দড়ী বেঁধে রেবতীর হাত দিয়ে তারে একবার নাচাবো, অন্তরে হাস্য রেখে সেই ইচ্ছাকে হৃদয়ে আমি স্থান দিয়ে রাখলেম।

রেবতী আমার সঙ্গে কথা কোচ্ছে, চণ্ডেশ্বরের রূপবর্ণনা শুনে আমি আমোদ কোচ্ছি, প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা রেবতি! সম্প্রতি একদিন সন্ধ্যাকালে তোমাদের বাড়ীতে কে একটি বিদেশিনী গিয়েছিল. জলের ঘাটে যার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, সেই বিদেশিনীটি তোমার চক্ষে কেমন ঠেকেছিল?"

অন্যমনস্কে চোমকে উঠে, চকিতনেত্রে আবার নয়ন নিরীক্ষণ কোরে রেবতী উত্তর কোল্লে, "সে বিদেশিনীর কথা তুমি কি কোরে জানতে পাল্লে? সন্ধ্যাকালে এসেছিল, ভোরবেলা পালিয়েছিল, তার কথা তুমি কার মুখে শুনলে?"

ও কথায় যেন আমি কান দিলেম না, মুখে হাসি আসছিল, সে হাসি চেপে রেখে, গম্ভীরবদনে আবার আমি প্রশ্ন কোল্লেম, "আচ্ছা রেবতি! ব্রজকিশোরীকে দেখে সে বিদেশিনী তেমন কোরে ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকেছিল কেন?"

ক্রমশঃ রেবতীর মনে বেশী বেশী বিস্ময়ের আবির্ভাব। অমরকুমারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেম, এবারে অমরকুমারীর মুখেও বিলক্ষণ বিস্ময়ের লক্ষণ প্রতিভাত। কৌতুকের নূতন তরঙ্গ প্রবাহিত। রেবতীর মুখে কোন উত্তর পাওয়া গেল না ;—মুখের বাক্যে পাওয়া গেল না, কিন্তু মুখের ভঙ্গীতে বেশ উত্তর পাওয়া গেল। আশ্চর্য জ্ঞান।

তৃতীয়বার আমি বোল্লেম, বিদেশিনী গণনা জানে, হাত-মুখ দেখে মানুষের ভাগ্যের ভবিষৎ ফলাফল বোলতে পারে ;—না দেখেও বোলতে পারে! ঘোমটা দিয়ে ব্রজকিশোরীর ভাগ্যফল বোলেছিল ; হাতও দেখে নাই, মুখও দেখে নাই, কিছুই করে নাই ; ঘোমটার ভিতর হয় তো জ্যোতিষবিদ্যার পুঁথি রাখে। অদ্ভুত বিদেশিনী। গণকঠাকুরেরা পুরুষমানুষ, মেয়েরা বলে গণৎকার, কিন্তু সেই বিদেশিনী গণকঠাকুরও হোতে পারে না, গণৎকারও হোতে পারে না। জ্যোতিষবিদ্যাতে আগে আগে স্ত্রীজাতির অধিকার ছিল। তুমি রেবতী, তুমি যদি রাজ্য বিক্রমাদিত্যের আমলে রাক্ষসের দেশে, রাক্ষসীদের কাছে জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা কোত্তে, তুমিও একজন খনাবতী, লীলাবতী হোতে পাত্তে। আচ্ছা, সেকালের কথা যাক, সেই বিদেশিনী অত গণনা কি কোরে জানতে পরেছিল ?"

এ বারেও রেবতী উত্তর দিলে না। অমরকুমারীর দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশান্তবদনে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি জানো অমর? তুমিই ত ব্রজ-কিশোরী ছিলে? ঘোমটা-ঢাকা বিদেশিনী তোমার ঐ মুখখানি না দেখেই সাফ সাফ বোলেছিল, 'চোরে চুরি কোরেছে, এ কষ্ট থাকবে না, হারানিধি প্রাপ্ত হবে, শীঘ্র তুমি মুক্তি পাবে।' এ সব কথা কেমন কোরে জেনেছিল? কেমন কোরে বোলেছিল? ফল তো দেখছি ঠিক হয়েছে, শীঘ্রই তুমি মুক্তি পেয়েছ, চোরের সন্ধান হোলেই এখন সব আপদ চুকে যায়। হবেও তা, কিন্তু বল দেখি অমরকুমারি, সে বিদেশিনী কোথায় গেল ?"

এইবার একটু হেসে অমরকুমারী বোল্লেন, "তুমিও যে দেখছি, দিব্যি গণৎকার হয়েছ! তুমিই কেন বল না, সে বিদেশিনী কোথায় গেল? এসেছিল, বোলেছিল, পালিয়েছিল, এ সব তুমি জানতে পেরেছ, আগাগোড়া সব কথা বোলতে পেরেছো, কোথায় গেল, সেটি কি তুমি জানতে পার না ?"

আমি মনে কোল্লেম হাসি ; কিন্তু হাসলেম না ; সমভাবে সমস্বরেই বোল্লেম, "তাই তো আমি ভাবছি! বিদেশিনী কোথায় গেল, তোমারে দেখা দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে গেল, আমি একবার সেই বিদেশিনীকে যদি দেখতে পাই, গোটাকতক মনের কথা জিজ্ঞাসা করি। অন্বেষণ কোরে বেড়াচ্ছি, ধোত্তে পাচ্ছি না ; একটিবার দেখা হোলে আগেই জিজ্ঞাসা করি চণ্ডেশ্বরের সন্ধান। তুমি কি বোলতে পার, তোমারে এক জায়গায় ফেলে রেখে চণ্ডেশ্বর কোথায় লুকিয়েছে? পার বোধ হয়? তুমিও বিদেশিনী ছিলে, সেটিও বিদেশিনী হয়ে এসেছিল ; দুটি বিদেশিনী মিলন হয়েছিল, বিদে-শিনীর ছায়া তোমার গায়ে লেগেছে ; বিদেশিনীর গায়ের বাতাস তোমার গাত্র স্পর্শ কোরেছে ; তুমিও বোধ হয়, একটি গণৎকার হয়ে আছ ; আমিও যেন তাই দেখছি। বল দেখি, সেই পাষণ্ড চণ্ডেশ্বর এখন কোথায় ?"

হস্তসঞ্চালন কোরে অমরকুমারী বোল্লেন, "বোলো না, বোলো না হরিদাস! ও নাম আমার কানের কাছে আর তুমি বোলো না। শুনলেই আমার গা কাঁপে ; প্রাণ ধড়ফড় করে! তিনটে নাম একরকম ভয় দেখায়! যে নামটা তুমি দিয়েছ, সেই নামটাতেই আরো বেশী ভয়!"

রেবতী দেখলে, অমরকুমারীর সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ, চণ্ডেশ্বরের সঙ্গেও আমার অনেকদিনের পরিচয়, আশ্চর্য্য মনে কোরে ব্যগ্রতা জানিয়ে, রেবতী আমারে বোল্লে, "তুমি বাপু হরিদাস! তুমি সব জানো, তুমি সব পারো, তুমিও গণনা জানো, বিদেশিনীর সব কথা তুমি ঠিক ঠিক বোলচো; বাপু হরিদাস! আমার একটি কথা কি তুমি রাখবে?"

কি জানি কি কথা, কি কথা বলবার জন্য রেবতী ও রকম ব্যগ্রতা জানাচ্ছে, শীঘ্র স্থির কোত্তে না পেরে, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন দিয়ে আমি জানতে চাইলেম,—রেবতীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি তোমার কথা?"

মুখখানি একটু ম্লান কোরে রেবতী তখন বোল্লে, "কথা আমার আর কিছুই নয়, হাকিমের লোকেরা আমাদের বড়বাবুটিকে ধোরেছে, আড়াল থেকে শুনে শুনে কথার ভাবে আমি বুঝতে পেরেছি, হাকিমবাবুটি তোমার খুব বশীভূত ; আমাদের বাবুটিকে হাকিম যেন ছেড়ে দেন, বিনা দোষে কোন রকম শাস্তি না দেন, এইটি আমার কথা। চোর হলো চণ্ডেশ্বব, চোর হলো তার দলের লোকেরা, আমাদের বাবু কি অপরাধে ধরা পড়েন, বাবু আমাদের নেহাৎ ভালমানুষ। যে যা বলে, তাই তিনি শোনেন, তাই তিনি করেন, এই তাঁর দোষ। তুমি বাছা, বাবুটিকে খোলসা কোরে দিও, সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল কোরবেন।"

সর্ব্বমঙ্গলাকে স্মরণ কোরে আশ্বাসবাক্যে আমি বোল্লেম, "তোমাদের বৌমাটি সর্ব্বমঙ্গলা, সেই সর্ব্বমঙ্গলার পুণ্যবলে সকল দিকে মঙ্গল হবে, তোমাদের অমরকুমারীকে শ্রীবিষ্ণুঃ!—তোমাদের ব্রজকিশোরীকে জিজ্ঞাসা কর, চণ্ডেশ্বরের সঙ্গে তোমাদের বাবুর বন্দোবস্তের কথাটা সত্য কি না? সে কথা যদি সত্য না হয়, রমণীবাবু বেকসুর খালাস পাবেন ; ধনঞ্জয় ঘটক বন্দোবস্তের কথা প্রকাশ কোরেছে, তাতে বাবুতে ৫০০ টাকা বখরা পাবে, এই কথা বোলেছে ; এ কালের ঘটকেরা সব বলে ; এখনকার ঘটকেরা প্রায়ই মিথ্যাবাদী হয়, আদালতেও তার প্রমাণ আছে। বাবু যদি ধনঞ্জয়ের কথাটা মিথ্যা বলেন, তা হোলে বাবুর নামে কোন দোষ দাঁড়াতে পারবে না।"

হাঁ কোরে আমার কথাগুলি শুনে রেবতী যেন সকল কথার সারমর্ম্ম অক্ষরে অক্ষরে গ্রাস কোল্লে ; কিন্তু অন্যকথার দিকে বেশী মনোযোগ না রেখে, বিস্মিত নয়নে অমরকুমারীর দিকে একবার চেয়ে, সমদৃষ্টিতে আবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, সমান বিস্ময়ে বোল্লে, "কে গা তুমি হরিদাস? কোথা থেকে তুমি এসেচ? আমাদের বৌমাটি সর্ব্বমঙ্গলা সে কথা তুমি কেমন কোরে জানলে?"

কথাও সত্য। রেবতীর বৌমাটিকে আমি কেমন কোরে জানলেম? আমার

কথা শুনে রেবতীরও যেমন বিস্ময়, অমরকুমারীরও তদ্রূপ বিস্ময়। সে বিস্ময় ভঞ্জন করবার কৈফিয়ৎ কি?

অবসর মন্দ নয়। সত্য কৈফিয়তেই এখানে কাজ হবে। রেবতীর বিস্ময়-সূচক প্রশ্নে প্রথমে উত্তর না দিয়ে অমরকুমারীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "সে রাত্রে সেই যে সেই বিদেশিনী ঘরের ভিতর ঘোমটা দিয়ে তোমার সঙ্গে কথা কোয়েছিল, তুমি কি সেই বিদেশিনীকে তখন চিনতে পেরেছিলে?"

অমরকুমারী বোল্লেন, "তাও কি তুমি সম্ভব মনে কর? কখন যারে দেখি নাই, ঘোমটাতেই যার মুখ ঢাকা ছিল, তারে আমি চিনবো এমন কথা কেন তোমার মনে এলো? কি ভেবেই বা তুমি জিজ্ঞাসা কোল্লে?"

মৃদু হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "বৌমাকে আমি কেমন কোরে জেনেছি, রেবতী আমার মুখে সেই কথা শুনতে চায়; বিদেশিনীকে তুমি চিনতে পেরে-ছিলে কি না, কেমন কোরে তেমন কথা আমার মনে এলো, আমার মুখে তুমি সেই কথা শুনতে চাও; সমস্যা বিষম। অমরকুমারী! এ সমস্যা-পূরণে আমি যদি এখন হৃদয়-কপাট মুক্ত করি, তোমরা উভয়েই মহা বিস্ময়াপন্ন হবে।"

বক্রনয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত কোরে অমরকুমারী বোল্লেন, "আমার আর এখন মহা বিস্ময়াপন্ন হবার কিছুই বাকী নাই, এ সকল মহা বিস্ময়ের শেষ কত দূরে, তাও এখন আমি জানতে পাচ্ছি না। এই বিস্ময়ের উপর যদি আবার নূতন বিস্ময় উৎপাদন কোরে দাও, তাতে আমি অভিভূত হব না। যেটা যখন অভ্যাস হয়ে আসে, যতই ভয়ঙ্কর হোক, যতই কষ্টকর হোক, যতই বিস্ময়কর হোক, তাতে আর ততটা গুরুত্ব থাকে না। তুমি বল, রেবতী যে কথা তোমারে জিজ্ঞাসা কোরেছে, সে কথার উত্তরে যা তুমি বোলতে চাও, প্রকাশ কোরে বল, বিস্ময়কে আলিঙ্গন কোত্তে আমি ভালবাসি।"

বাবু মণিভূষণ আমাদের তিনজনের ঐরূপ রহস্যোক্তি একমনে শ্রবণ কোচ্ছিলেন, কি যে সে সব কথা, সে সব কথার মর্ম্মই বা কি, কিছুই তিনি অবধারণ কোত্তে পাচ্ছিলেন না; তাঁর মুখের ভাব দেখে, আমি বুঝতে পাচ্ছিলেম, বাজে কথা মনে কোরে তিনি একটু একটু বিরক্ত হোচ্ছিলেন। যাঁরা বিরক্ত হন, তাঁরা বিরক্ত থাকুন, মণিভূষণকে বিরক্ত রেখে অমরকুমারীকে আমি বোল্লেম, "অমর! এক বিষয়ে তোমাদের উভয়েরই আগ্রহ; তোমরা উভয়েই শ্রবণ কর। আমিই সে বিদেশিনী।"

আমার মুখের দিকে চেয়ে রেবতী অবাক, রেবতীর মুখের দিকে চেয়ে অমরকুমারী চমকিতা, আমার মুখের দিকে চেয়ে মণিভূষণের চক্ষু নির্নিমেষ। তিনজনেই নির্ব্বাক। আমি বোলতে লাগলেম, "সত্য অমরকুমারী! আমিই সেই বিদেশিনী। তোমার অন্বেষণে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে শেষে আমি মাণিকগঞ্জে উপস্থিত হই, জলের ঘাটে নারীবেশে রেবতীর সঙ্গে দেখা হয়; রেবতী আমারে বিদেশিনী পরিচয়ে বৌমার কাছে নিয়ে যায়, সেইখানে আমি বৌমাকে দেখি, স্নেহ-বাৎসল্য-মাখা মধুর বচনগুলি শ্রবণ কোরে অপ্রত্যাশিত

স্নেহ-দয়া প্রাপ্ত হয়ে, বৌমার প্রতি আমার ভক্তি হয়। তার পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিলাষ প্রকাশ করি। তুমি দর্শন দাও, চিনতে পার কি না পার, পরীক্ষার জন্য সেই সময় আমি অবগুণ্ঠন ধারণ কোরেছিলেম।"

ঘন ঘন করতালি দিয়ে অমরকুমারী ঘন ঘন হাস্যকোত্তে লাগলেন। সমভাবে নির্ব্বাক থেকে রেবতী কেবল ঘন ঘন আমার দিকে দৃষ্টিপাত কোত্তে লাগলো, মণিভূষণ বিস্ময় প্রকাশ কোরে বারংবার আমারে বাহাদুরী দিলেন। কোন দিকেই আমার মন থাকলো না, আমি বোলতে লাগলেম, "অমরকুমারী! লোকমুখে কিছু কিছু সন্ধান পেয়ে তোমারে দর্শন করবার জন্য নারীবেশে সেই বাড়ীতে আমি গিয়েছিলেম। তোমরা হয় তো মনে কোচ্ছ কৌতুক, মণিভূষণ মনে কোত্তে পারেন কৌতুক, রেবতী মনে কোত্তে পারে কৌতুক, কিন্তু তুমি পার না। অমরকুমারী! নারীবেশে সাজিয়ে দিয়ে বীরভূমে তুমি আমার প্রাণরক্ষা কোরেছিলে, নারীবেশে মাণিকগঞ্জে আমি তোমার উদ্ধারকামনায় গৃহস্থ লোকের অন্দরমহলে প্রবেশ কোরেছিলেম; ন্যূনকল্পে কৃতকার্য হয়েছি: নারীবেশকে নমস্কার করি। সংসারে নারীজাতি শক্তিরূপিণী; নারী যদি মহাশক্তির অনুগ্রহে নিজশক্তি পরিচালন করেন, সংসারের সকল কার্যই শুভ হয়; সর্ব্বদা সকল স্থলেই সে শক্তির উচিত ব্যবহার হয় না বোলেই অনর্থ ঘটে। রমণীবাবুর সহধর্ম্মিণীকে ভক্তির চক্ষে আমি দর্শন কোরেছি; দয়ার চক্ষে রেবতীকে আমি দর্শন করি, স্নেহের চক্ষে তোমারে আমি দর্শন করি, হৃদয়ে অহরহ তোমার মূর্ত্তি ভাবি; শক্তিপূজায় সর্ব্বদা আমার আনুরক্তি, শক্তির কৃপাতেই স্ত্রীবেশধারণে আমার মঙ্গল ফললাভ হয়েছে। মুখে সামান্য অবগুণ্ঠন ছিল, সেইজন্য তুমি আমারে চিনতে পার নাই।"

অকস্মাৎ অমরকুমারীর মুখমণ্ডল রক্তিম আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠলো। স্ত্রীজাতিসুলভ গৌরবে স্ফূর্ত্তিমতী হয়ে গৌরবিণী বোল্লেন, "আমি তোমারে চিনতে পেরেছিলেম। অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢাকা ছিল, কণ্ঠস্বর ঢাকা ছিল না; কণ্ঠস্বরে অনেকবার আমি মনে কোরেছিলেম, হরিদাসের কথা, শুধু মনে করাই তখন সার হয়েছিল, মনের কথা ফুটে বলবার সুবিধা ঘটে নাই; কিন্তু আমি চিনেছিলেম।"

আমাদের উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে, অমরকুমারীকে লক্ষ্য কোরে, চঞ্চলস্বরে রেবতী বোল্লে, "তুমি চিনতে পেরেছিলে, আশ্চর্য কথা নয়, হরিদাসকে তুমি অনেকবার দেখেচ, অনেকবার হরিদাসের মুখের কথা তুমি শুনেচ, ঘোমটার ভিতর থেকে কথা কোইলেও আওয়াজ তুমি বুঝতে পেরেছিলে, প্রকাশ কর নাই, এ কথাও অসম্ভব হোতে পারে না; আমি—আমিও কিন্তু হরিদাসকে চিনিনিচ। সেই রাত্রে নারীবেশধারী হরিদাসের গুটিকতক, কথা আমি শুনেছিলেম, কণ্ঠস্বর আমার মনে ছিল, আজ যখন হরিদাসের মুখের কথা শুনি, তখনি মনে হয়েছিল, এখনো শুনচি, এখনো মনে হোচ্চে, সেই বিদেশিনীর কথা আর হরিদাসের কথা ঠিক একরকম: গলার সুরও যেমন, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলিও সেই রকম। হরিদাস তোমারে উদ্ধার কোল্লেন, তুমি সুখী হোলে,

কিন্তু তোমরা আমাদের ফেলে চোলে যাবে, তাই মনে কোরে আমার প্রাণ কেমন কোচ্চে।"

অমরকুমারীর সঙ্গে রেবতীর এই রকম কথা, তার পর আমারে সম্বোধন কোরে রেবতী পুনর্ব্বার বোল্লে, 'দেখ বাবা! দেখ হরিদাস! আমার কথাটি ভুলে থেকো না ; আমাদের বাবুটি যাতে কোরে কোন বিপদে না পড়েন, তাঁরে যাতে আসামী হোতে না হয়, এই উপকারটি তুমি কোরো।"

"বাবু যদি কোন দোষে লিপ্ত না থাকেন, হাকিমের বিচারেই তিনি নিষ্কৃতি-লাভ কোরবেন, এই আমার বিশ্বাস। তিনি বিপদে পড়েন, তেমন ইচ্ছা আমার নয়। তাঁর অনুকূলে হাকিমকে দু-কথা বলা যদি আমার আবশ্যক হয়, অবশ্য তা আমি বোলবো। সেজন্য তুমি ভেবো না।"—রেবতীকে এই রকমে আশ্বস্ত কোরে মণিভূষণের সঙ্গে উপস্থিত ক্ষেত্রের কথোপকথনে আমি প্রবৃত্ত হোলেম।

ঢাকা সহরের সদরঘাটে আমাদের তরণী পৌঁছিল। রাত্রিকাল। সঙ্গে স্ত্রীলোক, কোথায় যাওয়া যায়? বেশীক্ষণ চিন্তা কোত্তে হলো না। ডেপুটি-বাবু ব্রাহ্মণ। আমাদের প্রতি তাঁর যত্নও যথেষ্ট। রাত্রিকালে তাঁর বাড়ীতেই আমরা উঠলেম। বিনা কষ্টে নিরুদ্বেগে সেই বাড়ীতেই আমরা রাত্রিযাপন কোল্লেম। আমি মনে কোরেছিলেম, হয় তো অমরকুমারীকে নিয়ে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সমীপে উপস্থিত হোতে হবে, সেখানে হয় তো শাখা-পল্লব-সম্বলিত আসল মোকদ্দমার আসল বিবরণ এজাহার কোত্তে হবে, কিন্তু ডেপুটিবাবুর অনুগ্রহে সে কষ্টটা আমাদের স্বীকার কোত্তে হলো না ; ডেপুটিবাবু নিজেই উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট দিলেন, অপহৃতা কন্যাকে উদ্ধার করা হয়েছে ; কন্যা মুর্শিদাবাদে যে বাড়ীতে ছিল, সেই বাড়ীর অধিকারীর উপযুক্ত পুত্র মণিভূষণ দত্ত, সেই মণিভূষণের হস্তে কন্যাটিকে সমর্পণ করা হয়েছে, এই মর্ম্মে রিপোর্ট। সে রিপোর্টে আরো লেখা ছিল, মূল আসামী নিরুদ্দেশ ; সম্ভবতঃ যোগের আসামী রমণীবল্লভ ভৌমিক, ধনঞ্জয় ঘটক, আর বংশীধর পোদ্দার, এই তিনজনকে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে।

আমাদের আর আদালতে যেতে হলো না, ডেপুটিবাবুর বাড়ীতেই এক দিন এক রাত্রি আমরা বাস কোল্লেম। রাত্রিকালে ডেপুটিবাবু আমারে নিজগৃহে আহ্বান কোরে বোল্লেন, "অমরকুমারীকে নিয়ে তোমরা দেশে যাও, এখানকার পুলিশের একজন প্রহরী তোমাদের নিরাপদের জন্য সঙ্গে থাকবে ; চণ্ডেশ্বর, গণেশ্বর আর মিয়াজান, এই তিনজনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়াণা জারি হোচ্ছে ; তারা গ্রেপ্তার হয়ে এলে মুর্শিদাবাদে চালান হবে ; মূল মোকদ্দমা মুর্শিদা-বাদে ; শাখা-মোকদ্দমার বিচার এখানে হবে না। রমণীবল্লভ, ধনঞ্জয়, আর বংশী পোদ্দার এই তিনজনের হাজার টাকা তাইনে মুছলকা নিয়ে আপাততঃ তাদের খালাস দেওয়া হলো। তারা যদি মূল আসামীদের হাজির কোত্তে পারে, যোগাযোগ যদি প্রমাণ না হয়, তবে তারা আসামী-শ্রেণীভুক্ত হবে না। মোকদ্দমা

বিচারের সময় তাদের কিন্তু একবার মুর্শিদাবাদে যাওয়া আবশ্যক হবে। তোমরা এখন দেশে যাও।”

সে রাত্রের এই পর্য্যন্ত কথা। পরদিন প্রভাতে আমরা মাণিকগঞ্জে যাত্রা কোল্লেম। রেবতী তখন আর আমাদের তরণীতে থাকলো না। বাবুদের নৌকাতেই তারে যেতে হলো। বাবুদের নৌকায় রমণীবাবু, ধনঞ্জয় আর বংশীধর, সেই নৌকায় রেবতী।

আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে রেবতী যখন বাবুদের নৌকায় যায়, চক্ষে অঞ্চল দিয়ে রেবতী তখন কেঁদে গেল। কিসের মায়ায় রেবতী কাঁদলো, তা আমি বুঝতে পাল্লেম। অমরকুমারীকে ভালবেসেছিল, অল্পক্ষণের পরিচয়ে আমার প্রতিও একটু স্নেহ বোসেছিল, বিশেষতঃ আমিই যেন তার বাবুটিকে আপাততঃ অব্যাহতি দিবার হেতু হোলেম ; এই তিন কারণে, আমাদের বিরহে, আর বাবুর খালাসের আনন্দে রেবতী সেই সময় কেঁদে গেল। কথাবার্ত্তার ভাবে আমি বুঝেছিলেম, রেবতীর শরীরে মায়া-মমতা কিছু বেশী।

পঞ্চম কল্প

পম্মায় প্রাণ যায়

যে বজরায় ঢাকায় আসা হয়েছিল, সেই বজরায় আরোহণ কোরে আমরা মাণিকগঞ্জে চোল্লেম। আমরা ছয় জন ;—আমি, মণিভূষণ, অমরকুমারী, হরিহরবাবুর সরকার, হরিহরবাবুর চাপরাসী আর ঢাকার পুলিশ-প্রহরী।

মনে আনন্দ আছে, অথচ আসামীরা ধরা পোড়ছে না, গুপ্তভাবে কোথায় কি প্রকারে ওৎ কোরে থাকে, কোথায় কি প্রকারে কখন কি বিপদ ঘটায়, সেই বিষয়ে কিছু কিছু আশঙ্কাও আছে। আমার জীবনের কেমন এক গ্রহফল, চিন্তাশূন্য আমি থাকতে পারি না। নিশ্চিন্ত থাকায় যে সুখ, সে সুখ যেন আমার ভাগ্যে নাই, তাই আমি সর্ব্বদা ভাবি। বজরায় বোসে বোসে অমরকুমারীর সঙ্গে কথা কোচ্ছি, মণিভূষণের সঙ্গে কথা কোচ্ছি, চিন্তা-রাক্ষসী বুকের ভিতর খেলা কোচ্ছে! রাশিচক্রের গতির ন্যায় কত পরিবর্ত্তনে কত প্রকার চিন্তা আমার মনের ভিতর উদয় হোচ্ছে, ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। বর্দ্ধমানে সর্ব্বানন্দবাবুর খুনের পর রক্তদন্ত আমারে ধোরে এনেছে, সর্ব্বানন্দবাবুর পরিবারেরা কে কেমন আছেন, কোন সংবাদ পাই না, মোহনবাবুর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়েছিল, শ্বশুরবাড়ীর সংবাদ তিনি কিছুই বলেন নাই। আশালতা ; স্নেহময়ী বালিকা আশালতা ; রক্তদন্ত যে দিন আমারে

ধোত্তে যায়, সেই দিন বালিকা আমার অনুকূলে পিতার কাছে কত কথাই বোলেছিল। হায় হায়! আশালতার বিবাহের আয়োজনের সময়েই সর্ব্বানন্দ-বাবুর প্রাণ গেল! কারা যে তাঁরে কেটে গেল, পুলিশ তার কিছুই কিনারা কোত্তে পাল্লে না ; আজ পর্যন্ত খুনী আসামীর সন্ধান হলো কি না, তাও কিছু জানা গেল না। জানা যাবেই বা কিরূপে ? মোহনবাবুর মোহন চক্রে তদবধি আমি নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি ; কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পাচ্ছি না। বর্দ্ধমানের সংবাদ আমারে কে এনে দিবে ?

রক্তদন্ত আমার শত্রু ; জাতশত্রু ; প্রাণসংহার কোত্তে চায় ! তেমন শত্রুতা তার সঙ্গে আমার কি আছে, কিছুই আমি জানি না। কাশীতে জেনেছি, মোহনলালবাবুর গুপ্ত উপদেশে রক্তদন্ত আমার উপরে দৌরাত্ম্য করে। সে কথাটাই বা কি ? মোহনবাবুর কাছে আমি কি অপরাধে অপরাধী, মোহনবাবু কেন আমার শত্রু, তাও আমার অজ্ঞাত। তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে আমি ছিলেম, মহাবিপদসময়ে সেইখানে আশ্রয় পেয়েছিলেম, এই আমার অপরাধ, মোহন-বাবু আমারে সে আশ্রয় ছাড়িয়ে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যেতে আমি সম্মত হই নাই, এই আমার অপরাধ। সে অপরাধে প্রাণে মারবার সংকল্প হয়, এটা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল।

চিন্তার স্রোত একটানা বহে না, জোয়ার-ভাঁটার ন্যায় গতির তারতম্য অনুভূত হয়, নানা দিকে শাখা-প্রশাখা প্রবাহিত হয়ে থাকে। মোহনলালবাবু একবার আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন, সে প্রসন্নতা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। বারাণসীধামে রমেন্দ্রবাবুর নিকটে একদিন আমি মোহনলালের চরিত্রের একটু একটু ছায়া-চিত্র অঙ্কিত কোচ্ছিলেম, গুপ্তভাবে শ্রবণ কোরে মোহনবাবু আবার আমার উপর খড়্গহস্ত ; অল্পদিনের সেই প্রসন্নতা অল্পদিনেই উড়ে যায় ; তদবধি চক্ষে চক্ষে তার সঙ্গে আর আমার দেখা-সাক্ষাৎ হোচ্ছে না, কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁর দুষ্টচক্র সমভাবেই ঘূর্ণিত হোচ্ছে। অমরকুমারী-হরণের এই যে ভয়ানক চক্র, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, এ চক্রের মূলেও মোহনবাবু দণ্ডধর ! অমরকুমারীকে উদ্ধার কোরে আমি নিশ্চিন্ত হোতে পাচ্ছি না। চক্রের নায়কেরা—উপনায়কেরা নিরাপদে মুক্ত আছে। আমার শান্তিপথে তারা বিষম কণ্টক ; তবে আমি নিশ্চিন্ত থাকি কিরূপে ?

নিশ্চিন্ত সুখ আমার ভাগ্যে নাই। আমার সম্মুখে অমরকুমারী ; অমর-কুমারীর চন্দ্রমুখ আমি দর্শন কোচ্ছি, অমরকুমারীর অমৃতময়ী বাণী আমি শ্রবণ কোচ্ছি, তথাপি যেন চিত্তে সুখ নাই : চিন্তার অনলে আমার হৃদয় দগ্ধ হোচ্ছে। কবির বাণী অখণ্ডনীয়। কবি বলেন, চিতা আর চিন্তা এই উভয়ের মধ্যে চিন্তাই গরীয়সী, কেন না, চিতা কেবল মৃতদেহ দাহ করে, চিন্তা সর্ব্বদা সজীব প্রাণীকে দাহ করে ! সেই চিন্তার প্রখর অনলে আমি দগ্ধীভূত। এক এক সময় এক একটি আনন্দের হেতু উপস্থিত হয়, চিন্তার অনল সেই হেতুগুলিকে তখনি দগ্ধ কোরে ফেলে ! এখন আমার সেইরূপ অবস্থা।

মাণিকগঞ্জে তরণী পেঁাছিল। হরিহরবাবুর বাসায় আমরা উত্তীর্ণ হোলেম। বাসায় পরিবার থাকেন না, কিন্তু বাসাবাড়ী দু-মহল। ভিতরমহলে অমরকুমারীকে রাখা হলো, বাসায় দাসী আর পাচিকা অমরকুমারীর সঙ্গিনী হয়ে থাকলো। হরিহরবাবু অমরকুমারীর রূপ দর্শন কোল্লেন ; যত কষ্টে, যত কৌশলে, যত ব্যয়ে, যত শ্রমে অমরকুমারীকে আমি উদ্ধার কোরেছি, আমার মুখে সেই সব কথা শ্রবণ কোল্লেন ; তত অল্প বয়সে তত সৃষ্টি আমি কোরেছি, স্নেহবশে প্রশংসা কোরে আমারে সাধুবাদ দিলেন ; ভক্তিভাবে আমি তাঁরে অভিবাদন কোল্লেম।

মাণিকগঞ্জে তিন দিন। দীনবন্ধুবাবু আমার কোন সমাচার প্রাপ্ত হোচ্ছেন না। চিঠি লিখে সংবাদ দেওয়া, তাও ঘোটে উঠছে না, সমস্তই অনিশ্চিত ছিল, অনিশ্চিত সংবাদে বন্ধুলোকের উদ্বেগ বৃদ্ধি করা হয় মাত্র ; সেই কারণেই মুর্শিদাবাদে আমি চিঠি লিখি নাই। তৃতীয় দিবসের রজনীযোগে হরিহর-বাবুকে সেই সব কথা আমি বোল্লেম ; আর কালবিলম্ব না কোরে মুর্শিদা-বাদে ফিরে যাওয়া আমার ইচ্ছা ; এই নির্ব্বন্ধ জানালেম। একটু চিন্তা কোরে তিনি বোল্লেন, "আর একটি দিন অপেক্ষা কর। মণিভূষণ আর তুমি, দু-জনেই ছেলেমানুষ, অমরকুমারীও বালিকা ; যেতে হবে অনেকদূর, ভয়ঙ্করী পদ্মা-নদী, পদ্মার তরঙ্গে বড় বড় সাহসী পুরুষেরও হৃদয় কম্পিত হয় ; উপযুক্ত বন্দোবস্ত কোরে, উপযুক্ত লোকজন সঙ্গে দিয়ে, একদিন পরে আমি তোমাকে পাঠাব ; আর একটি দিন মাত্র অপেক্ষা কর।"

একটি দিন আমি অপেক্ষা কোল্লেম। সেই দিন দীনবন্ধুবাবুর নামে আর শান্তিরাম দত্তের নামে দুইখানি চিঠি লিখে, আমি স্বহস্তে ডাকঘরে দিয়ে এলেম। সে দিন আমার আর অন্য কার্য ছিল না, দিনমানে হরিহরবাবুও বাড়ীতে ছিলেন না, মণিভূষণের সঙ্গে আনুসঙ্গিক নানাপ্রকার গল্পে দিনমান আমি অতিবাহিত কোল্লেম। সন্ধ্যার পর হরিহরবাবুর বাসায় এলেম। আমাদের মুর্শিদাবাদে যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হলো। অমরকুমারীর সঙ্গে দুজন দাসী থাকবে আর নৌকার হেপাজাতের জন্য পাঁচজন পাইক থাকবে, রন্ধন-কার্যের জন্য একটি ব্রাহ্মণবালকও সঙ্গে যাবে, এইরূপ বন্দোবস্ত। সঙ্গে আমার যে টাকাগুলি ছিল, সমস্তই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে, অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট, হরিহরবাবু আর একশত টাকা আমারে ঋণস্বরূপ প্রদান কোল্লেন, মুর্শিদাবাদে পেঁাছে সেই টাকা আমি পাঠাব, এইরূপ অঙ্গীকার কোল্লেম।

পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে আহারাদি কোরে আমরা নৌকারোহণ কোল্লেম, আমাদের জন্য বড় একখানি বজরা, আর রন্ধনের জন্য আর একখানি নৌকা ভাড়া করা হলো, বজরা আমাদের পদ্মানদীতে প্রবেশ কোল্লে, আমরা পদ্মা-গর্ভে ভাসলেম। পূর্ণ বর্ষাকাল নয় তথাপি পদ্মার এ কূল ও কূল দেখা যায় না। অল্পবাতাসেও পদ্মানদীতে তুফান হয় তরঙ্গে তরণীগুলি যেন নৃত্য কোত্তে থাকে। আমরা যে দিন পদ্মায়, সে দিন অল্প অল্প হাওয়া ছিল, তরঙ্গ প্রবল ছিল, বাতাসের গতি উত্তরদিকে, পদ্মা একটানা, দক্ষিণবাহিনী, উজানে তরণী চোলেছে, যে দিকে স্রোত, বায়ু সে দিকে অনুকূল ছিল না, কাজে

কাজে দ্রুতগমনে বাধা হোচ্ছিল, এক ঘণ্টার পথে দুই ঘণ্টা অতীত। বজরার সারেং পাকালোক, নদীর যেখানে যেখানে চড়া, যেখানে যেখানে গভীরতা, সারেঙের সে সব জায়গা ঠিক ঠিক জানা ছিল; বেলা যখন প্রায় অবসান, সারেং সেই সময় মধ্য-স্রোত পরিত্যাগ কোরে কিনারা ধোল্লে, কিনারায় কিনারায় মৃদুগতিতে তরণী চোল্লো, দশ হাত দূরেই তীরভূমি। মধ্যস্থল দিয়া গেলে কোন তীরের কোন বস্তু স্পষ্ট নজর হয় না, কিনারা থেকে একপারের সকল বস্তুই দেখা যায়। এক এক-বার আমি তীরের দিকে চেয়ে দেখছি, লোকজন চলাচল কোচ্ছে, গরু-বাছুর চোরে বেড়াচ্ছে, এক একটা জঙ্গলের উপর বড় বড় কাক বোসে আছে, দূর থেকে দেখলে বোধ হয়, যেন এক একটা কৃষ্ণবর্ণ খাসী ; এ অঞ্চলের লোকের মুখে কাকের নাম 'কৌয়ো।' ঠাঁই ঠাঁই অনেক গাছপালাও দেখা গেল, দূরে দূরে এক একখানা বাড়ীও দেখতে পেলেম, কিন্তু ক্রমশই লোকালয় অদৃশ্য, যে স্থানে আমরা এসে পোড়লেম, সে দিকে মানুষের গতিবিধিও বড় কম। পশ্চাতে আমি চেয়ে দেখলেম, একখানিও নৌকা দেখা গেল না, দূরে দূরে ক্ষুদ্রাবয়ব এক একখানি নৌকার পালদণ্ড দেখা গেল, কিন্তু সে সকল নৌকারও গতি অন্যদিকে। এক এক জায়গায় ইলিশমাছ ধরার ডিঙ্গী ; জেলেরা স্ফূর্ত্তিতে গান কোত্তে কোত্তে মাছ ধোরে বেড়াচ্ছে, এক এক ক্ষেপে বহু মৎস্য আটক পোড়ছে, দেখতেই এক তামাসা।

আমাদের তরণী ক্রমশই অগ্রসর ; সূর্য্যও ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর ; মাছধরা নৌকাও ক্রমশঃ বিরল ; তীরভূমি জনশূন্য, আমার বোধ হলো যেন, কোন একটা প্রশস্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে আমরা ভেসে ভেসে যাচ্ছি, সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে আর একখানিও নৌকা নাই। পদ্মাবক্ষে নৌকাযোগে যাঁরা নূতন যাত্রী, বিস্তার দর্শনে, তরঙ্গ দর্শনে তাঁদের ভয় হয়, যখন আবার অন্য নৌকা দৃষ্টিগোচর হয় না তখন আরো সেই ভয়ের বৃদ্ধি হয়। সূর্য্য-দেব ডুবে যাচ্ছেন, ডুবুডুবু মূর্ত্তিতে পদ্মার জলতলে তরঙ্গে তরঙ্গে কম্পিত হোচ্ছেন, বোধ হোচ্ছে যেন, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর দিনপতি ঠাকুর পদ্মা-জলে স্নান কোত্তে নেমেছেন। ধরাতল অন্ধকার হয়ে আসছে ; যে সময়ের নাম গোধূলি, সেই সময় অতি নিকট ; আমার অন্তরে অল্প অল্প আশঙ্কার উদয়, অকারণে কেন তখন আশঙ্কা, নিজের মন নিজে জানতে পাল্লেও সে আশঙ্কার হেতুনির্দ্দেশ করা দুরূহ। এক একবার তীরের দিকে আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি, একটিও লোক নাই, সে জায়গাটায় চলাচলের রাস্তা আছে কি না, তাও ঠিক জানা গেল না, অনাবশ্যক বিবেচনায় সারেঙকেও কিছু জিজ্ঞাসা কোল্লেম না।

তরণী চোলেছে, তীরের বৃক্ষশাখাও যেন চোলেছে। হঠাৎ দেখি, এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষতলে একজন লোক। মাথায় প্রকাণ্ড একটা পাগড়ী; গায়ে বোধ হলো তুলাভরা চাপকান, হাতে একগাছা মানুষপ্রমাণ যষ্টি। লোকটা সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল, কোন দিকে তার দৃষ্টি, অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেও আমি সেটা ঠিক কোত্তে পাল্লেম না, অনুভবে বুঝলেম যেন, পদতলের মৃত্তি-কার দিকেই চেয়ে আছে, অন্যদিকে দৃষ্টি নাই। গোধূলির অল্প অল্প অন্ধ-

কার, লোকটার মুখখানা কি রকম, স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হলো না ; মুখ দৃষ্টিগোচর হলো না বটে, কিন্তু মনের ভিতর কেমন একরকম সন্দেহ দাঁড়ালো, কারণ উপস্থিত নাই, তথাপি আমি একটু একটু ভয় পেলেম।

ভয়ের সময় আপন মনে সাহস আনয়ন করা ভাল, ভয়কে অতিক্রম করা যাক না যাক, সাহসের প্রবোধে কতকটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। মনে কোল্লেম, হয় তো পথিক লোক, কিম্বা হয় তো, কোন আদালতের পেয়াদা, কিম্বা হয় তো কোন জমীদারের পাইক। এই একপ্রকার প্রবোধ। ভয়ের সময় সাধ্যানুসারে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করাও ভাল। লোকটার দিকে আর চাইলেম না, তরণীও ক্রমে ক্রমে সে জায়গা ছাড়িয়া গেল। যে বস্তু দেখবো না, যে দিকে চাইবো না মনে করা যায়, সেই বস্তু দেখতে—সেই দিকে চাইতে আগেই যেন প্রবৃত্তি আসে, সেইরকম উপদেশ দেয়, মানুষের প্রবৃত্তির এই একটা ধর্ম্ম যেন সাধারণ। পশ্চাতে ফিরে ফিরে দুই তিনবার সেই বৃক্ষের দিকে আমি চাইলেম, যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ চাইলেম, শেষে চেয়ে চেয়ে দেখি, সে লোক সেখানে আর নাই। আতঙ্ক, উপেক্ষা, তাচ্ছল্য, এই তিনের পরস্পর মল্লযুদ্ধ। সে যুদ্ধ দেখবার লোক নাই, আমার চক্ষু কি দেখেছে, আমার মন কি ভেবেছে, চক্ষুই জানলে, মনই জানলে, কাহাকেও আমি কিছু বোল্লেম না ; লোকটার কথা যেন ভুলেই গেলেম। অন্য বিষয়ে একটু চিন্তা কোরে, অমরকুমারীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা অমর ডেপুটিবাবুকে তুমি বোলেছিলে, একটা লোকের নাম চন্ডেশ্বর। আচ্ছা, চেহারা তুমি জান, পাপিষ্ঠ জটাধর ওখানে চন্ডেশ্বর নাম ধোরেছিল, যেটা ঠিক হোতে পারে, কিন্তু আর একটা লোকের নাম তুমি বোলেছ, গণেশ্বর। আচ্ছা, শোনবার ত তোমার ভুল হয় নাই ? ঠিক মনে কর দেখি, গণেশ্বর কি ঘনশ্যাম ?"

অমরকুমারী বোল্লেন, "শোনবার ভুল হয় নাই। ঠিক শুনেছি, তার নাম গণেশ্বর ; কিন্তু ভাই ! চন্ডেশ্বর এক একবার সেই লোকটাকে ঘনশ্যাম বোলে ডাকতে ডাকতে বড় বড় দাঁত দিয়ে জিব কামড়ে ফেলেছিল, তাও আমি দেখেছি। বোধ করি, সেই লোকটার দুটো নাম ;—এক নাম গণেশ্বর, এক নাম ঘনশ্যাম।"

আপন মনেই আমি বোলে উঠলেম, "ওঃ! ঘনশ্যামটাও তবে নাম ভাঁড়িয়েছে ! যে সব কাজ তারা করে, সে সব কাজে নামভাঁড়ান, বেশ লুকান, বড়ই দরকার। ঘনশ্যামটা গণেশ্বর হয়েছে, জটাধরটা চন্ডেশ্বর সেজেছে, তবে সেই —যার নাম মিয়াজান, সে লোকটাও হয় তো ঠিক নামে পরিচয় দেয় নাই ; সে লোকটাও হয় তো আর কিছু হবে। যাই হোক, জটাধরের নাম ভাঁড়ান ফস্কা গেলো ;—বিধাতার গঠনের উপর কারিকুরি খাটে না ; বানরের মত মুখ ভালুকের মত লোম, উটের মত কুঁজ, সে লোক সামান্য একটা নাম ভাঁড়িয়ে কত দিন লুকিয়ে থাকতে পারে ? চেনালোকের চক্ষে পোড়লেই সব বুজরুকী ভেঙে যাবে। থাক তারা। ইংরেজী পুলিশের দক্ষতা যদি পরীক্ষামুখে খাঁটি দাঁড়ায়, পুলিশ যদি কর্ত্তব্যজ্ঞানটা হজম না করে, তা হোলে ভন্ডলোকেরা কদাচ নামের আবরণে অব্যাহতি লাভ কোত্তে পারবে না।"

আমার মুখপানে চেয়ে অমরকুমারী বোল্লেন, 'আমিও তাই মনে করি। তিনটে লোকেই জালমানুষ সেজেছে, তিনটে লোকেই নাম ভাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে. মিয়াজানটার কথা ঠিক আমি বোলতে পাচ্ছি না, কেন না, সে চেহারার লোক পূর্ব্বে আর কোথাও আমি দেখি নাই ; কিন্তু যে লোকটার নাম গণেশ্বর, তারে আমি দেখেছি। বীরভূমে যে রাত্রে জটাধর তোমার প্রাণবিনাশের মন্ত্রণা কোরেছিল, সেই রাত্রে সেই চেহারার একটা লোক জটাধরের কাছে বোসে ছিল, তারে আমি দেখেছি।"

পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে সবিস্ময়ে আমিও বোল্লেম, "আমিও তাই বুঝেছি। গণেশ্বরটাই ঘনশ্যাম। জটাধরের কাছে বোসে ছিল, তুমি গিয়ে আমারে খবর দিলে, মেয়েমানুষ সাজিয়ে দিলে, খিড়কী দিয়ে যখন আমি পালাই. আড়ে আড়ে সদরের দিকে চেয়ে দেখেছিলেম,—জ্যোৎস্না ছিল কি না,—ঠিক তাই! জটাধর আর ঘনশ্যাম। মিয়াজানটাকে এখনো ঠিক জানা যাচ্ছে না ; ধরা পোড়্‌লেই ধরা যাবে।"

এই সব কথা আমাদের হোচ্ছে. নদীতীরে বৃক্ষতলে কিছু পূর্ব্বে যে লোকটাকে আমি দেখেছিলেম. সে লোকটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছি, অমরকুমারী তারে দেখেন নাই, মণিভূষণও দেখেন নাই. অমরকুমারী যদি দেখতেন, মিয়াজানের আকারের সঙ্গে সেই লোকের আকারের সাদৃশ্য আছে কি না, বোধ হয় ধোত্তে পাত্তেন। আমার বোধ হোচ্ছে. সেই লোকটাই মিয়াজান, তিনজনেই তারা এই অঞ্চলে আছে। মাণিকগঞ্জে আমি এসেছিলেম, ঢাকায় আমি গিয়েছিলেম. অমরকুমারীকে আমি উদ্ধার কোরেছি গোপনে গোপনে এ সব সন্ধান তারা রেখেছে, কোন দিকে আমরা যাই. সঙ্গে আমাদের কত লোক. সেই সন্ধান জানবার জন্যই সেই লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল, এই আমার অনুমান।

অমরকুমারী ভয় পাবেন, এই ভেবে সে অনুমানের কথা অমরকুমারীকে আমি বোল্লেম না ; মনের অনুমান আমার মনের ভিতরেই চাপা থাকলো। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে. আকাশে চাঁদ উঠেছে, নক্ষত্র উঠেছে. দিনমান অপেক্ষা একটু জোরে জোরে বাতাস উঠেছে, আকাশপানে আমি চেয়ে আছি। চন্দ্রমণ্ডল প্রায় ষোলকলা পূর্ণ রূপখানি কিন্তু সর্ব্বক্ষণ আমার নয়নগোচর হোচ্ছে না. এক একদিক থেকে এক একখানি তরল মেঘ এসে চাঁদের ছবিখানি ঢাকা দিয়ে ফেলছে. মেঘেরা চোলে যাচ্ছে, চাঁদ আবার একটু একটু হাসি-মুখে প্রকাশ হোচ্ছেন ; আবার মেঘ আসছে, আবার চাঁদ ঢাকছে, চোলতী মেঘের আবরণে চন্দ্রমা অধিকক্ষণ লুক্কায়িত থাকছেন না। তরল শুভ্র মেঘ যখন চন্দ্রগাত্র আচ্ছাদন করে, চন্দ্রমণ্ডল তখন পাণ্ডুবর্ণ দেখায়। আমাদের তরণী চোলেছে ; আমি দেখছি, পাণ্ডুচন্দ্র আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চোলেছেন।

একটা জায়গায় এসে বজরাখানি থামলো ; পশ্চাতের নৌকাখানিও সেইখানে নোঙ্গর করা হলো, রন্ধনাদির আয়োজন।

শশধর মেঘমুক্ত। পদ্মার বক্ষে কৌমুদীহার শোভমান ; আকাশ নীল ; চন্দ্র-নক্ষত্র সেই নীলাকাশে মণি-মরকত ; পদ্মা-সলিলের গর্ভেও মণি-মরকত-

খচিত নীলাকাশের নির্ম্মল ছায়া, তরণীর গবাক্ষপথে মুখ বাহির কোরে সেই শোভা আমি দর্শন কোত্তে লাগলেম ; শশিবিভূষিণী রজনীতে প্রকৃতির শোভা যেমন সুন্দর দেখায়, ভাবুকের মন সে সৌন্দর্যে অপরিচিত নয়, ভাবুকের ভাবে চিরবঞ্চিত থাকলেও সেই নৈশ শোভা সন্দর্শনে আমার নয়ন-মন পুলকিত হোতে লাগলো। সেইখানে আমি দেখলেম, প্রবল পদ্মার আর একটি স্রোত চন্দ্রকিরণে রজতবর্ণ ধারণ কোরে সমানবেগে দক্ষিণদিকে চোলে যাচ্ছে। ভূগোলে লেখা আছে, সে রকম নদীর নাম শাখানদী। আমাদের সারেং অবশ্য ভূগোলবিদ্যায় অপণ্ডিত, বাংলা স্কুলের ছাত্রও নয়, তথাপি তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ নদীটির নাম কি ?"

সারেং একটি গল্প বোল্লে। যে ভাষায় তার বর্ণনা, আমাদের পাঠক-মহাশয়েরা সে ভাষায় রসাস্বাদনে তৃপ্তিলাভ না কোত্তে পারেন, এই বিবেচনায় আমি আমার নিজের ভাষায় সারেঙের কথাগুলি এইখানে সুপ্রণালীক্রমে লিপিবন্ধ কোল্লেম।

এইখানে পদ্মাতীরে একটি লোকালয় ছিল ; অনেকগুলি লোকের বাস। এক বৎসর বৈশাখমাসে কি একটা যোগ হয়, সেই যোগে গঙ্গাস্নানে মহা ফল। অগ্রে যারা সে সংবাদ পেয়েছিল, যে দেশে গঙ্গা আছেন, সেই দেশে তারা গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল ; পূর্ব্বে যারা সংবাদ পায় নাই, পদ্মাকে গঙ্গার ভগ্নী-বিশ্বাসে পদ্মাস্নানেই তারা যোগফল লাভ করবার আশা করে। গ্রামে একঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর ধর্ম্মপত্নী সেই যোগে পদ্মাস্নানে অভিলাষিণী হন। বাড়ীতে একজন দাসী ছিল, তার নাম গৌরী। প্রভাতের গৃহকার্যে গৌরীকে নিযুক্ত রেখে ব্রাহ্মণী শীঘ্র শীঘ্র পদ্মাস্নানে আসেন। বেলা চারি দণ্ডের মধ্যে যোগ ছিল, গৌরীও স্নানার্থিনী, গৃহকর্ম্মে তার বেলা হোতে লাগলো, গৌরী বড় ব্যাকুলা, এক হস্তে গৃহমার্জ্জনী-ঝাঁটা, অপর হস্তে গোময়ের হাঁড়ী, সেই অবস্থাতেই গৌরী পদ্মাস্নানে ছুটলো ; পথে একটি ফুলগাছে অনেকগুলি ফুল ফুটেছিল, একটা কচুপাতা ছিঁড়ে নিয়ে গৌরী গুটিকতক ফুল তুলে নিলে। আবার ছুট! সকলেই জানেন, পদ্মায় মধ্যে মধ্যে মহা ভাঙ্গন হয় ; গৌরী আসছে :—আসতে আসতে দেখলে, পথের মাঝখানে শুষ্ক ভূমিতে একটা চিড়,—প্রখর সূর্যতপে মাটি যেন ফেটে গিয়েছে, সেই রকমের একটা চিড় ;—সেই ফাটোলে অল্প অল্প জল। ওদিকে সূর্যদেব অনেক দূরে উঠে এসেছেন, বেলা চারি দণ্ড হবার দেরী নাই, ততক্ষণের মধ্যে পদ্মার স্রোত প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, গৌরী এইরূপ বিবেচনা কোল্লে। যোগ ফুরায়, কি হয়, সাত পাঁচ ভেবে গৌরী সেই ফাটোলের ধারেই বোসে গেল ; ঝাড়ু, হাঁড়ি সেইখানে রেখে, কচুপাতার ফুলগুলিতে অঞ্জলি পূর্ণ কোরে সেই ফাটোলের জলেই পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কোল্লে। অর্পণমাত্রেই ফাটোলের বিস্তার ;—জলস্রোত দক্ষিণদিকে ছুটলো ; গৌরী কেঁদে উঠলো ; "নিলে না মা ! আমার পূজা নিলে না মা ! দাসী বোলে অবহেলা কোরে চোলে যাচ্ছো ? আমি তোমায় ছাড়বো না, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।" স্রোত ক্রমশই দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ; ঝাড়ু, হাঁড়ি তুলে নিয়ে গৌরীও সেই স্রোতের

ধারে ধারে প্রধাবিতা ; স্রোত ক্রমশই বিস্তৃত, ক্রমশই বেগবান ; যেখানে ফাটোল ধোরেছিল, তার আধ ক্রোশ পর্যন্ত জলশায়ী হয়ে গেল ; ধারে ধারে গৌরী ছুটেছে ; নূতন জলস্রোত যতই ছোটে, গৌরীও ততই ছোটে ; জল দাঁড়ায় না ; হু হু শব্দে দক্ষিণদিকে গতি ; দেখতে দেখতে সেই স্রোত মহা বেগবতী নদী। গৌরীর হাতে ঝাঁটা ছিল, স্রোতের জলে নিক্ষেপ কোল্লে, পদ্মা পদ্মা বোলে ডাকতে লাগলো, উভরায় চীৎকার ; পদ্মা উত্তর দিলেন না, গতিও থামলো না, সমানবেগে ছুট ; গৌরীরও সমানবেগে ছুট। পূর্ব্ব-দেশের লোকেরা আমাদের হাঁড়িকে পাতিল বলে ; খানিক দূর গিয়ে গৌরী তার হাতের সেই গোলা-হাঁড়িটা সেই জলে ফেলে দিলে ; স্রোত ছুটেছে, গৌরীও ছুটেছে ; গৌরী আর পারে না ;—পাল্লেনা ; কেবল মা মা, পদ্মা পদ্মা, বোলে উচ্চরবে ডাক দিতে লাগলো ;—ডাকেও কিছু হলো না ;—গৌরী শেষকালে মা মা বোলতে বোলতে সেই স্রোতের জলে ঝাঁপ দিলে ;—গৌরীকে কোলে কোরে পদ্মাবতী সমুদ্রের দিকে ছুটলেন। গৌরীর নামে পদ্মার সেই শাখানদীর নাম গৌরী-নদী ;—তীরবর্ত্তী গ্রামবাসীরা এই গৌরী-নদীর নাম দিয়েছে, গড়ুই নদী ;—ইংরেজরা নাম দিয়েছেন গোরাই। গৌরী যেখানে ঝাঁটা ফেলে দিয়েছিল, সে স্থানের নাম ঝাঁটাদহ, যে স্থানে পাতিল (হাঁড়ি) ফেলে দিয়েছিল, সে স্থানের নাম পাতিলদহ, যে স্থানে মা মা বোলে ডাক দিয়ে-ছিল, সে স্থানের নাম ডাকদহ। সেই ডাকদহের বর্ত্তমান নাম কুষ্ঠিয়া। পদ্মা-নদীতে যাঁদের গতিবিধি আছে, তাঁরা সকলেই জানেন, কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি, পাংসা প্রভৃতি স্থানের নীচে দিয়ে যে নির্ম্মলসলিলা নবনদী প্রবাহিতা, সেই নদীর নাম গড়ুই নদী ;—গৌরী নামের অপভ্রংশে গড়ুই নামের উৎপত্তি।

পদ্মার এক শাখানদী গৌরী। সারেঙের মুখে গৌরী নদীর উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কোরে আমরা চমৎকৃত হোলেম। ওদিকে আমাদের রন্ধনকার্য সমাপ্ত হলো, আমরা আহার কোল্লেম। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত। আমার ইচ্ছা ছিল, সেইখানেই সে রাত্রে নঙ্গর ফেলে প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা, কিন্তু সারেঙ আমার সে অনুরোধ রক্ষা কোল্লে না। সারেঙ বোল্লে, "দিব্য চাঁদনী রাত্রি, ঠান্ডায় ঠান্ডায় বেশ যাওয়া যাবে ; এই বোলেই তরণী খুলে দিলো। তখনো জোর হাওয়া, তখনো পদ্মায় তরঙ্গ, তখনো আকাশে অল্প অল্প মেঘ, তখনো এক একবার চন্দ্রচ্ছাতি মেঘাবৃত। তরণী চোল্লো, কতদূর চোলে গেল, কেবল আমাদের তরণীই চোলেছে, যতদূর চেয়ে দেখি, অগ্রে পশ্চাতে আর একখানি তরণীও দেখতে পাই না। সারেং আমাদের তরণীখানি ধারে ধারেই নিয়ে যাচ্ছে অল্প দূরেই ডাঙ্গা।

সময় প্রায় নিশীথ। সেই সময় পশ্চাদ্দিকে আমি চেয়ে দেখি, দূরে এক-খানা নৌকা আসছে, যাত্রীনৌকা। অন্য নৌকা, নির্ণয় কোত্তে পাল্লেম না, খানিকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে থাকলেম, ক্রমশই সেই নৌকা আমাদের নৌকার দিকে অগ্রসর। আমাদের নৌকা অপেক্ষা সে নৌকার গতি দ্রুত, দেখতে দেখতে নিকট-বর্ত্তী তখন আমি দেখলেম, সে নৌকায় অনেক দাঁড় ; ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে দাঁড়

পোড়ছে, নৌকাখানা যেন তীরবেগে, ছুটেছে। সে ধরনের নৌকা পূর্ব্বে আর কখন আমি দেখি নাই ; কিসের নৌকা, দেখবার জন্য কৌতূহল জন্মিল ; সারেঙকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম. সারেঙ উত্তর কোল্লে. "ছীপ নৌকা ; শিকারী লোকেরা ঐ রকম নৌকায় বড় বড় নদীতে বেড়ায়।"

কেবল ঐ পর্য্যন্তই আমি জানতে পাল্লেম। বড় বড় নদীতে শিকারী নৌকা, বিচরণ করে। নদীতে কি রকম শিকার পায়, সেটা আমি হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পাল্লেম না। ছীপনৌকা অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের নৌকার নিকটবর্ত্তী হলো, দেখলেম, সেই ছীপের একজন লোক ক্ষুদ্র একটা লণ্ঠন হাতে কোরে ইতস্ততঃ একবার সঞ্চালন কোল্লে. পরক্ষণেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দে নৌকার ভিতর থেকে বন্দুকের আওয়াজ হলো, শব্দে আমার বুক কেঁপে উঠলো। জলের উপর বন্দুকের আওয়াজ হোলে শব্দ আরো বেশী হয়, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি থাকে ; জলে স্থলে, উভয় স্থানে প্রতিধ্বনি হয়। অজ্ঞাত কারণে আমার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হলো। না জানি, রাত্রিকালে কি বিপদ ঘটে. ওখানা যদি ডাকাতের নৌকা হয়, ডাকাতেরা যদি আমাদের নৌকায় প্রবেশ করে, কি উপায়ে অমরকুমারীকে রক্ষা কোরবো, সেই ভাবনাতেই আমার ভয়। ছীপ-নৌকা তীরবেগে ছুটে আসছে ; আর বিশ হাত অগ্রসর হোলেই আমাদের নৌকার উপরে পোড়বে। তখন আমাদের কি উপায় হবে ? আমাদের বিপদ ঘটবার কোন হেতু আছে, সারেঙ সেটা জানতো না, দাঁড়ী-মাঝীরাও জানতো না, সুতরাং তারা ভয় পেলো না ; পূর্ব্বাপর ঘটনা স্মরণ কোরে আমার কিন্তু ভয় হলো। পুনর্ব্বার সেই শিকারী নৌকায় বন্দুকের আওয়াজ। আমি নিরস্ত্র ছিলেম না, আমার সঙ্গে পিস্তল ছিল, ছীপের দিকে চেয়ে পিস্তল বাগিয়ে আমি সতর্ক থাকলেম।

ছীপখানা প্রায় ৮০ হাত দীর্ঘ। বহর কম। কত লোক সেই ছীপে ছিল, দেখা গেল না. কোন দেশের লোক. তাও জানা গেল না, ছীপের দুই মুখে দুগাছা দীর্ঘ দীর্ঘ লাঠি, লাঠির মাথায় নিশান উড্ডীয়মান, সম্মুখের নিশান রক্তবর্ণ, পশ্চাতের নিশান কৃষ্ণবর্ণ। ছীপ আমাদের নিকটবর্ত্তী হোলে সারেঙকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এই কি শিকারী নৌকা ?" সারেঙ তখন একটু ইতস্ততঃ কোরে যেন একটু কুণ্ঠিতভাবে উত্তর কোল্লে. "ওদিকে আপ-নারা চাইবেন না, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথাও কবেন না, রাত্রিকালে এ রকম ছীপ-নৌকায় কত লোক কত রকম মতলবে ফেরে, বুঝে উঠা যায় না।"

সারেঙের কথায় আমার আশংকা হলো। নিশান দর্শন কোরে আমি মনে কোচ্ছিলেম, হয় তো পুলিশের নৌকা হবে ; সারেঙ বোল্লে, মতলবের কথা। কারা কি মতলবে রাত্রিকালে জলে জলে বেড়ায়, সে অঞ্চলের লোকেরা সে তত্ত্ব জানতে পারে, আমাদের জানা অসম্ভব। ছীপের দিকে আমি চেয়ে থাকলেম। বায়ুবেগে অতিক্রম কোরে নক্ষত্রবেগে ছীপখানা ছুটে আসছে, দেখতে দেখতে আমাদের তরণীর কাছে এসে পোড়লো, গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হয় হয় এইরূপ গতিক ; একদৃষ্টে সেই দিকে আমি চেয়ে আছি ; ঠেকাঠেকি হলো না। সাঁ সাঁ কোরে ছীপখানা আমাদের বজরা ছাড়িয়ে প্রায়

দু-শ হাত দূরে বেরিয়ে গেল। যে প্রকার দ্রুতগতি, তাতে আমি মনে কোল্লেম, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের চক্ষের অন্তর হয়ে যাবে, ভয়ের কারণ থাকবে না।

হরিহরবাবুর প্রেরিত পাইকেরা আমাদের পশ্চাতের নৌকায় ছিল। ছীপ-খানা বেরিয়ে যাবার পর তারা পরস্পর চুপি চুপি কি বলাবলি কোরে আমাদের বজরায় এসে উঠলো। তাদের মুখের ভাব দেখে আমি বুঝলেম, তারা যেন কোন রকম অমঙ্গলের আশঙ্কা কোচ্ছিল। অমরকুমারীকে সাবধানে রাখ-বার জন্য দাসী-দুজনকে আর মণিভূষণকে আমি সতর্ক কোরে দিলেম। আমি যে দিকে লক্ষ্য রাখছিলেম, মণিভূষণ তা দেখতে পান নাই; অমরকুমারীও কিছু জানতে পারেন নাই। বজরার কামরা মধ্যে তাঁরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত। ছীপের দিকে আমি চেয়ে আছি, অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে, নদীর স্রোত অপেক্ষাও অধিকবেগে ছীপখানা চোলেছে। পুনর্ব্বার গুড়ুম গুড়ুম শব্দে সেই ছীপ নৌকায় বন্দুকের আওয়াজ।

মণিভূষণ ইতিপূর্ব্বে সারেঙের কথা শুনেছিলেন; অমরকুমারীও শুনে-ছিলেন, সেই কথাই তাঁদের মনে ছিল; শিকারী নৌকা, শিকারীরা বন্দু-কের আওয়াজ করে, তাই তাঁরা কোন রকম আতঙ্ক অনুভব কোল্লেন না। না করাই আমার ইচ্ছা। বন্দুকধ্বনি শ্রবণ কোরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমি সেই অল্প-দৃষ্ট ছীপের দিকে চেয়ে থাকলেম, গতির ভাবে বুঝলেম, ফিরেছে, যে দিকে যাচ্ছিল, সে দিকে আর গেল না, আমাদের নৌকার দিকেই আসতে লাগলো। এবার কিন্তু গতি তত দ্রুত নয়, কিঞ্চিৎ শ্লথগতি, কিঞ্চিৎ ধীরে ধীরে গতি। যদিও ছীপখানা তখন অনেক দূরে, তথাপি শঙ্কাসূচক মৃদু-স্বরে আমাদের লক্ষ্য কোরে সারেঙ বোল্লে, "সাবধান!" আমিও প্রতিধ্বনি কোল্লেম, "সাবধান!" পাইকেরা পূর্ব্বেই হয় তো জানতে পেরেছিল; গতিক বড় ভাল নয়; তাদের মধ্যে যে লোকটি সর্দ্দার, সারেঙকে সম্বোধন কোরে যথাসম্ভব অনুচ্চস্বরে সেই লোকটি বোল্লে, "কিনারায় ধর, নোঙ্গর কর।"

সর্দ্দারের কথায় সারেঙের নির্ভীকতায় যেন আঘাত পেলে। কিনারায় ধরা অথবা নঙ্গর করা তার মত হলো না; বজরা এতক্ষণ যে ভাবে চোলছিল, তদপেক্ষা কিছু মন্দবেগে চালনের নিমিত্ত চালকগণকে অনুমতি দিল। পাই-কেরা ব্যতিব্যস্ত। তাদের চাঞ্চল্য দর্শনে আমিও ক্ষেত্রকর্ম্ম-বিধানের অবসর প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে থাকলেম। যে দিকে স্ত্রীলোকেরা, সেই দিকে মণি-ভূষণকে রেখে আমি সম্মুখভাগে দরজা বন্ধ কোরে বহির্দ্দিকে দাঁড়ালেম।

আর সময় নাই। ছীপখানা একবার মৃদুগতি ধারণ কোরেছিল, পুনর্ব্বার দ্রুতগতি। আমাদের বজরা চোলেছে, ছীপখানাও চোলেছে, অবিলম্বেই কাছা-কাছি। আমরা আছি দশ হাত দূরে পশ্চাতে, ছীপ আছে দশ হাত দূরে অগ্রে; এই সময় এক ঘূর্ণন। সচরাচর সোজা পথে যেতে যেতে পাড়ি দিবার সময় নৌকা যেমন আড়ে আড়ে খেয়া দিবার জন্য ঘুরে যায়, ছীপখানা সেই রকমে এক ঘূর্ণনে ঘুরে এসে আড়ে আড়ে দাঁড়ালো। বলা হয়েছে, ছীপখানা প্রায় ৮০ হাত লম্বা, নদীর এক কিনারা থেকে জলভাগের ৮০ হাত পর্য্যন্ত

আটক পোড়ে গেল। বোধ হলো যেন, অর্দ্ধপদ্মায় সেতুবন্ধ। আমাদের বজরা আর অগ্রসর হবার পথ পেলো না, ৮০ হাত ঘুরে আবার স্রোতোপথে উপস্থিত হবার অগ্রেই ছীপের লোকের আক্রমণে কোথায় আমরা তলিয়ে যাব, ঠাঁই-কিনারা থাকবে না। বিপদ আসন্ন। ছীপের লোকেরা আমাদের উপরেই লক্ষ্য কোরে আসছে। সারেং বোলেছিল, শিকারী নৌকা : আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে একপ্রকার সেই কথাই ঠিক হয়। শিকারী নৌকাই বটে। আমরাই সেই শিকারীদের শিকার !

চিন্তার অবসর নাই, বাক্যের অবসর নাই ; ছীপখানা সেই ভাবে সোরে সোরে এসে আমাদের বজরার মুখের কাছে লাগলো। গোলন্দাজী জাহাজের ছিদ্রপথে যেমন বিভীষণ তোপধ্বনি হয়, জলদগর্জ্জনের ন্যায় সেই ছীপে ঘন ঘন সেই প্রকার বন্দুকধ্বনি ! রণতরীর সঙ্গে রণতরীর যুদ্ধ ; সমুদ্রপথে সে যুদ্ধ যাঁরা দর্শন কোরেছেন, তুলনাকে একটু ছোট কোরে ভেবে তাঁরা এখন মনে করুন, পদ্মাবক্ষে সেইরূপ জলযুদ্ধের উপক্রম ! আমাদের তরণীখানি রণতরণী নয়, তাদৃশ যোদ্ধাপতিও উপস্থিত নাই, মহাসংকট উপস্থিত। ত্রাহি মধুসূদন !

ঝুপ ঝুপ কোরে ৮।১০ জন অস্ত্রধারী লোক ছীপের উপর থেকে আমাদের বজরার উপর লাফিয়ে পোড়লো। ডাকাতী করবার অগ্রে মফস্বলের ডাকাতেরা বিকট চীৎকারে যে প্রকার কুকী দেয়, সেই সকল লোক সেই প্রকারে বিকট চীৎকার আরম্ভ কোল্লে, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার-বিঘূর্ণন। ছীপে কত লোক ছিল, অনুমান কোত্তে না পেরেও আমাদের পাই-কেরা মালসাট মেরে দাঁড়ালো ; আক্রমণকারীরা দশজন, পাইকেরা আটজন। রাত্রিকালে পদ্মাবক্ষে বিপদ হয়, পাইকেরা সেটা জানতো ; তারা প্রস্তুত ছিল, কেবল লাঠিমাত্র ভরসা নয়, ছোট ছোট তলোয়ার, ভুজালি, ছোট ছোট বন্দুক তারা সঙ্গে এনেছিল ; মহা বিপদের সম্ভাবনা বুঝে, আমাদের দাঁড়ী-মাঝীরাও তরণীচালন পরিত্যাগ কোরে পাইকের দলে যোগ দিলে ; আমি তখন কি করি পকেটে পিস্তল ছিল, পিস্তল বাগিয়ে যোদ্ধাদলের পশ্চাতে দাঁড়ালেম। ঘোরতর যুদ্ধ। ছীপখানা ক্রমশঃ ঘুরে ঘুরে আমাদের বজরাকে প্রদক্ষিণ কোত্তে লাগলো। দুর্গানাম স্মরণ কোরে, সাহসে ভর কোরে, দুই তিন বার আমি পিস্তলের আওয়াজ কোল্লেম। কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না, সুতরাং সে আও-য়াজে কিছুই ফল হলো না। তরণীমধ্যে স্ত্রীলোক তিনটার অস্ফুট আর্ত্ত-নাদ ! মণিভূষণ তাঁদের সান্ত্বনা কোত্তে লাগলেন ; "ভয় নাই, ভয় নাই" বোলে আমিও বাহির থেকে সাধ্যমত অভয় দিতে লাগলেম ; কে কার কথা শুনে, কে কারে অভয় দেয়, কে কারে সান্ত্বনা করে, মহা কলরবে প্রকৃতি প্রতি-ধ্বনিত ! তলোয়ারে তলোয়ারে যুদ্ধ, বন্দুকে বন্দুকে যুদ্ধ ! দুই পক্ষে পাঁচ সাত জন অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ! পদ্মার জল অনেক দূর পর্যন্ত রক্তিম ! এই অবসরে ছীপারোহী আরো জনকতক লোক আমাদের বজরায় এসে উঠলো ; বহুলোকের পদভরে বজরাখানি যেন ডুবুডুবু হয়ে দোলা খেতে লাগলো ! আমার পিস্তলের গুলীবারুদ নিঃশেষিত ! একজনের হস্তের একখানা তলো-

য়ার ছিনিয়ে নিয়ে আমি বৈরীদলের সম্মুখীন হোলেম ; খেলাঘরের ছেলেরা যেমন ছোট ছোট ছুরী দিয়ে কলাগাছ কাটে বলবান দস্যুর সম্মুখে আমার অস্ত্রধারণও সেইরূপ কলাগাছ-কাটার প্রয়াসের ন্যায় ব্যর্থ হয়ে গেল ; তবু আমি ইতস্ততঃ তলোয়ার ঘুরিয়ে দুই একজন বিপক্ষের ঊরুতে বাহুতে রক্ত-পাত কোরে দিলেম। পাইকেরা সুশিক্ষিত মল্ল ; তলোয়ার-খেলাতেও বিল-ক্ষণ নিপুণ, তারা আমার অঙ্গরক্ষক, তারা আমারে পশ্চাদ্দিকে সোরিয়ে সোরিয়ে আপনারাই রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ কোত্তে লাগলো ; তাদের আবরণে আমার গাত্রে কোন রকম আঘাত লাগলো না, কিন্তু রণরক্তে আমার অঙ্গবস্ত্র ভিজে গেল।

যুদ্ধভঙ্গ ! পাইকপক্ষেও বন্দুক ছিল ; কিন্তু তলোয়ারের যুদ্ধেই তারা বৈরী-দলকে বিপর্যস্ত কোরে তুল্লে। গোলন্দাজেরা যখন বন্দুক লক্ষ্য করে, তখন তারা নীচু হয়ে গুঁড়ি মেরে বসে, মাথার উপর দিয়ে গুলী চোলে যায়। বন্দুকধারীরা যখন নীচুদিকে গুলী করে, তখন তারা লম্ফ দিয়ে কুলালচক্রের ন্যায় ঘুরে ঘুরে ঠিক যেন শূন্যপথে ক্রীড়া করে ; পায়ের, নীচে দিয়ে গুলী চোলে যায়। চমৎকার শিক্ষা। আমাদের দাঁড়ী-মাঝীরাও সে বিপদে অল্প সাহস প্রকাশ কোল্লে না। আমারে আক্রমণ করা, তরণী মধ্যে প্রবেশ কোরে অমর-কুমারীকে হরণ করা দস্যুদলের আসল মতলব ; অর্থলোভেই এই নৈশযুদ্ধে তারা প্রবৃত্ত হয় নাই ; সেটি আমি বেশ বুঝলেম। প্রতিপক্ষকে ঠেলে ঠেলে তারা কেবল আমার দিকেই রুকে রুকে আসে, তরণীর খড়খড়ী ভেঙে ভিতরে প্রবেশ কোত্তে চায় ; আমার পক্ষের লোকেরা বিশেষ বীরত্ব দেখিয়ে পদে পদেই তাদের গতি অবরোধ করে ; বিপক্ষেরা কিছুতেই অভিসন্ধি সিদ্ধ কোত্তে সমর্থ হয় না। আমাদের পাইকেরা একপ্রকার ব্যূহ-রচনা জানে ; অল্পলোক হোলেও দিব্য একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ-রচনা কোরেছিল ; বোম্বেটেরা বহু-চেষ্টা কোরেও সে ব্যূহভেদ কোত্তে পাল্লে না।

আমি স্থির কোল্লেম, বোম্বেটে। জলপথে যারা ডাকাতী করে, জলপথে যারা মানুষ মারে, তারাই সব বোম্বেটে। আমার লোকেরা আমারে ঢেকে ঢেকে রাখছে। আকাশের তরল মেঘমালা তখন অন্তর হয়ে গিয়েছে, সুধাকর তখন মেঘমুক্ত হয়ে সমুজ্জ্বল সুধাকর পরিবর্ষণ কোচ্ছেন, রক্ষক লোকগুলির বাহু-পার্শ্ব দিয়ে বোম্বেটে লোকের চেহারাগুলো আমি উঁকি মেরে মেরে দেখছি ; ভয়ঙ্কর চেহারা ! কতক লোকের ফিরিঙ্গী সজ্জা, মুখে ফিরিঙ্গী দাড়ী, গলায় ফিরিঙ্গী বগলোস, মাথায় ফিরিঙ্গী টোপ ; কতক লোকের মাথায় বড় বড় পাগড়ী, গালে গাল-পাট্টা, গায়ে বুকবন্দ চাপকান, চাপকানের উপর লাল কাপড়ের কোমরবন্ধ ; কতক লোকের মাথা নেড়া, মুখে কালী, কালীর উপর চুনের গোঁফ, চুণের ভ্রূ, গা আদুড়, হিন্দুস্থানী ধরনের মালকোঁচার উপর সবুজ কাপড়ের কোমরবন্ধ, কতক লোক কাফ্রিদের মতন কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় সেই রকম কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, নীলবর্ণ ইজেরপরা ; বুঝা গেল ছদ্মবেশ ; যেহেতু, ঠোঁটে আর নাকে কাফ্রি লক্ষণের অভাব।

নদীতীরে বৃক্ষতলে যে লোকটাকে আমি দেখেছিলেম, সেই দীর্ঘকার লোকটা সেই দলের মধ্যে ছিল, তুলাভরা চাপকানে আর প্রকাণ্ড পাগড়ীতে আমি তারে সনাক্ত কোত্তে পাল্লেম, কে যে কি, কারা যে তারা, কেন যে আমাদের উপর তাদের আক্রোশ, তা আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। একবার মনে কোরেছিলেম, চণ্ডেশ্বরের চক্র ; অমরকুমারীকে আমি উদ্ধার কোরেছি, গোপনে গোপনে জানতে পেরে, সেই রাগে চণ্ডেশ্বর এই বোম্বেটের দল ভাড়া কোরে এনেছে, কিন্তু ফিরিঙ্গী, কাফ্রী, পেশোয়ারী, এ সব লোক কোথাকার? এ সব লোক চণ্ডেশ্বরের আয়ত্তাধীন হবে, এমন তো আমি বিশ্বাস কোত্তে পাল্লেম না। তুলাভরা চাপকানধারী বৃহৎ পাগড়ীওয়ালা বৃহদাকার লোকটাই এই দস্যুদলের দলপতি, সে লোকটা কে? আকারে বুঝেছিলেম পঞ্জাবী, কিন্তু নিকটে মুখের চেহারা দেখে, পূর্ব্বদেশবাসী বাঙালী বোলেই বোধ হলো ; চাপকান-পাগড়ীতে বিদেশী সেজে এই বোম্বেটে-দলের মুরুব্বী হয়েছে। এই লোকটাই হয় তো এখানে চণ্ডেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক, শেষকালে এই সিদ্ধান্তই মনে এলো।

আমার তখন সিদ্ধান্ত করবার সময় নয় ; তরণীর উপর উভয় দলে মল্লযুদ্ধ বেধে গিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ কোরে উভয় দলের হাতা-হাতি, মুষ্টামুষ্টি, লাথা-লাথি, হুড়া-হুড়ি, জড়া-জড়ি, মাথা-ঠোকা-ঠুকি আরম্ভ হয়েছে। জনকতক লোক রক্তবমি কোত্তে কোত্তে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দুই একটা লোকের চক্ষু ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। একটা লোক দাঁতকপাটি লেগে মুর্চ্ছিত হয়ে পোড়েছে। তখনো যুদ্ধের বিরাম হোচ্ছে না, ছীপের উপর থেকে তখনো মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ হোচ্ছে, সে সব কেবল ফাঁকা আওয়াজ, এইরূপ আমি স্থির কোল্লেম, কেন না, এক জায়গায় ঘরদল পরদল উভয়দল জমা, বন্দুকের গুলীতে কোন দলের কোন লোকের প্রাণ যাবে, বন্দুকওয়ালারা তা জানে না ; শুধু কেবল আমাদের ভয় দেখাবার জন্যই ফাঁকা আওয়াজ কোচ্ছিল, বন্দুকে গোলাগুলী ছিল না। থাকুক আর নাই থাকুক, অমরকুমারীর ক্রন্দনে আমার প্রাণ ছটফট কোচ্ছিল। বন্দুকের ধ্বনিতে আমার কিছুই ভয় ছিল না।

ছীপের ভিতর ভীষণ চীৎকারধ্বনি। ভীষণগর্জ্জনে চার পাঁচজনে একসঙ্গেই চীৎকার কোরে বোলে উঠলো, "ডুবিয়ে দে! ডুবিয়ে দে!"

এতক্ষণ বরং একটু ভরসা ছিল, ঐরূপ গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ কোরে আমার প্রাণ উড়ে গেল! ক্ষণেকের মধ্যে আশা-ভরসা ফুরালো! বোম্বেটেরা দলে পুরু, অবহেলেই আমাদের বজরাখানি ডুবিয়ে দিতে পারে। এইবারেই প্রাণ গেল! অনেক বিপদেই অনেকবার পোড়েছি, ভগবান রক্ষা কোরেছেন, এবার এই পদ্মাবক্ষে বোম্বেটের হাতেই প্রাণ গেল! পদ্মার কাছে আমরা কোন অপরাধ করি নাই, পদ্মার জলে প্রাণ যায়! পদ্মাগর্ভে আজ আমাদের জীবন্তেই সমাধি হয়! মা পদ্মা! এই কি তোমার মনে ছিল? বিদেশী নিরপরাধী বালক আমি, বিদেশিনী নিরপরাধিনী বালিকা অমরকুমারী ; মা পদ্মা! তুমি কি এই রাত্রে বিষম বদন-ব্যাদান কোরে আমাদের দুটিকে গ্রাস কোরে ফেলবে? এতগুলি প্রাণী তোমার গর্ভে জীবন বিসর্জ্জন দিবে, নরনারী-ভক্ষণে তোমার অভ্যাস

আছে, জীবনগ্রহণে তুমি মায়া-দয়া রাখ না, কিন্তু মা! তুমি আমাদের মা গঙ্গার সহোদরা ; গঙ্গা আমাদের পতিতপাবনী দয়াময়ী, তুমিও দয়াময়ী, তুমি আমাদের প্রতি দয়া কর!"

মনে মনে এই মন্ত্রে আমি পদ্মাবতীর স্তব কোল্লেম ; পদ্মার প্রবল স্রোত আমার স্তবে কর্ণপাত না কোরে সাগরসঙ্গমে সমভাবে ছুটে চোল্লো ; ছীপের লোকেরা আবার পূর্ব্বরূপ উৎকট-স্বরে সঙ্গীলোকগুলাকে হুকুম দিতে লাগলো, "ডুবিয়ে দে! ডুবিয়ে দে! ডুবিয়ে দে!"

ভয় দেখাবার হুকুম নয়। সত্যই তারা মোরিয়া হয়েছে ; সত্যই বজরাখানি ডুবিয়ে দিবে। আর আমাদের অব্যাহতি নাই! যারা সন্তরণ জানে, তারা পরিত্রাণ পেতে পারে। আমি সন্তরণ জানি, পদ্মাস্রোতে সন্তরণে প্রাণরক্ষা যদি সম্ভব হয়, আমি পরিত্রাণ পেলেও পেতে পারি, কিন্তু স্বর্ণপ্রতিমা অমরকুমারীকে পদ্মার জলে বিসর্জ্জন দিয়ে সংসারে আমি বেঁচে থাকবো, তাও কি কখনো হয়? আর দুটি স্ত্রীলোক অমরকুমারীর সহচরী হয়ে এসেছে, তাদের কি অপরাধ? বোলতে গেলে আমিই তাদের রক্ষক, দৈববিপাকে নয়, আমারই কারণে দস্যুপরাক্রমে তরণী ডুবছে, সেই দুটি স্ত্রীলোক জলে ডুবে প্রাণ হারাবে, আমি স্ত্রীহত্যার পাতকী হব, এ প্রাণে আমার কাজ কি? ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মা দুর্গা! ত্রাহি সর্ব্বমঙ্গলে! দীনের প্রতি সদয় হয়ে এই বিপদে রক্ষা কর!"

ঘোর বিপদে কাতর হয়ে আবার আমি বিপদ-বারণ মধুসূদনের স্তব কোল্লেম, বিপদ-বারিণী ব্রহ্মময়ীকে ডাকলেম ; আবার আমার কর্ণে সেই ভীমগর্জ্জন প্রবেশ কোল্লে,—"ডুবিয়ে দে! ডুবিয়ে দে! ডুবিয়ে দে!"

বার বার তিনবার! আর বিলম্ব নাই। মণিভূষণের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে আমি বোলে উঠলেম, "ভাই মণিভূষণ! ভাই! অমরকুমারী থাকলেন, অমরকুমারীকে রক্ষা কোরো! বহরমপুরের মোকদ্দমা আমি দেখতে পেলেম না ; দীনবন্ধুবাবুকে আমার এই শেষবার্ত্তা জানিও ; প্রাণ যায়! আমার জন্য এতগুলি লোকের প্রাণ যায়! ভাই! আমি যদি আগে মরি, তোমরা নিরাপদে থাকবে ; মঙ্গলময় মহেশ্বর তোমাদের নিরাপদে রাখবেন। আমি কাহারো শত্রু নই, আমার শত্রু এতো! আমার জন্য বোম্বেটেরা পদ্মার অগাধজলে এ তরণী ডুবাবে! না ভাই! তা আমি দেখবো না! পৃথিবীতে আমি থাকবো না! অমরকুমারীকে তুমি দেখো! অমরকুমারীকে তুমি রক্ষা কোরো! জন্মের মত আমি বিদায় হোলেম!"

কথাগুলি আমি বোল্লেম, কিন্তু চক্ষে আমার এক বিন্দুও জল এলো না। লম্ফ দিয়ে বজরার ছাদের উপর আমি উঠলেম। যে দিকে বেশী জল, সেই দিকে ঝাঁপ দিয়ে পোড়বো, পদ্মার সঙ্গে মহাসাগরে ভেসে যাব, দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলে, সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ করবার উদযোগ কোচ্ছি, আমার লোকেরা আমারে নিবারণ করবার নিমিত্ত কাতরে টানাটানি কোচ্ছে, এমন সময় এক দৈব অনুগ্রহ।

যে দিক থেকে আমরা আসছি, সেই দিকে অকস্মাৎ ঘন ঘন গোটাকতক বন্দুকের ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। সকলের কর্ণ সেই দিকে স্থির, সকলের চক্ষু সেই দিকে চকিত। আমি তখন একপ্রকার মোরিয়া, জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত, আমার আর তখন ভাল-মন্দ ভাবনা করবার আবশ্যক ছিল না, তথাপি আমি সেই দিকে একবার চাইলেম। চক্ষু তখন সে কার্যে আমার কোন উপকারে এলো না, কিছুই দেখা গেল না; পদ্মার জলরাশি চন্দ্রালোকে যেমন জলময় প্রান্তরের ন্যায় ধূ ধূ কোচ্ছিল, চক্ষু আমার সেই রূপ অবলোকন কোল্লে। বন্দুকধ্বনি আমার কর্ণে এসেছিল, শরতের জলদ-গর্জ্জনের ন্যায় গুড়ু গুড়ু নাদে পুনর্ব্বার সেই প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের গম্ভীরধ্বনি; জলে স্থলে প্রতি-ধ্বনি। শব্দ কেবল কর্ণে প্রবেশ কোচ্ছে, কোথা থেকে শব্দ আসছে, তা কিছু দেখা যাচ্ছে না। চেয়ে আছি, খানিক পরে দেখলেম, সাধারণ খেয়া-নৌকার ন্যায় একখানি তরণী বায়ুভরে ছুটে আসছে, সেই তরণী থেকেই বন্দুকের আও-য়াজ আসছে। দেখতে দেখতে সেই নৌকা নিকটবর্ত্তী, আর একখানা বৃহৎ ছীপ। দূর থেকে ক্ষুদ্র নৌকা মনে হয়েছিল, তা নয়, বৃহৎ ছীপ। যে ছীপের উপর বোম্বেটেরা আমাদের প্রাণের উপর আক্রমণ কোচ্ছিল, সেই ছীপের পূর্ব্ব-গতি অপেক্ষা আগন্তুক ছীপের গতিবেগ আরো অধিক দ্রুত; সে ছীপেরও দুইদিকে দুই নিশান; সে দুই নিশান ঘোর রক্তবর্ণে রঞ্জিত।

আমি মনে কোল্লেম, আর একদল ডাকাত! একদলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই দুর্ঘট হয়েছিল, তার উপর আর এক দল গ্রহদেবতারা নিতান্তই বাম! পদ্মাগর্ভে শয়ন করাই আমাদের নিয়তি! ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, আমার লোকেরা আমার হাত ধোরে টানাটানি কোচ্ছে, ছাড়াবার জন্য আমি ধস্তাধস্তি কোচ্ছি, ইতিমধ্যেই নূতন ছীপখানা বিদ্যুতবেগে পশ্চিমদিকে খানিকদূর ভেসে গেল। কেন গেল, তাও আমি বুঝতে পাল্লেম; পূর্ব্বাগত বোম্বেটে নৌকা আড়ভাবে পদ্মাপ্রসারের অনেকদূর পর্যন্ত জুড়ে ছিল, আধখানা পদ্মায় যেন নৌ-সেতু হয়েছিল, সে স্থান দিয়ে অন্য নৌকার চলাচলের পথ ছিল না, কাজেই নূতন ছীপখানা তফাৎ দিয়ে ঘুরে গেল। গেল কি এলো, একটু পরেই চিনতে পাল্লেম।

ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ। আওয়াজে আওয়াজে দুই ছীপে শব্দ-যুদ্ধ। তখন আমার মনে হলো, নূতন নৌকাখানা ডাকাতের নৌকা নয়; বিপন্ন লোকের কোন রক্ষাকর্ত্তা ঐ নৌকার অধিকারী। আমাদের বজরার মাঝী-মাল্লারা আকাশে হাত তুলে আনন্দধ্বনি কোরে উঠলো। বোম্বেটে ছীপ আর এই নূতন ছীপ পাশা-পাশি; ছীপে ছীপে তুমুল যুদ্ধ। প্রথমতঃ বন্দুকে বন্দুকে যুদ্ধ।

আমি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হোলেম। সারেং এসে আমার কানে কানে বোল্লে, সিপাহী-ছীপ:—সেনাদলের সিপাহী আর রণবেশধারী পুলিশ-প্রহরী একত্র সমবেত। ভগবান আমাদের রক্ষার জন্য এই অভয়া তরণী প্রেরণ কোরেছেন।"

একবার পদ্মার দিকে আর একবার সেই দুই রণতরীর দিকে আমি নয়ন ফিরালেম। যুদ্ধাস্ত্রের গর্জ্জনশব্দে পদ্মা যেন নৃত্য আরম্ভ কোরেছিল;

পদ্মার সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখতে দেখতে বজরার ছাদের উপর থেকে আমি নামলেন। হতাশে জলে ঝাঁপ দিবার শেষ সঙ্কল্পটা তখন একরকম ভুলেই গেলেম। যুদ্ধদর্শনের কৌতূহলে মন যখন একপ্রকার উন্মত্ত হয়ে উঠলো। ভয় নাই, ভয় নাই, আশ্বাসবাক্যে ভীরুলোকগুলিকে নিজেই আমি অভয় দিতে লাগলেম।

ছীপে ছীপে যুদ্ধ। এক ছীপে বোম্বেটেদল, এক ছীপে সিপাহীদল। প্রায় ২৫ জন সিপাহী আপনাদের ছীপ থেকে সুশাণিত অসি হস্তে বোম্বেটে ছীপে লাফিয়ে এলো ; একটু পরে আরো ২৫ জন। উভয় দলে তলোয়ার-যুদ্ধ। কাটা-কাটি, রক্তা-রক্তি, লোম-হর্ষণ কাণ্ড! আমরা তখন নিশ্চেষ্ট। রক্ষা-কর্ত্তা পরমেশ্বর, কিন্তু পরমেশ্বর স্বয়ং বাহুবিস্তার কোরে কোন বিপদ-ক্ষেত্রেই বিপদগ্রস্ত প্রাণী-পুঞ্জকে রক্ষা কোত্তে আসেন না, এক একটা উপলক্ষ্য হয় ; এখানে আমাদের রক্ষার উপলক্ষ্য ঐ নবাগত সিপাহী-ছীপ। পর পর যুদ্ধে কত লোক নিহত, কত লোক আহত, গণনা করা গেল না, কিন্তু অল্প-ক্ষণ পরেই আমি দেখতে পেলেম, বোম্বেটেরা সকলেই পুলিশ-প্রদত্ত অলঙ্কার পরিধান কোরে, ঘন ঘন বেত্রাঘাতে ছীপের উপর যেন নৃত্য কোত্তে লাগলো। দুঃসাহসিক দুরন্ত লোকেরা নির্ঘাত প্রহারেও, নিদারুণ যন্ত্রণাতেও ক্রন্দন করে না, তপ্তলৌহে অঙ্গদাহ কল্লেও শীঘ্র তাদের চক্ষে জল আসে না ; যে সকল লোক পুলিশের হাতে বাঁধা পড়লো, রোদন দূরে থাক, চক্ষে জল আসা দূরে থাক, তাদের কাহারো মুখে একটি ক্ষুদ্রবাক্যমাত্রও উচ্চারিত হলো না।

যুদ্ধের অবসান। প্রকৃতি একপ্রকার স্থির। পদ্মা একপ্রকার শান্ত। আমরা একপ্রকার নির্ভয়। এই সময় সিপাহী-ছীপের একটি ভদ্রলোক আমাদের বজরায় এলেন। দর্শনমাত্রেই আমি চিনলেম, অমরকুমারী-উদ্ধারের যিনি আমা-দের প্রধান উত্তরসাধক হয়েছিলেন, তিনিই সেই উদারাশয় ডেপুটিবাবু। সাদরে আমার মস্তকে হস্তার্পণ কোরে মধুরবচনে তিনি বোল্লেন, "হরিদাস! তোমরা তো সকলে অক্ষত শরীরে আছ? দুরাত্মারা কেহই তো বালিকা অমরকুমারীর অঙ্গস্পর্শ কোত্তে পারে নাই?"

বাবুকে অভিবাদন কোরে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞে না, বোম্বেটেরা কেহই আমাদের অঙ্গে আঘাত কোত্তে পারে নাই ; আমার সঙ্গের পাইকেরা, আর বজরার মাঝী-মাল্লারা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন কোরেছে। বজরার মধ্যে অমর-কুমারী কুশলে আছেন। আপনি আমাদের এ বিপদের সংবাদ কি প্রকারে প্রাপ্ত হোলেন?"

ঈষৎ হাস্য কোরে ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "সে সব কথা পরে বোলছি। এখন দেখ দেখি, তোমার সঙ্গী লোকেদের মধ্যে অক্ষতশরীরে ক-জন জীবিত আছে?" ডেপুটিবাবু ঐ কথা বোল্লেন, সেই জন্যই আমার সেই কথাটা তখন মনে হলো। অত লোকের সঙ্গে অল্পলোকে অতক্ষণ যুঝেছে, আমাদের বাঁচি-য়েছে, এই তো তাদের মহাপরাক্রমের পরিচয় ; তার উপর আরো বেশী ;— সাতটি লোক আমাদের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন কোরেছে ;—দাঁড়ী-মাঝী এগারজন, সারেং একজন, পাইক আটজন, এই কুড়িজনের মধ্যে তেরজন জীবিত। পাই-

কেরা সুশিক্ষিত খেলোয়াড়, তথাপি তাদের মধ্যেও দুটি লোক বোম্বেটের গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মারা গিয়েছে! আমাদের প্রাণের জন্য অপর লোকে প্রাণ দিলে, বড়ই পরিতাপের কথা! ডেপুটিবাবুও তজ্জন্য আক্ষেপ প্রকাশ কোল্লেন। উপায় নাই, এইমাত্র প্রবোধ।

আমার পক্ষে এই কথা ; অপরপক্ষে ডেপুটিবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বোম্বেটে-দলে কতগুলা লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?" বাবু উত্তর কোল্লেন, "পূর্ণসংখ্যা জানা যায় নাই। আমাদের উপস্থিতির অগ্রে কজন ঘাল হয়েছে, সিপাহী-যুদ্ধে কজন কাটা পোড়েছে, ঠিক জানা গেল না। কতক মৃতদেহ নদীর জলে ডুবেছে, কতক দেহ ভেসে গিয়েছে, যুদ্ধের সময় জন-কতক ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে জলে পোড়ে সাঁতার দিয়ে পালিয়েছে। এগারোটা মৃত-দেহ ছীপের উপর পোড়ে আছে, একুশটা জখম, তাদের বন্ধন করা হয় নাই, অবশিষ্ট ৩৫ জনকে হাতকড়ী-বাঁধা গিয়েছে।" আমি একটি নিশ্বাস ফেলে বোল্লেম, "তবেই তো বড় গোলমাল। যে সকল দেহ ডুবে গিয়েছে, ভেসে গিয়েছে, যে সকল লোক সাঁতার দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে মুখচেনা লোক যদি আমি দুটো-একটা ধোত্তে পাত্তেম, তা হোলে অনেকটা সংশয়ভঞ্জন হতো, সে উপায় থাকলো না। পূর্ব্বে আমি আপনাকে বোলেছি, অকারণে আমার শত্রু অনেক। বিশেষতঃ অমরকুমারীকে যারা মাণিকগঞ্জে এনেছিল, তারা দূরদেশে যায় নাই। আমাদের মারবার জন্য কিম্বা ফাঁদ পেতে ধরবার জন্য বোম্বেটে দলের নিয়োগ-কর্ত্তা তারাই ; সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকছে না। প্রকাশ্যে তারা তিনজন ;—সেই তিনজনের মধ্যে বোম্বেটেদলে কেহ উপস্থিত ছিল কি না, নির্ণয় করা কঠিন হবে। তবু আচ্ছা, বন্দীদলে, জখমীদলে, ছীপে পতিত মৃতদলে, তাদের মধ্যে কাহাকেও চেনা যায় কি না, চেনালোক তাদের ভিতর আছে কি না, একবার আমি দেখবো।"

ডেপুটিবাবু আমারে বোম্বেটে-নৌকায় নিয়ে গেলেন! মরা ১১ জন ;—সকলের স্কন্ধে মুণ্ড ছিল, একে একে আমি দেখলেম, চেনা গেল না ;—জখমী ২১ জন—তাদেরো সকলের মুখ দেখলেম, চেনা গেল না ;—বন্দী ৩৫ জন ;—হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী, গলায় শিকল ;—গুড়ের নাগরীর মত সারি সারি বোসে আছে ; বিকট-শিকট-মুখে মিট-মিট কোরে চেয়ে চেয়ে দেখছে, একখানা মুখও চেনা গেল না। চিনলেম কেবল একটা লোককে। পাঞ্জাবী-ধরনের পাগড়ী মাথায় দিয়ে যে দীর্ঘাকার লোকটা নদীর ধারে বৃক্ষ-তলে দাঁড়িয়ে ছিল, গায়ে তুলাভরা চাপকান, বন্দীদলে সেই লোক বিদ্যমান। তারে চিনেই বা আমার কি ফল? সে লোককে পূর্ব্বে আমি দেখি নাই, দেখা দিয়ে পূর্ব্বে যে আমার কোনপ্রকার শত্রুতাচরণ করে নাই, তারে চিনে মোকদ্দমা-প্রমাণের কোন সূত্রই আমি পাব না, সে লোকটা হয় তো বোম্বেটেদলের গুপ্ত গোয়েন্দা—গুপ্তচর! বিচারের সময় বোম্বেটেদের সঙ্গেই তার দণ্ড হবে, আমাদের মূল মোকদ্দমার সঙ্গে সে লোকের কোন সংস্রব নাই।

তবে হাঁ,—একটা কথা, সেই সময় আমার মনে পোড়লো। অমরকুমারী বোলেছিলেন, তিনটে লোকের মধ্যে একটা লোকের নাম মিয়াজান। এই লোকটা

যদি সেই মিয়াজান হয়, জিজ্ঞাসা কোল্লে এ যদি সত্যকথা বলে, তা হোলে বোধ হয়, চণ্ডেশ্বর নামধারী রক্তদন্তের সন্ধানটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। ডেপুটিবাবুর অনুমতি গ্রহণ কোরে সেই লোকের নাম আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। লোক তো প্রথমে কথাই কোইলে না, শেষকালে সিপাহীলোকের ধমকে, পায়ের জুতার ঠোক্করে, বন্দুকের কুঁদোর গুঁতোতে হাউ হাউ কোরে বোল্লে, "মাদু।"

এক কথায় সব ফর্শা। মুখের চেহারা দেখেও জানতে পারা গেল, নামটা সত্য হোক না হোক, লোকটা বাস্তবিক হিন্দু। মুসলমানের মুখে আর হিন্দুর মুখে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। একটু চিন্তা কোরে দ্বিতীয়বার ডেপুটি-বাবুর অনুমতি নিয়ে পুনরায় সেই লোককে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা মাধু, তুমি কি কখনো কোন জায়গায় কোন লোকের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে মিয়াজান নামে পরিচয় দিয়াছিলে?"

লোক তখন দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে, সক্রোধে বারকতক অধরোষ্ঠ দংশন কোরে সগর্জ্জনে বোল্লে, "হুঁ—উঁ—উঁ—উঁ—উম!"—জনান্তিকে ডেপুটিবাবু তখন আমারে বোল্লেন, 'বজ্জাৎ বদমাসলোকের মুখে সত্যকথা বাহির করা এক প্রকার অসাধ্য! এখানে ও প্রকার প্রশ্ন করা নিষ্ফল। বিচারের সময় কোন সূত্রে যদি কিছু প্রকাশ হয়, অবশ্যই তুমি সে সব কথা জানতে পারবে।"

আর আমরা ছীপ-নৌকায় থাকলেম না, বজরায় উঠে এলেম। এগারটা মৃতদেহ পদ্মার জলে নিক্ষেপ করবার হুকুম হলো। আমাদের পক্ষে যে সাত-জন মারা গিয়েছিল, তাদের দেহ পাওয়া গেল না; পদ্মার স্রোতে অন্বেষণ করাও বিফল, সুতরাং পদ্মাগর্ভেই তাদের চিরবিশ্রাম।

আমরা বজরায় এলেম। যুদ্ধের সময় কামরায় প্রবেশের দ্বার আমি বন্ধ কোরে রেখেছিলেম, উন্মুক্ত কোরে কামরার মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম: আমি আর ডেপুটিবাবু। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা ঢেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অমর-কুমারী একধারে বোসে থাকলেন, অঞ্চলসঞ্চালনে দাসীরা তাঁরে বাতাস কোত্তে লাগলো, মণিভূষণও আমাদের দিকে সোরে এলেন। অমরকুমারীর দিকে চেয়ে প্রসন্নবদনে ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "ভয় নাই মা! শত্রুনিপাত হয়েছে! তোমরা নিরাপদ হয়েছ!"—হুলস্থুলের সময় অমরকুমারী একবার মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, অনেক কষ্টে মূর্চ্ছাভঙ্গ করা হয়েছে, মণিভূষণের মুখে এই কথা শুনে, আমি একবার অমরকুমারীর সম্মুখে গেলেম, 'শত্রুনিপাত হয়েছে, তোমরা নিরাপদ হয়েছ,' এই বোলে ডেপুটিবাবুর বাক্যের প্রতিধ্বনি কোল্লেম। অমরকুমারী একবার উজ্জ্বলনয়নে আমার দিকে চেয়ে বক্রনয়নে ডেপুটিবাবুর দিকে কটাক্ষ কোরে নীরবে নতমুখী হোলেন। আমি অতঃপর ডেপুটিবাবুর নিকটে এসে, আমার সেই পূর্ব্বপ্রশ্ন পুনরুত্থাপন কোল্লেম, "পদ্মার উপর বোম্বেটের হাতে আমরা বিপদে পোড়েছি, এ সংবাদ আপনি কি প্রকারে প্রাপ্ত হোলেন?"

পকেটে কি একখানি কাগজ ছিল সেইখানি বাহির কোরে একবার দেখে, আবার সেখানি পকেটে রেখে, শান্তস্বরে ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "তোমরা বিপদে পোড়েছ, সংবাদ পেয়ে তরণীসজ্জা কোরে এত শীঘ্র ঢাকা থেকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, এমন অসম্ভব কথা তুমি মনে কোত্তে পার না। মাণিক-

গঞ্জের ওভারসীয়ার হরিহরবাবু তোমার আপনার লোক ;—হাঁ, অবশ্যই আপনার লোক, উপকারী বন্ধু ;—বজরা ছেড়ে তোমরা রওনা হবামাত্র, তিনি একজন বিশ্বাসী ভদ্রলোককে শীঘ্র শীঘ্র ঢাকায় প্রেরণ করেন। ষোলদাঁড়ী পানসীতে সেই লোকটি অবিলম্বে আমার কাছে উপস্থিত হয়, একখানি পত্র আমাকে দেয়। আমার সঙ্গে হরিহরবাবুর আলাপ আছে, পত্রপাঠমাত্র পত্রের কথাগুলি আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর করি ; তুমি শত্রুবেষ্টিত, পদ্মায় বোম্বেটের ভয়, এই সব অবস্থা জানিয়ে তোমার রক্ষাবিধানের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি বিশেষরূপ অনুরোধ করি : যেরূপ সজ্জায় আমি এসেছি, সেইরূপ সজ্জা প্রয়োজন, আমিই সেই প্রস্তাব করি। বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবটি অতিশয় সদাশয় ; অবিলম্বে তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। আমি বোধ করি, তোমরা এদিকে অধিক দূর আসতে না আসতেই আমরা অধিক দাঁড়ী-নিযুক্ত কোরে ঢাকায় গঞ্জঘাট থেকে ছীপখানা খুলে দিই, শীঘ্র রওনা হয়েছিলেম বোলেই এখানে আমরা উপস্থিত হোতে পেরেছি।"

উদ্দেশেই হরিহরবাবুকে প্রণাম কোরে, ঢাকার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধন্যবাদ দিয়ে, সমীপোবিষ্ট ডেপুটিবাবুকে আমি অভিবাদন কোল্লেম। উপরে বোলেছি, দৈব অনুগ্রহ ; বিপদে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে আমি ডেকেছি, বিপদনাশিনী মা দুর্গাকে আমি ডেকেছি, ডাকবার অগ্রেই তাঁরা হরিহরবাবুকে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আর এই ডেপুটিবাবুটিকে সদয়ভাবে ভবিষ্যজ্ঞান বিতরণ কোরেছিলেন, তাতেই আমাদের রক্ষা হলো, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলো না ; এই জন্যই আমি বোলেছি, দেব অনুগ্রহ। বিপত্তিকাণ্ডারী হরি শ্রীমধুসূদন ! বিপত্তিনাশিনী দুর্গা ভবনিস্তারিণী। এই দুটি বাক্য সার্থক। মধুসূদনে যাঁদের বিশ্বাস নাই, দুর্গা-নামে যাঁদের ভক্তি নাই, তাঁরা আমারে যদি উপহাস করেন সে উপহাস আমি পরমাদরে মাথা পেতে গ্রহণ কোরবো।

আমরা পরিত্রাণ পেলেম। বিপদের রজনী দীর্ঘ হয় ; দীর্ঘ রজনীর অবসান। ডেপুটিবাবুর সঙ্গে যখন আমি কথা কোচ্ছি, তখন ঊষাকাল ; ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সমাগত : অল্পে অল্পে সূর্যমণ্ডলের আরক্ত ছবি পূর্ব্বগগনে সমুদিত। তিথি ছিল কৃষ্ণপ্রতিপদ, প্রতিপদের চন্দ্র পশ্চিমগগনে অস্ত যাচ্ছেন, নূতন প্রভাকর পূর্ব্বগগনে উদয় হোচ্ছেন। সুপ্রশস্ত নদীবক্ষে তরণীর উপর থেকে প্রকৃতির সেই শোভা কি চমৎকার দেখায়, যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই সেটি অনুভব কোত্তে পারবেন। সমুদ্রযাত্রী লোকের মুখে আমি শুনেছি, মধ্যসমুদ্র থেকে সেই দৃশ্য আরো সুন্দর দেখায়, আরো চমৎকার ! নয়ন মন উভয়ই বিমুগ্ধ হয়।

ধূসরবসনা ঊষা তুষারসিক্ত হয়ে লজ্জাবনতবদনে প্রস্থান কোল্লেন, দিনমণি সুপ্রকাশ। আমি তখন ডেপুটিবাবুকে বোল্লেম, "এখন আমরা তবে বিদায় হোতে পারি ? দিনের বেলা নদীতে আর বোম্বেটের ভয় থাকবে না, দিনের বেলা নূতন বোম্বেটেরা আর আমাদের ধোত্তে আসবে না, আপনার অনুগ্রহে পরম উপকৃত হোলেম ; মহা বিপদে জীবনরক্ষা হলো। আপনার

মহত্ত্বের নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকলেম। এখন অনুমতি হয়, বজরা খুলে দিই।"

মৃদু হাস্য কোরে ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "তাই বুঝি তুমি মনে কোরেছ? এত বড় কাণ্ডটা কেবল জলের উপরেই শেষ হয়ে গেল, এই বুঝি তোমার বিশ্বাস? তা নয় হরিহরিদাস, তা নয়। অল্পবয়সে সাহসে তুমি ধন্য, কিন্তু সংসারের বিষয়জ্ঞানে এখনো তুমি অপরিপক্ক। ব্যাপার ছোট নয়। ছীপ-নৌকায় আমোদ কোরে পদ্মানদীতে আমরা মাছ ধোত্তে এসেছিলেম, শীকার ধোরে আমোদ কোরে ফিরে চোল্লেম, তাও নয়। বিচার আছে। তোমারেও আর একবার ঢাকায় যেতে হবে। এই ভীষণ ব্যাপারের মূল উপলক্ষ্য তুমি। তোমার তরণী আক্রমণের উদ্দেশেই বোম্বেটেদল জমায়েত, তোমার লোকের সঙ্গেই বোম্বেটেদের প্রথম যুদ্ধ। উভয় পক্ষেই খুন-জখম; এ অবস্থায় বিচারস্থলে তোমার সাক্ষ্যই অগ্রগণ্য। তোমারে আর একবার ঢাকায় যেতে হবে। বোম্বেটে নৌকা নদী বেয়ে যাচ্ছিল, আমরা ছুটে এসে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কোরেছি; কত নৌকা অমন যায়, কোন একটা অকু ঘটনা না হোলে পুলিশ তাদের ধরে না, বিনা প্রমাণে নৌকার লোককে বোম্বেটে বোলে ধরাও যায় না, প্রমাণ আবশ্যক; প্রমাণের জন্যই অগ্রে তোমারে দরকার হবে। তুমি আমাদের সঙ্গে ঢাকায় চল।"

আর আমার কোন ওজর-আপত্তি খাটলো না। আবার আমারে ঢাকায় ফিরে যেতে হলো। আমাদের বজরায় ডেপুটিবাবু থাকলেন। ডেপুটিবাবুর ছীপে সিপাহী শান্ত্রী থাকলো, বোম্বেটেদের ছীপে পুলিশ-পাহারায় জখমী লোকেরা আর বন্দীলোকেরা থাকলো। আমরা ঢাকায় চোল্লেম। বজরার গতি মৃদু, ছীপের গতি দ্রুত। একসঙ্গে কি প্রকারে যাওয়া যায়, সেই তত্ত্ব একবার আমার মনে উঠেছিল, কিন্তু ডেপুটিবাবুর বন্দোবস্তে তিন তরণীর গতি সমান কোরে দেওয়া হলো। সর্ব্বপ্রথমে গ্রেপ্তারী আসামী নৌকা, মধ্যস্থলে আমার বজরা, পশ্চাতে সিপাহী। তিন তরণীর সমান গতি।

ষষ্ঠ কল্প

আমি নাগরদোলায়

আবার আমরা ঢাকায়। বোম্বেটেরা ফৌজদারী আদালতে চালান হয়ে গেল, জখমী লোকেরা হাসপাতালে প্রেরিত হলো, আমরা ডেপুটিবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় পেলেম। হরিহরবাবুর আটজন পাইকের মধ্যে জলযুদ্ধের সময় দুজন নিহত হয়েছিল, বাকী ছিল ছয়জন, তাদের ইচ্ছা ছিল, মাণিকগঞ্জে ফিরে যায়, কিন্তু ডেপুটিবাবু যেতে দিলেন না। ইংরেজ আইন, প্রমাণের উপরেই অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে; বোম্বেটে ধরা পড়াতে আবার এক নূতন মোকদ্দমা।

রক্তপাত হয়ে গেল, মানুষ মারা গেল, ভগবানের কৃপায়, ডেপুটিবাবুর অনুগ্রহে, আমরা কজন প্রাণে প্রাণে রক্ষা পেলেম ; এই মোকদ্দমায় প্রমাণ আবশ্যক। বেঁচেছিলেম বোলে আমরাই সাক্ষী, পাইকেরাও সাক্ষী। আমাদের বজরার সারেং আর তার অধীনস্থ দাঁড়ী-মাঝীরা সাক্ষীশ্রেণীতে গণ্য। তারাও উপস্থিত থাকলো। বোম্বেটেদের বৃহৎ ছীপখানা ২০ জন লোকের দ্বারা চালিত হয়েছিল, তারাও বোম্বেটে। ডাকাতের সঙ্গের দলবল সকলেই ডাকাত, আসামীর দলে সেই ২০ জনও বন্দী হয়ে এসেছে ; মোকদ্দমা গুরুতর। বিচারের দিন ধার্য হয় নাই ; অবসর-প্রতীক্ষায় পাঁচদিন আমরা ঢাকায় থাকলেম।

ডেপুটিবাবুর বাসাবাড়ীর অন্দরমহলে অমরকুমারী। হরিহরবাবু যে দুটি স্ত্রীলোককে অমরকুমারীর সঙ্গে দিয়েছিলেন, তারা ঠিকাচাকরানী, যারা ঠিকালোক, তাদের উপর অধিক প্রভুত্ব চলে না ; যাতে চলে, আমি তার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন কোল্লেম। মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সঙ্গে যেতে হবে, অমরকুমারীর কাছে কাছেই থাকতে হবে, এই কড়ারে সম্মত কোরে তাদের আমি মাসিক পাঁচ পাঁচ টাকা বেতন ধার্য কোরে দিলেম ; খোরাক-পোষাক স্বতন্ত্র। অমরকুমারীর মধুর ব্যবহারে, মধুর বচনে তারা তুষ্ট হয়েছিল, তার উপর অধিক বেতনের আশা পেলে, আর তাদের কোন আপত্তি থাকলো না। পাঁচ দিন আমরা নির্ব্বিঘ্নে ঢাকায় বাস কোল্লেম।

পুলিশের সাহায্য-প্রার্থনায় আদালতে দরখাস্ত দাখিল উপলক্ষে ইতিপূর্ব্বে একবার ঢাকায় আমি এসেছিলেম ; লোকের মুখে শুনা ছিল, পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে ঢাকা খুব ভাল সহর ; মুর্শিদাবাদে বাঙলার রাজধানী হবার অগ্রে ঢাকাতেই রাজধানী ছিল। ঢাকা সহর আমার দর্শন করা হয় নাই ; দর্শনের অভিলাষ প্রবল ; পূর্ব্বযাত্রায় সময় ছিল না, অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই ; এই যাত্রায় যদি ঘটে, বঙ্গের এই প্রাচীন সহরটি আমি ভালরূপে দর্শন কোরবো, এই সঙ্কল্প আমার মনে ছিল।

পাঁচ দিন অতিবাহিত। ইতিমধ্যে একদিন মোকদ্দমা ডাক হয়েছিল, আমাদের তলব হয় নাই। আসামীদের হাজতবাসের হুকুম। এই পর্যন্তই সে দিনের কার্য। আবার কবে দিন ধার্য হবে, আর কত দিন আমাদের ঢাকায় অবস্থান কোত্তে হবে, জানতে পারা গেল না। মনে উদ্বেগ থাকলো ; কিন্তু সঙ্কল্পসিদ্ধির সময় পেলেম। সহরমাত্রই জনাকীর্ণ। বহুদিকে বহু গলীপথ ; বহুদিকেই দোকান-পসার। অজানা লোকের পক্ষে শীঘ্র শীঘ্র সহরের সর্ব্বস্থান চিনে লওয়া সহজ হয় না। ঢাকা আমার পক্ষে নূতন সহর। কোন দিকে কি, কোন দিকে কোন রাস্তা, কোন দিক দিয়ে কোন রাস্তায় যেতে হয়, কোন দিকে গৃহস্থলোকের বাস, কোন কোন দিকে কোন কোন দর্শনীয় পদার্থ, একাকী বাহির হয়ে ঠিক ঠিক সে সব নির্ণয় করা কঠিন ; অতএব পল্লীর একটি বালককে আমি পথ-প্রদর্শক-রূপে মনোনীত কোল্লেম। বালকটি আমার সমবয়স্ক, বেশ চালাক-চতুর, কিছু কিছু লেখাপড়াও জানে, নাম অবলাকান্ত। প্রতিদিন অপরাহ্নে অবলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে আমি নগরদর্শনে বাহির হই।

মণিভূষণ বাহির হন না, স্থানাদি-সন্দর্শনে তাঁর আগ্রহ অল্প, বাসাতেই তিনি থাকেন, সঙ্গে আসবার জন্য আমি তাঁরে অনুরোধও করি না, বরং অমর-কুমারীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমার কোন উদ্বেগ থাকে না, সে জন্য আনন্দ জন্মে ; নিত্য নিত্য নিরুদ্বেগে নগরদর্শনে আমি প্রীতি অনুভব করি। মণি-ভূষণের বাসায় থাকা ভালই হয়।

অবলাকান্ত আমার মনের মত সহচর। যেটি যেটি আমি দর্শন কোত্তে চাই, অবলাকান্ত সেইগুলি আমারে দেখায়, যে যে রাস্তার যে যে নাম, যে যে পদার্থের যে যে প্রকার বর্ণনা, যে যে মহাপুরুষের নামের যে সকল কীর্ত্তি একে একে তন্ন তন্ন কোরে আমারে বোলে বোলে দেয় বুড়ীগঙ্গার ধারে কোথায় কোথায় জলদস্যুর ভয়, তাও আমারে দেখিয়ে দেখিয়ে চিনিয়ে চিনিয়ে রাখে ; যে দিকে ইংরেজটোলা, যে দিকে কোম্পানির বিদ্যালয়, চিকিৎ-সালয়, বিচারালয়, সাধারণ কার্যালয়, কারাগার, সে সকল দিকেও এক এক-দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে আসি। অষ্টাহকাল এইরূপে আমি অবলাকান্তের সঙ্গে ঢাকা সহরের বহুস্থান সন্দর্শন কোল্লেম। ঢাকার বাঙালীটোলার রাস্তাগুলি, বাজারের গলীগুলি অপ্রশস্ত ; কাশীর বাঙালীটোলার ছোট ছোট গলী যত অপ্রশস্ত, তত অপ্রশস্ত নয়, কিন্তু যানবাহনের চলাচলে সঙ্কীর্ণ। ঢাকার বাজারে অনেক প্রকার জিনিষপত্র অতি সুন্দর। ঢাকাই কাপড়, ঢাকাই স্বর্ণা-লঙ্কার, ঢাকাই রজতালঙ্কার, ঢাকাই শঙ্খ অতি পরিপাটী। বঙ্গের সকলেই বলেন ঢাকার স্বর্ণকারেরা সোণারূপার উপর যেরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচিত্র কাজ কোত্তে পারে, অন্য স্থানের স্বর্ণকারেরা সেরূপ পারে না। বিদেশী লোকের কাছেও ঢাকাই তাঁতি আর ঢাকাই সোণার বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নিত্য নিত্য নূতন স্থান দর্শনে নিত্যই আমার নূতন নূতন কৌতূহল। একদিন অপরাহ্নে সহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে পোড়লেম।—একটা মেলা উপলক্ষে সেইস্থানে অধিক জনতা। সেই জনতা ভেদ কোরে আমরা নানা প্রকার তামাসা দেখে দেখে বেড়াচ্ছি, মেলা স্থলে নানা প্রকার জিনিষপত্র বিক্রীত হোচ্ছে, এক একপ্রকার জিনিসের এক একটা পটি বোসে গিয়েছে ; তরুণবয়স্ক ভিক্ষুক বালকেরা বহুরূপী সেজে পটিতে পটিতে ভিক্ষা কোরে বেড়াচ্ছে, ছদ্ম-বেশী জুয়াচোর ও গাঁটকাটারা উত্তম কৌশলে আপনাদের গুপ্ত মতলব হাঁসিল কোচ্ছে, বদমাসলোকেরা রকমারী যুবতী স্ত্রীলোকের অন্বেষণে ভিড়ের ভিতর লুকাচুরি খেলাচ্ছে, স্থানে স্থানে গীতবাদ্য হোচ্ছে, একধারে হরিসংকীর্ত্তন বেরিয়েছে, যাত্রাওয়ালা ছেলেরা দিল্লীকা বাইজী সেজে ঘাঘরা ঘুরিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে দর্শকের কাছে পয়সা আদায় কোচ্ছে ; এই সকল দেখতে দেখতে আমরা সেই ভিড়ের ভিতর পথহারা হোলেম, অবলাকান্তকে হারিয়ে ফেল্লেম। যেখানে মেলা হয়েছিল, সে দিকে আর কোনদিন আমি যাই নাই, সঙ্গীহারা হয়ে ফাঁপরে পোড়লেম। দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা সমাগত, চতুর্দিক অন্ধকার। আকাশে নক্ষত্রোদয়।

সন্ধ্যাকালে যেমন অন্ধকার হয়, সেই রকম অন্ধকার, কিন্তু আমার চক্ষে তখন অনেক বেশী। কি কারণে আমি বেশী অন্ধকার দেখলেম, বোধ হয় তার

পরিচয় দিতে হবে না। বিপদ আমার সঙ্গে সঙ্গে, শত্রু আমার সঙ্গে সঙ্গে, তার উপর সন্ধ্যাকালে অজানা জায়গায় সঙ্গীহারা। একবার তো বরদা-রাজ্যে সন্ধ্যাকালে পথ ভুলে বনমধ্যে প্রবেশ কোরে মহা বিপদে পতিত হয়েছিলেম, সেই কথাই মনে হোতে লাগলো। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়, এ কথা নিষ্ফল নহে। আমি ভয় পেলেম। সহরের ভিতর যদি থাকতেম, সহরের ভিতর যদি পথ হারাতেম, তা হোলে হয় তো ভয় পেতেম না। যেখানে এসেছি, সে স্থানটা সহরের বাহির ; সেই জন্যই ভয়।

সহরের বাহিরেই মেলা। মেলাস্থল থেকে প্রায় আধ ক্রোশ পথ আমি চোলে এসেছি। কোন দিকে এসেছি, কোন দিকে যাচ্ছি, কোন দিকে সহর, কোন দিকে বুড়ীগঙ্গা, কোন দিকে ডেপুটিবাবুর বাসা, কিছুই জানতে পাচ্ছি না। আকাশে সূর্য থাকলে বরং দিকনির্ণয় করা যেতো, সন্ধ্যার অন্ধকারে, সে পক্ষেও বাধা। কি করি ?

দাঁড়ালেম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণনয়নে আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ কোল্লেম। দেখলেম কেবল অন্ধকার। আকাশপানে চাইলেম, আকাশে মেঘ ছিল না, উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল নক্ষত্রমালা নয়নগোচর কোল্লেম ; নীল চন্দ্রাতপে যেন মণি-মুক্তাখচিত, এইরূপ শোভা ; প্রকৃতির সে শোভা তখন আমার ভাল লাগলো না ; অন্য ভাবনায় প্রাণ আকুল। কত ভাবনাই ভাবছি, সকল ভাবনার উপরে অমরকুমারীর ভাবনা প্রবল হয়ে উঠছে। কোন দিকেই আর পদচারণ কোচ্ছি না, পথের একধারে একটি স্থানেই চুপ কোরে দাঁড়িয়ে আছি। আমি একাকী। কোন দিকে যাই, আপন মনে আপনা আপনি এই প্রশ্ন। নক্ষত্রেরা আকাশে জ্বলে, আকাশে আলো হয় ; সে আলো ধরাতলে আসে না ; নক্ষত্রেরা যদি ধরাতলে পথ দেখিয়ে দিতে পাত্তো, তা হোলেও বরং অনুমানে অনুমানে গঙ্গা-তীরের রাস্তাটা আমি ধোরে নিতে পাত্তেম, প্রকৃতির খেলাঘরে নক্ষত্রপুঞ্জে যে দীপ্তি বিকাশ করে, সে দীপ্তিতে পার্থিব পথিকের বিশেষ উপকার কিছুই হয় না ; নক্ষত্র-দীপ্তি সে সময় আমার কোন উপকারেই এলো না।

পথের মাঝখানে আমি অচল। সান্ধ্য-সমীরণ বৃক্ষ-পল্লবের সঙ্গে খেলা কোচ্ছে, তরুবাসী বিহঙ্গেরা মিশ্রকণ্ঠে মিশ্র-রাগিণীতে গান কোচ্ছে, বাতাসের শব্দ আর সেই সঙ্গীত ধ্বনি আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ কোচ্ছে, তমোময়ী নিশা-মূর্ত্তি আমার সম্মুখে তিমির-বসন পরিধান কোরে কেমন এক রকম ভয় দেখাচ্ছে, কিছুই যেন আমি দেখছি না, কিছুই যেন আমি শুনছি না, নেত্র কর্ণ উভয়েই যেন নিশ্চেষ্ট। আমি অন্যমনস্ক।

রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড। স্থাণুর ন্যায় এক স্থানেই আমি নিবদ্ধ ; কে যেন সেই স্থানেই আমার পায়ে প্রেক মেরে আটক কোরে রেখেছে, এই প্রকার ভাব। এই ভাবে আমি আছি, এমন সময় দেখলেম, যে দিক থেকে আমি এসেছি, সেই দিকে একটু দূরে তিনটি শুভ্র পদার্থ ;—পদার্থ তিনটি সচল ;—আমার দিকেই যেন চোলে চোলে আসছে। ক্ষণকাল অনিমেষে সেই দিকে আমি চেয়ে থাকলেম। সেই তিন পদার্থের সমান গতি। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী।

যদিও অন্ধকার, তথাপি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হওয়াতে আমি জানতে পাল্লেম, অন্য পদার্থ নহে, তিনটি মনুষ্য ;—শুভ্রবসনাবৃত তিনজন পুরুষ। সমভাবে এক স্থানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম, সেই তিনজন মনুষ্য সম্মুখরাস্তা দিয়ে চোলে যাবার সময় আমারে দেখতে পেলে। রাস্তার উপরেই আমি ছিলেম না, বামদিকের একটা বৃক্ষতলে নিঃশব্দে নীরবে দুর্ভাবনায় আমি নিমগ্ন, মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে, সেই তিনজনের মধ্যে একজন একটু যেন চমকিত-ভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে আপনি ? এখানে এই অন্ধকারে একাকী এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "পথিক আমি সম্প্রতি ঢাকা নগরে এসেছিলেম, আজ বৈকালে মেলা দেখতে বেরিয়েছিলেম, সঙ্গে আমার একটি বন্ধু ছিল, ভিড়ের ভিতর সেটিকে আমি হারিয়ে ফেলেছি ; পথ ভুলে গিয়েছি ; এদিকে আমার নূতন আসা, কোন দিক দিয়ে কোথায় যেতে হয়, জানি না, এজন্যই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি।"

লোকটি যেন একটু সদয়ভাবে পুনরায় আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কোথায় আপনি যেতে চান ? কোন দিকে আপনার বাসা ?"—আমি বোল্লেম, বাসা আমার এখানকার আদালতের দিকে ; ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট সদানন্দবাবু, তাঁরই বাসাতে আমি থাকি ; কোন দিকে বুড়ীগঙ্গা, অনুগ্রহ প্রকাশ কোরে সেইটি যদি আপনি দেখিয়ে দেন, তা হোলেই আমি চিনে নিতে পারবো।

আকাশের দিকে মুখ তুলে লোকটি একটু উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠলো, "বুড়ীগঙ্গা ?—বুড়ীগঙ্গা এখান থেকে অনেক দূর। সে দিকের রাস্তা ছেড়ে আপনি অনেক দূর এসে পোড়েছেন। আমরাও মেলা দেখতে গিয়েছিলেম, এই দিকেই আমাদের বাড়ী, বুড়ীগঙ্গার ধার দিয়ে গেলেও আমরা বাড়ীতে পৌঁছিতে পারি, কিন্তু অনেকটা ঘুর হয়। কি করা যায়, আপনি দেখছি নূতন, রাত্রিও অন্ধকার, একাকী কোন দিকেই আপনি যেতে পারবেন না, নূতন লোকের পক্ষে রাত্রিকালে এ পথে যাওয়াও নিরাপদ নয়, কাজেই বুড়ী-গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসা আমরা উচিত বিবেচনা কোচ্ছি। এ পথে ডাকাতের ভয় আছে ; আপনি দেখছি নিতান্ত ভালমানুষ, আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকলেও সময় এ পথে আপনাকে একা ছেড়ে যেতে আমার মন সরছে না ; চলুন, গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আমরাও আপনার সঙ্গে যাই।"

কথাগুলি শুনে লোকটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মিল। কোথাকার কে আমি, অকস্মাৎ আমার প্রতি দয়া, এ লোক অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র। যথার্থ ভদ্রলোক। তাঁর অঙ্গীকারে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্যবাদ দিব দিব মনে কোচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আপনি ঘোড়া চোড়তে জানেন ? বুড়ীগঙ্গা এখান থেকে অনেকটা দূর, পদব্রজে যেতে হোলে দেরী হবে, অনেক রাত্রি হয়ে যাবে ; ঘোড়ায় চেপে যাওয়াই সুবিধা ; আপনি ঘোড়ায় চোড়তে জানেন ?"

কেন, বোলতে পারি না, সহসা ঐ প্রশ্ন শ্রবণ কোরে আমার মনে একটু সন্দেহ এলো। এই তিনটি লোক পদব্রজে যাচ্ছিল সঙ্গে ঘোড়া ছিল না, হঠাৎ ঘোড়ায় চড়ার কথা কেন বলে ? সন্দেহটুকু মনের ভিতর চেপে রেখে সেই প্রশ্নে আমি উত্তর দিলেম, "ঘোড়া যদি এখানে সুলভ হয়, আমি সওয়ার হোতে জানি ; মধ্যে মধ্যে সওয়ার হওয়া আমার অভ্যাস আছে।"

যিনি আমার সঙ্গে কথা কোচ্ছিলেন, আমারে কিছু না বোলে তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে একবার কটাক্ষপাত কোল্লেন, একজন তৎক্ষণাৎ ভোঁ ভোঁ কোরে একদিকে দৌড় ছিল। কেন দৌড়িল, কোথায় গেল, তা আমি বুঝলেম না, য'রা সেখানে থাকলো তাদের কিছু জিজ্ঞাসাও কোল্লেম না। তিনজনেই আমরা নিস্তব্ধ।

দশ মিনিট পরে একজন ঘোড়-সওয়ার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। সহচরের ইঙ্গিতে যে লোকটি ইতিপূর্ব্বে দ্রুতগতি ছুটে গিয়েছিল, সেই লোকটিই সওয়ার ; তৎপশ্চাতে অপর তিনটি শূন্যপৃষ্ঠ অশ্ব ; সে তিনটি অশ্বের লাগামও একগাছি রজ্জু বন্ধ কোরে সেই সওয়ার আপনার কটিদেশে নিবদ্ধ রেখেছে। ঘোড়ারা কদমে কদমে চোলে এসেছে। পশ্চাতের তিনটি অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠ এ কথা বলবার তাৎপর্য এই যে, সেই তিন অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার ছিল না ; —পৃষ্ঠদেশ শূন্য ছিল, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় ; কেন না, চর্ম্ম-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর জীন সেই তিন অশ্ব-পৃষ্ঠে সজ্জিত ছিল।

প্রথমে যে লোকটি আমার সঙ্গে কথা কোয়েছিলেন, এই সময়ে তিনি আমারে একটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করবার জন্য অনুরোধ কোল্লেন ; কোনটিতে আমি আরোহণ কোরবো, অঙ্গুলিসঙ্কেতে সেটিও তিনি আমারে দেখিয়ে দিলেন, এক লম্ফে সেই সুন্দর জীনসজ্জিত তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে আমি আরোহণ কোল্লেম। লোকেরা তিনজন, আমি একজন, চারিজন, একজন সওয়ার ছিল, দ্বিতীয় অশ্বে আমি আরোহণ করবার পর অবশিষ্ট দুজন অবশিষ্ট দুটি অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ কোল্লে, অশ্বেরা তখন দ্রুতগতিতে ধাবিত হোতে লাগলো। যে অশ্বে আমি আরোহণ কোল্লেম, সেই অশ্বের সম্মুখ দুজন, আর পশ্চাতে একজন সওয়ার আরূঢ় থাকলো।

ঘোড়ারা ছুটেছে। কোন দিকে চোলেছে, আমি সেটা নিরূপণ কোত্তে পাচ্ছি না ; দিগভ্রম হয়েছিল, রাত্রিও অন্ধকার, নিরূপণ করাও কঠিন। মানুষের অনুমানটা সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। যেখানে আমি ছিলেম, দিগভুল হোলেও ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে আমি অনুমান কোচ্ছিলেম, মুখ যেন আমার দক্ষিণদিকে আছে ; দক্ষিণদিকে মুখ থাকলে বামদিকে পূর্ব্বদিক, পশ্চাতে উত্তরদিক, দক্ষিণ হস্তের দিকে পশ্চিমদিক থাকে। এ হিসাবে দক্ষিণদিকেই বুড়ীগঙ্গা ; কিন্তু ঘোড়ারা যে দিকে দৌড়িল, ঐ হিসাবে আমার অনুমান সেটা পূর্ব্বদিক। কোথায় যাচ্ছি, লোকেরা আমারে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সভয় সংশয় মনে আমার এইরূপ বিতর্ক !

অশ্বগতি অবিরাম। কতদূর আমরা গিয়ে পোড়লেম, ঠিক অনুমান কোত্তে পাল্লেম না, কিন্তু ভয় হলো। পথ ভুলেছিলেম, সেটা বরং এক রকম ছিল

ভাল ; নূতন লোকের কথায় ভুলে, ভুলের কান্তারে এসে পোড়লেম। বুড়ী-গঙ্গা এ দিকে নয় ; লোকেরা আমারে পথ ভুলিয়ে অন্যদিকে এনে ফেলেছে, ইচ্ছা কোরেই এনেছে, তাদের ভুল নয়, আমারই ভুল, তাদের হয় তো দুষ্ট মতলব, আমার সরল প্রাণে আশুপ্রত্যয়, উপকারী ভদ্রলোক বিবেচনা কোরেই তাদের প্রস্তাবে আমি সম্মত হয়েছিলেম, তাদের ঘোড়াতে আরোহণ কোরে-ছিলেম, সেইটিই আমার ভুল ; সেই ভুল এখন আমার আতঙ্কের কারণ।

একবার উচ্চকণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমরা আমারে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? কেহই উত্তর দিল না ; সম্মুখে সওয়ারও নিরুত্তর, পশ্চাতের সওয়া-রেরাও উদাসীন। ভগবানের মনে কি আছে, ভগবান জানেন, অজ্ঞাত লোকের ঘোড়ার উপর অজ্ঞাত ভয়ে আমি অর্দ্ধকম্পিত ; সংশয় ক্রমশই প্রবল।

আশুগতি অশ্বেরা কতক্ষণে কত পথ অতিক্রম কোত্তে পারে, অশ্বধারণে শিক্ষা হওয়া অবধি সেটি আমি জেনেছিলেম, এই চারিটি অশ্ব এক ঘণ্টায় প্রায় তিন ক্রোশ অতিক্রম কোরেছে, এইরূপ আমি সিদ্ধান্ত কোল্লেম। যেখানে আমি বিফল প্রশ্ন কোরে হতাশ্বাস হয়েছিলেম, সে স্থান থেকে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অগ্রসর হয়ে সম্মুখের ঘোড়াটা হঠাৎ থেমে গেল। আমি মনে কোল্লেম, এই বুঝি তবে ঠিকানায় এসে পোঁছিলেম।

সব ভুল। মেলাস্থলে সঙ্গীহারা হয়ে এত রাত্রি পর্যন্ত যা যা আমি ভাবছি, যা যা আমি কোচ্ছি, সব ভুল। সম্মুখের ঘোড়াটা থেমে গেল। সও-য়ার লোকটা এক-বেষ্টন প্রায় বিশ হাত পশ্চাতে হোটে গিয়ে ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক কশাঘাত কোল্লে, ঘোড়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় তীরবেগে অগ্রসর হয়ে তুড়ি-লাফ কেটে অনেক দূরে গিয়ে যেন ঠিকরে পোড়লো, আমি অবাক হয়ে সন্দেহে সন্দেহে কারণ চিন্তা কোত্তে লাগলেম। চিন্তার অবসর হলো না। পশ্চাতে যে দুজন সওয়ার ছিল, তাদের মধ্যে একজন বেশ মিষ্টবচনে উৎসাহ দিয়ে আমারে বোল্লে, "আপনিও ঐ রকম করুন, ঐ লোকটি যেমন বিশ হাত পেছিয়ে গিয়ে অধিক বেগে ঘোড়া ছুট করালে, আপনিও তাই করুন। সম্মুখে একটা নালা আছে, ওসার প্রায় চার হাত, কানায় কানায় জল, ঘোড়া যদি কিনারায় দাঁড়িয়ে লাফ দেয়, একলাফে পার হোতে পারবে না, জলে পড়া সম্ভব ; দূর থেকে ছুট কোরিয়ে লম্ফের অবসর দিলে নির্ব্বিঘ্নে পার হওয়া যায়, আপনি তাই করুন।"

তাই আমি কোল্লেম। সুশিক্ষিত অশ্ব একলম্ফে নালা পার হয়ে গেল। আমার পশ্চাতে যে দুজন সওয়ার ছিল, ঐ রকমে তারাও পার হয়ে এলো ;—এলো, কিন্তু কেহই দাঁড়ালো না। যেমন সারিবন্দী হয়ে আমরা আসছিলেম, সেই রকম সারিবন্দী হয়েই যেতে লাগলেম। অগ্রপশ্চাতে ঘোড়াসওয়ার, মধ্য-স্থলে আমি ; এত পথ এলেম, কাহারও মুখে কোন কথা শুনলেম না। নালা পার হবার উপদেশটি মাত্র একজনের মুখে শুনা হয়েছিল, তার পর আবার সকলেই নিস্তব্ধ।

আমিও নিস্তব্ধ। মহা বিপাকে ঠেকলেম। নালা পার হবার পর অবধি আমার অশ্বপৃষ্ঠের জীনটা অল্প অল্প কম্পিত হোচ্ছিল, অশ্বের গতিবেগে

সেই কম্পন ক্রমশই বেড়ে বেড়ে উঠতে লাগলো, অশ্বপৃষ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে আমি যেন টোলে টোলে পোড়তে লাগলেম। আশ্চর্য ব্যাপার! যারা ভেল্কীবাজী দেখায়, তাদের কত কৌশল সকলেই দেখেন, কিন্তু ঘোড়ার পিঠের জীন, আপনা আপনি কাঁপে, আপনা আপনি টলে, এটা কি প্রকার ভেল্কী, সহজে অনুধাবন করা যায় না। দুই দিকের দুই রেকাবে দুই পা ; জীন-কম্পনে পা আমি ঠিক রাখতে পাচ্ছি না, জীনের ভিতর কি রকম কল আছে, তাই যেন মনে হোতে লাগলো। জীন ঘোরে, জীনের সঙ্গে আমিও ঘুরি ; একবার কাৎ হোলেম ; ঘুরে ঘুরে ঘোড়ার পেটের নীচে আমার মাথা এলো, রেকাব-শুদ্ধ পা-দুটি ঘোড়ার পিঠের উপর উঠলো, আবার আর এক চক্র ঘুরে জীন-শুদ্ধ অশ্বপৃষ্ঠে আমি সওয়ার হয়ে বোসলেম, আবার ঘুরে পোড়লেম, আবার উঠলেম, দুই হস্তে অশ্বের কেশর আকর্ষণ কোরে অশ্বপৃষ্ঠে শুয়ে পোড়লেম ; তবুও স্থির থাকতে পাল্লেম না, আবার ঘুরে ঘুরে ঝুলে পোড়লেম, ঝুলে ঝুলে আবার উপরদিকে ঠেলে উঠলেম, ভোঁ ভোঁ কোরে মাথা ঘুরতে লাগলো, অশ্বের বেগ সংযত করবার চেষ্টা পেলেম, বিফল চেষ্টা, কিছুতেই থামাতে পাল্লেম না। বায়ুবেগের ন্যায় অশ্বগতি, আমি কেবল ঝুলছি আর উঠছি, অশ্বারোহণে সুশিক্ষা না থাকলে কখনই আমি সেই ভাবে অধিকক্ষণ ঝুলতে পাত্তেম না, উঠছি, নামছি, ঝুলছি, ছেলেরা যেমন নাগরদোলায় দোলে, সেই রকমই দুলছি, সত্যই যেন আমি নাগরদোলায়।

বিধাতার নাগরদোলায় দোল খাওয়া আমার একপ্রকার অভ্যাস হয়ে এসেছে। গুরুপত্নী যখন আমারে বিদায় কোরে দেন, তখন আমি এক প্রকার অধঃপতিত, সর্ব্বানন্দবাবু যখন আমারে দয়া কোরে আশ্রয় দেন, তখন আমি একপ্রকার উচ্চে উত্থিত, তার পর আবার রক্তদন্তের তাড়নে পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত ; সংসারের নাগরদোলা উপর্য্যুপরি কতবার কত স্থানে অধঃপতিত হোচ্ছি, মাঝে মাঝে এক এক ঘটনায় একটু একটু সামলে উঠছি, পাঠকমহাশয় পদে পদে আমার এই নাগরদোলায় ঘূর্ণনের বিশেষ বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হোচ্ছেন, আবার এই এক অশ্বপৃষ্ঠে নাগরদোলা! বিধাতা আমারে নাগরদোলায় ঘুরাচ্ছেন, মানুষেরাও ঘুরাচ্ছে, আবার এই চতুষ্পদ অশ্ব আমারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চমৎকার খেলা খেলাচ্ছে। অশ্বারোহণে সুশিক্ষা না থাকলে হয় তো মাটিতে পোড়ে অশ্বপদাঘাতে চূর্ণ হয়ে যেতেম, পৃথিবী থেকে হরিদাসের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয়ে যেতো, কেবল ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাচ্ছি। যে সওয়ার আমার অগ্রগামী, সে একবারও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখছে না ; যারা পশ্চাতে, তারা অবশ্য দেখছে ; এক একবার আমিও তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি ; তারা গম্ভীর। লোকে যেমন গম্ভীরবদনে কোন আশ্চর্য ক্রীড়া দর্শন করে, তারাও সেই রকমে আমার তখনকার সেই দুর্দশা দর্শন কোচ্ছে। উদরের দায়ে যারা পশু-পক্ষী বলিদান করে, রাজ-সরকারের যারা জল্লাদের কাজ করে, জীবের জীবনান্তসময়ে আনন্দ প্রকাশ কোরে তারা হাস্য কোরে থাকে। অশ্বপৃষ্ঠে আমি নাগরদোলায় দুলছি, সেই দশা দর্শন কোরে

আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই দুজন ঘোড়সওয়ারও অবশ্য মনে মনে হাস্য কোচ্ছিল, সে অংশে সন্দেহ বিরহ।

নাগরদোলায় দুলতে দুলতে কতদূর আমি গিয়েছিলেম, মনে হয় না, প্রাণ হাঁই ফাঁই কোচ্ছিল, থেকে থেকে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, আর খানিক-ক্ষণ সেই ভাবে থাকলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হোত। কোথাকার লোক এরা? আমার সঙ্গে এদের কি এত শত্রুতা? আমারে প্রাণে মারবার জন্য কেন এই চক্র বিস্তার? মনে মনে আমি এই সকল আন্দোলন কোচ্ছি, ঘোড়ার উপরে ক্রমাগত ঝুলছি আর উঠছি, তার পর আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিলেম। কতকক্ষণ অজ্ঞান ছিলেম, মনে নাই।

সপ্তম কল্প

এ আবার কে?

যখন চৈতন্যোদয় হলো, তখন আমি দেখলেম, বনমধ্যে একখানি কুটির, সেই কুটিরে পর্ণশয্যায় আমি শুয়ে আছি, আমার মাথার কাছে একটি স্ত্রী-লোক উপবিষ্ট। কে এই স্ত্রীলোক? মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন মনে করে, সব যেন ঠিক, স্বপ্নভঙ্গ হবার পর সকলের সকল কথা মনে থাকে না, স্বপ্নবৃত্তান্ত কেহ কেহ স্মরণ রাখতে পারে, কেহ কেহ পারে না, কিন্তু মূর্চ্ছার অগ্রে যা যা ঘটে, মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সব কথাই মনে হয়। স্মৃতি আমারে পরিত্যাগ কোরে যায় নাই! তিনজন লোক আমার হিতৈষী হয়ে পথপ্রদর্শক হবার অঙ্গীকার কোরেছিল, পদব্রজে কষ্ট হবে বোলে অশ্ব সংগ্রহ কোরে দিয়েছিল, তাদের চক্রে আমার এই দশা। কারা তারা? কেন আমারে এই বিজনস্থানে এনে ফেলেছে, কেনই বা অজ্ঞান অব-স্থায় বনমধ্যে পরিত্যাগ কোরে পালিয়েছে, বুঝে উঠতে পাল্লেম না; পালি-য়েছে কি লুকিয়ে আছে তাও তখন জানতে পারা গেল না। এই স্ত্রীলোকটি কে?—তাদেরই কেহ হবে কিম্বা বনবাসিনী অন্য কোন কামিনী করুণাবশ-বর্ত্তিনী হয়ে আমারে রক্ষা কোত্তে এসেছে, বিনা জিজ্ঞাসায় সেটিও আমি অবধারণ কোত্তে অক্ষম হোলেম।

সূর্য-দর্শনে অনুমান হোল বেলা এক প্রহর অতীত। বনমধ্যে কুটীর। কুটীরের চতুর্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন কোরে আমি অনুভব কোল্লেম, কেহই এখানে বাস করে না। বাসের যোগ্য যে সকল স্থান, সে সকল স্থানে মানুষের ব্যবহারের সামগ্রী থাকে: এ কুটীরে কিছুই নাই। পত্রশয্যায় আমি শয়ন কোরে আছি, মাথার কাছে সেই স্ত্রীলোকটি পত্রাসনে বোসে আছে।

কিছুই যেন আমি দেখ্‌ছি না, বাস্তবিক কিন্তু সেই স্ত্রীলোকের মুখের দিকে আমার নজর আছে। তার দিকে আমি চেয়ে দেখ্‌ছি, তারে কিন্তু সেটি আমি জানতে দিচ্ছি না। আমার চক্ষে যখন তার চক্ষু পড়ে, তখন আমি অন্যদিকে চক্ষু ফিরাই।

কিঞ্চিৎ অগ্রে আমি ভাবছিলেম, কে এই স্ত্রীলোক? এই সময় অনেক পরিমাণে সে ভাবনা দূরে গেল। একরকমে সেই স্ত্রীলোকটি আমি চিনলেম। সে আমারে চিনতে পেরেছিল কি না, তা আমি বোলতে পারি না। বাঙালীর ঘরের কন্যা, মুখশ্রীতে সে লক্ষণ বেশ জানা যাচ্ছে; কিন্তু বাঙালীর মেয়ে আপনাদের ঘরে যেমন থাকে, যেমন অলঙ্কারবস্ত্র পরিধান করে, যে ভাবে মস্তকে কেশবিন্যাস করে, এ মূর্ত্তিতে সে ভাবের অভাব। বাজীকরী ভানুমতীরা যে রকমে কাপড় পরে, সেই ভাবে মালকোঁচ্চা কোরে কাপড় পরা, বক্ষে রক্তবর্ণ কাঁচুলি, সেই কাঁচুলির উপর বসনাঞ্চল খুব চোস্ত কোরে বাঁধা; গলায় একছড়া তবলকীর মালা, দুই কানে দুটি রূপার মাকড়ী, তাতেও তবলকী গাঁথা; মাথার চুল কিছু খাটো খাটো, সে চুলগুলি কপালের দিকে টেনে বামদিকে নাড়ুগোপালের চূড়ার মত চূড়াকরা। একরকম ছদ্মবেশ বোল্লেও বলা যায়। তথাপি মুখ দেখে তারে আমি চিনলেম।

অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সেই স্ত্রীলোক আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমার কি ক্ষুধা হয়েছে? তুমি কি এখন স্নান কোরবে?" প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় আমি এসেছি? যারা এনেছে, তারা কোথায় গেল?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে স্ত্রীলোকটি সেখান থেকে উঠে গেল; একটু পরে এক কলসী জল আর একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র এনে সে আমারে স্নান কোত্তে বোল্লে। আমি কথা কোইলেম না। স্ত্রীলোক হুড় হুড় কোরে আমার মাথায় এক কলসী জল ঢেলে দিলে, মার্জ্জনী অভাবে আমার মস্তক গাত্র জলসিক্ত থাকলো; শুষ্ক বস্ত্রখানি পরিধান কোরে সিক্ত বস্ত্রখানি আমি পরিত্যাগ কোল্লেম। স্ত্রীলোকটি আবার চোলে গেল; আবার একটু পরে গুটিকতক ফল আর এক ভাঁড় জল এনে আমারে খেতে দিলে। দুটি ফল ভক্ষণ কোরে আমি জল খেলেম। কিছুই ভাললাগে না। যে অবস্থায় আমি পতিত, সে অবস্থায় কিছু ভাল লাগাও সম্ভব নয়।

বেলা যখন প্রায় দুই প্রহর, সেই সময় সেই স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ কোরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "যদি তোমার বিশ্বাস হয়, বিশ্বাস কর, আমি গৃহস্থকন্যা, আমার হস্তে অন্ন গ্রহণ কোত্তে তোমার কোন বাধা আছে কি না?"—অন্নগ্রহণে আমার ইচ্ছা ছিল না, গৃহস্থকন্যা সামান্য কথা, ব্রাহ্মণের কন্যা বোলে পরিচয় দিলেও অন্নগ্রহণে আমার রুচি হোতো না। আমি নিরুত্তর থাকলেম। অনেকক্ষণের পর সেই স্ত্রীলোককে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ জায়গায় তুমি কেন থাক? আর কে কে এখানে থাকে?"

স্ত্রীলোক উত্তর কোল্লে, "কেহই থাকে না, আমিও থাকি না, নূতন এসেছি। যারা তোমারে এনেচে, তারাও নূতন, আমিও নূতন। যখন

যেখানে তারা যায়, আমারেও সঙ্গে নিয়ে যায়, যেখানে তারা আড্ডা করে, আমারেও সেইখানে থাকতে হয়।"

আমি মনে কোল্লেম, যখন যেখানে যায়, তখন সেইখানে আড্ডা করে, বেদেদের টোলফেলা ; সেই জন্যই এই স্ত্রীলোককে ভানুমতীর সাজে সাজিয়ে রেখেছে। তারা বাজীকর, এখন আমি বেশ বুঝলেম। ঘোড়ার পিঠের জীনটা ঘুরে ঘুরে আমারে নাগরদোলায় দুলিয়েছিল, সেটা বাজীকরের কৌশল, এখন ঠিক বুঝলেম ; কিন্তু এই স্ত্রীলোক কি কোরে বাজীকরের দলে মিশে আছে, সেটি আমি ভাল কোরে বুঝতে পাল্লেম না। রাত্রিকালে তাদের মুখ যদি ভাল কোরে আমি দেখতে পেতেম, তা হোলেও এক রকমে কিছু অবধারণ কোত্তে পাত্তেম, কিন্তু ঘোর অন্ধকারে সে তিনটে লোকের মুখ-দর্শনে আমার সুবিধা হয় নাই ; অজ্ঞানাবস্থায় আমারে এইখানে ফেলে রেখে তারা গা-ঢাকা হয়েছে, আমি এখন এই স্ত্রীলোকটির জিম্মায়।

বেলা ক্রমশই অধিক হোতে লাগলো। স্ত্রীলোকটিকে আমি বোল্লেম, "আমার ক্ষুধা নাই, আহারে আমার রুচি নাই, আমার জন্য তুমি কেন আর কষ্ট পাও ? তুমি গিয়ে আহার কর, তোমার লোকেরা যদি এসে থাকে, তাদের আহার করাওগে, আর একবার আমারে দেখা দিও।"

স্ত্রীলোক বোল্লে, "পালিও না, পালাবার চেষ্টা কোরো না, পালাতে পারবে না, এ স্থানটা অরণ্যময়, চারিধারে গড়খাই খালের ভিতর অগাধ জল, পালাবার উপায় নাই, পালাবার চেষ্টা কোল্লেই বিপদে পোড়বে।"

আমি ঈষৎ হাস্য কোল্লেম, কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে বোল্লেম, "যারা আমারে এখানে এনেছে, তাদের সঙ্গে একবার দেখা না কোরে কোথাও আমি যাব না, তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার গৃহকর্ম্মে মনোযোগী থাক। আর দেখ, তোমারে যেন কোথায় আমি দেখেছি, এই রকম মনে হোচ্ছে, তোমার শরীরে দয়া আছে, তাও আমি বুঝতে পাচ্ছি ; আমার প্রতি দয়া রেখো ; কাজকর্ম্ম সারা হোলে আর একবার তুমি আমার কাছে এসো ; তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি কথা আছে।"

এইবার সটান আমার মুখের দিকে চেয়ে, মুখখানি একটু ভারী কোরে, স্ত্রীলোকটি কুটির থেকে বেরিয়ে গেল। আমি একাকী হোলেম। সূর্য কাহারও অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করেন না। আমি বিপদে পোড়েছি, দিনমানে একটু নির্ভয় থাকি, রাত্রিকালে বড় যন্ত্রণা, তুমি একটু থেকে যাও ; আমার উপকারের জন্য তুমি একটু অপেক্ষা কর। যোড়হাতে মিনতি কোরে এরূপ প্রার্থনা কোল্লেও সূর্যদেব সে প্রার্থনা শ্রবণ করেন না। সেই অবস্থায় আমারে রেখে দিবাকর পশ্চিমাচলে অস্ত গেলেন। অন্ধকারে সেই কুটিরমধ্যে আমি থাকলেম। একাকী। সে স্ত্রীলোক আর ফিরে এলো না।

স্ত্রীলোকের মুখে আমি শুনেছি, এখানে তারা নূতন। ভালমানুষ নয় ; ভালমানুষ হোলে অবশ্য লোকালয়ে থাকতো, বনের ভিতর থাকতো না, বনের ভিতর লুকিয়ে আছে, নিশ্চয়ই দুষ্ট মতলব। যে প্রকারে ঘোড়ায় তুলে এই বনের ভিতরে তারা আমারে এনেছে, তাতে আর নিশ্চয়তার বাকী কিছুই

নাই। ঐ স্ত্রীলোকটি আমার চেনা ; যা বোলে আমি চিনেছি, তাই ঠিক ; বসন-ভূষণের পরিবর্ত্তন হয়েছে, মুখের গঠনের পরিবর্ত্তন হয় নাই, আমার চক্ষেরও ভুল হয় না ; যা ভেবে চিনেছি, তাই ঠিক।

মহা বন, চারিদিকে গড়খাই, এই গড়বন্দী অরণ্যমধ্যে সেই তিনটি লোক আছে আর ঐ স্ত্রীলোকটি আছে, আরও কেহ কেহ থাকলেও থাকতে পারে। কুটির কেবল এই একখানি নয়, আরও কুটির আছে, সেই কুটিরে সেই স্ত্রী-লোকটি গিয়েছে। ফিরে আসবার কথা আছে, আমিও ফিরে আসবার আম-ন্ত্রণ কোরেছি ; কিন্তু এলো না। কতক্ষণ আমি এই অন্ধকারে একাকী অব-স্থান কোরবো, তাই ভাবতে লাগলেম।

সে ভাবনা বড় নয়, তদপেক্ষা বড় ভাবনায় আমার হৃদয় ব্যাকুল। আবার আমি অমরকুমারীকে হারালেম! এত কষ্টে উদ্ধার কোরে আনলেম, এনেও নিরুদ্বেগ হোতে পাল্লেম না। হাকিমের বাসায় অমরকুমারী আছেন, মণি-ভূষণ রক্ষক আছেন, দুষ্টলোকেরা সেখান থেকে অমরকুমারীকে হরণ কোত্তে পারবে না, সেটি আমি বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু অমরকুমারীকে আমি দেখতে পাচ্ছি না ; এই বড় আক্ষেপ।

কোথায় আমি এলেম? সেই তিনজন লোক কোথাকার? কেন তারা তেমন কোরে আমারে এই বনের ভিতর ধোরে নিয়ে এলো? আমি তাদের কাছে কি অপরাধ কোরেছিলেম? কি অপরাধে তারা আমার শত্রু? তারাও কি রক্তদন্তের দলের লোক? তাই হবে। রক্তদন্তের লোক সর্ব্বঠাঁই! যেখানে আমি সেইখানেই রক্তদন্তের চর! প্রতাপ সামান্য নয়! আচ্ছা, রক্তদন্তের লোক তারা, এই যদি ঠিক হয়, তবে তারা একটি মেয়েমানুষের কাছে আমারে রেখে সোরে গেল কেন? সম্মুখে আর এলো না কেন? বেঁধে রাখলে না, প্রহার কোল্লে না, ভয় দেখালে না, অমনি অমনি সোরে গেল ; মানে কি? শীঘ্র যদি আমি এখান থেকে মুক্ত না হোতে পারি, অবশ্যই আমার অনু-মান একজন হাকিমের বাসাতে আমি থাকি, পূর্ব্বদিন বৈকালে আমি বেরিয়ে এসেছিলেম, সমস্ত রাত্রির মধ্যে ফিরে যাই নাই, আজও সমস্ত দিন গেলেম না, অবশ্যই অনুসন্ধান হবে ; হয় তো অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে আমি আবদ্ধ, নগরে আমারে পাওয়া যাবে না ; বনে আমি আছি, এ সংবাদও প্রচার হবে না, অন্বেষণকারীরা কোথায় আমার দর্শন পাবে?

কপট-চাতুরীতে যারা আমারে এই বনের ভিতর এনেছে, তারা আর এখন দেখা দিচ্ছে না। কি মতলবে এনেছে, তাও আমি জানতে পাচ্ছি না। প্রাণে মারবে কি বাঁচিয়ে রাখবে, তারাই জানে। আমি মরি আর বাঁচি, তাতে আর আমার ক্ষোভ থাকছে না। কেন যে আমি পৃথিবীতে এসেছিলেম, পাঠাবার অগ্রে বিধাতার মনে যে কি ছিল, সে তত্ত্ব বিধাতারই সুগোচর ; আমার ভাবনা বৃথা। জন্ম হয়েছে, বেঁচে আছি, এইমাত্র। এই বয়স পর্য্যন্ত জীয়ন্তে আমি মৃতবৎ : মরণেও আমার ক্ষোভ নাই। যদি মরি, অমরকুমারী নিরা-পদ, এটি আমি জেনে যাব। আপাততঃ রক্ষক একজন হাকিম, অভিভাবক

মণিভূষণ দত্ত। এখানকার কার্য সমাধা হবার পর অমরকুমারীকে সঙ্গে কোরে মণিভূষণ দেশে যাবেন, বৃদ্ধ শান্তিরাম দত্ত অমরকুমারীরে সযত্নে পালন কোরবেন, দীনবন্ধুবাবু পশুপতিবাবু তত্ত্বাবধান কোরবেন। অমরকুমারীর বিবাহ হবে।

অহো! অকস্মাৎ আমার প্রাণ কেন এমন করে? বড় গরম! প্রাণ আই ঢাই কোচ্ছে! এতক্ষণ তো এ রকম ছিল না, হঠাৎ কেন এমন হয়? অমরকুমারীর বিবাহ হবে, আমি দেখতে পাব না, সেই জন্যই কি প্রাণ আমার এত অস্থির?

ছুঁড়িটা কোথায় গেল? আমারে চৌকি দিবার জন্য নষ্টলোকেরা তারে এখানে বোসিয়ে রেখেছিল, আমি পালাতে পারবো না; ছুঁড়ী আমারে এই কথা বোলে ভয় দেখিয়ে গেল, আর এলো না। পিপাসায় যদি আমার ছাতি ফাটে, এক বিন্দু জল পাবো না। ছুঁড়িটা গেল কোথায়? কেন এলো না? বোধ হয়, আমারে চিনতে পেরেছে। যখন আমার জ্ঞান ছিল না, তখন সে ছিল; যখন আমি চৈতন্য পাই, তখনও সে ছিল, কথাও কোয়েছিল, চিনেছে, তেমন ভাব কিছুই জানায় নাই। আমি চিনেছি, সে ভাবটি আমিও তারে জানাই নাই। এখন আমি কি করি?

ভাবছি, এমন সময় একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে কোরে একটা লোক সেই কুটিরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে, একবার তার মুখের দিকে চেয়ে আমি মাথা হেঁট কোল্লেম। সে লোককে পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই, রাত্রে যারা আমাকে ঘোড়ায় তুলে বনে এনেছে, সেই লোকটা তাদের মধ্যে একজন, তাতে আর আমি কোন সন্দেহ রাখলেম না, কিন্তু তারে দেখে আমার কোন প্রকার ভয় হলো না। প্রাণে যার মায়া নাই, শত্রু-দর্শনে তার কোন প্রকার ভয় হোতেও পারে না। আমি ভয় পেলেম না। পূর্ব্বরাত্রে পথের ধারে যখন তারা আমাকে দেখে, আমি যখন তাদের দেখি, রাত্রের অন্ধকারে তখন আমি তাদের মুখ ভাল কোরে দেখতে পাই নাই; তথাপি আমি স্থির কোল্লেম, সেই তিনজনের মধ্যেই এই একজন।

মশাল হাতে কোরে লোকটা খানিকক্ষণ নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো। তার পর ভাঙা কাঁসি যেমন খন খন শব্দে বাজে, সেইরূপ আওয়াজে সগর্জ্জনে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি রে ছোকরা! তোর নাম হরিদাস? এই বয়সে ততটা ধূর্ত্ততা তুই কোথায় শিখেছিস? আমাদের হাতে এইবার সেই ধূর্ত্তটা ভাঙবে।"

প্রথমে তার মুখ দেখে আমি মাথা হেঁট কোরেছিলেম, এই সময় মাথা তুলে তার মুখ পানে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তোমরা কে?

হি হি শব্দে হাস্য কোরেই সেই লোক উত্তর কোল্লে, "আমরা কে? কোন আমরা? আমাদের পরিচয় অনেক। সে সকল পরিচয়ে তোর কি দরকার?"

ধীরস্বরে আমি বোল্লেম, দরকার আমার কিছুই নাই, তবে কি না, বিনা দোষে আমারে বনবাসে এই কারাযন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হোচ্ছে, অকারণে তোমরাই আমার এই যন্ত্রণার হেতু, সেই জন্যই আমি জানতে চাই, তোমরা কে?

কেন আমারে ধোরেছ? একবার আমি ভেবেছিলেম, অদ্য কোন লোককে ধর-বার তোমাদের মতলব ছিল, অন্ধকারে ঠিক কোত্তে না পেরে আমারেই ধোরে ফেলেছ. এখন দেখছি, তুমি আমার নাম পর্যন্ত জানো, কেন আমারে ধোরেছ, সেইটি জানতে পারলে,—

মশালটা একধারে নামিয়ে রেখে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোরে, উগ্রস্বরে সেই লোক বোলে উঠলো, "জানতে পারলে তুই কি কোরবি? ভারী চালাক! এবারে আর চালাকী খাটছে না যাদু! গুজরাটের বরদা রাজ্য নয়! এ রাজ্য প্রবল প্রতাপ ইংরেজের, এখানে লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া বড় শক্ত কথা! একজন বিশ্বাস-ঘাতক রাজকুমার, কে জানে রাজকুমার কি প্রেতকুমার,—সে ব্যক্তি ছদ্মবেশে বীর-মল্লের আশ্রয়ে থেকে, বীরমল্লকে ধোরিয়ে দিয়েছে। হস্তী-পদতলে নিক্ষেপ কোরে সেই বীর-পুরুষের বীরদেহ ধূলিসাৎ কোরেছে, তুই তার সহায় হয়ে-ছিলি, সেই নিমখারাম তোর মুরুব্বি হয়েছে, এইবার দেখা যাবে, কে তোরে রক্ষা করে! তুই হয় তো মনে করেছিস, আমরা নিকটে থাকি না, তোরে আমরা বেঁধে রাখি নাই মনে কোল্লেই তুই পালাতে পারিস, সেই সাহসেই তোর বুকে ভয় নাই। হাঁ, আমরা নিকটে থাকি না, সম্মুখে আসি না, এ কথা সত্য, কিন্তু দূরে দূরে আমরা বিচরণ করি। দূরে থেকে তোকে পরীক্ষা করি। আমরা কেবল তিনজন নহি। তুই যা মনে ভাবিস, তা নয়, আমরা অনেক, আমাদের তাঁবেদার বন্দুকধারী লোকেরা গড়ের ধারে ধারে দিবারাত্রি পাহারা দেয়। পালা-বার চেষ্টা কোল্লেই তুই মারা যাবি।

লোকটা নিস্তব্ধ হলো। মশাল জ্বেলছিল, লোকের মুখের দিকে চেয়ে আমি বুঝলেম, তার কথাগুলো আমার উপর কতদূর কাজ কোরেছে, রক্ত-বর্ণ বক্রনয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই লোকটা তাই পরীক্ষা কোচ্ছে। বাস্তবিক ঔষধ ধরে নাই, কথাগুলো আমার উপর কিছুই কাজ করে নাই ;—

কাজ করা মানে আমার ভয় পাওয়া। আমি কিছু মাত্র ভয় পাই নাই, আমি তখন ভাবছিলেম, লোকটা মিথ্যাবাদী ; দুষ্টলোকে সত্যবাদী হয় না। ধূর্ত্তলোকে সত্যকথা বলে না। জানি, তথাপি আমি মনে কোল্লেম, এ লোক-টার আগাগোড়া সমস্তই মিথ্যাকথা। যে স্ত্রীলোকটা আমার কাছে ছিল, আমি তারে চিনেছি, সে এখনও এ সব লোকের দলে দস্তুরমত অভিষিক্ত হয় নাই। অকপটে সে আমারে বোলেছে এ বনে তারা নূতন ; এ লোকটা বোলছে, তাঁবে-দার লোকেরা দিবারাত্রি গড়ের ধারে পাহারা দেয়। গড় যেন এই সব লোকের ইস্তমুরারী ভোগ-দখলী মৌরাশী পাট্টাই। পুরুষানুক্রমে এরা যেন এই গড়-বন্দী অরণ্যের অবিরোধ অধিকারী! কাণ্ডই মিথ্যা।

নানা কথায় আমারে ভয় দেখিয়ে, লোকটা সেখান থেকে চলে গেল। মশালটা নিয়ে যেতে ভুলে গেল না। কুটির অন্ধকার। আবার আমি ঘোর অন্ধকারে একাকী স্ত্রীলোকটা এলো না। গত রাত্রে আমি উপবাস কোরেছি, আজি দিবা-ভাগে গোটা দুই ফল খেয়েছি ; ক্ষুধার উদ্রেক নাই, কিন্তু পিপাসা বারণ করা যায় না। পিপাসা হোচ্ছে ; স্ত্রীলোকটা যদি আসে, একটু জল পাবার

আশা হয়। জল পিপাসা অপেক্ষা সে সময় আমার আর একটা পিপাসা ছিল। যা আমি ভেবেছি, যা আমি স্থির করেছি, যা বলে চিনেছি, বাস্তবিক সেই স্ত্রীলোকটি, সেই স্ত্রীলোক কি না, সেই তত্ত্বটি পরিজ্ঞাত হবার পিপাসা।

অন্ধকারে আমি বসে আছি, প্রায় অর্দ্ধদণ্ড অতীত। বাহির দিকে একটু দূরে অল্প অল্প আলো দেখা গেল। যে লোকটা মশাল হাতে কোরে বেরিয়েছে, সেই লোক হয় তো আবার ফিরে আসছে, এইরূপ আমি মনে কোল্লেম। তা নয়,—সে নয় ; আলো যখন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হলো, তখন দেখলেম, সেই পূর্ব্বকথিত স্ত্রীলোক। কুটিরদ্বারে ক্ষুদ্র এক লণ্ঠন হস্তে সেই স্ত্রীলোক।

স্ত্রীলোক কুটিরমধ্যে প্রবেশ কোল্লে, লণ্ঠনটি পাশে রেখে আমার নিকটে এসে বোসলো, অতি নিকটে। আমি তার মুখ দেখলেম। মুখ ম্লানও নয়, মুখে হাসিও নাই ; অথচ ভাবে যেন একটু হাসি হাসি বুঝা গেল। সেইভাবে সেই মুখখানি ঘুরিয়ে সে আমারে বোল্লে, "কেমন শুনলে ? যা আমি বোলেছিলেম, তাই ঠিক কি না ? পালাবার উপায় নাই।"

সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমি অনাবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম। পূর্ব্বাবধি যে কথাটি আমার মনে মনে জাগছিল, সেই কথাই অগ্রে উত্থাপন করি, এই আমার অভিলাষ ; কিন্তু হলো না, স্ত্রীলোক পুনরায় আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "যে লোকটি এসেছিল, তোমারে আর কি কি কথা বোলে গেল ? আমি তোমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলেম, তার পর অনেকক্ষণ অনুপস্থিত ছিলেম, তাতে কি তার রাগ রাগ ভাব দেখলে ?"

আর আমি ধৈর্য রাখতে পাল্লেম না, ক্ষুধা আমার পূর্ব্বেই দূর হয়েছিল, একটু পূর্ব্বে একটু পিপাসা এসেছিল, ছুঁড়িটার বাচালতা দেখে, সে পিপাসাও দূর হয়ে গেল। এক নিশ্বাসে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "নবীন! এ বনে কি তুমি নবীন তপস্বিনী ?"

প্রশ্ন শ্রবণ মাত্র, স্ত্রীলোকটা চমকে গেল। আঁতে ঘা লাগলো। তার চক্ষু তখন আমার চক্ষের দিকে ছিল না। সহসা সমসূত্রে আমার চক্ষের দিকে চক্ষু উত্তোলন কোরে ছুঁড়ী খানিকক্ষণ হাঁ কোরে থাকলো ; যতক্ষণে অন্ততঃ দশবার চক্ষের পলক পড়া সম্ভব, ততক্ষণের মধ্যে একটিবারও পলক ফেলে না। ভাব আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পাল্লেম তার নাম আমি জানতে পেরেছি, নাম ধোরেই সম্বোধন কোরেছি, তার পরিচয় আমি জানি, সে জন্যই তার বিস্ময়।

বিস্ময়ে জড়ীভূতা সেই নবীন বন-বাসিনী চমকিতনয়নে চেয়ে অবাক হয়ে আছে, সেই ভাব দর্শন কোরে পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "নবীন! তোমার এ দশা কতদিন ? কতদিন তুমি এই দস্যুদলের সহচারিণী ? আমি এখান থেকে পালাতে পারবো না, সেই কথা তুমি বোলেছিলে, এবার তুমি আসবার কিছু পূর্ব্বে যে লোক এখানে এসেছিল, সেই লোকটিও সেই কথা বোলে গেল। তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ? আমার সঙ্গে তোমার কি শত্রুতা ? আমারে তুমি চিনতে পেরেছ ? তোমার চাউনি দেখেই তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার ভাগ্যে এই ছিল, স্মরণ কোরে আমার প্রাণে কষ্ট

হোচ্ছে ; কিন্তু এ কি বিপরীত ! আমি বিপদে পড়েছি, তাতে তুমি আহ্লাদিনী ! ধর্ম্মভাবটা তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছ। যে পথে তুমি এখন দাঁড়িয়েছ, যারা যারা সে পথে আসে, তারা সকলেই ধর্ম্মভাব ভুলে যায়। দেখ নবীনকালি ! দুই একদিন নয়, অনেকদিন তোমাদের বাড়ীতে আমি ছিলেম, তোমাদের সংসারে যাতে মঙ্গল হয়, তোমরা যাতে সুখে থাক, সাধ্যমত সেই চেষ্টাই আমি কোরেছি, তাও তুমি জানো ; কি অবস্থায় কি প্রকারে এই বিজন বনমধ্যে আমি এসে পড়েছি, তাও তুমি জেনেছ ; এ অবস্থায় তোমার কি করা কর্ত্তব্য, সেটা তুমি ভাবলে না ; যাতে আমি এখানে থেকে পালাতে না পারি, তাই তুমি ইচ্ছা কোচ্ছো ! চিরদিন আমি সত্যধর্ম্মের সেবা করি, তুমি নিশ্চয় জেনো, তোমার ইচ্ছা কখনই ফলবতী হবে না। মানুষ পৃথিবীতে আসে, চিরকাল পৃথিবীতে থাকে না। মানুষ কখনও অমর হয় না। কিছুদিন ইহসংসারে সুখভোগ অথবা দুখভোগের পর, মানুষকে এক অজ্ঞাত দেশে চলে যেতে হয় ; সে দেশের নাম পরলোক। সে লোকের অবস্থার নাম পরকাল। সে লোকে সে কালেও সুখ-দুঃখের ভোগ আছে। তুমি অভাগিনী, পাপবুদ্ধির বশবর্ত্তিনী, পাপীলোকের সঙ্গিনী, এ সব ঠিক ; কিন্তু অবকাশ কালে নির্জ্জনে এক একবার পরকালের কথাটা মনে কোরো।”

এইবার নবীনকালীর ঘন ঘন চক্ষের পলক পড়তে লাগলো। তার সর্ব্ব-শরীর সিউরে উঠলো ; কি যেন আমারে বোলবে বোলবে। মনে কোল্লে, দুই তিনবার একটু একটু হাঁ কোল্লে, কথা ফুটলো না, বোলতে পাল্লে না।

পাঠক-মহাশয় হয় তো এই স্ত্রীলোকটির পরিচয় জানবার নিমিত্ত উৎসুক হয়ে থাকবেন। এই স্ত্রীলোক বঙ্গবাসিনী। শেষকালে কাশীবাসিনী হয়েছিল। কাশী রমণবাবুর বাড়ীতে যখন আমি আশ্রয় পাই, তখন তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে আমার জানাশুনা হয়। রমণবাবুরা তিন সহোদর। তিনি জ্যেষ্ঠ, রামশঙ্কর মধ্যম, মতিলাল কনিষ্ঠ। তাঁদের পিসীমার দুটি কন্যা, সেই দুটি কন্যার মধ্যে একটি কন্যা এই নবীনকালী। রামশঙ্কর একরাতে পিসীমার হাতের অঙ্গুলিগুলি ছেদন কোরে, মেজ বৌমার গায়ের অলঙ্কারগুলি কেড়ে নিয়ে, বাড়ী থেকে পলায়ন করে। সেই রাত্রেই এই নবীনকালী নিরুদ্দেশ ! এতদিন কোথায় ছিল, প্রকাশ ছিল না ; এতদিনের পর পড়বি তো পড়, আমারই নজরের উপর ! দর্শনমাত্রেই আমি চিনেছি ; অংশ চিনতে কিছু বাকী আছে। সঙ্গে সঙ্গে রামশঙ্কর আছে কি না, সেইটি এখন অনিশ্চিত।

পরকালের নামে নবীনকালী সিউরে উঠছে, চমকে উঠেছে ; এতক্ষণ ডেকে ডেকে কথা কোচ্ছিল, এই সময় কিছু নরমসুর ধোল্লে ; বিষাদে ম্লানমুখী হয়ে নরমসুরে আমারে বোল্লে, “না হরিদাস ! অমন কোরে তুমি আমারে ভয় দেখিও না ! কাশীবাস আমার ভাগ্যে নাই ; বিশ্বেশ্বর আমারে কাশীতে রাখলেন না, তাড়িয়ে দিলেন, সেই জন্যই আমার নরকভোগ !”

এই দেখ ! পাপিয়সী ! কেমন কোরে আপনার মুখে আপনি আগুন দেয় দেখ ! হতভাগিনী স্বৈরিনী। বিশ্বেশ্বর তোমারে তাড়িয়েছেন, পাপমুখে এমন কথা বোলো না। বিশ্বেশ্বরপুরী তোমারে ভাল লাগলো না, রামশঙ্করের

প্রেমে মন মজে গেল, মুক্তিক্ষেত্র পরিত্যাগ কোরে রাতারাতি রামশঙ্করের সঙ্গে তুমি পালিয়ে এলে! বিশ্বেশ্বরের নিন্দা করবার সময় তোমার পাপ-রসনা অবসন্ন হয় না, এই বড় আশ্চর্য।

নবীনকালী আরও জড়সড়; আরও নরম হয়ে আরও অনুতাপ কোরে বোল্লে, "না হরিদাস! আর তুমি আমারে ওরকম তিরস্কার কোরো না; বিশ্বেশ্বর আমারে তাড়ান নাই; পাপে আমার মতি ছিল, কালভৈরব আমারে তাড়া কোরেছিল! তাও না! পাপে আমার মতি হয় নাই, একজন আমারে কুমতি দিয়ে ছিল! সেই রামশঙ্কর আমার পরকালের পথ বিষময় কোরে দিয়েছে, নরকের অগ্নি নরকের বিষ অহরহ আমারে দগ্ধ কোচ্ছে, জর্জ্জরীভূত কোচ্ছে; ভুলিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও; নরকের মূর্ত্তি আর আমারে তুমি দেখিও না! আচ্ছা হরিদাস! আমি যে সেই কুলকলঙ্কিনী নবীনকালী, এখানে এ বনে, তা তুমি কেমন কোরে চিনেছ?"

মৃদুহাস্য কোরে আমি বোল্লেম, ভানুমতী সেজে যে হরিদাসের চক্ষে ধাঁধা লাগান বড় শক্ত কথা! তোমার মত শত শত নবীনকালীও আমার চক্ষে ধাঁধা দিতে পারে না। একবারমাত্র তোমার মুখখানি দর্শন কোরেই আমি ছদ্মবেশের ছদ্ম-আবরণ ভেদ কোরে ফেলেছি। ধরা তুমি দাও কি না দাও, তোমার নিজ-মুখে নিজ পরিচয় প্রকাশ হয় কি না হয়, সেই প্রতীক্ষায় আমি চুপ কোরে-ছিলেম। বোধ হয়, তোমার ইচ্ছাও ছিল না, পরিচয় দেওয়া; বিশ্বেশ্বর দেওয়াইলেন। তুমি এখন বুঝতে পেরেছ, নরকভোগ। নিজ মুখে স্বীকার। দয়াময় বিশ্বেশ্বর তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ কোরেছেন। আচ্ছা, নবীন! রাম-শঙ্কর কি তোমার সঙ্গে আছে?

এ প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা কোরবো, কলঙ্কিনী সেটা ভাবে নাই; প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। প্রশ্নটা ঘুরিয়ে দ্বিতীয়বার আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তুমি কি রামশঙ্করের সঙ্গে আছ? সে প্রশ্নেও নবীনকালী কোন উত্তর দিলে না। কাশী থেকে ঢাকা! পলায়নের দৌড় কম নয়! সরাসর এক যাত্রায় ঢাকা, এমনও সম্ভব নয়। এরূপ পাপ-কার্য্যের রীতি-পদ্ধতি যে প্রকার, সেই প্রকার পদ্ধতিতেই নানা স্থানে এরা পরিভ্রমণ কোরেছে, সেটি আমি অনুভবে বুঝে রাখলেম। আর এক তত্ত্ব আমার মনে এলো। মশালহাতে কোরে যে লোকটা আমার কাছে এসেছিল, সে লোক রামশঙ্কর নয়; কিন্তু সে বোলে গিয়েছে, তারা অনেক লোক; দিবারাত্রি গড়ের ধারে ধারে বন্দুকধারী পাহারা। কথাটা সত্য কি না? নবীনকালীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সমান প্রকৃতির কত লোক এই বনে বাস করে? পথে আমার দেখা পেয়ে তিনজনে আমারে এখানে এনেছে। সত্য কি কেবল তিনটি লোক তোমার রক্ষাকর্ত্তা?

নিৰ্ব্বাকে অল্পক্ষণ আমার নয়ন নিরীক্ষণ কোরে নবীনকালী আমারে এক প্রশ্ন দিলে। সে প্রশ্ন আমার অভাবনীয়। নবীনকালী জিজ্ঞাসা কোল্লে, "ও কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর? কম লোক যদি হয়, তা হলে কি তুমি পালাবে?

পালাবার উপায় থাকলে আমি পালাবো, এই ভাব আমার মনে ছিল। কাপুরুষের মত পলায়ন কোত্তে আমার ইচ্ছা ছিল না; যদি পালাতে হয়,

বীরত্ব দেখিয়ে জয়ী হয়ে পালাবো, এই আমার মতলব। প্রশ্নের উত্তরে আমি বোল্লেম, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমারে তুমি নূতন প্রশ্ন দিচ্ছ, এটা ঠিক হোচ্ছে না ; আগে আমার প্রশ্নের উত্তর কর, তার পর আমার মনের কথা শুনতে পাবে।

নবীনকালী বোল্লে, "অল্প দিন হলো, আমরা এখানে এসেছি। যে তিন-জনকে তুমি দেখেছ, তারাই এখানে থাকে। রাত দিন এক জায়গায় বোসে থাকে না, ঠাঁই ঠাঁই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ; তাদের ভিতর রামশঙ্কর আছে কি না, সে কথা তুমি আমারে জিজ্ঞাসা কোরো না, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না। এখন তোমার কথা হোচ্ছে, কেবল সেই তিনজন মাত্র এ বনের অধিকারী কি না। হাঁ, আপাততঃ অধিবাসী তিনজন, কিন্তু এই কদিনের মধ্যে আমি দেখেছি, আরও দুটি লোক একদিন এখানে এসে ঐ তিনজনের সঙ্গে ফুসফুস কোরে কি পরামর্শ কোরে গিয়েছে ; পরামর্শ সব আমি শুনতে পাই নাই। একজন কেবল দুই একবার একটু বড় বড় কোরে তোমার নাম কোরেছিল, তাই আমি শুনেছি ; তাই শুনেই আমি বুঝেছিলেম, তুমি ঢাকায় এসেছ ; তার পর আর কোন উচ্চবাচ্য ছিল না ; আজ সকালবেলা তোমারে আমি এখানে দেখলেম।

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "দেখে তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়েছিল ? আপন ইচ্ছায় আমি এসেছি, কিংবা আর কেহ আমারে এনেছে, কি তুমি ভেবেছিলে ?"

নবীনকালী উত্তর কোল্লে, "নিবিড় বন, হিংস্র জন্তুর বাসভূমি, বিরাম-কানন অথবা ক্রীড়া-কানন নয়, ইচ্ছাপূর্ব্বক রাত্রিকালে তুমি এখানে আসবে, এমন আমি ভাবি নাই ; কারা তোমারে ধোরে এনেছে, সেই কথাই আমি ভেবেছিলেম।

আমি।—ভেবে তোমার আনন্দ হয়েছিল, কিংবা আমার এই অবস্থা দেখে আমার কষ্টে তুমি কষ্ট অনুভব কোরেছিলে ?

নবীন।—আমি তোমারে চিনেছিলেম। কাদের হাতে তুমি ধরা পড়েছ, সেইটি মনে কোরে আমি কষ্ট অনুভব কোরেছিলেম।

আমি।—হাঁ হাঁ, তা হোতে পারে ! তোমার মনটি বড় ভাল ! কারা আমারে ধোরেছে তা তুমি জানতে না, এখনো বোধ হয় জান না, প্রাতঃকালে আমারে এখানে দেখেই তোমার কষ্ট হয়েছিল, আনন্দ হয় নাই, এই তো তোমার কথা ? আচ্ছা, এখন জানতে পেরেছ, কাদের হাতে আমি ধরা পোড়েছি ?

নবীন।—(নিরুত্তর)।

আমি।—চুপ কোরে থাকলে হবে না, মিথ্যাকথাও খাটবে না, আমার সরল প্রশ্নের সরল উত্তর দাও।

নবীন।—উত্তর আমি দিতে পাচ্ছি না, গুর গুর কোরে বুক কাঁপছে ! যারা তোমারে ধোরেছে, এখন তারা আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

আমি।—দেখ নবীনকালী, পূর্ব্বাবস্থা মনে কর। এখন তুমি কাশীবাসিনী নও ; কাশীতে তুমি যেমন ছিলে, তোমার মন সেখানে যেমন ছিল, এখানে

এখন তার সম্পূর্ণ বিপরীত ; নষ্ট সংসর্গে স্বভাব নষ্ট হয়, মনও নষ্ট হয় ; তাই তোমার ঘোটেছে। কাশীতে আমি তোমারে দেখেছি, তোমার কার্যকলাপ পরীক্ষা কোরেছি, আমার প্রতি তোমার স্নেহ-যত্ন ছিল, সদয় ব্যবহার ছিল, তাও আমি অনুভব কোরেছি ; এখন সম্পূর্ণ ভাবান্তর ; যাদের কাছে এখন তুমি আছ, তাদের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েছ ; পাকা পাকা মিথ্যাকথাও শিখেছ ; জটিলতা কুটিলতা অভ্যাস কোরেছ ; রামশঙ্কর এ বনে আছে কি না, সে কথাটাও তুমি আমার কাছে বোলছ না ; সকালে তুমি আমারে চিনেছিলে, সঙ্কেতেও সে ভাবটি আমার কাছে প্রকাশ কর নাই ; বনবাসী দস্যুরা আমারে নিয়ে কি কোরবে, তাও তুমি আমারে বোলছো না ; সব একযোগ ! কাশীতে তোমারে দেখে আমার আনন্দ হতো, এখানে তোমারে দেখে ভয় হয় ! কাশীতে তুমি এক প্রকার দেবী ছিলে, এখানে এখন তুমি ভয়ঙ্করী পিশাচী হয়েছ।

নবীন।—আর আমারে লাঞ্ছনা দিও না হরিদাস, আর লাঞ্ছনা দিও না! তোমার কথা শুনে আমার প্রাণের ভিতর যেন আগুন জেবলে উঠছে! এ আগুন নির্ব্বাণ করবার ঔষধ নাই! হাঁ, ভাল কথা! তুমি কি এখানে উপবাস কোরেই থাকবে ? দিনমানে তো কিছুই আহার কোল্লে না, রাত্রেও কি কিছু খাবে না ? অনাহারে বাঁচবে কিরূপে ? সেই কথা জিজ্ঞাসা কোত্তেই আমি এসেচি।

আমি।—বাঃ! সব দয়া-মায়া তবে তুমি হারাও নাই! আমার আহারের কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছ! তারা বুঝি এই কথা তোমারে শিখিয়ে দিয়েছে ? দেখ নবীন, আহারে আমার রুচি নাই, একটু পূর্ব্বে পিপাসা হয়েছিল, তখনি তখনি তা আবার মিলিয়ে গিয়েছিল, এখন আবার একটু একটু পিপাসা আসছে। মনে দুশ্চিন্তা থাকলে কিছুই ভাল লাগে না, এক দণ্ডও আর এখানে থাকতে আমার ইচ্ছা নাই।

নবীন।—তবে কি তুমি পালাবে ?

আমি।—বিদ্রূপ কর কেন ? নিজেই তুমি বোলছ, পালাবার উপায় নাই, তুমি আসবার আগে তোমাদের একটা লোক এখানে এসেছিল, সে লোকটাও বোলে গিয়েছে, পালাবার চেষ্টা কোল্লেই মারা যাবে। তোমাদের দুজনের মুখেই এক রকম কথা। এখন আবার এ কিসের ছলনা ? ছলনা কোরে তুমি বুঝি আমার মন জানতে এসেছ ?

নবীন।—না হরিদাস, ছলনা আমি শিখি নাই ; আমার মনের কথা শুন। যে অবস্থায় পোড়ে কুল হারিয়ে আমি বেরিয়েছি, কতক কতক তুমি জান, কিন্তু গোড়ার কথা জান না ; তুমি হয় তো মনে কোচ্ছো, আমি এখানে সুখে আছি। হায় হায়! যে সুখে আমি আছি, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তিনিই তা জানছেন। এখানে আমি এক রকম পিঞ্জরবন্ধ বিহঙ্গিনী। গাছতলায় বোসে বোসে পালাই পালাই ডাক ছাড়ি! পালাতে পারি না ; তুমি কি পালাবে ? তুমি যদি পালাও, সত্য বোলছি হরিদাস, তুমি যদি পালাও, আমিও তোমার সঙ্গে পালাবো। হাঁ, কি কথা বোলছিলে ? পিপাসা হয়েছে ? রোসো একটু, শীঘ্রই আমি আসছি।

নবীনকালী উঠে দাঁড়ালো ; আলো এনেছিল, সে আলোটি হাতে কোরে আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল ; একটু পরেই ফিরে এলো ; হস্তে একটা মাটির ভাঁড় ; এসেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত্বরিতস্বরে বোল্লে, "এ বনে এক রকম ফল হয়, সে ফলের রস অতি সুস্বাদু ; পান কোল্লে তৎক্ষণাৎ পিপাসাশান্তি হয়, অনেকক্ষণ আর পিপাসা আসে না ; সেই ফলের সরবত কোরে এনেচি, খাও, এক চুমুকে সবটুকু খেয়ে ফেলো, শরীর জুড়িয়ে যাবে।"

ফলের গুণ ব্যাখ্যা কোরে, ঐ সব কথা বোলে, নবীনকালী সেই মৃৎপাত্রটি আমার হাতে দিলে, যথার্থই আমার পিপাসা হয়েছিল, যথার্থই এক চুমুকে সেই সরবতটুকু আমি পান কোল্লেম। কতক্ষণ নবীনকালী আমার কাছে বোসে ছিল, কতক্ষণ আমার সংগে কথা কোয়েছিল, মনে হয় না, কেবল এইটুকুমাত্র মনে হয়, আমার চক্ষের সম্মুখে যেন ঝাঁক ঝাঁক জোনাকী পোকা উড়ে বেড়াতে লাগলো, একপাল কালো কালো কুকুর আমার সম্মুখ দিয়ে ছুটে গেল, ঘুমের ঘোরে অবশাঙ্গ হয়ে আমি যেন সেইখানে তৃণাসনের উপর ঢোলে পোড়লেম।

অষ্টম কল্প

ভূতের বাড়ী

একখানা দোতালা বাড়ীর একটি ঘরে আমি শয়ন কোরে আছি ; বড় বড় জানালার ফাঁক দিয়ে প্রখর সূর্য-কিরণ সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ কোচ্ছে ; রৌদ্র আমার গাত্র স্পর্শ কোচ্ছে ; রৌদ্রের প্রখরতা দর্শনে অনুভব, বেলা দ্বিতীয় প্রহর। কোথায় এসেছি, যে রাত্রে নবীনকালীর হস্তে ফলের সরবত পান কোরেছিলেম, সেই রাত্রের পরদিনের সূর্য আমার গাত্রে উত্তাপ দিচ্ছিলেন কি না, অবধারণ কোত্তে অক্ষম হোলেম। শুয়ে আছি, ঘরের চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, অপরিচিত গৃহ সেটাও বেশ বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু কোথায় ?

শয্যার উপর একবার আমি উঠে বোসলেম ; বোসে থাকতে পাল্লেম না, ভোঁ ভোঁ কোরে মাথা ঘুরতে লাগলো ; মাথা অত্যন্ত ভারী, চক্ষেও ঝাপসা দেখতে লাগলেম। আবার শয়ন কোল্লেম, কত যে কি ভাবনা তখন আমার মানসক্ষেত্রে তোলাপাড়া কোত্তে লাগলো, নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। প্রায় আধ ঘণ্টা এইরকম। একখানা পাখা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে একজন ভুঁড়িওয়ালা লোক সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লে। আমি শুয়ে ছিলেম, নিদ্রা আসছিল না, দিনমানে কখনই আমার চক্ষে নিদ্রা আসে না, নেত্র উন্মীলিত ছিল, তাই দেখে লোকটি বিকৃতস্বরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি হে নবাবপুত্র ! জেগে

আছ? ছি! ছি! ছি! এই বয়সে অত নেশাও করে? দু দিন দু রাত্রি একেবারেই বেহুঁস, বে-একতার! উঠ, স্নান কর, কিছু আহার কর, শরীর তাজা হবে, উঠতে পারবে কি, না এই বিছানার উপর হুড় হুড় কোরে জল ঢেলে দিতে হবে? বুঝচো কেমন? নেশাটা ছুটেছে তো? দেখ দেখি চেষ্টা কোরে, উঠতে পারবে কি না?"

আমি অত্যন্ত লজ্জা পেলেম। লজ্জা পাওয়া অকারণ, মনে মনে বিরক্ত হোলেম। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আর একবার উঠে বোসেছিলেম, মাথা অত্যন্ত ভারী, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, বোসে থাকতে পারি নাই, সেই ভাবটা স্মরণ হলো; কি করি, অতিশয় কষ্ট থাকলেও ধীরে ধীরে উঠে বোসলেম। লোক বোল্লে "এই ঠিক, নেশা তবে ছুটেছে; এসো, আমার সঙ্গে বাহিরে এসো।"

কষ্টে আমি দাঁড়ালেম, বিছানা থেকে নামলেম; কষ্টে সেই লোকের অনুগামী হোলেম। চোলে যেতে টোলে পড়ি, লোক আমার সে ভাবটা দেখতে পেলে না, দরজার দিকে মুখ কোরে আগে আগে চোলেছিল, আমি পশ্চাতে ছিলেম, বারান্দায় এলেম। ভাঙা ভাঙা রেল দেওয়া সুদীর্ঘ বারান্দা। একধারে একখানা চৌকী পাতা ছিল, সেই চৌকীর উপরে আমি বোসে পোড়লেম। একজন চাকর আমার মাথায় প্রায় একপোয়া তেল ঢেলে দিয়ে কলসী কলসী জল ঢাল্লে, বোসে বোসেই আমি স্নান কোল্লেম। শরীর একটু সুস্থ বোধ হলো। তারা দয়া কোরে আমারে একখানি কাপড় দিলে, আমি কাপড় ছাড়লেম। আমার সম্মুখে এক গেলাস সরবত; দেখেই আমি মনে মনে কেঁপে উঠলেম, এক সরবতে এত হুলস্থুল, আবার সরবত! খাই কি না খাই, মনে মনে তর্ক; কিন্তু অত্যন্ত পিপাসা হয়েছিল, এক চুমুক সরবত আমি পান কোল্লেম। সেই ভুঁড়িওয়ালা লোকটা আবার আমারে সঙ্গে কোরে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল; সেই শয্যার উপরে আবার আমি বোসলেম। লোকটা তখন আমারে বোল্লে, "আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী এখানে অন্নপাক করে, আহার কর, তাহার পর আবার নিদ্রা যেয়ো; শরীর সেরে যাবে; সব অসুখ ভাল হবে।"

সে কথায় কান না দিয়ে সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় আমি এসেছি?"

আমার মুখপানে চেয়ে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "ঐ জন্যই তোমার এই দশা! হিতকথা বোল্লে তাতে তুমি কান দাও না, তোমার কান হিত কথা ভালবাসে না, সেই কারণেই তুমি কষ্ট পাও। একরত্তি ছেলে, আজিও ফুল ছাড়ে নাই, মুখে এখনো দুধের গন্ধ ঘুচে নাই, এই বয়সেই নেশা ধোরেছ! তিনদিন নেশায় বিভোর হয়ে অজ্ঞান ছিলে, সবে মাত্র চৈতন্য হয়েছে; ভালর জন্য আমি বোল্লেম, আহার কর; কথাটা তোমারে ভাল লাগলো না; কথার উপর কথা দিয়ে তুমি জিজ্ঞাসা কোল্লে, কোথায় এসেছ? সে কথায় এখন তোমার কি দরকার? আহার কর, সুস্থ হও, নিদ্রা যাও, তার পর যে যে কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কোরো। তা নয়, এত অবাধ্য কেন তুমি?"

তিরস্কার সহ্য কোরে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "আহারে আমার ইচ্ছা নাই। কোথায় আমি এসেছি, সেই তত্ত্বটি অগ্রে আমি জানবো। আমার ভাগ্য বড় মন্দ, ভাগ্যদোষে লোকের কাছে আমি নিন্দাভাজন হই। যে সব কথা আপনি আমারে বোলছেন, তার বিন্দু-বিসর্গও আমি বুঝতে পাচ্ছি না। নেশা করা, অজ্ঞান থাকা, অবাধ্য হওয়া, এ সব কথার অর্থ কি? আচ্ছা মহাশয়, সব কথা না বলুন আমার একটি কথার উত্তর দিন। যেখানে এখন আমি আছি, এ স্থানটি কি ঢাকাজেলার এলাকা?"

ভুঁড়ি নাচিয়ে হাস্য কোল্লে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "রোগে ধোরেছে, রোগে ধোরেছে! রোগ বড় শক্ত! নেশা এখনো ছাড়ে নাই! নেশায় লোকে পাগল হয়; তাতে আবার কঁচি বাঁশে ঘুণ ধরা; মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। হায়, হায়! পাগল রে পাগল! বলে কি না ঢাকাজেলা! কোথায় তোদের ঢাকা-জেলা?"

বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে পুনরায় আমি বোল্লেম, "তবে কি এটা ঢাকাজেলার এলাকা নয়? কোথায় তবে আমি এসেছি? আমার অজ্ঞাতে কারা আমারে এখানে এনে ফেলেছে?"

ব্রাহ্মণের ক্রোধ উপস্থিত। চক্ষু পাকল কোরে ঘাড় বাঁকিয়ে ব্রাহ্মণ বোলে উঠলেন, "অধঃপাতে এসেছিস! কারা এনেছে, কোথায় এনেছে, কিসের এলাকা, এ সব নিকাস আমার কাছে নাই। বেহুঁস দেখেছিলেম, দয়া হয়েছিল, যত্ন কোরে রেখে দিয়েছিলেম। কপালে সুখ না থাকলে জোর কোরে কি সুখী করা যায়?"

আলাৎ-পালাৎ কত কথাই ব্রাহ্মণের মুখে বর্ষিত হলো, শুনে শুনে আমি যেন হতজ্ঞান হোলেম। সকল কথা আমার কানেও গেল না। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে শেষবারে তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি আমারে বোলতে চান কি? কোথা থেকে কোথা আমি এসেছি, সেইটি আমি জানতে চাই, আর কোন বেশী কথা আমি জানতে চাই না, অনুগ্রহ কোরে সেইটি আপনি বলুন। বার বার আপনি আমার আহারের জন্য অনুরোধ কোচ্চেন, কলির মানুষের অন্নগত প্রাণ, অন্নাহার ব্যতিরেকে প্রাণধারণ করা যায় না, তাহা আমি জানি, কিন্তু ক্ষুধা নাই, রুচি নাই, প্রবৃত্তি নাই। কত স্থানে কত বিপদে আমি পতিত হয়েছি, তা যদি আপনি শুনেন, আমার প্রতি আপনার দয়া হবে। ঢাকাতে আমার আত্মীয়বন্ধু আছেন, আমার অদর্শনে তাঁরা ভাবিত হয়েছেন, আমারো দুর্ভাবনা অনেক। একখানি চিঠি লিখে সেখানকার একটি ডেপুটি বাবুকে আমার এই দুর্দশার কথা জানাব, এই আমার আকিঞ্চন, সেইজন্যই বারবার আমি আপনাকে মিনতি কোরে বোলছি, আপনি আমার প্রতি একটু সদয় হোন, কোথায় আমি এসেছি, দয়া কোরে কেবল সেইটি আমাকে বলুন।"

বিরক্তবদনে ব্রাহ্মণ তখন বোল্লেন, "কুমিল্লার এলাকা, ত্রিপুরাজেলা, রুদ্রাক্ষ গ্রাম। তুমি কিঞ্চিৎ আহার কর, তার পর অপরাপর কথা জানতে পারবে।

একটা কথা কি জানো, এখান থেকে এখন তুমি কোথাও যেতে পাবে না, কিছুদিন এই বাড়ীতেই থাকতে হবে, যে যে কাজ আমরা বোলবো, সেই সব কাজ তোমাকে কোত্তে হবে ; মুটে-মজুরের কাজ নয়, আমাদের সেরেস্তায় লেখা-পড়ার কাজেই তোমাকে নিযুক্ত রাখা আমাদের ইচ্ছা, লেখা-পড়া তুমি জানো ?"

সংক্ষেপে তাঁর কথাগুলির উত্তর দিয়ে বিষাদে আমি একটি নিশ্বাস ফেল্লেম। ব্রাহ্মণ একজন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর দ্বারা আমার জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী আনিয়ে দিলেন, নামমাত্র আহার কোরে এক গেলাস জল খেয়ে আমি পিপাসা-শান্তি কোল্লেম। আমারে শয়ন কোত্তে বোলে ব্রাহ্মণ তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ; আমাকে স্বাধীনতা দিয়ে গেলেন না, দ্বারের বাহিরে চাবী বন্ধ কোরে গেলেন। বেলা আড়াই প্রহর অতীত হয়েছিল, আমি একটু শয়ন কোল্লেম ; নিদ্রার জন্য শয়ন কোল্লেম না, ক্লান্তি দূর করা প্রয়োজন ছিল, সেই কারণেই শয়ন। যখন আমি বোসে থাকি, যখন দাঁড়িয়ে থাকি, যখন কোন কাজকর্ম্মে অন্যমনস্ক থাকি, চিন্তা তখন আমার উপর বেশী শক্তি প্রকাশ কোত্তে পারে না ; শয়ন কোল্লেই প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করে। বিনা সংগ্রহে চিন্তার উপকরণ আমার বিস্তর। অমরকুমারীর রূপখানি মনের মধ্যে আনয়ন কোরে আনুসঙ্গিক কত ভাবনা যে আমি ভাবলেম, অক্ষরে অক্ষরে লিখে জানানো যায় না। অমরকুমারী আমার জন্য কত ভাবছেন, মণিভূষণ কতই উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, অন্যান্য স্থানে যাঁরা যাঁরা আমার হিতৈষী বন্ধু, আমার সমাচার না পেয়ে তাঁরা কত উদ্বিগ্ন আছেন, সেই সকল ভাবনা তখন আমার মনে একত্র। ভাবনার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যক্ত কোরে পাঠকমহাশয়কে বিরক্ত করা কিম্বা ভাবনাযুক্ত করা আমার এখনকার কার্য নয়, গোটাকতক নূতন কথা বলি।

ত্রিপুরাজেলার কুমিল্লার এলাকা রুদ্রাক্ষ গ্রাম ; ব্রাহ্মণের বাড়ী ; যে ব্রাহ্মণ আমারে তিক্তমধুরমিশ্র সম্ভাষণে প্রপীড়িত করবার অথবা পরিতুষ্ট রাখ-বার চেষ্টা কোল্লেন, তাঁর কথা শুনে, কার্য দেখে আর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে, অনুমানে আমি বুঝলেম, তিনিই সেই বাড়ীর কর্ত্তা—নামটি তখনো পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পাঠকের মনে একটু ধারণা জন্মাবার উদ্দেশে ব্রাহ্মণটির রূপ বর্ণনা করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণের রূপবর্ণনে আমি অভিলাষী। সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র বোলেছি, ভুঁড়িওয়ালা ব্রাহ্মণ। যারা যারা স্থূলাঙ্গ, সর্ব্ব অবয়ব যাদের বিলক্ষণ স্থূল প্রায়ই তাদের ভুঁড়ি হয়, সে সকল অঙ্গে ভুঁড়িও মানায় ; কিন্তু এ ব্রাহ্মণ স্থূলাঙ্গ নয় ;—হাত দু-খানা সরু সরু, পা দু-খানা সরু সরু, বুকখানাও সরু, গলাটিও সরু, অঙ্গের সম্ভাবিত সমস্ত মাংস কেবল উদরেই আশ্রয় কোরেছে ; ভুঁড়ি প্রকাণ্ড। উদরীরোগগ্রস্ত লোকের চেহারা যেমন হয়, মুখ যেমন পাণ্ডুবর্ণ দেখায়, এ ব্রাহ্মণের চেহারাও সেই প্রকার। গঠন দীর্ঘাকার, বর্ণ পিঙ্গল, চক্ষু বড় বড়, নাসিকা খর্ব্ব, কপাল প্রশস্ত, মস্তক প্রায় কেশশূন্য, মধ্যস্থলে

প্রায় এক হাত লম্বা এক টিকি, পৃষ্ঠদেশের অর্দ্ধেক দূর পর্যন্ত লম্বিত ; পরিধান একখানি সরু ফিনফিনে মলমলের ধুতি ; ভুঁড়ি আচ্ছাদনেই সে ধুতির অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা অধিক পর্যবসিত, অপর অংশে নিম্নাঙ্গের জানু পর্যন্ত আচ্ছাদিত। মূর্ত্তিদর্শনে সহসা ভয়ের আবির্ভাব হয় ; ঘৃণা বলা গেল না,—ব্রাহ্মণের চেহারা দেখে ঘৃণা কোত্তে নাই ; বস্তুতঃ ঘৃণা যেন আপনা হোতেই অগ্রে অগ্রে এসে উপস্থিত হয়।

এই অনুমানে আমার যদি ভুল না থাকে, তবে এই ব্রাহ্মণ এই বাড়ীর কর্ত্তা। বাড়ীখানা কেমন, বাড়ীখানা কত বড়, তখনো পর্যন্ত তা আমি জানতে পারি নাই ; কিন্তু যে ঘরে আমি আছি, সে ঘরের আয়তন আর সাজ-সরঞ্জামের পারিপাট্য দেখে মনে হয় বৃহৎ বাড়ী, ব্রাহ্মণ একজন বড়মানুষ।

বেলা যখন প্রায় অবসান, সেই সময় দ্বারের চাবী খুলে সেই ব্রাহ্মণ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, সঙ্গে একটি লোক। প্রবেশ কোরেই গম্ভীরস্বরে ব্রাহ্মণ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি গো ! ঐ দেখ,—কথায় কথায় আমি তোমার নামটা ভুলে ভুলে যাই ; কি নাম ?—হাঁ, হরিদাস। কি গো হরি-দাস ! ঘুম ভেঙেছে ?"

আমি উঠে বোসলেম ; ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিলেম, "ঘুম আমার আসে না ; ঘুমের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল, চিন্তা-পিশাচী সে সম্বন্ধটি যেন বিচ্ছিন্ন কোরে দিয়েছে ; প্রকৃতির উপরেও যেন চিন্তা আপ-নার পরাক্রম প্রকাশ কোরেছে !"

সাপের মত বারকতক ফোঁস ফোঁস কোরে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "তাই তো ! প্রকৃতির দোষ, চিন্তার দোষ, তোমার দোষ নাই ! তাই তো বটে ! তিন দিন তিন রাত বেহুঁস,—বেহুঁসে ঘুমিয়েছ, তবে আর নিদ্রাকে দোষ না দিয়ে তুমি আর কি কোত্তে পার ? আচ্ছা, আমার কাছে তুমি একটা প্রতিজ্ঞা কোত্তে পার ? জন্মে আর কখনো কোন নেশার জিনিস তুমি ছোঁবে না, যারা নেশা করে, তাদের কাছে যাবে না, এই প্রতিজ্ঞা কোত্তে যদি রাজী হও, তা হোলে নিদ্রাকে উপরোধ কোরে আমি তোমার বশীভূত রাখতে পারবো।"

আমার অন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগলো। ম্লান-বদনে ব্রাহ্মণকে আমি বোল্লেম, "বারম্বার কেন আপনি একটা মিথ্যাকথা নিয়ে আমারে ঐরূপ তিরস্কার কোচ্ছেন ? নেশা কারে বলে, নেশার জিনিস কি প্রকার, জন্মেও কখন তা আমি জানি না। যারা আমারে অজ্ঞান অবস্থায় এখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে, তারা আপনাকে কি একটা মিথ্যাকথা শুনিয়ে দিয়েছে, ধ্রুব-বিশ্বাসে তাই আপনি মনে কোরে রেখেছেন, তাই মনে কোরেই বার বার আপনি আমারে অপরাধী কোচ্ছেন। আমি গরীব। জন্মাবধি আমি ফকিরের মতন পর্যটক, দোষের কাছে জন্মাবধি আমি অপরিচিত ; পরের মুখে রচা কথা শুনে আপনি আমারে দোষী করেন, শুনে শুনে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে !"

কেমন এক প্রকার হাস্য কোরে ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ আবার সক্রোধে বোলে উঠলেন, "কি কথা বোলছো তুমি ? পরের কথা আমি শুনেছি ? কাদের

কথা আমি শুনেছি ? বেহুঁস হয়ে পথে তুমি পোড়ে ছিলে, কুড়িয়ে এনে যত্ন কোরে নিজ বাড়ীতে আমি তোমায় আশ্রয় দিয়েছি, তারই বুঝি এই ফল ? পরের কথা আমি শুনেছি, কে তোমাকে এমন কথা বোল্লে ?"

আমি আর সে সময় বেশী শিষ্টাচার দেখাতে পাল্লেম না, তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেম, "কেহ কিছু বলে নাই, নিজেই আমি বুঝতে পাচ্ছি. পরের কথা আপনি শুনেছেন। তা না শুনলে আমার নাম আপনি কেমন কোরে জানলেন ? আমি তো আপনার কাছে আমার নাম বলি নাই। অবশ্যই আপনি পরের কথা শুনেছেন। যা যা শুনেছেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমার নামটি ছাড়া সমস্তই মিথ্যা !"

ব্রাহ্মণ এইবার অপ্রতিভ হোলেন : অল্পক্ষণ নিরুত্তর থেকে, তেজটা একটু কোমিয়ে এনে. একটু নম্রস্বরে বোল্লেন. "তাই তো ! তোমার মাথাটা এখনো গরম আছে ! এসো, এই লোকটির সঙ্গে বাহিরের বাতাসে একটু বেড়িয়ে এসো ; ঠাণ্ডা হবে। আর কোথাও যেয়ো না, এখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা কোল্লে ভারী বিপদে পোড়বে।"

প্রথমের কথাকটি আমি শুনলেম. শেষের কথায় কান দিলেম না ; বাহিরের বাতাসে বেড়াবার একান্ত ইচ্ছা হয়েছিল, আবশ্যকও হয়েছিল, ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারী লোকটির সঙ্গে উপর থেকে নেমে বাড়ী থেকে আমি বেরুলেম।

যদিও শেষ বেলা, তথাপি তখনো আকাশে সূর্য ছিলেন। বাড়ীখানি আমি ভাল কোরে দেখলেম। প্রকাণ্ড বাড়ী। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা বৃহৎ বারান্দা ; অর্দ্ধেকটা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত. অর্দ্ধেকটা বে-মেরামতে মলিন। বারান্দার সম্মুখে বাগান ছিল. ফুলবাগান ; চারিদিকে ছোট ছোট থাম দিয়ে ঘেরা ছিল ; অনেকগুলি থাম কেবল ইষ্টকসার হয়ে আছে. ফুলগাছগুলিও আধমরা। কিসের শোকে গাছেরা যেন কাঁদছে. এই রকম বোধ হলো। একদিকে দেখলেম, মস্ত একটা ঢিবি। যে লোকটি আমার সঙ্গে এসেছিল, তার নাম রামদাস। তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ঐ ঢিবিতে কি হয় ?"

রামদাস উত্তর কোল্লে, "বাবুদের বাড়ীতে পূর্ব্বে রাস হোতো, এখনো হয়, ঘটা হয় না ;—ঐখানে দিব্য একটি পাকা রাসমঞ্চ ছিল, ১২৫৯ সালের ঝড়ে সেটি সমভূমি হয়ে যায় ; কেবল ঐ ঢিবিমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; এখনো তাই আছে ; অবস্থা সিকস্ত ; বাবুরা আর সেই রাসমঞ্চ খাড়া কোরে তুলতে পারেন নাই। তদবধি রাসের সময় ঐ ঢিবির উপর গোটাকতক বাঁশ খাড়া কোরে চাঁদোয়া টাঙিয়ে ঠাকুর বসানো হয়।"

আমি রামদাসের মুখের দিকে চেয়ে থাকলেম ; কিন্তু আকার-প্রকারে বুঝতে পেরেছিলেম, রামদাস সে বাড়ীর একজন সামান্য চাকর মাত্র ; মূলতত্ত্বে তার সঙ্গে অধিক কথা কওয়া আমি তখন অনাবশ্যক ভাবলেম। রাসমঞ্চের পরিচয় দিয়ে রামদাস আরো বোল্লে, "বাহিরে তো এই দশা দেখছো, ভিতরদিকে আরো দুর্দ্দশা। অন্দরমহল একেবারে নাই, সমভূম ; পূজাবাড়ীর দালানের তিনদিকে বারান্দা দেখেছ, পশ্চিমের বারান্দার পশ্চাদ্দিকে

যতগুলি ঘর আছে, ফাটা চটা নোণাধরা, সেই সকল ঘরে এখন অন্দরমহল হয়েছে, দক্ষিণের আর পূর্ব্বের বারান্দায় দিবারাত্রি চিক ফেলা থাকে।"

ও সব কথায় আমার তত প্রয়োজন ছিল না, কেবল শুনলেম এই মাত্র, বাবুদের এখন দুরবস্থা, সেইটি বুঝে রাখলেম। গল্প কোত্তে কোত্তে রামদাস আমারে সম্মুখদিকে খানিক দূর এগিয়ে নিয়ে গেল। চারিদিক আমি নিরীক্ষণ কোল্লেম। রামদাসের মুখে শুনলেম, অনেক দূর পর্যন্ত বাবুদের ভদ্রাসনের সীমা। বাবুদের দুরবস্থা ঘোটেছে, কিন্তু বিশ্বজননী প্রকৃতির যেরূপ মধুর ভাব, সে ভাবের কিছুই ব্যত্যয় ঘটে নাই ; অপরাহ্নের সুশীতল সমীরণ সেবন কোরে অনেক পরিমাণে আমি শীতল হোলেম। বুকের ভিতর যে আগুন জ্বোলছিল, তার কিছু উপশম হলো না, কিন্তু বাহিরে অনেকটা ঠাণ্ডা বোধ কোল্লেম।

সূর্যদেব অস্তগত। বেড়াতে বেড়াতে আমরা বাড়ীর দিকে ফিরলেম। যাবার সময় দেখি নাই, আসবার সময় দেখলেম, বাহিরের বারান্দার যে অর্দ্ধাংশ ভেঙে গিয়েছে, সেই অংশের শেষভাগের সর্ব্বপশ্চিম সীমায় একটি ভগ্নগৃহ বিদ্যমান : বাঁশের সিঁড়ির সাহায্য ভিন্ন সে গৃহে প্রবেশ করবার উপায় নাই। একবার পশ্চিমাকাশে, একবার সেই ভগ্নগৃহের দিকে দৃষ্টিদান কোরে, রামদাস তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো, "চলো চলো, চলো, শীঘ্র চলো। অন্ধকার হয়ে এলো ! এ জায়গায় অন্ধকারে বড় ভয় আছে !"

কথা বোলতে বোলতে,—পশ্চাতে হাত ফিরিয়ে, হাতছানি দিয়ে আমারে ডাকতে ডাকতে রামদাস একদৌড়ে দেউড়ীর ভিতর ঢুকে পোড়লো : পূর্ব্বাপর কিছুই চিন্তা না কোরে আমিও দ্রুতপদে তার অনুগামী হোলেম। বাবুর বাড়ীর দেউড়ী তখনো ছিল, কিন্তু দেউড়ীগুলি যারা শোভিত করে, তারা কেহ উপস্থিত ছিল না। দেউড়ী পার হয়ে রামদাসের সঙ্গে আমি উপরে গিয়ে উঠলেম। অল্পকথায় আমি বুঝে নিলেম, রামদাসটি লোক সরল, কিন্তু অত্যন্ত ভীরু।

দিনমানে যেখানে ছিলেম, সেইখানে প্রবেশ কোরে দেখলেম, ঘরের একধারে একটি প্রদীপ জ্বোলছে, যে বিছানায় আমি শয়ন কোরেছিলেম, সেই বিছানার উপর দুটি যুবা চুপ কোরে বোসে আছে ; যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি আমার খাবার সামগ্রী দিয়ে গিয়েছিল, একধারে দেয়াল ঠেস দিয়ে সে স্ত্রীলোকটিও দাঁড়িয়ে আছে। আমারে দেখেই সেই স্ত্রীলোক একটু হাসতে হাসতে বোল্লে, "ওগো হরিদাস, এই দুটি বাবু তোমায় দেখতে এসেছেন। কর্ত্তাবাবুর ছেলে।"

কর্ত্তাবাবুর ছেলেদের মুখপানে আমি চাইলেম, তাঁরাও খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। আমার মুখ দেখা শেষ হয়ে গেলে ভাই দুটি পরস্পর চক্ষু ঠারাঠারি কোরে মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেন, বিছানার উপর এক চাপড় মেরে একটি বাবু আমারে তাঁদের কাছে বসবার ইঙ্গিত কোল্লেন ; ঠিক নিকটে না বোসে একটু দূরে গিয়ে আমি বোসলেম।

বাবুর ছেলে। ক্ষমতা না থাকলেও কর্ত্তাবাবুর রূপ আমি বর্ণনা কোরেছি, বৃহৎ এক ভুঁড়ি থাকলেও কর্ত্তাবাবু একটি কাহিল মানুষ, সোজাকথায় রোগা মানুষ ; এই দুটি বাবুও রোগা রোগা ;—আর সেই প্রাচীনা স্ত্রীলোক, নিশ্চয়ই পরিচারিকা, সেই পরিচারিকাটিও রোগা ; যে রামদাসটি আমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল, সেই রামদাসটিও খুব রোগা ; বাড়িতে যতগুলিকে আমি দেখলেম, সকলগুলিই রোগা রোগা। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার !

আশ্চর্য ভেবে একদিকে আমি চেয়ে আছি, বাবু দুটির মধ্যে একটি বাবু সেই সময় আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "তোমাকে দেখে আমরা বড় তুষ্ট হোলেম। শুনেছিলেম, তুমি একটা দোষ কোরেছ, তোমার মুখ দেখে সে কথায় আমার বিশ্বাস হোচ্ছে না। দেখ হরিদাস, তুমি খুব সাবধানে থেকো ; লোকের মুখে শুনতে পাই, এখানে কিছু ভয় আছে। রাত্রিকালে যদি কিছু ভয়ের লক্ষণ বুঝতে পার,—ঘরের ভিতর নয়, বাহিরে যদি কোন প্রকার শব্দ শুনতে পাও, বিছানা থেকে উঠো না, দরজা খুলে দেখো না, কোন প্রকার তত্ত্ব জানবার চেষ্টা কোরো না, ভয়টা আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। বুঝলে কি না ?"

আর একটি বাবু বোল্লেন, "ভয়ের কথা বোলে দাদা তোমাকে সাবধান কোচ্ছেন, আমি কিন্তু আর একটি কথা বোলতে চাই। শুনলেম, কিছুই তুমি আহার কোচ্ছো না। কেন উপবাস কর ? ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আহার করায় কোন দোষ নাই। আহার কোরো,—অনাহারে শরীর শীর্ণ হোলে দাদার কথায় ভয়টা আরো তোমাকে জোড়িয়ে জোড়িয়ে ধোরবে। আহার কোরো।"—এই পর্যন্ত বোলে সেই প্রাচীনা স্ত্রীলোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কোরে ছোটবাবুটি আরো বোল্লেন, "এই ইনি আমাদের পাচিকা, কুলীনব্রাহ্মণের কন্যা, রাত্রিকালে ইনি তোমার জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন এনে দিবেন, আহার কোরো ; কল্য আমরা শুনবো ; কল্য আবার এক সময় আমরা দুজনে এসে তোমার সঙ্গে ভাল কোরে আলাপ কোরবো।"

বাবু দুটি উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁদের উভয়কে দুই হাত তুলে প্রণাম কোল্লেম ;* তাঁরা চোলে গেলেন ; প্রাচীনা ব্রাহ্মণীও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। অল্পক্ষণ আমি একাকী থাকলেম। একটু পরেই সেই রামদাস।

চুপি চুপি ঘরের ভিতর এসে রামদাস আমার বিছানার কাছে ছোট এক-খানা চৌকীর উপর বোসলো ; নানা রকম গল্প জুড়ে দিলো। এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর ঘন ঘন নিশ্বাস নিল, পরে রামদাস একটু কৌতুকস্বরে বোল্লে, "রাম নামের চেয়ে আর নাম নাই ; এই নামে ভয় যায়, রাম রাম বোলে শয়ন কোরো, কোন ভয় থাকবে না। এ বাড়ীতে ভূতের ভয় আছে শুনেছি, বড়বাবুও বোলে গেলেন : ভয় আছে সত্য, কিন্তু 'রাম' নাম শুনে ভূতেরা ছুটে পালায়।"

যখনই রামদাস বোলছে, তৎক্ষণাৎ তা আমি বুঝতে পাল্লেম, মনে মনে হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "রাম নামের অভাব কি ? তোমার নাম রামদাস, আমার নাম হরিদাস, দুজনেই আমরা রামচন্দ্রের সেবক ; তোমারো ভয় নাই,

আমারো ভয় নাই। আচ্ছা রামদাস! এ বাড়ীর কর্ত্তাবাবুর নাম কি? যে দুটি বাবু এসেছিলেন, সে দুটি বাবুর নাম কি?"

রামদাস উত্তর কোল্লে, "কর্ত্তার নাম জয়শঙ্করবাবু, বড়বাবুর নাম প্রাণগতিবাবু, ছোটবাবুর নাম মিহিরচাঁদ। উপাধি চৌধুরী।"

রামদাসের সঙ্গে আমি অনেক রকম গল্প কোল্লেম, তার মুখেও অনেক রকম গল্প শুনলেম। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর পর্যন্ত কেবল রামদাসটি আমার দোসর। দেড় প্রহরের পর রামদাস উঠে গেল। সেই প্রাচীনা স্ত্রীলোকটি আমার জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত কোরে সেই ঘরেই এনে উপস্থিত কোল্লেন। আগে আমি তাঁরে পরিচারিকা মনে কোরেছিলেম, শেষে জানলেম, তাদৃশী পরিচারিকা নন, বাবুদের পাচিকা। তিনি একাকিনী এলেন না, জল, আসন আর লবণাদি হাতে কোরে একটি পরিচারিকা তাঁর সঙ্গে এলো। আমার আহারাদির আয়োজন কোরে দিয়ে পাচিকাঠাকুরাণী একখানি চৌকীর উপর বোসে থাকলেন, কপাটের ধারে পরিচারিকা দাঁড়িয়ে থাকলো।

পরিচারিকার বয়স অল্প : বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর, বর্ণ অগৌর নয়, কিন্তু গায়ে ঠাঁই ঠাঁই বসন্তের দাগ, মুখেও বসন্তের দাগ ; মাথায় চুল অল্প, মুখখানি কিন্তু দেহের সঙ্গে মানানসই, চক্ষু দুটি ভাসা ভাসা। গায়ে অলঙ্কার ছিল না, পরিধান একখানা লালপেড়ে শাড়ী। দেখতে নিতান্ত মন্দ নয় ; কিন্তু রোগা। আমি মনে কোল্লেম, এ বাড়ীর বাতাসের কোন রকম দোষ আছে ; যারা এ বাড়ীতে থাকে, যারা এ বাড়ীতে জন্মে, তারাই রোগা হয়।

আমার আহার-সামগ্রী প্রস্তুত। যদিও ব্রাহ্মণের বাড়ী, তথাপি সর্ব্বপ্রথমে বাড়ীর কর্ত্তা আমার সঙ্গে যে রকম কর্কশ ব্যবহার কোরেছিলেন, আমায় যে সকল কটূবাক্য বোলেছিলেন, সে সব মনে কোরে সে বাড়ীতে অন্নগ্রহণ কোত্তেও আমার প্রবৃত্তি ছিল না ; কর্ত্তার ছেলে দুটির শিষ্টাচার দর্শনে আর সেই প্রাচীনা ব্রাহ্মণ-কন্যার স্নেহ-যত্ন দর্শনে আমার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছিল। রাত্রে আমি আহার কোল্লেম।

যতক্ষণ আমি আহার কোল্লেম, সেই পরিচারিকা ততক্ষণ সেই কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকলো ; চাউনি কি প্রকার, আড়ে আড়ে চেয়ে চেয়ে এক একবার তাও আমি দেখলেম। আহার যখন প্রায় শেষ হয়ে এলো, সেই সময় পাচিকাঠাকুরাণী সেই পরিচারিকাকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "রূপসি! যা, দুধ-সন্দেশ নিয়ে আয়!"

পরিচারিকার নাম রূপসী। পাচিকার আদেশে রূপসী একবার অন্দরের দিকে গেল ; বোলে রেখেছি, বারান্দার পাশেই অন্দর,—শীঘ্রই দুধ-সন্দেশ নিয়ে ফিরে এলো। আহার সমাপন কোরে বাহিরদিকের বারান্দায় আমি আচমন কোল্লেম। আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ অথবা তাম্রকূট সেবন আমার অভ্যাস হয় নাই, সুতরাং সেই দুই দায় থেকে রূপসী অনিচ্ছায় অব্যাহতি পেলে। সাবধানে আমারে শয়ন কোত্তে বোলে পাচিকাঠাকুরাণী চোলে গেলেন, কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ কোরে, কপাটে চাবী লাগিয়ে রূপসীও চোলে গেল, যাবার

সময় বোলে গেল, "প্রদীপে অনেক তেল থাকলো, ইচ্ছা হয়, জেবলে রেখো, ইচ্ছা হয় নিবিয়ে দিও।"

ঘরে মানুষ থাকলো. দরজায় চাবী পোড়লো, এটাই বা কেমন? এখানেও কি আমি কয়েদী? গতিক ভাল নয়! সেই যে গোড়ায় রক্তদন্তের চক্র, এখনো সর্ব্বত্র সেই চক্রের জের চোলে আসছে ; রক্তদন্তের লোকেরা নিশ্চয়ই সেই চক্র ঘুরাচ্ছে! যাই হোক, দক্ষিণদিক খোলা, বাহিরদিকের দক্ষিণের বারান্দা উদার মুক্ত, বাতাসের অভাবে দম আটকে মারা যাব না, মনে তখন এইটুকু শান্তি।

আমি শয়ন কোল্লেম। ঘরে ঘড়ী ছিল না, অভ্যাসের অনুমানে অবধারণ কোল্লেম, রাত্রি দুই প্রহর। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যত দিন ছিলেম, তত দিন কি রকম হতো, ঠিক মনে হয় না, কিন্তু পাঠশালা থেকে দূরীভূত হবার পর অবধি শয়নমাত্রই নিদ্রা আসে না, অনেকক্ষণ জেগে থাকতে হয় ; জেগেই আছি ;—যে সকল ভাবনা নিত্য আসে, সে সকল ভাবনা তো আছেই,—তার উপর নূতন জায়গায় নূতন ভাবনা। বেঁহুস হবার কথা, নেশা করবার কথা, কিছুদিন এই বাড়ীতে বাস করবার কথা আমার মনের ভিতর আসছে ;—ত্রিপুরাজেলার এলাকামধ্যে এসে পোড়েছি, সে কথাও ভাবছি ; অমরকুমারী ঢাকায়, মোকদ্দমা বহরমপুরে, সে সব কথা মনে কোরে অন্তরে অন্তরে উদ্বেগ বাড়ছে : অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা কোচ্ছি, পাচ্ছি না। এই নূতন বিপদের মূল সেই কুলকলঙ্কিনী নবীনকালী। ঘনিষ্ঠতা কোরে, আত্মীয়তা কোরে, নবীনকালী আমারে বোলেছিল, সে আমার পালাবার সহায় হবে, সে নিজেও আমার সঙ্গে পালিয়ে আসবে। বোলেছিল, তার কথায় আমি প্রত্যয় কোরেছিলেম ; সেই প্রত্যয়ের ফল এই! হায়, হায়! কেন আমি তার কথায় বিশ্বাস কোরেছিলেম? কেন আমি তার হাতে কাল-সরবৎ পিয়েছিলেম? নিশ্চয় সে সরবতে মাদকদ্রব্য মিশানো ছিল! দুষ্টলোকের পরামর্শে নিশ্চয়ই নবীনকালী সে সরবতের সঙ্গে ভাং-ধুতুরা অথবা আর কোন উৎকট বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, তাতেই আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিলেম! অজ্ঞান অবস্থায় এক একবার যেন আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন কিসের উপর দুলছি, হেলে দুলে যেন গোড়িয়ে গোড়িয়ে পোড়ছি ; এক একবার ঝনঝনে ঘর্ঘরশব্দ আমার কানের ভিতর প্রবেশ কোরেছিল, এখনো সেই ভাবটা একটু একটু মনে পোড়ছে। লোকেরা হয় তো নৌকায় তুলে, গাড়ীতে তুলে কুমিল্লা এলাকায় আমাকে এনে ফেলেছে! নৌকার গতি আর গাড়ীর গতি এখনো যেন আমি অনুভব কোচ্ছি! এ অনর্থের মূল সেই নবীনকালী। পাপিনী, বিশ্বাসঘাতিনী নবীনকালী আমার সঙ্গে বিলক্ষণ চাতুরী খেলেছে! ব্যভিচারপাপে যে সকল স্ত্রীলোক রত হয়, অধিকন্তু পরিবারস্থ নিজসম্পর্কীয় পুরুষের সঙ্গে যারা কুলের বাহির হয়, তাদের মায়া এই প্রকার! যে সকল কুলকন্যা এইরূপে অপথে পদার্পণ করে, তাদের বিশ্বাস করা আর কালসাপ গলায় বন্ধন করা এক সমান!

শুয়ে শুয়ে এই সকল আমি ভাবছি, হঠাৎ ছাদের উপর ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর

শব্দ। দুম দুম, গুম গুম, দুপ দাপ, ধুপ ধাপ, হুপ হাপ, এই প্রকার বিকট বিকট শব্দ! একবার বোধ হলো, ঠিক যেন আমার মাথার উপর, একটু পরে আবার বোধ হলো যেন আমার শয়নঘরের বারান্দায়, একটু পরে আবার বোধ হলো যেন খানিকটা তফাতে! একবার এখানে, একবার ওখানে, একবার ছাদের উপর, একবার বারান্দায়, নানা স্থানে নানাপ্রকার শব্দ! এক একবার বোধ হোতে লাগলো যেন সূতিকাগারে শিশুর ক্রন্দন, এক একবার বোধ হলো যেন কোন বন্যজন্তুর সক্রোধ অস্ফুট গর্জ্জন, একবার শুনলেম যেন দুই তিনজন মনুষ্যের বেতালা নৃত্যের সঙ্গে অট্ট অট্ট হাস্য!

কি ব্যাপার! এই গভীর রজনীতে বাড়ীর ভিতর এ সব কি হয়! যারা আমার প্রাণান্ত করবার চেষ্টায় ফেরে, তারাই কি এই রাত্রিকালে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে এই রকমে আমারে ভয় দেখাচ্ছে? কিছু স্থির কোত্তে পাল্লেম না। উপর্য্যুপরি কেবল সেইরূপ শব্দ, সেইরূপ গর্জ্জন আর সেই-রূপ উচ্চ উচ্চ হাস্য শ্রবণ কোত্তে লাগলেম! ভূতে যার বিশ্বাস আছে, তারা অবশ্যই ভয় পেতো, ভূত আমি বিশ্বাস করি না, সুতরাং ভূতের ভয় আমার এলো না, কিন্তু অন্য এক প্রকার সন্দেহ আমার মনোমধ্যে সমুদিত হয়ে কোন এক প্রকার অজ্ঞাত কারণে আমার চিত্তকে অত্যন্ত বিচলিত কোরে তুল্লে।

ওঃ! এই জন্যই বটে! এই জন্যই রামদাস আমারে সাবধান থাকতে বোলেছিল, এই জন্যই কর্ত্তার বড়ছেলেটি আমারে সাবধান কোরে গিয়েছিলেন, এই জন্যই আমার আহারের পর পাচিকাঠাকুরাণী বার বার আমারে সতর্ক কোরে গিয়েছেন; তাঁরা বোধ হয় নিত্য রাত্রে ঐরূপ শব্দ শুনতে পান, শুনে শুনে তাঁরা বোধ হয় ভূত মনে কোরে ভয় পান। অনেক দিনের পুরাতন বাড়ীতে পরিবার বেশী না থাকলে ভূতেরা এসে বাসা করে, অনেক জায়গায় অনেকের মুখে এরূপ কথা শুনা যায়; কেহ কেহ তালগাছের মত ভূত দেখেন, শাদা কাপড় পরা, কালো কালো কোপনী পরা, লাল কাপড়ের জাঙ্গিয়াপরা, বিকটাকার ভূত অনেক লোকের চক্ষে পড়ে, কালো কালো ভূতেরা অনেক লোকের ঘাড়ে চাপে, যুবতী স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়ে, এমন কথাও শুনা যায়, আমার মনে কিন্তু সে রকম ভাব কিছুই এলো না, ভূতের ভয়ে আমি অভিভূত হোলেম না। ব্যাপার কি, যদি কিছু জানা যায়, জানবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণদিকের একটা দরজা খুলে বারান্দায় আমি বেরুলেম। নীচে দিব্য পরি-ষ্কার, আকাশ দিব্য পরিষ্কার, দিব্য জ্যোৎস্না, সকল দিকে চেয়ে দেখলেম, কোথাও কিছু নাই, ছাদের দিকে চাইলেম, কিছুই দেখা গেল না; ভগ্ন বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে যে একটা ভগ্নাগৃহ রামদাস আমারে দেখিয়েছিল, সেই গৃহের দিকেও চাইলেম, সেখানেও কিছু নাই; মনে মনে হাস্য কোরে গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ কোল্লেম; দরজাটা বন্ধ কোরে দিলেম; প্রদীপটা তখনো জ্বেল-ছিল, নির্ব্বাণ কোরে দিয়ে পুনর্ব্বার আমি শয়ন কোল্লেম। পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ! যতক্ষণ আমি বারান্দায় ছিলেম, ততক্ষণ থেমেছিল, পুনর্ব্বার সেইরূপ নৃত্য, সেইরূপ হুঙ্কার, সেইরূপ হাস্য। কি এ? ভূত যদি হয়, তবে তো

ভূতেরা বিলক্ষণ চালাক, বিলক্ষণ হুঁশিয়ার! সজাগ মানুষ দেখে সাবধান হয়! ভূত যদি হয়, এ রকম ভূত ভাল!

ভূতের কথা আর আমি ভাবলেম্ না। নাচে নাচুক, মাতে মাতুক, হাসে হাসুক, আমার তাতে কি? ভূতের ভাবনা দূরে রেখে আমি নয়ন মুদিত কোল্লেম; রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, নয়ন মুদে থাক্‌তে থাক্‌তে নিদ্রা এলো, গাঢ়নিদ্রায় আমি অভিভূত হোলেম। প্রভাতে দরজার চাবী খুলে একজন সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে; সেই শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো; চেয়ে দেখি, সম্মুখে সেই রূপসী।

বারান্দার খড়খড়ী খোলা ছিল, ঘরের ভিতর রৌদ্র এসেছিল, রূপসীকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, বেলা প্রায় ছয়দণ্ড। কি আমি বলি, শুন্‌বার অভি-লাষে রূপ্‌সী আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, কিছুই আমি বোল্লেম না; রাত্রে যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শব্দ আমি শ্রবণ কোরেছিলেম, সে সব শব্দের কথা আমার মনের ভিতরেই চাপা থাকলো। ঘরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার কোরে, ঘরে ঝাড়ু দিয়ে, রূপ্‌সী নিঃশব্দে তখনকার মত বাহির হয়ে গেল। তার পর স্নান, আহার, বিশ্রাম; অপরাহ্ণ সমাগত।

রামদাসকে সঙ্গে কোরে প্রাণগতিবাবু প্রবেশ কোল্লেন। তখনো আমি শয়ন কোরে ছিলেম, বাবুকে দেখে উঠে বোসলেম। শয্যার এক পার্শ্বে উপ-বেশন কোরে সহাস্যবদনে বড়বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হরিদাস! গত রাত্রে কেমন ছিলে? কোন রকম ভয় পাও নাই তো?"

প্রশ্ন শুনে আমি ভাব্‌লেম, ভয় পাওয়াটা এ বাড়ীর একটা দৈনিক কার্য্যের মধ্যেই গণ্য হয়ে পোড়েছে! বাড়ীতে যাঁরা আছেন, তাঁরা হয় তো সকলেই ভয় পান কিম্বা হয় তো অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, ততটা আর গ্রাহ্য করেন না; নূতন লোক এলেই ভয়ের কথাটা—ভয়ের কাণ্ডটা নূতন হয়ে জেগে উঠে। কাজ কি আমার সে সব কথায়? বিনা সঙ্কোচে সপ্রতিভ হয়েই আমি উত্তর কোল্লেম, "বেশ ছিলেম, কিছুই ভয় পাই নাই, ভয় পেতে হয়, তেমন কোন লক্ষণও আমি জানতে পারি নাই।"

বড়বাবুর উভয় নেত্র বিস্ফারিত। নিষ্পলকে আমার নিষ্পলক নয়ন নিরী-ক্ষণ কোরে ক্ষণকাল তিনি নির্ব্বাক্ থাক্‌লেন, তার পর একটু গুঞ্জনস্বরে বোল্লেন, "ছেলেমানুষের ঘুম বেশী। তা বেশ! রাত্রিকালে জেগে থাকলেই অনেক রকম ভয় আসে, চক্ষের কাছে যেন কত রকম বিভীষিকা দেখা যায়। অচেতনে ঘুমালে আর কোন উৎপাত থাকে না। তা বেশ! এখন একটু বেড়াতে যাবে?"

অছিলা একটু পেলেই হয়। বেড়াতে যাওয়ায় আমার বড় আমোদ। নানা দিকে নানা বস্তু দর্শন কোরে মন একটু প্রফুল্ল থাকে, চিন্তা-ভাণ্ডারের দ্বার খানিকক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে, খানিকক্ষণ বেশ অন্যমনস্ক থাকা যায়। বড়বাবুর প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর দিলেম, "যাব। নূতন জায়গায় এসেছি, দেখে শুনে রাখা ভাল। বিশেষতঃ কর্ত্তার মুখে শুনেছি, কিছুদিন আমারে এখানে থাক্‌তে হবে, সেরেস্তায় লেখাপড়া কোত্তে হবে, স্থানটী ভালরূপে জেনে রাখা

দরকার। কল্য বৈকালে রামদাস অল্প অল্প দেখিয়ে এনেছে। রামদাসটি বেশ লোক। আজিও কি রামদাস আমার সঙ্গে যাবে?"

বড়বাবু বোল্লেন, "হাঁ, রামদাসও যাবে, আমিও যাব। চল ; এসো।"

তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে আমি বেরুলেম। দক্ষিণের জানালা দরজা বন্ধ হলো, ঘরের প্রবেশ-দ্বারে রামদাস চাবী দিল. আমরা বেড়াতে চোল্লেম। আমি আর বড়বাবু পাশাপাশি,—সারি সারি, পশ্চাতে রামদাস।

রুদ্রাক্ষ গ্রাম। যে বাড়ীতে আমারে থাকতে হয়েছে, গ্রামের উত্তর প্রান্তে সেই বাড়ী। বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমরা পশ্চিমের রাস্তা ধোল্লেম। পল্লী-গ্রামের রাস্তা, সর্ব্বত্রই প্রায় সঙ্কীর্ণ, ঠাঁই ঠাঁই কিছু প্রশস্ত ; ধারে ধারে দূরে দূরে এক একখানা সামান্য রকমের বাড়ী, দূরে নিকটে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ-মালা। শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ, এমন কথা আমি বোল্‌ছি না, কোথাও একটি, কোথাও দুটী পাঁচটী, কোথাও বা আট-দশটী, স্থানে স্থানে এই রকমে নানাজাতি বৃক্ষ দণ্ডায়মান, মধ্যে মধ্যে এক একখানি বাগান। এইখানে আমি একটী আশ্চর্য্য দেখ্‌লেম। সকল গাছে পাতা নাই ; যে সব গাছে পাতা আছে, সে সব গাছ যেন একটু একটু ঝলসানো ঝলসানো ; পাতাগুলিও ছোট ছোট। পাতার বর্ণও অন্য প্রকার ; নিখুঁত হরিৎবর্ণের বৃক্ষপত্র অতি অল্পই দেখা গেল। আর এক আশ্চর্য, কোন বৃক্ষশাখায় একটিও পাখী দেখলেম না।

গল্প কোত্তে কোত্তে আমরা চোলেছিলেম, প্রকৃতির ঐরূপ বিপর্যয় দর্শনে বড়-বাবুকে আমি সেই বিপর্য্যয়ের হেতু জিজ্ঞাসা কোল্লেম। বড়বাবু বোল্লেন, "দ্বাদশ মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে পাঁচবার অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, অনেক লোকের ঘর-বাড়ী ভস্ম হয়ে গিয়েছে, অনেক বড় বড় বৃক্ষ সমূলে দগ্ধ হয়েছে, অগ্নি-ক্ষেত্রের নিকট বৃক্ষ একটিও সতেজ নাই ; যে সকল বৃক্ষ দূরে ছিল, সেই-গুলিই বেঁচে আছে. এগুলিও দূরে থাকাতে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু ভীষণ অনলের উত্তাপে শাখাপত্রাদির অবস্থা ঐ রকম। এ অঞ্চলে তৃণগৃহ অনেক ছিল, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সমস্তই ভস্মীভূত ; পুনর্নির্ম্মাণে যারা অসমর্থ ছিল, তারা পালিয়ে গিয়েছে, কাজেই গ্রামবাসীর সংখ্যা কম হয়ে পোড়েছে।"

পশ্চাতে ছিল রামদাস। বড়বাবুর অপেক্ষা রামদাসের বয়স অনেক বেশী ; রামদাস তাঁদের বাড়ীর অনেক দিনের চাকর, রামদাস বড়বাবুর জন্ম দর্শন কোরেছে ; বড়বাবুর কথা সমাপ্ত হবামাত্র রামদাস আমাদের সম্মুখে এগিয়ে এসে হস্ত বিস্তার কোরে বোলে উঠ্‌লো, "সে কথাটা বুঝি বোল্‌বে না? ঘর পুড়ে গিয়েছে. গাছ পুড়ে গিয়েছে, মানুষেরা পালিয়ে গিয়েছে, এই কথা বোল্লেই বুঝি সব বলা হলো? আসল কথাটা চেপে রাখ কেন? ভয় করে বুঝি বোলতে?"—বড়বাবুকে ঠেস দিয়ে দিয়ে ঐ কথাগুলি বোলে আমার দিকে চেয়ে রামদাস বোলতে লাগলো, "না গো হরিদাস, সে রকম আগুন লাগা নয় ; লোকেরা সব লোকের ঘরে ঘরে আগুন দিয়ে দিয়ে বেড়াতো। কাজ পাবার মৎলবে এক এক জায়গায় গুপ্তভাবে ঘরামী লোকেরা যেমন লোকের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়, এ গাঁয়ের কাণ্ডটা সে রকম নয় ;—রাম! রাম! রাম!—এ গ্রামে মাসকতক অত্যন্ত ভূতের ভয় হয়েছিল, সন্ধ্যার

পর ভূতের ভয়ে কেহই ঘরের বাহির হোতে পাত্তো না ;—না বেরুলে নয়, এমন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হোলে পাঁচ সাতজন একত্র হয়ে মশাল জেবলে জেবলে রাস্তায় বেরুতো। কেন জানো ?—ভূতেরা আগুন দেখ্লে ভয় পায়, আলো দেখ্লে পালিয়ে যায়, সেই জন্য। সেই রকম হোতে হোতে গ্রামের জনকতক ডানপিটে লোক একটা দল বেঁধে পরামর্শ কোল্লে, আগুন দেখে যদি ভূত পালায়, তবে গ্রামে আগুন দিয়ে ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা করা যাক্। সেই ব্যবস্থায় বার বার অগ্নিকাণ্ডে লোকের ঘর-বাড়ী গেল, গাছপালা গেল, ভূত কিন্তু পালালো না।"

কিঞ্চিৎ বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে একটু উচ্চকণ্ঠে বড়বাবু বোল্লেন, "ও কি কর রামদাস বালকের কাছে ও সব পরিচয় কেন ? রেতের বেলা ভয় পাবে। কত জায়গায় কত গ্রামে কতবার আগুন লাগে, ও রকমে হেতুর নির্ণয় কোরে কেহ কাহাকেও বুঝায় না, বুঝাতে হয়ও না।"

রামদাস চুপ্ কোরে থাক্লো। আমি মনে মনে হাস্য কোল্লেম। বালক রেতের বেলা ভয় পাবে ! ভূতের নামে ভয় পায়, এ বালক নয়, প্রাণগতিবাবু সেটি জানেন না, সেই জন্যই রামদাসকে সাবধান কোরে দিলেন। একরকম ইতিহাস আমি শুনলেম, মুখ বুজে চুপ কোরে থাকাও ভাল দেখায় না, বড়-বাবুকেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আগুন লেগেছিল, অনেক লোকের ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, হোতেই পারে, হয়েই থাকে, গাছে একটীও পাখী বসে না কেন ? পাখীরাও কি ভূতের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে ?"

বড়বাবু উত্তর করবার পূর্ব্বে আমার নূতন প্রশ্নে রামদাস উত্তর কোল্লে, "ভূতের ভয়ে পাখী পালায় না, ভূতের ভয়ে পালায় নাই ; বৎসরের মধ্যে বার বার আগুন লাগতে লাগলো, পাখীদের বাসাগুলি সব পুড়ে গেল, ছানা-গুলিও মারা গেল, বাসাতে যে সকল ডিম ছিল, সেগুলি সব দগ্ধ হলো, কাজে কাজে আগুনের ভয়ে পাখীরা সব উড়ে পালালো আগুনের ভয়,—ভূতের ভয়ে নয়। আমি তো মনে করি, অনেক মানুষের চেয়ে অনেক পশু-পক্ষীর বুদ্ধি বেশী। পশু-পক্ষীরা মুখে কথা কোয়ে কিছু প্রকাশ কোত্তে পারে না, কিন্তু মনে মনে ভালমন্দ সমস্তই বুঝতে পারে ;—পেটে পেটে বুদ্ধি।"

আমরা বেড়াচ্ছি, রুদ্রাক্ষগ্রামের পশ্চিমসীমা যেখানে শেষ, সেইখানে একটা নদী, আমরা সেই নদী-কূলে উপস্থিত হোলেম। আর অগ্রসর হওয়া গেল না, নদীতীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকের শোভা আমরা দর্শন কোত্তে লাগলেম। খানিকক্ষণ আপন মনে কি আলোচনা কোরে একটু ম্লানবদনে রামদাস আমাকে বোল্লে, "পাড়াগাঁয়ে গরীবের বাস অধিক ; গরীবলোকেরা পাতার ঘরে, খড়ের ঘরে বাস করে ; এ গ্রামেও তাই ছিল, দেখে এসেছো খানকতক কুঁড়ে ঘর নূতন হয়েছে, আগেকার পোড়া-ঘর পোড়ে আছে, বড়ই দুর্দ্দশা। আমাদের গাঁয়ে পাকাবাড়ী বড়ই কম ; আমাদের বাবুদের ঐ একখানি আর গ্রামের পূর্ব্ব-দিকে তিন ঘর তন্তুবায়ের তিনখানি, এই মাত্র। পাকাবাড়ীতে আগুনের ভয় বড় একটা থাকে না, বাবুলোকের উপর ভূতের উপদ্রবও বেশী হয় না, যত কোপ গরীবদের উপর !"

রামদাসের শেষ কথাগুলির উপর টীকা করবার কোন প্রয়োজন হলো না, আমি চুপ কোরে থাকলেম। রামদাসের মুখখানি একটু ভারী হলো,—ভাবে বুঝা গেল অভিমান। যারা বেশী কথা কয়, তারা মনে করে, আমাদের কথায় সকল লোকের আমোদ হবে, সকলে আমাদের বাকশক্তির প্রশংসা কোরবে, অবশ্যই কেহ না কেহ মনোযোগ দিয়ে শুনে শুনে বড় বড় কথার উত্তর দিবে। রামদাস এখানে কোন উত্তর পেলে না, তাতেই তার অভিমান হলো। রামদাস হঠাৎ পাকাবাড়ীর কথা কেন তুলেছিল, আমি সেটা কতক কতক বুঝতে পেরেছিলেম; ভূতেরা পাকাবাড়ীতে বাসা করে কি না, রামদাস হয় তো সেই কথাই বোলতো; উত্তর পেলো না বোলেই ভূমিকাতেই ইতিহাসটা সাঙ্গ কোরে দিলে; সাঙ্গ কোত্তেই বাধ্য হলো। সেইজন্যই অভিমান, তার তখনকার মুখের ভাব দেখে আমি সেইরূপ অনুমান কোল্লেম।

নদীর জল-তলে রক্তবর্ণ সূর্যমণ্ডলের ছায়া। সূর্যদেবের অস্তাচলে গমনের সময় সন্নিহিত। প্রাণগতিবাবু আকাশের দিকে একবার চেয়ে আমার মুখের দিকে ফিরে প্রসন্নবদনে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস, তুমি আমাদের কাছে নূতন, তথাপি তোমার চক্ষু দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি বেশ বুদ্ধিমান। ভূতের প্রসঙ্গে যে সব কথা আমরা বলাবলি কোল্লেম, তত হোক না হোক, ও সব কথায় মনে এক প্রকার ভয় আসে; পৃথিবীর সকল দেশেই ভূতের অস্তিত্বে আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প শুনা যায়; বিশ্বাসের সঙ্গে যারা গল্প করে, তারা অবশ্যই ভয় পায়। দিনমানে ততটা ভয় না আসুক, রাত্রিকালে নিশ্চয়ই ভয় হয়; আর এখানে আমাদের বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; সন্ধ্যা আগতপ্রায়।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা বাড়ীতে ফিরে গেলেম। নূতন জায়গায় প্রথম প্রথম যেমন হয়ে থাকে, সেই রকমে সে রাত্রিও আমি যাপন কোল্লেম, সে রাত্রেও পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় নানা প্রকার উৎকট শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হলো; ভ্রূক্ষেপ না কোরে নির্ভয়ে আমি শয়ন কোরে থাকলেম। নিদ্রার অগ্রে সে রাত্রে আমি একটা নূতন কথা ভাবছিলেম। গ্রামের পশ্চিমদিকে অগ্নিকাণ্ডের নিদর্শন। প্রাণগতিবাবু অন্য কোন দিকে না গিয়ে সেই দিকে আমারে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন? অগ্নিকাণ্ডের হেতু জানবার ইচ্ছা হোলে আমারে তিনি ভূতের উৎপাতের কথা শুনাবেন, শুনে আমি ভয় পাব, এই কি তাঁর মতলব? পূর্ব্বদিনের সতর্কতার উপদেশ, রামদাসের মুখে, পাচিকার মুখে আর তাঁর নিজমুখে সাবধানতার বার্ত্তা, আজ আবার স্পষ্ট স্পষ্ট ভয়-প্রদর্শন-ভূমিকা। এ প্রকার ভূমিকার কারণ কি? আমারে ভূতের ভয় দেখিয়ে কার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে? যারা আমারে আমার অজ্ঞাতে এ বাড়ীতে রেখে গিয়েছে, তারাই কি ঐরূপ উপদেশক? তাই যদি হয়, তবে ভূতের কথা কেন? ভয়ের হেতু অনেক রকম আছে, অনেক কারণেই লোক ভয় পায়, ভূতের ভয় দেখিয়ে ছলনা করবার উদ্দেশ্য কি? কিছুই মীমাংসা আনতে পাল্লেম না। নিদ্রা এলো, ঘুমালেম, সব ভয়—সব তর্ক ভুলে গেলেম।

উপর্য্যুপরি পাঁচ রাত্রি আমি ঐ প্রকার শব্দ শ্রবণ কোল্লেম, একবারও আমার ভয় হলো না; কেবল একটা সন্দেহ বাড়লো মাত্র। যা যা আমি শুনি,

কাহারও কাছে প্রকাশ করি না, কেহ জিজ্ঞাসা কোল্লেও সে সব কথা বলি না। বড়বাবু, পাচিকা ও রামদাস আমার নির্ভীকতা অনুভব কোরে বিস্ময়াপন্ন। কর্ত্তাবাবু সেই একদিন ভিন্ন আর কোন দিন আমারে দেখা দেন নাই, ছোট-বাবুও সেই একবার ভিন্ন আর আমার কাছে আসেন না। বড়বাবু, রামদাস, পাচিকা আর রূপসী, এই চারিজনের সঙ্গেই আমার দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা চলে। রূপসী দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ সাতবার আমার ঘরে আসে, কাজ-কর্ম্ম করে, কথা কবার প্রয়োজন না থাকলেও সামান্য একটা অছিলা ধোরে নানা রকম কথা কয়, হাস্যের কারণ না থাকলেও মুখ মুচকে মুচকে হাসে, আমি যখন অন্যদিকে চেয়ে থাকি, রূপসী তখন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে, ঘর থেকে যখন বেরিয়ে যায়, আমি তখন তার বিলক্ষণ কটাক্ষ-ভঙ্গী দর্শন করি ; মনে সন্দেহ আসে।

এইভাবে দশদিন আমি সেই বাড়ীতে থাকলেম। সকল রকমেই সেই দশদিন সমভাব। কর্ত্তা আমারে বোলেছিলেন লেখা-পড়ার কাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে হবে। কথা আমার মনে ছিল, কাজে কিন্তু কিছুই না :—কাগজ-কলমের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ মাত্র নাই। আমি তবে কি করি ?—উত্থান করি, ভোজন করি, ভ্রমণ করি, শয়ন করি, চিন্তা করি, মাঝে মাঝে আজগুবী আজগুবী গল্পগুজব শ্রবণ করি, এই পর্যন্ত আমার কর্ম্ম। দশদিন দশ রাত্রি ঠিক একভাবে কেটে গেল। থাকতে থাকতে বাবুদের পরিবারবর্গের পরিচয় পেলেম।

পুরুষের মধ্যে কর্ত্তা স্বয়ং আর দুটি পুত্র ; স্ত্রীলোকের মধ্যে গৃহিণী, বড়বধূ, ছোটবধূ আর কর্ত্তাবাবুর এক শ্যালকের একটি স্ত্রী ; চাকরের মধ্যে রামদাস, চাকরাণীর মধ্যে রূপসী ; এইগুলি ছাড়া সেই বৃদ্ধা পাচিকা-ঠাকুরাণী। বড়বাবুর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ, ছোটবাবুর বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশতি বর্ষ ; বড়-বৌমার বয়স বাইশ বৎসর, ছোট-বৌমার বয়স ঊনিশ বৎসর। কর্ত্তার যে শ্যালক-পত্নীটি বাড়ীতে আছেন, তিনি বিধবা, বয়স অনুমান তেইশ চব্বিশ বৎসর ; দেখতে দিব্য সুশ্রী, বর্ণ গৌর, সে গৌরবর্ণের উপর রক্তবর্ণ আভা ; কর্ত্তা সেটিকে রাঙা-বৌ বোলে আদর করেন, গৃহিণীও বলেন, রাঙা-বৌ। সেই রাঙা-বৌটি ছেলেবাবুদের মামী হন ; রামদাস আর রূপসী সেই সম্পর্কে রাঙা-বৌকে রাঙা-মামী বোলে সম্মান দেয়।

বাবুদের একটি ভগ্নী আছে, তার নাম শুকতারা। সেই ভগ্নীটি সর্ব্ব-কনিষ্ঠা। সেটী প্রায় বারমাস শ্বশুরালয়ে থাকে, মাঝে মাঝে এক একবার আসে, সপ্তাহের মধ্যেই আবার চলে যায়। পূর্ব্বে বলেছি, এ বাড়ীর ভিতরমহল বাহিরমহল প্রায় এক, কেবল একটি বারান্দা মাত্র ব্যবধান; তথাপি আমি প্রথম প্রথম কেবল বাহির-মহলেই থাকতেম, নারী-মহলে প্রবেশের অনুমতি পেতেম না, বেশীদিন থাক্‌তে থাক্‌তে আমার রীতি চরিত্র দেখে, কর্ত্তা আমারে অন্দরে গিয়ে আহার করবার অনুমতি দিলেন। সেই কর্ত্তা ; যিনি আমারে

নেশাখোর ভেবে অগ্রাহ্য কোরেছিলেম, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ঝেড়েছিলেন, একমাস পূর্ণ হোতে না হোতেই সেই কর্ত্তা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন।

ভিতরমহলে আমি প্রবেশ করি, গৃহিণীকে আমি মা বোলে ডাকি, বৌ দুটী আমারে দেখে ঘোমটা দেন, রাঙা-মামী ঘোমটা দেন না। দুই বেলা আহারের সময় বাড়ীর ভিতর আমি যাই, অন্য কোন প্রয়োজন উপস্থিত হোলেও অন্দরে আমার ডাক পড়ে ; অবাধ গতিবিধি ; কিন্তু রাত্রিকালে শয়নটা আমার বাহিরেই হয়। বাহিরে শয়ন করি বটে, কিন্তু রাত্রিকালে সমস্ত কলরব নিবৃত্তি হোলে ভিতরমহলের উচ্চ উচ্চ কথাবার্ত্তা আমার শ্রবণগোচর হয়। আমার শয়ন-ঘরের ঠিক পাশেই অন্দর ; বারান্দার দরজা পার হয়ে অন্দরের পথের বামদিকে যে ঘরটী, রাত্রিকালে সেই ঘরে রাঙা-মামী শয়ন করেন, সেই ঘরের পশ্চিমের দুটি ঘরে বড়বাবু আর ছোটবাবু। সেই তিনটি ঘর উত্তরদ্বারী, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। অপর ধারে ঐরূপ তিনটি ঘর দক্ষিণ-দ্বারী ; একটিতে কর্ত্তা-গৃহিণী থাকেন, একটিতে পাচিকা আর রূপসী, তৃতীয়টী ভাঁড়ার ঘর। রন্ধনগৃহ নিম্নতলে। অন্দরের চিত্র এইরূপ। বাহির-দিকেও উত্তর বারান্দার দক্ষিণাংশে সারি সারি তিনটি ঘর। একটি ঘরে আমি থাকি, তার পাশে পূর্ব্বদিকের একটী ঘরে রামদাস শয়ন করে, তৃতীয় ঘরটী খালি থাকে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বাড়ীতে যখন পূজা-পার্ব্বণ হতো, সেই সময় লণ্ঠনদেয়ালগির়ি অনেক ছিল, অনেক এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে, অবশিষ্ট গোটাকতক এখন সেই খালি ঘরে রক্ষিত হয়েছে।

প্রতি রজনীতে আমি ভয়ংকর ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি, কোথা থেকে শব্দ আসে, কারা সেই সকল শব্দ করে, কিছুই আমি ঠিক কোত্তে পারি না ; দিনের বেলা আমি কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করি না। সেই ভাবে প্রায় একমাস গেল। আমার মন ক্রমশই চঞ্চল। যাঁরা আমারে ভালবাসেন, আমি যাঁদের ভালবাসি, তাঁরা কে কেমন আছেন, মামলা-মোকদ্দমার সংবাদ কি, কিছুই জানতে পাচ্ছি না। একদিন বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে আপন ঘরের একটি গবাক্ষে বোসে গালে হাত দিয়ে আমি ভাবছি, এত দিনের পর কর্ত্তা হঠাৎ সেইখানে এলেন। ভাবনায় অন্যমনস্ক ছিলেম, চক্ষুও অন্যদিকে ছিল, নিঃশব্দে টিপি টিপি প্রবেশ কোরে আচম্বিতে কর্ত্তা আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হরিদাস, এত গভীর কিসের চিন্তা ? কিসের ধ্যানে নিমগ্ন আছ ?"

চমকে উঠে থাড়িমাড়ি খেয়ে আমি নেমে দাঁড়ালেম। একটু পূর্ব্বে যে একটি কল্পনা, আমার অন্তরে খেলা কোচ্ছিল, কোন কথা মনে আনবার অগ্রেই সেই কল্পনাটি কর্ত্তাকে জানিয়ে বিনম্রবচনে নিবেদন কোল্লেম, "আপনার নিকটে আমার একটি প্রার্থনা। নিরাশ্রয় অবস্থায় যাঁরা আমারে আশ্রয় দিয়ে-ছিলেন, তাঁদের জন্য সর্ব্বদা আমার প্রাণ কেমন করে ; ডাকযোগে চিঠি লিখে তাঁদের শুভসমাচার আনাই, এই আমার ইচ্ছা। আপনি অনুগ্রহ কোরে অনু-মতি দান করুন।"

গম্ভীরবদনে কি একটু চিন্তা কোরে কর্ত্তামহাশয় আমারে বোল্লেন, "যা লিখতে চাও, লিখতে পার, কিন্তু শিরোনামগুলি আমি দেখে দেখে দিব।"

—আমি বোল্লেম, "আজ্ঞে, কেবল শিরোনামা কেন, পত্রে যা যা আমি লিখবো, সমস্তই আপনি দেখে দিবেন।"

আমার বিছানার উপর কর্ত্তা বোসলেন : একটু দূরে বোসে মনের উল্লাসে আর কিছু আমি বলবার উপক্রম কোচ্ছিলেম, সেই অবসরে এক রকম বিমর্ষ-স্বরে কর্ত্তা আবার বোল্লেন, "না না, তা তুমি পার না। চিঠি যদি তুমি লিখতে চাও, তাতে কেবল এই কথা লিখতে পার যে, তুমি বেঁচে আছ, সুখে আছ, পীড়া হয় নাই, এই রকম খোলসা খোলসা কথা। কোথায় আছ, কি বৃত্তান্ত, সে সব কথা লিখতে পাবে না। আরও একটি কথা বোলে রাখি। চিঠিগুলি লেখা হোলে আমার হাতে দিও, আমি সেইগুলি কলিকাতা যাত্রী বিশ্বাসী-লোকের হাতে দিয়ে রওনা কোরে দিব, তাঁরা সেগুলি কলিকাতার ডাক ঘরে অর্পণ কোরবেন। ত্রিপুরা, ঢাকা অথবা পূর্ব্বাঞ্চলের কোন ডাকঘরের নাম নিদর্শন কোন চিঠিতেই থাকতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?"

বিষণ্ণ বদনে আমি উত্তর কোল্লেম, "বুঝতে পাল্লেম সব, যাঁদের আমি লিখবো, তাঁরা সে সকল পত্র পাবেন, সে কথাও সত্য, কিন্তু যে জন্য আমার প্রাণ আকুল, সে পক্ষে কোন উপকার হবে না ; ঠিকানা লেখা না থাকলে পত্রের প্রত্যুত্তর আমি প্রাপ্ত হব না।"

"তা আমি কি কোরবো?"—কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কর্ত্তা বোলে উঠলেন, "তা আমি কি কোরবো? এই জেলায় আমার বাড়ীতে তুমি আছ, সে কথা প্রকাশ হোলে দলে দলে লোক এসে আমাকে উস্তম-খুস্তম কোরবে, অনেক লোক তোমার তল্লাস কোরতে আসবে, সেটা আমি ইচ্ছা করি না। সাবধান, আমার অজ্ঞাতে ক্ষুদ্র একখানি চিঠিও এখানকার ডাকঘরে তুমি দিও না। যদি দাও, তোমার নিজেরই মন্দ হবে ; স্মরণ রেখো।"

এই সব কথা বোলে, কটমটচক্ষে আমার দিকে চাইতে চাইতে কর্ত্তাবাবু ত্বরিতপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কি কোত্তেই বা এসেছিলেন, কি কোরেই বা চোলে গেলেন, কিছুই আমি বুঝলেম না, অবাক হয়ে একটি ধারে আমি বোসে থাকলেম।

কর্ত্তাও বেরিয়ে গেলেন, তৎক্ষণাৎ রামদাস এসে উপস্থিত। আমি মনে কোল্লেম, রামদাস বুঝি এবার কর্ত্তারই প্রেরিত : কিন্তু তা নয়।

রামদাস এসেই যেন একটু চমকিতস্বরে আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "গত রাত্রিতে তুমি কি কাজ কোরেছিলে? তোমার ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় কি সব শব্দ হয়েছিল?"

প্রশ্নের ভাব আমি বুঝতে পাল্লেম না। নিত্য রাত্রে ভয়ানক ভয়ানক শব্দ হয়, বাড়ীর লোকেরা সকলেই তা জানে, রামদাসও জানে, না জানলে ভয় পেয়ো না বোলে আমারে সাবধান কোরবে কেন? জানে সব, আমার বারান্দায় শব্দ হওয়াটা মিথ্যা কথা ; নিদ্রা আমার অল্পক্ষণ ; অন্য দিকে শব্দ হয়, হাস্য হয়, নৃত্য হয়, সব আমার কানে আসে, আমার সম্মুখের বারান্দায় কোন রাত্রে কোন শব্দ হয় না ; জানালা-খড়খড়ী খোলা থাকে, শব্দ শোনা মাত্র নয়, শব্দের নায়কেরাও আমার নয়ন-পথবর্ত্তী হোতে পাত্তো। বারান্দায়

কিছুই হয় নাই। রামদাস তবে এমন কথা বলে কেন? কোন রকম ধাপ্পা না কি?

রাত্রে যে যে কাণ্ড হয়, একদিনও কাহারো কাছে আমি সে সকল গল্প করি না। সেই দিন রামদাসের কথায় কৌতূহলী হয়ে আমি বোল্লেম, "দেখ রামদাস, যে সব কথা তোমরা বোলেছিলে, সে সব কথা সত্য, অনেক রকম শব্দ আমি শুনতে পাই; কিসের শব্দ, কারা শব্দ করে, কিছুই আমি বুঝতে পারি না, জান কি তুমি শব্দগুলা কিসের?"

বেলা এক প্রহর, তথাপি রামদাসের চক্ষে যেন ভয়ের লক্ষণ দেখা গেল। চকিতনেত্রে চারিদিকে চেয়ে, রাম রাম মন্ত্রে আত্মসার কোরে রামদাস চুপি চুপি বোল্লে, "রামনাম কর! রামনাম কর! এখানা ভূতের বাড়ী! বাড়ীতে পরিবার অনেক ছিল, যমের দৌরাত্ম্যে প্রায় সকলেই শ্মশানশায়ী হয়েছে, যে কয়জন বেঁচে আছে, চক্ষেই দেখতে পাচ্ছো। বাড়ীখানাও কত বড়, আছেই বা কতটুকু, তাও তুমি দেখছো। পাড়ার লোকেরা বলে, থানা বাড়ী! সকলে তো ভেতরের খবর রাখে না, যার মনে যা উদয় হয়, সেই কথাই সেই বলে। এ বাড়ীতে আজ কাল ভূতের অধিকার! তুমি নূতন এসেছো, ভয় পাবে বোলে সব কথা আমি তোমাকে বলি না। ভূত সব দেখা যায়! ভয়ানক ভয়ানক ভূত! গণনাতে অনেক! ইদানীং উপদ্রবটা কিছু বেড়েছে, এত দিনের পর কর্ত্তা ভয় পেয়েছেন; ভূতেরা দুদিন তিন দিন কর্ত্তার ঘরে দুধ-সন্দেশ চুরি কোরে খেয়েছে। বাক্সের টাকা সিঁড়িতে ছড়াছড়ি যাওয়া আরম্ভ হয়েছে, বাক্সে চাবি দেওয়া থাকে, টাকা উড়ে যায়, টাকার বাটিতে চাঁপাফুল, কোন দিন বা দু একটা রসগোল্লা পাওয়া যায়।"

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ কোরে হঠাৎ আমি বোল্লেম, "তবে তো সে সকল ভূতের বেশ ধর্ম্মজ্ঞান আছে! টাকা চুরী করে না, ছড়িয়ে দিয়ে যায়, খাবার জিনিস রেখে যায়, ফুল রেখে যায়, আমার যেন মনে হয়, সে সব ভূত ঘরের ভূত! তাদের শরীরে মায়া দয়া বেশী। আচ্ছা রামদাস, ভূত যদি দেখা যায়, তবে কেন প্রতীকার করা যায় না?"

একটু শিউরে উঠে মস্তক সঞ্চালন কোরে রামদাস বোল্লে, "এই রে! ছেলেমানুষ কি না, ভূতের প্রতীকার কোত্তে চায়! ভূতের প্রতীকার কি রকম হরিদাস? আদালতে মোকদ্দমা করা? ঢাল-তলোয়ার নিয়ে তাড়া করা? লাঠিসোঁটা নিয়ে সদরদরজা আটক করা? তা নয় হরিদাস, তা নয়! মোকদ্দমামামলাতে কিম্বা যুদ্ধ-সজ্জাতে ভূত দমন করা যায় না, যাতে দমন করা যায়, কর্ত্তা সেই উদ্‌যোগে আছেন; কর্ত্তা-গিন্নী দুজনেই এই মাসের মধ্যে গয়াধামে যাবেন, গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান কোল্লেই একদিনে সমস্ত ভূত উদ্ধার হয়ে যাবে, বাড়ীতে আর কোন প্রকার উপদ্রব থাকবে না।"

সব কথায় বেশী মনোযোগ না রেখে, সত্যই যেন বেশী বিশ্বাস কোরেছি, সেই ভাব জানিয়ে গম্ভীরবদনে আমি বোল্লেম, "আচ্ছা রামদাস, সত্য কি ভূত তুমি স্বচক্ষে দেখেছ?"

রামদাস উত্তর কোল্লে, "চক্ষে না দেখে কোন কথা বলা আমার অভ্যাস

নয়। অনেকবার দেখেছি। কিন্তু একটা কথা কি জান, ছোটলোক ভূত আর ভদ্রলোক ভূত এক রকম হয় না ; ছোটলোক ভূতেরা সম্মুখে পোড়্‌লেই ঘাড় ভাঙে, ভদ্রলোক ভূতেরা সে রকম করে না, কেবল দূরে থেকে ভয় দেখায়। তাদের আরো একটা গুণ আছে। ঘরের মধ্যে বেশী লোক থাকলে তারা দেখা দেয় না, বাইরে বাইরে শব্দ কোরেই পালিয়ে যায়, রাত্রিকালে এক-ঘরে যদি একজন থাকে, তা হোলেই দেখা দেয়। দেখবে তুমি ? আজ অনেক রাত পর্যন্ত তুমি জেগে থেকো ; রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে ভূত আসে না, রাত্রি যখন ঝাঁ ঝাঁ করে, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সব যখন নিস্তব্ধ থাকে, সকলে যখন নিদ্রা যায়, সেই সময় ভূতের আমদানী ! আজ তুমি জেগে থেকো, ভয় পেয়ো না কিন্তু, ভয় পেলেই তারা বিকটমূর্ত্তি দেখায়। চুপটি কোরে ঠান্ডা হয়ে চেয়ে থেকো, ভূতগুলির লাফানী ঝাঁপানী দেখতে পাবে। তারা আমাদের পোষা ভূত !"

ক্রমশঃ বেলা হোতে লাগলো, রামদাস উঠে গেল, দিবা-কর্ত্তব্য সমাপ্ত কোরে আমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কোল্লেম। বিশ্রামকালে রামদাসের কথা স্মরণ কোরে আমার হাসি পেলে, কিন্তু হাসতে পাল্লেম না। চিঠি লেখা হবে না, অমরকুমারীর সংবাদ লওয়া হবে না। কর্ত্তা বোলে গেলেন, পূর্ব্বদেশের কোন ডাকঘরে আমার চিঠি অর্পণ করা হবে না। আমি যদি চিঠি লিখি, সাদা কথায় লিখে কর্ত্তার হাতে দিব, এখান থেকে কলিকাতায় যারা যায়, সেই সকল চিঠি কর্ত্তা তাদের হাতে দিবেন, কলিকাতার ডাকঘরে দস্তুরমত মোহর হয়ে সেই সব চিঠি বিলি হবে। কর্ত্তার ইচ্ছা এই প্রকার। ভূতের কৌতুক মনে কোত্তে কোত্তে কর্ত্তার ঐ সব কথা আগেই মনে এলো, হাসতে পাল্লেম না।

তাৎপর্য কি ? যেখানে আমি আছি, সেখানকার ডাকঘরে চিঠি দেওয়া হবে না, যে স্থানে আমি আছি, আমার বন্ধুগণকে সে ঠিকানা জানতে দেওয়া হবে না, তাৎপর্য কি ? যা আমি ভেবেছিলেম, ঠিক তাই ! যে সকল লোক এখানে আমারে রেখে গিয়েছে, নিশ্চয়ই তারা রক্তদন্তের দলের লোক ; রক্ত-দন্তের চক্র বহুদূরে-বিস্তৃত ! চিরদিন আমারে গোপন কোরে রাখা সেই চক্রের লোকের মতলব। দেখি দেখি, কপালে কি আছে ! ভগবান কাহারো প্রতি নির্দ্দয় থাকেন না, লোকের অবশ্যই চিরদিন সমান থাকে না, আমার এই দুরবস্থা যে চিরদিন সমান থাকবে, এমন কি পাপ আমি কোরেছি ? প্রাণে যদি না মরি, বৈরিহস্তে যদি আমার প্রাণ না যায়, তা হোলে একদিন না একদিন অবশ্যই আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে, অবশ্যই সুদিন উদয় হবে, ভগবান অবশ্যই মুখ তুলে চাইবেন, সেই সময় অবশ্যই জানতে পারবো, এই ভয়ানক যুক্তি-তর্কের গোড়া কোথায় ?

বেলা শেষ হয়ে এলো। আমি একাকী সেই ঘরটিতে বোসে আছি, রূপসী এসে আমারে ডেকে গেল ; বোলে গেল, রাঙামামী ডাকছেন।

রাঙামামী আমারে কেন ডাকেন ? রাঙামামী আমারে দেখে লজ্জা করেন না, কোন কিছু আবশ্যক হোলে আমারেই এনে দিতে বলেন, এই পর্যন্তই

আমি জানি। দাসী দিয়ে তিনি আমারে ডেকে পাঠাবেন, এটা আমার জানা ছিল না। কি করি, চাকুরী সম্পর্ক না হোলেও এ'দের বাড়ীতে আমি আছি, আমার উপর কর্ত্তার প্রভুত্ব চলে, ভাবতে গেলে এক রকম আমি চাকর। যেতে হলো।

ভিতরমহলে আমি প্রবেশ কোল্লেম। এইখানে আমারে একটু অনধিকার-চর্চ্চা কোত্তে স্বাধীনতা নিতে হলো। পূর্ব্বে বোলে রেখেছি, রাঙামামী বিধবা, রাঙামামী পরমা সুন্দরী। এই দিন আমি যে ভাবে তাঁরে দেখলেম, তাতে আমার এক মহা সন্দেহ দাঁড়ালো। অলংকার-বস্ত্রে সুশোভিতা, অলক্তকরা-গরঞ্জিতা, মণি-মণ্ডিত-কবরী-বিভূষিতা সেই রাঙামামী একটি নির্জ্জন গৃহে একাকিনী। তাঁর দুটি চক্ষে জলধারা। এই সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করা আমার অনধিকারচর্চ্চা। বিধবা যদি বিধবার মত ব্রহ্মচারিণীরূপে অধিষ্ঠিতা থাকতেন, তা হোলে সে দিকে চেয়ে দেখতে মানুষের মন পুলকিত হতো, দুষ্টের নয়ন ঝলসে যেতো। এ মূর্ত্তি সে মূর্ত্তি নয়, গৌরবর্ণের উপর গোলাপী আভা, অধ-রোষ্ঠে গোলাপী আভা, কপোলযুগলে গোলাপী আভা, বিশাল নয়নে বক্রদৃষ্টি। বক্ষঃস্থলে নীলবর্ণ কাঁচুলী, সেই কাঁচুলীর অর্দ্ধাংশ নীলবসনে ঢাকা। সম্মুখে গিয়ে আমি নত-নয়নে নত-বদনে দাঁড়ালেম। মৃদু হেসে মামী বোল্লেন, "বোসো হরিদাস, তুমি অমন ভয় পাচ্ছো কেন? তুমি না কি ভূতের ভয় পেয়েছ?"

আমি বোসলেম না, ভূতের ভয়ের কথাতেও কোন উত্তর দিলেম না। রাঙা-মামী আবার বোল্লেন, "রামদাস আমারে বোলে গেল, তুমি ভূতের ভয়ে কাতর আছ। ছি! ভূতকে কি ভয় করে? আমি তো মেয়েমানুষ, অন্য অনেক রকম ভয় আমার আছে, কিন্তু ভূতের ভয় আমি রাখি না। বাড়ীতে এক রকম শব্দ হয়। এত বড় বাড়ীখানা, কত লোক এ বাড়ীতে থাকতো, এখন গুটিকতক অস্থি-চর্ম্মসার ক্ষুদ্র প্রাণী খেলা কোরে বেড়ায়, সমস্ত বাড়ীখানা ফাঁকা; তাতে কোরেই রেতের বেলা বাতাসের শব্দকেও যেন বড় বড় কামানের শব্দ মনে হয়। তাতে তুমি ভয় পেয়ো না; কোথায় কি শব্দ হোচ্ছে, জানবার জন্য বিছানা থেকে উঠো না, উঁকি মেরে দেখো না, হাঁকাহাঁকি কোরে গোলমাল কোরো না! দেখ ভাই—(শ্রীবিষ্ণু!) দেখ হরিদাস, তোমার উপর আমি বড় সুখী আছি। আজ তুমি আমার একটি উপকার কর।"

"উপকার কর!"—এই কথাটি শুনে, আমি তখন মুখ উঁচু কোরে রাঙা-মামীর মুখখানি ভাল কোরে দর্শন কোল্লেম। একটু পূর্ব্বে চোখে জল দেখে-ছিলেম, সে জল কোথায় উড়ে গিয়েছে, চন্দ্রমুখ হাসি হাসি। চন্দ্রমুখ বোল্লেম, কিছু অশিষ্টতা প্রকাশ পেলে, কিন্তু কবিরা ভগবতীর বদনকেও চন্দ্রবদন বোলে বর্ণনা করেন। আমি কবি নই, কিন্তু সুন্দরী কামিনীর সুন্দর বদন-কেও চন্দ্রবদন বলাতে দোষ হোতে পারে না, এইরূপ আমার ধারণা। উত্তমরূপে তাঁর মুখখানি নিরীক্ষণ কোরে, ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "উপকার?—আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হোতে পারে?"

রাঙামামী উঠে দাঁড়ালেন ; ঘরের পূর্ব্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র একটী তোরঙ্গ ছিল, সেইটী খুলে কি একটী পদার্থ হাতে কোরে নিয়ে আমার কাছে ফিরে এলেন। অন্য কোন প্রকার ভূমিকা না কোরেই সেই পদার্থটী আমার হাতে দিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে চাপড়ে তিনি বোল্লেন, "তুমি বেশ ছোক্‌রা, খুব বুদ্ধিমান, এই জিনিসটি নিয়ে গিয়ে অমুক জায়গায় অমুক ঠিকানায় অমুক বাড়ীর সেজোবাবুর হাতে দিয়ে এসো। বুঝতে পেরেছো ঠিকানাটি ? সে দিন তোমরা যে রাস্তা ধোরে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলে, যে দিকে আগুন লেগেছিলো, সেই দিকে—সেই বড় একটা আম গাছ,—সেই দিকে বাঁ-হাতী একখানা ছোটবাড়ী। বুঝ্‌তে পেরেছো ? সেই বাড়ীর সেজোবাবুকে ডেকে চুপি চুপি এই মোড়কটী তাঁর হাতে দিয়ে এসো। এ মোড়কে ওষুধ আছে। সঙ্গোপনে দিও কেহ যেন দেখেনা কোন লোকের কাছে কোন কথা প্রকাশ কোরো না, আমাদের রামদাসকেও কিছু বোলো না।"

মোড়কটী আমার হাতে থাক্‌লো, ফিরিয়ে দিতে পাল্লেম না, 'এ কাজ আমার নয়" এ কথা বোলে মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিতে পাল্লেম না, কাজে কাজে মুষ্টিবন্ধ কোরে মোড়কটী ঢেকে রেখে আমি বেরিয়ে এলেম। আপনার ঘরে এনে মোড়কখানি আমি ভাল কোরে দেখলেম। বর্ত্তুলাকার এক খন্ড কাগজ। উপরে কিছু লেখা ছিল না ওজনেও ভারী নয়. ভিতরে কোন প্রকার ওষুধ কিম্বা বস্তু থাকলে ভারী হতো, তা নয় তবে কি ? মোড়ক করা, ধারে ধারে আঠা দিয়ে জোড়া, ভাব কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেম না ; এনেছি, মৌনসঙ্কেতে দৌত্যকর্ম্ম স্বীকার কোরেছি. দিয়ে আস্‌তে হবে, তাও স্থির কোল্লেম কিন্তু মনে কেমন খট্‌কা লাগ্‌লো।

মনে কোরেছিলেম, রাত্রে ভূত দেখ্‌বার কথা আছে, রাত জাগ্‌তে হবে, আজ আর বেড়াতে যাব না, কিন্তু রাঙামামীর দৌত্য কার্য্যে সে সঙ্কল্প অটল রাখ্‌তে পাল্লেম না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাপড় ছেড়ে সম্মুখ-রাস্তায় বাহির হোলেম। কেহই আমারে তখন দেখতে পেলে না। নদীর তীরে রাস্তাটা আমার জানা হয়েছিল, সরাসর সেই রাস্তায় গিয়ে সেই আম্রবৃক্ষের তলে আমি দাঁড়ালেম। হস্তে সেই বর্ত্তুলাকার পত্রিকা। কি বোল্লেম ?—পত্রিকা ?—কে আমারে এমন কথা বলালে ?—দেবতারা ?—সত্যই তবে এখানি এক গুপ্তপত্রিকা। একজন সেজোবাবুর হাতে এই গুপ্তপত্রিকা অর্পণ কোত্তে হবে। বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি, নিকটে একখানি বাড়ীও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ডাকি কি বোলে ? বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোত্তেও ভরসা হোচ্ছে না ; বাইরে দাঁড়িয়ে "সেজোবাবু সেজোবাবু" বোলে ডাকা, সেটাও ঠিক নয়। আমি নূতনলোক, ততটা স্বাধীনতা লওয়া আমার পক্ষে দোষের কথা। করা যায় কি ? সূর্যদেব অস্তাচলে যাচ্ছেন, আকাশের অনেকদূর পর্যন্ত রক্তবর্ণ হয়েছে, কুলায়বাসী পাখীরাও সব উড়ে উড়ে পালাচ্ছে, সন্ধ্যার বাতাসে নদীর জলে তরঙ্গ খেল্‌ছে, এমন সময় সেই বাড়ী থেকে একটী স্ত্রীলোক বেরুলো ; এক কোলে একটী জলের কলসী, এক কোলে একটী ছেলে।

যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম, স্ত্রীলোকটী সেইখান দিয়ে চোলে যায়, অগ্রবর্ত্তী হয়ে আমি তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "তুমি কি এই বাড়ীতেই থাকো ?"

একটু চমকিতভাবে চমকিতস্বরে স্ত্রীলোক আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কেন গা ? কে গা তুমি ? কোথা থেকে এসেছো ?"

এইবার আমি উত্তর কোল্লেম, "অনেক দূর থেকে এসেছি, দিনকতক এই গ্রামেই আছি, এখানে আমার একটু দরকার আছে।"

স্ত্রীলোক বোল্লে, "কার কাছে দরকার ? কি দরকার ?"—আমি উত্তর কোল্লেম, "যে বাড়ী থেকে তুমি আসছো, ঐ বাড়ীর সেজোবাবুর কাছে আমার দরকার।"—স্ত্রীলোক আপন মনে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আমাদের সেজোবাবুর কাছে কত লোকের যে কতরকম দরকার, তা আর বলবার নয়। রাতদিন দরকার ;—রাতদিন দরকার ! দরকার আর ফুরায় না !" আপন মনে ঐ সব কথা বোলে, আমার মুখের দিকে চেয়ে, সে স্ত্রীলোক একটু যেন রুক্ষস্বরে বোল্লে, "সন্ধ্যা হয়, এখন আবার তোমার কি দরকার ?"

আমি বোল্লেম, "একবার সাক্ষাৎ করা দরকার। যদি তুমি একবার তাঁরে খবর দিতে পার, আমার বড় উপকার হয়।"

বিড়্ বিড়্ কোরে আপনা আপনি কত কি বোকতে বোকতে সেই রুক্ষভাষিণী স্ত্রীলোক কি যেন ভেবে চিন্তে বিরক্ত হয়ে বোল্লে, "আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি জল নিয়ে আসি, অন্ধকার হয়ে এলো, এ সব জায়গায়—আচ্ছা, এইখানে তুমি একটু দাঁড়াও, ফিরে এসে তাঁরে আমি জানাবো, কি তিনি বলেন, আমার মুখেই শুনতে পাবে।"

আমি বুঝতে পাল্লেম, সেই স্ত্রীলোক সেই বাড়ীর চাকরাণী। বয়স কম, বাড়ীর মেয়ে হোলে আমার কাছে দাঁড়িয়ে অত কথা কইতো না। যাই হোক্, কাজ নিয়ে আমার কথা, চাকরাণী কি রাজরাণী, তাতে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি সোরে গিয়ে সেই বৃক্ষতলে দাঁড়ালেম। স্ত্রীলোকটী নদীর ঘাটে জল আন্‌তে গেল। যখন সে ফিরে এলো, তখন আর আমার দিকে চাইলে না ; হন্ হন্ কোরে বাড়ীর দিকেই চোল্লো। গাছতলা থেকে একটু উচ্চকণ্ঠে ডেকে ডেকে আমি তারে মনে কোরে দিলেম, "ভুলো না, আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম।"

স্ত্রীলোক উত্তর দিল না, চোলে গেল, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে। সূর্য্যদেব অস্তে গেলেন। আমার ভয় হতে লাগ্‌লো। ভূতের ভয় নয়, কত লোকের কুচক্রের শীকার আমি, নূতন জায়গায় নির্জ্জন পথে একাকী, যদি আবার রাহুচক্রে পড়ি, সেই ভয়।

দাঁড়িয়ে আছি, প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে একটী বাবু সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই তফাৎ থেকে তিনি জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন, "কে গা ? কে আমার তত্ত্ব কোচ্ছে ?"—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লেন, আমি সেই সময় তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেম। সূর্যদেব চোলে গিয়েছিলেন, অন্ধকার হয় নাই, বাবুটি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, আমিও তাঁর মুখের দিকে চাইলেম। বেশ বাবুটী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখ-দুটী বড় বড়,

ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া বাব্রী চুল, মাঝখানে সিঁতিকাটা। চুলের কেয়ারীতে কলিকাতার ধরণ অনেকটা জানা যায়। বোধ হলো এ বাবুটীর কলিকাতায় গতিবিধি আছে। কি জাতি, কি বৃত্তান্ত, জানা ছিল না, আমি নমস্কার কোল্লেম না; ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, আপনি কি এই বাড়ীর সেজোবাবু?

একটু চিন্তা কোরে বাবুটী উত্তর কোল্লেন, "হাঁ, আমি তাই। কেন তুমি ও কথা জিজ্ঞাসা কর? কে তুমি?" রাঙামামীর দত্ত-মোড়কটী বাহির কোরে দেখিয়ে আমি বোল্লেম, "একটি ওষুধের মোড়ক আছে, আপনার হাতে দিবার আদেশ।"

"ওষুধের মোড়ক? আমার জন্য? তোমার তো ভুল হয় নাই?"

বাবুর মুখের ঐ প্রকার কাটা কাটা প্রশ্ন শুনে আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞে না, ভুল হয় নাই। যিনি আমার হাতে দিয়েছেন, তিনি আমারে সব ঠিকানার কথা বোলে দিয়েছেন, আমি ঠিক এসেছি। যিনি দিয়েছেন, তিনি একটী স্ত্রীলোক।"

বাবু তখন পূর্ব্বস্মৃতির প্রসন্নতা লাভ কোরে প্রফুল্লবদনে বোল্লে, "ও—হো হো! বটে, বটে। একটী স্ত্রীলোক আমাকে একটী ঔষধ দিবেন স্বীকার কোরেছিলেন, মনে পোড়েছে!" সেজোবাবু দক্ষিণ হস্ত বিস্তার কোল্লেন, আমি সেই মোড়কটী তাঁর হস্তে অর্পণ কোল্লেম।

আর আমার সেখানে অপেক্ষা করা উচিত ছিল কি না, ভাবছিলেম, আমার মুখের দিকে চেয়ে বাবু বোল্লেন, "যিনি তোমার হাতে এই ঔষধের মোড়ক দিয়েছেন, ফিরে গিয়ে তাঁরে তুমি কিছু বোলো না। মোড়কটী যখন তিনি তোমারে দেন, তখন কেহ দেখেছিল, এমন তোমার মনে হয়?"

কথা হলো দুটী, একটী নিবারণ, আর একটী প্রশ্ন। দুটী কথার উত্তরেই একটি "না" দিয়ে আমি বিদায় হোলেম; বাবু আর আমারে কোন কথাই বোল্লেন না।

সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আমি ফিরে এলেম। সন্ধ্যার-পূর্ব্বে আমি কোথায় ছিলেম, কেহই আমারে সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে না; বোধ হয়, কেহই সে সময় আমার তত্ত্ব করে নাই; বড় একটা কৈফিয়তের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলেম। সন্ধ্যার পর নিত্য যেমন হয়ে থাকে, সেই রকমে সময় কাট্লো, আহারের সময় রাঙামামী একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আমার চক্ষের দিকে চাইলেন, আমিও সেই রকমে চেয়ে ঈষৎ মস্তকসঞ্চালনে সংকেতে সঙ্কেতে তদুত্তর দিলেম। রাঙামামী বুঝ্লেন, দৌত্যকার্য্যে আমি কৃতকার্য্য।

আহারান্তে বাহিরের ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম। রামদাস সেইখানে ছিল। অন্যদিন সে সময় কেহ থাকে না, রামদাস সে দিন কেন ছিল, একটু একটু আমি বুঝ্তে পাল্লেম। ভূত দেখাবার কথা। রামদাস আমার কাছে উপস্থিত থেকে ভূতের খেলা দেখাবে, তাই যেন আমার মনে হলো। রামদাস বোসে ছিল, আমারে দেখে উঠে দাঁড়ালো; চুপি চুপি বোল্লে, "ভূত যদি দেখ্তে

পাও, গোলমাল কোরো না, কাহাকেও ডেকো না, চুপ্ কোরে শুয়ে থোকো, ভূতেরা তোমাকে কিছুই বোলবে না : যদি গোলমাল কর, হাঙ্গাম বেধে যাবে। শয়ন কর। দুই প্রহরের পূর্ব্বে নিদ্রা যেয়ো না, আমার কথাগুলি মনে রেখো।"

বেশীদিন আমি আছি, তথাপি রাত্রে আমার শয়নঘরে চাবী পড়ে। আমারে সদুপদেশ দান কোরে, দ্বারে চাবী দিয়ে রামদাস চোলে গেল। আমি শয়ন কোল্লেম। ঘরে আলো থাকলো, দক্ষিণ-বারান্দার দ্বার-গবাক্ষ অনাবৃত।

রাত্রিকালে রূপসী আসে, যাবার সময় রূপসীই দ্বারে চাবী দিয়ে যায়, এ রাত্রে রামদাস ; বোধ হয় উপদেবতার অধিবাস। নিত্য রজনীতেই আমি দুই প্রহর পর্যন্ত জাগি, এক একদিন বেশীও জাগি ; সে রজনীতে সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হলো না ; জেগেই থাক্‌লেম। একটা কিছু নূতন উপলক্ষ্য পেলে রাত্রিজাগরণের কিছু সুবিধা হয়। নাচতামাসা, খোসগল্প, তাসপাশা নিশা-জাগরণের নির্দ্দোষ সহায়। সে সব সহায় আমার ছিল না ; চিন্তা আমার সখী, চিন্তার সঙ্গেই আমার খেলা।

চিন্তা এলো, রাঙামামী ঔষধ জানেন ; একটী গোলাকার মোড়কে ঔষধ পূর্ণ কোরে একটী বাবুর কাছে তিনি পাঠালেন। মোড়কে কেবল কাগজ ছিল, পরীক্ষা কোরে তা আমি জান্‌তে পেরেছি। কাগজ যদি ঔষধ হয়, তবে সে ঔষধ ঠিক্। কাগজে শিরোনাম ছিল না, পত্রিকা বোলে অবধারণ করা সুসাধ্য নয়। একজন পরপুরুষের কাছে একটি কুলবধূর পত্রিকা-প্রেরণ, কথাও কিছু ভাল নয় ; তবে কেন তিনি পাঠালেন ? পাছে কাহারো মনে এই সন্দেহের উদয় হয়, সেই সন্দেহভঞ্জনের উদ্দেশে নাম দেওয়া হয়েছে ঔষধ। উত্তম ঔষধ। বাস্তবিক কাণ্ডখানা কি, জানতে পারা গেল না। ভবিষ্যতে কোন সূত্রে যদি কিছু জানা যায় ঔষধের পরাক্রমে সেজোবাবু যদি রোগমুক্ত হন, পাঠকমহাশয় জানতে পারবেন।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত। আমার নিদ্রা নাই। ভূতের সঙ্গেও সাক্ষাৎ নাই। রাম-দাস যে কথা বোলেছিল, সে কথা আমার মনে মনে জাগছিল, আমিও জাগছিলেম, কথাও জাগছিল, কিন্তু কিছুই না ; নিত্য রাত্রে শব্দ হয়, সে রাত্রে শব্দ পর্যন্ত স্তব্ধ। আমার শিয়রের কাছে একটা খড়্‌খড়ী, সে খড়্‌খড়ীর পাখীগুলি আমি খুলে রেখেছিলেম। রাত্রি যখন প্রায় তৃতীয় প্রহর, সেই সময় আমার ঘরের ভিতর কেমন একরকম আলো এলো ; ভাগ ভাগ করা আলো ; জ্যোৎস্নারজনী, মনে কোল্লেম, চাঁদের আলো, কিন্তু তাও না, বারান্দার দিকে দ্বার-গবাক্ষ সমস্তই উন্মুক্ত, খড়খড়ীর পাখীর ফাঁক দিয়ে বিছানায় যদি চাঁদের আলো আসে, অপ-রাপর দ্বার-পথ দিয়ে ঘরের ভিতর আলো আসাও সম্ভব। সে রকম কিছু দেখা গেল না, কেবল বিছানার উপর ভাগ ভাগ করা আলো। রংমশালের আলোর বর্ণ যেরূপ, সে আলোর সেইরূপ বর্ণ, এলো আর গেল ; বিদ্যুতে আলো যেমন আসে আর যায়, ঠিক সেই প্রকার। এ তবে কি ? এই বুঝি তবে ভূত ? বিছানার উপর আমি উঠে বোসলেম, অনেকক্ষণ বারান্দার দিকে আমি চেয়ে থাকলেম, প্রকৃতি যেমন নিস্তব্ধ, ঠিক সেই ভাব, কৌমুদীর যেমন খেলা, ঠিক সেই ভাব। একবার যে আলো আমি দেখলেম, সে আলো আর

এলো না, ঘরের ভিতর তো এলোই না, বাহিরেও জ্যোৎস্নার কোলে সেরূপ মিশ্রবর্ণের আলো দেখা গেল না। কোন লোক হয় তো আমার চক্ষে চমক লাগাবার জন্য রংমশাল জেবলে আমার মাথার দিকে বারান্দা দিয়ে চোলে গিয়েছিল, আর ফিরে এলো না, তাই আমি মনে কোল্লেম ; বৃথা বৃথা সমস্ত রজনী-জাগরণ ; প্রায় ঊষাকালে নিদ্রা এসেছিল, প্রভাতেই নিদ্রাভঙ্গ। প্রভাতেই গৃহমধ্যে রামদাসের প্রবেশ। রামদাসের অধরে মৃদু মৃদু হাস্য।

শয্যার উপর উপবিষ্ট হয়ে রামদাসকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এত প্রত্যূষেই তুমি শয্যা ত্যাগ কর ?" রামদাসের উত্তর,—"নিত্য আমার এরূপ অভ্যাস নয়, তুমি যদি কোন প্রকার বিভীষিকা দর্শন কোরে থাক, তোমার মন যদি চঞ্চল হয়ে থাকে, তাই মনে কোরে সারারাত আমি ঘুমাই নাই ; কেমন আছ, শীঘ্র শীঘ্র দেখতে এসেছি। কোন রকম বিভীষিকা কি তুমি দর্শন কোরেছ ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "প্রায় শেষ রাত্রে একটা রংমশালের আলো ; আর কিছুই নয়। রংমশালের আলোকে বিভীষিকা বলা—"

ঐটুকু শুনেই রামদাস বোলে উঠলো, "আলো দেখেই বুঝি তবে তুমি চক্ষু বুজে শুয়ে ছিলে ? আলোর পশ্চাতে পশ্চাতে কি এসেছিল, সেটা দেখতে বুঝি তোমার ভরসা হয় নাই ? ঐ রকম হয়। আগে একটা ঐ রকম আলো আসে, তার পশ্চাতে পশ্চাতে—রাম !—রাম !—রাম !—প্রভুরা দেখা দেন ! তুমি তাঁদের দেখ নাই, ভালই হয়েছে ; ছেলেমানুষ তুমি, একাকী এই ঘরের ভিতর সে সব মূর্ত্তি দেখলে দাঁতকপাটি লেগে মূর্চ্ছা যেতে।"

হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "মূর্চ্ছা গেলেই তোমাদের কর্ত্তাটি এসে নেশা কোরে বেহুঁস হয়েছে' বোলে ভূমিকা জুড়ে দিতেন ! জান তো সে কথা ? একটা তুচ্ছকথা নিয়ে তিনি আমারে এককালে পশুর অধম কোরে দিয়েছিলেন !"

"না—না—না"—মস্তকের সহিত বারকতক হস্তসঞ্চালন কোরে রামদাস বোলে উঠলো "না—না—না,—অমন কথা বোলো না ! কর্ত্তা আমাদের আশুতোষ ! কটুবাক্য তাঁর মুখে নাই, সকলকেই তিনি ভালবাসেন, সকল লোকেই তাঁর সুনাম গায়, তাঁকে তুমি দোষের ভাগী কোরো না। যারা এসেছিল, তারা সেই কথা বোলে গিয়েছে, তুমিও অজ্ঞান ছিলে, কাজে কাজেই—"

রাত্রিজাগরণের কষ্ট বিস্মৃত হয়ে রামদাসের দুখানি হাত ধোরে উত্তেজিত-স্বরে আমি বোল্লেম, "কি বোল্লে, কি বোল্লে ? যারা এসেছিল ? কারা তারা রামদাস ? যারা আমারে এখানে এনে রেখে গিয়েছে, তাদেরই কথা তুমি বোলছো, বেশ আমি বুঝতে পেরেছি। রামদাস ! তারা কি রকম লোক ? তাদের চেহারা কি রকম ?"

অসাবধানে রামদাসের মুখ থেকে ঐ সত্যকথাটি বেরিয়ে পোড়েছিল, প্রভু যেটি অস্বীকার করেন, ভৃত্য সেইটি প্রকাশ কোরবে, কথা ভাল নয়, অপ্রস্তুত হয়ে রামদাস বোল্লে, "তারা—তারা—অন্ধকার—চেহারা—"

রামদাসের মনের ভাব আমি বুঝতে পাল্লেম, লোকটা অপ্রতিভ হয়ে গেল, বেশ দেখলেম। কর্ত্তাও একদিন ঐরকম অপ্রতিভ হয়েছিলেন, সে কথাও আমার মনে হলো, আমি থেমে গেলেম। প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে রামদাসকে আমি বোল্লেম, "তুমি আমার কাছে ঐ কথা প্রকাশ কোচ্ছিলে, কাহারও কাছে এ কথা আমি বোলবো না ; উপদেবতা দর্শন কোরে আমি মুর্চ্ছিত হব, এমন কখন তুমি ভেবো না। কোন রাত্রে যদি কিছু তুমি দেখতে পাও, আমারে ডেকে নিয়ে দেখিয়ে দিও, আমি গুলী কোরবো।"

"ও বাবা ! কি বুকের পাটা ! উপদেবতাকে গুলী করে !" আত্মগত বাক্যে সাতঙ্কে এই কথা বোলতে বোলতে রামদাস অতি দ্রুত সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবলেম, ভালই হলো। নবীনকালী বিষফলের সরবৎ খাইয়ে আমারে অজ্ঞান কোরেছিল, তার মালিকেরা সেই অবস্থায় আমারে কুমিল্লার এলাকায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, প্রথমাবধি সেটা আমি বুঝে আসছি; এ বাড়ীর কর্ত্তা অস্বীকার কোরেছিলেন, নিজের উক্তিতেই একদিন ধরা পোড়েছিলেন, রামদাসও সত্যকথা বোলতে বোলতে সামলে গেল। নবীনকালীর নায়কেরাই আমার এই দুর্দ্দশার কারণ, তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকছে না ; কিন্তু এখানে তারা ক-জন এসেছিল, জানবার উপায় নাই ; এখন নাই, কিন্তু সব তত্ত্ব যখন প্রকাশ হবে, তখন আর কোন তত্ত্বই গুপ্ত থাকবে না।

এইগুলি আমার নির্জ্জন ভাবনা। রাঙামামীর ঔষধ-প্রেরণের ভাবনা অপেক্ষাও এই ভাবনাই আমার চিত্তচাঞ্চল্যের পক্ষে অধিক প্রবল।

আর তিনটি দিবারাত্রি সমভাবে আমি কাটালেম। বাবু জয়শঙ্কর চৌধুরী সপরিবারে গয়াধামে যাত্রা কোল্লেন। সপরিবার অর্থে তিনি আর তাঁর সহ-ধর্ম্মিণী। ভূতের উপদ্রবে সংসারে অমঙ্গল হয়, সংসারের লোকেরাই অকাল-মরণে ভূতত্ব-প্রাপ্ত, গ্রামবাসী লোকেরাও মারীভয়ে গতানু হয়ে ভূতত্ব-প্রাপ্ত, গ্রামস্থ সমস্ত লোকের এই বিশ্বাস। গ্রামের কর্ত্তা জয়শঙ্করবাবু। তিনি সস্ত্রীক গয়াতীর্থে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান কোল্লে সমস্ত ভূত উদ্ধার হয়ে যাবে, এটিও সে গ্রামের সর্ব্ববাদিসম্মত।

কর্ত্তাবাবু গয়ায় গেলেন। বড়বাবু ছোটবাবু প্রায় সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে বোসে গল্প করেন, আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন, আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করেন, আমি তবু তাঁদের কাছে জীবনের বেশী কথা ভাঙি না। রামদাস যখনি আসে, তখনি ভূতের কথা কয়। দশদিন পরে ভূতের দফা গয়া হয়ে যাবে, পিণ্ড পেলেই ভূতেরা সব পালাবে, এই কথাই রামদাস বার বার আমারে শুনায়। রূপসী, পাচিকা, রাঙামামী এই তিন জনেও বড় বড় ভূতের গল্প করে।

দশদিন পরে ভূত থাকবে না, রামদাসের এই কথা। এ দশদিন মানে, অনেক দিন। তখন বাষ্পশকট ছিল না। ত্রিপুরাজেলা থেকে গয়াধামে যাত্রা, অধিক লোকের নামে পিণ্ডদান, কতক দিন তথায় অবস্থান, তৎপরে প্রত্যাগমন, অনেক দিনের কার্য।

দিন দিন এ বাড়ীতে ভূতের উৎপাত বেশী হোতে লাগলো। "আমি কিছুই

দেখতে পাই না, কেবল শুনতে পাই। আহা! ভূতগুলির লীলা-খেলা চির-কালের মত ফুরিয়ে যাবে, এই দুঃখে আমার বড় কষ্ট হয়।

পাঠকমহাশয় বোধ হয় ধৈর্যহারা হোচ্ছেন ; একাদিক্রমে বহুক্ষণ এক বিষয়ের নানা কথা শুনে শুনে বোধ হয় বিরক্তিও জন্মাচ্ছে। নিজে আমি যে বিষয়টা মিথ্যা বোলে বুঝতে পাচ্ছি, সে বিষয়ে এত আড়ম্বর কি কারণে, এটাও বোধ হয়, অনেকের মনে উদয় হোচ্ছে। আমার নিবেদন, আর কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য ধারণ করুন ; উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে ; সেই উদ্দেশ্যটি প্রকাশ হোলে বিফল বর্ণনা বোলে বোধ হবে না।

কর্ত্তা গয়াধামে। দুই তিন দিন অতীত। রাত্রিকালে নিত্য যেমন আমি শয়ন কোরে থাকি, সেই রকমে শয়ন কোরে আছি, ঘরের দরজায় দস্তুরমত চাবী বন্ধ আছে, গৃহদীপ নির্ব্বাপিত, দক্ষিণদিকের দ্বার-গবাক্ষ অনাবৃত। রাত্রি কত, ঠিক জানতে পারি নাই ; স্মরণ হোচ্ছে, কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী কিম্বা অষ্টমী, তখনো অন্ধকার, একটু পরেই চন্দ্রোদয় হবে, এইরূপ আমি মনে কোচ্ছি। ছাদের উপর নিত্য যেরূপ শব্দ হয়, নৃত্য হয়, হাস্য হয়, এ রাত্রে তখনো পর্যন্ত সেরূপ কোন লক্ষণ জানা গেল না।

আমার নিদ্রা নাই। উপাধানের উপর মুখ রেখে, শিয়রের খড়খড়ীপথে আমি চেয়ে আছি, বোধ হলো যেন, ফর্শা কাপড়পরা দুই মূর্ত্তি সাঁ কোরে বারান্দা দিয়ে ছুটে গেল। মনের খেয়ালের সঙ্গে নয়নের ভ্রম হয় ; আমার বোধ হয় তাই। লোকের মুখে শুনছিলেম ভূত, মনে মনে ভাবছিলেম ভূত, রাত্রিও অন্ধকার ছিল, কোথাও কিছু নাই, যুগলমূর্ত্তি ছুটে গেল, মনের কল্পনায় সে হয় তো আমার দৃষ্টিভ্রম। যারা ছুটে গেল, আর তারা ফিরে এলো না ; দৃষ্টির ভ্রমটাই যেন ঠিক দাঁড়ালো। যুগল হস্তে যুগল নয়ন মার্জ্জন কোল্লেম। যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার ;—ঘরে বাহিরে সমান অন্ধকার। চন্দ্রমা তখনো অদৃশ্য।

বারান্দাতে ঘন ঘন গুম গুম শব্দ। ইতিপূর্ব্বে যে দুই মূর্ত্তি দেখেছিলেম, —দেখেছিলেম বোলে জ্ঞান হয়েছিল, সে রকম মূর্ত্তি কিছু দেখা গেল না, কেবল শব্দ। একবার শুনলেম, দুই তিন কণ্ঠমিলিত অস্ফুট হাস্য ; বারান্দার দ্বার উন্মুক্ত ছিল, মনে কোল্লে উঠে দেখতে পাত্তেম, কেহ কোথাও আছে কি না,—যারা আমারে সাবধান করে, তারা বলে, "শব্দ শুনে উঠো না, তত্ত্ব জানবার চেষ্টা কোরো না." সেই কথা মনে কোরে বিছানা থেকে আমি উঠলেম না, শব্দও থামলো না, ঠিক আমার মাথার কাছে শব্দ ; এক একবার একটু দূরে যায়, আবার সেইখানে ফিরে আসে ; শব্দেরই চলাচল, পদার্থ দৃষ্ট হয় না। ঠিক আমি চেয়ে আছি, দৃষ্টির ভ্রম হোচ্ছে না মনে ভয়ও আসছে না, তত্ত্ব জানবার ইচ্ছাও হোচ্ছে না।

প্রায় এক ঘণ্টা এই ভাব। আকাশে চন্দ্রোদয়। চন্দ্রালোকে বাহিরের পদার্থগুলি আমার নয়নগোচর হোতে লাগলো, শব্দগুলাও শ্রবণগোচর হোতে লাগলো, সংশয়ে বিস্ময়ে আমি জড়ীভূত।

কট্ কট্ কোরে চাবী খোলার শব্দ হলো। একজন লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। এই কি ভূত? চাবী খুলে ভূত আসবে কেন? ভূতেরা অগ্নি স্পর্শ করে না, লৌহ স্পর্শ করে না, এরূপ প্রবাদ। চাবী খুলে ভূত আসা অসম্ভব। তবে কি?—কে প্রবেশ কোল্লে? চাঁদের আলো ঘরের ভিতর আসে নাই, প্রবেশকারী ধীরে ধীরে আমার শয্যাপাশে এসে নিকটে একটু হেঁট হয়ে, চুপি চুপি বোল্লে, "জেগে আছ?"

চক্ষু আমার গবাক্ষের দিকে ছিল, প্রশ্ন শুনে চোমকে উঠে পাশের দিকে চেয়ে দেখলেম, একটি মনুষ্য। স্বর শুনেও বুঝেছিলেম, অল্প অল্প চেহারা দেখেও বুঝলেম রামদাস। বিছানার উপর আমি উঠে বোসলেম; ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এত রাত্রে এখানে তুমি কি চাও রামদাস?"

রামদাস চুপি চুপি বোল্লে, "তোমাকেই চাই। উঠ। যে সব কথা তোমাকে আমরা বলি, তাতে তুমি বিশ্বাস কর না, শব্দ হয় শুনতে পাও, অলৌকিক শব্দ মনে কর; সত্য বটে অলৌকিক, কিন্তু কিছু বিশেষ আছে। উঠে এসো; দেখবে এসো।"

বিছানা থেকে আমি নামলেন। রামদাস বোল্লে, "চলো।" মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দ্বারের দিকে দুই তিন পদ আমি অগ্রসর হোলেম। রামদাস বোল্লে, "ওদিকে নয়।" রামদাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি দাঁড়ালেম। দক্ষিণের বারান্দার দিকে অগ্রসর হোতে হোতে পূর্ব্ববৎ চুপি চুপি রামদাস বোল্লে, "সঙ্গে এসো—নিঃশব্দে, কথা কোয়ো না।"

নিঃশব্দে রামদাসের সঙ্গে সঙ্গে আমি বারান্দায় উপস্থিত হোলেম। পশ্চিমদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে আমার কাণের কাছে রামদাস চুপি চুপি বোল্লে, "ঐ দেখ!"

স্বরকম্পনে আমি বুঝতে পাল্লেম, আতঙ্ক-মিশ্রিত কণ্ঠস্বর। রামদাস যেন কোন প্রকার ভয় পেয়ে সেই ভয়ের বস্তু আমাকে দেখাবার জন্য সমুৎসুক; আমারে বোল্লে, "ঐ দেখ!" নিজে কিন্তু পশ্চিমদিকে চাইলে না, পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলো।

চন্দ্রদেব তখন আমাদের মশালটির কাজ কোল্লেন। পশ্চিমদিকে আমি চাইলেম। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, সম্মুখ-বারান্দার অর্দ্ধাংশ ভগ্ন, সেই ভগ্নাংশের সর্ব্বশেষে একটা ভগ্নগৃহ, সেই গৃহের সম্মুখভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোটাকতক মুণ্ড, এত প্রকাণ্ড যে, এতদ্দেশে ঢাকাই জালার যেরূপ প্রসিদ্ধি, সেই প্রসিদ্ধির অনুগত জালার আকারে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মুণ্ড। দুর্গার পদতলের পশুরাজ সিংহের যে প্রকার বর্ণ, মুণ্ডগুলার বর্ণ সেই প্রকার। নাসিকাও সিংহনাসা সদৃশ। সুন্দরবন অঞ্চলে বনদেবতার পূজায় কালুরায় দক্ষিণরায় নামে বুনোরা যেরূপ বিগ্রহ গঠন করে, সেই সকল বিগ্রহের চক্ষের ন্যায় ভয়ানক ভয়ানক বড় বড় চক্ষু। বন্যবরাহের মুলদন্ত যে প্রকার, সেই সকল মুণ্ডের দন্তপাতি-তদ্রূপ বৃহৎ বৃহৎ। সিংহের জটার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কেশর বৃহৎ বৃহৎ কর্ণের উভয় পার্শ্বে বিলম্বিত। দূর থেকে দর্শন কোল্লে বাস্তবিক অন্তরে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়। মুণ্ডগুলা সারি সারি সংস্থাপিত।

সেই সকল বিকট মুণ্ড আমি দর্শন কোল্লেম, মনে কোল্লেম, তামাসাস্থলে যারা সং দেখায় তারাই হয় তো অবোধ মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য ঐ সব মুণ্ড ঐ ভাবে সাজিয়ে রেখেছে। আমি মনে কোল্লেম ঐ রকম, রামদাস কিন্তু ঘন ঘন কাঁপতে লাগলো, কাঁপতে কাঁপতে বোল্লে, "আর নয়, আর নয়, আর এখানে থাকা নয়, আমাদের দেখতে পেলেই লাফ দিয়ে ঘাড়ে পোড়ে—"

রামাদাস ছুটে পালায়, আমি তার একখানা হাত ধোরে ফেল্লেম ; অভয় দিয়ে বোল্লেম, "যা তুমি মনে কোচ্ছো, যা তোমরা মনে কর, বাস্তবিক তা নয়। তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন ? আমি নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছি, দুষ্টমানুষের ঐ সব খেলা। কোন প্রকার মতলবে দুষ্টেরা ঐ রকম বিভীষিকা দেখায়, সেই চেষ্টা-তেই তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তুমি দাঁড়াও, আমি আরও একটু ভাল কোরে দেখি।"

আমার হাত ছাড়াবার জন্য ধস্তা-ধস্তি কোত্তে কোত্তে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে রামদাস বোল্লে, "রাম! রাম! রাম! কুলক্ষণ! বড় কুলক্ষণ! আজকের জন্যই আমি ছিলেম! ভূতের হাতে প্রাণ গেল! তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।"

আমার অপেক্ষা রামদাসের বয়স অনেক বেশী, আমার অপেক্ষা রামদাস কিন্তু দুর্ব্বল ; টানাটানি কোরেও রামদাস আমার হাত ছাড়াতে পাল্লে না। পুনর্ব্বার হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বোলতে লাগলো, "তুমি ছেলেমানুষ, কখন ও সব দেখ নাই, সেই জন্যই তোমার অত সাহস! বড় কুলক্ষণ! অমাবস্যার রাত্রে মেঘাড়ম্বর থাকলে, ঐ সব ভয়ানক-মূর্ত্তি দেখা দেয়। জ্যোৎস্না-রাত্রে কখনো আমরা দেখি নাই. না জানি, কপালে আজ কি আছে! তুমি আমাকে ছেড়ে দাও! তুমিও এখান থেকে পালাও! কপালে—"

আরো জোরে রামদাসের হস্ত ধারণ কোরে আমি তখন বোল্লেম, "কপালে কি আছে, তা আমি বুঝতে পাচ্ছি। তোমার কপালে কি আমার কপালে কিংবা ঐ সকল মুণ্ডুর কপালে, কার কপালে কি ঘটে, তাই আজ আমি দেখবো, তোমার বন্দুক আছে ?"

চোমকে উঠে, শঙ্কিতনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে রামদাস বোল্লে উঠলো, "বন্দুক ? বন্দুক নিয়ে তুমি কি কোরবে ?"—মৃদুস্বরে আমি বোল্লেম, "থাকে যদি, একটি আমারে তুমি এনে দাও। গুলী, বারুদ, সরঞ্জাম, সব যেন ঠিক থাকে। বন্দুক দিয়ে উপদেবতার পূজা কোত্তে হয় ; সে পূজা তোমরা জান না, সেই জন্যই ভয় পাও ; দেবতারাও সেই জন্য ভয় দেখান। আছে তোমার বন্দুক ?"

অল্পক্ষণ কি চিন্তা কোরে রামদাস বোল্লে, "আমার নাই, তুমি আসবার আগে এই বাড়ীতে দরোয়ান ছিল, সেই দারোয়ানের এক জোড়া গুলীভরা বন্দুক আমার ঘরে আছে ; পূজা কোল্লে যদি ভাল হয়, একটা আমি এনে দিতে পারি।"

"শীঘ্র এনে দাও। পূজা কোল্লে অবশ্যই ভাল হবে। এত ভাল হবে যে, সমস্ত উপদেবতা মুক্তিলাভ কোরে এই রাত্রেই স্বর্গধামে চোলে যাবে! এ কথা

যদি আগে তুমি আমারে বোলতে কিম্বা আগে যদি ঐ সকল মূর্ত্তি আমারে তুমি দেখাতে পাত্তে, তা হোলে আর কর্ত্তাকে গয়ায় যেতে হোতো না ; ঘরে বোসেই আমি নূতন প্রকার পিণ্ডদান কোরে দেবতাগুলিকে উদ্ধার কোরে দিতেম। দেখ না, এই রাত্রে তাই হবে। দাও তুমি, বন্দুক একটা আমাকে এনে দাও। কর্ত্তা ফিরে আসতে না আসতে ভূতগুলি সব উদ্ধার হয়ে যাবে। দাও তুমি, দারোয়ানের সেই বন্দুক একটি আমাকে এনে দাও।"

এই সব কথা বোলে রামদাসের হাতখানা আমি ছেড়ে দিলেম। আমার শয়ন-ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে, রামদাস অবিলম্বে একটি দুনালি বন্দুক এনে আমার হাতে দিলে ; দিয়েই আমার সন্দিগ্ধস্বরে বোল্লে, "পূজা হবে, ফুল-চন্দন দরকার হবে না ?"

অন্তরে হাস্য কোরে আমি উত্তর দিলেম, "মন্ত্র পাঠ কোল্লেই বন্দুকের গর্ভস্থ উপকরণগুলি ফুল-চন্দনের আকার ধারণ করে। পূজা দর্শন কোরে তোমরা এককালে মোহিত হয়ে যাবে।" পূর্ব্বে রামদাসের যতটা কম্প ছিল, আমার পূজার ফলশ্রুতি শ্রবণ কোরে আর তার ততটা কম্প থাকলো না। তারে একটু পশ্চাতে সোরিয়ে রেখে, বন্দুক হস্তে আমি সম্মুখে দাঁড়ালেম। আমার দৃষ্টি সেই সকল মুণ্ডুর দিকে। লক্ষ্য একটা প্রকাণ্ড মুণ্ড। বন্দুকটি ভাল কোরে বাগিয়ে ধোরে অতি সাবধানে আমি আওয়াজ কোল্লেম। অব্যবহিত পরেই সেই দিক থেকে ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ রব সমুত্থিত হলো, একটা মুণ্ড সেইখানে পোড়ে থাকলো, ছড়িভঙ্গ হয়ে সমস্ত মুণ্ড অদৃশ্য ! বারুদের ধোঁয়ায় সে দিকটা আচ্ছন্ন।

রামদাসের মুখে আর বাক্য নাই। বাড়ীর ভিতর থেকে বড়বাবু ছোটবাবু সেই সময় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ; স্ত্রীলোকেরাও অন্যদিক থেকে উঁকি মেরে আতঙ্ক প্রকাশ কোত্তে লাগলেন ; "কি হলো, কি হলো" বোলতে বোলতে রাঙামামীও ছাদের উপর থেকে চীৎকার কোত্তে থাকলেন।

আমি বুঝতে পাল্লেম, যা হবার তাই হলো ; রামদাসকে বোল্লেম, "যে দিকে তোমাদের উপদেবতারা মায়া বিস্তার কোচ্ছিলেন, সেই দিকে আমারে তুমি একবার নিয়ে চল।" রামদাস নিরুত্তর। বাবুরা আমারে বার বার নিষেধ কোল্লেন, সে দিকে যাবার পথ নাই, এই কথা বোলে, আমারে নিরস্ত করবার চেষ্টা পেলেন। তাঁদের নিষেধ আমি শুনলেম না। একনলে আওয়াজ হয়েছিল, দ্বিতীয় নল তখন পরিপূর্ণ ; বন্দুকটি উপর দিকে তুলে, উপরদিকে চেয়ে তাঁদের সকলকে আমি বোল্লেম, "ভগবান রক্ষাকর্ত্তা, উপদেবতার উপরে সর্ব্বময় দেবতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। উপদেবতাগুলি কোথায় গেল, একবার আমি দেখে আসি।"

যে দিকে সেই সব মুণ্ডু ছিল, সেই দিকে অনবরত কুক্কুরমণ্ডলীর বিভীষণ চীৎকার। বড়বাবু বোল্লেন, "কর্ম্ম তুমি ভাল কর নাই, উপদেবতার মায়া! মায়াবী দেবতারা কুক্কুরের মত কলরব কোরে আমাদের সংসারকে দেখাচ্ছেন! অবিশ্রান্ত ঘেউ ঘেউ রব। একে উপদেবতা, তাহার উপর তুমি

তাঁদের ক্রোধ উৎপাদনের হেতু হয়েছ! আমাদের আর রক্ষা নাই! ওদিকে তুমি যেয়ো না। একান্তই যদি যাবার ইচ্ছা হয়, রাত্রি প্রভাত হোক, প্রভাতে যা ইচ্ছা, তাই তুমি কোরো।"

রামদাস এই সময় বাবুদের কাছে আমার নামে নালিশ কোল্লে। আমি তার কাছে বন্দুক চেয়ে নিয়েছি, ভূতের মস্তকে আঘাত কোরেছি, ভূতগুলিকে রাগিয়ে দিয়েছি, এই তিন অভিযোগ। বড়বাবু আমারে বিস্তর ভর্ৎসনা কোল্লেন। কিছুতেই আমি সংকল্প ত্যাগ কোল্লেম না। আমাদের পরস্পর কথা কাটাকাটি হোচ্ছে, সেই সময় নীচের সিঁড়ি দিয়ে গুম গুম শব্দে একটি নূতন বাবুলোক সেই বারান্দায় এসে উপস্থিত হোলেন। বাহিরের লোক। সদর দরজা যেন খোলা ছিল, বাহির থেকেই যেন তিনি এলেন, এইরূপ সকলে বিবেচনা কোল্লে। আমাদেরও তাই ভাবতে হলো। বাবুটিকে আমি দেখলেম। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হলো না। মাথায় এক পাগড়ী। পাগড়ীর উপর দিয়ে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত লম্বা একখানা সবুজ রুমালের পটি বাঁধা। কর্ণ, কপাল, ললাট, সমস্তই ঢাকা; কেবল নাকটি আর চক্ষুদুটি জাগছিল। চিনতে পারা অসম্ভব; কিন্তু চক্ষু দর্শন কোরে আমি এক রকম অনুমান কোল্লেম। আমি কথা কোইলেম না। যিনি এলেন, তিনিও কোন কথা বোল্লেন না। আমার সংকল্প উপদেবতার উপনিবেশনান্তর দর্শন করা। আমার নির্ব্বন্ধতাতিশয্য দর্শন কোরে কেহই আর তখন বাধা দিলেন না, আমি তখন সঙ্গী পেলেম রামদাসকে আর ছোটবাবুকে। উপরেই বারান্দা, উপরেই সেই ভগ্নগৃহ; মধ্যস্থল সংযোগশূন্য। উপর দিয়ে সেই ভগ্নগৃহে গমন করবার উপায় ছিল না। তিনজনে আমরা উপর থেকে নেমে এলেম। রামদাস পূর্ব্বে আমারে বোলেছিল, কোন প্রয়োজন উপস্থিত হোলে, বাঁশের সিঁড়ির সাহায্যে সেই ভগ্নগৃহে আরোহণ কোত্তে হয়। নির্দ্দিষ্ট স্থলে আমরা উপস্থিত হোলেম। ফুট জ্যোৎস্না, বেশ দেখা গেল, দীর্ঘ একটা বাঁশের সিঁড়ি সেই স্থানে আড়ে আড়ে সংরক্ষিত আছে। রামদাস বোল্লে, "এই সিঁড়ি; এরূপ সিঁড়িতে উঠা নামা তোমার অভ্যাস আছে?" আমি উত্তর কোল্লেম, "অভ্যাসের কথা কেন বল:—আবশ্যক হোলে অনভ্যাসকেও অভ্যাসের মধ্যে গণনা কোরে নিতে হয়।"

ছোটবাবুর আদেশে রামদাস সেই সিঁড়িখানা খাড়া কোরে তুল্লে। আমরা উঠতে আরম্ভ কোল্লেম। অগ্রে ছোটবাবু, মধ্যে আমি, পশ্চাতে রামাদাস। আমার বাম হস্তে বন্দুক; দক্ষিণহস্তে সিঁড়ির বাঁশ ধোরে ধোরে ধীরে ধীরে আমি আরোহণ কোল্লেম। উপর্য্যুপরি ঘেউ ঘেউ রব। বিরামের অবসরে এক একবার শুনা গেল, কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ কেঁউ!

কুকুর নিশ্চয়। মানুষ ভূতের বদলে কুকুর ভূত, এটাও একটি আশ্চর্য ব্যাপার বটে। কোনটা আশ্চর্য, কোনটা আশ্চর্য অগ্রে আমি স্থির কোত্তে পাল্লেম না। নিত্য রজনীতে ছাদের উপর যে রকম শব্দ হয়, কুকুরে সে রকম শব্দ কোত্তে পারে না। হাস্য, নৃত্য, হুহুঙ্কার, লম্ফনের গুপ গাপ শব্দ, সে সব

কাণ্ড কুকুরের নয়। মানুষভূত আর কুকুরভূত দুই দল যদি থাকে, পরীক্ষা করা যাবে।

আমরা আরোহণ কোল্লেম। ঘেউ ঘেউ রব কোত্তে কোত্তে সেই সকল প্রকাণ্ড মুণ্ড ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লো। চতুষ্পদ জন্তুর যে রকম গতি, মুণ্ডেরও সেইরূপ গতি মুণ্ডের ভিতর কুকুর আছে, বেশ বুঝতে পারা গেল। আর আমার বন্দুকের আওয়াজ করবার আবশ্যক হলো না। রাগী কুকুরেরা সম্মুখের মানুষকে দংশন করে, যে সকল কুকুর আমাদের সম্মুখে, তাদের মুখে মোটা মোটা আবরণ ছিল, সেই সকল আবরণ নরমুণ্ড অথবা সিংহমুণ্ড সদৃশ, সে আবরণ ভেদ কোরে মানুষকে দংশন করা সেই সকল কুকুরের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। দুঃসাধ্য না বোলে অসাধ্য বলাই ঠিক। সুতরাং কুক্কুরদংশনের আতঙ্ক আমাদের থাকলো না, সে অংশে আমরা নিঃশঙ্ক।

যে দিকে কেঁউ কেঁউ রব হোচ্ছিল, বন্দুক হস্তে দ্রুতগতি সেই দিকে আমি অগ্রসর হোলেম ; দেখলেম, একটা কুক্কুর রক্তাক্ত-কলেবরে ভূমিশায়ী। তার মুখের আবরণমুণ্ড আমার বন্দুকের গুলীতে বিদীর্ণ। সেই কৃত্রিম মুণ্ডটা ভেদ কোরে কুক্কুরের কণ্ঠদেশে গুলী লেগেছে, অনবরত রক্তধারা প্রবা-হিত হোচ্ছে, মৃত্যু আসন্ন। থেকে থেকে এক একবার মৃত্যুযন্ত্রণায় কেঁউ কেঁউ রব।

দেখে আমার বড় দয়া হলো, কষ্টও হলো। ছোটবাবুকে ডেকে সেই কষ্ট-কর দৃশ্য আমি দেখালেম। তেমন কর্ম্ম কখন আমি করি নাই, বিনা দোষে নিরীহ প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করা আমার আন্তরিক ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী। ছোটবাবুকে বোল্লেম, একপ্রকার কুহকে পোড়ে এই কার্য আমাকে কোত্তে হয়েছে। সকলেই বলে ভূত ; শব্দ শুনেও মনে হয়, কোন প্রকার ভৌতিক কার্য। আজ রাত্রে সেই মুণ্ডগুলো দর্শন কোরে তথ্য জানবার নিমিত্ত আমার আগ্রহ জন্মেছিল, তাতেই বিনা দোষে এই অবলা জন্তুটি আমি বিনাশ কোরেছি। এখন আপনি সন্ধান করুন, এ কার্য কার ? কোন ব্যক্তি এই-সকল কুকুরের মুখে ভয়ানক ভয়ানক কাষ্ঠের মুখোস সংযুক্ত কোরে ঐ ভাবে সাজিয়ে রেখেছে। বনের কুকুর নয়, পোষা কুকুর, সন্দেহ নাই। কুকুরকে যেমন যেমন শিক্ষা দেওয়া যায়, কুকুরেরা তাই শিক্ষা করে। কুকুরেরা প্রতিপালকের একান্ত বশীভূত হয়। আপনি সন্ধান করুন, কোন ধূর্ত্ত মায়াবী লোক এই সকল কুকুরের প্রতিপালক।"

ছোটবাবু তখন আমার কথায় মনোযোগ দিলেন না ; রামদাসকে বোল্লেন, "সব বুজরুকী বুঝতে পারা যাচ্ছে। এক এক কোরে এই কুকুরগুলিকে তুমি নামিয়ে নিয়ে চল। কার কি মতলব, এই সকল কুকুর কার কাছে ছুটে যায়, সেই ক্রিয়া দেখলে অভিসন্ধি নিরূপণ করা যাবে।"

রামদাস তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাপালন কোল্লে। কুকুরগুলি বেশ শান্ত, বিশেষতঃ পোষা কুকুর, রামদাসের কোলে বেশ স্থির হয়ে থাকলো। রামদাস একে একে সকলগুলিকেই নামিয়ে নিয়ে গেল। যে কুকুরটিকে আমি অগ্রে গুলী কোরে-

ছিলেম, সেটি বাঁচলো না। বাকীগুলি আমার শয়নঘরের বারান্দায় প্রেরিত হলো। কুকুরের মুখোসগুলো সেই ভগ্নগৃহে পোড়ে থাকলো। কাঠের মুখোস ; সাদা রং মাখিয়ে ভীষণ আকারে চিত্র করা। লোকে দেখলেই রাত্রি-কালে ভূতের মুখ বোলে ভয় পাবে, কোন লোকের পরামর্শে চিত্রকরের সেই-রূপ নৈপুণ্যের পরিচয়।

রামদাসের কার্য সমাপ্ত হবার পর আমরা উভয়ে সেই বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেম ; আমি আর ছোটবাবু।

যে ঘরে আমি শয়ন করি, সেই ঘরের ভিতরে বাহিরে অনেকগুলি লোক। ভিতরের দিকের বারান্দায় স্ত্রীলোক ; ঘরের ভিতর আর বাহিরের বারান্দায় পুরুষ। সকলে সেই বাড়ীর লোক নয়, প্রতিবাসী লোকেরাও অনেকে সেই শেষরাত্রে সেইখানে এসে জমা হয়েছেন। আমরা গিয়ে সেইখানে ছোট-খাটো সমা-রোহ দেখলেম। এ সকল লোক খবর পেয়েছিল কিরূপে ? বাড়ীতে তাদৃশ গোলমাল হয় নাই, কেহ চীৎকার করে নাই, কেহ কাহাকেও ডাকে নাই, কেহ কাহাকেও খবর দিতে যায় নাই, তবে কিরূপে এ স্থানে এত লোক একত্রিত হলো ? এ প্রশ্নের উত্তর আমি স্বয়ং। ভূতের মুণ্ড লক্ষ্য কোরে আমি গুলী কোরেছিলেম, বন্দুকের আওয়াজ অনেকদূর গিয়েছিল, লোক জমায়েতের কারণ সেই আওয়াজ।

বাড়ী যখন গুলজার ছিল, বাড়ীর অধিকারীরা যখন শ্রীমন্ত ছিলেন, তখন এই বাড়ীর নাম ছিল, "বাবুদের বাড়ী।" এখন ভগ্নাবস্থা, সকলদিকেই ভগ্ন-দশা, তথাপি নাম আছে, বাবুদের বাড়ী। যতদিন সেই জায়গায় দুই একখানা ইষ্টক, দুই একখানা কাষ্ঠ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন নাম থাকবে, বাবুদের বাড়ী। এ দেশের সর্ব্বত্র ঐ রকম হয়েই থাকে। অত রাত্রে বাবুদের বাড়ীতে বন্দুকের আওয়াজ হয়েছে, হয় তো কি একটা নূতন কাণ্ড উপস্থিত, তাই মনে কোরে প্রতিবাসী লোকেরা সেইখানে জড় হয়েছেন। অনেকেই শুনেছিলেন, বাবুদের বাড়ীতে এখন ভূতেরা বাসা কোরেছে ; বাবুদের বাড়ীর নাম এখন ভূতের বাড়ী। আমি যে ভূত শীকার করবার মতলবে বন্দুক ছুড়েছিলেম, সেটা কেহ ভাবেন নাই ; এখানে জমা হয়ে সকলেই শুনলেন, সাফ কথা। সক-লেই বিস্ময়াপন্ন।

কুকুরগুলিকে নামিয়ে এনে রামদাস নীচের একটি ঘরে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। আমার ইঙ্গিতে ছোটবাবুর আদেশে, সেই সময় সেইগুলিকে উপরে আনা হলো। পোষাকুকুর, ক্রীড়া-কৌতুকে সুশিক্ষিত। কার দ্বারা সুশিক্ষিত, সেইটি পরীক্ষা করবার জন্য সর্ব্বাগ্রে আমার অভিলাষ। আমার অভিলাষে কাজ হয় না। চুপি চুপি বড়বাবুকে আমি মনের কথা জানালেম ; ছোটবাবুও শুনলেন। যতগুলি পুরুষমানুষ সেখানে ছিল, সারিবন্দী কোরে সকলকে দক্ষিণ বারান্দায় দাঁড় কোরিয়ে দেওয়া হলো। উপদেশমতো রামদাস সেই সময় কুকুরগুলির শিকল ছেড়ে ছিল।

পশুপ্রভৃতির আশ্চর্য ক্রীড়া। কুকুর সাতটি। যতগুলি লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সাতটি কুকুর ক্রমে ক্রমে সকলের সমীপবর্ত্তী হয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘ্রাণ কোল্লে; একে একে সকলের মুখের দিকে চাইলে, শেষকালে একটি লোকের নিকটে গিয়ে, অঙ্গবস্ত্রাদির আঘ্রাণ লয়ে, আহ্লাদে লাঙ্গুল সঞ্চালন-পূর্ব্বক অস্ফুট আনন্দধ্বনি কোত্তে কোত্তে সেই লোকটির কন্ধে, বক্ষে, হস্তে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগলো। এই রঙ্গ দর্শন কোরে দর্শক লোকেরা স্তম্ভিতভাবে পরস্পর মুখ-চাহাচাহি কোত্তে লাগলো।

যে লোকটির সঙ্গে কুক্কুরদলের ক্রীড়া, সেই লোকটি অতিদ্রুত উপর থেকে নেমে এসে দক্ষিণদিকে দৌড়িল; দেখতে দেখতে অদেখা হয়ে গেল। ঝন্ ঝন্ শব্দে শিকলি বাজিয়ে বাজিয়ে কুকুরেরাও খানিকদূরে সেই লোকের সঙ্গে ছুটেছিল, চার পাঁচজন সঙ্গীসহ রামদাস ধাবিত হয়ে কুকুরগুলিকে ফিরিয়ে আনলে। কুকুরেরা তখন প্রভু-বিরহে অস্থির হয়ে বন্ধনশৃঙ্খল টানা-টানি কোত্তে লাগলো; লাফিয়ে লাফিয়ে ঘেউ ঘেউ রব কোত্তে লাগলো; অল্প-ক্ষণের মধ্যেই আটক পোড়ে গেল। উপস্থিত লোকেরা অল্প অল্প ইতিহাস শ্রবণ কোরে বিস্ময় প্রকাশ কোল্লেন। কুকুরের মুখে ভূতের মুখোস ছিল, সকলের কাছে সেটা আমি প্রকাশ কোল্লেম না; কিন্তু কুকুরগুলির রঙ্গ দেখে সকলেই হাস্য কোল্লেন। হাস্যের কোন হেতু আছে, আমি কিন্তু তেমন কিছু বিবেচনা কোল্লেম না; আমি কেবল ভাবতে লাগলেম, যে লোকটা ছুটে পালালো, সে লোকটা কে? ইতাগ্রে মুখে মাথায় রুমালবাঁধা যে একটি লোক দর্শন দিয়েছিল, সেই লোক।

কে সেই লোক, চিনে লওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। বড়লোকেরা যে সকল কুকুর পোষেন, সেই সকল কুকুরের সেবার নিমিত্ত এক এক চাকর নিযুক্ত থাকে; সেই সকল চাকরের উপাধি "ডুবিয়া"। অর্দ্ধবদনাবৃত যে লোকের গাত্রে কুকুর-গুলির খেলা, সে লোকের অবয়ব,—সে লোকের পরিচ্ছদ ডুবিয়ার মত নয়; ডুবিয়ারা নীচজাতিসম্ভূত; অধিকাংশই মেথর। এখানকার কুকুরেরা যে লোকটিকে প্রভু বোলে চিনেছিল, সে লোকের আকার-প্রকার ভদ্রসন্তানের তুল্য; মেথর বলা যায় না। বস্তুত কুকুরগুলি সেই লোকের বহুদিনের পালিত, শিক্ষিত, বশীভূত, সে পক্ষে আমার কোন সংশয় থাকলো না।

ঊষাকাল উপস্থিত। ঊষাবায়ু প্রবাহিত, ঊষা-বিহঙ্গের সঙ্গীতে চতু-র্দ্দিক কূজনিত। ক্রমশঃ পূর্ব্বদিক পরিষ্কার। বাহিরের লোকেরা রঙ্গ দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেলেন, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অন্দরে প্রবেশ কোল্লেন, বাবুরা আমারে নিয়ে জেঁকে বোসলেন। নিকটে থাকলো রামদাস।

কর্ত্তা-গৃহিণী বাড়ীতে নাই। ছেলেবাবুরাই কর্ত্তা। তাঁদের মতানুসারেই আমারে চোলতে হবে। যে যে কথা তাঁরা আমারে জিজ্ঞাসা করেন, সে সব কথার জবাব দিতে হবে, যে যে কার্য তাঁরা আমারে আদেশ করেন, আদেশ পালন কোরে সেই সকল কার্য আমারে নির্ব্বাহ কোত্তে হবে; সেই সকল

কার্য নির্ব্বাহে আমি বাধ্য। উপস্থিত ক্ষেত্রে সম্ভবমত সকল কথার উত্তর আমি দিলেম।

এখন অবধি রাত্রিকালে আর ভূতের উপদ্রব হয় কি না, অগ্রে দেখা হোক, তার পর অপরাপর বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারণ করা যাবে।

প্রভাতে নিত্যকর্ম্মে সকলেই ব্যাপৃত। মধ্যাহ্নে রামদাসকে নির্জ্জনে পেয়ে সকৌতুকে আমি বোল্লেম, "এই তো রামদাস! এই তো তোমাদের ভূতের বাড়ী! ভূতগুলি তো এখন বাঁধা পোড়ে গেল, কর্ত্তা এখন গয়াধামে কোন ভূতের জন্য পিণ্ডদান করবেন, তা কিছু তুমি অনুমান কোত্তে পার?"

কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত কোরে রামদাস বোল্লে, "কে জানে বাপু ভূতের কথা; ভূতেরাই বোলতে পারে, পিণ্ডির কথা পাণ্ডালোকেরাই বোলতে পারে; যারা ভূতের পিণ্ড দেয়, তারাই তার মর্ম্ম জানে; আমি গরীবলোক, সামান্য মানুষ ও সব কথা আমাকে তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।"

নিষেধ পেলেম, তথাপি আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আচ্ছা রামদাস, ও সব তো তুমি জান না, ও সব কথা তো তুমি বোলতে পারবে না: আচ্ছা, কিন্তু ছাদের উপর না হয়, হাসি হয়, আরো কত রকম শব্দ হয়, সে সব তো নূতন ভূতের কাণ্ড। যে সকল ভূত এখন ধরা গেল, সে সকল ভূত মানুষের মত নৃত্য, হাস্য, হুহুঙ্কার কোত্তে পারে না, এটা নিশ্চয়। তবে সে কি, তা কি তুমি জানো?

রামদাস উত্তর কোল্লে, "সবুরে মেওয়া ফলে। দুদিন সবুর কর, দেখা যাক, কোন দিকে আর কোন রকম ভৌতিক ক্রিয়া—ভৌতিক উৎপাত ঘটে কি না। তা যদি কিছু না ঘটে, তবেই জানা যাবে, ঐ সকল কুকুর ভূতের—"

প্রশ্ন এড়াবার মৎলবেই রামদাস ঐ রকম বাজেকথার আড়ম্বর আনছে, সেটা আমি বুঝতে পাল্লেম। সে সব কথা শুনবার আমার ইচ্ছা ছিল না, থামিয়ে দিলেম; অন্য প্রকার প্রশ্ন কোল্লেম, "গয়ায় পিণ্ডদানের অগ্রে এখানকার উপদ্রব যদি থামে, তা হোলে কর্ত্তা ফিরে এসে আমারে কি বোলবেন? গয়া-মাহাত্ম্য অধিক কিম্বা আমাব বন্দুকের মাহাত্ম্য অধিক, এই কথা আমি তাঁরে বোলতে পারবো কি না, তুমি রামদাস, তুমি অনেক দিন এই বাড়ীতে আছ, তুমি সে বিষয়ে আমারে কিরূপ পরামর্শ দিতে পার?"

দ্বারের দিকে চাইতে চাইতে রামদাস ধীরে ধীরে বোল্লে, "সেই কথাই তো আমি বোলছিলেম; এখন অবধি এখানকার উপদ্রব যদি থামে, তা হোলে তোমার বন্দুকের মহিমাই গয়ার মহিমার চেয়ে বড় হবে।"

রামদাসের মীমাংসা শ্রবণ কোরে আমার মনে একটি কৌতুক জন্মে থাকলো। কর্ত্তার প্রত্যাগমনকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা না কোল্লে, সে কৌতুকের পরিতৃপ্তি সাধিত হবে না, মনে মনে সেটিও আমি বুঝে রাখলেম। নিম্নতলে ঘেউ ঘেউ রবে কুকুর ডেকে উঠলো। রামদাস উঠে দাঁড়ালো; একরকম মুখভঙ্গী কোরে বোল্লে, "ক্ষুধা লেগেছে, পেটের জ্বালায় চীৎকার জুড়েছে, খাবার দিলে খায়

না, ক্ষুধা সেটা মানে না, যাই একবার, কৃষ্ণের জীব, অনাহারে মারা যাবে, সংসারের অকল্যাণ হবে।"

কুকুরের সেবার জন্য রামদাস নেমে গেল। আমি মনে কোল্লেম, কথাও ঠিক, যে লোকের পোষা কুকুর, যে লোকের হাতে আহার করে, সেই লোক সম্মুখে থাকলে আহার করে ; যে লোক নিত্য আহার দেয়, তার কাছে ও লাঙ্গুল-সঞ্চালনে আমোদ কোরে আহার করে ; পোষা কুকুরের ধর্ম্মই এই। অপরিচিত লোকের হাতে ভক্ষ্য গ্রহণে একজনের পোষা কুকুরের শীঘ্র প্রবৃত্তি হয় না। থাকতে থাকতে রামদাসের যদি পোষ মানে, তা হোলেই ঠিক হবে।

আমার মনের কথা আমার মনেই থাকলো। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরে অবিরামে আপন কাম বাজিয়ে সূর্যদেব আপন বিরামস্থানে চোল্লেন, নানা চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে একাকী আমি ঘরের মধ্যে বোসে থাকলেম।

বড়বাবু দর্শন দিলেন। স্ফীতবদনে আমার মস্তক স্পর্শ কোরে বড়বাবু বোল্লেন, "ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তুমি খুব বাহাদুর আছ। যে কাজ তুমি কোরেছ, সে কাজ আমরা পাত্তেম না। কর্ত্তা তোমাকে অবিশ্বাস কোত্তেন, স্বাধীনতা দিতে রাজী ছিলেন না, আজ অবধি আমি তোমাকে কর্ত্তার চক্ষে দর্শন কোরবো না। তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে আমাদের দুটি ভাইকেও তিনি বিশেষ কোরে বোলে গিয়েছেন, 'হরিদাসকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রেখো, একাকী কোথাও যেতে দিও না।'—মানে আমি বুঝেছিলেম, কিন্তু পিতার সে আজ্ঞা আমি পালন কোত্তে পাল্লেম না। তোমাকে আমি স্বাধীনতা দিলেম। এখন অবধি তুমি তোমার ইচ্ছামত কাজ কোত্তে পারবে ? কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতে বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে পাবে না।"

আমি মনে মনে হাস্য কোল্লেম। বড়বাবু শীঘ্র শীঘ্র উঠে গেলেন না, আমারে বেড়াতে যেতেও অনুরোধ কোল্লেন না। দিবাকার্য সমাধা কোরে দিবাকর স্বস্থানে প্রস্থান কোল্লেন। রূপসী এসে আমাদের দিকে চাইতে চাইতে ঘরে একটা বাতী জেবলে দিয়ে গেল। একটু পরেই ছোটবাবু সেইখানে এলেন। আকাশের মিহির অস্তাচলে বাড়ীর মিহিরটি উদয়াচলে উপস্থিত। আমরা তিনজনে নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন কোচ্ছি, কথায় কথায় ভূতের প্রসঙ্গ এসে পোড়লো। ছোটবাবু বোল্লেন, "ইন্দ্রজাল অনেক রকম দেখা গিয়েছে, এরকম কোথাও দেখি নাই। কুকুরেরা ভূতের খেলা দেখায়, বড়ই আশ্চর্য। আমি একদিন—"

কি কথা বলা ছোটবাবুর মনে ছিল, শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করবার অবসর হলো না, একটি লোক সেই সময় মন্থরগতিতে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। পরিচ্ছদে ভদ্র লোক, দৃষ্টি কিছু কুটিল, মস্তকে লম্বা লম্বা চুল, সম্মুখভাগে কুঞ্চিত, চুলের বাবরীতে কাণ দুটি ঢাকা, মাথায় একটি মৌলবীকে তার তাজ, ডানদিকে বক্রভাবে হেলা, এত হেলানো যে, লোকটির ডানকানটি আছে কি না জানা যায় না।

অভ্যর্থনা কোরে হাসতে হাসতে বড়বাবু বোল্লেন, "আসুন পায়রাবাবু, আসুন ; অনেক দিনের পর আজ আপনার দর্শন পেলেম, সংসারের সমস্ত মঙ্গল ত ?"

পায়রাবাবু বোসলেন। বড়বাবুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি কত রকম কথা বোল্লেন. আমি সকল কথার অর্থ বুঝলেম না। মন যদি আমার সেই দিকে থাকতো, হয় তো বুঝতে পাত্তেম, কিন্তু মন তখন আমার সে দিকে ছিল না। চক্ষের সংগে মনের মিলন কোরে পায়রাবাবুর চেহারাটি তখন আমি দর্শন কোচ্ছিলেম। চক্ষে অবশ্য পলক ছিল, কিন্তু দৃষ্টি সেই দিকে অবিরাম। দেখছি, লোকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোচ্ছি। মনে একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব। পায়রাবাবুর মুখ-মণ্ডলের প্রতিই আমার নয়নের অধিক আকর্ষণ। অশ্রুপুট দর্শন কোল্লেম, নাসিকা দর্শন কোল্লেম, নেত্রপুট দর্শন কোল্লেম, কেশস্তবক দর্শন কোল্লেম। সুবক্র তাজের উপরে নেত্র স্থির। অনেকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটে একরাত্রে আমি বিদ্যাসুন্দর যাত্রা শ্রবণ কোরেছিলেম। গোপালে উড়ের যাত্রা। সেই যাত্রায় যে লোকটি বর্দ্ধমানের সুন্দরের প্রতিনিধি সেজেছিল, সেই লোকটির মস্তকের তাজ ঠিক ঐ রকমে দক্ষিণে হেলা। যাত্রার সুন্দরকে আমার মনে পোড়লো। সুন্দরের কার্য্যের সংগে পায়রাবাবুর কার্য্যের মিলন আছে কি না, ক্ষণকাল তাই আমি ভাবলেম।

চেয়ে আমি পায়রাবাবুর মুখের দিকে ; মনে হলো, মূর্ত্তি যেন আমার চেনা। আর কোথাও দেখেছিলেম কি না, ঠিক স্মরণ কোত্তে পাল্লেম না, কিন্তু এই রুদ্রাক্ষগ্রামেই তাঁরে আমি দেখেছি, এইরূপ যেন অবধারণ কোল্লেম। গ্রামের কোথায় দেখা, সেটি স্মরণ কোত্তেও অধিক বিলম্ব হলো না। গতরাত্রে ভূতের উৎসবের সময় মুখে মাথায় রুমালবাঁধা যে লোকটি ভিড়ের ভিতর দর্শন দিয়েছিলেন, কুকুরেরা যাঁর গায়ে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠেছিল, সেই লোক। মুখখানি তখন ঢাকা ছিল, নাকটি আর চক্ষুদুটি খোলাছিল। ঠিক চিনতে পারি নাই, একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল। আজ এই সময় অনাবৃত মুখমণ্ডল দর্শন কোরে সেই সন্দেহভঞ্জন হয়ে গেল। সত্যই বড়বাবুর পায়রাবাবুটি সেই লোক। আমি যেমন স্থির কোল্লেম সেই লোক, বড়বাবু আর ছোটবাবু সে রকম স্থির কোত্তে পাল্লেন কি না, লক্ষণ দর্শনে তেমনটি নিশ্চয় কোত্তে আমি অক্ষম হোলেম।

মুখ ঢাকা দেখেছিলেম, খোলামুখ দেখলেম, মনে মনে চিনতে পাল্লেম। কেবল তাও নয়, আর কোথায় দেখেছি। মনে মনেই তর্ক, মনে মনেই নিশ্চয়। নদীতীরের আম্রবৃক্ষতলে একটি সেজোবাবু আমি দেখেছিলেম। রাঙামামীর প্রেরিত দূতস্বরূপ যাঁর হস্তে আমি সেই ঔষধের মোড়ক সমর্পণ কোরেছিলেম, ইনিই সেই সেজোবাবু। সাক্ষী আমার চক্ষু আর আমার মানসিক স্মৃতি। এই পায়রাবাবুই সেই সেজোবাবু।

কথা কিছু ভাঙলেম না। পায়রাবাবু মধ্যে মধ্যে আমার দিকে কটাক্ষপাত কোচ্ছিলেন, কটাক্ষপাতে আমিও তাঁর সেই কটাক্ষ দর্শন কোচ্ছিলেম। বস্তুতঃ

তাঁর দর্শন আর আমার দর্শনের ভাব স্বতন্ত্র। ভূতের গল্প আরম্ভ হলো। সেই সময় আমি দেখলেম, প্রবেশকালাবধি এতক্ষণ পর্যন্ত পায়রাবাবুর মুখের ভাব যে প্রকার ছিল, সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। কোন প্রসঙ্গ শ্রবণের ইচ্ছা না থাকলে শ্রোতা যেমন ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়, কোন পুরাতন বৃত্তান্ত আপন কৃতকার্যের ন্যায় ভেবে নিয়ে সে যেমন ম্রিয়মাণ হয়, চাঞ্চল্যের হেতু উপস্থিত না থাকলেও সে যেমন ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরায় কিম্বা পলায়নের পন্থা দেখে, মিহিরচাঁদের মুখে ভূতের গল্পের ভূমিকা শুনেই পায়রাবাবুর বাহ্যভাব সেই প্রকার। ভাবটা আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য কোল্লেম। কি আমি লক্ষ্য কোচ্ছি, পায়রাবাবু হয় তো ঠিক সেটা অনুভব কোত্তে পাল্লেন না। অল্পক্ষণ পরেই অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন ; বড়বাবুর দিকে চেয়ে গদ্‌গদবচনে বোল্লেন, "রাত্রি হয়, স্থানান্তরে আমার আজ একটা কাজ আছে ; এখন আমি চোল্লেম, অবকাশমতো আর একদিন এসে সকল কথা শুনবো।"

পায়রাবাবু দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হোলেন।

'যাও কিম্বা থাকো', বড়বাবু এই দুটি কথার একটি কথাও বোল্লেন না।

বারান্দা পার হয়ে সিঁড়িতে নামছেন, সেই সময় ছোটবাবুর কানে কানে চুপি চুপি গুটিকতক কথা আমি বোল্লেম। শশব্যস্তে গাত্রোত্থান কোরে, ছোটবাবু বারান্দায় বেরিয়ে পশ্চাতে ডাকলেন ;—ডেকে ডেকে বোল্লেন, "পায়রা-বাবু ! পায়রাবাবু ! চোল্লেন আপনি ? একটু দাঁড়ান ; আপনার কুকুরগুলি নিয়ে যান।"

ছোটবাবুর সঙ্গে আমিও বারান্দা পর্যন্ত গিয়েছিলেম, পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেম, দেখলেম, পায়রাবাবু নামতে নামতে মুখ ফিরিয়ে যেন কতই বিস্ময়ে বোলে উঠলেন, "আমার কুকুর ? কে বলে এমন কথা ? কোথাকার কুকুর ? কার কুকুর ? আমি ত—আমি—"

উপযুক্ত অবসরে ছোটবাবুর কর্ণে আমি আর এক মন্ত্র ঝাড়লেম। পায়রাকে সম্বোধন কোরে ছোটবাবু শীঘ্র শীঘ্র বোল্লেন, "আপনি একবার উপরে আসুন, আপনার একটি কার্য বাকী আছে, দাদা আপনাকে ডাকছেন।"

পায়রাবাবুর মুখের কথা ওষ্ঠাগ্রেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল, ছোটবাবুর বাক্যাবসানে তিনি কিয়ৎক্ষণ সিঁড়ির উপর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ; নেত্রদ্বয় কিয়ৎক্ষণ উপরদিকে বিকসিত হয়ে থাকলো, তার পর ধীরে ধীরে তিনি উপরে এসে উঠলেন, গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, ছোটবাবু তাঁর সঙ্গে থাকলেন, আমি নীচে নেমে এলেম। পাঁচ সাত মিনিট পরেই আবার আমি বাবুদের মজলীসে গিয়ে আসনগ্রহণ কোল্লেম।

যে সময়টুকু আমি গরহাজির ছিলেম, সেই সময়ের মধ্যে পায়রাবাবুর সঙ্গে বাবুদের কিরূপ কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তা আমি জানতে পাল্লেম না। আমি হাজির হবার পর বড়বাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আচ্ছা, পায়রাবাবু, আপনি বোলছেন, কুকুর আপনার নয়, কিন্তু আমি শুনেছি, কুকুরপোষা

আপনার ভারী সখ ; কুকুর স্বভাবতই প্রভুভক্ত, সেই ভক্তির উপর আপনি আরও অধিক ভক্তিসংযোগ কোরে কুকুরগুলিকে অধিক ভক্ত—অধিক বশীভূত কোরে তুলতে পারেন, সে বিষয়ে আপনার অতুল ক্ষমতা। যে কুকুরগুলি আমার এখানে আছে, সেগুলি যদি—"

ঝুমুর ঝুমুর শব্দে শৃংখলবাদন কোত্তে কোত্তে সাতটি কুকুর সেইখানে উপস্থিত হলো। আমাদের কাহারো মুখে বাক্য থাকলো না। কুকুরেরা সানন্দ-গুঞ্জনে লম্ফে ঝম্ফে দ্রুত ধাবিত হয়ে পায়রাবাবুর গায়ে মাথায় আরোহণ কোত্তে লাগলো। সেই ক্রীড়া দর্শনে বড়বাবু ছোটবাবু উভয়ে বিস্ময়াপন্ন, আমি কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হোলেম না। গত রাত্রে বহুরূপীর মত ছদ্মবেশে এই পায়রাবাবু এইখানে উপস্থিত ছিলেন, কুকুরেরা গত রাত্রে এই মূর্ত্তির নিকটে এইরূপ অভিনয় কোরেছিল, আমি সেটি জানতে পেরেছিলেম, সেই কারণেই আমার মনে, বিস্ময়ের উদয় হলো না। আজ রাত্রে আবার সেই প্রকার অভিনয়ে আমি নিজেই এই অভিনয়ের সূত্রধার।

সিঁড়ির পথে ছোটবাবুর আহ্বানে পায়রাবাবু যখন দ্বিতীয়বার উপরে উঠে আসেন, সেই সময় আমি একবার নীচে গিয়েছিলেম ; রামদাসকে ক্ষেত্র-কর্ম্মের পরামর্শ দিয়াছিলেম। সেই পরামর্শের ফলে কুকুরের প্রবেশ। কুকুরের অভিনয় ; সুতরাং আমিই এই অভিনয়ের সূত্রধার।

পায়রাবাবু অস্থির। লোকটির মনে স্পষ্ট আঘাত লাগে, এমন কোন বাক্য উচ্চারণ না কোরেই হাসতে হাসতে বড়বাবু বোল্লেন, "বাঃ! আপনি তো কুকুর-বংশের উত্তম বশীকরণ জানেন ; আপনাকে দেখলেই সব কুকুর আনন্দে নৃত্য করে, গায়ে উঠে খেলা করে। আশ্চর্য ক্ষমতা আপনার। আপনি বোলছিলেন, আপনার কুকুর নাই, আপনার কুকুর নয় সে কথায় অবিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু এই কুকুরগুলো আপনি নিয়ে যান। একবার আপনাকে দেখেই এরা পোষ মেনে'ছে, আপনাকে দেখেই সুখী হয়েছে ; আপনার কাছে এরা ভাল থাকবে, আপনি নিয়ে যান।"

আমতা আমতা কোরে পায়রাবাবু বোল্লেন, "আমি ?—আমি ?—আমি কেন ? আমি কেন ?—এ সব কুকুর আমি—" এইরূপ অসম্বন্ধ কথা বোলতে বোলতে হাত ছুড়ে ছুড়ে গায়ের কুকুরগুলিকে তিনি তাড়িয়ে দিবার চেষ্টা কোল্লেন, দূর দূর বোলে ধমক দিলেন, কুকুরেরা সে ধমক মানলে না, শুনলে না, গ্রাহ্যই কোল্লে না ; যতই তিনি ফেলে ফেলে দেন, নূতন খেলা মনে কোরে কুকুরেরা ততই আহ্লাদে লাঙ্গুল সঞ্চালন কোরে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বার বার তাঁর গায়ে উঠে।

টাকা যদি মেকী হয়, সে টাকার গায়ে অনেক রকম নিশানা থাকে, মানুষের কপটতারও নিশানা অনেক। কপট বিরক্তি দেখিয়ে পায়রাবাবু সেই কুকুর-গুলিকে চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত উপহার দিতে আরম্ভ কোল্লেন ; মুখে বোলতে লাগলেন, "এ কি উৎপাত ! কোথাকার উপসর্গ ! কোথাকার কুকুর এ সব ! কেন আমাকে—কেন আপনারা—কেন আমি—কুকুর নিয়ে—"

শীকারের গন্ধ পেয়ে বিড়াল যেমন চুপি চুপি ছলী পেতে আসে, সেই রকম ছলী পেতে পেতে রামদাস সেইখানে এসে উপস্থিত। দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রামদাস সেই মজলীসের বাগবিতণ্ডা শ্রবণ কোরেছিল, মধ্যবর্ত্তী হয়ে পায়রাকে বোলতে লাগলো, "কেন মশাই অমন কর? কেন মশাই না না কর? নিয়ে যাও মশাই, নিয়ে যাও, কেন আমাদের মাথার উপর জীবহত্যা-পাপের বোঝাটা চাপিয়ে দিতে চাও? খাবার দিলে খায় না, ভেঁউ ভেঁউ কোরে কাঁদে, দু দিন থাকলে ঠায় মারা যাবে, কৃষ্ণের জীব, কে কোথায় অনাহারে বাঁচে? কেন আপনি আমাদের অতগুলো জীব-হত্যার ভাগী কর। এখানে থাকলে ওরা বাঁচবে না; নিয়ে যাও।"

কাহারো কোন কথাই পায়রাবাবু শুনলেন না; গায়ের উপর থেকে কুকুরগুলিকে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ভারী কোরে উঠে সটান চঞ্চলচরণে এককালে বাহিরের রাস্তায় উপস্থিত হয়েই ছুট! বড়বাবু, ছোটবাবু আর আমি, তিনজনেই বাহিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পায়রাবাবুর ছুটের ঘটা দেখ্‌লেম; তিনজনেই হাস্য কোল্লেম; তিনজনেই রামদাসের প্রতি ইঙ্গিত কোরে যথাকর্ত্তব্য আদেশ দিলেন। রামদাস তৎক্ষণাৎ সে কুকুরগুলির গলার শিকল-গুলি খুলে নিয়ে সদরদরজায় বাহির কোরে দিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিলে। বন্ধ করবারও আবশ্যক ছিল না, দরজা খোলা থাকলেও কুকুরেরা বাড়ীর ভিতর ফিরে আসতো না। রাস্তার ধূলা আঘ্রাণ কোত্তে কোত্তে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটে ছুটে তারা সেই পলায়িত মনিবের পথানুসরণ কোল্লে; দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য হয়ে গেল। এইখানেই এ নাটকের যবনিকা-পতন।

নবম কল্প

দারুণ কলঙ্ক—কলঙ্কভঞ্জন

সপ্তাহ অতীত। এই সপ্তাহের মধ্যে একরাত্রেও ভূতের নৃত্য, ভূতের হুঙ্কার, ভূতের ক্রন্দন, ইত্যাকার কোন অদ্ভুত শব্দই শ্রুতিগোচর হয় নাই। কেবল আমার নিজের কথা বোলছি না, বাড়ীর কেহই কিছু শ্রবণ করেন নাই। অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে বড়বাবু প্রফুল্লবদনে আমার শয়নগৃহে প্রবেশ কোরে আমারে বাহাদুরী দিয়ে বোল্লে, "হরিদাস, তুমি বীরপুরুষ, যুদ্ধক্ষেত্রের বীর-পুরুষের হস্তপদাবিশিষ্ট সজীব মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সে যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয়ই আছে। তুমি ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ কোরেছ, তোমার প্রতাপে ভূতেরা পরাজিত হয়ে পলায়ন কোরেছে। যথার্থই তুমি বীরপুরুষ! এখন অবধি আমি তোমাকে সহোদর তুল্য বিবেচনা কোরবো, তোমার পরামর্শমতই কার্য্য কোরবো। লোকে যেমন নিরুপদ্রবে মনের সুখে নিজ বাড়ীতে বাস করে, এখন অবধি তুমি সেইরূপ মনের সুখে এই বাড়ীতে বাস কর। কর্ত্তা ফিরে এসে যদি কোন বিরুদ্ধ কথা বলেন, আমি তাঁকে তোমার গুণের কথা বোলে ঠাণ্ডা কোরে রাখবো।"

বাহাদুরী পেলেম ; বীরপুরুষ হোলেম ; কর্ত্তা আমাদের সুনয়নে দেখবেন, কর্ত্তার পুত্রের মুখে সেরূপ আশ্বাসও পেলেম, কিন্তু একটি কথাও আমারে ভাল লাগলো না। সে বাড়ীতে কি একটা যে গুপ্তকাণ্ড আছে, অনুমানে সেইটি চিন্তা কোরে আমি নীরব হয়ে থাকলেম ; অকৃতজ্ঞ হোলেম না, মৌনভাবে দুইহাত তুলে বড়বাবুকে নমস্কার কোল্লেম।

রামদাস আসে যায়, কত রকমের কত কথা কয়, রূপসী আসে যায়, অভ্যাসমত আপন মনে পাঁচ রকমের গল্প করে, যাবার সময় এক একবার আঁখি ঠেরে চোলে যায়। ছোটবাবু আসেন যান, আমার সঙ্গে বেশ আত্মীয়তা দেখান, এক একদিন আমারে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের এক একদিক্ দেখিয়ে আনেন, এই রকমে দিন যায়। বড়বাবুর মুখে সেই উপদেবতার কথা ভিন্ন আর অন্যকথা প্রায়ই শুনতে পাই না ; গতকথা নিয়ে অত আলোচনা কেন তাঁর, সেটাও ঠিক বুঝতে পারি না।

আর এক সপ্তাহ অতীত। একদিন বৈকালে ছোটবাবুর সঙ্গে আমি একটি সরোবরতীরে ভ্রমণ কোচ্ছি, গুটীকতক হংস-হংসী সেই সরসীজলে খেলা কোরে বেড়াচ্ছে, দেখে দেখে মনে আমার একটা ভাব উদয় হলো। ছোটবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনাদের গ্রামে পায়রাবাবু আছেন, মানুষের আকার ধারণ কোরে পায়রাবাবু সংসারধামে ক্রীড়া করেন, এই সকল হংসের মধ্যে কোন হংস নরমূর্ত্তি ধারণ কোরে হংসবাবু কেন হয় না ? প্রণয়-সংসারে আমি সংসারী নই, বাস্তবিক প্রণয়পদার্থটি যে কি, তাও আমি বুঝি না। এ সংসারে বিহঙ্গকুলে হংস-হংসী আর কপোত-কপোতী বিমল প্রেমের দৃষ্টান্তে প্রসিদ্ধ পায়রাবাবুর ক্রীড়া দর্শনে একটি হংসবাবুর ক্রীড়া দর্শন কোত্তে আমার অভিলাষ হয় ; হংসের বাক্যশ্রবণে কৌতূহল জন্মে। তার কি কোনরূপ উপায় হোতে পারে না ?"

ছোটবাবু বোল্লেন, "তোমার কথা আমি বুঝতে পাল্লেম না, হংসের বাক্যশ্রবণে কৌতূহল, সে কৌতূহলের অর্থ কি ? হংসেরা কি কথা কয় ? সৃষ্টি কালাবধি হংসের মুখে কেহ কখন বাক্য শ্রবণ করে নাই।"

সমান আগ্রহে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "কেহ কখন শ্রবণ না কোল্লে আমার মনে সে ভাবের উদয় হোতো না। শ্রীহর্ষদেবের হংসের মুখে নলরাজা কথা শুনেছিলেন, দয়মন্তীদেবীও হংসমুখে পরিণয়-সম্বন্ধ শ্রবণ কোরেছিলেন, প্রণয়-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ থাকলে আমি কেন হংসবাক্য শুনতে পাব না, তাই আমি ভাবি ; বিশেষতঃ পায়রা যখন নরাকার ধারণ করে, তখন হংস অপারগ থাকে কেন ? আচ্ছা, ছোটবাবু, সেই পায়রাবাবুটি আপনাদের গ্রামে কতদিন আছেন ? এখানে তাঁদের কয়পুরুষের বাস ?"

খানিকক্ষণ বিস্মিতনেত্রে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত-স্বরে ছোটবাবু বোল্লেন, "বংশাবলীর তত্ত্ব তুমি জানতে চাও ? বেশী দিনের খবর আমি বোলতে পারবো না, পায়রাবাবুর পিত্রালয় এই গ্রামে বটে, কিন্তু এ গ্রামে পায়রাবাবুর জন্ম হয় নাই ; মাতামহালয়ে জন্ম, মাতামহালয়েই তিনি

প্রতিপালিত। জন্মাবধি এ গ্রামে তিনি আসেন নাই, সম্প্রতি এসেছেন। তাঁর প্রকৃত নামটি কি, তাও আমরা জানি না। কথা কবার সময় তাঁর গলাটি একটু ফুলে ফুলে উঠে, বক বকম, বক বকম শব্দের ন্যায় এক রকম ঘড় ঘড় শব্দ হয়, সেই জন্য দাদা রসিকতা কোরে তাঁর নাম দিয়েছেন 'পায়রাবাবু।' দেখাদেখি—দাদার মুখে শুনে শুনে, গ্রামের পাঁচজনেও বলে পায়রাবাবু।

কথা শুনলেম, কি আমি ভাবলেম, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হলো। জ্বলন্ত আগ্রহে, জ্বলন্ত কৌতূহলে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় পায়রাবাবুর মাতামহালয় ?"—ছোটবাবু বোল্লেন, "বীরভূমজেলা।"

আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠলো। আর তখন ছোটবাবুর দিকে ভাল কোরে আমি চাইতে পাল্লেম না। বিস্ময়ের বিকাস হোলে মানুষের নয়নের দীপ্তি কেমন একপ্রকার দাঁড়ায় ; বীরভূমজেলার নাম শ্রবণে আমার মনে এক মহা বিস্ময়ের উদয় হয়েছিল। সে সময় আমার চক্ষু দর্শন কোরে ছোটবাবু যদি কোন প্রকার বিস্ময়লক্ষণ বুঝতে পারেন, ভাল হবে না, সেই জন্যই ছোটবাবুর দিকে ভাল কোরে চাইতে পাল্লেম না ; মাথা হেঁট কোরে মনে মনে বোল্লেম, "যা ভেবেছি, তাই, সেই লোক না হোলে এতদূর ধড়ীবাজী আর কার মাথায় যোগায় ?"

কি ভাব আমার মনে উদয়, নয়নে আমার কোন ভাবের বিকাস, ছোটবাবু সেটি অনুভব কোল্লেন না, আমার চক্ষের দিকেও চেয়ে দেখলেন না, হঠাৎ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "পায়রাবাবুর বংশপরিচয় জানতে তোমার এত আগ্রহ কেন ?"

বিভ্রাট ! আগ্রহের হেতুবাদটা কি জানাই ? অল্পক্ষণ চিন্তা কোরে একটু উদাসীনভাবে আমি বোল্লেম, "এমন কিছু আগ্রহ নয়, বিশেষ কোন হেতুও নাই, তবে কি না, পায়রাবাবু একটি পাকালোক, কুকুর বশীভূত করবার বিশেষ ক্ষমতা তিনি ধরেন, কুকুরেরাও তাঁর সঙ্গে বেশ খেলা করে। পুরুষানুক্রমে কুকুরপোষার সখ না থাকলে এতটা দক্ষতা জন্মে না, এইজন্য আমি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, এ গ্রামে তাঁর কয় পুরুষের বাস ? জিজ্ঞাসা করবার আর কোন কারণ ছিল না।"

আসল কথা আমি গোপন রাখলেম। কথাটা আমি উলটে নিলেম, ছোটবাবু কিন্তু ধোত্তে পাল্লেন না ; ধরবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না, আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর শ্রবণ কোরেই তিনি সন্তুষ্ট হোলেন। বেলাও শেষ হয়ে এলো, বাড়ীতে আমরা ফিরে এলেম।

সেই রাত্রে আর এক অভিনব কাণ্ড। রাত্রিকালে আমার আহারের পর প্রথম প্রথম ঘরের দরজায় চাবী বন্ধ হতো, এখন বড়বাবু আমার প্রতি সদয়, এখন আর চাবী বন্ধ হয় না। অন্দরেই আমি আহার করি, সামান্য সামান্য দুই একটা কাজের অছিলায় রূপসী আমার শয়ন-ঘরে আসে ; নিত্য যেমন আসে, যে রাত্রের কথা আমি বোলছি, সে রাত্রেও সেইরূপ এসেছিল, রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই আবার চোলে গিয়েছিল। তার পর,—রাত্রি যখন অনেক, বাড়ীর সকলে

যখন নিদ্রাগত, সেই সময় রূপসী আবার চুপি চুপি দরজা ঠেলে, টিপি টিপি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে. নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। আমি তখনো ঘুমাই নাই। যে রাত্রে কিছু বেশী চিন্তা থাকে কিম্বা কোন প্রকার নূতন চিন্তা উপস্থিত হয়, সে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম হয় না। আমি জেগেই ছিলেম ; যা যা হোচ্ছে, ঘরে তখনো আলো ছিল, বেশ আমি দেখতে পাচ্ছি। রূপসী আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। কি করে, কি মৎলব, জানবার জন্য কপটে সেই সময় আমি নয়ন মুদিত কোল্লেম ; অনুমানে বুঝলেম, রূপসী আমার বিছানার উপর বোসলো। কিছুই আমি বোল্লেম না. চক্ষু খুলে একবার চাইলেমও না। রূপসী ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট ; তার পর ধীরে ধীরে একবার আমার বাহুমূল স্পর্শ কোল্লে, ধীরে ধীরে নাড়া দিলে, আমি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগলেম. অংগসঞ্চালন কোল্লেম না ; কি ভেবে রূপসী তখন আমার হাত থেকে আপনার হাতখানা একবার সোরিয়ে নিলে, কিন্তু উঠলো না। ক্ষণকাল চুপ। আবার সেই রকম অংগস্পর্শ।

কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন কোরে কিম্বা ঘুমের ঘোরে কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ কোরে মানুষ যেমন হঠাৎ শঙ্কিত-ভাবে জেগে উঠে, ভাণ কোরে সেই রকম ভাব দেখিয়ে, আমি সেই সময় একবার নয়ন উন্মীলন কোল্লেম ; কেবল নেত্রোন্মীলন মাত্র নয়, চমকিতভাবে বিছানার উপর উঠে বোসলেম। কাঁচা ঘুমে আশু জাগরিত লোকে সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে যেরূপ চমকিতভাবে ত্বরিত প্রশ্ন করে. রূপসীকে সম্মুখে দেখে সেই ভাবে আমি ত্বরিত প্রশ্ন কোল্লেম. "রূপসি ! এত রাত্রে তুমি এখানে কি জন্য ?"

শয্যা পরিত্যাগ না কোরেই দিব্য সপ্রতিভ ভংগীতে একটু মৃদুস্বরে রূপসী উত্তর কোল্লে. "আমি তোমারে একটি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছি। সন্ধ্যার পর যখন এসেছিলেম. তখন মনে ছিল না. সেইজন্য আবার এসেছি।"

সহসা আমার অন্তরে বিষম সন্দেহের সঞ্চার। সংশয়াকুললোচনে কিঙ্করীর মুখখানে চেয়ে আমি বোল্লেম. "জিজ্ঞাসা করবার আর কি তুমি সময় পাও নাই ? যখনি ইচ্ছা. তখনি আসছো. যতবার ইচ্ছা, ততবার আসছো. একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আর কি সময় হয় না ?"

রূপসী।—সময় হয়, কিন্তু নির্জ্জন হয় না। কথাটা নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করবারই কথা। রোজ রোজ মনে করি, জিজ্ঞাসা কোরবো. এক একদিন ভুলে যাই. এক একদিন কেহ না কেহ এখানে উপস্থিত থাকে, অবসর পাই না।

আমি।—বুঝলেম. বুঝলেম, আবশ্যকটা বুঝলেম,—আচ্ছা, আচ্ছা. বল দেখি, এত রাত্রে কি তোমার জিজ্ঞাসা ?

রূপসী।—জিজ্ঞাসা—জিজ্ঞাসা—জিজ্ঞাসা—

আমি। (কিঞ্চিৎ উত্তেজিত-স্বরে) এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে বোলতে বোলতে আবার থামা মারো কেন ? ঘোরফের আমি বুঝি না কথাটা কি, খোলসা কোরেই বল ? কি তুমি জিজ্ঞাসা কোত্তে চাও ?

রূপসী।--কথা ?—চাই ?—একটি কথা ;—বেশী এমন কিছুই না, কেবল একটি মাত্র কথা। তুমি যদি—

আমি।—(বিরক্ত হইয়া) গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে দাও, আসল কথাটা কি, বোলতে হয় তো বল, না হয় তো চোলে যাও।

রূপসী।—(আমার দিকে একটু হেলিয়া মৃদুস্বরে) রাগ কর কেন ? রাগ কর কেন ? ভাল কথাই আমি বোলছি, ভাল কথা বোলতে আমি এসেচি। রোজ রাত্রে তুমি একলাটি এইখানে শুয়ে থাকো, ভয় করে না ?

আমি।—ভয় ?—কিসের ভয় ?—ভূতের ?

রূপসী।--না, না, না, সে ভয় তো তুমি এক রকম ঘুচিয়ে দিয়েচ সে কথা বোলচি না ; বোলচি এই,—ভয় অনেক রকম। এত বড় একটা বাড়ী, তাতে আবার লোকে বলে হানাবাড়ী,—মানুষ কম, তারাও আবার অন্য মহলে, এ বাড়ীতে একা থাকতে রেতের বেলা তোমার ভয় করে না ?

আমি।—কিছুতেই আমার ভয় নাই। আমি ভয় পাই না, আমার ভয় হয় না, তুমি আবার কি নূতন ভয়ের কথা বোলতে এসেছ ? আচ্ছা ধর, ভয় যদি থাকে, তুমিই যা তার কি উপায় কোত্তে পার ?

রূপসী।—আমি ?— আমি ?—ভয়ের ?—না,—নূতন ?—না,—নূতন নয়। দেখে অবধি তোমাকে আমি বড় ভালবেসেচি, তোমার জন্যই আমার ভয় হয়। ভালবেসেচি বোলেই সর্ব্বক্ষণ যেন আমার মনে হয়, তুমি হয় তো ভয় পাও।

আমি।--যেন তোমার মনে হয়, আমি হয় তো ভয় পাই, এ কথার উত্তর আমি কি দিব ? তুমি এক জায়গায় চাকরী কর, আমি সেই জায়গায় নূতন এসেছি, তোমার সঙ্গে আমার দেখা-শুনা হয়, আমি ভয় পাই না, তুমি ভাব, হয় তো আমি ভয় পাই, এত টান কিসের ? এত ভালবাসা কিসের ?

রূপসী।—টান ?—ভালবাসা ?—এত কথা, এত কথা ?—ভাব দেখি হরিদাস! আহাহা! কি সুন্দর নামটি তোমার! হরিদাস!—ইচ্ছা করে, নামটি লিখে মালা গেঁথে, গলায় পরি।—আহাহা! কি সুন্দর রূপখানি তোমার!—কি সুন্দর মুখখানি তোমার! কি সুন্দর চক্ষু দুটি!—কি সুন্দর চুলগুলি! —আহাহা! রংটুকু যেন কাঁচা সোণা! ইচ্ছা করে, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ কোরে রাতদিন ঐরূপখানি আমি দেখি!—আহাহা! কি মিষ্ট বচনগুলি তোমার!—কাণে যেন মধু ঢেলে দেয়!—ইচ্ছা করে, রাতদিন ঐ মধুমুখের মধু খেয়ে ভালবাসার ভাবে বিভোর হয়ে থাকি!—আচ্ছা, হরিদাস! কত ভালবাসি আমি তোমারে, আমার প্রাণ তা জানে ; তুমি কি আমারে ভালবাস না ?—একটুও ভালবাসতে পার না ?

আমি দেখলেম, বেগতিক। এতক্ষণ অতটা বুঝতে পারি নাই। এতক্ষণের পর স্বৈরিণীর মনের ভাব কি তা আমি বুঝে নিলেম। কথার ভাবেই মনের ভাব, কেবল তাও না—শেষকথাগুলা বলবার সময় ছুঁড়ি আমার মুখের কাছে মুখ আনবার উপক্রম কোরেছিল! সামান্য একটা চাকরাণীর এতদূর বুকের পাটা! ত্বরিত-গতিতে বিছানা থেকে নেমে ঘরের মাঝখানে গিয়ে আমি দাঁড়া-

লেম। রূপসী তখন ফ্যাল-ফ্যাল-চক্ষে আমার দিকে চেয়ে থাকলো। আমি তখন একটু জোরে জোরে বোলতে লাগলেম, দেখ রূপসি! এখান থেকে চোলে যাও! এখনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও! একতিল যদি বিলম্ব কর, এখনি আমি গোল-মাল বাধাব, এখনি আমি বড়বাবুকে ডাকবো। বাড়ীর সব ঘুমন্ত লোকগুলিকে এখনি আমি জাগাব, ভালমুখে এখনো বোলছি, গরীবের মেয়ে, কলঙ্কের ডালি মাথায় কোরে কেন এই চাকরিটি খোয়াবে? বেরিয়ে যাও, শিষ্টশান্ত হয়ে আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কর।"

আমি ভেবেছিলেম, ঐ সব কথা শুনে চাকরাণীটা ভয় পাবে, ভয় পেয়েই হয় তো ছুটে পালাবে; কিন্তু কি আশ্চর্য, একটুও ভয় পেলে না, বিছানা থেকে লাফিয়ে পোড়ে উগ্রমূর্ত্তিতে আমার দুহাত তফাতে এসে দাঁড়ালো। সেই রোগা শরীর যেন ফুলে উঠলো, কতই যেন দীর্ঘাকার দেখাতে লাগলো, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু যেন জোনাকীর মত জেবালে উঠলো। স্বৈরিণী তখন আমার মুখের কাছে মুষ্টিবন্ধ দক্ষিণহস্ত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গর্জ্জনস্বরে বোল্লে, "আচ্ছা—আচ্ছা —আচ্ছা! থাকো—থাকো—থাকো। থাকো তুমি!—এতখানি ভালবেসেছিলেম, সেই ভালবাসার তুমি এই প্রতিফল দিলে!—আচ্ছা দাও!—দেখবো আমি তোমাকে!—কলঙ্কের ডালি!—আরে আমার কলঙ্কের ডালি রে!—দেখবো আমি, কেমন কোরে তুমি কলঙ্কের ডালি ঝেড়ে ফেলো! আমাকে তুমি চেনো না যাদু! —আগুন—আগুন!—আগুন!—উঃ!—বুকের ভিতর আগুন জেবলছে!—প্রাণের সঙ্গে ভালবেসে যৌবনধন ডালি দিতে চাইলেম, তার কি না এই ফল! এত অপমান!—এত যন্ত্রণা!—উঃ!—দেখবো আমি তোমাকে!—মেয়েমানুষ আমি!— দেখবো আমি তোমাকে!—কেমন কোরে কলঙ্ক কাটাও, দেখবো আমি!— দেখবো —দেখবো!—দেখবো!"

এই রকমে শাসিয়ে শাসিয়ে নাগিনী তখন যেন যষ্টি তাড়িতা নাগিনীর ন্যায় ফোঁস ফোঁস গর্জ্জন কোত্তে কোত্তে চপলা-গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিশ্বাস ফেলে, দরজা বন্ধ কোরে আমি শয়ন কোল্লেম। দুটি ভাবনা আমার নূতন সহচরী। পায়রাবাবুর মাতামহালয় বীরভূমজেলা। যে দিন আমি রাঙামামীর দূত হয়ে ঔষধের মোড়ক বিলী কোত্তে গিয়েছিলেম, সে দিন জানতেম না, বাবুটির নাম পায়রাবাবু; সে দিন জেনেছিলেম, সেজোবাবু! মুখ-খানি দেখে সেজোবাবুকে আমি আর এক বাবু অনুমান কোরেছিলেম, বীর-ভূমজেলার নাম শুনে, এ রাত্রে সেই অনুমানটি ঠিক মনে হোচ্ছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরীচুল, সেই সব চুলে কাণদুটি ঢাকা। বাবুটি যে দিন তাজ মাথায় দিয়ে এসেছিলেন, সে দিনের ভঙ্গীতেও কতক কতক বুঝতে পারা গিয়েছিল। ছদ্মবেশী লোকের পরচুল খুলে দিলে আসল রূপ যেমন চেনা যায়, পায়রাবাবুকে নেড়া কোরে দিতে পাল্লে, সেইরূপ চেনা যেতে পারে। বরদারাজ্যে যে কথা আমার শুনা হয়েছে, সে কথা যে ঠিক নয়, এমন আমি মনে কোত্তে পাচ্ছি না। একটা গল্প মনে পোড়লো। একগ্রামে একটি বাবু ছিল; বাবুটি কুচ্‌কুচে কালো, লম্বে প্রায় চারি হাত, অঙ্গে মাংস অনেক,

মস্তকটি অল্প অল্প চুলে ঢাকা, বাবুর মাথায় কি রকম রোগ ছিল, অধিক চুল রাখলে সেই রোগটা বাড়তো, সুতরাং হপ্তায় হপ্তায় বাবুটিকে নেড়া হোতে হতো। বাবুটির দুটি তিনটি মোসাহেব ছিল, বাবুর নেড়ামুর্ত্তি দর্শন কোরে সেই মোসাহেবরা বহুৎ বহুৎ তারিফ কোত্তো। কেন কোত্তো, তার কারণ ছিল। গজকুম্ভের ন্যায় বাবুর মাথায় উঁচু নীচু দুটি তিনটি ঢিবি ; কেশশূন্য হোলে সেই ঢিবিগুলি বেশ জেগে উঠতো, অত্যন্ত কদাকার দেখাতো। মোসাহেবেরা সেই সময় বাবুর মুখের কাছে হেঁট হয়ে পাঁচজনের সাক্ষাতে আমোদ কোরে বোলতো, "নেড়া হোলে আমাদের বাবুর চেহারার যেমন খোলতা হয়, আর কাহারো চেহারা তেমন খোলে না। অনেকেই ত সময়ে সময়ে নেড়া হয়ে থাকে, ছি ছি! কিম্ভুতকিমাকার দেখায়! আমাদের বাবু নেড়া হোলে কার্ত্তিকের মত রূপ ফোটে।"

গল্পের ভাব এইরূপ। পায়রাবাবুকে যদি সেইরূপ প্রশংসায় ফুলিয়ে তুলে একবার নেড়া কোরে দেওয়া যায়, তা হোলেই রঙ-তামাসা ধরা পড়ে। সজ্জা-পারিপাট্য ভদ্রলোকের মত ;—"দেখি তোমার চুল কেমন, দেখি তোমার কাণ কেমন," হঠাৎ ভদ্রলোককে এমন কথা বলা ভদ্রলোকের উচিত হয় না। ছোট-বাবুকে সুপারিশ কোরে পায়রাটিকে একদিন নেড়া করাই সুপরামর্শ। প্রথম চিন্তাটার সেই পর্য্যন্তই বিরাম। দ্বিতীয় চিন্তা রূপসী দাসীর অভিসার। রূপসীর অত্যন্ত দুঃসাহস! কুপথে আমার প্রবৃত্তি লওয়াবার অভিলাষে দুশ্চারিণী ঘোর নিশীথসময়ে এই ঘরে প্রবেশ কোরেছিল, হতমনোরথ হয়ে প্রতিশোধের ভয় দেখিয়ে গেল। নাগিনী আমারে দেখবে, নাগিনী আমারে দেখাবে, আমার মাথায় কলঙ্কের ডালি চাপাবে, এই রকম ভয়প্রদর্শন। পারে তা, দুষ্টবুদ্ধিতে কুলটারা সব কোত্তে পারে, জানি ; আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি না। মনে জানছি, সামান্য একটা চাকরাণীর কথায় আমার ভয় পাবার কোন কারণ নাই ; চরিত্রের প্রতি আমার অধিক দৃষ্টি, চরিত্ররক্ষায় সর্ব্বদা আমি সাবধান, পাপিনী আমার কি প্রকারে অপকার কোত্তে পারবে?—কিছুই পারবে না। এই বিশ্বাসে সে ভাবনাটা আমি মন থেকে দূর কোরে দিলেম ; সে পক্ষে একরকম নিশ্চিন্ত হয়েই থাকলেম।

রূপসীকে আমি বার বার নাগিনী বোলে উল্লেখ কোচ্ছি ; দৃষ্টান্তে নাগিনী বোলছি না, বাস্তবিক তার একটা নাম যেন নাগিনী, অনেকেই এইরূপ বিবে-চনা কোরবেন, পাঠকের মনে সংশয় জন্মিবারও সম্ভাবনা ; সে সংশয়ের হেতু আমি রাখবো না। চাকরাণীর কাজ করে, কিন্তু চেহারায় রূপসীকে চাকরাণী বোলে বোধ হয় না, এই কারণে রামদাসকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, রূপসীটা কে?—রামদাস বোলেছিল "ছোটবাবুর জন্মের অগ্রে এই বাড়ীতে একজন চাকর ছিল, তার নাম লবকুমার লাগ ; তারা স্ত্রীপুরুষে এই বাড়ীতে থাকতো, তাদেরই কন্যা ঐ রূপসী। ছোটবাবুর যখন জন্ম হয়, রূপসী তখন ছোট ছিল, বড় হয়ে এখন এই বাড়ীতেই দাসীবৃত্তি কোচ্ছে।"—বঙ্গের কোন কোন জেলার ইতরশ্রেণীর লোকেরা দন্ত্য "ন" স্থলে "ল" উচ্চারণ করে, সেই

অভ্যাসে নবকুমার নাগকে রামদাস বোলেছিল, 'লবকুমার লাগ'; সুতরাং নাগের কন্যাকে আমি নাগিনী বোলে পরিচয় দিলেম।

সে রাত্রের দুটি চিন্তাকেই ঐ প্রকারে বিদায় দিয়ে আমি নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেম। পরদিন প্রভাতে আমার ঘরের নিয়মিত কার্য্যগুলি রামদাস এসে নির্ব্বাহ কোরে গেল, রূপসী এলো না। তদবধি রূপসী আর আমার সঙ্গে দেখা করে না, আমি যখন অন্দরে যাই, রূপসী তখন আমারে দেখে, মুচকে মুচকে দুষ্টহাসি হেসে, মুখ ঘুরিয়ে অন্য ঘরে প্রবেশ করে। ক্রমাগত একপক্ষ এই ভাব। কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না।

পক্ষান্তে এক রাত্রে আমি আপন কক্ষে শয়ন কোরে আছি, রাত্রি অনুমান দুই প্রহরের অধিক, অন্দরের ভিতর একটা গোলমাল উঠলো। দুই তিনজনের কথা, একটি কণ্ঠস্বর কিছু উচ্চ উচ্চ। সে বাড়ীর সদর অন্দর একমহলে, অতি অল্পমাত্র ব্যবধান, এ কথা পূর্ব্বেই আমি বোলেছি। যে ঘরে আমি শয়ন করি ; সে ঘর থেকে অন্দরের উচ্চ উচ্চ কথা বেশ শুনা যায় ; বিশেষতঃ গভীর রাত্রে। গোলমালটা ক্রমশই বাড়তে লাগলো। বিছানা থেকে আমি উঠলেম। রূপসীর দুর্বাসনা-প্রকাশের পর থেকে শয়ন-ঘরের দরজায় আমি রাত্রিকালে অর্গলবন্ধ কোরে রাখি, নিঃশব্দে অর্গলমুক্ত কোরে চুপি চুপি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেম ; এত রাত্রে বাড়ীর ভিতর কিসের গোলমাল, খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলেম। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। স্বর বোলছে, "দেখ ঠাকুরপো, দেখ! তোমার দাদার কীর্ত্তিখানা এসে দেখ ; মামীর ঘরে রাসলীলা হোচ্ছে, তোমার দাদা দেই লীলার ঠাকুর হয়েছেন ; দরজা খুলে একবার বেরিয়ে এসে দেখ!"

এই কথার পর একটা বন্ধ দরজায় গুম গুম কারে শব্দ হোতে লাগলো ; একটা দরজার খিলখোলা শব্দও আমি শুনতে পেলাম। তার পর আবার সেই পূর্ব্বস্বরের উচ্চ ধ্বনি। ভূত-শাসনের পরদিন থেকে বড়বাবুর অনুমতিক্রমে বাড়ির বৌমা-দুটি আমার সঙ্গে কথা কন ; স্বরে বুঝলেম, বড়-বৌমার কণ্ঠস্বর। ডেকে ডেকে তিনি বোলছেন, "ডাকো ঠাকুরপো, ডাকো! চক্ষের উপর দেখ, এই ঘরেই তোমার দাদা! যেদিন থেকে ভূতের উপদ্রব থেমেছে, সেইদিন থেকেই এই রকম হোচ্ছে। দরকার আছে, কার্য আছে, বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে, এই রকম এক একটা অছিলা কোরে বড়বাবু রোজ রোজ সন্ধ্যাকালে বেরিয়ে যান, অনেক রাত্রে ফিরে আসেন, কিছুই আমি জানতে পারি না, তক্কে তক্কে থেকে আজ রাত্রে আমি ধোরে ফেলেছি ; জেগেছিলেম, রাঙামামীর ঘরে দুজন মানুষের কথা শুনে, দুজনের হাসির শব্দ পেয়ে, বারান্দায় আমি বেরিয়েছি, কথার আওয়াজে মানুষটিকেও চিনতে পেরেছি ; ডাকাডাকি কোল্লেম, কতবার দরজা ঠেল্লেম, কত বকাবকী কোল্লেম, এখন আর সাড়া-শব্দ নাই। নিশ্চয়ই এই ঘরে তোমার দাদা আছেন! কি কেলেঙ্কার! কি কেলেঙ্কার! ডাকো তুমি! দাদাকে ডাকতে সাহস না হয়, মামীকে ডাকো। সব ভুর আজ ভেঙে দিব!"

এই সব কথা আমি শুনলেম ; শব্দে জানতে পাল্লেম, মামীর ঘরের দরজা খোলা হলো। বড়বাবু রেগে রেগে বোলতে লাগলেন, "কি—কিক্ক—ক্কি ? হয়েছে কি ? অত হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কিসের জন্য ? রাঙামামীর পেটব্যথা কোচ্ছিল, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট কোচ্ছিল, আমাকে ডেকেছিল, তাই আমি ওষুধের ব্যবস্থা কোত্তে এসেছিলেম ; দেখ না এসে, ওষুধের শিশি ! হয়েছে কি ?"

বড়-বৌমা আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব্যংগ কোরে বোল্লেন, "আহাহা ! কি আমার ডাক্তার গো ! রসের নাগর, গুণের সাগর ! পেটের ব্যথার ওষুধ দিতে এসেছিলেন ! শোনো ঠাকুরপো, শোনো ! তোমার দাদাবাবুর ডাক্তারী বিদ্যার পরিচয়টা একবার শুনে রাখো ! ছি ছি ছি ! ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ কি কারখানা ! গলায় দড়ী দিয়ে মোত্তে ইচ্ছা হয় !"

ছোটবাবুর কোন কথা আমি শুনতে পেলেম না ; বড়বাবুও চুপ্ কোল্লেন, বোধ হলো যেন অন্যদিকে তিনি সোরে গেলেন। আবার বড়-বৌমার কণ্ঠস্বর। মামীকে লক্ষ্য কোরে তিনি বোলতে লাগলেন, "আর তোমাকেও বলি বাছা, তুমি রাঙামামী কুটুম্বুর মেয়ে, কুটুম্বুর বাড়ীতে রয়েছ, এ সব ঢলাঢলি কেমন কোরে কর ? লজ্জা হয় না ? ধিক্কি জীবন আর কি ! মামী মায়ের সমান, ভাগ্নে সন্তান তুল্লি, ভাগ্নে নিয়ে এই সব কাণ্ড ! দড়ী জোটে না ? দড়ী কলসী নিয়ে আঘাটায় যাও ! সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে ; তোমারও যাবে, আমাদেরও যাবে। আমি না জানি কি ? তোমাকে জানি, পায়রাকেও জানি, কি রকমে ভূতের নৃত্য হতো, তাও জানি, সব আমি জানি, হাঁস, পায়রা, হীরামন, পেঁচা, দাঁড়কাক, কত রকম ডাক্তার যে তোমার পেটের ব্যথার ওষুধ দিতো, কিছুই আমার জানবার বাকী নাই ! এখন কি না ঘরের ভিতর বৃন্দাবন বসালে ! ভাগ্নে নিয়ে নীলে-খেলা ! তুমি রাধা, তিনি শ্যাম ! এইবার একটি কাঁদে বাড়ী বলরাম এলেই ঠিক হয় ! কি ঠাকুরপো ! বলরামের পালাটা গাইতে পারবে ? ধিক—ধিক—ধিক ! এখন আমাদের মরণই মঙ্গল !"

এই সময় ছোটবাবু বোধ হয়, কোন রকম থাবাথুবি দিয়ে গোলমালটা থামিয়ে দিলেন, আর কোন উচ্চবাচ্য আমি শুনতে পেলেম না। খানিকক্ষণ সমস্তই চুপচাপ চুপি চুপি ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ কোরে বিছানার উপর আমি বোসলেম। অনিচ্ছায় আমার নাসারন্ধ্র থেকে দুটি নিশ্বাস বহির্গত হলো। কি পাপের ভোগ ! ভাগ্যশেষে এমন বাড়ীতেও আমি বাস কোচ্ছি ! রক্তবিচার নাই ! ওঃ ! সেই কথাই বটে বড়-বৌমা ঠিক ধোরেছেন ! আমার মনে মনেও একটা খটকা ছিল ! ঔষধের মোড়ক নিয়ে আমি রাঙামামীর দৌত্যকার্য কোরেছিলেম ! কিসের ঔষধ, এখন আমি বুঝলেম। পায়রাবাবুই রাঙামামীর প্রেমের নাগর ! কেবল একটি নয়, বৌমার কথায় তাও আমি বুঝতে পাল্লেম। পালায় পালায় ছাদের উপর অনেক রকম ভূত এসে দক্ষযজ্ঞ ভংগ কোত্তো ! ভূতের পালা এখন ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন ঘরে ঘরেই বৃন্দাবন ! ও ! কত দিনে যে এই পাপপুরী থেকে আমি পরিত্রাণ পাব, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। দুরাচার রক্তদন্ত কত রকম পাপের মূর্ত্তি যে আমাকে দেখাচ্ছে, কত রকম পাপ-কথাই আমাকে

শুনাচ্ছে, আমার অন্তরাত্মাই তা জানতে পাচ্ছেন। আবার আমার নাসারন্ধ্রে অগ্নিশিখা তুল্য তিনটি দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত।

বোসে বোসেই আমি রজনীপ্রভাত কোল্লেম। প্রভাতে রামদাস এসে ঘরের কাজগুলি সেরে দিয়ে গেল। রাত্রে কিছু আমি জেনেছি, কিছু আমি শুনেছি, রামদাসকে সে সব কথা কিছু আমি বোল্লেম না। ক্রমে ক্রমে বেলা হলো ; কথায় কথায় আমি শুনলেম, শেষরাত্রে বড়বাবু কোথায় চোলে গিয়েছেন, কেহই কিছু বোলতে পারে না। দিন গেল, সন্ধ্যা হলো, রাত্রি এলো, বড়বাবু বাড়ী এলেন না। সকলেই উদ্বিগ্ন। কর্ত্তাগৃহিণী বাড়িতে নাই, বড়বাবু কর্ত্তৃত্ব কোচ্ছিলেন, তিনিও অদৃশ্য! আমার মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হলো! সর্ব্বদাই আমি চিন্তাযুক্ত।

এই ঘটনার পর আট দশ দিন অতিক্রান্ত । বড়বাবুর দেখা নাই। মামীর ঘরে বৃন্দাবন-লীলার রজনীতে যে সকল কান্ড হয়েছিল, এই আট দশ দিনের মধ্যে সে প্রকান্ড কান্ডের কোন কথা কাহার মুখে প্রকাশ পেলে না ; তুষারাবৃত আগ্নেয়গিরির ন্যায় বাহিরে বাহিরে বাড়ীখানা এক রকম ঠান্ডা। বোল্লেম আমি ঠান্ডা, কিন্তু আমার ভাগ্য-চক্রের ঘর্ষণে এক অভাবনীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি! সেই রুদ্রাক্ষগ্রামেই বড়-বৌমার পিত্রালয়। একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্ন-প্রাশন উপলক্ষে বৌমা পিত্রালয়ে যাবেন, রামদাস তাঁর সঙ্গে যাবে, রামদাসের মুখে সেই কথা আমি শুনলেম। আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। এই দুরন্ত সংসারে বড়বাবু আমার প্রতি সদয়, ছোটবাবু আমার বন্ধু, আমার প্রতি বড়-বৌমার পুত্রতুল্য স্নেহ, রামদাসটিও আমার বিশেষ অনুগত, বাধ্য ; বড়বাবু কোথায় চোলে গিয়েছেন, বড় বৌমাও বাড়ীতে থাকছেন না, রামদাসও থাকছে না। বোলতে গেলে আমি এক রকম অসহায় হব। কেন ভাবি অসহায়? —অকস্মাৎ যদি কোন বিপদ ঘটে, ছোটবাবুটি ছাড়া আর কাহাকেও আমি রক্ষাকর্তা পাব না.—আর কেহই আমার সহায় হবে না। ছোট-বৌমাটি ছেলে-মানুষ, যদিও তাঁর স্বভাব অতি নির্ম্মল, তথাপি সংসারের কোন কার্য্যে তাঁর তাদৃশ হাত নাই। কেন এটা আমি ভাবলেম, বিপৎপাতের ভাবী আশঙ্কা হঠাৎ কেন আমার মনে এলো, সে কথা আমি বোলতে পারি না। ঘুঘুর বাসায় আমি আগুন দিয়েছি, কুকুরের মুখোসে গুলী কোরে ভূতের বাসা ভেঙ্গে দিয়েছি, রাঙ্গামামী আমার শত্রু হয়ে আছেন, অভিসারিকার কুৎসিত অভিলাষে আমি উপেক্ষা কোরেছি, রূপ্সী আমার শত্রু হয়ে আছে, বড়-বৌমা বাড়ী থেকে চোলে গেলে কি জানি কে কোন্ দিক্ থেকে কি প্রকার ফ্যাঁসাদ বাধায়, সেই জন্যই আমার ভয়। ভয়ত্রাতা মধুসূদন। বিপদ্‌বারণ মধুসূদনকে স্মরণ কোরে সে ভয়টা তখন আমি চেপে রাখ্‌লেম ।

যে দিন আমি এই সব কথা ভাবলেম সত্য সত্যই রামদাসকে সঙ্গে কোরে বড়বৌমা সেইদিন বৈকালে ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন দেখ্‌তে গেলেন। তিনদিন আস্‌বেন না, রামদাসের মুখে সে কথাও আমি শুনেছিলেম। বেলাটুকু চোলে

গেল, রামদাস নাই, রূপসী আসে না, সেই পাচিকাই সন্ধ্যাকালে আমার ঘরে আলো দিলেন, রাত্রিকালে আহারের পূর্ব্বে যা কিছু আবশ্যক, সেই প্রাচীনার দ্বারাই অগত্যা আমি সেগুলি সাধন করাতে বাধ্য হোলেম। পরদিন প্রভাতেও তিনি আমার গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ কোরে দিলেন। বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত আমি এক প্রকার গৃহশান্তি উপভোগ কোল্লেম ; সন্ধ্যার পরে বিনামেঘে বজ্র-পাত !

আহারান্তে ছোটবাবুর সঙ্গে আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলেম, সন্ধ্যার পর ফিরে এসে দেখি, যে ঘরে আমি থাকি, সেই ঘরে আমার বিছানার উপর দুটি লোক ;—একটি যুবা, আর একটি অর্দ্ধবৃদ্ধ। দরজার কাছে বাড়ীর দাসী আর পাচিকা। লোক-দুটির বদন গম্ভীর। আমরা আসবার পূর্বে কি তাঁরা বলাবলি কোচ্ছিলেন, আমাদের দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। লোক-দুটিকে পূর্বে আমি দেখি নাই, গৃহে আমরা প্রবেশ করবামাত্র তাঁরা পরস্পর মুখ-চাহাচাহি কোরে কেমন একপ্রকার ভ্রূকুটী-ভঙ্গীতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁদের সেই গম্ভীরবদনে সেই সময় একপ্রকার বিকৃতভাব লক্ষিত হলো। রূপসীর মুখে চক্ষে উল্লাসলক্ষণ দেখলেম, বিজয়োল্লাসে বীরপুরুষের মুখ-চক্ষু যেরূপ প্রফুল্ল হয়, ঠিক যেন সেইরূপ ; ভাব আমি কিছুই বুঝতে পাল্লেম না।

ছোটবাবুর দিকে চেয়ে সেই দুটি লোকের মধ্যে একটি লোক যেন কিছু উদাসীনভাবে বোল্লেন, "বসো মিহিরচাঁদ।"—বস্, এই পর্য্যন্ত কথা ; আমারে কেহই কিছু বোল্লেন না। ছোটবাবু বোসলেন। উদ্বেগযুক্ত হয়ে আমিও তাঁর কাছে বোসলেম। আমার দিকেই লোক-দুটির ঘন ঘন দৃষ্টি। কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরব। নূতন লোকেরা কি জন্য এসেছেন, ছোটবাবু সেই কথা জিজ্ঞাসা কোরবেন, উপক্রম কোচ্ছেন, এমন সময় একটি বাধা। লোকটি এক নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ বোলে উঠলেন, "দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। কার মনে যে কি আছে, কে যে কখন কি করে, বুঝে উঠা ভার ! দিনের বেলা বাড়ীতে চুরি হয়েছে, বড় আশ্চর্য কথা।"

যে লোকটির বয়স অধিক, তিনি প্রথম বক্তা। ছোটবাবুর বিস্ময়সূচক প্রশ্নে তিনি উত্তর কোল্লেন, "হাঁ গো, তোমাদেরই বাড়ী,—তোমারই ঘরে !—স্নান করবার সময় ছোট-বৌ-মা গলার হারছড়াটি খুলে একটা তাকের উপর রেখেছিলেন, বৈকালে চুল বাঁধবার সময় খুঁজে দেখলেন হারছড়াটি নাই। তুমি বাড়ীতে ছিলে না, তোমার মামী, পাচিকা ব্রাহ্মণী, বৌমা নিজে আর ঐ রূপসী অনেক জায়গায় অনেক খুঁজেছে, কোথাও সে হার নাই। তোমার মামীর আদেশে রূপসী ছুটে গিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছিল, বরদাকান্তকে সঙ্গে কোরে তাই আমি এখানে এসেছি। ব্যাপারখানা কি, কিছুতেই তো জানা যাচ্ছে না। ঘরের ভিতর থেকে জিনিস গেল, কেহই খুঁজে পেলে না, এ বড় আশ্চর্য্য কথা ! এসে আবার শুনলেম, রূপসী বোল্লে, 'সেই ঘরে পালঙের নীচে জলখাবার দুটি গেলাস ছিল, তাও পাওয়া যাচ্ছে না।' তাজ্জব ব্যাপার ! দিনের বেলা বাড়ীর ভিতর

কি চোর প্রবেশ কোরেছিল? বাড়ীতে এখন বেশী লোক নাই, এ কার্য্য কার তবে?"

পূর্ণবিশ্বাস না কোরে একটু তাচ্ছল্য-ভাবে ছোটবাবু বোল্লেন, "আছে হয় তো কোথায় কে হয় তো কোথায় রেখেছে, এখন মনে কোত্তে পাচ্ছে না, একটু ভাল কোরে খুঁজলেই পাওয়া যাবে ; চুরি কোত্তে কে আসবে?"

তিন পা এগিয়ে এসে, হাত নেড়ে নেড়ে রূপসী বোলতে লাগলো "খুঁজতে কি আর আমরা বাকী কোরেছি? তন্ন তন্ন কোরে খুঁজেচি ; কোথাও নাই! কোথাও নাই! নিশ্চয় চুরি গিয়েছে! ছোট ছোট সিকি আধুলি নয়, দুটো একটা পয়সা নয়, মস্ত একছড়া দামী হার, বড় বড় দুটো জলের গেলাস, কোথায় লুকিয়ে থাকবে? উড়ে যাবে কি?"

বিরসবদনে পাচিকা ঠাকুরানী মৌনবতী। ছোটবাবু চিন্তাযুক্ত। আমি বিস্ময়াপন্ন। কথায় কথায় আমি জানতে পাল্লেম, দুটি আগন্তুক ভদ্রলোকের মধ্যে যিনি বয়োধিক, তিনি এই গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক :—দলপতি ; বরদাকান্তটি তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর। পল্লীগ্রামে কোন প্রকার অকু ঘটনা হোলে গ্রামের মোড়ল-চৌকিদারকে মধ্যস্থ রেখে তদারক করা হয়, সেই হিসাবে এই দলপতি-মহাশয় এই গ্রামের মোড়ল ; নাম রূপচাঁদ ভঞ্জ। রূপসীর বাক্যাবসানে ছোটবাবুকে সম্বোধন কোরে ভঞ্জবাবু বোল্লেন, "কথাও ত ঠিক্ বটে ; ছোট-খাটো জিনিস নয়, বড় বড় জিনিস, ঘরের ভিতর কোথাও থাক্‌লে কেনই বা খুঁজে পাওয়া যাবে না? চল দেখি যাই, তুমিও চল, রূপসীও চলুক, ব্রাহ্মণীও চলুন, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। ভাল কোরে অন্বেষণ কোল্লে, বোধ হয়, পাওয়া যেতে পারে। তাতেও যদি না পাওয়া যায়, তবে নিশ্চয় চুরি ; নিশ্চয়ই চোরের কাজ।"

দলপতিবাবু এই কথাগুলি যখন বলেন, তখন কট্‌মট্ চক্ষে বারকতক আমার দিকে চেয়েছিলেন ; ভিতরে ভিতরে রেগেছিলেন, দন্তে দন্তঘর্ষণের কড়্ মড়্ শব্দও আমার কর্ণে এসেছিল। আমি কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে একটিও কথা কই নাই, কেহ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন নাই, বাবুদের মুখের দিকে চেয়ে চুপ কোরে আমি বোসে ছিলেম। দলপতির অনুরোধে ছোটবাবু উঠে দাঁড়ালেন, দলপতিও উঠলেন, বরদাকান্ত বোসে থাকলেন। যাবার সময় পশ্চাতে একবার চেয়ে ছোটবাবু আমারে বোল্লেন, "যাবে হরিদাস? এসো!"

মুখ ফিরিয়ে সচকিতে দলপতি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কারে তুমি ডাকছো?—কে যাবে?—হরিদাস?—কে হরিদাস?"

আমার দিকে হস্তনির্দেশ কোরে ছোটবাবু উত্তর দিলেন, "এই ছোকরার নাম হরিদাস ; এটি এখন আমাদের বাড়ীতেই আছে ; বেশ ছোকরা, স্বভাব-চরিত্র বড় ভাল ; চরিত্রে কিছুমাত্র দোষ নাই।"

মুখ ভারী কোরে বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দলপতি-মহাশয় ছোটবাবুকে বোল্লেন, "না না, অন্যলোকের সেখানে যাবার কোন দরকার নাই ; তোমাতে আমাতে গেলেই চোল্‌বে ; এসো তুমি।"

দলপতির সঙ্গে ছোটবাবু অন্দরের দিকে গেলেন, ঘনপদক্ষেপে সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন কোরে রূপসী তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো ; সর্ব্বপশ্চাতে ব্রাহ্মণী-ঠাকুরাণীও চোল্লেন। ঘরে থাক্‌লেম আমি আর বরদাকান্ত।

আমি আর বরদাকান্ত। উভয়ের নিকটে উভয়েই আমরা অপরিচিত। পরিচয়ের অবসর উপস্থিত। আমার পরিচয় যৎসামান্য। বিদেশী বালক, নানা বিপাকে ঠেকে নানা স্থান পর্য্যটন কোরে গ্রহগতিকে এই গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই বাড়ীতেই আছি, এই পর্য্যন্ত আমার পরিচয় ; বরদাকান্তের পরিচয় পূর্ব্বে একটু প্রকাশ হয়েছিল, দলপতিবাবুর সহোদর তিনি ; কোথাও কাহারো চাক্‌রী করেন না, সর্ব্বদা বাড়ীতেই থাকেন, পিতার একখানি তালুক আছে, সেই তালুক-সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্ম দেখেন শুনেন, স্বহস্তেও লেখাপড়া করেন। পরিচয় এই পর্য্যন্ত। অতঃপর আর কি কথা ?—নূতন লোকের সঙ্গে নূতন কথা আমার কিছুই ছিল না, কিন্তু দুজনে এক স্থানে বোসে চুপ কোরেও থাকা যায় না ; প্রসঙ্গ-শূন্য দুটি একটি ফাঁকা ফাঁকা কথা তাঁরে আমি বোল্‌ছি, তিনি এক একবার হুঁ হাঁ দিচ্ছেন, এক একবার চুপ কোরে থাকছেন ; এক একবার আমি তাঁর মুখের দিকে চাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, কথার দিকে তাঁর মন নাই। কোন বিষয় শ্রবণ কোত্তে কোত্তে শ্রোতার মনে ঘৃণার সঞ্চার হোলে তাঁর মুখের ভাব যেমন হয়, বরদাকান্তের মুখের ভাব তখন সেই প্রকার। কটাক্ষ-ভঙ্গীতে যখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন সেই কটাক্ষে বিলক্ষণ ঘৃণার লক্ষণ প্রকাশ পায়। মনে মনে আমার সন্দেহের উদয়। কেন তিনি আমারে ঘৃণার চক্ষে দেখেন ? তাঁর চক্ষে আমি নূতন, আমার চক্ষেও তিনি নূতন মানুষ, এ ক্ষেত্রে ঘৃণার ভাব কেন আসে ? নূতন দর্শনে পরস্পর অনুরাগ-বিরাগ একপ্রকার অস্বাভাবিক। নাটক-নবন্যাসে দুই একটি নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শনে অভাবনীয় অনুরাগলক্ষণ পাঠ করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সে লক্ষণের তাদৃশ মিলন অনুভূত হয় না। সেই কথাই আমি ভাবছি, ছোটবাবুর সঙ্গে দলপতি-মহাশয় সেই ঘরে ফিরে এলেন। দলপতির মুখখানা তখন অত্যন্ত ভার ভার ; ছোটবাবুর মুখ সংশয়মাখা। দরজার দিকে আমি চেয়ে দেখ্‌লেম, এক ধার থেকে কে একজন উঁকি মেরে মেরে দেখ্‌ছে। ভাল কোরে দেখে চিনলেম, উঁকি মারছিল রূপসী, রূপসীর চক্ষু যেন তখন কি আহ্লাদে ফিক ফিক কোরে হাসছিল, ভাব কিছু আমি বুঝতে পাল্লেম না।

একটা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা কোরে যাঁরা ফিরে এলেন, তাঁদের মুখ দেখে সে কার্য্যের ফলাফল কিছুই বুঝা গেল না ; ফলটা ভাল কি মন্দ, কিছুই প্রকাশ পেলে না। অনুমানে আমি যেন মন্দটাই ভেবে নিলেম। তাঁরা বোসলেন না, স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুটিকতক কথা বলাবলি কোল্লেন। সে সব কথার মর্ম্ম এইরূপ :—"কর্ত্তার ঘরে চাবি বন্ধ, বড়বাবুর ঘরেও চাবি বন্ধ, যে কয়েকটি ঘর খোলা আছে, সেই সব ঘরে তল্লাস করা হয়েছে, চোরা জিনিস পাওয়া যায় নাই। বরদাবাবুকে সম্বোধন কোরে রূপচাঁদবাবু বোল্লেন, তোমরা একবার নেমে দাঁড়াও ; এই ঘরটা একবার অন্বেষণ কোত্তে হবে। বরদাবাবু

আমারও যেমন বাকরোধ, ছোটবাবুরও প্রায় সেইরূপই বাকরোধ হয়েছিল। মোড়লবাবুর উগ্রমূর্ত্তি দর্শন কোরে, উগ্রমূর্ত্তি শ্রবণ কোরে, তিনি তখন অল্প অল্প কম্পিত-কণ্ঠে বোল্লেন, "শুনলেম সব ; শুনলেম সব, কিন্তু বুঝলেম না কিছুই, হরিদাস চোর, কিছুতেই আমার বিশ্বাস হোচ্ছে না। এতদিন রয়েছে, একদিনও হরিদাসের স্বভাবে বিন্দুমাত্রও দোষ আমি দেখি নাই ; অকস্মাৎ চোর হবে, কিছুতেই আমার বিশ্বাস হয় না ; বোধ হয়, এ কাণ্ডের ভিতর কাহার কুচক্র থাকতে পারে।"

আমি সেই সময় একটু সাহস পেয়ে ছোটবাবুর দুটি পায়ে জোড়িয়ে ধোল্লেম, চক্ষের জলে পা-দুখানি ভিজিয়ে দিলেম, কম্পিত—স্তম্ভিত স্বরে বোল্লেম, "দোহাই ছোটবাবুর! দোহাই ধর্ম্মের! আমি চোর নই ; কিছুই আমি জানি না, আমারে নষ্ট করবার মতলবে কে যে এই কুচক্রের সৃষ্টি কোরেছে, কিছুই আমি বুঝতে পাচ্ছি না ; আপনি আমারে রক্ষা করুন! দোহাই আপনার, থানায় খবর দিবেন না, থানায় আমারে পাঠাবেন না! বহু-যন্ত্রণা আমি সহ্য কোরেছি, তত যন্ত্রণা পেয়েও জন্মাবধি আমি নিষ্কলঙ্ক, থানার হাতে সোঁপে দিলে কখনই আমি বাঁচবো না ; ঘৃণায়, অপমানে, মিথ্যা অপবাদে প্রাণ আমার আপনা হোতেই ঠিকরে বেরিয়ে যাবে!"

আমার সকরুণ রোদনে অন্তরে ব্যথা পেয়ে, দলপতির দিকে চেয়ে, গদগদ-বচনে ছোটবাবু তখন বোল্লেন, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, জিনিসগুলি হরি-দাসের ঘর থেকে বেরিয়েছে, যদিও স্বচক্ষে আমি দেখলেম, তথাপি হরিদাসকে চোর বোলতে আমার মন চায় না। হরিদাসকে আমি থানায় দিতে পারবো না ; যেখান থেকেই যা হোক, জিনিসগুলি পাওয়া গিয়েছে এই মঙ্গল, হরিদাসকে পীড়ন কোত্তে আদৌ আমার ইচ্ছা নাই।"

মোড়লবাবু রেগে উঠলেন ; আসনত্যাগ কোরে দাঁড়িয়ে উঠে সক্রোধে বোলতে লাগলেন, "ইচ্ছা নাই? যদি ইচ্ছা নাই, তবে তোমার বাড়ীর মেয়েরা আমাকে খবর দিয়েছিল কেন? ডেকে পাঠিয়েছিল কেন? ঘরে ঘরে মিট-মাট কোরে ঘরের ভিতর চোর পুষে রাখলেই তো ঠিক হতো, ডেকে এনে অপমান করা কি জন্য? থানায় তুমি যাবে না? চোরকে তুমি থানায় তবে দিবে না? আচ্ছা! আচ্ছা! থাক তবে। তুমি বুঝি মনে কোচ্ছো, আমার কোন ক্ষমতা নাই? থানার দারোগা আমার আজ্ঞাকারী, মেজেষ্টার সাহেবের ডান হাত আমি, আমার পরামর্শ নিয়ে মেজেষ্টার সাহেব কাজ করে। আমার কথায় চোরকে তুমি থানায় দিতে রাজী নও?—আচ্ছা, আমি তবে চোল্লেম, দেখি, চোরকে তুমি কেমন কোরে রক্ষা কর! এসো হে বরদা! ঝকমারী কোরেছিলেম এসেছিলেম, এসো!"

সরোষগর্জ্জনে এই সব কথা বোলতে বোলতে মহাপ্রতাপশালী দলপতিমহাশয় চঞ্চলপদে ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত অগ্রসর হোলেন। চঞ্চলপদে পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তাঁর দুখানি হাত ধোরে মিনতিবচনে ছোটবাবু বোল্লেন, "রাগ কোরবেন না মহাশয়, রাগের কথা নয়, যে সব কথা আমি বোল্লেম, ভাল কোরে আপনি

বিবেচনা করুন। যদি ঠিক ঠিক প্রমাণ হয়, অগত্যা থানার সাহায্য গ্রহণে আমি অসম্মত হব না ; এখনো আমার সন্দেহ দূর হয় নাই, বিষম সন্দেহ আছে। হরিদাসের চরিত্র আপনি জানেন না, সেইজন্যই এত ব্যস্ত হোচ্ছেন ; আমরা সকলেই জানি, হরিদাসের স্বভাব নিষ্কলঙ্ক। কর্তা বাড়ী নাই, দাদা বাড়ীতে নাই, বড়-বৌটিও পিত্রালয়ে ; তাঁরা আসুন, ইতিমধ্যে আমি আরও ভাল কোরে তত্ত্বটা জানি, যে তত্ত্ব আজ প্রকাশ পেলে, এ তত্ত্বের বিপরীত যদি কিছু প্রকাশ না হয়, তা হোলে—"

বিরক্ত হয়ে ভঞ্জবাবু বোলে উঠলেন, "তত্ত্ব আবার জানবে কি ? তত্ত্ব জানবার আর বাকী কি ? তোমার মামীও বোল্লেন, এই দাসীটিও বোল্লে, আজ বৈকালে এই ছোকরা ছোট-বৌমার ঘরে প্রবেশ কোরেছিল, অনেকক্ষণ সেই ঘরে ছিল : স্বকর্ণেই শুনে এলে, সে প্রমাণের উপর বিপরীত প্রমাণ তুমি আর কি জানতে চাও ? আমি বাপু, তোমাদের ও সব কথার ভিতর আর থাকতে চাই না, চোর-ডাকাত ধরা যাদের কাজ, তারা যা জানে, তাই কোরবে, আমি এখন রিপোর্ট দিয়ে—"

শেষকথা না শুনেই অধিক ব্যগ্রতা জানিয়ে ছোটবাবু বোল্লেন, "না মহাশয় ! ও কাজ আপনি কোরবেন না ; রিপোর্ট এখন পাঠাবেন না। বাড়ীর ভিতর বৌমানুষের ঘরে দিনের বেলা চুরী, এ কথাটা অনেক রকমে ঘোরে ; কলঙ্কের ভয় আছে, রিপোর্ট আপনি এখন পাঠাবেন না ; হরিদাস বরং এখন এই ঘরের মধ্যেই আটক থাকুক, ঘরের দরজায় আমি সর্বদা চাবীবন্ধ রাখবো, এই ঘরটাই এক রকম হাজত-গারদ হবে, হরিদাস কোথাও যেতে পাবে না, যদি পালায়, হাজির করবার জন্য আমি দায়ী থাকবো, থানা জানাজানিতে এখন দরকার নাই ; অনুগ্রহ কোরে আপনি আমার এই প্রস্তাবে সম্মতিদান করুন।"

কিঞ্চিৎ শুভগ্রহ। সরলমনে না হউক, আন্তরিক অনিচ্ছায় দলপতি-মহাশয় কিঞ্চিৎ ক্রোধ সংবরণ কোল্লেন, ছোটবাবুর অনুরোধে তিনি আমারে তত শীঘ্র পুলিশে পাঠাতে জিদাজিদি কোল্লেন না, ঘরের গারদে আটক রাখাই সাব্যস্ত হলো, বরদাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে ভঞ্জবাবু বিদায় হোলেন। ঘরের গারদেই আমি বন্দী হয়ে থাকলেম। আমি পালাবো না, ছোটবাবু সেটি জানতেন, দিনের বেলায় চাবী দিতেন না, রাত্রিকালে আহারাদির পর চাবী বন্ধ হতো। তিন দিন তিন রাত্রি এই রকম।

চতুর্থ দিবসে বড়বৌমা বাড়ী এলেন, রামদাসও এলো। রামাদাসকে দোসর পেয়ে আমি অনেকটা ভরসা পেলেম। চোর অপবাদে ঘরের ভিতর আমি কয়েদ, বড়বৌমা সে কথা শুনলেন। যেমন যেমন হয়েছিল, তার উপর দশটা ডালপালা দিয়ে সাজিয়ে রাঙামামী তাঁর কাণ ভারী করবার—মন ভারী করবার, চেষ্টা পেলেন ; রূপসীও তাতে বাতাস দিলে, বড়বৌমা সে সব কথায় কিরূপ উত্তর দিয়েছিলেন, সে সব আমি শুনতে পেলেম না। রামদাসের মুখে শুনলেম, ছোটবৌমা বোলেছেন, "যেদিনে চুরী হয়, সেদিন বৈকালে হরিদাস

আমার ঘরে প্রবেশ করে নাই।” তিনি আরো বোলেছেন, “হরিদাস চুরী কোরবে, এমন কথা তিনি মনের কোণেও স্থান দেন না।” এ সংবাদেও আমার একটু ভরসা হলো। ধর্মে যার অকপট বিশ্বাস, ধর্ম তারে রক্ষা করেন, চিরদিন এইরূপ আমার ধারণা ; শাস্ত্রে কবিবাক্যেরও সেইরূপ মর্ম ; সেই বিশ্বাস উদ্দেশে ধর্মদেবকে নমস্কার কোরে ভক্তিভাবে ভগবান দীনবন্ধুর করুণাময় নাম আমি জপ কোত্তে লাগলেম।

এক গৃহস্থের এক গৃহমধ্যে আমি কয়েদ ; রামদাস ছিল না, কথার দোসর পেতেম না, পাচিকা ব্রাহ্মণী দুইবেলা আমার আহারসামগ্রী দিয়ে যেতেন, সর্বদাই তাঁর মুখখানি আমি বিষণ্ণ বিষণ্ণ দেখতেম। বিষণ্ণনয়নে আমার মুখের দিকে তিনি চেয়ে চেয়ে থাকতেন, কথা কইতেন না ; দিবা-রাত্রি আমি একাকী থাকতেম। তিন দিন এই রকমে কেটেছিল। এখন রামদাস এসেছে, রামদাস মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসে, দুটি পাঁচটি কথা কয়, আমি চোর হয়েছি, রামদাস সে কথায় বিশ্বাস করে না, আমার অবস্থা দেখে বরং দুঃখ প্রকাশ করে। রাত্রিকালে যখন চাবী বন্ধ হয়, তখন আর রামদাস আসতে পায় না। রাত্রেই আমার ভীষণ যন্ত্রণা।

চিন্তা করা আমার অভ্যাস। ভগবান আমারে যত চিন্তা দিয়েছেন, তত চিন্তা বোধ হয়, আর কাহাকেও দেন নাই। চিন্তা ভগবান দেন কি মানুষে দেয় কি আপনাআপনি আসে, সে তত্ত্ব আমি জানি না ; কিন্তু শৈশবে যখন গুরুগৃহে ছিলেম, তখন অবধিই আমার চিন্তা করা শিক্ষা হয়েছে ; দুশ্চিন্তাই অধিক ; স্বভাবতঃ শুভচিন্তা আসে বটে, কিন্তু শুভঘটনা আমার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না, কাজে কাজে শুভচিন্তাগুলি জলবিম্বের ন্যায় অন্তরেই মিলিয়ে যায়। কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা আমারে অধিকার কোরেছে, অবিচ্ছেদে আমার হৃদয়ে আশ্রয় নিয়েছে, রাত্রিকালে অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে। এখন আমার যেরূপ অবস্থা, এ অবস্থায় অন্য চিন্তা আমি ভুলে যাই। নাম নাই, পরিচয় নাই, আশ্রয় নাই, একটিও আপনার লোক জানা নাই ; ছিল কেবল একটি চরিত্র, রেখেছিলেম কেবল একটি চরিত্র, সেই চরিত্র এখন সঙ্কটাপন্ন, প্রতি নিশাকালে সেই চিন্তাই এখন কেবল প্রবলা। রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে ভাবি কেবল কি হলো ? আমি চোর হোলেম ! বিধাতার মনে কি এই ছিল ? মানুষের কাছেও আমি অপরাধী নই, বিধাতার কাছেও আমি অপরাধী নই, তবে কেন আমার কপালে এমন ঘোটলো ? আমি অদৃষ্টবাদী, অদৃষ্টকেই আমি বলবান জ্ঞান করি। দুই একখানি পুস্তকে আমি পাঠ কোরেছি, কোন কোন লোক অদৃষ্ট মানে না। যারা মানে না, তারা সুখে থাকে কি কষ্টে থাকে, তাও আমি বুঝে উঠতে পারিনে, বোধ হয় যেন তারা বেশী কষ্ট পায়। ভাগ্যফল আমি মানি, সেই কারণেই জন্মাবধি মানুষের অসহ্য কষ্ট আমি সহ্য কোত্তে পাচ্ছি, অদৃষ্টে আছে, ঘোটছে, এই আমার প্রবোধ ; ভাগ্য যদি না মানতেম, তা হোলে বোধ হয়, কিছুতেই এ সকল কষ্ট আমি সহ্য কোত্তে পাত্তেম না। চিরজীবন কষ্টে যাবে, চিরজীবন বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে, কাহারো

অদৃষ্টে এমন ফল লেখা থাকে না। কখন না কখন জীবনকালের মধ্যে আমার ভাগ্যে শুভদিনের উদয় হবে, মহাবিপদে পতিত হয়েও সেইটিই আমি ভাবি ; সেই শুভ আশা আমার অবসর-হৃদয়কে প্রফুল্ল কোরে দেয়, তাতেই আমি বেঁচে আছি। অদৃষ্টবাদে অবিশ্বাস থাকলে বোধ হয় কখনই আমি বাঁচতেম না। লোকে যেটিকে বিধাতার লিখন বলে, আমি সেটিকে বিধাতার ইচ্ছা মনে কোরেই আপনা আপনি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই।

পাঁচ দিন গেল, চোর অপবাদে পাঁচ দিন আমি বন্দী ; থানার গারদে অথবা রাজকারাগারে বন্দী হয়ে থাকলে লোকে যত যন্ত্রণা ভোগ করে, তত যন্ত্রণা আমার হয় না বটে তথাপি আমি যেন মনে করি, অপরাধী বন্দী অপেক্ষা আমার যন্ত্রণা অধিক। অপরাধীরা জানে অপরাধের দণ্ড ; আমি জানি কি ? —আমি জানি, বিনা অপরাধে বিষম কলঙ্কে অজ্ঞাত লোকের কুচক্রে অকারণে আমি কারাবাসী !

অকারণ ?—অসম্ভব ! কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই হয় না ; অকারণে আমার কারাবাস, মূলতত্ত্ব অগ্রাহ্য কোরে কি সাহসে আমি এমন কথা বলি ? অকারণে নয়, অবশ্যই কারণ আছে ; সে কারণটা কি তবে ? ষষ্ঠ যামিনীর অবসানকালে এই তর্ক আমার মনোমধ্যে সমুদিত। মিথ্যা অপবাদে আমার কারাবাসের কারণ কি তবে ? ভাবলেম অনেক ; যে ক-দিন কয়েদ আছি, সে ক-দিন নিত্য নিত্যই ঐ কথা ভাবি ; মনে মনে একটা সন্দেহ জাগে। এই শেষের রাত্রে যেন কার উপদেশে অবধারণ কোল্লেম, কারণসূত্র দুটি মনুষ্য :—দুটি স্ত্রীলোক। বাবুদের রাঙামামী বহু নায়ক-বিলাসে কলঙ্কিনী ছিলেন, বাড়ীতে ভূতের উপদ্রবে সে কলঙ্কে এক রকম চাপা পোড়ে থাকতো : পিণ্ডদানে না হোক, মন্ত্রবলে না হোক, আগ্নেয়াস্ত্রের বলে সে সব ভূত আমি তাড়িয়েছি, রাঙামামী দারুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর মনঃপীড়ার প্রধান হেতুই আমি ; সেই কারণে আমার উপর রাঙামামীর মর্ম্মান্তিক রাগ হওয়া সম্ভব। তিনি আমার এই কলঙ্কের—এই যন্ত্রণার একটি কারণ। আর এক কারণ রূপসী।—কুৎসিত অভিলাষে রূপসী আমার কাছে প্রেমভিক্ষা চাইতে এসেছিল, ঘৃণা পূর্ব্বক আমি তাকে প্রত্যাখ্যান কোরেছি, প্রতিফল দিবে বোলে রূপসী আমারে ভয়প্রদর্শন কোরে রেখেছিল, অবসর বুঝে সেই কোপ—সেই আক্রোশ জাগিয়ে তুলেছে। রাঙামামী আর রূপসী, উভয়েই আমার শত্রু ! কি সূত্রে তাদের সেই কুচক্র প্রকাষ পায়, আপন মনে তার উপায় কল্পনা কোত্তে আমি সচেষ্ট হোলেম। উপায় আমার কল্পনায় এলো না। কল্পনার সঙ্গে উষাসতী ধীরে ধীরে বিদায় হয়ে গেলেন। রজনী প্রভাত।

প্রভাতে আমার কয়েদঘরের চাবী খুলে রামদাস প্রবেশ কোল্লে। গৃহকর্ম্ম সমাধা কোরে ম্লানবদনে রামদাস আমার বিছানার ধারে এসে বোসলো। কাতর-নয়নে রামদাসের মলিন বদন নিরীক্ষণ কোরে সন্দিগ্ধস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রামদাস ! সর্ব্বদা আমি তোমাকে প্রফুল্ল দেখি, আজকাল তুমি এমন হয়েছ কেন ? যখনি তোমাকে দেখি, তখনি তোমার মুখখানি শুষ্ক শুষ্ক,

মুখে হাসি নাই, বেশী কথা নাই, কি যেন ভাবো, এই রকম লক্ষণ দেখতে পাই ;—কারণ কি ?"

ম্লানবদনেই রামদাস উত্তর কোল্লে, "কারণ তুমি ; তোমাকে এরা চোর বোলে আটক রেখেছে, বড় আশ্চর্য ব্যাপার! এই কথা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পোড়েছি। এ বাড়ীতে কারা তোমার শত্রু, তা আমি জানতে পাচ্ছিনে ; শত্রুপক্ষের কুচক্র ভিন্ন তোমার নামে এত বড় কলঙ্ক আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। বাড়ীর ভিতর আমি শুনলেম, বড়-বৌমা বোলছেন, হরিদাস কখনই চোর নয় ; ছোট-বৌমা বোলছেন, হরিদাস কখনই চোর নয় ; ব্রাহ্মণী বোলছেন, হরিদাসকে সোণার সঙ্গে ওজন করা যায় ; সোণাতে বরং খাদ থাকে, হরিদাসে খাদ নাই। এই তো তিনজনের কথা, তবে আর কার কথাতে লোকে তোমাকে অপরাধী বোলে বিশ্বাস কোরবে ?"

রামদাসের কথায় কিঞ্চিৎ উৎসাহ পেয়ে রামদাসকেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার কি রকম বোধ হয় ?" রামদাস বোল্লে, "আমার তোমাকে দেবতা বোলে বোধ হয়। কলিকালে দেবতা যদি থাকে, ধর্ম্ম যদি থাকে, তারা তবে অবশ্য তোমার মত একটি ক্ষুদ্র দেবতাকে—"

বারান্দার দিকে মানুষের পদশব্দ। কারা যেন শীঘ্র শীঘ্র সেই ঘরের দিকে চোলে আসছে, এই রকম দ্রুত পদবিক্ষেপের শব্দ। রামদাসের কথা সমাপ্ত হোতে না হোতেই ছোটবাবুর সঙ্গে সেই দলপতিবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। রামদাস আমার বিছানার ধারে বোসে ছিল, এই সময় সোরে গেল ;—ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না, একটু দূরে দেয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। উপবেশন করবার অগ্রেই আমারে সম্বোধন কোরে একটু কুণ্ঠিতস্বরে দলপতিবাবু বোল্লেন, "হরিদাস! আগে ঠিক বুঝতে না পেরে আমি তোমাকে অপরাধী বিবেচনা কোরেছিলেম, এখন জানতে পাল্লেম, বিষম কুচক্র। তোমাকে আমি কষ্ট দিয়েছি, সে জন্য তুমি কিছু মনে কোরো না, ভুলচুক সকলেরই আছে ; প্রথমে আমার বুঝবার ভুল হয়েছিল ; তুমি এখন রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সগৌরবে প্রকাশ পাবে, তার আয়োজন হয়েছে। ছোটবাবুর মুখে সকল কথা শ্রবণ কর।"

উৎফুল্ল-নয়নে ভঞ্জমহাশয়ের মুখপানে আমি চাইলেম, মনের কথা তিনি বোল্লেন, কিম্বা ব্যঙ্গচ্ছলে আমার প্রাণে অধিক বেদনা দিচ্ছেন, সেই তত্ত্বটি জানবার জন্য তাঁর দুটি নয়ন আমি নিরীক্ষণ কোল্লেম। কথা কবার সময় মনের ভাব অনেকটা নয়নে প্রকাশ পায় ; রূপচাঁদ ভঞ্জের নয়নে বদনে ব্যঙ্গের লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না।

আমি যেখানে বোসে ছিলেম, তার দুই হাত তফাতে ফুল্লবদনে ছোটবাবু বোসলেন, ছোটবাবুর পার্শ্বে ভঞ্জবাবু উপবেশন কোল্লেন। ছোটবাবুর মুখে কি আমি শুনবো, আগ্রহে আগ্রহে প্রতীক্ষা কোচ্ছি, চক্ষের জল মুছতে মুছতে পাচিকাঠাকুরাণী সেই সময় এসে দেখা দিলেন।

ছোটবাবু বোল্লেন, "আপনাদের কথাতেই আপনারা ধরা দিয়েছেন, 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে', এই একটা সাধারণ কথা আছে, উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই কথাই

মিলে গেল। হরিদাস চুরি করে নাই, সে কথা সপ্রমাণ করবার সাক্ষী-সাবুদ ছিল না, ধর্মই সাক্ষী হোলেন। রূপসী বোলেছে সেই দিন বৈকালে হরিদাস আমাদের শয়নঘরে প্রবেশ কোরেছিল, রাঙামামী সেই কথার পোষকতা কোরে-ছিলেন। বৈকাল কথাটা মাঝখানে যদি না থাকতো, তা হোলে শীঘ্র শীঘ্র সংশয়-ভঞ্জনের সুবিধা হোতো না। রূপসীকে আমি গতরাত্রে অনেক সওয়াল কোরে-ছিলেম, প্রত্যেক সওয়ালের জবাবেই রূপসী ধরা পোড়েছে। রূপসী ধরা পোড়-লেই রাঙামামীর ধরা পড়া হলো, তাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। আচ্ছা হরিদাস! রূপসী তো তোমার কাজকর্ম কোরে দিত, তোমার নাম হোলেই ভাল কথা বোলতো, হঠাৎ "ভাবান্তরের হেতু কি, তা কি তুমি কিছু বুঝতে পার? কিছু কি অনুমান কোত্তে পার?"

ভাবতে ভাবতে আমি উত্তর কোল্লেম, "পারি কিছু কিছু, কিন্তু সে কথা এখানে বলবার নয়, সকল লোকের সাক্ষাতে সে কথা আমি বোলতে পারবো না। আপনাদের প্রসাদে যদি আমি কলঙ্কমুক্ত হোতে পারি, তা হোলে সময়ান্তরে আপনাকে আমি নির্জনে সেই কথাগুলি শুনিয়ে দিব। বস্তুতঃ রূপসীর ভাবান্তরের বিশিষ্ট কারণ আছে, এই পর্যন্ত এখন আমি বোলে রাখতে পারি।"

দলপতির নয়নে ছোটবাবু নয়ন নিক্ষেপ কোল্লেন, ধীরে ধীরে মস্তক-সঞ্চালন কোরে দলপতি যেন একটু শিউরে উঠলেন, উভয়ের ঐরূপ ভঙ্গী আর দৃষ্টিবিনিময় আমি দর্শন কোল্লেম; বোধ হলো যেন, ঐ দিন প্রাতঃকালেই দলপতির সঙ্গে ছোটবাবুর তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার কথা হয়েছিল, লক্ষণেই সেটি বুঝা গেল; সেই কথা স্মরণেই দলপতির ঐ ভাবে মস্তক-সঞ্চালন।

পাচিকাঠাকুরাণী আমার মুখের দিকে চেয়ে দলপতিকে বোল্লেন "যে কথা রূপসী বলে, সেই কথাটা আমি আর এক রকমে জানি। হরিদাসের কিছু-মাত্র দোষ নাই, চন্দ্রসূর্য সাক্ষী কোরে সে কথা আমি বোলতে পারি।"

রামদাসের দিকে চক্ষু ফিরিয়ে ছোটবাবু আদেশ কোল্লেন, "যাও রামদাস! রূপসীকে এখানে আন!"—আদেশমাত্রেই রূপসীকে আনতে রামদাস অন্দরে গেল। আমি বুঝতে পাল্লেম, আজ আবার নূতন বিচার হবে; এই বিচারের ফলের উপর আমার ভাগ্যফলাফল নির্ভর কোত্তে লাগলো।

রামদাসের সঙ্গে রূপসী এসে উপস্থিত। আমার দিকে রূপসী আর চায় না, কোন দিকেই চায় না, কতই যেন ভালমানুষ, সেইভাবে মাথাটি হেঁট কোরে আপনার পদনখগুলি নিরীক্ষণ কোত্তে লাগলো। দলপতির দিকে ছোট-বাবু একবার নয়ন ইঙ্গিত কোল্লেন, ইঙ্গিতের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম কোরে দলপতি-মহাশয় কেবল রূপসীকে জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগলেন; "রূপসি! হরিদাস যখন সে দিন ছোট বৌ-মার ঘরে প্রবেশ কোরেছিল, তখন বেলা কত?"

রূপসী।—বেলা?—বেলা বৈকাল।

দল।—বৈকাল বোল্লে অনেকটা সময় বুঝায়। বেলা দুই প্রহরের পর সন্ধ্যার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বৈকাল। তার মধ্যে কোন সময় তুমি হরিদাসকে সে ঘরে

যেতে দেখেছিলে, সেইটি আমি জানতে চাই। বৈকালে দেখেছিলে, সে কথায় কিছুই স্থির বুঝা যায় না।

রূপসী।—তবে আমি কি বোলবো ?

দল।—হরিদাসকে যখন তুমি দেখেছিলে, তখন কতখানি বেলা ছিল ?

রূপসী।—বেলা ছিল আন্দাজ চার দণ্ড কি ছয় দণ্ড। আমি যখন—"

এই সময় আমি ভিতরদিকের বারান্দায় বস্ত্রঘর্ষণের খস খস শব্দ শুনতে পেলেম; বুঝতে পাল্লেম, বিচারফল কিরূপ দাঁড়ায়, সেইটি শুনবার জন্য বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা, স্ত্রীলোকেরা মানে, বৌ-মা দুটি সেইখানে এসে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছেন, উৎকণ্ঠিতা হয়ে অঙ্গবস্ত্র সঞ্চালন কোচ্ছেন। ছোটবাবুর কর্ণ অথবা চক্ষু সে দিকে ছিল না, রূপসীর অসমাপ্ত কথায় বাধা দিয়ে তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠলেন, "চারি দণ্ড কি ছয় দণ্ড!—ধন্য জগদীশ!—আচ্ছা রূপসী! ছয় দণ্ড বেলা থাকতে হরিদাস কোথায় ছিল, তা কি তোমার মনে আছে ?"

রূপসী।—কেন থাকবে না ? সেই সময় বৌ-মার ঘর থেকে বেরিয়ে আপনার ঘরে এসেছিল।

ছোট।—হার আর গেলাস তখন হরিদাসের হাতে ছিল, তা কি তুমি দেখেছিলে ?

রূপসী।—তখন দেখি নাই, তার পর এই ঘরে যখন তল্লাস করা হয়, তখন এই ঘরেই বেরিয়েছে।

ছোট।—তা তো জানি, বেরিয়েছে। কিন্তু চার ছ দণ্ড বেলা থাকতে হরিদাস কোথায় ছিল, সে কথা তুমি বলতে পার না ?

রূপসী।—কোথায় আর থাকবে ? যেখানে থাকে, সেইখানেই ছিল।

ছোট।—(পাচিকার প্রতি) আপনি কি জানেন ? রূপসী যে কথা বোলছে, এই কথাই কি সত্য ?

পাচিকা।—চার ছ দণ্ড বেলা থাকতে রূপসী দুবার হরিদাসের ঘরে এসেছিল, হরিদাস তখন ঘরে ছিল না, এই পর্যন্ত আমি জানি, ছোট-বৌমাও তাই জানেন।

ছোট।—হাঁ! ছোট-বৌ সে কথা আমাকে বোলেছে ; সব আমি জানতে পাচ্ছি। রাঙামামী আর রূপসী একপক্ষ। আপনি আর ছোট-বৌ এক পক্ষ। যার বস্তু সে বলে না হরিদাস দোষী, রূপসী বলে হরিদাস চোর, এখনই এ তত্ত্বের মীমাংসা হবে।

আমি সেই সময় দাঁড়িয়ে উঠে দলপতিকে আর ছোটবাবুকে বিনীতভাবে বোল্লেম, আমার ঘরে চোরা জিনিস বেরিয়েছে, আমি দোষী হয়েছি, রূপসীর সাক্ষ্যবাক্যে সেইটিই সপ্রমাণ হোচ্ছে। এই সঙ্গে আর একটি তত্ত্বের মীমাংসা হোক। ঐ যে দেয়ালের গায় কুলুঙ্গী, ঐ কুলুঙ্গী আমি কখন দেখি নাই তক্তা

ঢাকা থাকতো, কি তো কি, ওদিকে আমি চাইতেম না। ঐ কুলুঙ্গীর ভিতর গেলাস-দুটি কি রকমে এসেছিল, সেই কথা আমি—

আর আমারে কিছু বোলতে না দিয়ে গম্ভীরবদনে ছোটবাবু বোল্লেন, "বাস! বাস! তোমাকে আর কিছু বেশী বোলতে হবে না, সমস্তই আমি বুঝতে পেরেছি, গোড়া ফাঁক।"—আমারে এই পর্যন্ত বোলে দলপতির দিকে চেয়ে তিনি একটু নম্রস্বরে বোল্লেন, "দেখুন রূপচাঁদ কাকা, সে দিন আহারের পর বেলা দুই প্রহরের পূর্বে হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলেম, সন্ধ্যার পর ফিরে আসি। রূপসী দেখেছে, বেলা চার দণ্ড কি ছয় দণ্ড থাকতে হরিদাস আমার ঘরে হার চুরি কোরে গিয়েছিল! রূপসীই ফরিয়াদী, রূপসীই সাক্ষী ; যোগের সাক্ষী রাঙামামী। এখন আপনি বিবেচনা করুন, এ মামলার জোর কত।"

ভঞ্জবাবু পূর্ব হোতেই সপ্রতিভ হয়েছিলেন, ছোটবাবুর শেষকথা শ্রবণ কোরে খানিকক্ষণ তিনি অবাক হয়ে থাকলেন। রূপসী সেই অবসরে পালাবার উপক্রম কোচ্ছিল, চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়েছিল ; উগ্রস্বরে ধমক দিয়ে ছোটবাবু বোল্লেন, "যাস কোথা?—দাঁড়া! হরিদাসের নামে তুই নালিশ কোরেছিস, হরিদাসকে চোর বোলে ধোরিয়ে দিয়েছিস, তোর কথার প্রমাণেই হরিদাসকে আমরা কয়েদ কোরে রেখেছি, মোকদ্দমা এখনো চোকে নাই, তুই এখন যাস কোথা?—দাঁড়া! শেষকথাগুলো বোলে যা! কত বেলা থাকতে হরিদাসকে তুই আমার ঘরে প্রবেশ কোত্তে দেখেছিলি, রাঙামামীকে তুই কি কি কথা বোলেছিলি, ভাল কোরে মনে কর, ঠিক ঠিক কথা বল!"

রূপসী কাঁপতে লাগলো ; অধোমুখে জড়িতস্বরে আমতা আমতা কোরে বোল্লে, "আমি তো—বেলা—মামীমা—হরি—বৌ-মা—"

ছোটবাবু তখন আর কি কথাই বা শুনবেন, মোড়লমহাশয়ই বা কি সিদ্ধান্ত কোরবেন? আসল কথা তাঁরা বিলক্ষণ বুঝতে পাল্লেন। পাচিকাঠাকুরাণী চক্ষের জল মার্জন কোরে এক পা এগিয়ে ছোটবাবুকে বোলছিলেন, "রূপসী যখন এই ঘরে আসে, আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে আসতে আসতে—"

"আপনাকে আর কিছু বোলতে হবে না, যা কিছু বোলতে হয়, রূপসী নিজেই বোলবে ; নিজেই বলুক।"—ব্রাহ্মণীকে এই রকমে থামিয়ে ছোটবাবু পুনর্বার রূপসীকে বোলতে লাগলেন, "দেখ রূপসী! ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়ীতে তুই আছিস, তোর বাপ এ বাড়ীতে অনেক দিন ছিল, তোর উপরে আমাদের মায়া বোসেছে, সত্যকথা বোল্লে তোকে আমরা কিছুই বোলবো না, যা যা হয়েছিল, ঠিক ঠিক বল ; কার পরামর্শে তুই হরিদাসকে চোর বোলে সাক্ষ্য দিয়েছিলি, ঠিক ঠিক বল ; মিথ্যাকথা যদি বলিস, পুলিশে চালান হোতে হবে ; মনে রাখিস, সাবধান! মিথ্যাকথা বোল্লে কিছুতেই নিস্তার পাবি নে।"

পুলিশের নাম শুনে দুই হাতে দুই চক্ষু ঢেকে রূপসী কেঁদে ফেল্লে। ছোটবাবু তখন জোরে জোরে আরো অধিক ধমক দিতে লাগলেন। রূপসীর

রোদনে কাহারো হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হলো না। ছোটবাবুর রুক্ষ প্রশ্ন, রুক্ষ আদেশ ; মোড়লবাবুর উগ্র প্রশ্ন উগ্র আদেশ ; মাগীটা তখন ফাঁপোরে পোড়ে গেল ; কি করে! ছোটবাবুর মুখের দিকে একবার চাইলে, মোড়লের দিকেও চাইলে, দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভিতরের বারান্দার দিকেও একবার চেয়ে দেখলে, কোন দিক থেকেই একটি অভয়বাক্য এলো না। প্রথম অভিযোগে যে সকল মুখে হাসি এসেছিল, রূপসীর চক্ষে সে সকল মুখ তখন সক্রোধ বিস্ময়ে রক্তবর্ণ ; ভাবদর্শনে নিরুপায় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে রূপসী তখন বোলতে লাগলো "আমার কোন দোষ নাই—আমি, ঠাকুর দেবতাসাক্ষী—আমি—না, আমার কোন দোষ নাই, এই রকম খাপছাড়া কথা বলে, আর মাঝে মাঝে এ দিক ও দিক চায়। ধৈর্য ধারণ কোত্তে না পেরে চণ্ডলস্বরে ছোটবাবু বোল্লেন, "ভাল কথায় এখনো বোলছি, সত্যকথা বল। তোর যদি কোন দোষ নাই, তবে হরিদাসের বালিশের ভিতর হারছড়াটা কেমন কোরে এসেছিল? দেয়ালের গায়ে ক্ষুদ্র খোপের ভিতর গেলাস-দুটো কেমন কোরে গিয়েছিল? হরিদাস যখন ঘরে ছিল না, তখন হরিদাসের বিছানার মধ্যে হার রেখেছিল কে? গেলাস-দুটো লুকিয়ে রেখেছিল কে?"

জলপূর্ণ চক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে, কড়িকাষ্ঠের দিকে চক্ষু তুলে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে রূপসী উত্তর কোল্লে, "মামী-মা আমাকে—না না—মামী-মা একদিন—ভূত পালাবার পর পায়রা—না—"

ভঞ্জবাবু এই সময় ছোটবাবুকে বোল্লেন, "সহজে কথা পাওয়া যাবে না, পুলিশের একজন লোককে—"

চক্ষের জলে ভেসে, মোড়লবাবুর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পোড়ে, লুটোপুটি খেতে খেতে রূপসীটা চিৎকার কোরে বোলতে লাগলো, "না বাবা!—বলি বাবা! পুলিশ বাবা!—আমি বাবা!—মামী-মা আমাকে বোলেছিল- তাই জন্যে আমি—"

এই পর্যন্ত বোলেই রূপসী আবার কান্না আরম্ভ কোল্লে। মৃদু হাস্য কোরে ছোটবাবু বোল্লেন, "তাই জন্যে তুই কি কোরেছিলি? চুপি চুপি হার চুরি কোরে এই ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলি? গেলাস চুরি কোরে খোপের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলি? কেমন, এই তো তোর কথা? সত্য বল। আমিও সত্য বোলছি, সত্যকথা বোল্লে আমি তোকে পুলিশে দিব না।"

রোদনের সুরের সঙ্গে নূতন রকম সুর মিশিয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে রূপসী বোলতে লাগলো, "আমি নই—আমি নই ; ওগো, আমি তেমন কাজ করি নাই, তেমন কাজ আমি কোত্তেম না—রাঙামামী—"

বোলতে বোলতে রূপসী আবার থেমে গেল। ছোটবাবু বোল্লেন, "রাঙামামী তোরে কি বোলেছিল?—চুরি কোত্তে বোলেছিল? জিনিসগুলি হরিদাসের ঘরে এনে রাখতে বোলেছিল? হরিদাসের মাথায় দোষ চাপাতে বোলেছিল?"

রূপসী উত্তর কোল্লে, "তাই তো আমি কোরেছিলেম, রাঙামামী শিখিয়ে দিয়েছিল, পায়রাবাবু আমাকে টাকা দিবে বোলেছিল, ভাল একটা চাকরী দিবে বোলেছিল, বুঝতে না পেরে—"

"বুঝতে না পেরে সেই লোভে তুই আমার ঘরের জিনিস চুরি কোরেছিলি ? একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে চোর বোলে ধোরিয়ে দিয়েছিলি ? পায়রাবাবু যদি তোকে আমার গলায় ছুরি দিবার পরামর্শ দিত, টাকার লোভে—চাকরীর লোভে তাও তুই দিতিস ?"

ছোটবাবুর এইরূপ তীব্র উক্তিতে দাসীটা কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠে হাতযোড় কোরে বোলতে লাগলো, "না বাবা—না বাবা—না গো বাবা ! তেমন কর্ম আর আমি কোরবো না। তুমি বরং আমার মাথা মুড়িয়ে দেশছাড়া কোরে দাও, পুলিশের হাতে আমারে ধোরিয়ে দিও না। হরিদাস চোর, এমন কথা আর আমি কখনই বোলবো না।"

মোড়লবাবু হাস্য কোল্লেন, ছোটবাবুও হাস্য কোল্লেন ; আমারও হাসি পেয়েছিল, আমি সামলে গেলেম। আর একটা কথা উত্থাপন না কোল্লে সে সময় হাস্য সংবরণ করা যেতো না, সেই জন্য ছোটবাবুকে আমি বোল্লেম, "পায়রা-বাবুকে যদি পাওয়া যায়, এই সময় তাঁকে একবার এইখানে হাজির কোত্তে পাল্লে ভাল হয়। একটা কথা এতদিন আমি আপনাকে বলি নাই, ঘটনার বৈচিত্র্য দেখে অগত্যা আজ সেই কথাটা বোলতে হলো। একদিন রাঙামামীর আমি একটি উপকার কোরেছিলেম, পায়রাবাবুরও উপকার কোরেছিলেম ; রাঙা-মামী আমার মারফতে একদিন একটি ঔষধের মোড়ক পায়রাবাবুর কাছে পাঠিয়ে-ছিলেন, পায়রাবাবুকে তখন আমি পায়রাবাবু বোলে চিনতেম না ; রাঙামামী বোলেছিলেন, সেজোবাবু ; আমিও জেনেছিলেম সেজোবাবু। সেই উপকার আমি কোরেছিলেম ; সেই উপকারের প্রত্যুপকার এই। তাঁদের পরামর্শে, রূপসীর যোগাযোগে আমি চোরদায়ে ধরা পোড়েছিলেম ; ভগবানের কৃপায়, আপনাদের অনুগ্রহে আজ আমি অব্যাহতি পেলেম ;—নিষ্কলঙ্কে অব্যাহতি। এই সময় একবার পায়রাবাবুকে—

ছোটবাবু বোল্লেন, "সময় আছে, পায়রাকে এখন এখানে হাজির করবার দরকার, নাই, ডেকে পাঠালেও পায়রা এখানে আস'ব না। কুকুরের খেলার সময় পায়রা এখানে বিলক্ষণ জব্দ হয়ে গিয়েছে, আমাদের উপর রাগ হয়েছে, সে কি আর এখন এখানে আসতে চায় ? সময় আসুক, পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে রকমে হয়, আর কিছুদিন যদি তুমি এখানে থাকো, স্বচক্ষেই দেখতে পাবে। এখন তুমি একটা ভয়ানক অপকলঙ্ক থেকে মুক্ত হোলে, এইটিই আমাদের সন্তোষের বিষয়।"

করযোড়ে নমস্কার কোরে আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, আপনাদেরও সন্তো-ষের বিষয়, সেই সন্তোষে আমারও কলঙ্কভঞ্জন। নষ্টচন্দ্রদর্শনের কলঙ্ক। আমি তো আমি, নষ্টচন্দ্র দর্শনে দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণেরও 'মণিচোরা' কলঙ্ক হয়ে-

ছিল। আমার এই কলঙ্কভঞ্জনে আমি আপনার কাছে চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকলেম।"

এই কথাগুলি বলবার সময় মোড়লবাবুর দিকে আমি একবার বক্রনয়নে কটাক্ষপাত কোল্লেম। ভাব বুঝতে পেরে মিষ্টবচনে মোড়লবাবু আমাকে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! পুনরায় আমি বোলছি, তুমি কিছু মনে করো না ; সে সব পূর্ব্বকথা ভুলে যাও। মেয়েমহলে এত বড় একটা চক্র, চক্রের ভিতর এত সৃষ্টি, আগে আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই, তোমাকে অনেক অপ্রিয় কথা বোলেছি, তজ্জন্য এখন আমার অনুতাপ আসছে, সে সব কথা তুমি ভুলে যাও ; তোমার কলঙ্কভঞ্জনে আমি সুখী হোলেম।"

প্রসন্নবদনে আমারে ঐ সব কথা বোলে, ছোটবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে রূপ-চাঁদবাবু গাত্রোত্থান কোল্লেন, পুনঃ পুনঃ আত্মীয়তা জানিয়ে সে দিনের মত তিনি বিদায় হয়ে গেলেন। অধোবদনে নেত্রমার্জ্জনা কোত্তে কোত্তে মৃদুপদসঞ্চারে রূপসীদাসী অন্দরে প্রবেশ কোল্লে ; ভিতরবারান্দায় যাঁরা আমার মুক্তিমন্ত্র শ্রবণ কোরেছিলেন, তাঁরাও সেখান থেকে সোরে গেলেন। ঘরে আমরা তিনজনে থাকলেম—ছোটবাবু, আমি আর রামদাস।

আমি কলঙ্কমুক্ত হোলেম, ছোটবাবু আনন্দিত হোলেন, রামদাসের শুষ্ক-মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। খুসী হয়ে রামদাস বোলতে লাগলো, "মন যেন আগেই সব জানতে পারে। এই ঘটনার ভিতর রূপসী ছিল, ঘটনাটা শুনেই আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলেম : রূপসীর সঙ্গে রাঙামামীর যোগ ছিল, তা আমি জানতে পারি নাই। ধর্ম্মের কর্ম্ম ; ধর্ম্ম হরিদাসকে রক্ষা কোল্লেন, মিথ্যা অপবাদ রটনার মূল যারা, ধর্ম্মই তাদের চিনিয়ে দিলেন।"

কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কভাবে ছোটবাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "পায়রাবাবুকে এখানে একবার হাজির কোল্লে ভাল হয়, এ কথাটা তুমি কেন বোলছিলে?"

কারণটা প্রকাশ করি কি না করি। প্রকাশে কোন প্রকার দোষ আছে, এইরূপ আমি ভাবলেম। সত্য যদি আমার অনুমানটি ঠিক না হয়, আমি অপ্রস্তুত হব, প্রথমে আমার মনোমধ্যে সেই ভাবের উদয় হলো ; তার পর আবার বিবেচনা কোল্লেম, আসল কথা আগেই তো আমি ভাঙবো না, নিশ্চিত-রূপে সন্দেহটা দূর হয়ে গেলে মনে কোল্লেম আমি খুলে দিব, স্থূলকথা প্রকাশে দোষ কি? এইরূপ ভেবে আমি উত্তর কোল্লেম "বোধ হয় যেন পায়রা-বাবুকে আমি চিনি। ঐ নামে চিনি না, অন্য নামে চিনতেম, অন্যস্থানে দেখে-ছিলেম, এইরূপ যেন আমার মনে হয়। সত্য সত্য সেই লোকটি এই পায়রাবাবু কি না, একবার পরীক্ষা করবার ইচ্ছা হোচ্ছে ; দেখেছিলেম, মুখামুখি বোসে কথাবার্ত্তা হয় নাই, কিন্তু লোকটির স্বভাব ভাল নয়, নানা প্রমাণে তা আমার জানা হয়েছিল। রাঙামামীর প্রেরিত দূত হয়ে পায়রাবাবুকে যে দিন আমি ঔষধের মোড়কটি দিতে যাই, সে দিন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, চেহারা ভাল কোরে দেখতে পাই নাই, তথাপি যেন পূর্ব্বস্মৃতি একটু একটু জেগে—। তিনি তখন সেজোবাবু ছিলেন, এখন হয়েছেন পায়রাবাবু। যে রাত্রে

আমি ভূত শীকার করি, সে রাত্রে সর্বাঙ্গ বসনাবৃত, রুমালে গালপাটা বাঁধা একটি লোক জনতামধ্যে দর্শন দিয়েছিলেন, বোধ করি, আপনারা সে দিকে ততটা লক্ষ্য রাখেন নাই, আকার-ইঙ্গিতে আমি কিন্তু বুঝেছিলেম, সেই সেজো-বাবু। তার পর একরাত্রে এইখানে তাজপরা মূর্ত্তি ; সেই রাত্রে কুকুরগুলির কৌতুকাবহ ক্রীড়া। আর একবার সেই মূর্তি দর্শন কোল্লে মনের অভিপ্রায় আমি প্রকাশ কোত্তে পারবো, সেইজন্যই বোলেছিলেম, একবার হাজির কোত্তে পাল্লে ভাল হয়।

ছোটবাবু বোল্লেন, "হাজির করা বোধ হয় সহজ হবে না ; নিজে তিনি যে কথা অস্বীকার করেন, সেই কথাই ঠিক। তিনি বোলছিলেন কুকুর তাঁর নয়, কুকুরেরা দেখালে তারা তাঁরই। মিথ্যাকথা ধরা পড়াতে তিনি পালিয়ে গিয়েছেন, কুকুরেরা, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছে, সব আমরা বুঝেছি, তাও তিনি জানতে পেরেছেন। এখন যদি তাঁকে আমরা ডেকে পাঠাই, তা হোলে—"

"রাধা-কৃষ্ণ ! রাধা-কৃষ্ণ ! মহাভারত ! মহাভারত !" ছোটবাবুর কথা সায় হোতে না হোতে ঐরূপ পবিত্র নাম উচ্চারণ কোত্তে কোত্তে দ্রুতপদে একটি স্ত্রীলোক সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। চকিতনয়নে আমি চেয়ে দেখলেম, রাঙামামী ! তাঁর বগলে একটি কাপড়ের পুঁটলী, হাতে একখানি ময়ূরপুচ্ছের পাখা। রোদনের সুরে ছোটবাবুকে তিনি বোলতে লাগলেন, "আর আমার এ বাড়ীতে থাকা হলো না ! কর্তাকে বোলো, জন্মের মত আমি বিদায় হোলেম ! রূপসী বোলে গেল, আমি তারে শিখিয়ে দিয়েছিলেম ; হার চুরি কোরে হরিদাসের বালিশের ভিতর রাখা, সেটা আমারই পরামর্শ, এই কথাই রূপসী বোলেছেঃ তোমরাও তার কথাই বিশ্বাস কোরেছ, তোমাদের মোড়লবাবু—গাঁয়ের লক্ষ্মী ছেড়ে গিয়েছে কি না, গাঁখানা এখন ভাঙা গাঁ, মোড়লবাবুটি সেই ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল ! প্রথম দিন তিনি বোলেছিলেন, হরিদাসকে থানায় দাও ; আজ এসে বোলে গেলেন, হরিদাস ছোকরা রাহুমুক্ত পূর্ণচন্দ্র। দু রাত্রের বিচারের মূল সাক্ষী সর্ব্বনাশী রূপসী। আমি সেই রূপসীর কথায় অপরাধিনী হয়েছি, ধর্ম্মের বিচারে অপরাধিনী হব না, তোমাদের বিচারে আমি ধরা পোড়েছি, এ বাড়ীতে বাস করায় আর আমার মঙ্গল নাই, আমি বাপের বাড়ী চোল্লেম ! আরো, ভেবে দেখ, মিছামিছি, আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তোমাদের বড়বৌটি সে রাত্রে কি কাণ্ডই না কোল্লেন ! ছি ! ছি ! ছি ! কি কেলেঙ্কার ! গৃহস্থ-বাড়ীতে এমন কেলেঙ্কার ভাল কথা নয়, আমাকে নিমিত্তের ভাগী কোরে তোমার দাদাবাবুটি গাঁছাড়া হয়ে গিয়েছেন ; গাঁ-ছাড়া কি দেশছাড়া, তাও ঠিক নাই, কর্তা ফিরে এসে আমাকেই দোষী কোরবেন ; আসতেই আমি চাই নাই, কর্ত্তাই জেদাজেদি কোরে আমাকে বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন। আমার কপাল যখন ভেঙেছে তখনি আমি অকূল পাথারে ডুবেছি ; ভাঙা কপাল নিয়ে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই এখন আমি যেতে পারি। কর্ত্তাকে এই সব কথা বোলো—আমি আমার বাপের বাড়ী চোল্লেম ! সেখানে যদি আশ্রয় না পাই, পথের ভিখারিণী হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোরে বেড়াবো, তোমরা সুখে থাকো।"

চক্ষের জলের সঙ্গে এই সব বিষাদবাক্য বর্ষণ কোত্তে কোত্তে অস্থিরপদে ঘর থেকে বেরিয়ে রাঙামামী সরাসরি সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ কোল্লেন, সঙ্গে সঙ্গে ছোটবাবু ছুটলেন, বাবুর সঙ্গে সঙ্গে রামদাসও ছুটলো ; কি রঙ্গ হয়, দেখবার জন্য আমিও সিঁড়ির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম। ছোটবাবু বিস্তর সাধ্যসাধনা কোল্লেন, "রূপসীর কথায় বিশ্বাস করি নাই" বোলে বিস্তর বুঝালেন, গোঁ ফিরাতে পাল্লেন না। যুবতীমামীর হাত ধোরে টানাটানি কোত্তে পারেন না, পাল্লেনও না ; রাঙামামী কত কি বোকতে বোকতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সে রাত্রের অভিনয় এই পর্য্যন্ত। পরদিন প্রাতঃকালে আমি শুনলেম রূপসী পালিয়ে গিয়েছে। উভয়েই আমার কলঙ্করটনার হেতু ছিল,—রাঙামামী আর রূপসী, উভয়েই পালালো। পায়রাটিও উড়েছে কি আছে, জানতে পারা গেল না। আমার নিজের জন্য যে উদ্বেগ জন্মেছিল, সে উদ্বেগটা দূর হয়ে গেল। নির্ভাবনায় দিবা অবসান। রাত্রিকালে আহারাদি কোরে আমি শয়ন কোল্লেম। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি আমার নিশ্বাস পড়েছিল, সে নিশ্বাসে তীব্র তীব্র অগ্নিকণা ; আজ রাত্রে আমি স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেম। অমরকুমারীকে মনে পোড়লো ; অমরকুমারী সর্ব্বক্ষণ আমার মনের ভিতর জাগেন, এই রাত্রে মনে পোড়লো, কথাটা যেন অকৃতজ্ঞ হৃদয়ের কথা। তা নয়, চোর অপবাদে আমি প্রায় হতবুদ্ধি হয়েছিলেম, মনে যেন কোন বাসনা—কোন ধারণাই ছিল না ; চিন্তাপথে অমরকুমারী আসতেন, চপলার মত চোলে যেতেন ; চপলার সঙ্গে ছুটতে পাত্তেম না ; নিজের ভাবনাতেই আমি আকুল হয়ে থাকতেম। মানুষের স্বভাবই এইরূপ। মানুষ যখন অভাবনীয় মহাবিপদে পতিত হয়, নিজের পরিত্রাণের চিন্তা ভিন্ন তখন তার মনে অন্যচিন্তা স্থান পায় না, নিজের চিন্তাই বলবতী হয়ে থাকে। সকল চিন্তার উপরেই চিন্তা। এই রাত্রে অমরকুমারীকে মনে পোড়লো, অমরকুমারী কোথায় ? এখনো কি ঢাকায় ? ঢাকার শাখা-মোকদ্দমা এখনো কি নিষ্পন্ন হয় নাই ? আমার কথা কি অমরকুমারীর মনে আছে ? লোকে আমারে চোর বোলেছিল, অমরকুমারীর মন কি সে অপবাদের কথা জানতে পেরেছে ? আমার প্রতি কি অমরকুমারীর অশ্রদ্ধা জন্মেছে ? কত দিনে আবার আমি অমরকুমারীকে দেখতে পাব ?—নির্জ্জনে এক জায়গায় বোসে কবে আমি অমরকুমারীকে এই সব কথা জিজ্ঞাসা কোরবো ? অমরকুমারীর নাম উচ্চারণ কোল্লে হৃদয় আমার শীতল হয়, দর্শনের আশায় প্রাণ আমার ব্যাকুল হয় ; অন্য প্রকারে চিত্ত বিচলিত হয় না, এ রাত্রেও বিচলিত হোচ্ছে না। অমরকুমারী ভাল আছেন ; কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটনা হোলে বহুদূরে থেকেও অন্তরঙ্গ লোকের মন সে অমঙ্গল জানতে পারে ; কোন অমঙ্গল ঘটে নাই, অমরকুমারী ভাল আছেন। অমরকুমারী হয় তো মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়েছেন, শান্তিরাম দত্ত হয় তো তাঁরে পুত্রীরূপে আশ্রয় দিয়েছেন। আবার কি রক্তদন্ত অমরকুমারীর উপর উপদ্রব কোরবে ?—না, পারবে না ; দীনবন্ধুবাবু অমরকুমারীর রক্ষার উপায়বিধান কোরবেন, পশুপতিবাবু সে কথা

আমার কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোরেছেন। অমরকুমারীর ভয় নাই। আমার ভয় আছে, ভবসংসারের ভয়নিবারণ ভূতভাবন ভবানীপতি এ ভয় আমার ঘুচাবেন। পুনরায় আমি অমরকুমারীকে দেখতে পাব, দেখতে পেয়ে সুখী হব, পদ্মমুখে হেসে হেসে পদ্মমুখী আমার সঙ্গে সুখের আলাপ কোরবেন, রজনী দেবী আজ আমারে সেই আশা প্রদান কোচ্ছেন। অমরকুমারীকে ভাবতে ভাবতে অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুগণকে হৃদয়াসনে আমি আনয়ন কোল্লেম, হৃদয় জুড়াল ; বিরাম-দায়িনী নিদ্রাদেবী এই সময় আমার প্রতি দয়া কোল্লেন, মঙ্গলময়ী আমাকে হৃদয়ে স্থান দান কোল্লেন। নিদ্রার ক্রোড়ে আমি অচেতন হোলেম।

নিত্য আমার মনে নূতন নূতন আশার সঞ্চার। আশা সর্বত্র সর্বদা সর্বকার্যে ফলবতী হয় না, তথাপি আশা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, এই গুণে আশাকে আমি আদর করি। চোরদায় থেকে মুক্ত হয়ে আমি আশা সলিলে অবগাহন কোল্লেম। সে সময়ে আমার মনে কত রকমের কত আশা খেলা কোত্তে লাগলো, এখন সে সব স্মরণ কোত্তে পাচ্ছিনে। আমার প্রতি ছোটবাবুর যে রকম ভাল-বাসা ছিল বুঝলেম, সে ভালবাসা দিন দিন বেড়ে উঠলো রামদাসের ভক্তিও দিন দিন বাড়তে লাগলো, বৌমা-দুটিও দিন দিন আমারে বেশী আদর কোত্তে লাগলেন, পাচিকার স্নেহ-যত্নও দিন দিন আমি বেশী বেশী অনুভব কোত্তে লাগলেম। এই রকমে আর একমাস কেটে গেল।

কর্ত্তা বাড়ীতে এলেন। এসে তিনি সর্ব্বাগ্রেই শুনলেন, বড়বাবু গৃহত্যাগী। কারণ-জিজ্ঞাসু হয়ে বাড়ীর পরিবারবর্গের কাছে কিরূপ তিনি শুনেছিলেন, সে সব কথা আমি শুনতে পেলেম না, তবু মনে মনে ভেবে নিয়েছিলেম, প্রাণ-গতিবাবু তাঁর রাঙামামীর প্রাণগতি হয়েছিলেন, সেই গৌরবের কথা তিনি শুনতে পান নাই। রাঙামামী বাড়ীতে নাই, এ কথা যখন কর্ত্তা শুনলেন, তখন তার কারণটিও অনলঙ্কৃতভাবে তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল। শুনে তিনি বিমর্ষ হয়ে-ছিলেন ; ক্রমে ক্রমে অপরাপর বিবরণ সমস্তই তিনি শুনলেন। ভূতের ক্রীড়ার অবসান। আমিই সেই অবসানের মূলাধার।

রামদাস এসে আমারে সংবাদ দিলে, ঐ কথা যখন কর্ত্তার কাণে যায়, তখন তিনি এক বিশাল নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরেছিলেন ; জানতে চেয়ে-ছিলেন, কোন দিন কোন সময়ে ভৌতিকলীলার অবসান। দিনক্ষণ ছোটবাবুর একখানি খাতায় লেখা ছিল, ছোটবাবু সেই খাতাখানি কর্ত্তার কাছে ধোরে দিলেন, কর্ত্তা সেই অক্ষরগুলি দর্শন কোরে নিমীলিত-নয়নে ক্ষণকাল যেন কি গুটিকত মন্ত্র জপ কোল্লেন, এক দুই কোরে অঙ্গুলীর পর্ব্ব গণনা কোল্লেন, শেষে আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বিস্মিতবদনে বোল্লেন, "ওঃ ! তবে তো গয়ায় পিণ্ডদানের সপ্তাহপূর্বে সেই ঘটনা। আশ্চর্য্য।"

এই সব কথা রামদাসের মুখে আমি শুনলেম। কর্ত্তার সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ হলো, ভূতের কথা তখনো উঠেছিল, কর্ত্তা কিন্তু আমার সাক্ষাতে তখন "আশ্চর্য্য" বাক্যটি উচ্চারণ কোল্লেন না। ভূতের তিরোধান, বড়বাবুর

অদর্শন, রাঙামামীর পলায়ন, রূপসীর পলায়ন, এই সমস্ত প্রসঙ্গে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, "আমি কেমন আছি" কর্ত্তা সে কথাটি পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করবার সময় পেলেন না। সময় পেলেন না কিম্বা সে কথা জানবার তাঁর দরকার ছিল না, তিনিই তা বোলতে পারেন। গয়ায় গদাধরের পাদ-পদ্মে পিণ্ডদানের অগ্রেও অন্য উপায়ে ভূত উদ্ধার হোতে পারে, কর্ত্তার সেটা বিশ্বাস ছিল না, বন্দুকের গুলীতে আমি ভূত উদ্ধার কোরেছি, সে কথাটা তাঁর ভাল লাগলো না, তাঁর মুখের ভাব দেখে তা আমি বুঝতে পাল্লেম। রাঙামামী পালিয়েছে, রূপসী পালিয়েছে, আমিই তার হেতু, বাড়ীর লোকের মুখে সে কথা তিনি শুনেছিলেন, তাতেও যেন আমার উপর তাঁর একটু একটু মন ভার। মনোভাব গোপনে রেখে গুটিকত মিষ্টবচনে আমারে তিনি তুষ্ট করবার চেষ্টা কোল্লেন, আমি তুষ্ট হোতে পাল্লেম না। তাঁর পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ কোরে আমার দারুণ ভয় হোতে লাগলো।

গৃহিণী ঠাকুরাণী আমার প্রতি সন্তুষ্ট। অজ্ঞাত লোকেরা আমারে যখন এই বাড়ীতে ফেলে দিয়ে যায়, কর্ত্তা তখন আমারে নেশাখোর বিবেচনা কোরে কার্য্যে বাক্যে ঘৃণা প্রকাশ কোরেছিলেন ; গৃহিণী কিন্তু প্রথমাবধিই আমার প্রতি স্নেহবতী। বাড়ীতে যে কাজ আমি কোরেছি, ভূতগুলোকে তাড়িয়েছি, মিথ্যা মিথ্যা চোর অপবাদে অনেক কষ্ট পেয়েছি, সেই সব কথা শ্রবণ কোরে এবার আমার প্রতি গৃহিণীঠাকুরাণীর অধিক আদর, অধিক যত্ন, অধিক স্নেহ আমি অনুভব কোল্লেম। পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হোলে জননীর পুত্রশোক উপস্থিত হয় ; জ্যেষ্ঠপুত্রের অদর্শনে ততটা না হোক গৃহিণী-ঠাকুরাণী শোকসন্তাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আমার প্রতি কোন প্রকার অযত্ন হয় নাই। কর্ত্তা-গিন্নীর প্রত্যাগমনে দিনকতক আমি বরং এক প্রকার সুখেই থাকলেম। কোন প্রকার অপ্রিয়বাক্য আমাকে শুনতে হলো না।

একদিন সন্ধ্যার পর আমি আপনার ঘরে একাকী বোসে আছি, একজোড়া চসমা চক্ষে দিয়ে, হস্তে একগাছি যষ্টিধারণ কোরে কর্ত্তা সেই সময় সেইখানে এসে উপস্থিত হোলেন ; জড়সড় হয়ে বিছানার একধারে আমি সোরে বোসলেম। ঘরের চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত কোত্তে কোত্তে কর্ত্তা আমার কাছে বোসলেন।

কি তাঁর মতলব, কি কথা তিনি বলেন, ভাব বুঝতে না পেরে অবনত-মস্তকে আমি ক্ষণকাল নীরব হয়ে থাকলেম। কর্ত্তা হঠাৎ আমারে সম্বোধন কোরে গম্ভীরস্বরে বোল্লেন, "হরিদাস! পূর্বে কি তুমি বর্ধমানে ছিলে? মোহনলাল ঘোষ নামে একটি বাবুর সঙ্গে সেখানে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল ?" —দুই প্রশ্নেই আমি 'হাঁ' দিলেম। কর্তা বোল্লেন, "সেই মোহনলালবাবু এখন পাটনায় ; তীর্থকর্ম সমাধা কোরে আমি একবার পাটনায় গিয়েছিলেম, মোহন-লালের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি একজন জমীদার, এই জেলায় তাঁর একখানি জমীদারী আছে, মধ্যে মধ্যে কোন কোন বিষয়কার্যের উপলক্ষে পূর্বে পূর্বে তিনি এখানে আসতেন, এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-শুনা

ছিল, আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। পাটনা সহরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে অনেক নূতন নূতন কথা আমি জানতে পেরেছি। তিনি বেশ লোক ; ভাল-লোকের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়, ভগবানের কৃপা হোলে কমলাও প্রসন্না হন, মোহনলালের প্রতি কমলার শুভদৃষ্টি পতিত হয়েছে। ছিলেন তিনি বড়-মানুষ, আছেন তিনি বড়মানুষ, তার উপর সম্প্রতি নূতন সৌভাগ্যের উদয়। তাঁর একটি মাতুলানী সম্প্রতি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েছেন ; তিনি বিধবা ছিলেন, সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই, প্রায় লক্ষ টাকা উপস্বত্বের বিষয় তাঁর অধিকারে ছিল, অন্য কোন নিকট উত্তরাধিকারী না থাকাতে মোহনলালবাবু সেই বিষয়ের অধি-কারী হয়েছেন। কতকগুলি সৎকার্যের পুরস্কারস্বরূপ রাজদরবার থেকে তিনি রাজা উপাধি লাভ কোরেছেন। তাঁর মুখে আমি তোমার অনেক সুখ্যাতি শ্রবণ কোরেছি। ছেলেবুদ্ধিতে তুমি তাঁর অবাধ্য হয়েছিলে, সে জন্য তিনি আপসোস করেন ; অন্তরে কিন্তু তোমার উপর তিনি দয়াশূন্য হন নাই। এই সময় তুমি যদি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পার, তা হোলে তোমার বিশেষ উপকার হোতে পারে। আর দেখ—অবস্থাগতিকে তোমার চরিত্রের প্রতি প্রথমে আমার কিছু সন্দেহ জন্মেছিল, তোমাকে আমি তিরস্কার কোরেছিলাম, সে সব কথা তুমি আর মনে কোরো না ; প্রকৃত অবস্থা আমি বুঝতে পারি নাই ; মোহন-বাবুর মুখে তোমার চরিত্রের প্রশংসা শুনে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। চির-দিন এই বাড়ীতে রেখে তোমাকে আমি পুত্রবৎ পালন করি, এই আমার ইচ্ছা। কিন্তু কিছুদিনের জন্য একবার তোমার পাটনায় যাওয়া আবশ্যক। কি বল ?—যাওয়ার তোমার ইচ্ছা আছে ?"

কথাগুলি আমি শুনলেম, প্রশ্নমাত্রেই কোন উত্তর দিলেম না। আমার মৌন দর্শন কোরে কর্তামহাশয় কি ভাবলেন, কি বুঝলেন, বোলতে পারি না, নীরবে কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে সহসা তিনি গাত্রোত্থান কোল্লেন, ঘর থেকে বেরিয়ে চোল্লেন ; যাবার সময় আমারে বোলে গেলেন, "আচ্ছা, বিবেচনা কর। পাটনায় যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না, বিবেচনা কোরে স্থির কর, কল্য আমি তোমার মুখে এই বিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ কোরবো।"

কর্তা চোলে গেলেন, আমি ভাবতে বোসলেম। মোহনলালবাবু লক্ষ টাকার বিষয় পেয়েছেন, রাজা হয়েছেন, আমারে স্মরণ কোরেছেন, কি ভাব ? অকস্মাৎ আমার প্রতি কেন তিনি এত সদয় ? তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা কাশী-ধামে। প্রথম প্রথম দিনকতক আদর পেয়েছিলেম, শেষকালে আমি তাঁর বিষ-নয়নে পড়ি ; বুদ্ধির দোষে অথবা আত্মবিশ্বাসে আমি তাঁর চরিত্রের গুটি-কতক কথা রমণবাবুর নিকটে ব্যক্ত কোচ্ছিলেম, গোপনে অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই সব কথা শ্রবণ কোরে তিনি আমার উপরে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন, তদবধি তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা-সাক্ষাৎ নাই। এত দিনের পর অকস্মাৎ তিনি আমারে স্মরণ কোরেছেন, ভাব কি ?—আর কি তবে আমার উপর কোন প্রকার উৎ-পীড়ন হবে না ? বৈরিবেষ্টিত হয়ে আর কি আমারে অহরহ যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হবে না ? সমস্ত উপদ্রবই কি থেমে যাবে ? তাই যদি সত্য হয়, থামে যদি

সত্য, তবে তো আমার গ্রহ সুপ্রসন্ন ; কিন্তু তাও কি সম্ভব ? দুরাচার রক্তদন্ত তাঁর প্রধান চেলা ; কেবল চেলা নয়, বেতনভোগী চাকর। মোহনবাবুর পরামর্শে রক্তদন্ত চলে, বলে, কুকার্য করে, আবশ্যক হোলে মানুষ খুন কোত্তেও প্রস্তুত হয়। আমি ভুক্তভোগী, আমার উপর রক্তদন্তের বিষম আক্রোশ ; মোহনবাবু যদি তারে নিবারণ করেন, তা হোলে সংসারে আমি এক প্রকার নিরাপদে থাকতে পারবো। কাশীতে আমি জানতে পেরেছিলেম, মোহনবাবু একখানি পত্র লিখে রক্তদন্তকে আমার উপর দৌরাত্ম্য কোত্তে নিষেধ কোরেছিলেন ; তার পর আবার যে সেই। এখন আমার কি করা কর্তব্য ? পাটনায় গিয়ে মোহনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ; পাটনায় আমার পরিচিত লোক কেহই নাই, কায়দায় পেয়ে মোহনবাবু যদি আমারে আটক কোরে ফেলেন, তা হোলে আমি কি উপায়ে রক্ষা পাব ? এ দিকে আমার অনেক কাজ বাকী, দুই জেলায় দুই মোকদ্দমা দায়ের, অমরকুমারীর উদ্ধারসাধন আমারই উদযোগ-সাপেক্ষ, কি করি ?—যাই কি না যাই ? প্রবলপক্ষের মনস্তুষ্টিসাধন করাতে উপকার আছে ; মোহনবাবু প্রবল, আমি দুর্বল, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমার অসাধ্য। তিনি কুপিত হোলে আমার বিস্তর অনিষ্ট কোত্তে পারেন ; তিনি প্রসন্ন থাকলে সংসারে সর্বদা আমারে শঙ্কিত থাকতে হয় না। এই সকল বিবেচনা কোরে, কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকলেও অবশেষে স্থির কোল্লেম, পাটনায় একবার যাওয়াই কর্তব্য।

কর্তব্য স্থির কোরে বোসে আছি, ছোটবাবু এলেন। কর্তব্য স্থির হোলেও চিত্ত তখন আমার চিন্তাশূন্য ছিল না। আমারে চিন্তানিমগ্ন দর্শন কোরে উপবেশনের অগ্রেই ছোটবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি ভাবছো হরিদাস ? যখনি আমি তোমাকে দেখি, তখনি তুমি বিমর্ষ থাকো ; কত রকম আমোদজনক ঘটনা হয়, কত রকম আনন্দোৎসব উপস্থিত হয়, সে দিকে তোমার মন থাকে না, সর্বদাই তুমি যেন কি ভাব ; এত অল্প বয়সে এত ভাবনা কি তোমার ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আপনি কখন আসবেন, তাই আমি ভাবছিলেম। আপনি বসুন কতকগুলি কথা আছে।" ছোটবাবু বোসলেন। প্রথমেই আমি কর্তার কথা তুল্লেম, কর্তা আমারে পাটনায় যেতে অনুরোধ কোচ্ছেন ; পাটনায় একটি বাবু আছেন, সেই বাবুর সঙ্গে পূর্বে আমার জানা-শুনা ছিল ; আপনাদের বাড়ীতে আমি আছি, গল্প প্রসঙ্গে কর্তার মুখে সেই কথা জানতে পেরে সেই বাবুটি আমারে স্মরণ কোরেছেন, পাটনায় যেতে বোলেছেন ; আমিও এক রকম স্থির কোরেছি, যাওয়া কর্তব্য। আপনি কিরূপ পরামর্শ দেন ?"

ছোটবাবু বোল্লেন, "তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয় না। পরামর্শ কি দিব ? পাটনার বাবু, কি প্রকৃতির বাবু, তোমার সঙ্গে তাঁর কিরূপ আলাপ, তাঁর কাছে তোমার কিরূপ প্রয়োজন, সে সব না জানলে কি প্রকারে পরামর্শ দেওয়া যায় ?" সংক্ষেপে আমি গুটিকতক কথা বোল্লেম, মোহনবাবু আমার ভয়ের কারণ, সে কথা বোল্লেম না, সাক্ষাৎ কোত্তে পাল্লে কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনা আছে, কেবল এই পর্যন্তই ছোটবাবুকে আমি জানালেম। তিনি তখন

একটু চিন্তা কোরে বোল্লেন, "কর্তা যদি ইচ্ছা করেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে একবার যেতে পার, কিন্তু বেশী দিন সেখানে থেকো না, শীঘ্র আবার ফিরে এসো। কবে যাবে স্থির কোরেছ ?"

আমি তখন আর একখানা ভাবছিলেম, "কবে যাবে স্থির কোরেছ" এই প্রশ্নের উত্তরের ভূমিকায় আমি বোল্লেম, 'স্থির এখনো কিছুই করি নাই, আপনার অভিপ্রায় জানবার জন্য অপেক্ষা কোচ্ছিলেম। এখানে এসে আমি অনেক রকম কাজ করেছি। অনেক রকম তাজ্জব ব্যাপার দর্শন কোরেছি, অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কথাও শ্রবণ কোরেছি, একটি কাজ আমার বাকী আছে।" —ছোটবাবু জিজ্ঞাসা "কোল্লেন," কোন কার্য বাকী ?"

সেই পূর্ব্বকথাই আমি পুনরুল্লেখ কোল্লেম,—পায়রাবাবুকে একবার এই বাড়ীতে হাজির করা। কি কারণে হাজির করা প্রয়োজন, স্পষ্ট কিছু ভাঙলেম না, কেবল এইমাত্র বোল্লেম, "ভূতের ব্যাপারের সঙ্গে পায়রাবাবুর অতি নিকট সম্বন্ধ। ভূতগুলি উ-ধার হয়ে গিয়েছে, সেই দুঃখে পায়রাবাবু ম্রিয়মাণ আছেন ; তাঁরে গুটিকত প্রবোধ বাক্য—"

হাস্য কোরে ছোটবাবু বোল্লেন, "পায়রাকে প্রবোধ দিয়ে তুমি ঠাণ্ডা কোত্তে পারবে, এমন আমার বিশ্বাস হয় না। পায়রাবাবুটি তুখোড় লোক, বেশী চালাক, সকল রকমে সকল দিকেই তার বুদ্ধি খেলে : অল্পদিনে সে সব আমি বুঝতে পেরেছি। পায়রা এ দেশে ছিল না, নূতন এসেছে, সে কথা তুমি শুনেছ : নূতন লোকের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা না কোল্লে চরিত্র ধরা যায় না, তথাপি বিনা ঘনিষ্ঠতায় পায়রাকে আমি এক প্রকার চিনে নিয়েছি। পায়রার একটা রোগ আছে ; ঔষধের মোড়ক নিয়ে তুমি—"

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে রামদাস সেই সময় সংবাদ দিলে, "নূতন বিপদ উপস্থিত ! পুলিশের লোক এসেছে ! খুনের খবর এনেছে ! আমাদের বাড়ীতে যিনি আগে আগে ঠাকুরপূজা কোত্তেন, সেই বামুনঠাকুর সঙ্গে আছেন। চাতালপুর গ্রামের এক মাঠের ধারে একটা গাছতলায় মেয়েমানুষ খুন ! এই রকম কথা তারা বোলছে, উপরে আসতে চাচ্ছে, আমি তাদের কি বোলবো ?"

খুনের খবর শুনে চমকিতভাবে ছোটবাবু বোল্লেন, "কোথায় মাঠের ধারে খুন হয়েছে, আমাদের বাড়ীতে তার কি ? আচ্ছা, দাঁড়াতে বল গে, আমি যাচ্ছি।"

রামদাস নেমে গেল। একটু পরে একটি জামা গায়ে দিয়ে ছোটবাবু উপর থেকে নামলেন, অনিশ্চিত ভাবনায় কৌতূহলবশে আমিও সঙ্গে গেলেম ;— গিয়ে দেখি, একজন ফাঁড়ীদার ব্রাহ্মণ, আর দুই জন বরকন্দাজ, সঙ্গে একজন ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্যকে সম্বোধন কোরে ছোটবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি মথুর কাকা ? ব্যাপার কি ? আপনার সঙ্গে পুলিশ কেন ?"

ছোটবাবু বোল্লেন মথুর কাকা, আমি শুনলেম মথুর কাকা, এখন মথুর কাকা কি উত্তর দেন, সেই কথা শুনবার জন্য তাঁর মুখ-পানে আমি চেয়ে থাকলেম। মথুর কাকা একবার ফাঁড়ীদারের মুখের দিকে চাইলেন, ফাঁড়ীদার বোলতে লাগলো, "চাতালপুরের এক বাগানের এক বৃক্ষতলে একটি স্ত্রীলোকের

মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, গলায় দড়ী কিম্বা সর্পাঘাত কিম্বা বিষখাওয়া, তার কোন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। কেহ তাকে খুন কোরেছে কি না, তাও প্রকাশ হোচ্ছে না, কে সেই স্ত্রীলোক, কোথা থেকে এসেছিল, সে কথাও কেহ বোলতে পারে না। গ্রামের কেহ নয়; গ্রামের লোকেরা চিনতে পাচ্ছিল না, দুএকজন বোলেছিল, তিন চারি দিন গ্রামের রাস্তার ধারে সেই স্ত্রীলোককে তারা দেখেছে। আর কোন বিশেষ কথা তার কিছুই জানে না। আমি তদারক কোচ্ছিলেম. এমন সময় এই ব্রাহ্মণঠাকুর সেইখানে উপস্থিত হোলেন, লাশ দেখে ইনি চিনতে পাল্লেন। এঁরি মুখে আমি শুনলেম, সেই স্ত্রীলোক আপনাদের বাড়ীতে ছিল, তার নাম রাধারাণী। কি প্রকারে মোরেছে, চাতালপুরে কেন গিয়েছিল, এই সব কথা আমাদের জানা দরকার। আপনাকে একবার চাতালপুরে যেতে হবে, মোড়ল-চৌকিদার মোতায়েন রেখে আপনার কাছে আমি এসেছি।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা। ফাঁড়ীদারকে কেহ বোসতে বোল্লে না, আমরাও কেহ বোসলেম না, বরকন্দাজেরা এক এক লাঠি ঘাড়ে কোরে প্রাচীর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। ফাঁড়ীদারের কথায় ছোটবাবু বোল্লেন, "সে সব কাজ তোমাদের, আমাকে কেন চাতালপুরে নিয়ে যাবার আকিঞ্চন পাও? ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিনতে পেরেছেন, নাম রাধারাণী, সে কথাও বোলেছেন, এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি। সে স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ীর লোক নয়, কিছুদিন আমাদের বাড়ীতে ছিল, একমাসের বেশী হলো আপন ইচ্ছায় চোলে গিয়েছিল; তার পর কোথায় কি হয়েছে আমরা তার কি জানি? কোথায় কি রকমে মোরেছে. সরকারী ডাক্তারেরা পরীক্ষা কোল্লেই জানতে পারবে। সনাক্ত হয়ে গিয়েছে. তবে আর আমাকে কেন কষ্ট দিতে চাও? তোমরাই বা কষ্ট পেয়ে এতদূর কেন এসেছ? স্বস্থানে ফিরে যাও; ঐরূপ অপঘাতমৃত্যুর তদারকে যেমন যেমন তোমাদের কর্ত্তব্য, আইন যেমন বলে, তাই তোমরা কর গে; আমার সেখানে যাবার কোন দরকার নাই; আমি যাব না।"

পুলিশের লোক প্রায়ই জুলুমবাজ হয়; ভদ্রলোককে অনর্থক কষ্ট দিয়ে ষটচক্র সৃজন কোরে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা পায়। এই ফাঁড়ীদারটী কিছু ভালমানুষ ছিল; বোধ হয় নূতন লোক, পুলিশের কায়দা দস্তুরমত শিক্ষা করে নাই। ছোটবাবুর কাটা কাটা কথাগুলি শ্রবণ কোরে সে লোক আর কোন মারপেঁচের কথা বোল্লে না, আট গণ্ডা পয়সা রাহাখরচ গ্রহণ কোরে অল্পে অল্পে বিদায় হয়ে গেল। কায়দার মধ্যে কেবল এইটুকু দেখলেম, মথুর ভট্টাচার্য্যকে ছেড়ে গেল না।

আমরা আবার উপরে গিয়ে উঠলেম; যে সব কথা শুনে এলেম, অনুচ্চস্বরে তারই আলোচনা কোত্তে লাগলেম। রামদাসকে সাবধান কোরে ছোটবাবু বোলে দিলেন, খবরদার, কর্ত্তা যেন এ সব কথা না শোনেন। বাড়ীর মেয়েরাও যেন এ সব কথা শুনতে না পায়। কাহারো কাছে তুমি এ গল্প কোরো না।"

স্বীকার কোরে রামদাস আপন কর্ম্মে গেল, ছোটবাবুতে আমাতে নির্জ্জনে থাকলেম। ছোটবাবু বোল্লেন, "দেখ হরিদাস, কোথাকার পাপ কোথায়? পাপের

প্রায়শ্চিত্ত এই রকমেই হয়। রাঙামামী মোরেছে, আত্মঘাতিনী হয়েছে কিম্বা কেহ তারে খুন কোরে মাঠের ধারে ফেলে গিয়েছে, ঠিক জানা যাচ্ছে না বটে ; কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত ঠিক হয়েছে। যে রকম ঢলাঢলি আরম্ভ হয়েছিল, আমি তাতে ভয় পেয়েছিলেম ; বাড়ীর ভিতর পাছে কোন কাণ্ড ঘটে, বাড়ীর ভিতর পাছে খুনোখুনী হয়, সেই ভয়ে সদাই আমি শঙ্কিত থাকতেম। ভূতের কাণ্ড গেল, দাদার কাণ্ড গেল, তার পর তোমার নামে চোর অপবাদ রটলো, আর কিছু দিন থাকলে আরো যে কত রকম কি কারখানা হোতো, কে বোলতে পারে? ভালোয় ভালোয় আপনাআপনি বিদায় হয়ে গিয়েছিল, জন্মের মত পৃথিবী হোতে বিদায় হয়ে গেল, এক রকম হলো ভাল। সকল পাপের যদি এই রকম হাতে হাতে প্রায়শ্চিত্ত হয়, তা হোলে সংসারের পাপ-তাপ অনেকটা কম হয়ে আসে।"

ফাঁড়ীদারের কথা আমি শুনেছি, ছোটবাবুর কথাও শুনলেম, কিন্তু ছোট-বাবুর শেষের কথাগুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনলেম না। নূতন একটা কল্পনা মনোমধ্যে সমুদিত হয়ে আমারে কিছু অন্যমনস্ক কোরে দিয়েছিল। ছোটবাবুর কথা সমাপ্ত হলো কিম্বা আরও কিছু তাঁর বক্তব্য বাকী থাকলো, সে দিকে লক্ষ্য না রেখে হঠাৎ আমি মন্তব্য দিলেম, "হাতে হাতে প্রায়শ্চিত্ত হওয়া খুব ভাল। আর একজন যদি এই সময় একটা প্রায়শ্চিত্ত করে, তা হোলে আমার একটা মনস্কামনা পূর্ণ হয়, মস্ত একটা সন্দেহও জন্মে রয়েছে, সেটাও দূর হয়ে যায়।"

তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ হয়ে সকৌতুকে ছোটবাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আবার কার কি রকম প্রায়শ্চিত্ত হরিদাস? যার পাপ, সে তো আপনার জীবন দিয়ে মহাপ্রায়শ্চিত্ত কোরে গেল, তবে আর তুমি অন্য কোন পাপীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বোলছ?"

আমি একটু ভাবলেম, সহসা যদি অকপটে মনের কথা প্রকাশ করি, তা হোলে হয় তো উপহাসেই ছোটবাবু আমার কথাটা উড়িয়ে দিবেন, একটু বাঁধুনী রাখা আবশ্যক। মনে মনে বন্ধনের সূত্র কল্পনা কোরে ছোটবাবুকে আমি বোল্লেম, "আপনাদের গ্রামে অনেক রকম তামাসা আমি দেখলেম, তামাসা-দর্শনে প্রায় সকল লোকেই কৌতুক অনুভব করে, আমোদ অনুভব করে, যারা তামাসা দেখায়, তাদের অনেকের রঙ্গভঙ্গ দর্শনে প্রায় সকলেই অবিচ্ছেদে হাস্য করে ; এখানকার তামাসায় আমি দুই প্রকার দেখলেম। কতক তামাসায় হাস্যের উদয় হয়, কতক তামাসায় কষ্ট অনুভূত হয়ে থাকে। তামাসগীর লোক এখানে অনেক আছে বোধ হয়। একটি কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই ; এ গ্রামে কি দুই একজন বহুরূপী পাওয়া যায়? বহুরূপীদের তামাসা বড় চমৎকার। একটি বহুরূপীর ক্রীড়াদর্শনে আমার অভিলাষ জন্মেছে, আছে কি কোন বহুরূপী?"

একদৃষ্টে আমার নয়ন নিরীক্ষণ কোরে ছোটবাবু বোল্লেন, "এ যে দেখছি তোমার অদ্ভুত অভিলাষ। সকল জায়গায় কি বহুরূপী থাকে? সকল

পল্লীগ্রামে কি বহুরূপী পাওয়া যায়? আমাদের গ্রামে বহুরূপী নাই; তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটা মেলার স্থলে দুই একজন বহুরূপী আসে। মধ্যে মধ্যে কখন কখন গৃহস্থ লোকের বাড়ীতেও এক একজন বহুরূপী দেখা দেয়, এই পর্য্যন্ত আমি জানি। এ গ্রামে বহুরূপী নাই।”

আবার আমি একটু ভাবলেম; ভেবে ভেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “বহুরূপী-দের কোনপ্রকার সজ্জা এখানকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কাহারো নিকটে পাওয়া যেতে পারে না?”—ছোটবাবু বোল্লেন, “যেখানে বহুরূপী নাই, সেখানে বহুরূপীর সাজ পাওয়া অসম্ভব; তবে এখানে যাত্রার দল আছে, তাদের কোন রকম সাজ পেলে যদি তোমার কোন কাজে লাগে, তা বরং যোগাড় করা যেতে পারে।”

না পাওয়ার চেয়ে বরং তা পাওয়াও ভাল, এই বিবেচনা কোরে আমি বোল্লেম, “যাত্রার দলে যারা মুনিগোঁসাই সাজে, তাদের সেই রকমের একটা সাজ পেলে একটি লোকের উপকার হয়। আপনি যদি দয়া কোরে সেই সাজ আমারে আনিয়ে দেন, তা হোলে আমি উপকৃত হই।”

ছোটবাবু সম্মত হোলেন। আর তখন আমাদের বেশী কথা কিছু হলো না। ছোটবাবু অন্দরে প্রবেশ কোল্লেন। উপর থেকে নেমে গিয়ে আমি রামদাসের অন্বেষণ কোল্লেম, রামদাসকে পেলেম, চুপি চুপি তারে একটি পরামর্শ দিলেম। যেন একটু ভয় পেয়ে রামদাস বোল্লে, “আমায় ও কথা কেন বল? সে কি আমার কর্ম্ম? আমি পারব না। তুমি যদি নিজে পার, চেষ্টা কোরে দেখ; আমি বরং তোমার সঙ্গে থাকবো।

রামদাসের শঙ্কিতভাব অনুভব কোরে, মনে মনে হেসে পুনর্ব্বার আমি তারে বোল্লেম “ভয় পাও কেন? সরপট তোমারে কোন কাজ কোত্তে হবে না, সে বাড়ীতে যেতে হবে না, পল্লীর অপর কোন লোককে জিজ্ঞাসা কোরে শুধু কেবল জেনে আসবে সেই লোক এখন এ গ্রামে আছে কি না? সর্ব্বদা বাড়ীতে থাকে কি না? সর্ব্বদা যদি না থাকে, কোন সময় তার দেখা পাওয়া যায়, শুধু কেবল সেইটুকু জেনে আসতে পার আমার কাজ হবে।”

গুণগুণস্বরে আপন মনে কিয়ৎক্ষণ গুঞ্জন কোরে রামদাস শেষকালে বোল্লে, “তোমার খেলা তুমিই বুঝতে পার, খেলার ভাল-মন্দ তুমিই জানো; আমি তোমাদের হুকুমের চাকর, কাজেই আমাকে সব রকম হুকুম তামিল কোত্তে হয়। এখন তুমি যে কথা বোল্লে, সে কাজটা হয় তো আমি পারবো। রাত্রের কথা নয়, প্রভাত হোক, আমি একবার চেষ্টা কোরে দেখে আসবো।”

কার্য্যসিদ্ধির আভাষ পেয়ে পুনর্ব্বার আমি বোল্লেম, “প্রভাতে হোক, বেলা এক প্রহরে হোক, দ্বিপ্রহরে হোক, সন্ধ্যার মধ্যে সংবাদটা পেলেই আমি যথা-কর্ত্তব্য অবধারণ কোত্তে পারবো; কেবল কথাটিমাত্র এনে দিবে, এই তোমার কাজ।”

কি একটু চিন্তা কোরে রামদাস বোল্লে, “ঐ পর্য্যন্ত আমার কাজ, তা আমি বুঝলেম, ভাবতে কথাটা খুব সহজ বটে, কিন্তু আমার মনে যেন কোন প্রকার

গোলমাল ঠেকছে। দেখ বাপু, আর যেন কিছু বাড়াবাড়ি করো না ; যা করবার, ঢের কোরেছ, তার উপর আর কিছু বেশী হোলে ঢলাঢলি আরো বেশী হবে, আমি কেবল সেই ভয় করি, যে সব কাজ তুমি কোরেছ, এক রকম মানিয়ে গিয়েছে ; সে সময় কর্তা বাড়িতে ছিলেন না, ততটা গোলমাল হয় নাই ; কর্তা এখন ফিরে এসেছেন, সাবধান হয়ে কাজ কোরো। খবরটা আমি তোমাকে এনে দিব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

রামদাসের তখন বাড়ির ভিতর কাজ ছিল, রামদাস অন্দরে গেল, আমি আপনার ঘরে গিয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হয়ে বোসলেম। রাত্রের কার্য এই পর্যন্ত। আহারান্তে ঘরের দরজা বন্ধ কোরে আমি শয়ন কোল্লেম। যেটি আমার নূতন সংকল্প, মনে মনে খানিকক্ষণ সেইটি আলোচনা কোরে, পাকিয়ে রেখে, ভবিষ্যৎ কর্তব্য অবধারণ কোত্তে লাগলেম। বাধা পোড়ে গেল। আমার গৃহদ্বারে দুই তিনবার জোরে জোরে করাঘাত। শুয়ে শুয়েই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, কে ?—উত্তর পেলেম না। সদরদরজা বন্ধ হয়েছিল, বাহিরের লোক আসবে না ; রূপসী পালিয়ে গিয়েছে, রূপসীর ভয়ও ছিল না ; আমি উঠলেম। পুনর্বার দ্বারে করাঘাত। ধীরে ধীরে দরজা খুলে আমি পাশ কাটিয়ে সোরে দাঁড়ালেম ; গৃহের দীপ তখনো নির্বাপিত হয় নাই ; সম্মুখে দেখি—কর্তা।

অকস্মাৎ আমার তখন কেমন একটা আতঙ্ক এলো। এত রাত্রে কর্তা এ ঘরে কেন ? রামদাস বুঝি আমার পরামর্শের কথা কর্তাকে কিছু জানিয়েছে, তাই শুনে কর্তা বুঝি আমারে ধমক দিতে এসেছেন, এইরূপ ভাবনাই আমার আতঙ্কের কারণ। শেষে বুঝলেম ; তা নয় ; বিছানার উপর উপবিষ্ট হয়ে, নিকটে আমারে ডেকে, প্রফুল্লবদনে কর্তা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে কথা মনে আছে হরিদাস ? বিবেচনা কোরে কিরূপ স্থির কোরেছ ? পাটনায় যেতে ইচ্ছা হয় ? মোহনলালবাবু বেশ লোক, তিনি একবার তোমাকে দেখতে চান ; দেখা কোল্লে বোধ করি তোমার পক্ষে ভাল হবে ; তুমি তোমার নিজের জাতিকুল জানতে না, এখনো জান না ; কিন্তু মোহনলালবাবু বোলেছেন, তিনি তোমার জাতিকুল অবগত আছেন। কথার ভাবে আমি বুঝেছি, তুমি তাঁর স্বজাতীয় কোন ভদ্রলোকের সন্তান। তার সময় এখন খুব ভাল, তোমার প্রতিও তিনি বেশ সদয়, এই সময় একবার যদি তুমি দেখা কর, খুব ভালই হবে, এইরূপ আমি বুঝতে পাচ্ছি। যাওয়া যদি তোমার মত হয়, বিলম্ব কারো না, বেশী দিন আর তিনি পাটনায় থাকবেন না ; এক মাসের ভিতরেই তিনি শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা কারবেন, এইরূপ আমি শুনে এসেছি। কেন আমি তোমাকে এত কথা বোলছি, তা তুমি বুঝতে পেরেছ ? তোমার উপকার হোলে, আমি সন্তুষ্ট হব, সেই জন্যই বলা। সন্ধ্যাকালে আমি পাঁজি দেখেছি, আগামী কল্য শুভদিন, কল্যই তুমি যাত্রা কোত্তে পার। রাহাখরচ ইত্যাদি যাহা কিছু প্রয়োজন, সব আমি দিব, কল্যই তুমি যাও, এই আমার ইচ্ছা।"

কর্তার ইচ্ছায় আমার একটা বড় ইচ্ছা চরিতার্থ করবার বাধা পড়ে, তাই

ভেবে, বিনীতভাবে মৃদুস্বরে আমি বোল্লেম, আজ্ঞা! আপনার ইচ্ছার অবাধ্য হওয়া আমার উচিত হয় না, কিন্তু এখানে আমার একটি বিশেষ কার্য আছে. সপ্তাহের মধ্যে সেকার্য আমি সিদ্ধ কোত্তেও পারবো, এমন আশা রাখি ; অনুগ্রহ পূর্বক সপ্তাহের পরে আপনি আর একটি শুভদিন স্থির কোরে দিবেন, সেই দিনেই আমি রওনা হবো। মোহনলালবাবু একমাস পাটনায় থাকবেন, তার মধ্যে আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখা কোত্তে পারবো, তাতে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

কর্তা বোল্লেন, "আচ্ছা, তবে তাই কোরো, কিন্তু দেখো, বেশী বিলম্ব যেন না হয়। এখানকার কাজটা সপ্তাহের অগ্রে যাতে সমাধা কোত্তে পার, চেষ্টা কোরো।"

এইরূপ উপদেশ দিয়ে কর্তা উঠে গেলেন, আবার আমি দরজা বন্ধ কোরে শয়ন কোল্লেম। পাটনায় আমি যাব, ভেবে আমার ভয় হলো কি আহ্লাদ হলো, নিজেই যেন আমি সে ভাবটা স্থির কোত্তে পাল্লেম না। মোহনলালবাবু বর্ধমানে আমার প্রতি যেরূপ সদয়ভাব—নির্দয়ভাব দেখিয়েছিলেন, স্মরণ হলো ; ভেলুয়া-চটিতে গৃহদাহের সময় তিনি আমারে যেরূপ আদর কোরেছিলেন, স্মরণ হলো ; বারাণসীধামে প্রথম দর্শনে তাঁর প্রসন্নতা আমি লাভ কোরেছিলেম, তার পর অপ্রসন্নতার আক্রমণ, সে কথাও স্মরণ হলো। এখন পাটনায় গিয়ে আদর পাব কিম্বা তাঁর রক্তচক্ষু দর্শন কোরবো, নিশ্চয়তা নাই, এইরূপ আমি ভাবলেম। রক্তচক্ষু দর্শন সত্যই যদি আমার ভাগ্যে ঘটে, তাতেই বা এত কি ভয়? মোহনবাবু মনুষ্য, রাক্ষস নন, রাগের বশে টপ কোরে তিনি আমারে খেয়ে ফেলবেন না ; যদি বেগতিক দেখি, পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা কোত্তে পারবো। পাটনায় আমি যাব।—মোহনবাবু যেতে বোলেছেন, সেই জন্যই আমারে যেতে হবে, কর্তা যদি এমন কথা বোলতেন, তা হোলে আমি যেতেম না। আজ রাত্রে যে কথা শুনলেম, সেই কথার উপরেই আমার ভবিষ্যৎ আশার প্রধান একটি অংশ নির্ভর কোচ্ছে, সেই জন্যই আমি যাব।

কর্তা বোলে গেলেন, মোহনলালবাবু বোলেছেন, আমি তাঁর স্বজাতি ; এ কথা যদি সত্য হয়, তা হোলে মোহনলালবাবু আমার অপরাপর পরিচয়ও অবশ্য জানেন। যে পরিচয় আমি জন্মাবধি জানি না, সেই পরিচয় আমি তাঁর মুখে শুনতে পাব ; মনে একটি উল্লাস জন্মিল ; সেই জন্যই আমি যাব।

একরকম সংকল্প আমি স্থির কোল্লেম, নিশ্চিন্ত হোলেম না ; মনে আবার একটা তর্ক উঠলো। পাটনায় আমার কথাটা কেন উঠেছিল? কে তুলেছিলেন? মোহনবাবু কিম্বা জয়শঙ্করবাবু? মোহনবাবু হঠাৎ একজন অপর লোকের কাছে আমার কথা তুলবেন, এমন তো সম্ভব বোধ হয় না ; জয়শঙ্করবাবুই তুলে থাকবেন ; কিন্তু কেন? আবার মনটা আমার অন্যদিকে ঘুরে গেল ; যে সন্দেহটা মনে মনে চাপা ছিল, সেই সন্দেহ আবার জাগলো। অজ্ঞান অবস্থায় ত্রিপুরা জেলায় যারা আমারে ফেলে রেখে গিয়েছে কর্তা সে কথা অস্বীকার কোল্লেও অন্য সূত্রে সে তত্ত্ব আমি জেনেছি। সূত্র কিছু না থাকলেও

তাই-ই আমি জানতেম ; কেন না অচেতন লোকেরা নিজের চেষ্টায় হেঁটে আসতে পারে না। আমি অচেতন ছিলেম, সেই অবস্থায় জয়শঙ্করবাবু এখানে আমারে দেখেছেন ; তাতেই বুঝা গিয়েছে, আমার সঙ্গে অন্য লোক ছিল, আমারে এখানে রেখেই তারা পালিয়েছে। কারা তারা, প্রথমেই আমি অনুমান কোরেছিলেম। বনের ভিতর যারা আমারে ধোরে রেখেছিল, দুশ্চারিণী নবীন-কালী যাদের সঙ্গিনী, তারাই ঢাকা থেকে ত্রিপুরায় আমারে এনেছিল, তাতে আর সন্দেহ নাই। তারা যদি নূতন লোক হতো, আমার বিপক্ষদলের সঙ্গে তাদের যদি কোন সংস্রব না থাকতো, তা হোলে এমন ঘটতো না। পূর্বেই আমি স্থির কোরেছিলেম, রক্তদন্তের চক্রের সঙ্গে সঙ্গে নানা দিকে নানা লোক ঘোরে। ঢাকায় যারা আমারে ধোরেছিল, তারা যে রক্তদন্তের লোক কিম্বা রক্তদন্তের সুশিক্ষিত গুপ্তচরের সহকারী লোক, সেটা নিঃসন্দেহ। রক্তদন্ত মোহনবাবুর পেটাও লোক। রক্তদন্ত অথবা রক্তদন্তের চরেরা আমার সম্বন্ধে যে সব কাজ করে, মোহনবাবু অবশ্য সে সব কাজের খবর পান। জয়শঙ্করবাবু ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় মোহনবাবুর কাছে আমার নাম কোরেছিলেন, মোহনবাবু অমনি সদয় হয়ে আমারে দেখতে চেয়েছেন, পাটনায় আমারে যেতে বোলেছেন, কথা কিছু আশ্চর্য্য বটে! কথার ভিতর কিছু গোলমাল আছে, তাও যেন আমি বুঝতে পাচ্ছি, তবুও আমি যাব। কোন গতিকে মোহনবাবুর মুখে আমি আমার নিজের পরিচয়টা যদি জেনে নিতে পারি, তা হোলে আমার একটা বিশেষ উপকার হবে, বুকের উপর থেকে ভারী একটা বোঝা নেমে যাবে ; অজ্ঞ পরিচয় সর্বদা আমারে অপর লোকের কাছে সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়, সে অসংকোচটা দূর হবে, মাথা উঁচু কোরে পূর্ণসাহসে বুক ফুলিয়ে সব জায়গায় আমি বেড়াতে পারবো, সকল লোকের কাছে সপ্রতিভ থাকবো ; কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লে বোবা হয়ে থাকতে হবে না, কোথাও কাহার কাছে মাথাও হেঁট হবে না। পরিচয় জানবার জন্যই পাটনায় আমি যাব।

আর একটা কথা আমার মনে হলো। জয়শঙ্করবাবু বোলেছেন, মোহন-লালের সঙ্গে তাঁর পূর্বাবধি পরিচয়। ত্রিপুরায় জয়শঙ্করবাবুর বাড়ীতে আমি আছি, চক্রঘূর্ণনে মোহনবাবু হয় তো সে সংবাদ রাখতেন, জয়শঙ্করের মুখে আমার নাম শুনেই হয় তো আর কোন মতলব তিনি স্থির কোরেছেন ; সেই মতলব সিদ্ধ করবার অভিপ্রায়েই পাটনায় আমারে যেতে বোলেছেন, এইটাই যেন সম্ভব বোধ হোচ্ছে। হয় হোক, তাই হোক ; তবু আমি যাব।

রাত্রে আর নিদ্রা হলো না ; চিন্তায় চিন্তায় সারা রাত্রিজাগরণ। ঊষা-পক্ষিগণ বৃক্ষে বৃক্ষে কলরব আরম্ভ কোল্লে ; যে সকল পক্ষী গীত গায়, গীতের সুরে তারা ঊষাবন্দনা আরম্ভ কোল্লে ; পল্লীবাসী শ্রমজীবী লোকে-রাও একে একে জেগে উঠলো, নিকটে নিকটে কত লোকের কত প্রকার অস্পষ্ট কথা আমার শ্রবণগোচর হোতে লাগলো ; গবাক্ষপথ দিয়ে ঘরের ভিতর আলো এলো, রজনীপ্রভাত।

বেলা দুই প্রহরের মধ্যে নূতন ঘটনা কিছুই হলো না। অপরাহ্নে রামদাস

এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লে। রামদাসকে আমি একটি দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত কোরেছিলেম, সেই কার্য্যে সিদ্ধমনোরথ হয়ে চুপে চুপে রামদাস আমারে সংবাদ দিলে, "সে লোক এ গ্রামে আছে, আরো তিন দিন থাকবে, তিন দিন পরে স্থানান্তরে চোলে যাবে।" রামদাসকে তখন আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না, রামদাস চোলে গেল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় একজন ছোকরাকে সঙ্গে কোরে ছোটবাবু এলেন। ছোকরার হাতে একটা পুঁটলী। ছোটবাবুর আদেশে সেই পুঁটুলীটি আমার বিছানার উপর রেখে প্রণাম কোরে ছোকরা শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হয়ে গেল। পুঁটুলীটি খুলে ছোটবাবু আমারে কতকগুলি জিনিস দেখালেন।—একখানি গেরুয়া বসন, একখানি নামাবলী, পরচুলো, শ্বেতবর্ণ দীর্ঘ দাড়ী, শ্বেতবর্ণ গোঁপ, পিঙ্গলবর্ণ জটা, আর একছড়া হরিনামের জপমালা জিনিসগুলি দর্শন কোরে আমি হাস্য কোল্লেম।

হাস্য কোরে ছোটবাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এই তো বহুরূপীর সজ্জা এলো, এ সজ্জাগুলি নিয়ে তুমি কি কোরবে?—আমি উত্তর কোল্লেম, কি আমি কোরবো আজ রাত্রে তা আপনি শুনতে পাবেন না; কার্য্যসিদ্ধির পর কল্য কিম্বা পরশু সমস্তই আপনি জানতে পারবেন। সে প্রসঙ্গে ছোটবাবু আর কোন কথা বোল্লেন না; অন্য কথা উত্থাপন কোরে আমার গায়ে হাত দিয়ে বোল্লেন, "তুমি কি নিমন্ত্রণে যেতে ভালবাস? আজ আমাদের গ্রামের দক্ষিণ-পাড়ায় এক বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নী;—সত্যনারায়ণের কথা হবে, কৃষ্ণ-মঙ্গল গীত হবে, কৃষ্ণভক্তি যাত্রা হবে, খুব ঘটা। আমাদের নিমন্ত্রণ আছে, আমি যাব, কর্ত্তাও যাবেন, তোমার কি যাবার ইচ্ছা আছে?"

উল্লাসপ্রাপ্ত হয়ে মনে মনে আমি বোল্লেম, সত্যনারায়ণ দীর্ঘজীবী হয়ে থাকুন, ভালই হলো; যে ভাবনা আমি ভাবছিলেম, সত্যনারায়ণের ইচ্ছায় সে ভাবনা অন্তরে গেল, ছোটবাবুর প্রশ্নে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না: আজ আমার শরীর বড় ভাল নয়, নিমন্ত্রণে আমি যেতে পারবো না।"

ছোটবাবু আমারে আর কিছু বোল্লেন না, খানিকক্ষণ সেইখানে বোসে অন্য প্রসঙ্গে দুইটি চারিটি কথা কোয়ে, তিনি অন্দরে প্রবেশ কোল্লেন, আমি এদিকেও প্রস্তুত হোলেম। নিমন্ত্রণে যাব না, তবে আমার প্রস্তুত হওয়া কিসের জন্য, কিঞ্চিৎ পরে তাহার পরিচয়।

রামদাসকে সঙ্গে নিয়ে কর্ত্তা আর ছোটবাবু বাড়ী থেকে বেরুলেন; যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, সেই বাড়ীতেই গেলেন। কথা আছে, গীত আছে, যাত্রা আছে শীঘ্র তাঁরা ফিরে আসবেন না, তা আমি জানতে পাল্লেম। পাচিকা-ঠাকুরাণী সেই সময় একবার আমার ঘরে এসেছিলেন, তাঁরে আমি বোল্লেম, অসুখ আছে, রাত্রে আজ আমি কিছু আহার কোরবো না। সেই কথা শুনে, তিনি একবার আমার কপালে হাত দিয়ে বিষণ্ণ বদনে বোল্লেন, "তাই তো! গা গরম হয়েছে! কপালের শির লাফাচ্ছে। মাথা ব্যথা কোচ্ছে বুঝি? চুপ

কোরে শুয়ে থাক ; বেশী রাত জেগো না। শীঘ্র যাতে ঘুম হয়, সেই চেষ্টা কর।"

শয়নের উপদেশ দিয়ে পাচিকা-ঠাকুরাণী অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লেন। আমি আপনি আপনি হাস্য কোল্লেম। কতকগুলি স্ত্রীলোকের স্বভাব এইরূপ যে, কোন প্রকার অসুখের কথা শুনলে—অসুখটা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হোক—স্নেহ জানিয়ে সেই কথারই পোষকতা করেন, সাবধান থাকবার পরামর্শ দেন। এই পাচিকাটিও তাই কোল্লেন ; বাস্তবিক আমার কোন অসুখ ছিল না। ঘরের দরজা বন্ধ কোরে আমি আপনার ইচ্ছামত কার্য্য বোল্লেম, দর্পণে মুখ দেখলেম, গৃহের প্রদীপটি নির্ব্বাণ কোরে দরজা ভেজিয়ে বারান্দায় বেরুলেম। সে দিকটা অন্ধকার ; সদরবাড়ীতে কেহই ছিল না, সিঁড়ির দরজাটি ভেজিয়ে রেখে নিঃশব্দে উপর থেকে নেমে এলেম, বাড়ী থেকে বেরুলেম। বাবুরা নিমন্ত্রণে গিয়েছেন, শীঘ্র শীঘ্র সদরদরজা বন্ধ হবে না, মনে ভরসা থাকলো, ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে আমি চল্লেম।

সেই নদীতীর, সেই আম্রবৃক্ষ, নিকটে সেই বাড়ী, বৃক্ষতলে আমি। সত্য বটে আমি ; কিন্তু তখন আমারে হরিদাস বোলে চিনতে পারে, তেমন চক্ষু সে অঞ্চলে ছিল না। আমি তখন একজন শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট জটাধারী সন্ন্যাসী। কৌপীন অথবা ব্যাঘ্র-চর্ম্মপরিধান করা নাই, অঙ্গে ভস্মলেপন নাই, কেবল মুখের ঠাঁই ঠাঁই শ্বেতচন্দনের রেখা এঁকেছিলেম। সজ্জিত সন্ন্যাসীতে আর আমাতে অতি অল্পমাত্র প্রভেদ। আমার পরিধান গৈরিকবসন, কৃষ্ণ নামাবলী-চিত্রিত গৈরিকবসনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, হস্তে জপমালা, মুখে অবিরাম হরিনাম।

সেই বাড়ীখানির সম্মুখ দরজার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম; উচ্চকণ্ঠে হরিনাম গান কোচ্ছিলেম, একটি স্ত্রীলোক এসে আমারে দেখে গেল। ঔষধের মোড়ক সমর্পণ করবার দিন যে স্ত্রীলোকটি আমার দূতী হয়েছিল, সেই স্ত্রীলোক। আমারে তখন চিনতে পারে কার সাধ্য ? সজ্জা সমাপ্ত কোরে দর্পণে যখন আমি মুখ দেখি, তখন আমি নিজেই আমারে চিনতে পারি নাই। স্ত্রীলোকটি আমারে দেখে গেল, অব্যবহিত পরেই বাবু এলেন। আমি সন্ন্যাসী, বাবু আমারে প্রণাম কোল্লেন। যে বাবুকে আমার দরকার, সেই বাবুই তিনি। জয়োচ্চারণ কোরে বাবুকে আমি বোল্লেম আপনার মঙ্গলের জন্যই আমার এখানে আসা ; জন্মাবধি আপনি দেশে ছিলেন না, পৈতৃক ভদ্রাসনে নূতন এসেছেন, আপনার মনে কোন প্রকার অশান্তি আছে, গণনা কোরে সে সব আমি জানতে পেরেছি। কিছুদিন এই গ্রামে আমি আছি। গোটাকতক কুকুর সঙ্গে কোরে যে রাত্রে আপনি শিবের মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে চোলে আসেন, সেই রাত্রে আপনারে আমি দেখেছিলেম, আপনারে দেখেই আমার দুঃখ উপস্থিত হয়েছিল। বুঝতে পেরেছেন আমার কথা ? আপনার মনে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা আছে ; স্বকৃত কার্যের জন্যই সেই চিন্তা। এখানে আপনার নাম পায়রাবাবু। এখানে

আপনার গুটিকতক বন্ধু আছেন, গুটিকতক শত্রুও আছেন, যাতে কোরে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে, যারা শত্রুপক্ষ, তারা সেই চেষ্টাই কোচ্ছে। আপনি কোন প্রকার উৎকট পাপে—না না, সে কথা এখানে বলা হবে না, আপনার কোন ভয় নাই, শান্তি আছে, হরি আপনাকে শান্তি দিবেন। আপনি আমার সঙ্গে ঐ শিবালয়ে চলুন, আমি আপনার গ্রহশান্তির সুব্যবস্থা কোরে দিব।

বাবু একটু মুখ বাঁকালেন। হরিনামে তাঁর বিশ্বাস নাই, ধর্মেকর্মে আস্থা নাই, বাড়ীর ভিতর ফিরে যাবার উপক্রম কোল্লেন। আমি তাঁর একখানি হাত ধোরে নরম কথায় চুপে চুপে তাঁর কাণের কাছে বোল্লেম, আমার সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেলে তুমি পরিত্রাণ পাবে না, কার্য বড় শক্ত। কুলস্ত্রীর —সে সব কথা এখানে যদি তুমি শুনতে চাও, ঘরে বাহিরে মহাকলঙ্ক বেঁধে উঠবে ; আমি তোমারে চাই। গ্রামে এত লোক থাকতে, খুঁজে খুঁজে তোমাকেই আমি সুপাত্র বোলে ধোরেছি, আমি তোমার ভাল কোরবো ; পালিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না ; সব কথা আমি জানি। বীরভূমের কথাও জেনেছি, কাশীর কথাও জেনেছি, এখানকার কথাও জানতে পেরেছি। পাপের আগুন হু হু কোরে জ্বলছে, লুকিয়ে থাকলে সে অগ্নিনির্বাপিত হবে না। আমার সঙ্গে তুমি শিবমন্দিরে চল, শান্তিজলে আমি তোমার অশান্তি-বহ্নি নির্বাণ কোরে দিব।

পাঠক মহাশয়! বুঝতে পাল্লেন, এই বাবুটিই সেই পায়রাবাবু। আমার মুখে শেষের কথাগুলি শুনে, মনে মনে কি তিনি ভাবলেন, তাঁর জীবনের সমস্ত খবর আমি রাখি, সেটিও যেন বুঝতে পাল্লেন ; সেখানে আর আমি বেশী কথা না বলি, সেইরূপে সাবধান হয়ে আমার সঙ্গে শিবমন্দিরে আসতে সম্মত হোলেন।

নদীতীরে একটি শিবমন্দির ; বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সেই মন্দিরে আমি এলেম। মন্দিরের দ্বারে চাবি দেওয়া ছিল ; মন্দিরের একদিকের বারান্দায় উপবেশন কোরে সংক্ষেপে সংক্ষেপে সমস্ত কথার সারমর্ম তাঁকে আমি শুনিয়ে দিলেম। বাবু ঘন ঘন কেঁপে কেঁপে উঠলেন। ভূতভবিষ্যৎ গণনায় আমি পরম পণ্ডিত, বাবু যেন সেটি বেশ বুঝতে পাল্লেন ; আমার কথাগুলি যেন তাঁর অস্থিতে অস্থিতে বিঁধে গেল। আরো একটু খোলসা কোরেই আমি বোল্লেম রাধারাণী মরেছে। আত্মঘাতিনী হয়েছে! তোমার জন্যই রাধারাণীর অপঘাত মৃত্যু! পুলিশ পর্যন্ত জানাজানি হয়েছে, পুলিশে এখনো তোমার নামটা উঠে নাই ; কার মনে কি আছে, কে জানে? তদন্তমুখে উঠতে পারে, গণনাতে তাও আমি জানতে পেরেছি, এই বেলা প্রতীকারের চেষ্টা পাওয়া ভাল। বীরভূমে যা তুমি কোরেছ, তার ভিতরেও একটি কুলকন্যা ছিল ; সেই কুলকন্যা এখন গুজরাটে, গণনায় সব আমি নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি। সে নায়িকা বেঁচে আছে, রাধারাণী ইহসংসার থেকে বিদায় হয়েছে। মহাপাপ! মহাপাপ!! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত শীঘ্র শীঘ্র যদি তুমি না কর, পুলিশের হস্তে শীঘ্র তুমি ধরা

পোড়বে, ইহলোকে রাজবিচারে শাস্তি পাবে। তার পর পুলিশের উপর পুলিশ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর—

এই পর্যন্ত শুনে পায়রাবাবু খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকলেন, চঞ্চল-নয়নে চতুর্দিকে চাইলেন, কাতরবচনে আমারে বোল্লেন, "কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত কোল্লে আমি নিস্তার পাই, দয়া কোরে আপনি আমারে আজ্ঞা করুন।"

কথার ভাবে আমি বুঝলেম, প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে পায়রাবাবুর ইচ্ছা আছে। কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত, আমি তা মনে জানতেম ; মনে রেখেই প্রকাশ্যে বোল্লেম, এখানে সে কথা বলা হবে না। রাধারাণী মরেছে, দেহ এখন শ্মশানে ভস্ম হয় নাই, সেই দেহ যদি তুমি দর্শন কর, তা হোলেই একরকম প্রায়শ্চিত্ত হয়। দর্শন কোত্তে পারবে কি? পুলিশের সম্মুখে তোমার প্রেমনায়িকার মৃতদেহ দর্শন কোত্তে তোমার সাহস হবে কি?

আমি সন্ন্যাসী ; সংসারের কোন কথাই যেন আমি জানি না, এইরূপ বিশ্বাসে একটু কপট বিস্ময় প্রকাশ কোরে তিনি বোল্লেন, "রাধারাণী?—কে রাধারাণী? রাধারাণীর মৃতদেহ আমি কেন দেখতে যাব? পুলিশ! পুলিশের সঙ্গে আমি কেন দেখা কোরবো? আমি যাব না।"

মৃদুহাস্য কোরে আমি বোল্লেম, প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে রাজী আছ, অথচ রাধা-রাণীকে জান না ; পুলিশের নামে ভয় হয়, কার কাছে তুমি এ চাতুরী খেলাচ্ছ? মানুষের কাছে বরং চাতুরী খাটে, বিদ্যার কাছে খাটে না ; জ্যোতি-র্বিদ্যা প্রভাবে সমস্তই আমি জানতে পেরেছি। একটি বালক একদিন তোমার হস্তে রাধারাণীর প্রেমপত্রিকা প্রদান কোরেছিল, তার পর রাধারাণীর প্রেমা-শ্রমের উপদেবতানিপাত ; আমার কাছে তুমি এ সব কথা অস্বীকার কোত্তে পার না। যদি কর, অস্বীকার করবার যদি চেষ্টা পাও, পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

বাবুটির অন্তরে ভয় ছিল, বদনেও ভয়ের চিহ্ন উদিত হয়েছিল। দুই তিন-বার আমার মুখে পুলিশের কথা শুনে, সেই ভয়টা এই সময়ে ঘনীভূত হয়ে উঠলো। তখন তিনি আমার প্রসাদভিখারী হয়ে মৃদুবচনে বোল্লেন, "ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর আপনি যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি দেন, তাতে আমি প্রস্তুত আছি। আপনি দৈবজ্ঞ, ভূতভবিষ্যৎ উভয় তত্ত্ব আপনি পরিজ্ঞাত, আপনি আমাকে রক্ষা করুন!"

আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবার পূর্বলক্ষণ। রাত্রি প্রায় এক প্রহর। সত্য-নারায়ণের সিন্নী রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত শেষ হোতে বাকী থাকে না ; ছোট-বাবু যদি যাত্রাগীতি শোনবার আশা না রাখেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন ; শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করাই আমার আবশ্যক। পায়রাকে বোল্লেম, তোমার প্রায়শ্চিত্তটা যাতে অন্য লোকের চক্ষে না পড়ে, তেমন উপায় আমি কোত্তে পারি ; তুমি নারীবেশ ধারণ কর। তোমাদের গ্রাম, পাল্কীবেহারা কোথায় পাওয়া যায়, তা তুমি জানো, নারীবেশধারণের অগ্রে একখানা পাল্কী ডাকাও, তার পর যা যা

কোত্তে হয়, সে সব আমার ভার। এইখানে আমি থাকলেম, নারীবেশের উপকরণ বাড়ীর ভিতর থেকে সংগ্রহ কোরে আমার কাছে রেখে যাও, তার পর পাল্কী-বেহারা ডাকো। আমি তোমাকে নারী সাজাব ; যাও, দুই কার্য কোরে এসো! পালিও না, পালিয়ে নিস্তার পাবে না। ধর্মের চক্ষু সর্বদর্শী,—সর্বত্রদর্শী—জলধিজলে ডুবে থাকলেও সে চক্ষু তোমাকে দেখতে পাবে, নিবিড় বনে প্রবেশ কোল্লেও সে চক্ষু তোমাকে আকর্ষণ কোরবে, কিছুতেই পরিত্রাণ পাবে না! যাও, পালিও না!

ধর্মের কর্ম, পায়রাবাবুকে আমি আপন কায়দায় আনলেম, যা যা বোল্লেম, সমস্তই ঠিকঠাক হলো। বস্ত্রালঙ্কার আর একখানি শিবিকা উপস্থিত। পায়রাকে আমি বধূসজ্জায় সজ্জিত কোল্লেম, পাল্কীর ভিতর বসালেম, সর্দার বেহারার কাণে কাণে ঠিকানা বোলে দিয়ে শিবিকার দ্বার রুদ্ধ কোরে দিলেম। শিবিকা সরাসর বাবুদের বাড়ীর ফটকের কাছে উপস্থিত হলো, শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে আমি।

অবগুণ্ঠনে কপোতীর বচন আবৃত কোরে আমি সেটিকে উপরে নিয়ে তুল্লেম। যে ঘরে আমি থাকি, সে ঘরে তখন আলো ছিল না, অন্ধকারেই নববধূটিকে ঘরের একধারে আমি বসালেম, কথাবার্তা কিছুই নয়। কোথায় আমি এনেছি, পায়রা সেটা বুঝতে পারে না। মন্দিরে বোসে যা আমি ভেবেছিলেম, তাই ঠিক হলো। একটু পরেই ছোটবাবু ফিরে এলেন ; হরিভক্তির আকর্ষণে হরিগুণগান শ্রবণের অভিলাষে কর্তা সেই নিমন্ত্রণকর্তার বাড়ীতেই থাকলেন। প্রায়শ্চিত্তের আয়োজনে আমি সুবিধা পেলেম।

ছোটবাবু এসেছেন, জানতে পেরে, সিঁড়ির পথেই তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোল্লেম। তাঁর সঙ্গে আলো ছিল, সম্মুখে আমারে দেখে ছোটবাবু স্তম্ভিত হয়ে সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন। আমারে চিন্তে পাল্লেন না। আমি চুপি চুপি তাঁরে বোল্লেম, চমকিত হবেন না ; ভাল কোরে আমারে দেখুন ; আমি সন্ন্যাসী নয়, আমি হরিদাস। আপনি আমারে বহুরূপীর সাজ এনে দিয়েছিলেন, সেই সজ্জার অভ্যন্তরে আমি হরিদাস। আমি একটি কপোতী ধোরে এনেছি, সেই কপোতীও বহুরূপী ; কখন কপোত হয়, কখন কপোতী সাজে। কপোত-কপোতীর প্রেম কবিকুলের প্রেম-সংসারের আদর্শ। কপোতবেশে আমার কপোতী বিশুদ্ধ প্রেমশিক্ষা করে নাই, পাপ হয়েছিল ; সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত—"

আমার হিঁয়ালীর অর্থ ছোটবাবু শীঘ্র বুঝলেন না ; কি রকম কপোতী, দর্শনের কৌতূহলে তিনি আমার সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। ঘরের অন্ধকার ঘুচে গেল ; দীপাধারে উজ্জ্বল দীপ সংস্থাপিত, অন্ধকার দূরে গেল। ঘরের অন্ধকার গেল, ছোটবাবুর মনের অন্ধকারও দূর হলো ; ঘোমটা খুলে কপোতীর মুখখানি তাঁরে আমি দেখালেম। ছোটবাবু বিস্ময়াপন্ন। বিস্ময়ের সঙ্গে হাস্যের সম্বন্ধ অল্প, কিন্তু সবিস্ময়ে ছোটবাবু হাস্য কোল্লেন। পায়রা-

বাবু কাঁপতে লাগলেন। ছদ্মবেশ খুলে নিয়ে পায়রাটিকে আমি আবার পায়রা-বাবু সাজালেম।

পরামর্শ স্থির হলো। অতি সহজেই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে, লোক-জানাজানি হবে না, এরূপ আশা দিয়ে, পায়রার মুখে আমি পাপস্বীকার করালেম। পূর্বকথা সে ক্ষেত্রে প্রকাশ পেলে না। রুদ্রাক্ষগ্রামের ভৌতিক ক্রীড়া পায়রাবাবু কথায় কথায় স্বীকার কোল্লেন ; রাধারাণীর সঙ্গে গুপ্তপ্রেম, নিজমুখে তাঁকে স্বীকার কোত্তে হলো।

ছোটবাবু আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?" আমি ব্যবস্থা দিলেম, মস্তক মুণ্ডন। মন্ত্র পাঠ হয়ে গেল ; পাপীর নিজ মুখেই মন্ত্রপাঠ—পাপস্বীকার ; বাকী কেবল মস্তকমুণ্ডন। আর কোন প্রকার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার আবশ্যক হবে না, কেবল মস্তকমুণ্ডনেই ইহলোকে পূর্ণাঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদিত হবে। এই রাত্রের মধ্যেই সে কার্যটি সম্পন্ন হোলে ভাল হয়। অন্য লোকে দেখবে না, গ্রামের লোকে জানবে না, রাত্রের কার্য রাত্রের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে ; পায়রাবাবু যেখানে ইচ্ছা, রাত্রের মধ্যে সেইখানেই চোলে যেতে পারবেন।

ব্যবস্থা মঞ্জুর। ছোটবাবুও মঞ্জুর কোল্লেন, পায়রাবাবুও মঞ্জুরী জানালেন। রাত্রের মধ্যেই প্রায়শ্চিত্ত হওয়া স্থির। স্থির বটে, কিন্তু এ রাত্রে নাপিত কোথায় পাওয়া যায় ? আমি সন্ন্যাসী ; ক্ষৌরকারের কার্যে আমার পাণ্ডিত্য ছিল না, আমি কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হোলেম ; উদ্বেগের কারণ ছোটবাবুকে জানালেম। ছোটবাবু বোল্লেন, "চিন্তা কি ? আমাদের রামদাসটি ক্ষৌরকার,—প্রামাণিক বংশসম্ভূত। কর্তা বোধ হয় প্রভাতের অগ্রে ফিরে আসবেন না, আমাদের সম্মুখে অনেকটা সময় ; রামদাস নির্বিঘ্নে মুণ্ডনকার্য সমাধা কোরে দিতে পারবে।"

রামদাসকে আহ্বান করা হলো, গৃহমধ্যে রামদাস উপস্থিত। পায়রা-দর্শনে রামদাসের বিস্ময়-কৌতুক একত্র। বিস্ময়ে নিস্তব্ধ, কৌতুকে হাস্য। ছোটবাবু তারে পায়রাটির মুণ্ডনকার্য নির্বাহ করবার আদেশ দিলেন। আর এক অভাব। রামদাসের ক্ষুর নাই। সে অভাবটাও অধিকক্ষণ থাকলো না, ছোট-বাবুর নিজের একখানি ক্ষুর ছিল, অন্দরে প্রবেশ কোরে সেই ক্ষুরখানি তিনি বাহির কোরে এনে রামদাসের হাতে দিলেন ; রামদাস তখন পায়রার সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বোসলো।

এইখানে আর এক রঙ্গ ! উপনয়নের অগ্রে বিপ্রবালক এক নতুন আহ্লাদে আমোদিত হয়, কর্ণবেধ ও কেশমুণ্ডনের সময় সেই আহ্লাদের সঙ্গে সে যেমন একটু একটু ভয় পায়, বিস্ফোটকে অস্ত্র করবার সময় তীক্ষ্ম ছুরিকাধারী ডাক্তার সম্মুখে উপবিষ্ট হোলে রোগী যেমন নূতন যন্ত্রণার ভয়ে আকুল হয়, ক্ষুরাস্ত্রধারী রামদাসকে সম্মুখে দেখে যুগল হস্তে যুগলকর্ণ আচ্ছাদন কোরে পায়রাবাবু সেই রকম আতঙ্ক প্রকাশ কোত্তে লাগলেন ; কাঁদো কাঁদো মুখে বোলতে লাগলেন, "মাথার মাঝখানটা কামিয়ে দিলেই ঠিক হয়, বাকী চুল-

গুলি থাক ; সব চুল কামিয়ে দিলে মানুষকে কদাকার দেখায়, এ রকম হোলে লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। মাঝখানটি ছাড়া বাকী চুলগুলি আপনারা রেখে দিতে বলুন। আমি শুনেছি, মস্তকমুণ্ডন না কোরে চুলের মূল্য ধোরে দিলে ভট্টাচার্যেরা তুষ্ট হন। আমার প্রতি সদয় হয়ে তাই করুন, আমি মূল্য দিব।"

ছোটবাবু আমার মুখের দিকে চাইলেন, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আমি হাস্য কোল্লেম। সম্মুখদিকে ফিরে আমি অভিপ্রায় দিলেম, "এ পাপের সে-রূপ প্রায়শ্চিত্ত নয়, সম্পূর্ণ মুণ্ডন আবশ্যক।" আমার কথাই গ্রাহ্য হলো, ছোটবাবু রামদাসের প্রতি পূর্ণমুণ্ডনের আদেশ দিলেন, উৎসাহযুক্ত হয়ে দশমিনিটের মধ্যে রামদাস সেই আদেশ পালন কোল্লে। পায়রাবাবুর বাবরী-চুলগুলি তার পদতলে লুণ্ঠিত হোতে লাগলো। তখনো হস্তদ্বারা পায়রাবাবু আপনার কাণ-দুটি ঢেকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা পেলেন, চেষ্টা ফলবতী হলো না। আমি নিকটবর্ত্তী হয়ে, তাঁর হাত দুখানি ধোরে চাঁদমুখখানি ভাল কোরে দেখলেম। পায়রার চক্ষে জল, গাত্রে কম্প, রসনা বাকশূন্য। কারণ কি?—বাম-কর্ণ অর্দ্ধচ্ছিন্ন, দক্ষিণকর্ণ নাই। এই গ্রামে প্রথম দর্শনাবধি যে সন্দেহ আমার মনে ছিল, সেই সন্দেহই ঠিক। সন্দেহ আর থাকলো না, স্পষ্টই দেখলেম, কাণকাটা কানাই! আর একটি ছোট কথায় বোঁচা কানাই! পাঠকমহাশয় স্মরণ কোত্তে পারবেন, বীরভূমের কানাইবাবু আপন মাতুলকন্যার সতীত্বরত্ন হরণ কোরে, সেই ভগিনীটিকে কুলের বাহির কোরেছিলেন ; কত জায়গায় কত খেলা খেলিয়েছিলেন ; এই সেই কানাইবাবু। কত রাজ্য ঘুরে ঘুরে সেই কানাইবাবু এখন ত্রিপুরায় এসে ধরা পোড়লেন। কানাইকে আমি বোল্লেম, "চিনেছি আমি তোমাকে, সত্য তুমি পায়রাবাবু নও, বীরভূমের কানাইবাবু। তোমার নূতন নাম কাণকাটা কানাই! এই তোমার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল, এখন তুমি স্বাধীন, এখানে এখন তুমি নিষ্পাপ, এখন তুমি বিদায় হোতে পার। রাতারাতি প্রস্থান কোল্লে কেহই কিছু জানতে পারবে না। আমার কার্য শেষ হয়ে গেল, আমি এখন চোল্লেম।"

ছোটবাবুর দিকে চাইতে চাইতে ঘর থেকে আমি একবার বেরিয়ে গেলেম, বাহিরে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ কোরে, হরিদাস হয়ে গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ কোল্লেম। আমিই সেই সন্ন্যাসী, কানাইবাবু সেটি জানতে পাল্লেন না। দুই হস্তে কর্ণ আবৃত কোরে অধোবদনে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কানাইকে কানাই সাজিয়ে একটা সংকল্প আমি সিদ্ধ কোল্লেম। তিন দিন পর আমার পাটনা যাত্রার আয়োজন। একাকী আমি যেতে পারবো না কিম্বা হয় তো অন্য দিকে চোলে যাব এইরূপ সন্দেহ কোরে কর্তা আমার সঙ্গে ছোটবাবুকে পাঠাবেন। ছোটবাবুর হস্তেই আমাদিগের রাহাখরচের টাকা দিবেন, এইরূপ স্থির হলো। চতুর্থ দিবসে ছোটবাবুর সঙ্গে আমি পাটনা যাত্রা কোল্লেম।

হরিদাসের গুপ্তকথা

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম কল্প

পাটলীপুত্র

যত অল্প সময়ে পোঁছান যেতে পারে, বিশেষ চেষ্টা কোরে আমরা পাটনা-সহরে পোঁছিলাম। পাটনার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র। এক সময়ে পাটলী-পুত্রের সবিশেষ সমৃদ্ধি ছিল। বুদ্ধাধিকার সময়ে এখানে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ আলোচনা হতো। পাটনায় উপস্থিত হয়ে অনেক লোকের মুখে আমরা শুন-লেম, পূর্বের সে শ্রীসমৃদ্ধি এখন কিছু নাই। গঙ্গা আছেন, পাটনা নামে সেই পাটলীপুত্র বিদ্যমান আছে, ব্যবসায়ী মহাজনমণ্ডলীর কলরব আছে, ভূমির উর্বরতাশক্তির অধিক লাঘব হয় নাই, কিন্তু পূর্বে পূর্বে এই নগরী সন্দর্শন কোরে লোকে যেমন প্রীতি প্রাপ্ত হতো, আজকাল সেই প্রীতিকর দৃশ্য বিলুপ্ত। ঠিকানায় পোঁছিবার অগ্রে অনেকক্ষণ আমরা নগর দর্শন কোল্লেম। বড় বড় মহাজন, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাজনী গদী, বিবিধ পণ্যদ্রব্য সেখানে বিস্তর। খাপরেলের ঘর অসংখ্য ; দেশপর্যটকেরা সকলেই বলেন, পাটনায় যত খোলার ঘর, এত খেলার ঘর আর কোথাও নাই ; দর্শন কোরে আমরাও জানতে পাল্লেম, পর্যটকবর্গের কথাই সত্য, এত খোলার ঘর আর কোথাও নাই।

যে পল্লীতে মোহনলাল বাবুর কুঠী, অন্বেষণ কোরে সেই পল্লীতে আমরা উপস্থিত হোলেম। পল্লীর মধ্যে অধিক লোকের কুঠী দেখা গেল না। একটি লোককে জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, রাজা মোহনলাল ঘোষ বাহাদুর সম্প্রতি স্থানান্তরে গিয়েছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন ; কুঠীবাড়ীতে লোকজন আছে, সেইখানে গেলেই বিশেষ বৃত্তান্ত জানতে পারা যাবে। কোথায় সেই কুঠীবাড়ী, সেই লোকটিকে আমরা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, লোকটি আমাদের সঙ্গে কোরে বাড়ী-খানি দেখিয়ে দিলো। বাড়ীখানি অতি সুন্দর ; আমরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম।

বাড়ীখানি অতি সুন্দর ; জায়গা অনেক, চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, মধ্যস্থলে ইমারত ; ধারে ধারে ফুলবাগান, মধ্যে মধ্যে অপরাপর ফলকর বৃক্ষ ; স্থানটি রমণীয়। দোতালা কুঠী ; আমরা দোতালায় গিয়ে উঠলেম ; একটি ঘরের সম্মুখে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে ঢালা বিছানা, সারি সারি পাঁচ সাতটি তাকিয়া, প্রত্যেক তাকিয়ার পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর বৈঠকোবিষ্ট এক একটি হুঁকা। একটি তাকিয়ার কাছে একটি লোক ;—দিব্য স্থূলাকার, শ্যামবর্ণ, গলদেশে যজ্ঞোপবীত, কণ্ঠে ছোট ছোট সোণার মাদুলী-গাঁথা তিন-নর তুলসী-মাল্য ; মস্তকের মধ্যস্থলে টাকপড়া, পার্শ্বের চুলগুলি অল্প পক্ক, অল্প

অপক্ক, বয়স অনুমান প'য়তাল্লিশ কি ছচল্লিশ বৎসর। লোকটির সম্মুখে বৃহৎ একটা লাল কাপড়ের দপ্তর, দপ্তরের পার্শ্বে বৃহৎ একটা বাকস, বাকসের উপর অনেকগুলি কাগজপত্র ছড়ানো। লোকটি একখানি পত্রিকা চক্ষের নিকটে ধারণ কোরে মনে মনে পাঠ কোচ্ছিলেন ; পাঠে তন্মনস্ক। অন্য বিষয়ে অন্য মনস্ক ছিলেন, অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না, আমরা গিয়ে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়েছিলেম, প্রথমে তিনি দেখতে পান নাই ; তার পর পত্রিকার উপর থেকে চক্ষু তুলে, আমাদের দেখে, গম্ভীরবদনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে আপনারা? কোথা থেকে আসছেন? কি চান?"

আমরা তখন গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। আমি বোল্লেম, "রাজা বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিলাষ ; তিনি আসতে বোলেছিলেন, তন্নিমিত্তই আমাদের আসা।"

লোকটি আমাদের বোসতে বোল্লেন ; দুটি তাকিয়ার নিকটে পাশাপাশি হয়ে আমরা দুইজনে বোসলেম। যেরূপ গদিয়ানীভাবে সেই লোকটি সেইখানে বোসে ছিলেন, তাতে কোরে আমার বোধ হলো, তিনি হয় তো একজন সরকার অথবা মুহুরী অথবা খাতাঞ্চী। যাই তিনি হোন, স্থূলাঙ্গদর্শনে আমি তাঁরে দেওয়ানজী বোলেই অনুমান কোল্লেম? জমিদারী সেরেস্তার নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে দেওয়ানজী বোলে সম্মান দিলে খাতির পাওয়া যায়, তাই মনে কোরে আমি তারে দেওয়ানজী বোলে সম্বোধন কোরবো, এইরূপ ভাবছি, এমন সময় আর একটি লোক সেই গৃহে প্রবেশ কোরে সসম্ভ্রমে বোল্লে, "দেওয়ানজী মশায়! একজন ঘোড়সোয়ার এসেছে, একখানা চিঠি এনেছে, যদি বলেন, সেই লোককে আমি এখানে নিয়ে আসি। চিঠিখানি আমি চাইলেম, দিলে না;— বোল্লে, মহারাজের হাতে দিবার আদেশ। আমি বোল্লেম, 'মহারাজ বাড়ীতে নাই,' কথাও শুনলে না, চিঠি আমাকে দিলে না।"

দেওয়ানজী মহাশয় গাত্রোত্থান কোল্লেন ; আমাদিগের দিকে চেয়ে আর একবার বোল্লেন, "বসুন আপনারা, আমি আসছি।" যে লোক খবর দিতে এসেছিল, তার দিকে ফিরে তিনি আদেশ দিলেন, "বাবুদের তামাক দে রে!"— বোলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চাকরটি সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো।

তামাক আমিও খাই না, ছোটবাবুও খান না ; তামাক আনতে নিষেধ কোরে চাকরটিকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "রাজাবাহাদুর কোথায় গিয়েছেন? —কবে আসবেন?" চাকর উত্তর কোল্লে, "কোথা গিয়েছেন, তা আমি জানি না ; গত রাত্রে আসবার কথা ছিল, আসেন নাই ; আজ রাত্রে আসতে পারেন ; যদি না আসেন, কল্য নিশ্চয়।"

চাকরের সঙ্গে আর আমাদের কোন কথা ছিল না ; সে চোলে গেল, আমরা দুইজনে দেওয়ানজীর অপেক্ষায় সেইখানে বোসে থাকলেম।

দেওয়ানজী ফিরে এলেন। কোথাকার সোয়ার, কিসের পত্র, সে কথা জিজ্ঞাসা করা আমাদের অনধিকারচর্চ্চা ; আমরা আগন্তুক, সে কথার সঙ্গে

আমাদের কোন সম্বন্ধই ছিল না ; সুতরাং আমরা পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধভাবেই বোসে থাকলেম। নিজাসনে আসীন হয়ে দেওয়ানজী তখন আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমার পরিচয় আমি। আমি হরিদাস, রাজাবাহাদুরের আহ্বানে আমি এখানে উপস্থিত, এই পর্যন্ত আমার পরিচয়। ছোটবাবুর পরিচয়ে কিছু বেশী কথা। তিনি পরিচয় দিলেন, "নাম মিহিরচাঁদ চৌধুরী, পিতা জয়শঙ্কর চৌধুরী, নিবাস ত্রিপুরা ; আমার পিতাঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি পাটনায় এসেছিলেন, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, এই হরিদাস, আমাদের বাড়ীতে ছিল, আমার পিতার মুখে রাজাবাহাদুর সে কথা শুনেছিলেন, হরিদাসকে এখানে পাঠাবার জন্য পিতাকে অনুরোধ কোরেছিলেন, হরিদাস চিনবে না, একাকী আসতে পারবে না, সেই কারণে হরিদাসের সঙ্গে তিনি আমারে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

শান্তদর্শনে দেওয়ানজী আমাদের উভয়ের বদন নিরীক্ষণ কোরে, কি যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ কোরে প্রশান্তস্বরে বোল্লেন, "ঠিক কথা বটে ; এখন আমার মনে পোড়লো। রাজাবাহাদুর আপনার পিতার কাছে হরিদাসের নাম কোরেছিলেন বটে, হরিদাসকে এখানে পাঠাবার কথা বোলেছিলেন বটে, এই বালকটির নাম হরিদাস ?"

মিহিরবাবু উত্তর কোল্লেন, "হরিদাসের পরিচয় হরিদাস নিজ মুখেই প্রদান কোরেছে ; আমিও পুনরায় বোলছি, এই বালকের নাম হরিদাস। বালকটি খুব ভাল ; হরিদাসের শরীরে অনেক গুণ।"

দেওয়ানজী বোল্লেন, "সন্তুষ্ট হোলেম, আপনারা থাকুন, রাজাবাহাদুর একটি বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত আজ তিন দিন হলো, একটি বন্ধুলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে গিয়েছেন, আজ রাত্রে প্রত্যাগমন করবার কথা। এইমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এক পত্র নিয়ে একজন সওয়ার এসেছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আগামী কল্য এইখানে উপস্থিত হয়ে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবেন, পত্রের মর্ম্ম এইরূপ। পত্রের উত্তরে রাজাবাহাদুরের অনুপস্থিতির কথা আমি লিখে দিয়েছি। আপনারা থাকুন, আজ রাত্রে না হয়, কল্য আমি হরিদাসকে রাজসমীপে পরিচিত কোরে দিব।"

আমরা থাকলেম। দেওয়ানজীর সুবন্দোবস্তে, সম্ভবমত আদর-যত্নে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হলো না। রাত্রে রাজাবাহাদুর এলেন না, পরদিন বেলা দশটার সময় প্রত্যাগত হোলেন। দেওয়ানজীকে পুরোবর্ত্তী কোরে রাজার সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ কোল্লেম। মিহিরচাঁদের পরিচয় পেয়ে রাজাবাহাদুর হর্ষপ্রকাশ কোল্লেন। নূতন কোরে আমার পরিচয় দিতে হলো না, আমারে তিনি চিনতেন ; অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হোলে পরিচিত লোককে যে ভাবে জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়, সেইভাবে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কেমন আছ হরিদস ? দীর্ঘকালের পর তোমাকে আমি দেখলেম। এত দিন তুমি কোথায় ছিলে ! তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি আমার অবাধ্য, সেই জন্যই

নিজের দোষে তুমি কষ্ট পাও। এখন অবধি আমার কাছেই তুমি থাকো ; আমার বাধ্য থাকলেই তোমার ভাল হবে।"

নম্রভাবে উচিতমত উত্তর প্রদান কোরে আমি মৌন অবলম্বন কোল্লেম। অনেক দিনের অনেক পূর্বকথা আমার স্মরণ হলো। বাবু মোহনলালের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, তিনি রাজা হয়েছেন, আমার প্রতি তাঁর মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে, এইরূপে আমি ভাবলেম। বারাণসীধামে দুখানি পত্রিকা দর্শন কোরে আমার উপর তিনি যেরূপ রুষ্ট হয়েছিলেন, সে ভাব এখন নাই, ইহাই যেন আমি বুঝলেম।

যতক্ষণ আমি ঐ সকল কথা আলোচনা কোল্লেম, রাজাবাহাদুর ততক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলেন ; সহসা মৌনভঙ্গ কোরে আমারে তিনি বোল্লেন, "ত্রিপুরায় জয়শঙ্করবাবুর বাড়ীতে তুমি ছিলে, তিনি মহৎ লোক, তাঁর কাছে তোমার কোন প্রকার অযত্ন ছিল না, সে সব আমি শুনেছি। তিনি এখানে এসেছিলেন ; তাঁর মুখেই আমি তোমার সমাচার পেয়েছিলেম ; পেয়েছিলেম বটে, কিন্তু কি প্রকারে কার সঙ্গে তুমি ত্রিপুরায় উপস্থিত হয়েছিলে, সেটা আমি জানতে পারি নাই, তিনিও কিছু বলেন নাই। ত্রিপুরায় তুমি কেন গিয়েছিলে ?—সেখানে তোমার কি কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল ?"

কেন জানি না, রাজার প্রশ্ন শুনে হঠাৎ আমি চোমকে উঠলেম ; ভাব গোপন কোরে উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না ; বিশেষ অবিশেষ কোন প্রয়োজনই আমার সেখানে ছিল না ; কি জন্য গিয়েছিলেম, কিরূপে গিয়েছিলেম, তাও আমি বোলতে পারি না। যে দিন আমি—"

বোলতে বোলতে একবার আমি থাকলেম ; ত্রিপুরার প্রথমদিনের কথা আমার মনে পোড়লো, আমি কাঁপলেম। প্রথমদিন জয়শঙ্করবাবু আমারে নেশাখোর বোলে তিরস্কার কোরেছিলেন ; রাজাবাহাদুরের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা আছে, 'আমি নেশাখোর' এ কথাটা যদি তিনি রাজাকে বোলে গিয়ে থাকেন, হয় তো বোলে থাকবেন, এমন যদি হয়, তা হোলে আমার উপর রাজাবাহাদুরের একটা কুসংস্কার জন্মেছে, ইহাই সম্ভব। সত্যকথা কি, জয়শঙ্করবাবু সে সবও হয় তো বোলে থাকবেন, রাজা হয় তো সেই কথা চেপে রেখে আমার মুখে কোন প্রকার নূতন কথা শ্রবণ করবার কৌশল প্রকাশ কোচ্ছেন, এইরূপ আমি ভাবলেম। প্রথমে যা ভেবেছিলেম, জয়শঙ্করবাবুর তিরস্কার সহ্য করবার পর যে সব কথা আমার মনে হয়েছিল, সেই সব কথা যদি ঠিক হয়, তবে তো মোহনলালবাবুর কাছে আমাকে সর্বদা সাবধান হয়ে থাকতে হবে, পদে পদে কুণ্ঠিত হয়ে চোলতে হবে, সেটা নিশ্চয়। মনের কথা মোহনবাবুকে আমি, বোলবো কি না, একটু চিন্তা কোল্লেম। কৌশলক্রমে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া ভাল ; পরিশেষে সেই সিদ্ধান্তই অবধারিত হলো।

কথাগুলি লিখতে যতক্ষণ গেল, ভাবতে ততক্ষণ লাগে নাই। যে পর্যন্ত বোলতে বোলতে আমি থেমেছিলেম, সেই সূত্র ধারণ কোরে রাজাকে আমি

বোল্লেম, যে দিন আমি জয়শঙ্করবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হই, সে দিন আমি অজ্ঞান ছিলেম। কে আমারে অজ্ঞান কোরেছিল, তা আমি জানি না ; অজ্ঞান অবস্থায় কারা আমারে ত্রিপুরায় ফেলে গিয়েছিল, তাও আমি বোলতে পারি না ; জয়শঙ্করবাবু যত্ন কোরে আমারে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এই পর্যন্ত আমি বোলতে পারি।"

তাচ্ছল্যব্যঞ্জক হাস্য কোরে রাজাবাহাদুর বোল্লেন, "ওটা তোমার বুদ্ধির ভ্রম। মাঝে মাঝে তোমার এক একটা খেয়াল হয়, এটাও সেই প্রকার একটা খেয়াল। কে তোমাকে অজ্ঞান কোরে একটা জায়গায় ফেলে দিয়ে যাবে ? কার এত দায় পোড়েছিল ? কেনই বা তোমাকে অন্যলোকে একটা অজানা জায়গায় নিয়ে যাবে ? ও সব কথা মনে কোরো না। ভাল লোকের আশ্রয়ে ছিলে, আমার কাছে এসেছ, শান্ত হয়ে থাকো, ও সব খেয়াল ছেড়ে দাও। শিষ্টশান্ত হয়ে কাজকর্ম কর, আমার পরামর্শ মত চল, সংসারে একজন মনুষ্য বোলে গণ্য হোতে পারবে। চিরদিন কি এইরূপ ছেলেমানুষ থাকবে ? উদাসীনের মত চিরদিন কি দেশে বিদেশে পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে ? ঐ রকম হয়ে ঘুরে বেড়ানো কি ভাল ? স্থির হয়ে আমার কাছে থাকো ; কাজকর্ম শিক্ষা কর, মঙ্গল হবে।"

আর আমি কিছু বোল্লেম না ; ভাগ্য বিরূপ থাকলে মনে সর্বদাই কু-গায় ; কু-ভাবনা আমার গেল না। রাজাবাহাদুর আমাদের সেইখানে বোসতে বোলে গৃহান্তরে প্রবেশ কোল্লেন, চাকরেরা গৃহপরিষ্কারাদি নানা কার্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াতে লাগলো ; দেওয়ানজী মহাশয় মরুব্বী-আনা জানিয়ে এটা ওটা সেটা পাঁচ প্রকার হুকুমজারী কোত্তে লাগলেন ; রাজাও ব্যস্ত। ফল, ফুল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য আমদানী হোতে লাগলো। সেই সব আয়োজন দর্শন কোত্তে কোত্তে ভগবান মরীচিমালী অস্তাচল-শিখরে প্রস্থান কোল্লেন ; সন্ধ্যা হলো ; ঘরে ঘরে পরিষ্কার পরিষ্কার দীপাধারে পরিষ্কার পরিষ্কার বাতী জেলে উঠলো ; বিচিত্র নাচঘরের ন্যায় একটি সুপ্রশস্ত ঘরে ইংরাজী ধরণের মজলীস সাজানো হলো। বাড়ীতে কি একটা উৎসব আছে, কারা যেন আসবেন, অনেকেই এইরূপ বিবেচনা কোল্লেন।

রাত্রি যখন আটটা, কি নয়টা, সেই সময় ফটকে একখানা গাড়ী এসে লাগলো। গাড়ীর পশ্চাতে একজন ঘোড়সওয়ার। একজন খানসামা দ্রুতগতি উপরে এসে সংবাদ দিলে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। রাজাবাহাদুর উপরে ছিলেন, তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন, অভ্যাগত দুটি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে উপরে এসে উঠলেন। শেষে আমরা জানত পাল্লেম, একজন ম্যাজিস্ট্রেট আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নবাগত বন্ধু। যেখানে মজলীস হয়েছিল, আমরা সে ঘরে প্রবেশ কোল্লেম না ; ঘরের দুইধারে রঙ্গিন উর্দ্দীপরা দুইজন আরদালী দাঁড়ালো, দ্বারের কপাট রুদ্ধ হয়ে গেল।

কি প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেটের আগমন, সেটি আমি জানলেম না, জানবার

জন্য আগ্রহও প্রকাশ কোল্লেম না। গৃহমধ্যে পান-ভোজন, কথোপকথন ও অন্যান্য কার্য সমাপ্ত হোলে, সাহেবেরা বিদায় হোলেন, ভোজনান্তে আমরাও বিশ্রাম করবার অবকাশ পেলেম।

পাঁচদিন অতীত। মোহনবাবুকে বারংবার রাজাবাহাদুর বোলে উল্লেখ করা আমার বেশ কিছু কষ্টকর বোধ হোতে লাগলো ; বলি রাজাবাহাদুর, কিন্তু যেন বাধ বাধ করে। সম্বোধনে রাজাবাহাদুর কেন, অবাধে মহারাজ বলা যায় ; কিন্তু অপরের কাছে পরিচয় দিবার সময় একটু থেমে থেমে সাবধান হোতে হয়। মোহনরাজা অথবা মোহনলাল রাজা, এরূপ উচ্চারণ শ্রবণে নীরস। যত দিনের জানাশুনা, তত দিন আমি মোহনবাবু অথবা মোহনলালবাবু বোলে এসেছি। এখন তিনি নূতন রাজা হয়েছেন, রাজাবাহাদুর বোলতে হবে, না বলাটা ধৃষ্টতা, বলা চাই, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করা আবশ্যক। এই পাঁচদিন রাজাবাহাদুর আমারে বেশ আদর-যত্ন কোল্লেন, স্নেহ-মমতা জানালেন মিষ্টকথা বোল্লেন ; তুষ্ট হয়েও আমি তুষ্ট হোতে পাল্লেম না। অতুষ্টির কি কারণ, পাঠক মহাশয় সেটি অনুভবে হৃদয়ঙ্গম কোরবেন। রাজার কাছে আমি আদর-যত্ন পেলেন আমার অপেক্ষা মিহিরবাবু কিছু বেশী পেলেন ; পাওয়াই উচিত। একে তিনি নূতন তাতে আবার ব্রাহ্মণ, তার উপর আবার মিত্রকুমার। আমার অপেক্ষা মিত্রকুমারের অধিক সমাদর অবশ্যই সামাজিক রীতির গৌরববর্দ্ধক ; সমাজের প্রথাই এইরূপ ; সমাদরে বাস্তবিক আমি সন্তোষলাভ কোল্লেম।

পাঁচদিন পরে মিহিরচাঁদবাবু বিদায় হোলেন ; তাঁরে প্রণাম কোরে রাজা-বাহাদুর বোলে দিলেন, "তোমার পিতাঠাকুরকে আমার প্রণাম দিও ; হরিদাস এসেছে, ভাল আছে, থাকতে থাকতে ভাল হবে, এ কথাও তাঁরে বোলো।" মিহিরবাবু আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। আমাদের আসবার রাহাখরচ আর মিহির-বাবুর প্রতিগমনের রাহাখরচ রাজাবাহাদুর দিলেন। আমার সঙ্গে প্রিয়সম্ভাষণ কোরে মিহিরবাবু স্বদেশে প্রস্থান কোল্লেন। এইখানে আর একটি কথা বোলে রাখা আবশ্যক। প্রায়শ্চিত্তের ছলে পায়রাবাবুকে নেড়া করা, 'কানকাটা কানাই' প্রকাশ করা, কি প্রকার রহস্য, পাটনায় উপস্থিত হয়ে মিহিরবাবু নির্জ্জনে একদিন আমারে সেই কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। কানাইয়ের স্থূলে স্থূলে পরিচয় তাঁর কাছে আমি ব্যক্ত কোরেছিলেম। শুনে তিনি ঘৃণার সঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ কোরে বোলেছিলেন, "তবে আর রুদ্রাক্ষ-খোপে বাসা কোরে থাকতে পারবে না, লোকের কাছে বোঁচা-মুখ দেখাতে লজ্জা হবে, পায়রা অচিরেই রুদ্রাক্ষের বাসা ছেড়ে উড়ে পালাবে!" হাস্য কোরে আমি বোলেছিলেম, "সেটাও একপ্রকার দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত। তাদৃশ নরাধমের পুনঃ পুনঃ প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই কৃষ্ণের ইচ্ছা।"

মিহিরবাবু চোলে গেলেন, আমি থাকলেম। আদর পাই, যত্ন পাই, রাজার মুখের মিষ্ট মিষ্ট বাক্য পাই, রাজাদেশে সামান্য সামান্য কাজ-কর্ম্মও নির্ব্বাহ করি, এই রকমে একমাস। নিত্য নিত্য মনে করি, রাজাকে আমি মনের কথা

জানাব ; চিরজীবনের ঘোর অন্ধকার সংশয়টা ভঞ্জন করবার প্রয়াস পাব, অবকাশ পাই না। তিনি বড়লোক, আমি গরীব, শীঘ্র কোন কথা জিজ্ঞাসা কোত্তেও সাহস হয় না। রাজাকে নিৰ্জ্জনে না পেলে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল নয়, নিৰ্জ্জনে পাবারও অবসর ঘটে না। আরও একপক্ষ অপেক্ষা কোল্লেম।

বসন্তকাল উপস্থিত। বসন্তে আকাশমণ্ডল নিৰ্ম্মল, প্রকৃতি প্রসন্নমুখী, তরুলতা প্রফুল্ল, বিহঙ্গকুল প্রফুল্ল, সুখলালিত মানবকুলও প্রফুল্ল। আমার মত অভাগা চিরদুঃখী ব্যতীত সকলেই প্রফুল্ল।

একদিন অপরাহ্নে রাজাবাহাদুর মোহিনীমোহন বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে উপর থেকে নেমে আসছেন, আমি সেই সময় একটা কাজের জন্য তাড়াতাড়ি নীচে থেকে উপরে উঠছিলেম, সিঁড়ির পথে দেখা হলো। থোমকে, দাঁড়িয়ে সস্নেহ-সম্ভাষণে রাজা আমারে বোল্লেন, "এসো হরিদাস ! আমি তোমার তত্ত্ব কোচ্ছি-লেম, কোথায় ছিলে তুমি ? এসো !"

বোলেই তিনি অগ্রে অগ্রে সোপানাবলী অতিক্রম কোত্তে লাগলেন, কথার ভাবনা বুঝতে না পেরে পূর্ব্বস্থানেই আমি দাঁড়িয়ে থাকলেম। পশ্চাতে মুখ ফিরিয়ে রাজা পুনরায় আমারে আহবান কোরে বোল্লেন, "ভাবছ কি ? এসো !"

তখন আমি তাঁর মনের কথা বুঝতে পাল্লেম ; যে কার্য্যে যাচ্ছিলেম, সে কার্য্যে আর যাওয়া হলো না, সন্দিগ্ধচিত্তে রাজার সঙ্গে সঙ্গে নেমে ফটক পর্য্যন্ত এলেম। ফটকে গাড়ী ছিল, রাজাবাহাদুর আরোহণ কোল্লেন, আমারেও আরোহণ কোত্তে বোল্লেন ; নতবদনে আমি রাজাজ্ঞা পালন কোল্লেম।

গঙ্গাতীরের রাস্তার অদূরে একটি মনোহর উদ্যান ; সেই উদ্যানে শকট পৌঁছিল ; আমরা অবরোহণ কোল্লেম। গাড়ীতে যতক্ষণ ছিলেম, ততক্ষণের মধ্যে আমি একটিও কথা কহি নাই. একখানা ইংরাজী খবরের কাগজে চক্ষু রেখে রাজাবাহাদুর অন্যমনস্ক ছিলেন, তিনিও আমারে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। গাড়ী থেকে নেমে রাজা যখন উদ্যানের পুষ্পবাটিকায় পরিক্রমণ করেন, আমি তখন তাঁর পশ্চাতে ছিলেম। রৌদ্রের উত্তাপ ছিল না, সুখস্পর্শ সমীরণ আমাদের অঙ্গস্পর্শ কোচ্ছিল, নানা কুসুমের সৌরভে চিত্ত প্রমোদিত হোচ্ছিল, উদ্যানের শোভা দর্শনে আমি পরিতৃপ্ত হোচ্ছিলেম, উদ্যানপালেরা দূরে দূরে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, নিকটে কেহই ছিল না ; নিৰ্জ্জন-আলাপের উত্তম অবসর।

উদ্যানের স্থানে স্থানে উপবেশনযোগ্য সুন্দর সুন্দর বেদী ; বেদীর ধারে ধারে শ্বেতপ্রস্তর নিৰ্ম্মিত—চীনের মৃত্তিকানিৰ্ম্মিত নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর পুতুল ; দিব্য সুদৃশ্য ! কুসুমকাননের মধ্যস্থলে একটি শ্বেতবর্ণ ধারাযন্ত্র ; সেই ফোয়ারার একদিকে ময়ূরের মুখ, একদিকে সিংহমুখ, একদিকে হংসমুখ, একদিকে এক অসুরের মুখ. উপরিভাগে বিচিত্র-পক্ষযুক্ত একটি সুন্দরী পরী : যন্ত্রগাত্রের চারিমুখ দিয়ে নির্ঝরের ন্যায় ঝর ঝর শব্দে স্নিগ্ধ সলিল বর্ষিত হোচ্ছিল। সেই সকল শোভা দর্শন কোত্তে কোত্তে রাজাবাহাদুর নিকটস্থ একটি বেদীর

উপর উপবেশন কোল্লেন, প্রসন্ন-নয়নে আমার দিকে চেয়ে আমারেও বোসতে বোল্লেন। যে বেদীতে রাজা, সে বেদীতে না বোসে নিকটবর্ত্তী আর একটি বেদীতে আমি উপবেশন কোল্লেম।

প্রতিদিন মনোমোহিনী শোভা দর্শনে আমার চিত্ত পুলকিত হোচ্ছিল, কিন্তু আমার অন্তরসাগরে অহরহ অনুক্ষণ যেরূপ চিন্তা-তরঙ্গের খেলা, সে খেলার বিরাম ছিল না। রাজাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করা আমার ইচ্ছা; স্থান নির্জন, সময় রমণীয়; রাজাবাহাদুরের মেজাজ তখন বেশ ঠাণ্ডা, মনোগত কথা জিজ্ঞাসা করবার উপযুক্ত অবসর বটে; কিন্তু সহসা কি কথা বোলে মনের কথা উত্থাপন করি, তাই আমি ভাবতে লাগলেম। অবসর হয়েও অবসর হয় না ; রাজার দৃষ্টি তখন অন্যদিকে ছিল, অপাঙ্গে তাঁর মুখের ভাব নিরীক্ষণ কোরে আমি বুঝলেম, আমার ন্যায় তিনিও যেন কোন প্রকার চিন্তায় অন্য-মনস্ক। সেই ভাবে রাজার মুখের দিকে আমি চেয়ে আছি, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে, কি যেন ভেবে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি ভাবছো হরিদাস ?"

কি আমি ভাব্‌ছি, আমিই তা জানতেম। শৈশবে জ্ঞানের সঞ্চার হওয়া অবধি সর্বদা যে কথা আমি ভাবি, সেই ভাবনা আমার সহচরী। ভাবনাকে অন্তরে রেখে আমি উত্তর কোল্লেম, "উদ্যানটী অতি সুন্দর। এ উদ্যানে যা কিছু দর্শন কোচ্ছি, সমস্তই যেন আমার চক্ষে নূতন বোধ হোচ্ছে ; পুতুলগুলি যেন সজীব বিবেচনা কোচ্ছি ; পুতুলেরা যেন বাতাসের সঙ্গে কথা কোচ্ছে, এই ভাব আমার মনে আসছে ; বাতাসে দুলে দুলে ফুলগুলি যেন আহ্লাদে অহ্লাদে ঢোলে ঢোলে পোড়ছে, পবনদেবের সঙ্গে যেন খেলা কোচ্ছে তাই আমি দেখ্‌ছি।"

ঈষৎ হাস্য কোরে রাজাবাহাদুর বোল্লেন, "তা তো দেখছো, কিন্তু ভাবছো কি ? দেখ্‌তে পাই, সর্বদাই কি তুমি ভাবো। পূর্বেও দেখেছি, এখনো দেখ্‌ছি, একই ভাব। এখন আর তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষটি নও, ক্রমেই বয়স বাড়ছে, উদাসীনের মত সর্বক্ষণ ভেবে ভেবে তোমার বুদ্ধিশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে : ও সব ভাবনা ছেড়ে দাও। তোমাকে সংসারী হোতে হবে, সংসারী হবে, সংসারের মানুষগুলিকে চিনতে হবে, সংসারের প্রকৃতি বুঝতে হবে, সেগুলি কি তুমি একবারও ভাবো না ? অন্য ভাবনা ছেড়ে দাও। যাতে কোরে মানুষের মত হোতে পার, সেই চেষ্টা কর ; আমার কাছে যথেষ্ট সহায়তা পাবে।"

সুরে সুরে সুর মিলে গেল; ঠিক সুরে আমার হৃদয়-বীণা বেজে উঠলো। সূত্র অন্বেষণ কোচ্ছিলেম, উত্তম সূত্র পেলেম ; উত্তম সুবিধা ; ভাগ্যে যা থাকে, তাই হবে, এই সূত্রে মনের কথা আমি প্রকাশ করি। রাজা যদি সদয় হন, আশা পূর্ণ হবে ; কথা শুনে রাজা যদি রুষ্ট হন, আশা ভেসে যাবে ; যত দিন বাঁচবো, এই রকমে অকূলপাথারে ভেসে ভেসে বেড়াবো। আজ আমার ভাগ্যপরীক্ষার শেষদিন, মনের কথা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ভেবে ভেবে

দৃঢ়সংকল্প হয়ে ধীরে ধীরে আমি বোল্লেম, "যা আপনি আজ্ঞা কোচ্ছেন, তা ঠিক। সংসারে যখন এসেছি, তখন সংসারের পদ্ধতিতে সংসারী হওয়াই উচিত ; কিন্তু পন্থা অবলম্বনের মূলতত্ত্ব আমি অপরিজ্ঞাত। এ সংসারে কে আমি, কে আমার জন্মদাতা, কে আমার জননী, এত বড় বিশ্বসংসারে আমার আপনার লোক কেহ আছেন কি না জন্মাবধিই সেটী আমি জানলেম না। আমি আছি কেবল এইটুকু মাত্র জানি, আর কিছুই আমি জানি না। আপনি বোলছেন, 'উদাসীনের মত সর্বক্ষণ ভেবে ভেবে বুদ্ধিশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে' ; যথার্থই তাই, যথার্থই আমি উদাসীন ; সংসারে আমি এসেছি, সংসারে আমি আছি সংসারেই ভ্রমণ কোচ্ছি, কিন্তু সংসারটী কি, তা আমি জানি না। এমন অবস্থায় জীবন আমার বিড়ম্বনা জ্ঞান হয়। কেন বেঁচে আছি, তাও আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আপনি যদি সদয় হয়ে আমার পরিচয়টি আমারে বোলে দেন, তা হোলে—"

অকস্মাৎ রাজার মুখের সেই প্রফুল্লভাব তিরোহিত। আমার ঐ অর্দ্ধোক্তি শ্রবণে যেন কতই বিস্ময়ভাব প্রকাশ কোরে রুক্ষস্বরে তিনি বোল্লেন, "পরিচয় ? —তোমার ? তোমার পরিচয় আমি কি জানি ? পাগলের মত তুমি কি কথা কও ? কোথাকার কে তুমি কিছুই আমি জানতেম না ; আমার শ্বশুরের বাড়ীতে তোমাকে আমি প্রথম দেখি, দেখে তোমার প্রতি আমার দয়া হয়েছিল, নিজ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে যত্ন কোরে রাখবো, লেখাপড়া শিখাবো, কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিব, ঐরূপ আমার ইচ্ছা হয়েছিল ; সে কথা তোমাকে আমি বোলেছিলেম। তুমি শুনলে না, আমার সৎপরমর্শ গ্রাহ্য কোল্লে না, আপন বুদ্ধিতে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলে, তথাপি চৈতন্য হলো না। তার পরেও দুবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তখনো আমি তোমার ভাল চেষ্টা করেছিলেম, তাও তোমার ভাল লাগলো না। লোকের কাছে অকারণে তুমি আমার নিন্দা কোল্লে তাও আমি ভুলে গিয়েছিলেম, ছেলেমানুষ বোলে ক্ষমা কোরেছিলেম ; তদবধি তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা কোল্লে না। নিরাশ্রয় দেখে তোমাকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা আমি কোরেছি, সমস্তই বিফল হয়েছে। দয়াবশে কত সন্ধানের পর সন্ধান পেয়ে এখানে তোমাকে আমি আনিয়েছি, ভবিষ্যতে আর কোন কষ্ট না পাও, তার উপায় আমি কোরবো, স্বীকার কোরেছি, তাতেও তুমি সন্তুষ্ট থাকছো না। কোথাকার কথা কোথায় ! আমার কাছে তুমি তোমার পরিচয় চাও ! তোমার পরিচয় আমি কিরূপে জানবো ?'

কঠোর কর্কশকণ্ঠে রাজাবাহাদুর এই সব কথা বোল্লেন, আমি কিন্তু ভয় পেলেম না ; মনের উপদেশে আরো বরং অধিক সাহসে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "সব আপনি জানেন, কেন প্রতারণা করেন ? গরীব দেখে কেন আমার কথাগুলি উড়িয়ে উড়িয়ে দেন ? সমস্তই আপনি জানেন ; দয়া করুন। দয়া কোরে বলুন, কে আমি, কোথা আমার জন্ম, কোথায় আমার জনক-জননী,

কোথায় কোথায় কে আমার আপনার লোক বর্ত্তমান আছেন, অনুগ্রহ কোরে সেই কথাগুলি আমারে বলুন! সমস্তই আপনি জানেন।"

পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে রাজাবাহাদুর বোলে উঠলেন, "কি আমি জানি? তুমি একজন বিদেশী বালক, তোমার পরিচয় আমি কেমন কোরে জানবো? কোথায় তোমার জন্ম, কে তোমার বাপ, কে তোমার মা, সে সব কথা আমি কি জানি? আমাকে তুমি ও রকমে বিরক্ত কোরো না। যদি ভাল চাও, ঠাণ্ডা হয়ে কিছু-দিন আমার কাছে থাকো, পাগলামী দেখিও না। আমি অঙ্গীকার কোচ্ছি, সেই রকমে থাকলে আমি তোমার ভাল চেষ্টা করব; ও রকম পাগলামী দেখালে এখানে তুমি জায়গা পাবে না। বার বার আমি বোলছি, তোমার পরিচয়ের কোন কথাই আমি জানি না।"

রাজা মোহনলাল আমারে ভয় দেখালেন, "পাগলামী দেখালে এখানে জায়গা পাবে না" বোল্লেন। যেটী আমার সত্যকথা, রাজা বোল্লেন, সেইটি আমার পাগ-লামী। আমি ভয় পেলেম না; কোন প্রকার ভয়ের লক্ষণ না দেখিয়ে তৎ-ক্ষণাৎ আমি বোল্লেন, "কেন আপনি গোপন করেন? গরীব বোলে কেন আপনি আমারে অন্ধকারে রাখতে চান? কিছুই যদি আপনি জানেন না, তবে রুদ্রাক্ষ-গ্রামের জয়শঙ্করবাবুকে সে কথা আপনি কিরূপে বোলেছিলেন?"

কিঞ্চিৎ চমকিতভাবে রাজাবাহাদুর বোল্লেন, "কি আমি বোলেছিলেম? জয়শঙ্করের মুখে কি কথা তুমি শুনেছ? তোমার পরিচয় জয়শঙ্কর যেমন জানেন, আমিও সেইরূপ জানি। জয়শঙ্করের কাছে কি কথা আমি বোলে-ছিলেম? কিছুই ত আমার মনে হয় না। তুমি যদি—"

সত্য সত্যই আমি যেন তখন পাগলের মত হোলেম। যদিও অশিষ্টতা, যদিও অনুচিত, তথাপি আমি রাজার কথায় বাধা দিয়ে উত্তেজিত-স্বরে বোল্লেম, "কিছুই আপনার মনে হয় না? আচ্ছা, আমিই মনে কোরে দিচ্ছি। জয়শঙ্কর-বাবুর মুখে আমি শুনেছি, তাঁরে আপনি বোলেছিলেন, আমি আপনার স্বজাতি; আপনিও যে জাতি, আমিও সেই জাতি। জাতির কথা যদি আপনি জানেন, তবে আমার জন্মের কথাও অবশ্য আপনার জানা আছে, এই আমার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসেই এখানেই আমি এসেছি। কেন আপনি অস্বীকার করেন? কেন আর আমারে অন্ধকারে রাখেন? জাতি-জন্ম সম্বন্ধে চিরদিন আমি অন্ধকারে থাকি, সেইটিই কি অপনার ইচ্ছা? আপনার তুল্য মহৎলোকের সে রকম ইচ্ছা থাকা শোভা পায় না। দয়া করুন! যদি আমি আপনার কাছে কোন অপরাধ কোরে থাকি, ক্ষমা করুন! দয়া কোরে সত্যকথা বলুন! বিস্তর কষ্ট আমি পেয়েছি, আর কষ্ট সহ্য হয় না! আমার কষ্টের অনেক কথা আপনি জ্ঞাত আছেন। যারা আমার উপর দৌরাত্ম্য-করে, তাদের মধ্যে কোন কোন লোককে আপনি জানেন। আপনার উপদেশে একজন—"

রাজা যেন কেমন এক রকম অস্থির হোলেন; অস্থির হয়েই বেদীর উপর থেকে নেমে দাঁড়ালেন; দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে সরোষে আমারে বোল্লেন,

"আমি কি তবে মিথ্যাকথা বোলছি? যারা যারা তোমার উপর দৌরাত্ম্য করে, তাদের কি আমি জানি? আমার উপদেশে তোমার উপর দৌরাত্ম্য হয়? আমি কি তোমারে অন্ধকারে রাখছি? কি সব কথা তুমি বল? এ সব কথা শুনলে লোকে আমাকে কি বোলবে? তোমাকেই বা কি ঠাওরাবে? ও সব কথা তুলো না, ও সব কথা বোলো না; যা যা আমি বলি, আমার বাধ্য হয়ে তাই তুমি কর, বাচালতা দেখিও না; আমি যেন বুঝতে পাচ্ছি, দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। হোতেই পারে; হোতেই পারে; অনেক লোকের এই রকম হয়। আমি বরং তোমার চিকিৎসা করাবো; এখানে ভাল ভাল কবিরাজ আছে, ডাক্তার আছে, ভাল ভাল ঔষধ আছে, চিকিৎসকের ব্যবস্থামত চোল্লে শীঘ্রই তুমি আরাম হোতে পারবে।"

এই সব কথা বোলতে বোলতে একবার আকাশপানে চেয়ে রাজাবাহাদুর বোল্লেন, "আর বেলা নাই, চল আমরা কুঠীতে ফিরে যাই। যে সব কথা আজ তুমি আমাকে বোল্লে, নিকটে লোকজন থাকলে, ও রকম কথা বোলো না; লোকে কেবল প্রলাপ মনে কোরবে, তোমাকে উপহাস কোরবে, পাগল মনে কোরে হাততালি দিবে, গায়ে ধূলা দিবে; সাবধান! চল এখন!"

আমার মনের ভিতর তখন কিরূপ ভাবের উদয় হলো, বিশ্ববিধাতা ভিন্ন আর কেহ সে ভাব জানতে পাল্লেন না। রাজা চোল্লেন, নিস্তব্ধ হয়ে আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। অতঃপর শকটারোহণে কুঠীতে গিয়ে উপস্থিত হোলেম। সে রাত্রে সকল রাত্রি অপেক্ষা আমি অধিক অসুখী। বাবু মোহন-লাল রাজা উপাধি পেয়েছেন, সম্প্রতি তাঁর ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হয়েছে। আমি ভেবে-ছিলেম, পদমর্যাদা ও ধনমর্যাদার সঙ্গে তাঁর পূর্বপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়ে থাকবে; কিন্তু পুষ্পকাননে আজ তিনি যেরূপ অভিনয় কোল্লেন, তাতে বুঝলেম, কপটতা আরো যেন বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়েছে। নিশ্চয় আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমার পরিচয় তিনি জানেন; পূর্বে যতটুকু বুঝেছিলেম, এখন তদপেক্ষা অনেকটা পরিষ্কার বুঝেছি; কিন্তু সেই পরিচয়টি তিনি আমার কাছে প্রকাশ কোরবেন না, অপ্রকাশ রাখতে তিনি যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, লক্ষণে এইরূপ বুঝা গেল· কিন্তু কেন? আমার পরিচয় আমার কাছে প্রকাশ কোল্লে তাঁর কি কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে? আমি আমার পরিচয় জানতে পাল্লে তাঁর কি কোন প্রকার ইষ্টসিদ্ধির আঘাত হবে? গরীবের পরিচয় বোলে দিলে তাঁর অভিনব রাজা উপাধিতে কি কোন প্রকার আঘাত পাবে? বহু-চিন্তা কোরেও কিছুই আমি অবধারণ কোত্তে পাল্লেম না, হতাশে কেবল এইটুকুমাত্র অবধারণ কোল্লেম যে, চিরদিন আমারে জাতি-জন্মের পরি-চয়ে অন্ধকারেই থাকতে হবে। কেন না, ঐ মোহনলালবাবু ভিন্ন আর কেহ এই হতভাগ্য হরিদাসের সত্য পরিচয় জ্ঞাত আছে, এমন বোধ হয় না, বোধ হয়, রক্তদন্ত কিছু কিছু জানতে পারে; কিন্তু তার মুখে সত্যকথা বাহির করা দুরাশামাত্র। এত বড় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই বাবু মোহনলাল,—

অভিনব রাজা মোহনলাল, ইনি যখন এতদূর কৃপণতা কোচ্ছেন, তখন সেই একটা ধড়ীবাজ ডাকাত,—নরহন্তা অনুমান কোল্লেও মিথ্যা অনুমান হয় না,— সেই পাষণ্ড দস্যু আমার সম্বন্ধে সত্যকথা বোলবে কোনক্রমেই সেটা সম্ভব মনে করা যায় না ; তবে আর কার কাছে আমার অভীষ্টসিদ্ধির আশা ?— আশা নাই ! সূতিকাগারে আমি যেমন ছিলেম, কোথায় এলেম, কোথায় ছিলেম, কে আমি, কিছুই জানতেম না, মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেইরূপেই আমারে ঘোর অন্ধকারে থাকতে হবে, বিধাতার হয় তো ইচ্ছাই তাই। এখন আমি কি করি ? পরিচয়প্রাপ্ত হবার আশা তো দূরে গেল ! বিনা পরিচয়ে যাঁদের কাছে আমি এক রকমে পরিচিত হয়েছিলেম, যাঁদের কাছে আমি ভালবাসা পেয়েছিলেম, যাঁরা আমারে আদর-যত্নে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁরাই বা কে কোথায় থাকলেন ? অমরকুমারী কোথায় রইলেন ? অমরকুমারীর কাছে জীবনঋণে ঋণী আমি, সে ঋণ পরিশোধ কোত্তে পাল্লেম না। দুই জেলার দুই জায়গায় দুই মোকদ্দমা ; সে দুই মোকদ্দমার কিরূপ নিষ্পত্তি হলো, জানতে পাল্লেম না। ত্রিপুরায় যখন ছিলেম, বন্ধুবান্ধবগণকে চিঠি লিখে তত্ত্ব জানবার আশা কোরেছিলেম, জয়শঙ্কর চৌধুরী বাধা দিয়াছিলেন, আশা ফলবতী হয় নাই। এখন আমি পাটনায়, এখন আমি সে বিষয়ে স্বাধীন ; চিঠি আমি লিখবো, সে কথা রাজাকে জানাব না কি জানি, যে রকম প্রকৃতি, তাতে কোরে রাজা যদি জয়শঙ্করের মত আমার অভিলাষের পথে প্রতি-বন্ধক হয়ে দাঁড়ান ; তা হোলে মনোরথসিদ্ধি হবে না। রাজাকে জানাব না, সেই পরামর্শই ভাল। আপন সংকল্প আপনিই জানবো আর কাহাকেও জানতে দিব না ; দিনমানেও লিখবো না ; কল্য রাত্রিতে বাড়ীতে নিশুতি হবে, বাড়ীর সকলে যখন ঘুমাবে, সেই সময় আমি পত্রগুলি লিখে রাখবো।

এই আমার সংকল্প :—দৃঢ়সংকল্প। দিবসের শেষভাগে সুখীলোকে সুখ-ময় স্থানে ভ্রমণ করে ; শরীর সুস্থ হয়, মন সুস্থ হয়, নিশাকালে সুখে নিদ্রা যায়। অসুখী লোকে তাদৃশ রমণীয় স্থান পরিভ্রমণ কোরে সুস্থ হোতে পারে না, নিদ্রাও তারে আলিঙ্গন করে না। আমি অসুখী, রাজার সঙ্গে পুষ্পকুঞ্জ পরিভ্রমণ কোরে এলেম, উপকার পেলেম ?—দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল, প্রাণের ভিতর আঘাত লাগলো, নিদ্রাদেবী আমারে একবারও দয়া কোল্লেন না ; সমস্ত রজনী আমি অসুখী হয়েই জাগরণ কোল্লেম। একটি সুখ, ঐ কল্পনা ;— বন্ধুবান্ধবগণকে চিঠি লিখবো।

রজনী প্রভাত। সূর্য্যোদয়ের পূর্বে গাত্রোত্থান কোরে আমি একবার নীচে নেমে এলেম, সম্মুখের রাস্তাটি উদাসনয়নে দর্শন কোল্লেম ; সে ভাব আমার মনে কেন উদয় হয়েছিল, আমি নিজেই তা জানতেম না। অপরাপর স্থানে, অপরাপর সময়ে, যে যে বাড়ীতে আমি আশ্রয় পেয়েছিলেম, সেই সকল বাড়ীতে একটি না একটি অনুগত লোকের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা ঘোটেছিল। বাবু হোক, সরকার হোক, সামান্য একজন চাকর হোক, যেই হোক, একটি না একটি

লোকের সঙ্গে আমার সদ্ভাব সঞ্চারিত হতো ; কথা কহিবার দোসর পেতেম ; এখানে সেটি ঘটে নাই। প্রথমে দেখেছিলেম, দেওয়ান।

আমার সঙ্গে কথা কোয়েছিলেন, এখনো কথা হয়, কিন্তু সে সকল কথা যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। অপরাপর লোকের সঙ্গেও কথা হয়, সে সকল কথাতেও কোন রস থাকে না। রাজার সঙ্গেও কথা চলে, কিন্তু সেই সকল কথায় আমার হৃদয়ের ভার যেন আরো বেশী বেশী গুরুভার মনে হয়। মনের কথা বোলতে পারি, পাটনার রাজবাড়ীতে তেমন সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, একটি লোকও পাই না, বাড়ী থেকে বেরিয়ে সহর দেখতে যাই না, সর্বদাই আমারে বাড়ীর মধ্যে বাস কোত্তে হয়। রাজাবাহাদুর আমারে গত কল্য উদ্যানে নিয়ে গিয়েছিলেন, সুখী হব ভেবেছিলেম, বিপরীত হয়ে গেল। আজ আমি রাস্তা দেখছি কেন? পালিয়ে যাবার জন্য কি?—তা নয় ; চিঠি লিখতে হবে। কাগজ, কলম, কালি, ডাকের টিকিট আবশ্যক আছে। রাজবাড়ীতে সমস্যা আছে, সমস্তই হয় তো পেতে পারি, কিন্তু আমি চাইবো না ; মনের কথা কাহাকেও জানতে দিব না ; রাজকিঙ্করগণের মধ্যে কাহাকেও সেই উপকরণ-গুলি সংগ্রহ কোরে দিবার অনুরোধ কোরবো না, বাজার থেকে নিজেই সেই-গুলি খরিদ কোরে আনা আমার অভিলাষ ; সেই নিমিত্তই রাস্তা-দর্শন। কোন দিক দিয়ে কোথায় যেতে হবে সেইটি আমি ঠিক কোরে রাখলেম। অপরাহ্ণে কাহাকেও কিছু না বোলে রাজবাড়ী থেকে আমি বেরুলেম। এ বাড়ীকে বার-ম্বার আমি রাজবাড়ী বোলছি কেন? ভদ্রাসন না হোলেও মোহনবাবু এখন রাজা ; অতএব বাড়ীর নাম এখন রাজবাড়ী।

প্রয়োজন সিদ্ধ কোরে সন্ধ্যার মধ্যেই আমি ফিরে এলেম। দিনমানেও রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সন্ধ্যার পরেও সাক্ষাৎ হলো, পূর্বদিনের কোন কথাই তিনি উত্থাপন কোল্লেন না, তাঁর মুখের ভাবেও কোন প্রকার বিরক্তিলক্ষণ লক্ষিত হলো না, আমি সে প্রসঙ্গে তাঁরে কোন কথা বোল্লেম না। নিত্য যেমন হয়ে থাকে, সেই রকম পাঁচ প্রকার মজলিসী কথায় সম্ভবমত পরিতৃপ্ত হওয়া গেল। রাত্রি দশটা। আহারাদির পর সকলে স্ব স্ব স্থানে শয়ন কোল্লেন, আমার শয়নের জন্য যে ঘরটি নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, সেই ঘরে আমি বোসলেম।

এক ঘণ্টাকাল অনেক রকম আমি ভাবলেম, তার পর চিঠি লেখা আরম্ভ কোল্লেম। ঘরের দরজা বন্ধ করা হয়েছিল ; কি আমি কোচ্ছি, হঠাৎ কেহ এসে দেখতে পাবে, সে ভয় ছিল না, নির্ভয়ে আমি চিঠি লিখতে লাগলেম। সাত-খানি চিঠি ; কাশীতে রমণবাবুর নামে একখানি, বরদায় রাজকুমার রণেন্দ্ররাও বাহাদুরের নামে একখানি ; মুর্শিদাবাদে দীনবন্ধুবাবু, পশুপতিবাবু, শান্তি-রাম দত্ত, মণিভূষণ দত্ত, এই চারি নামে চারিখানি আর মাণিকগঞ্জে হরিহরবাবুর নামে একখানি, এই সাতখানি। মোড়ক কোরে শিরোনাম লিখে, সেই পত্রগুলি আমি শয্যাতলে রেখে দিলেম ; পরদিন প্রভাতে প্রভাতী-বায়ুসেবন-ব্যাপদেশে সেগুলি আমি স্বয়ং ডাকঘরের ডাকবাক্সে দিয়ে এলেম। একটা ভাবনা দূর হলো।

দ্বিতীয় কল্প

হায় হায়!—আমি পাগল!

অষ্টাহ অতীত। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে নিত্য আমার দেখা হয়, নিত্য তিনি আমারে উৎসাহবাক্যে আশা প্রদান করেন; আশ্রিতের প্রতি আশ্রয়দাতার যেরূপ স্নেহ থাকা সম্ভব, আমার প্রতি রাজা মোহনলাল সেইরূপ স্নেহ প্রদর্শন করেন; তাঁর কপট ব্যবহার জেনে শুনেও ঐ প্রকার বাহ্য ব্যবহারে আমি তুষ্ট থাকি। খেলাঘরের খেলার ন্যায় মিথ্যাবস্তুগুলিকে মনে মনে আমি সত্য সাজে সাজাই। কাজকর্ম্ম কোরবো, রাজাবাহাদুর আমারে ভাল ভাল কাজকর্ম্ম দিবেন, এইরূপ আশা করি, এইরূপ আশা পাই। যে সব কথা অন্তরে জাগে, এক এক সময় সে সব কথা ভুলে ভুলে থাকি।

দিবসে উপবেশনের নিমিত্ত আমার একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল, প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ সে গৃহে হঠাৎ প্রবেশ কোত্তেন না। একদিন অপরাহ্ণে একটি ভদ্রলোক সহাস্যবদনে সহসা আমার সম্মুখে উপস্থিত হোলেন। কথা-বার্ত্তা কিছুই নাই, লোকটি আপন মনে হাসতে হাসতে আমার বিছানার উপর বোসলেন, হাসতে হাসতে খানিকক্ষণ অনিমেষনেত্রে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন; ভাব আমি কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। তাঁর উপস্থিতির কারণ জানবার অভিলাষে কোন কথাই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। তিনিও নিস্তব্ধ, আমিও নিস্তব্ধ। বিশেষের মধ্যে তাঁর মুখে হাস্য ছিল, আমার মুখ বিস্ময়ভাব প্রকাশক।

লোকটির পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের ন্যায়, চেহারায় কিন্তু তদ্রূপ ভদ্রতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সচরাচর বড়লোকের দরবারে মোসাহেব লোকের যেরূপ ভাব-ভঙ্গী দৃষ্ট হয়, এই লোকের ভাব-ভঙ্গী সেই প্রকার। বাক্যশ্রবণ না কোল্লে প্রকৃতি বুঝা যায় না; প্রকৃতির বিচারে আমি অক্ষম থাকলেম। লোক-টির চক্ষু আমার মুখের দিকে, আমার চক্ষু তাঁর মুখের দিকে। এই ভাবে থাকতে থাকতে হেসে হেসে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার কি কোন প্রকার অসুখ আছে?"

অদ্ভুত প্রশ্ন! কস্মিনকালেও দেখা-সাক্ষাৎ নাই, আমার সুখাসুখের কথা কেহ তাঁরে বলেও নাই, অকস্মাৎ তিনি আমারে অমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি উত্তর কোল্লেম না; দুই তিনবার মস্তকসঞ্চালন কোরে পুনরায় তিনি আপনা আপনি বোল্লেন, "ওহো! সেই কথাই ঠিক বটে! সে রকম না হোলে এ রকমটা হয় না সেই কথাই ঠিক বটে! আত্মগত বাক্যে এইরূপ মন্তব্য দিয়ে পূর্ব্ববৎ হাসতে হাসতে আমারে তিনি বোল্লেন, "দেখি দেখি, তোমার হাত-খানি একবার দেখি।"

আমি মনে কোল্লেম, হয় তো গণকঠাকুর; সামুদ্রিকবিদ্যায় পণ্ডিত; এক

মনে কোরে আমি আমার দক্ষিণ করতলটি তাঁর সম্মুখে বিস্তার কোল্লেম। হাস্য কোরে তিনি বোল্লেন, "ও রকম নয়, ও রকম নয়, নাড়ী পরীক্ষা করা আবশ্যক।"

হাতখানি সরিয়ে নিয়ে বিরক্তভাবে আমি বোল্লেম, "শরীরে আমার কোন পীড়া নাই নাড়ী-পরীক্ষার কিছুই প্রয়োজন আমি দেখ্‌ছি না।"—আমার কথা তিনি শুনলেন না নিকটে সোরে এসে আমার হাতখানি ধোরে তিনবার তিনি টিপে টিপে দেখলেন, মাথা হেলিয়ে হাতের কাছে কাণ পাতলেন, তার পর হুঁ হুঁ শব্দ উচ্চারণ কোরে পূর্বের ন্যায় তিনবার মস্তকসঞ্চালন কোল্লেন ;—হাস্‌তে হাসতে বোলতে লাগলেন, "সে রকম কিছু নয় বটে ; কিন্তু কোথা থেকে তুমি এসেছ ? কোন কোন লোক তোমাকে বুঝি অনেক কষ্ট দিয়েছে ? তুমি বুঝি দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়িয়ে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পোড়েছ ? লোকেরা বুঝি তোমার অন্বেষণে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? কোথাও বুঝি তুমি স্থির হোতে পাচ্ছো না ? নাড়ীর লক্ষণে সেই রকম আমি দেখ্‌ছি। অজ্ঞাত, লোকেরা তোমার পরম শত্রু। কেন তারা তোমার উপর সে রকম দৌরাত্ম্য করে ? কেন তারা তোমার পাছে পাছে দেশে দেশে ঘোরে ?"

যখন তিনি আমার নাড়ী-পরীক্ষা করেন, সে সময় আমি ভেবেছিলেম, তিনি হয় তো বৈদ্যরাজ, শেষের কথাগুলি শুনে মনে কোল্লেম, তা নয় ; কেবল বৈদ্য-রাজ নয়, গণনাবিদ্যায় তাঁর দক্ষতা আছে। যে সব কথা তিনি বোল্লেন, যদি অন্য কারো মুখে না শুনে থাকেন, তবে তো সে সব কথায় তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বে যতটা বিরাগ জন্মেছিল, ততটা থাকলো না, গণক-ঠাকুর মনে কোরে তাঁর গুণপণার উপর আমার কিঞ্চিৎ ভক্তির সঞ্চার হলো। তখনো তিনি মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন। হাসে কেন ? আমি কষ্টে পোড়েছি, লোকের উপদ্রবে কষ্ট পেয়েছি, সে সব কথা জানতে পেরে কাহার মুখে কি হাসি আসে ? লোকটির স্বভাব বুঝি ঐ রকম, সর্বদাই হাস্য করা বুঝি তাঁর অভ্যাস, এইরূপ বিবেচনা কোরে দুই চারি কথায় আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা হাঁ, লোকে অকারণে আমার শত্রু হয়েছে, তারা আমারে বিস্তর কষ্ট দিয়েছে, এখনো পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই, বেশী কথা কি, বাগে পেলে তারা আমারে প্রাণে মাত্তে পারে, সে সব আমি জানতে পেরেছি।"

গণক, বৈদ্য অথবা সামুদ্রিক এই তিনের মধ্যে লোকটি যাই হোন, বিশ্বাস কোরে আমি তাঁরে বোল্লেম, "শত্রুর কুচক্রে সর্বদাই আমি বিপদাপন্ন।" সেই কথা শুনে সেইভাবে তিনি বোল্লেন, "হোতেই পারে, হোতেই পারে ; তুমি মিথ্যাকথা বোলছো না। সত্য সত্যই তোমার পাছে শত্রু লেগেছে। তুমি বেশ ছেলে, কেন তারা তোমার শত্রু হলো, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, তোমার বাড়ী কোন গ্রামে ? তোমার পিতার নাম কি ?"

বিশ্বস্তভাবে আমি উত্তর কোল্লেম, "তা আমি জানি না, বাড়ী-ঘর আমার নাই, মাতা-পিতার পরিচয় আমি অজ্ঞাত, যেখানে যখন আমি যাই, এক একটি মহৎলোকের কাছে আশ্রয় পাই, আমার দুর্দ্দশা শুনে তাঁরা দুঃখপ্রকাশ করেন ; সেখানেও আমার সঙ্গে সঙ্গে শত্রু ঘোরে, কোথাও আমি শান্তি পাই না। এই

রাজাবাহাদুর পূর্বে আমারে দেখেছিলেন, নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর কাছে থাকতে আমি সম্মত হই নাই ; মধ্যে কিছুদিন দেখা-শুনা ছিল না, সম্প্রতি তিনি আমারে এইখানে আনিয়াছেন ; এখন এইখানেই আমি আছি।"

একবার ঊর্ধ্ব দিকে দৃষ্টিপাত কোরে লোকটি বোল্লেন, "হাঁ হাঁ ; সেই কথাই তো আমি বোলছি, শত্রুর ভয়ে, শত্রুর উপদ্রবে কোথাও তুমি স্থির হোতে পাচ্ছো না। রাজাবাহাদুর আনিয়েছেন, এইখানেই তুমি আছ, সে কথা আমি জানতে পেরেছি ; কিন্তু আচ্ছা, কারা তোমার শত্রু, কি কারণে তারা তোমার শত্রু, সে কথা তুমি বোলতে পার ? শত্রুপক্ষের নাম তুমি জানো ?"

তৎক্ষণাৎ আমি কোন উত্তর দিলেম না , মনে কোল্লেম, এ সকল কি কথা ? আমার অবস্থার কথা ইনি জানেন ; শত্রু লেগেছে, সে কথাও বোলছেন, বোলতে বোলতে শত্রুপক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করেন কেন ? নাম যদিও আমি জানি, কিন্তু সেই নামের সঙ্গে কতদূর টান পড়ে সেটা ভাবতে গেলে প্রকাশ কোত্তে সাহস হয় না। শত্রু আমার একটি নয়, অনেক ; কার নাম বোলতে কার নাম আনবো, কোথায় গিয়ে পরিণাম দাঁড়াবে, ঠিক নাই, ফল বরং বিপরীত দাঁড়াবার সম্ভাবনা। এইরূপ চিন্তা কোরে আমি উত্তর কোল্লেম, "গুপ্তশত্রুর নাম নিঃসন্দেহে জানা যেতে পারে না। যাদের উপর আমার সন্দেহ হয়, তারা আমারে কিরূপ বিবেচনা করে, তাও আমি জানি না। অমুক অমুক আমার শত্রু, অমুক অমুক আমার প্রাণবিনাশে উদ্যত, ঠিক ঠিক তা যদি আমি জানতেম তা হোলে আদালতের সাহায্য নিতে পাত্তেম। যারা গোপনে থেকে যুদ্ধ করে, তাদের নাম বোলতে আমি ভয় পাই।"

লোকটি আমার কথার প্রতিধ্বনি কোরে বোল্লেন, "তা তো বটেই ! তা তো বটে ! ঠিক কথাই তুমি বোলেছ ! নাম বোলতে তুমি ভয় পাও ! আমরাও ভয় পাই। আহা ! বিস্তর কষ্ট তুমি পেয়েছ ! যারা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তারা শাস্তি পাবে ; এখানে না পায়, মরণান্তে যমলোকে অথবা অপর কোন পরলোকে অবশ্যই তারা শাস্তি পাবে। ও কি ? তুমি অমন কোরে কাঁদ কেন ? অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে ; শত্রু হয়েছে, ধরা পোড়বে ; ভয় কি ? রাজার বাড়ীতে এসেছ, রাজার বাড়ী আছ, কিসে তোমার ভয় ? রোদন সংবরণ কর ; শীঘ্রই আবার আমি তোমার কাছে আসছি, এখান থেকে তুমি কোথাও যেয়ো না।"

এই সব কথা বোলে, মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে লোকটি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোথাকার লোক ?—কে সে ?—কি সব কথা বোলে গেল ? আমি কাঁদছি ! কে তারে বোল্লে আমি কাঁদছি ? লোকটা কোন চক্ষে দেখলে আমি কাঁদছি ? প্রথমেই তারে দেখে, তার কথা শুনে, আমি মনে কোরেছিলেম, গণকঠাকুর, তার পর ভেবেছিলেম বৈদ্যরাজ, এখন বুঝতে পাচ্ছি, কিছুই না। ভণ্ডলোক ! যে সকল লোক কেবল কথা বেচে খায়, পাঁচ রকম কথা বোলে লোকের মন ভুলাবার চেষ্টা পায়, 'অসাধ্য রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানি' বোলে

যারা অবোধ লোকের পয়সা ফাঁকি দেয়, ঐ লোক হয় তো সেই দলের লোক হবে, এইরূপ আমার সন্দেহ হলো।

সন্দেহের কথাটা মনে মনে আলোচনা কোচ্ছি, সম্মুখে দেখি, আর একটি লোক। যে লোকটিরও অধর-ওষ্ঠে মৃদু হাস্য। যে আসে, সেই হাসে, ব্যাপার কি? আমারে দেখলে নূতন লোকের হাসি পায়, পাটনায় এসে আমি কি সেই রকমের কোন আশ্চর্য বস্তু হয়ে পোড়েছি? লোকটি এলো, কৃষ্ণঠাকুরের মত পায়ের উপর পা দিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়ালো, হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি হে বালক! তোমারই নাম হরিদাস? জায়গায় জায়গায় তুমি না কি বিস্তর কষ্ট পেয়েছ? অজানা লোকেরা বা কি তোমার উপর বেজায় দৌরাত্ম্য কোরেছে? হায় হায়! এমন লক্ষ্মীছেলে তুমি, এমন চমৎকার রূপ তোমার, হায় হায়! তোমার উপর দৌরাত্ম্য? কেন তারা তোমার উপর দৌরাত্ম্য করে? মানুষ?—না ভূত? হাঃ। হাঃ হাঃ! ভূতেরাই তোমার মত ছোট ছোট ছেলে-দের উপর প্রতাপ দেখায়! নিশ্চয় তারা ভূত!"

লোকটি ঝড়ের মত একসঙ্গে কত কথাই বোলে গেল, একটি কথাতেও আমি কোন উত্তর দিলেম না। নূতন লোকে অত কথা কেন বলে, কোন কথার সঙ্গে কোন কথার মিল নাই, বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপের ন্যায় প্রায় সকল কথাই অসম্বন্ধ। লোকটির উদ্দেশ্য কি, বুঝা গেল না। তার মুখপানে আমি চেয়ে দেখলেম, কেবল হাস্য; মাঝে মাঝে যতবার চেয়ে দেখেছি, ততবারই দেখেছি, সমভাবে হাস্য। শেষবার যখন আমি দেখলেম, তখন সেই মুখে একটু গাম্ভীর্য্য অনুভূত হলো। গম্ভীরভাব ধারণ কোরে লোকটি তখন আপন মনে বোল্লে, "তাই তো! তাই তো দেখছি! কান্ডখানা কি? এত অল্পবয়সে —আচ্ছা, আচ্ছা,—এখনো উপায় আছে।"

"উপায় আছে" বোলতে বোলতে সেই লোক ধীরে ধীরে বাহির হয়ে গেল। কিসের উপায় আছে, আমি কিছু অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। সন্ধ্যার পর আর একজন? সেই তৃতীয় ব্যক্তিও পূর্বোক্ত দুইজনের ন্যায় অভিনয় কোরে গেল। প্রথম লোকটির কথায় বরং আমি দুই চারিটি উত্তর দিয়েছিলেম, এদের দুইজনের বক্তৃতার সময় উদাসভাবে আমি মৌন। কেন তারা এসেছিল, কেন তারা ঐ সব কথা বোল্লে, "আহা! আহা!" বোলে কেন তারা দুঃখপ্রকাশ কোল্লে, তারাই তা বোলতে পারে, আমি বোলতে পারি না। তারা নূতন; পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে ভদ্রলোক, কথাগুলা কিন্তু ভদ্রলোকের কথার মত বোধ হলো না। আমার কষ্টের কথা উত্থাপন কোরে কেন তারা ততটা বাগাড়ম্বর বিস্তার কোরে গেল, আমার কষ্টের কথায় কেন তারা কষ্ট জানালে, সন্দেহে সন্দেহে তাই আমি ভাবতে লাগলেম।"

এই ঘটনার পর দশদিন অতিক্রান্ত। যারা ঐরূপে আমার বিস্ময় উৎপাদন কোরেছিল, এই দশদিনের মধ্যে তারা কেহই আর একদিনও আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে এলো না। রাজার সঙ্গে আমি দেখা করি, রাজা মিষ্ট মিষ্ট কথা কন, হিতোপদেশ শিক্ষা দেন, হাসির কথা উত্থাপিত হোলে একটু একটু হাস্য করেন,

বাগানের কথাটা একবারও আমার সাক্ষাতে আর উত্থাপন করেন না ; এই রকমে দিন যায়। একদিন সন্ধ্যার পর রাজা আমারে ডেকে পাঠালেন। যে ঘরে তিনি বসেন, সেটির নাম খাসকামরা, সেই ঘরে গিয়ে আমি উপস্থিত হোলেম।

দেড় হাত উচ্চ গদীর উপর রাজাবাহাদুর উপবিষ্ট। আশেপাশে অনেক লোক। রাজার অতি নিকটে পাঁচজন ; সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন রাজ-গদীস কিনারার উপর হাতের কনুই রেখে, রাজার দিকে একটু হেলে, তাঁর কাণের কাছে কি যেন পরামর্শ দিচ্ছিল। বড় বড় লোকের মজলীসে ঐ রকমের লোক অনেক থাকে। গদীর গায়ে জানু রাখা, কণুই রাখা, মাথা রাখা, সেই সব লোকের শ্লাঘাজনক দাম্ভিকতার পরিচয় ; তারা ভাবে, আমাদের এইরূপ ভঙ্গী দেখে লোকে ভাবুক, আমরাও এক একজন বড়দলের লোকের মধ্যে গণ্য। বড়লোকের কাণের কাছে মুখ রেখে মিছামিছি মন্ত্রপড়াও ঐরূপ শ্লাঘা-বিজ্ঞাপক ; অমুক লোক অমুক রাজার অথবা অমুক বাবুর পরম প্রিয়পাত্র, দর্শকলোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করা সেই সকল অভিমানী লোকের গূঢ় অভিপ্রায়। বড় বড় মজলীসে সর্বদা যাঁরা গতিবিধি করেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁরা সকলেই জানেন, অনেক লোকেরই ঐ প্রকার অভ্যাস।

আমি উপস্থিত হোলেম। বেদীর উপর পুরাণবক্তা কথকঠাকুর, মঞ্চোপরি রাজনীতিবক্তা বাগ্মীবাবু, নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে নান্দীপাঠক রসিক নট,—সঙ-যাত্রার আসরে রাক্ষস-বানররূপী নূতন সং, এই সকল মূর্ত্তির প্রতি দর্শক-লোকের চক্ষু যেমন সুস্থিরভাবে আকৃষ্ট থাকে, রাজমজলীসের সমস্ত লোকের চক্ষু সেইরূপ আমার প্রতি সমাকৃষ্ট। সমস্ত চক্ষুর সঙ্গে রাজার চক্ষু প্রথমে আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, একটু পরে নেত্রোত্তোলন কোরে আমারে দেখে প্রসন্নবদনে রাজা বোল্লেন, "এসো হরিদাস, বোসো।"

একটি পাশে চুপটি কোরে আমি বোসলেম। লোকেরা খানিকক্ষণ সমভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকলো ; দুই একজন একটু একটু হেলে হেলে পরস্পর ফুস ফুস কোরে কি যেন বলাবলি কোত্তে লাগলো, ভাব আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। হাঁ, একটি কথা বোলতে আমি ভুলেছি। ইতিপূর্বে তিন সময়ে যে তিনটি লোক আমার কষ্টে সমবেদনা জানাতে আমার ঘরে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনকে ঐ মজলীসে আমি দেখেছিলেম ; রাজার অতি নিকটে যে পাঁচটি লোক উপবিষ্ট ছিল, তাদেরই মধ্যে সেই লোক। সেই পাঁচজনের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ কোরে রাজাবাহাদুর আমারে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস ! এখানে এসে অবধি তুমি যে প্রকার উন্মনা উন্মনা ভাব দেখাচ্ছো, মাঝে মাঝে লোকের সঙ্গে,—কেবল লোকের সঙ্গে কেন, মাঝে মাঝে আমার কাছেও তুমি যে প্রকার অর্থশূন্য তাৎপর্য্যশূন্য কথা কও, তাতে যেন বুঝা যায়, নানা কষ্টে, নানা ভাবনায় তোমার বুদ্ধি বিচলিত হয়েছে, মাথা যেন কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছে চাউনীতেও এক এক সময় সেইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই পাঁচটি বাবু এখানকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ; পরীক্ষা কোরে এই ডাক্তারবাবুরা যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, সেই ব্যবস্থামতেই তোমাকে চোলতে হবে। আমার কাছে তুমি এসেছ,

তুমি পীড়িত, যাতে কোরে তোমার সুচিকিৎসা হয়, সেরূপ বন্দোবস্ত করা আমারই কর্ত্তব্য।"

পাঁচজনের মুখের দিকে এক একবার চেয়ে, রাজার মুখের দিকে দুটি চক্ষু আমি স্থির কোরে রাখলেম। ডাক্তারের মধ্যে একজন সেই সময় মন্তব্য দিলেন, "পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন, মুখ-চক্ষের ভাব দেখেই প্রকৃত অবস্থা আমরা বুঝতে পেরেছি। বিশেষ, এই নীলাম্বরবাবু যে সব কথা বোলেছেন, তাতে আর নূতন পরীক্ষা করা আমরা আবশ্যক বিবেচনা কোচ্ছি না। রোগ এখনো প্রবল হয় নাই, দুই একটা লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র, সামান্য ঔষধেই আরাম হয়ে যাবে।"

নীলাম্বরবাবুর কথার উপরেই ডাক্তারগুলির পূর্ণবিশ্বাস। নীলাম্বরবাবু কে? যে তিনটি লোক পূর্ব্বে আমারে ছলনা কোরে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে যাঁকে আমি এই মজলীসে চিনেছি তাঁরই নাম নীলাম্বরবাবু; মোটামুটি পরিচয় পেয়ে এখন আমি চিনলেম, ইনি একজন ডাক্তার। হা জগদীশ্বর! ডাক্তারের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? শরীর আমার বিলক্ষণ সুস্থ, অবস্থাচিন্তনে মন চাঞ্চল্য, কি কারণে চাঞ্চল্য, আমিই তা জানি, সে চাঞ্চল্যের কারণ নিরূপণ করা ডাক্তার-কবিরাজের সাধ্য নয়। তবে কেন আমি ডাক্তারের চক্রে নিক্ষিপ্ত হোলেম?

উদ্বিগ্ন হয়ে এই রকম আমি ভাবছি, দলের ভিতর থেকে আর একটি লোক একটু মাথা উঁচু কোরে সেই সময় বোলে উঠলেন, "ততদূর বোধ হয় যেতে হবে না; রঘুনাথবাবু বোলছেন, সামান্য ঔষধেই আরাম হবে। আমি শুনেছি, ইংরাজীমতের ডাক্তারখানায় সামান্য ঔষধ থাকে না; যতই সামান্য হোক, সমস্ত ঔষধের শক্তি গরম; এ ছোকরাকে গরম ঔষধ দিবার দরকার নাই। আমার ঘরে পঞ্চানন্দের বিল্বপত্র আছে, সেই বিল্বপত্র ধুয়ে একটু খাইয়ে দিলেই এক রাত্রির মধ্যে এ রোগটা সেরে যাবে।"

হো হো শব্দে সকলেই হেসে উঠলেন, ম্রিয়মাণ হয়ে আমি মাথা হেঁট কোল্লেম; মনে ভাবলেম, এই জন্য কি রাজাবাহাদুর আমারে পাটনায় আনালেন? গুপ্তরথীরা গুপ্তশর সন্ধান কোরে আমারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, সে এক রকম ছিল ভাল, এখন কি না বহুরথী একত্র হয়ে আমার এই ক্ষুদ্রপ্রাণ সংহার কোত্তে উদ্যত! বিদ্রূপের অগ্নিবাণে আমার অন্তরাত্মা যেন জ্বলে যাচ্ছে! ভাবলেম এই রকম, মুখে কিছু বোল্লেম না। বুঝলেম রঘুনাথবাবু একজন ডাক্তারের নাম, রঘুনাথের ব্যবস্থা খণ্ডন কোরে কিম্বা খণ্ডন করবার চেষ্টা কোরে যিনি পঞ্চানন্দের বিল্বপত্রের ব্যবস্থা দিলেন, তিনি একজন কবিরাজ। ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়ে যাঁরা কেবল অর্থলোভে ডাক্তার-কবিরাজের নাম কলঙ্কিত করেন, তাঁদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। একবার আমি শুনেছিলেম, একজন অর্থলোভী জমীদার তুচ্ছ বিষয়লোভে আপনার বাড়ীর একটি স্ত্রীলোককে পৃথিবী থেকে তফাৎ করবার অভিপ্রায়ে একজন ডাক্তারের আর

দুজন বৈদ্যবংশীয় কবিরাজের গুপ্তসাহায্য গ্রহণ করেন, বিসূচিকা রোগ, এইরূপ প্রকাশ কোরে চিকিৎসকের সেই বিধবা বধূটিকে প্রাণঘাতক ঔষধ সেবন করান। অনবরত ঘর্ম্ম হয় ; আবীরে ঘর্ম্ম নিবারণ করে, সেই ছলে বিধবার সর্বাঙ্গে সাত সের আন্দাজ আবীর মাখানো হয় ; আবীর সেই আবীরাকে অতি শীঘ্র যমালয়ে প্রেরণ করে। ধর্ম্মশীল চিকিৎসকেরা সেই মহৎ কার্য্যে লক্ষাধিক মুদ্রা পুরস্কার পেয়েছিলেন এইরূপ আমার শুনা আছে, যখন এই পাটনাসহরে বিনা রোগে ডাক্তার-কবিরাজের চিকিৎসায় আমার অদৃষ্টে কি ঘটে, ভগবান কি করেন, কিছুই আমি বোলতে পারি না।"

মজলীসে অনেক প্রকার পরামর্শ হলো ; চুপি চুপি পরামর্শই অনেক, সকলের সকল কথা আমি শুনতে পেলেম না। মজলীস থেকে উঠে আমি আসি আসি মনে কোচ্ছি, এমন সময় রাজাবাহাদুর বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! আমার কথায় তুমি অবহেলা কোরো না ; যা আমি বুঝেছি, তাই তোমাকে বোলেছি ; তোমার চিকিৎসার জন্যই এই বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তারগুলিকে আমি ডেকেছি। অবহেলা কোরো না, অবাধ্য হয়ো না ; ডাক্তার-কবিরাজের অবাধ্য হোলে রোগ তো সারেই না, বরং বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। আমার এই কথাগুলি তুমি মনে রেখো।"

আমি বিবেচনা কোল্লেম, যাঁর যা কিছু বলবার ছিল, শেষ হয়ে গেল, তবে আর কেন সেখানে বোসে থাকা। ধীরে ধীরে আমি উঠলেম ; মজলীসকে নমস্কার কোরে ভগ্নান্তঃকরণে বিদায় চাইলেম। প্রায় আধ ঘণ্টা মজলীসে ছিলেম, অতক্ষণের মধ্যে একটি কথাও আমার রসনা থেকে নির্গত হয় নাই, বিদায়-প্রার্থনাই সে মজলীসে আমার প্রথম কথা।

কতকগুলি লোক হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। হাস্যের কারণ বুঝতে না পেরেও আমি অপ্রতিভ হোলেম। পূর্বে যাঁরা কথা কয়েছিলেন, জানা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম রঘুনাথ। যিনি রঘুনাথ, তিনি একজন ডাক্তার ; আমার প্রস্থানের উপক্রমে বাধা দিয়ে, রাজার নিকট থেকে উঠে এসে, তিনি আমারে বোল্লেন, "সত্য সত্যই বুদ্ধির স্থিরতা নাই ; কোথায় চালেছ ?—বোসো ; তোমার রূপদর্শনের জন্য এখানে তোমাকে আহ্বান করা হয় নাই, তোমার প্রতি আমাদের গুটিকতক জিজ্ঞাস্য আছে ; বোসো ; অত ব্যস্ত হোচ্ছ কেন ? তোমার চিকিৎসার জন্য রাজাবাহাদুরের আহ্বানে আমরা এখানে এসেছি ; ব্যাধিটা অগ্রে নির্ণয় করা হোক, তার পর তোমার ছুটি।"

অপ্রস্তুত হয়ে পুনরায় আমি আসন গ্রহণ কোল্লেম। রাজাবাহাদুর একবার আমার দিকে চাইলেন ; কিন্তু মুখে কিছু বোল্লেন না। দশদিন পূর্বে যে তিনটি লোক এসে আমার গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন এই মজলীসে উপস্থিত আছেন এ কথা আমি পূর্বে বোলেছি। সেই লোকটি ছাড়া ডাক্তারের দলের অপর চারিটি লোক সে সময় রাজার নিকট থেকে সোরে এসে আমারে ঘিরে বোসলেন ; সুস্থির নয়নে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। দর্শনকার্য্যের অবসানে একজন একটু বিস্ময় প্রকাশ কোরে বোল্লেন,

"এ ছোকরা যথার্থ অনেক কষ্টভোগ কোরেছে, অনেক লোক এই ছোকরার শত্রু হয়েছে, এক একটা শত্রুর চেহারার ছায়া এই ছোকরার নেত্র পুতুলীতে দেখা যাচ্ছে।"—প্রতিধ্বনি কোরে আর একজন বোল্লেন, "ঠিক, ঠিক, আমিও যেন তাই দেখতে পাচ্ছি। মানুষ চিনতে পাচ্ছি না, কিন্তু ছায়াগুলো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেশ দেখা যাচ্ছে।"—তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লেন, "শুধু তাই নয়, এ ছোকরা এত বয়স পর্য্যন্ত নিজের পরিচয় নিজে জানে না, সেই জন্য চক্ষুর পুতুলীতে স্পষ্ট কাহার মুখ দেখা যায় না, কেবল ছায়া দেখা যায়।"—চতুর্থ ব্যক্তির প্রকৃতি কিছু গম্ভীর, মুখের আকৃতিও গম্ভীর। তাঁর মুখে দাড়ী ছিল ; দুই হস্তে সেই দীর্ঘ দাড়ীতে ঢেউ খেলিয়ে খেলিয়ে তিনি বোল্লেন, "আপনারা করেন কি ? ছায়াবাজীখেলার আলোচনার মত ও সব আপনারা বলেন কি ? সাক্ষাতে ও সব কথা বোলতে নাই ; ছোকরাকে বোলতে দিন, পরিচয় অজ্ঞাত থেকে কোন কোন চক্রে কি প্রকারে ঘুরে ঘুরে কি প্রকার কষ্ট পেয়েছে কিম্বা পাচ্ছে, বোলতে দিন। কেমন হে ছোকরা !" আমারে সম্বোধন কোরে সেই গম্ভীর লোকটি বোল্লেন, "কেমন হে ছোকরা ! সেই কথাই ঠিক নয় ? নিজের পরিচয় তুমি জানো না, অনেক কষ্ট পেয়েছ, অনেক শত্রু তোমার আছে, এই সব কথা ঠিক নয় ?"

বার বার এক কথা ;—সকলের মুখেই এক কথা ;—এ সব কথার মানে কি, বক্তাগুলির উদ্দেশ্যই বা কি, কিছুই আমি স্থির কোত্তে পাল্লেম না ; মাঝে মাঝে রোগের কথা বলে, এটাও একটা বিষম সমস্যা ! যাই হোক, উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। মজলীস সরগরম, অনেক লোক একত্র,—রাজসভা, রাজা মোহনলাল ঘোষ বাহাদুর স্বয়ং সভাপতি, এ মজলীসে আমার ভাগ্যের কথা প্রকাশ কোল্লে মন্দ হবে না : সকল লোক দয়াশূন্য হবে এমন কখনই সম্ভব নয়। আমার দুঃখের কথা শুনে অবশ্যই কাহার কাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হোলেও হোতে পারবে, আমার অনুকূলে রাজাবাহাদুরকে তাঁরা দুটি একটি কথা বোল্লেও বোলতে পারবেন, এই ভেবে সেই গম্ভীর লোকটির প্রশ্নের উত্তরে আমি বোল্লেম, "হাঁ মহাশয় ! কষ্ট আমি অনেক পেয়েছি। আমার জাতি-জন্মের পরিচয় আমি জানি না : শৈশবে আমি গুরুগৃহে বাস কোত্তেম, গুরুদেবের মৃত্যুর পর একটা বদমাসলোক আমারে দেশান্তরে নিয়ে যায়, তার পর একটি ভাল জায়-গায় আমি আশ্রয় পাই, এই রাজাবাহাদুর সে কথা জানেন। তার পর আমার পশ্চাতে শত্রু লাগে, শত্রু একটা নয়, অনেক জায়গায় অনেক ; এক একটা শত্রুর নাম আমি জানি, কিন্তু বোলতে ভরসা হয় না। ভগবান যদি—"

যাঁরা আমারে ঘিরে বোসেছিলেন, আমার মুখে ভগবানের নাম শুনে তাঁরা হো হো কোরে হেসে উঠলেন। একজন বোল্লেন, "তা তো হোতেই পারে ! আমাদেরও ও রকম হয় ; শত্রুর নাম কোত্তে আমাদেরও ভরসা হয় না। ভগবান যদি সে সব নাম বোলে দেন, তা হোলেই প্রকাশ পায়, তা না হোলে চিরকাল কষ্টভোগ কোরে ছটফট কোরে বেড়াতে হয়। আহা ! এ ছোকরা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে ! আপনার পরিচয়টা পর্য্যন্ত জানতে পাচ্ছে না, যাকে তাকে পরিচয়ের

কথা জেজ্ঞাসা করে ; প্রাণ সর্বদা হু হু করে কি না, কাজে কাজেই ঐ রকম ; ঐ রকমেই এই দশা ঘোটেছে।”

ঐ কথাগুলি যিনি বোল্লেন, তিনি আমার দিকে চাইলেন না, শেষে আমার দিকে চেয়ে যেন কতই সদয়ভাবে বোল্লেন, “ভয় পেয়ো না তুমি, অনেক লোকের ও রকম হয় : অল্পদিন চিকিৎসা কোল্লেই আরাম হয়ে যায়, ভয় কিছু নাই। দিবারাত্রি অত ভেবো না, সকল লোকের কাছে ও রকম গল্প কোরো না ; তোমার মাথার ঠিক নাই, লোকে সেটা বুঝবে না, বৃথা তুমি ঐ রকম বোকে বোকে ক্লান্ত হয়ে পোড়বে, মাথাটা আরো খারাপ হবে। চুপ কোরে থেকো, আমরা যে রকম ব্যবস্থা কোরে দিব, সেই রকম ব্যবস্থা মতে দিনকতক থাকতে থাকতেই সমস্ত উপসর্গ সেরে যাবে। আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার, দু-দিন পরে আমরা আবার আসবো, সে দিন যদি এই রকম দেখি, তা হোলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত ঠিক হবে।”

রাজাবাহাদুর ঐ সকল কথা শুনলেন, কোন প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ কোল্লেন না। তিনি আমারে আহ্বান কোরেছিলেন, প্রয়োজন কি ছিল, ডাক্তারমহাশয়েরাই সেটি ব্যক্ত কোল্লেন। ডাক্তারগণের বক্তৃতার তাৎপর্য্য আমার চিকিৎসা করা। কি রোগের চিকিৎসা হবে, আমি বুঝলেম না, অথচ চিকিৎসা হবে আমার। এ রহস্য ভেদ করা আমার অসাধ্য। আমার জীবনের ঘটনায় প্রায় পদে পদেই রহস্য। একটা রহস্যেরও মর্ম্মভেদে আমি সমর্থ হোলেম না, এটা সামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় !

বিদায়কালে রাজাবাহাদুরের দিকে আমি চাইলেম : মুখে যেন একটু একটু হাসি ছিল, আমার দৃষ্টিপাতমাত্রেই সে হাসি লুকালো।—মন্দ নয় ! অনেক বড়লোকের এইরূপ অভ্যাস আছে ; অনেক অভিমানিনী রমণীরও এই-রূপ প্রশংসনীয় অভ্যাস আছে ; ক্ষণমাত্রে হাস্য, ক্ষণমাত্রেই গাম্ভীর্য্য, ক্ষণ-মাত্রেই বিষণ্ণতা, ক্ষণমাত্রেই চক্ষে জল। হাস্য কোত্তে কোত্তে রাজাবাহাদুর গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লেন, সেই সময় আমি নমস্কার কোল্লেম। যাও কি থাকো, একটি কথাও তিনি আমারে বোল্লেন না। মজলীসের দিকে চাইতে চাইতে রাজার খাসকামরা থেকে আমি বাহির হোলেম। মজলীসভঙ্গ হলো না, আমারে উপ-লক্ষ্য কোরে যেরূপ অভিনয় হয়ে গেল, মজলীসী লোকেরা সেই অভিনয় সমা-লোচনা আরম্ভ কোল্লেন। নিকটে দাঁড়িয়ে থাকলে কথাগুলি আমার কাণে আসতো ; কিন্তু আমি মনের উদ্বেগে দ্রুতগতি চোলে আসছিলেম, কথা কাণে এলো না, একটা মহোচ্চ হাস্য কোলাহল শ্রবণ কোল্লেম মাত্র। আমারে উপলক্ষ্য কোরেই সেই হাস্য, সেটি বুঝতে আমার বাকী থাকলো না।

খেলা আমি অনেক রকম দেখেছি, রাজ-মজলীসের ডাক্তারমহাশয়েরা যেরূপ খেলা দেখালেন, সেরূপ খেলা আর কখন কোথাও দেখি নাই। খেলার সামগ্রী হরিদাস।—সত্যই এ সংসারে অনেক লোকের খেলার সামগ্রী হরিদাস। ডাক্তারের মুখে যে কথাগুলি আমি শুনলেম, নিজের চিন্তাগারে প্রবেশ কোরে মনে মনে সেইগুলি আলোচনা কোল্লেম। কথাগুলি যখন কাজে

দাঁড়াবে, তখন যে রঙ্গ হবে, তাই ভেবে বড় দুঃখে আমার মুখে একটু হাসি এলো।

দুদিন গেল। ডাক্তার রঘুনাথ সেইকালে বোলেছিলেন, দু-দিন পরে আবার তাঁরা আমার কাছে আসবেন ; আমি প্রস্তুত হয়ে থাকলেম। তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকাল থেকে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত কেহই এলেন না, রাজাও আমারে ডেকে পাঠালেন না। আড়াই প্রহর, তৃতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেল, তখনো পর্য্যন্ত কেহ দেখা দিলেন না, আমিও ঘর ছেড়ে কোথাও গেলেম না। সূর্য্য বোধ হয় আমার নূতন চিকিৎসার ব্যবস্থা দর্শন করা কষ্টকর বিবেচনা কোরে অস্তগমনের উপক্রম কোল্লেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় নূতন ধরণের পোষাকপরা দুটি ভদ্রলোক ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ কোরে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। পোষাকের ধরণ নূতন হোলেও মুখের ধরণ পুরাতন, দেখেই আমি চিনলেম। পঞ্চমূর্ত্তির মধ্যে যে দুই মূর্ত্তির নাম পাওয়া গিয়েছিলো, তারাই তারা, নীলাম্বরবাবু আর রঘুনাথবাবু দুজনই ডাক্তার, এ পরিচয় বাহুল্য।

ডাক্তারেরা আমার বিছানার উপর বোসলেন, গম্ভীরবদনে ক্ষণকাল আমার মুখপানে চেয়ে থাকলেন। দর্পণের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না, আমার মুখের ভাব তখন কি রকম ছিল কিম্বা ডাক্তার দর্শনে কি রকম হয়েছিল, আমি আর জানতে পাল্লেম না ; যাঁরা দেখলেন, তারা অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, পরস্পর মুখচাহাচাহি কোরে অস্পষ্ট ইংরাজীভাষায় কি দুই একটি কথা বোল্লেন, ঠিক আমি বুঝতে পাল্লেম না। তাদের উভয়ের নাম আমার শুনা হয়েছিল, চেহারাও বেশ মনে ছিল। যাঁর নাম নীলাম্বরবাবু, আমারে সম্বোধন কোরে তিনি বোল্লেন "তোমার মস্তিষ্কবিকারের একটা প্রধান হেতু আমি বুঝতে পেরেছি ; শুনলেম, বাড়ী থেকে তুমি একবারও বাহির হও না। নিয়ত অষ্ট প্রহর এক জায়গায় আবদ্ধ থাকলে, সহজ মানুষেরও চিত্ত-বিকার ঘটে। আমি বোধ করি, ঔষধসেবনের অগ্রে তুমি যদি প্রতিদিন সকাল বিকাল—সূর্য্যকিরণ যখন প্রখর হয় না,—প্রখর থাকে না, সেই সময়—দুবেলা দুবার খানিক বেড়িয়ে আসতে পার, তা হোলে প্রভাতসমীর আর সন্ধ্যা-সমীর সেবনে অনেকটা উপকার হোতে পারে। আমার ইচ্ছা, আজ থেকেই তুমি সেই অভ্যাস সুরু কর।"

সেই সুপারিসের প্রতিধ্বনি কোরে রঘুনাথবাবু তৎক্ষণাৎ বোল্লেন, "ঠিক আমার মুখের কথাটা তুমি কেড়ে নিয়েছ, আমিও ঐ কথাটা বোলবো বোলবো মনে কোচ্ছিলেম ; আজ থেকে সুরু করাই ভাল।"—বন্ধুবাবুকে এই কথা বোলে, নূতন একটা চুরুট ধোরিয়ে মুখে দিয়ে, আমার দিকে ফিরে, কি যেন ভেবে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তিনি বোল্লেন, "তোমার নামটি কি ভাল ?—হরি —হাঁ,—হরিদাস।—হাঃ হাঃ হাঃ ! হরিদাস-নামটা কিছুতেই আমার মনে থাকে না ! হাঃ হাঃ হাঃ ! যতগুলি হরিদাসকে আমি চিনি, মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হয়,—দেখা হোলেই নাম ভুলে যাই !—ওটা হোচ্ছে বাবাজী বৈরাগীদের

মুখস্থ করা নাম ; আমার মত ইংরাজীওয়ালাদের নয় ; আমার মধ্যে ও নামটা যেন কেমন বাধো বাধো ঠেকে।"

"বাধো বাধো ঠেকে" এই কথা বোলেই বক্তা ডাক্তারটি এক গাল ধূম উদ্গীরণ কোরে আমার মুখের কাছে ছেড়ে দিলেন। দোক্তার দুর্গন্ধ সহ্য কোত্তে না পেরে অন্যদিকে আমি মুখ ফিরালেম। বক্তার মুখের কাছে হাত ঘুরিয়ে ডাক্তার নীলাম্বর হাসতে হাসতে বোল্লেন, "কিছুদিন তুমি চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ কর, হরিনাম মুখস্থ হবে, হরিদাস নামটিও আয়ত্ত কোরে রাখতে পারবে। আর একটা পরমার্শ আছে, আর এক সময়ে সে কথা হবে, এখন তুমি হরিদাসকে কি কথা বোলছিলে, বোলে যাও।"

আর একবার চুরুটের ধূম উদ্গীরণ কোরে রঘুনাথবাবু আমারে বোল্লেন, "দেখ হরিদাস! খোলা জায়গার হাওয়া খাওয়া একটা পরম ঔষধ,—সকাল বিকাল দুবেলা। ঠিক সময় হয়েছে, আমাদের সঙ্গে গাড়ী আছে, তুমি প্রস্তুত হও। আজ আমরা তোমাকে হাওয়া খাওয়া ঔষধের প্রথম ফল দেখাব ; মনে কর, আজ তোমার হাওয়া খাওয়া বিদ্যার হাতে খড়ী ; প্রস্তুত হও।"

কি আমি শুনলেম, কি আমি বুঝলেম, হঠাৎ যেন একটা সংশয়ের অন্ধকারমূর্ত্তি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। হাওয়া খাওয়া বিদ্যার হাতেখড়ী! ডাক্তারদের মুখের দিকে চেয়ে আমি নীরব হয়ে থাকলেম। ডাক্তারেরা উভয়েই দুই তিনবার আমারে বোল্লেন, "শুভক্ষণ, শুভক্ষণ প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।" আর আমি অপ্রস্তুত থাকতে পাল্লেম না, ডাক্তারবাবুর অনুরোধ রক্ষা কোত্তে বাধ্য হোলেম। প্রস্তুত হওয়া কি রকম, তা আমি ভাবলেম না, অবসর চাইলেম না, কাপড়ও ছাড়লেম না, যে কাপড়খানি তখন আমার পরা ছিল, সেই কাপড়েই বাবুদের সঙ্গে আমি হাওয়া খেতে বেরুলেম, রাজাবাহাদুরের অনুমতি লওয়াও আবশ্যক বোধ কোল্লেম না।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে গিয়েছিলেন, অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে আসছিল, ঘোর অন্ধকার হয় নাই, সময়টা গোধূলি; গোধূলি লগ্নে যাত্রা;—উপর থেকে আমরা নেমে এলেম। দরজার সম্মুখে দিব্য একখানি গাড়ী, দিব্য দুটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব। রঘুনাথ ডাক্তার আমার একখানি হাত ধোরে গাড়ীতে তুলে দিলেন, তার পর তাঁরা দুজনে আরোহণ কোল্লেন। গাড়ী উত্তরমুখে চোল্লো। অশ্বেরা টপাটপ শব্দে দ্রুতবেগে ছুটে ছুটে যেতে লাগলো।

কতদূর গেলেম, ঠিক বুঝতে পাল্লেম না, অনুমানে বুঝলেম, এক ক্রোশের বেশী। গাড়ীর ভিতর ডাক্তারেরা নানা রকম গল্প জুড়েছিলেন ; গল্পের দিকে আমার কাণ ছিল না, মন ছিল না, সারা পথ আমি অন্যমনস্ক।

সমবেগে আর খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে গাড়ীখানা থামলো, ডাক্তারেরা নামলেন, আমারেও নামালেন। সেই সময় আমি একবার চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেম, অন্ধকার। বেশী দূর দেখা গেল না, তথাপি আমি বুঝতে পাল্লেম, পাটনায় এসে অবধি সে পথে আর কখনো আমি আসি নাই। রাস্তার বামদিকে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী ; ফটকে প্রকাণ্ড একটা লণ্ঠন জ্বলছিল, পাথরের

পুতুলের মত দুইজন দ্বারপাল বড় বড় দুটো বন্দুক ঘাড়ে কোরে দরজার দুই ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা নিস্পন্দ। পথ দেখিয়ে দেখিয়ে ডাক্তারেরা আমারে সেই বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। অকস্মাৎ দুর দুর কোরে আমার বুক কেঁপে উঠলো! কেন বোলতে পারি না, আমার মনে তখন যেন কোন প্রকার অমংগল আশংকার সঞ্চার হলো! গোধূলিলয়ে যাত্রা; এরূপ যাত্রাতে মংগল-ফল হয়, এই কথাই লোকে বলে, আমার মন কেন বলে অমংগল, কেমন কোরে জানবো?

বাড়ীর ভিতর আমরা প্রবেশ কোচ্ছি, ঠাঁই ঠাঁই আলো জ্বলছে দেখছি, শারি শারি কতই ঘর। যে দিক দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সে দিকের দরজা বন্ধ। দুই ধারেই ঘর, মধ্যস্থলে সুঁড়ী পথ। প্রকাণ্ড বাড়ী, কোন দিকে কত ঘর, একদিক দর্শনে সেটা জানা গেল না। যাচ্ছি, এক একবার বামে দক্ষিণে চক্ষু ফিরাচ্ছি, মাঝে মাঝে এক একদিকে সেই রকমের অপ্রশস্ত এক একটা সুঁড়ীপথ দেখতে পাচ্ছি। ডাক্তারেরা আমারে সোজা পথেই নিয়ে চোলেছেন। বাতাসের লেশমাত্র নাই। অনেক দূর গিয়ে দক্ষিণধারে দেখলেম, একটা ঘরের দরজা খোলা। ঘরে আলো ছিল, দেখলেম, ঘরটি দিব্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। আমারে অগ্রবর্ত্তী কোরে ডাক্তারেরা সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। ঘরের একধারে একটি পরিষ্কার বিছানা, আর কোন আসবাবপত্র ছিল না, কেবল একদিকে দুটি বড় বড় মাটির কলসী, মুখে দুখানা কাচের বাসন ঢাকা; বোধ হলো, জলের কলসী। বিছানার উপর আমারে বোসতে বোলে নীলাম্বরবাবু আমার নিকটেই বোসলেন, রঘুনাথবাবু বেরিয়ে গেলেন।

ঘরটি পরিষ্কার বটে, কিন্তু কেমন একটা দুর্গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ কোত্তে লাগলো। ঘরেই গন্ধ অথবা বাহিরের দুর্গন্ধ এসে ঘরটিকে দুর্গন্ধময় কোচ্ছিল, সেটা আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে বোসে থেকে, মৃদুস্বরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ আমি কোথায় এলেম? আপনারা আমারে কোথায় নিয়ে এলেন?" মাথা নেড়ে নেড়ে নীলাম্বরবাবু একটু হাস-লেন; আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। হাওয়া খাবার প্রস্তাব যখন হয়, তখন আমার মনে একটা সংশয় এসেছিল, সেই সংশয় এখন প্রবল হয়ে উঠলো। অমঙ্গল আশঙ্কাই বড় বেশী। বাম অঙ্গের ঘন ঘন স্পন্দন। কি যে সেই আশঙ্কা, কেন যে সেই আশঙ্কা, তার মূল কারণ তখন আমি কিছু স্থির কোত্তে পাল্লেম না; সন্দেহই প্রবল।

রঘুনাথবাবু পুনঃপ্রবেশ কোল্লেন; সংগে একটি লোক। কৃষ্ণযাত্রার আসরে বাসদেবের যেমন সজ্জা, সেই লোকটির সজ্জাও সেইরূপ। লোকটি দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, একহারা, মুখখানা কিছু গোল, চক্ষু ছোট, নাসিকা খর্ব, ঠোঁট পুরু, চোমরা গোঁফ, মাথার ঝাঁকড়া চুল, একখানা হাত একটু ছোট, সে হাতের অংগুলি খুব মোটা মোটা, গণনায় একটি কম, বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। অংগুলি-নির্দ্দেশে আমারে দেখিয়ে দিয়ে ডাক্তার রঘুনাথ সেই লোকটিকে বোল্লেন, "দেখ অনাদি! এই বালকটি কিছুদিন এই বাড়ীতে থাকবে, যেন কোন অযত্ন না হয়;

আহারে, শয়নে, ভ্রমণে বালক যেন কোন প্রকার কষ্ট না পায়। তোমার হস্তে এটিকে আমরা সমর্পণ কোল্লেম, আমাদের উপদেশমত কাজ কোল্লে তুমি প্রচুর পুরস্কার পাবে। বড়লোকের ছেলে, এখানে থেকে এ ছেলে যদি আরাম হয়,—বুঝলে অনাদি,—এখানে থেকে এ ছেলে যদি আরাম হয়,—আরাম হবেই নিশ্চয়,—যদি বেশ আরাম হয়, তা হোলে তোমাকে আর এখানে চাকরী কোত্তে হবে না। সে কথাই বা কেন, একেবারেই হয় তো চাকরী কোত্তে হবে না ; বাড়ী পাবে, পুকুর পাবে, আম-কাঁঠালের বাগান পাবে, দিব্য সুন্দরী একটি বৈষ্ণবীকে বিয়ে কোত্তে পারবে সেবা-যত্নে এ ছোকরাকে খুসী রাখতে পাল্লে দু-একখানি কোম্পানীর কাগজও পাবে, কোন কষ্টই থাকবে না ;—বুঝলে কি না ?"

রঘুনাথের সঙ্গে যে লোকের নবপ্রবেশ, সে লোকটার নাম অনাদি। ঘন ঘন চক্ষের পলক ফেলে। অনাদিকে ঐরূপ উপদেশ দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, আমার দিকে চেয়ে রঘুনাথ বোল্লেন "দেখ ছোক—ঐ দেখ! আবার ভুলে গিয়েছি! কতবার মনে করি, ইষ্টমন্ত্রের মত জপ করি, তবু মনে থাকে না!—ইষ্টমন্ত্র! —হাঁ হাঁ—দেখ হরিদাস! এইখানেই তোমার চিকিৎসা হবে ; এই অনাদি ঠাকুরটি অহরহ তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকবে। অনাদি ঠাকুর বেশ লোক, তোমাদের মত ছেলেদের আদর-যত্ন কোত্তে অনাদি যেমন জানে, এমন তার এ বাড়ীর একটা লোকও না। অনাদিঠাকুর ব্রাহ্মণ' বুঝতে পেরেছ আমার কথাটা ?—জাতিতে এই অনাদিঠাকুর একটি ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণের যত প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, অনাদিঠাকুর সব জানে। তুমি বেশ থাকবে, এইখানেই তুমি থাকো, স্বচ্ছন্দে থাকো, বেপরোয়া থাকো ; আমরা মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব, নূতন ব্যবস্থা কোরে যাব, কোন ভয় নাই।"

আমার চক্ষে জল এলো, অন্তরে অন্তরে আমি কাঁপছিলেম, এই সময় বাহ্য অবয়বে বিলক্ষণ কম্প! কাঁপতে কাঁপতে নীলাম্বরবাবুর দিকে আমি চাইলেম। হা অদৃষ্ট! নীলাম্বরবাবুও রঘুনাথের কথায় সায় দিলেন। হায় হায়! আর আমি কার মুখ চাই ? এ দুটো লোক কে ? সত্যই কি ডাক্তার ? উঃ! ডাক্তার সেজে এ দুটো লোক আমারে এই বাড়ীতে কয়েদ কোরে রেখে যাচ্ছে! এটা কিসের বাড়ী ? কাদের বাড়ী ? জনমানবের সঞ্চার নাই, এত বড় বাড়ীতে কেবল এই একটা অনাদি দেখলেম, আর কোন লোকের সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, মূর্ত্তিও দেখা গেল না। কি ব্যাপার! না না, অবশ্যই লোক আছে। লোক না থাকলে ফটকে পাহারা থাকবে কেন ? এতগুলো আলো জেলবে কেন ? অবশ্যই লোক আছে। কি রকম লোক তারা ?

কত যে আমি ভাবলেম, কিছুই এখন মনে নাই ; সত্য সত্যই আমি কেঁদে ফেল্লেম! বিস্তর মিনতি কোরে নীলাম্বরবাবুকে বোল্লেম, "কেন আপনারা আমারে এই বিজন বাড়ীতে ফেলে যাচ্ছেন ? আমি আপনাদের কাছে কি অপ-রাধ কোরেছি ? হাওয়া খেলে শরীর সুস্থ হবে ; আপনাদের সঙ্গে আমি হাওয়া খেতে এলেম, আপনারা আমারে ভাল হাওয়া খাওয়ালেন! হাওয়া খাওয়ার সাধ আমার মিটেছে, আর হাওয়া খাব না, দোহাই আপনার, দয়া

কোরে আমারে এখান থেকে নিয়ে চলুন! আমার যেন মনে হোচ্ছে, উপর থেকে কে যেন আমারে বোলে দিচ্ছে, এটা রাক্ষসের পুরী ; এ পুরীতে কিছুতেই আমি থাকতে পারবো না! দু-দিন থাকলেই হয় তো আমার প্রাণ যাবে! পায়ে ধরি, আপনি আমারে সঙ্গে কোরে নিয়ে চলুন!"

মৃদুহাস্য কোরে নীলাম্বরবাবু বোল্লেন, "ভয় কর কেন? এখানে তোমার কোন ভয় নাই. এইখানেই তোমার চিকিৎসা হবে। রাজবাড়ীতে বেশী লোকের গোলমাল সেখানে তুমি শীঘ্র শীঘ্র আরাম হোতে পারবে না. এখানে থাকলে শীঘ্রই আরাম হবে রঘুনাথবাবু যে যে কথা বোল্লেন, সমস্তই সত্যকথা ; এখানে তোমার সেবাযত্ন বেশ হবে, ছেলেমানুষী কোরো না, পাগলের মত বোকো না, শান্ত হয়ে থাকো, কেঁদো না. চুপ কর. কাল আবার আমি আসবো।"

এই সব কথা বোলে ব্যস্তভাবে নীলাম্বরবাবু উঠে দাঁড়ালেন, রঘুনাথ দাঁড়িয়েই ছিলেন, দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। "যাবেন না, যাবেন না, যাবেন না! আমারে এখানে একা ফেলে রেখে আপনারা চোলে যাবেন না! দোহাই আপনাদের, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব, কখনই আমি এখানে থাকবো না! এ জীবনে কষ্ট আমি অনেক ভুগেছি, আবার এই নূতন কষ্টের মুখে আমারে নিক্ষেপ কোরে আপনারা যাবেন না, যাবেন না, যাবেন না!" কাঁদতে কাঁদতে এই সব কথা বোলতে বোলতে ঘরের চৌকাঠের ধার পর্যন্ত আমি ছুটে গেলেম ; চৌকাঠ পার হয়ে তাঁরা তখন বাইরে গিয়েছিলেন। অনাদিটা ঘরের মধ্যেই ছিল, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দু-হাত দিয়ে সে আমারে জাপটে ধোল্লে! লোকটা রোগা বটে, কিন্তু জোর খুব ; ধস্তাধস্তি কোরেও আমি তার হাত ছাড়াতে পাল্লেম না। বাহির থেকে মুখ ফিরিয়ে নীলাম্বরবাবু বোল্লেন, "ঐ কথাই তো কথা. ঐ তো তোমার রোগ : অনেক কষ্ট ভুগেছ, এখানে থাকতে পারবে না, লোকের কথা শুনবে না, ঐ তো তোমার রোগ। সেই জন্যই তো তোমাকে এখানে আনা হয়েছে। ও রকম যদি কর, এ জন্মে তোমার ও রোগ সারবে না। থাকো, গোলমাল কোরো না। অনাদির সঙ্গে লড়ালড়ি কোরো না, আমরা চোল্লেম!"

ডাক্তারেরা চোলে গেলেন, অনাদি আমারে আটকে রাখলে। ঝাড়া এক ঘণ্টাকাল আমি চীৎকার কোরে কাঁদলেম, ধমক দিয়ে দিয়ে অনাদি আমারে বশে আনবার চেষ্টা কোল্লে, কিছুতেই আমি শান্ত হোতে পাল্লেম না। খানিক পরে সেই ঘরে একটা স্ত্রীলোক এলো তার হাতে একটা চাবীর তাড়া। হেসে হেসে চাবীওয়ালা মুখ-চক্ষু ঘুরিয়ে অনাদিকে বোল্লে, "এই যে গো! এই যে তুমি দিব্য একটি নূতন শীকার পেয়েছ! বেশ হয়েছে ; সদরদরজায় চাবী পোড়েছে, দরোয়ান এসে আমার হাতে এই চাবীর তাড়াটা দিয়ে গেল। ছেড়ে দাও, শীকারটিকে অমন কোরে ধোরে রেখেছ কেন? ছেড়ে দাও! আর পালাবার উপায় নাই।"

মানুষের গন্ধ পেয়ে যে সকল বিষধর সর্প ফণা তুলে গর্জন করে, ওঝাদের কাছে সেই সকল সর্প যেন কেঁচো হয়। এখানেও আমি সেই রকম দেখলেম।

অনাদিঠাকুর এতক্ষণ আমার উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন কোচ্ছিল, সেই স্ত্রীলোকের দুটি একটি কথা শুনে একেবারে ঠাণ্ডা ; আমারে ছেড়ে দিয়ে কতই যেন ভালমানুষ হয়ে, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে রহস্যালাপ আরম্ভ কোল্লে। আমি সেই অবসরে ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে বিছানার উপরে গিয়ে বোসলেম। হৃদয় অত্যন্ত ভারী, মনে যেন কিছুই নাই, কিছুই যেন চিন্তা কোত্তে পাচ্ছি না, সম্মুখে আলো আছে, তবুও যেন আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখ্‌ছি, তখন আমার এই রকম অবস্থা। ভাগ্যক্রমে আপনা আপনি আমি এক একটা প্রবোধ প্রাপ্ত হই ; যতই কেন মহাবিপদ উপস্থিত হোক না, তাদৃশ বিপদে আমি বড় একটা অবসন্ন হই না। বাল্যাবধি পরমেশ্বরে আমার অচল বিশ্বাস ; যা যখন হবার হয়, নিশ্চয়ই তা তখন হয়, যা হবার নয়, তা কখন হয় না, সংসারে মানুষের ভাগ্যে যা যখন ঘটে, সমস্তই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, এইরূপ আমার ধারণা ; সেই ধারণাই আমার প্রবোধ। সংসারচক্রের এক এক আবর্ত্তনে আমি এক এক প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হোচ্ছি ; পাটনায় এই এক নূতন অবস্থা ! এ অবস্থা আমার চিরদিন থাকবে না, দয়াময় অবশ্যই একদিন আমার প্রতি সদয় হবেন, সেই বিশ্বাসে, সেই আশ্বাসে আপন মনে আমি এক প্রকার সান্ত্বনা পেলেম। গৃহমধ্যে অনাদি আর সেই চাবীওয়ালী। অলক্ষিতে সেই যুগলমূর্ত্তির দিকে কটাক্ষপাত কোরে আমি তাদের রহস্যালাপ শ্রবণ কোত্তে লাগলেম।

অনাদি বোল্লে, "তুই ভাই আজ আমাকে যে হাসান হাসিয়েছিস জন্মেও আমি তেমন হাসি হাসি নাই ; লোকেরা যখন চুপচাপ কোরে থাকে, তোর হাসিটা তখন খুব বাড়ে ; তাই চিতোরি ! তুই আমার প্রাণের সহচরী। তুই হাসিস, তুই হাসাস, তাতেই আমি বেঁচে থাকি। তোর হাসি যেন বরফের মত ঠাণ্ডা ; হাটের কলরবের আগুনে আমার প্রাণ যখন জেবালে পুড়ে যায়, সেই সময় তুই হাসির ফোয়ারা খুলে দিস, জ্বালা-যন্ত্রণা সব আমি ভুলে যাই, হৃদয় জুড়িয়ে যায় ; শুভক্ষণে বিধাতা তোর সঙ্গে আমার—বুঝলি চিতোরি,—তোর সঙ্গে আমার মিলন কোরে দিয়েছেন, জন্মেও আর ছাড়াছাড়ি হবে না। তুই বুঝলি ? তুই আমার মাথার চুল, মুখের গোঁফ, চক্ষের তারা, বুকের মাংস, গায়ের লোম, তুই আমার সব। সেই একদিন তারা যখন—"

এই পর্য্যন্ত বোলতে বোলতে অনাদিঠাকুর হঠাৎ থেমে গেল। যতগুলি কথা তার মুখে উচ্চারিত হলো, তার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি হৃদয়ঙ্গম কোত্তে পাল্লেম না ; অনেক কথার অর্থ নাই ; বুঝলেম, কেবল তাদের দুজনের প্রেমসম্বন্ধ। স্ত্রীলোকটির নামও পাওয়া গেল, নামটা খুব নূতন বটে ; নূতন পুরাতন বিচার করা অনাবশ্যক, নামটি কিন্তু পাওয়া গেল ; নাম হোচ্ছে চিতোরী। আমার দিকে চেয়ে, পুনরায় চিতোরীকে সম্বোধন কোরে অনাদিঠাকুর বোল্লে, "দেখ চিতোরী ! সেই একদিন তারা যখন সেই রকম বাড়াবাড়ি কোচ্ছিল, না, থাক সে কথা"—আবার এইখানে থেমে, আবার আমার দিকে চেয়ে, একটু একটু চুপি চুপি বোলতে লাগলো, এই নূতন ছোকরাটা দেখ্‌ছি অকালপক ; ভূতে পেয়েছে ; সেই যে দুটি বাবু এসেছিল, ছোকরাকে তারা

আমার হাতেই সোঁপে দিয়ে গেল, সেবা কোত্তে বোলে গেল ; হো হো হো! কিন্তু ভাই চিতোরী! সেবা যদি তুই কোত্তে পারিস, খুব বড় একটা দাঁও মারা যাবে। দেখিস কিন্তু, কোন রকমে যেন না পালায়! সব সময় আমি—"

এই সময় কে যেন কারে খুব চীৎকার কোরে ডাকলে। কাণ খাড়া কোরে শুনে, তাড়াতাড়ি চোলতে চোলতে অনাদিঠাকুর তাড়াতাড়ি বোলে গেল, "থাক তুই এইখানে, যেমন যেমন বন্দোবস্ত কোত্তে হয়, করিস ; সব তুই জানিস, আমি যাই ; আবার কে কোথায় কি হাঙ্গামা বাধিয়েছে, থামাই গিয়ে ; ভাল ঝকমারীতেই পোড়েছি! রাত্রেও দু-দণ্ড স্থির হবার যো নাই।"

অনাদিঠাকুর কোথাকার হাঙ্গামা থামাতে গেল, চিতোরী এসে আমার বিছানার উপর বোসলো ; গা ঘেঁষে বোসলো না, হাতখানেক তফাতে। যে সুরে চিতোরী প্রথমে অনাদির সঙ্গে কথা কোয়েছিল, সে সুরটা বদল কোরে আর এক রকম নূতন সুরে কি গোটা কতক কথা আমারে বোল্লে, আমার মন তখন অন্যদিকে ছিল, অর্থ বুঝলেম না, উত্তর দিতেও পাল্লেম না ; চিতোরী আমার মুখপানে চেয়ে রইলো। আমি তখন আর একখানা ভাবছিলেম ; অনাদিঠাকুর হাঙ্গামা থামাতে গেল, কিসের হাঙ্গামা? এ বাড়ীতে কি হাঙ্গামা হয়? কি রকম জায়গা? যে একটা চীৎকার শুনলেম, সেটাও কেমন বিকট। অনাদি ইতিপূর্বে একবার বোলেছিল, "হাটের কলরব", এখানে কি হাট আছে? রাত্রেই কি হাট বসে? একটা লোকের চীৎকারেই কি হাট হয়? বোধ হয়, সে রকম হাট না হবে। কেন না, অনাদি বোলেছিল, "হাটের কলরবের আগুন", সে আগুন আবার কি প্রকার? ভাল হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেম, হাওয়ার বদলে আগুনের ভিতরে এসে পোড়েছি ; সত্যই আগুন! শরীর যেন সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে!

এই সব আমার মনের কথা। মনের কথা মনে মনে, মুখে কিছুই ফুটলো না। মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিতোরী সেই সময়ে আবার বোল্লে, "কথা কও না কেন? বোবা না কি? অত কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, খাতির নাই, কোথাকার ছোকরা? এটা বুঝি তোমার শ্বশুরবাড়ী? কথা কোইতে বুঝি লজ্জা হয়? পাঠশাল কখনো দেখেছো? পাঠশালে বজ্জাতী কোল্লে ঘোড়া বেত পিঠে পড়ে, নাড়ুগোপাল হোতে হয়, জানো সে সব শাস্তি? এটাও একটা পাঠশালা ; এখানেও সেই রকম শাস্তি আছে, এখানেও সেই রকম হবে ; কথা শোনো, কথা কও, রাত্রি অনেক, খাবে কি? পেট তোমার কি চায়? পেট তোমার সঙ্গে আছে, না আর কোথাও রেখে এসেছো? কথা কও, উত্তর কর, বল, রাত্রে তুমি খাবে কি?"

অনাদি চোলে যাবার পর চিতোরী প্রথমে আমারে যে সব কথা বোলেছিল, সে সব কোন ভাষার কথা, আমি বুঝি নাই, চিতোরী নামটা যেমন আমার কর্ণে নূতন, চিতোরীর ভাষাও সেই রকমের নূতন বোধ হয়েছিল। চিতোরী কি? রাজপুতানার চিতোর রাজ্যের মেয়েমানুষেরা কি চিতোরী নামে পরিচিতা হয়? এ চিতোরীর বাড়ী কি তবে চিতোরে?—তাই যেন বোধ হয়।

চিতোরীর প্রথমবারের কথাগুলাও বোধ হয় চিতোরী ভাষা ; এবারের কথা-গুলা হিন্দী বাংগলা মিশানো ? জিহ্বার একটু একটু আড়ষ্ট আছে, এই-মাত্র তফাৎ।

কথাগুলা রুক্ষ রুক্ষ ; চিতোরী কিন্তু দেখতে দিব্য সুশ্রী। তাদৃশী সুশ্রী রমণীর এ প্রকার কর্কশ কথা, এটাও আমার আশ্চর্য্য বোধ হলো। সুস্থির-নয়নে চিতোরীর অস্থিরনয়ন দর্শন কোরে আমি তার পূর্ব-প্রশ্নের উত্তর কোল্লেম, "রাত্রে আমি কিছুই খাব না, কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই ; তোমার যদি অন্য কার্য্য থাকে, স্বচ্ছন্দে চোলে যাও, আমারে একটু বিশ্রাম কোত্তে দাও ; আমার শরীর অসুস্থ, মন অসুস্থ, আমি অতিশয় পরিশ্রান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত, কিছুই আমি খাব না।"

চক্ষু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুচকে মুচকে হেসে, একখানা হাত নেড়ে চিতোরী বোল্লে "তা হবে না যাদুধন ! খেতেই হবে, এখানকার নিয়ম সে রকম নয় ; মানুষকে আরাম করবার জন্য এখানে আনা হয়। তুমি তো তুমি, তোমার মত কত ছোকরা, কত ছুকরী, কত পুরুষমানুষ, কত মেয়েমানুষ এখানে বাস করে, সকলকেই দুবেলা পেট ভোরে খেতে হয়। সহজে না খেলে, জোর কোরে খাওয়ানো হয়, আমি তোমাকে ভাল ছেলে দেখছি, সেই জন্যই ভালকথা বোলছি, ভালমুখে জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, কি খেতে ইচ্ছা হয় ; কি খাবে বল, আমি এনে দিব, না যদি বল, অনাদিঠাকুরের যে রকম ইচ্ছা হবে, সেই রকম জিনিস তোমাকে খেতে হবে —খেতেই হবে।"

বড় দায়েই আমি ঠেকলেম। ক্ষুধা না থাকলেও খেতে হবে, না খেলে এরা জোর কোরে খাওয়াবে, কথা না শুনলে বেত লাগাবে, চিতোরী এই রকম ভয় দেখালে। চিতোরী মেয়েমানুষ, চিতোরীর মুখে যখন ঐ রকম কথা, তখন না জানি, অনাদিঠাকুর আরো কত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোরবে। সেটা ভাল নয়। মনে মনে এই রকম আলোচনা কোরে চিতোরীকে আমি বোল্লেম, "একান্তই তোমরা যদি না ছাড়, এখানে যদি দুষ্প্রাপ্য না হয়, তবে আমারে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আর একপাত্র জল দিও, তাই দিলেই ঠিক হবে, তাই খেয়েই আমি শুয়ে থাকবো।

চিতোরী উঠলো না ; একটু পরে অনাদি এলো ; আমার মুখের কথা-গুলি চিতোরীর মুখে অনাদি শ্রবণ কোল্লে। ব্যবস্থা মঞ্জুর। অল্পক্ষণ পরে দুগ্ধ-জল পান কোরে আমি শয়ন কোল্লেম। কি বোলবো ?—প্রকৃতই হোক কিম্বা কল্পিতই হোক, রহস্যালাপের ভাবে আমি বুঝলেম, এরা স্ত্রী-পুরুষ, —দম্পতী ; ঘরের দরজায় চাবী দিয়ে অনাদিদম্পতি নিজস্থানে চোলে গেল।

সে সময় যদি আমার নিদ্রা আসতো, তবে এক প্রকার ভালই হোতো ; তা হলো না ; তেমন অবস্থায় শীঘ্র নিদ্রা হয়ও না। পাটনায় আসা অবধি এই দিনের হাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত আলোচনা কোত্তে কোত্তে প্রায় এক ঘণ্টা পরে নিদ্রা এলো, আমি ঘুমালেম। শেষরাত্রে কিম্বা উষাকালে বহু-কণ্ঠমিশ্রিত একটা ভয়ঙ্কর কলরব শুনে আমি জেগে উঠলেম। বিভীষণ চীৎকার ! চীৎকারধ্বনিতে অত বড় বাড়ীখানা যেন ভূমিকম্পনের মত কেঁপে

উঠলো! কত দূর পর্যন্ত সেই চীৎকারধ্বনির প্রতিধ্বনি হোতে লাগলো। কথা বুঝতে পাল্লেম না, ব্যাপার বুঝতে পাল্লেম না। অনাদির একটা কথা সার্থক বোধ হলো, হাটের কলরব ;—সত্যই যেন হাটের কলরব! অনুমান কোল্লেম, সত্যই এখানে হাট আছে।

পুনরায় সেই প্রকার কলরব! বোধ হলো যেন গগনভেদী চীৎকারধ্বনি! রুদ্ধদ্বার শিবমন্দিরমধ্যে চীৎকার কোল্লে যেমন গম্ভীর আওয়াজ হয়, মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আওয়াজ আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ কোত্তে লাগলো। রাত্রি দুই প্রহরের পর আমার নিদ্রা হয়েছিল, ঊষাকালে ভীম চীৎকারে জাগরণ। যতক্ষণ আমি ঘুমিয়েছিলেম, ততক্ষণের মধ্যে সে প্রকার চীৎকার হয়েছিল কি না, বোলতে পারি না ; জাগরণ কোরে অবধি দুই তিনবার সেইরূপ হৃদয়কম্পন, গৃহকম্পন, ভীষণ চীৎকারধ্বনি আমি শুনলেম! কোথা থেকে সেই সকল চীৎকার আসছে, কারা চীৎকার কোচ্ছে, ঠিক নির্ণয় কোত্তে পাল্লেম না ; অনুমানে বোধ হলো, বাড়ীর মধ্যেই চীৎকার ; শত শত লোকের চীৎকার! দেশে বিদেশে, অনেক স্থানে আমি শ্রবণ কোরেছি, চীৎকারও অনেক প্রকার শুনেছি, কিন্তু এমন চীৎকার কখনো আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। একবার মনে হয় মানুষ, একবার মনে হয় জানোয়ার। কত লোক এ বাড়ীতে থাকে, কত লোক আছে, কেন আছে, তারা এখানে কি করে, কেন তারা ঐ রকম রণরঙ্গ-উত্তেজন সিংহনাদ করে, তাও আমি বুঝলেম না। যে ঘরে আমি ছিলেম, এই সময় সেই ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে গেল।

প্রবেশ কোল্লে অনাদি, চিতোরী আর একজন দীর্ঘাকার লোক। নূতন লোকের পরিধান খুব চোস্ত চুড়ীদার পায়জামা, ফরাসীছিটের চিত্র-বিচিত্র বুকবন্ধ চাপকান, মাথায় একটা সবুজবর্ণের বাঁধা পাগড়ী, হাতে একগাছা মনুষ্যপ্রমাণ প্রকাণ্ড যষ্টি। লোকটার মুখ দেখলে ভয় হয়। মুখখানা চৌ-গোঁফফা ; বড় বড় রক্তবর্ণ দুই চক্ষু।

তখন প্রভাত। কিছু পূর্বেই আমি জেগেছিলেম, চীৎকার শুনে ভয় পেয়েছিলেম, নিশ্চয়ই আমার চক্ষে আতঙ্কলক্ষণ ছিল, নূতন লোকটা আমার আপাদমস্তক রক্তচক্ষে নিরীক্ষণ কোল্লে ; অনাদির দিকে চেয়ে, গভীর-গর্জ্জনে বোল্লে, "ঠিক বটে! কিন্তু ঠাণ্ডা আছে। চক্ষু দেখে বোধ হয়, রক্ত খুব গরম! তোমরা এই বালককে ঠাণ্ডা জিনিষ খেতে দিও, পাঁচ সাতটা ডাব নারিকেল পুকুরের পাঁকের ভিতর পুতে রেখে, সাত আট ঘণ্টা পরে তুলে সেই সকল ডাবের জল ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইয়ে দিও, আট দশ কলসী ঠাণ্ডা জলে স্নান করিও, আহারের ব্যবস্থা খাতাপত্রে যেরূপ লেখা আছে, সেইরূপ চোলবে। খবরদার! নূতন নূতন এ ছোকরাকে ঘরের বাহিরে নিয়ে যেয়ো না ; সকলের পক্ষে যে রকম ব্যবস্থা, এ ছোকরার পক্ষে সে রকম ব্যবস্থা হবে না, ডাক্তার-মহাশয়েরা সেই কথা বোলে গিয়েছেন ; সে রকম ব্যবস্থা হবে না কিম্বা এ ছোকরার পক্ষে খাটবে না, সেটা আমি বুঝি নাই, ডাক্তারদুটিকে সে কথা আমি জিজ্ঞাসাও করি নাই। ছেলেটির বয়স কম, চেহারাও ভাল, কিন্তু রক্ত খারাপ।

এখন বাহিরে বেড়াবার সময় নয়, যখন সময় হবে, সময় যখন আমি ঠিক বুঝবো, তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে উচিতমত বন্দোবস্ত করা যাবে।"

ব্যবস্থা বন্দোবস্তের এইরূপ উপদেশ দিয়ে, যষ্টিধারী নূতন লোক পুনর্ব্বার আমার দিকে চাইতে চাইতে ঘর থেকে বেরুলো ; ভাবে আমি বুঝলেম, সে লোকের ক্ষমতা কিছু অধিক ; এখানে সেই লোকের প্রভুত্ব চলে, হুকুম চলে, বাসিন্দালোকের আহারাদির ব্যবস্থা করার তারও সেই লোকের উপর।

লোক চোলে গেল ; অনাদি থাকলো, চিতোরীও থাকলো। আমার মাথার উপর খিলানকরা ছাদ, সেই ছাদের উপর গুম গুম কোরে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ হোতে লাগলো। মানুষেরা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটাছুটি কোচ্ছে কিম্বা আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য কোচ্ছে, সেইরূপ শব্দ। ভয় আছে, সন্দেহ আছে, বিস্ময় আছে, সেই তিন ভাবের মধ্যবর্ত্তী হয়ে অনাদিকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ও সকল কিসের শব্দ ! আমার মাথার উপর মানুষেরা ও সব কি কোচ্ছে ? একটু আগে দুই তিনবার আমি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ শুনেছি, একসঙ্গে বহু লোকের চীৎকার। কারা এখানে তেমন কোরে চীৎকার করে ? কেন করে ? বাড়ীতে কারা থাকে ? বাড়ীখানা কার ? এ বাড়ীতে কি হয় ?"

"কিসের চীৎকার, তাও বুঝি তোমাকে বোলতে হবে ? কিছুই বোলতে হবে না ; থাকো কিছুদিন এখানে, থাকতে থাকতে সমস্তই জানতে পারবে ; থাকতে থাকতে তোমাকেও এই রকম কোত্তে হবে। জায়গাটা বড় মজার জায়গা। দুনিয়ার মজা দেখতে যাদের সাধ হয়, তারাই এই বাড়ীতে আসে। দেখে যায়, শিখে যায়, ঐ রকম নেচে কুঁদে আমোদ করে যায়, শেষকালে আরাম হয়ে, দুরস্ত হয়ে ঘরে চোলে যায়।"—আমার বিস্ময়সূচক প্রশ্নে কৌতুকে উপরপড়া হয়ে চিতোরী এই সকল কথা বোলে উঠলো।

কি উৎপাত ! জিজ্ঞাসা কোল্লেম অনাদিকে, ব্যঙ্গ কোরে উত্তর কোল্লে, চিতোরী। উত্তরের কোন কথার মর্ম্ম আমি বুঝে উঠতে পাল্লেম না ; রাত্রে চিতোরীকে এক রকম দেখেছিলেম, এখন দেখলেম আর এক রকম। চিতোরী আমার সঙ্গে ঐ রকম পরিহাস কোত্তে লাগলো, অনাদিঠাকুর মুখ টিপে টিপে হাসতে আরম্ভ কোল্লে। আমি বিরক্ত হোলেম ; আর কোন কথা আমি তখন জিজ্ঞাসা কোল্লেম না, মাথা হেঁট কোরে মৌনভাবে বোসে থাকলেম।

রৌদ্রের তেজ বৃদ্ধি হবার অগ্রেই সেখানকার লোকেরা আমারে বাসী জলে স্নান করিয়ে দিলে, তত শীঘ্র পাঁকে পোতা হলো না, বড় বড় দুটো তাজা ডাবের শীতল জল আমারে খাইয়ে দিলে, উদর যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ভোরে একটু ক্ষুধাবোধ হয়েছিল, এখন আর কিছুমাত্র ক্ষুধা থাকলো না। অনাদিঠাকুর ঘণ্টাখানেক পরে আমার আহারসামগ্রী এনে হাজির কোল্লে ; আমি বোল্লেম, "খাব না", অনাদিঠাকুর সে কথা শুনলে না, কাজে কাজে যৎকিঞ্চিৎ মুখে দিয়ে বড় বড় ঢেঁকুর তুলে আমি আচমন কোল্লেম। আমার আচমন করা দেখে অনাদি চিতোরী উভয়েই যেন একটু চোমকে গেল। অনাদি

চাইলে চিতোরীর মুখের দিকে, চিতোরী চাইলে অনাদির মুখের দিকে; শেষকালে দুইজনই চাইলে আমার মুখের দিকে। আমি ভ্রূক্ষেপ কোল্লেম না।

এই রকমে আট দিন। এক ভাব। প্রথম রজনী প্রভাতে যেমন চীৎকার আমি শুনেছিলেম, যে রকম শব্দ পেয়েছিলেম, অবিচ্ছেদে ঐ আট দিন ঠিক সেই রকম শুনলাম। বোলতে হয় সেই রকম, বোল্লেমও সেই রকম; বাস্তবিক দিন দিন বরং উচ্চমাত্রার শ্রীবৃদ্ধি! একদিন জিজ্ঞাসা কোরে চিতোরীর মুখে পরিহাস শুনেছিলেম, অনাদিকে নিস্তব্ধ দেখেছিলেম, তদবধি আর কোনদিন আমি সে সকল উপসর্গের কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই;—জিজ্ঞাসা করি নাই বটে, কিন্তু মনে মনে ভয়বিস্ময়ের অবিচ্ছেদ ক্রীড়া। সে সকল ক্রীড়া কেবল আমিই অনুভব কোল্লেম।

অষ্টম রজনীতে বিশ্রামের জন্য যখন আমি শয়ন কোল্লেম, গৃহদ্বারে যখন চাবী বন্ধ হলো, সেই সময় আমার মনের সঙ্গে আমার প্রাণের কথা। রাজা মোহনলাল ঘোষ বাহাদুর আমারে পাটনায় আনালেন, ফুলবাগানে যা কিছু বলবার, তা আমারে বোল্লেন, তার পর তিনবার তিন জন লোক এসে আমারে পরীক্ষা কোরে গেল। পরীক্ষার পর রাজাবাহাদুর একদিন এক সভা কোল্লেন, সভায় আমারে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হোতে হলো। লোকেরা জিজ্ঞাসা কোল্লে আমার কষ্টের কথা, আমিও বার বার বোল্লেম আমার কষ্টের কথা। বার বার কেহ যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথা কয়, লোকে তারে পাগল মনে করে; রাজসভার লোকেরা আমারে পাগল বিবেচনা কোল্লে। ডাক্তার বোলে যারা পরিচয় দিয়েছিল, তারা আমার চিকিৎসা করবার ব্যবস্থা দিলে। চিকিৎসা!—কিসের চিকিৎসা?—তারা ভাবলে আমি পাগল; যে ঔষধে পাগল ভাল হয়, সেই রকম ঔষধ তারা আমার জন্য ব্যবস্থা কোরবে, এইরূপ আভাষ দিলে। তার পর দুটি ডাক্তার আমার কাছে গিয়ে নূতন রকম আত্মীয়তা জানালে; আমারে সন্ধ্যাকালের হাওয়া খাওয়াবে বোলে ফাঁকি দিয়ে এই বাড়ীতে নিয়ে এলো। আবার এসে দেখে যাবে বোলে, অনাদির হাতে আমারে সোঁপে দিয়ে হাসতে হাসতে তারা প্রস্থান কোল্লে; আর এলো না। নীলাম্বর আর রঘুনাথ।

কোথায় তারা আমারে রেখে গেল? লক্ষণে যে রকম আমি বুঝতে পাচ্ছি, লাফালাফি, হাঁকাহাঁকির যে রকম ঘটা, তাতে আমার যেন মনে হোচ্ছে, এ বাড়ীতে যারা আছে, তারা সকলেই পাগল! এটা পাগলাগারদ! ধূর্ত্ত ডাক্তারেরা ধূর্ত্ততা কোরে আমারে বাতুলালয়ে রেখে গিয়েছে! আমি পাগল! হায় হায়! লোকের চক্রেই আমি পাগল ভাঁড়ের গল্পে শুনেছিলেম, "দশচক্রে ভগবান ভূত!" মোহনলালের ডাক্তারেরা পাঁচজন, পঞ্চচক্রে আমিও এক রকম ভূত হয়েছি! সহজ মানুষ যদি পাগল হোতে পারে, তবে ভূত হওয়া বড় আশ্চর্য্য নয়! আমি ভূত!—আমি পাগল!—পাগলা গারদে আমি বন্দী! লোকের কুচক্রে কি যে হোতে পারে না, বিশ্বাসী জ্ঞানবান পণ্ডিতেরাও সে তত্ত্বের মীমাংসা কোত্তে অক্ষম।

আমি পাগল!—মানুষের চক্রান্তেই আমি পাগল! পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে যে যে স্থানে যতপ্রকার বিপদের মুখে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি, মানুষের চক্রান্তই সেই

সমস্ত বিপদের মূল। আমার সম্বন্ধে একটিও দৈব বিপদ নয়, পূর্ণবিশ্বাসে এ কথা আমি বোলতে পারি। এখন আমি পাগল ;—পাটনার পাগলাগারদে বন্দী ; অমরকুমারী কি আমার এ অবস্থা জানতে পাচ্ছেন ? অমরকুমারী এখন কোথায় !—ঢাকায় কিম্বা মাণিকগঞ্জে কিম্বা মুর্শিদাবাদে ? আমি কোথায় আছি, অমরকুমারী কি তা জানেন ?

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আর একটা বড় কথা আমার মনে পোড়লো। ত্রিপুরায় জয়শঙ্করবাবু আমার বন্ধুবান্ধবগণকে চিঠি লেখার সংকল্পের পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পাটনায় এসে সেই বাধা অতিক্রম কোরে, সাত-খানি পত্র লিখে ডাকযোগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমি প্রেরণ কোরেছি। যাঁর যাঁর নামে শিরোনাম, নিশ্চয়ই তাঁরা যথা সময়ে সেই সকল পত্র প্রাপ্ত হয়েছেন। উত্তরপ্রাপ্তির ঠিকানা আছে, রাজা মোহনলাল ঘোষ বাহাদুরের বাটী,—পাটনা। অমরকুমারী যদি মুর্শিদাবাদে থাকেন, শান্তিরামের মুখে অথবা মণিভূষণের মুখে আমার বর্ত্তমান ঠিকানা তিনি জানতে পেরেছেন,—অবশ্য জানতে পেরে-ছেন ; জানতে পেরে এখন তিনি কি মনে কোচ্ছেন ? যে "ভাব" তাঁর মনে উদয় হয়েছে, মনে মনে আমিও তা জানতে পাচ্ছি। কেবল জানামাত্র, ফলাংশে নূতন গোলমাল।

পত্রগুলি যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা অবশ্যই উত্তর লিখে পাঠাবেন। কোথায় পাঠাবেন ! রাজা মোহনলালের বাড়ীতে, রাজা মোহনলাল দয়া কোরে সে সকল পত্র আমার কাছে পাঠাবেন, সে আশা নাই ;—পত্রগুলি আমি পাব না। পাগলা-গারদে আমি কয়েদ আছি, ডাকঘরের লোকেরা এ অদ্ভুত ঠিকানা জানবে না, এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখাও কোরবে না, পত্রগুলি আমি পাব না। বন্ধু-লোকগুলির শারীরিক মানসিক শুভ সমাচার, অমরকুমারীর শারীরিক মান-সিক অবস্থাও আমি জানতে পাব না। তাঁদেরও উদ্বেগবৃদ্ধি হবে, আমারও উদ্বেগ দিন দিন বাড়তে থাকবে। দ্বিতীয়বার পত্র-লিখনেরও আর এখন আমার সুবিধা নাই। কতদিন যে এই রকমে যাবে, গণনা কোরে তার সীমাও আমি নিরূপণ কোত্তে পাচ্ছি না।

বাতুলালয়ে অষ্টম রজনীতে আমার মনোমধ্যে এই সকল ভাবনা সমুদিত। এই সকল ভাবনার সঙ্গে হঠাৎ একটা তর্ক আমার মনে উঠলো। পূর্বে আমি শুনেছিলেম, যে সকল লোককে সরকারী লোকেরা পাগলাগারদে রাখে, সে সকল লোকের চিকিৎসা নূতন প্রকার। গারদের লোকেরা পাগলগুলিকে ধরে, মারে, বাঁধে, যন্ত্রণা দেয়, ভয় দেখায় ফস্ত খোলে, এক এক জনের সম্মুখে পূতিগন্ধযুক্ত ঘৃণাকর বস্তু রেখে দেয় ;—আরো কত কি করে, সব কথা আমি শুনি নাই। এরা আমারে কয়েদ কোরে রেখেছে, একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক নিত্য নিত্য আমার সেবা-শুশ্রূষা কোচ্ছে, একজন একদিন এসে তদারক কোরে গিয়েছে, চিতোরী, মধ্যে মধ্যে ঠাট্টাতামাসার কথা কয়, এই পর্য্যন্ত ; তা ছাড়া কেহই আমার উপর কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করে না। কেন করে না, তাও আমি মনে মনে এক রকম অনুমান কোল্লেম। এখন সেটা বলা

হবে না ; ভাগ্যক্রমে কোন লোকের অনুগ্রহে যখন আমি এই পিশাচপুরী থেকে খালাস পাব, তখন সে অনুমানের কথাটা সকল লোককে জানাবো।

রাত্রের কার্য নিদ্রা। আমার কার্য চিন্তা। বিশেষতঃ এই গারদঘরে। নানা দুভাবনায়, দু-একটা সু-ভাবনায় সমস্ত রজনী আমি জাগরণ কোল্লেম। রজনী অবসানে। প্রভাতে—ঠিক প্রভাতে না, অথবা অল্প অন্ধকার থাকতে দরজার চাবী খুলে এক জোড়া নর-নারী গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে ; অনাদি আর চিতোরী। নিত্যনিয়মিত কাজগুলি সমাপ্ত হবার পর তারা দুজনে আমার নিকটে এসে বোসলো। অনাদিঠাকুর সত্য সত্য চিতোরীর স্বামী কি না, জানি না, কিন্তু আমি অনুমান কোরেছি স্বামী ; অনুমানমতেই পূর্বে পরিচয় দিয়েছি "দম্পতি।" স্বামীর মুখপানে চেয়ে চিতোরী একটু মুচকে মুচকে হেসে আমার দিকে ফিরে বোল্লে, "হরিদাস!—এই দেখ, আমি তোমার নাম পেয়েছি!—হরিদাস! আজ তোমারে একটা সুসংবাদ দি!—আজ বৈকালে এক জায়গায় তোমার নিমন্ত্রণ হবে ; সেখানে তুমি অনেক রকম নূতন নূতন মজা দেখতে পাবে।"—এই কটী কথা বোলে, উঠে দাঁড়িয়ে, তিনবার করতালি দিয়ে, কতই যেন উল্লাসে চিতোরী আপনা আপনিই বোল্লে, "ভারী মজা! ভারী মজা! ভারী মজা!"

কতই যেন আহ্লাদে ঐ কথাগুলি বোলে, বেশ আড়খেমটা তালে, চিতোরী সেইখানে হেলে দুলে নৃত্য আরম্ভ কোরে দিলে! অনাদিঠাকুর একটিও কথা বোল্লে না, আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে চঞ্চলভাবে উঠে দাঁড়ালো ; উভয়েই একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। আর একবার তারা এসেছিল ; আমার আহারের আয়োজন কোরে দিয়ে খানিকক্ষণ সেখানে থাকলো, আমি আহার কোল্লেম ; প্রাণধারণের জন্য আমার আহার করার অনিচ্ছায় যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ কোরে বিছানার ধারে আমি বোসলেম। পুনর্বার পূর্বরূপ করতালি দিয়ে, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে পূর্বরূপ স্বরেই চিতোরী তিনবার বোল্লে "ভারী মজা! ভারী মজা! ভারী মজা!" কিছুই ভাব বুঝতে না পেরে আমি ভাবতে লাগ-লেম, না জানি, কি মজাই এরা আমারে দেখাবে!

তৃতীয় কল্প

পাগলা বাগান!

অনাদি-দম্পতি প্রস্থান করবার পর আমার মনে আর নূতন কথা কিছুই এলো না, কেবল চিতোরীর কথাই আলোচনা কোত্তে লাগলেম। ভারী মজা'—কি রকম মজা! নিমন্ত্রণ!—নিমন্ত্রণে মজা কি আছে? কি মজা তারা আমারে দেখাবে? মজা আমি অনেক দেখেছি ; মজা দেখিয়ে দেখিয়ে মজার লোকেরা

আপনারাই মজে গিয়েছে ; এক এক স্থলে এক এক ঘটনায় আমারেও মজিয়েছে। এখানে আবার কি রকম মজা? অনেক চিন্তা কোল্লেম, অনুমানে কিছুই এলো না।

বৈকাল। ক্ষণে ক্ষণে আমি কোন লোকের আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছি। কে আসবে, কে আমারে কি রকম মজা দেখাবে, সাগ্রহ কৌতূহলে তাই আমি ভাবছি। হয় তো চিতোরী আসবে, হয় তো অনাদি আসবে, তাদের সঙ্গে হয় তো কোন নূতন লোক দেখা দিবে, এইরূপ আমার কল্পনা। বৈকাল। বৈকালের সীমা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত। ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমারে অপেক্ষা কোত্তে হবে, অপেক্ষার ফলে সত্য মিথ্যা জানা যাবে ; অপেক্ষা কোত্তে লাগলেম। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোত্তে হ'লো না। সত্য যদি কিছু মজা থাকে, আমার সঙ্গে সূর্য্যদেবও সেই মজা দর্শন কোরবেন, এইরূপ লক্ষণ বুঝলেম।

বেলা যখন প্রায় তৃতীয়প্রহর, সেই সময় একটি সুন্দরী রমণী দেখা দিল। সুন্দরী শুভ্রবর্ণা, পট্টকেশী, মার্জ্জারনেত্রা, কৃষ্ণবসনা। রমণী আমার প্রতি দুই তিনবার কটাক্ষপাত কোল্লেন, আমিও দুই তিনবার তাঁর প্রতি কটাক্ষপাত কোল্লেম, এই পর্য্যন্ত কার্য্য। কটাক্ষবিনিময়েই কার্য্যের উপমশ হয়। একটিও বাক্যব্যয় না কোরে রমণী ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে একটি সাহেবের প্রবেশ। সাহেবটি খর্ব্বাকার ; স্বাভাবিক খর্ব্বাকৃতি স্থূলে স্থূলে বসনাবরণে আরো যেন অধিক খর্ব্ব বোধ হলো ; মাথায় একটা ছত্রাকার টুপী, হস্তে একগাছি অশ্বচালনের চাবুক। আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে, দন্তদ্বারা বামহস্তের অঙ্গুলীর একটি নখ কর্ত্তন কোত্তে কোত্তে, সাহেবটি খানিকক্ষণ আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরক্ষণ কোল্লেন ; তার পর ছোট ছোট ইংরাজী কথায় আমারে গুটিকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেন। সাধ্যমত সাবধানে অর্থ বুঝে বুঝে, আমি তাঁর প্রশ্নগুলির যথাসম্ভব সদুত্তর প্রদান কোল্লেম। সাহেব আর দাঁড়ালেন না ; ঘন ঘন পদবিক্ষেপে চাবুকগাছটি নাচাতে নাচাতে, আপন মনে শীস দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই আর একটি লোক। ইত্যগ্রে একদিন সবুজ পাগড়ী মাথায় দিয়ে যে লোকটি আমারে দেখে গিয়েছিলেন, আমি যাঁরে এই আশ্রমের জমাদার মনে কোরেছিলেম, সেই লোক। গজেন্দ্রগমনে সেই লোকের প্রবেশ।

দুইবার দুইদিকে মস্তক বক্র কোরে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে, অশুদ্ধ হিন্দীভাষায় লোকটি আমারে বোল্লে, "এসো তুমি আমার সঙ্গে ; অনাদির মুখে আমি শুনেছি, কদিন তুমি বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আছ! সমান ভাব। শুনে আমি তোমার উপর খুশী হয়েছি, এসো তুমি আমার সঙ্গে!"

আমি ভাবলেম, এ কি ভাব! এ লোক আমারে ডাকে কেন? কোথায় নিয়ে যাবে? আমি পাগল নই, সেইটি জানতে পেরে এই লোকটি কি আমারে খালাস কোরে দিবে? তাও তো বিশ্বাস হয় না। তবে কি?—চিতোরী বোলেছিল, নিমন্ত্রণের কথা, মজা দেখবার নিমন্ত্রণ ; এই লোক কি আমারে সেই মজা

দেখাতে নিয়ে যাবে? যাব না যদি বলি, বিপরীত হয়ে দাঁড়াতে পারে, যাওয়াই কর্ত্তব্য; দেখাই যাক, কিরূপ ঘটনা হয়। এইরূপ ভেবে, দ্বিরুক্তি না কোরে, সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গে আমি চোল্লেম। প্রথমদিন যেমন ছোট ছোট জঙ্গলী-পথ অতিক্রম কোরে আসা হয়েছিল, লোকের সঙ্গে সেই রকম জঙ্গলীপথ পার হয়ে বাড়ীখানার অন্যদিকে উপস্থিত হোলেম। বাহির অংশ।

বাড়ীর বাহির, কিন্তু বাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন। বৃহৎ একখানা বাগান। এক দিকে বাড়ী, অপর তিন দিকে উচ্চ উচ্চ প্রাচীর। বাগানে নানাজাতি বৃক্ষ; কতকগুলি প্রাচীন, কতকগুলি তরুণ। এক একদিকে শারিবন্দী ফুলের গাছ; তৃণলতাশূন্য অনেকটা খালি জায়গা। স্থানে স্থানে জনকতক লোক এক একটা কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে আছে, কাহারো মুখে কথা নাই। কেহ কেহ বুকে হাত বেঁধে, অশ্বকদমে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, কাজকর্ম্ম কিছুই কোচ্ছে না। সহচর লোকটির সঙ্গে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আমি তাদের গতিক্রিয়া দর্শন কোত্তে লাগলেম। সেই সকল লোক কোথাকার, বাগানে তারা কি রকম কার্য্য করে, তা আমি জানতে পাল্লেম না। লোকটি আমারে কেনই বা সেখানে নিয়ে গিয়েছে, তার কারণ অনুভব কোত্তেও আমি অক্ষম হোলেম।

আমি অবগত হয়েছিলেম, আমার সঙ্গী লোকটির নাম হিঙ্গনসিংহ, ঐ আশ্রমের একজন তত্ত্বাবধায়ক। লোকেরা যে দিকে বেড়াচ্ছিল, যে দিকে কাজ-কর্ম্ম কোচ্ছিল, সে দিকে আমরা গেলেম না, একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেম। হিঙ্গনসিংহ আমারে বোল্লে, "কোথায় তুমি আছ, বোধ হয়, সেটা তুমি জানতে পার নাই; এই আশ্রমের নাম বাতুলালয়,—চলিত কথায় পাগলা-গারদ। তোমার মনোবিকার উপস্থিত হয়েছিল, তোমার অভিভাবকেরা তোমাকে এই আশ্রমে প্রেরণ কোরেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, অল্প দিনের মধ্যে তুমি অনেক-দূরে আরাম হয়ে উঠেছ। এখানকার নিয়ম এইরূপ যে, অল্পে অল্পে যারা আরাম হয়, যারা কোন প্রকার হাঙ্গামা না করে, প্রতিদিন তারা এই বাগানে হাওয়া খেতে পায়। বাগানের কাজ-কর্ম্ম যারা জানে, মন স্থির রাখবার জন্য সেই সকল লোককে এক একটা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। আজ অবধি তুমি এই বাগানে বেড়াবার অনুমতি পেয়েছ; বাগানে অনেক প্রকার মনোহর বস্তু আছে, সেই সকল বস্তু দর্শন কোল্লে, বৃক্ষপল্লবের শীতল বায়ু সেবন কোরে, তোমার মন অনেক ভাল থাকবে; এখানকার কর্ত্তাপক্ষের আদেশমতে সেই জন্যই আমি তোমাকে এখানে এনেছি। যাও, উদ্যানে স্বেচ্ছামত ভ্রমণ কর। যেগুলি তোমার দেখতে ভাল লাগে, সেইগুলি দেখ, হাওয়া খাওয়া কোন বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ো না, ফুল তুলো না, ফল পেড়ো না। সাবধান! যারা এখানে কাজ-কর্ম্ম কোচ্ছে, ভ্রমণ কোরে বেড়াচ্ছে, ওরা সকলেই পাগল। নিয়ম আছে, বাতুলালয়ের যে সকল পাগল কোন প্রকার উৎপাত করে না, কাহাকেও প্রহার কোত্তে যায় না, কাহাকেও দংশন করে না, ভালমানুষের মত শান্ত হয়ে থাকে, তারা ঐ রকম স্বাধীনতা পায়। যাও, যতক্ষণ ইচ্ছা, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ততক্ষণ ভ্রমণ কর; কেহ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে উত্তর দিও না; আমি এই-খানে থাকলেম, মনে রেখো।"

সেইখানে বৃহৎ একখানা চতুষ্কোণ পাথর ছিল, হিঙ্গনসিংহ সেই পাথরের উপর বোসে থাকলো, বাগানের যে দিকে পুষ্পবাটিকা, ধীরে ধীরে সেই দিকে আমি চোল্লেম ; আমার সঙ্গে তখন কেহই থাকলো না। একবার আকাশপানে চেয়ে আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেম। আমার পূর্ব্ব অনুমান যথার্থ। মনে মনে ভেবে ইতিপূর্ব্বে যা আমি স্থির কোরেছিলেম, হিঙ্গনসিংহের মুখে আজ স্পষ্টই তাই শুনলেম। বাড়ীখানা পাগলা-গারদ ! যখন তখন বাড়ীর ভিতর যে সকল চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করি, সে সকল পাগলের চীৎকার ; পাগলেরাই সময়ে সময়ে উৎকট চীৎকার কোরে বাড়ী কাঁপায়। ঐ সব কথাই ঠিক। হায় হায় ! কি অপরাধে আমি এই পাগলা-গারদে এসেছি ? যারা রেখে গেল, তারা আর এলো না ; কোথায় আমি থাকলেম, রাজা বাহাদুরও সে সংবাদ নিলেন না। রাজা মোহনলালের পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ কোরে মনে মনে আমি বেশ বুঝলেম, এ চক্রের গোড়াই মোহনলাল।

ভাবতে ভাবতে আমি চোলেছি, এক জায়গায় দেখি, একটা লোক একটা বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন আকাশপানে চেয়ে দেখছে ; হাতদুখানা এক একবার উপরদিকে তুলছে, মুষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক একবার নীচের দিকে নামাচ্ছে। জোরে জোরে কি যেন আকর্ষণ কোচ্ছে, ভঙ্গীতে এইরকম বোধ হয়। লোকটার হাতে কিছুই নাই, শূন্য হস্ত ; তথাপি ঐ প্রকার ভঙ্গী। লোকটা পাগল, বুঝতে আর বিলম্ব হলো না। পাগলের খেয়ালে বায়ু আকর্ষণ কোচ্ছে, এইরূপ আমি ভাবলেম। লোকটার দৃষ্টি সমভাবে উপরদিকে হাতদুখানা সমভাবেই ঘুরছে। হঠাৎ আপন মনে হো হো কোরে হেসে, লোকটা চীৎকার কোরে বোলে উঠলো, "হো হো—ভো কাট্টা !"

যেখানে সেই লোক, তার পাঁচ হাত তফাতে আমি। ধীরে ধীরে আমি পদক্ষেপ কোচ্ছিলেম, সহসা উপরদিক থেকে চক্ষু নামিয়ে, আমারে দেখে, সেই লোক আস্ফালন কোরে বোল্লে, "দু—ু— —ও ! হেরে তো গেল্লি ! ভো কাট্টা ! —ভো কাট্টা !—ভো কাট্টা ! আর আমি তোর সঙ্গে খেলবো না ! রসিকের সঙ্গে ঘুড়ী খেলেছি, তিনুদাদার সঙ্গে ঘুড়ী খেলেছি, পিসীমার সঙ্গে ঘুড়ী খেলেছি, ভো কাট্টা ! ভো কাট্টা ! ভো কাট্টা ! গুরুমশায় ! আয় আয় আয় ! তুই বুঝি সেই বক পাখী, তালগাছে একটা বক পাখী ছিল, তার সঙ্গে একবার আমি ভো কাট্টা লড়াই করি ; হাঃ—হাঃ—হাঃ ! তুই বুঝি সেই বক পাখী ? সে পাখী তো মেরেছি, পাখী তো ভূত হয়ে গিয়েছে, ভূত হয়েই ঘুড়ী হয়েছে, তুই বুঝি সেই ঘুড়ীখানা ? ঠিক তুই আমার কাছে এসেছিস ! হো ! হো ! হো ! ভো কাট্টা। ভো কাট্টা। ভো কাট্টা।"

পায়ে পায়ে লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো ; গল্পের কন্ধকাটা ভূত যেমন মানুষের উদ্দেশে বাহু বিস্তার কোরে ধরবার জন্য ছুটে যায়, সে লোকটাও সেইরূপ উপক্রম কোল্লে। আমি অগ্রসর হোচ্ছিলেম, পায়ে পায়ে পেছিয়ে পেছিয়ে হোটে আসতে লাগলেম ; মনে কোল্লেম, এটা ঘুড়ী খেলার পাগল। হোটে আসতে আসতে পশ্চাদ্দিকে একবার ফিরে চাইলেম ; দেখলেম,

যেখানকার হিঙ্গনসিংহ, সেইখানেই ঠিক বোসে আছে। একটা হিঙ্গন নয়, একটা সিংহ নয়, বাগানের স্থানে স্থানে, দূরে অদূরে, আরো কত সিংহ, আরো কত ব্যাঘ্র, আরো কত হস্তী, এক একখানা পাথরের উপর চুপ কোরে বোসে আছে দেখলেম ; কাহাকেও কিছু বোলছে না ; হিঙ্গনসিংহ আমারেও কিছু বোল্লে না ; কোন প্রকার ইসারাও কোল্লে না।

আমি আর একদিকে চোল্লেম ; যেতে যেতে দেখলেম, আর এক জায়গায় একটা কাটা কলাগাছ পোড়ে আছে, একজন বলবান লোক সেই কলাগাছের উপর হাঁটু দিয়ে বোসে দুই হাত দিয়ে সেই গাছটাকে জোরে জোরে ভাঙবার চেষ্টা কোচ্ছে ; গাছের উপর গুম গুম কোরে কিল মাচ্ছে, এক একবার লাথি মেরে গাছের গোড়ার দিকটা চেপে চেপে ধোচ্ছে। যেতে যেতে সেইখানে আমি দাঁড়ালেম ;--খুব নিকটে নয়, দুই তিন হাত তফাতে। লোকটা সেই সময় মুখ উঁচু কোরে আমার দিকে চেয়ে, গভীর-গর্জ্জনে বোল্লে, "কি তুমি দেখছো ? আমি কীচকবধ কোচ্ছি বাবা ! মল্লযুদ্ধে আমি ভীমসেনের বাবা ; কুইন ভিকটোরিয়ার সেনাদলে চাকরী পাবার প্রার্থনায় বিলাতে আমি দরখাস্ত পাঠিয়েছি, বিলাত থেকে হুকুম এসেছে, আমি যদি একটা কীচকবধ কোত্তে পারি, তা হোলেই পঞ্জাব রেজিমেণ্টে সুবেদার হব।"

নিকট থেকে আমি সোরে গেলেম ; মনে কোল্লেম, এ লোকটা যুদ্ধে চাকরী করবার পাগল। সে পাগলের প্রায় বিশ পঁচিশ হাত দূরে আর একটা লোক ঘাসের উপর বোসে বোসে সম্মুখের ঘাসের উপর অঙ্গুলীর দ্বারা কি যেন আঁক পাড়ছে, আপনা আপনি কি যেন বোকছে, ঘন ঘন ঠোঁট কাঁপাচ্ছে। আমি একটু নিকটে গিয়ে দাঁড়াবামাত্র, আমার মুখের দিকে চেয়ে সেই লোক শীঘ্র শীঘ্র বোল্লে, "সব ভুল ! সব ভুল ! সব ভুল !—তুমি ? এ সব টীকা তুমি লিখেছো।—সব ভুল ! সব ভুল ! সব ভুল ! নৈষধের টীকার—বাবা ! তোমার কর্ম্ম নয় ! আমি একবার যাজ্ঞবল্ক্য-টীকা সংগ্রহ কোরেছিলেম, আট বছরের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা দেখে, পুথিখানা জ্বালিয়ে দিয়েছে। নৈষধের টীকা করা তোমার কর্ম্ম নয় ! মেঘদূতের বাঙ্গালা অনুবাদ করবার সময় আমি দেখলেম, শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নাই, তবেই তো হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। যে পাঠ আমি ত্যাগ কোল্লেম, নৈষধ ধোল্লেম ; আদিরসের ভাগটা—বুঝলে কি না ?—সেই ভাগটা আমি—না না—সে আমি না, আমাদের দেশের রমানাথ পূজারী—তুমি বুঝি সেই রমানাথ পূজারীর মনুসংহিতা পাঠ কর ? বোসো তবে। আমি একখানা নৈষধের মনু তোমাকে দেখাব, তা হোলে আর টীকা করা আবশ্যক হবে না।"

যদি আমি না জানতেম, এটা পাগলা-গারদের বাগান, তা হোলে আমার হাসি পেতো। অপর লোকের হাসি দেখলে পাগলেরা রাগ করে, তাও আমি শুনেছিলেম ; হাসি পেয়েছিল, হাসলেম না ; মনে কোল্লেম, এটা শাস্ত্রের পাগল।

আবার অন্যদিকে আমি চোল্লেম। এক বৃক্ষডালে একটা স্ত্রীলোক ; মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক কোরে হাসছে, এক একবার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে ; তার চক্ষে যেন জোনাকী-পোকা জ্বেলছে। স্ত্রীলোকটা সুন্দরী ছিল ; এখনো বয়স অল্প, সৌন্দর্যের কিছু কিছু চিহ্ন তার মুখে চক্ষে এখনো বিদ্যমান। মাথার চুল নাই, সেই কারণে মুখশ্রী। প্রতি মানুষের চক্ষু ততটা আকৃষ্ট হয় না। পরিধান একখানা লালপেড়ে শাড়ী, শাড়ীর আঁচলটা ভূতলে লুণ্ঠিত হোচ্ছে, স্ত্রীলোকটা হাসছে। সম্মুখ দিয়ে আমি চোলে যাচ্ছিলেম, হাতছানি দিয়ে পাগলী আমারে ডাকলে। কাছে গেলেম না, একটু তামাসা দেখবার অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম। হস্ত-সঙ্কেতে, নেত্রসঙ্কেতে, হাবভাব দেখিয়ে পাগলী বোলতে লাগলো, "এসেছিস ? হাঁ—হাঁ—হাঁ! তেমনি কোরে কি পালিয়ে যেতে হয় ? হা—হা—হা। তেমনি কোরে বুঝি বিয়ে করে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ ; যারে যারে আমি বিয়ে কোরবো মনে করি, তারাই অমনি কোরে পালায়, হী—হী—হী! আচ্ছা ভাই! প্রেম-ধন, যৌবনধন, প্রাণধন যারে আমি দিতে চাই, সে কেন পালায় ? তুমি কেন পালালি ? হী—হী—হী! এরা আমাকে এইখানে এনেছে। বলে কি না—বলে কি না, এইখানেই আমার বিয়ে দিবে, হী—হী—হী! বিয়ের বর যে আমার কোথায়, তা এরা খুঁজে পাবে না। সেই যে বরটি,—যে আমারে বোলে গিয়েছে, —বাঁচি তো বসন্তকালে দেখা হবে আর বছর!' সে বরটি যে কোথায় গেল, হী—হী—হী! এই যে—এই যে সেই বর! বা রোসকে! তুই যে সেই বর! হী—হী—হী! সেই যে সেই ছোট বেলায়—তুই যখন খোকা ছিলি, আমি যখন খুকী ছিলেম, সেই সময় তোতে আমাতে বৌ বৌ খেলা কোরেছি, ঘোমটা দিয়ে তোর কাছে গিয়ে শুয়েছি, আপনার মুখে কাকের ডাক ডেকে দিনের বেলায় রাত পুইয়ে দিয়েছি, হাঃ—হাঃ—হাঃ! সে সব কি তুই ভুলে গেলি ? আয় ভাই! আয়!—আয়, আয়—আয়! 'বাঁচি তো বসন্তকালে দেখা হবে আর বছর!' সে আর বছর কি এখনো এলো না ? বছর না আসুক, তুই এসেছিস, হী—হী—হী! তোরে এরা ধোরে এনেছে, না তুই আপনি এসেছিস ? আর ভাই!—প্রাণ যায়!—বুক যায়!—কে এনেছে ?—সেই কোকিল পাখী ?—সেই আমাদের পুকুরধারে, ঘাসবনের ভিতর লুকিয়ে লুকিয়ে, যে পাখীটি কুহু কুহু গীত গাইত, সেই পাখী কি তোরে ধোরে এনেছে ? না ভাই! হী—হী—হী! —তা হবে না! আমি তোরে ছেড়ে দিব না! তোরেও ছাড়বো না, সেই পাখীও ছাড়বো না ভালবাসার কি দুর্দ্দশা!—তোকে ভালবেসে আমার এই দশা!—হা—হা! সেই পাখীটিরও—ভাই রে নারে প্রাণপাখী!—হী—হী—হী!"

হী হী রবে হাসতে হাসতে পাগলীটা আমারে যেন আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটে আসতে লাগলো, আমিও ছুটে পালালেম, পাগলীর দিকে আর ফিরে চাইলেম না ; মনে কোল্লেম, এটা হয় তো প্রেমের পাগলিনী ;—চাইলেম একবার হিঙ্গন সিংহের দিকে। হিঙ্গন তখন অনেক দূরে, বাগানটা খুব বড় কি না, অনেকটা দূরে আমি এসেছিলেম, হিঙ্গন সেই পূর্ব্বস্থানেই বোসে ছিল,

কাজেই অনেকটা দূর বোধ হলো। পাগলীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আমি অন্যদিকে চোল্লেম। কত দিকে কত পাগল কত কাজে নিযুক্ত আছে, আর আমি কাহারো নিকট দিয়ে চোল্লেম না ; যে দিকে লোকজন নাই, যে দিকে নানা রকম ফুলের গাছ, অন্য কোন দিকে না চেয়ে, ঠিক সেই দিকেই আমি চোল্লেম। যাচ্ছি, খানেক দূর গিয়েছি, দেখি—সম্মুখে একজন ভদ্রলোক ; ঠিক যেন একটি ভদ্রলোক ! দিব্য পরিষ্কার কাপড় পরা, গলায় একছড়া ফুলের মালা, মাথার বাঁ-দিকে, ডান দিকে, মাঝখানে, তিনটে সিঁথিকাটা · দিব্য চেহারা ! সেই লোকের সংগে মুখামুখী হয়ে আমি দাঁড়ালেম। লোক আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে যেন আপশোষ কোরে বোল্লে, "আহা ! এত অল্প বয়সে এখানে তুমি এসেছ। কে তোমাকে এখানে এনেছে ? আমি যখন রাস্তা দিয়ে চোলে যাচ্ছিলেম, সেই সময় দেখেছিলেম, তুমি একটি কালীর মন্দিরের কাছে হরিনাম সংকীর্ত্তন কোচ্ছিলে। আহা ! তেমন সুন্দর হরিনাম আর কাহারো মুখে শুনা যায় না ! তোমার মুখে যখন আমি হরিনাম শুনি, তখন আমার একটি দাদাশ্বশুর আমার সংগে ছিল। দাদাশ্বশুরটি রণজিৎ সিংহের যুদ্ধের সেনাপতি। তোমার হরিনাম শুনে, সেই দাদাশ্বশুর আমাকে বোলেছিল, 'নদীয়ার গৌরাঙ্গের মুখেও তেমন সুস্বর হরিনাম ফুটতো না।' সে কথা কি তোমার মনে হয় ? তুমি তাই এখান থেকে চোলে যাও। রণজিৎ যদি এখানে আসে, তা হোলে তোমাকে আমাকে দুজনকেই নিতাই চৈতন্য বোলে সেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কারবালা ময়দানে নরবলি দিবে।"

আ রে ! এটাও পাগল ! চেহারা দেখে মনে হয়েছিল ভদ্রলোক, কথায় পরিচয় পাওয়া গেল, মস্ত পাগল ! একে একে যে কটা পাগলকে আমি দেখলেম, তারা সকলেই এক এক রকম খেয়ালে এই পাগলা-গারদের আসামী। যত লোক এই বাগানে চরা করে, কাজ করে, প্রহরীরা ছাড়া তারা সকলেই পাগল। পাগলা-গারদের সংলগ্ন এই বাগান · সুতরাং আমার ভাষায় এই বাগানের নাম পাগলা-বাগান। আর আমি অধিকক্ষণ সেই পাগলা-বাগানে বিচরণ কোল্লেম না, দ্রুতপদবিক্ষেপে হিংগনের কাছে ফিরে গেলেম। হিংগন আমারে দেখে প্রথমে একবার হাস্য কোল্লে, তার পর আমার বীরতার—সহিষ্ণুতার বাহাদুরী দিয়ে ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমারে গারদের মধ্যে নিয়ে গেল। তদবধি একমাস কাল নিতান্ত অনিচ্ছায়, কর্ত্তাদের উত্তেজনায়, আমি সেই পাগলা-বাগানে পরিক্রমণ কোত্তে বাধ্য হয়েছিলেম, যাব না বোল্লে তারা শুনতো না, কথার অবাধ্য হোলে তারা আমারে বেঁধে রাখবে, বেত্রাঘাত কোরবে, আহার বন্ধ কোরে দিবে, এই সব কথা বোলে ভয় দেখাতো, কাজে কাজেই আমি তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতেম ; অবাধ্য হোতেম না।

একমাস। প্রতিদিন বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা কাল সেই বাগানে আমারে বেড়াতে হয়। মোতায়েন হিংগনসিংহ। একমাসের মধ্যে অনেক অনেক নূতন নূতন রঙ্গ আমি দেখলেম ; নূতন নূতন রঙ্গের কথাও অনেক শুনলেম। পাগলের খেলা, পাগলের লীলা, পাগলের কথা, সমস্তই অদ্ভুত ! একদিন

দেখলেম, একটা লোক যোগী-ঋষির মত যোগাসনে বোসে কি যেন ধ্যান কোচ্ছে। চক্ষু মুদিত নয়, একদিকে বেশ চেয়ে আছে। তার সম্মুখ দিয়ে আমি চোলে যাচ্ছি, সেই লোক আমারে ডেকে ডেকে বোল্লে, "তুমি বুঝি ঐখানে বিদ্যুতের সঙ্গে খেলা কোচ্ছিলে? রোহিণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল? মঙ্গলের সঙ্গে রোহিণীর বিয়ে হবে, রোহিণী ঘুরে গেছে, সোমদেবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ভাল লাগলো না, এইবার মঙ্গলকে বরণ কোরবে। তার পর হয় তো বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনির সহচারিণী হবে; কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি রকম তুমি দেখে এলে? কেবল ঘুর—ঘুর—ঘুর! কে যে ঘোরে, কে যে ঘোরে না, স্থির নাই। পৃথিবী ঘোরে, গ্রহ-নক্ষত্র ঘোরে, তুমি ঘোরো, আমি ঘুরি; পৃথিবীর মনুষ্যমণ্ডলী, জানোয়ার মণ্ডলী বিহঙ্গমণ্ডলী, সকলেই ঘোরে। ঘুরে ঘুরে রাহুর মুখে যারা পড়ে, তাদের আর মুক্তি হয় না। এক, দুই, তিন, দশ, কুড়ি, দুই, এই বাইশ বৎসর আমি এক জায়গায় বোসে আছি; জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ভ্রমণপথ নিরীক্ষণ কোচ্ছি; কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্ছি না। রোহিণীর বিয়ের সময় চন্দ্রের মহিষীরা আমাকে আকাশে তুলে নিয়ে যাবে, সে বিবাহে আমি পুরোহিত হব, ধূমকেতু আমাকে লাঙ্গুলে জড়িয়ে সাত সমুদ্রের জল খাওয়াবে, জ্যোতিষশাস্ত্রে এই রকম লেখা আছে। তুমি চন্দ্রালোকে গিয়েছিলে, ধূমকেতু কি তোমাকে দেখতে পায় নাই? বোসো—বোসো! বিস্তর পরিশ্রম কোরেছ, বিস্তর ঘুরেছ, বোসো!—বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ঘুরে পোড়ে যাবে! মিহির যখন রাক্ষসের দেশ থেকে সাগরপারে আসে, জ্যোতিষের পুঁথিখানার অনেক পাতা সে তখন ছিঁড়ে ফেলেছিল। ছেঁড়া পুঁথিতে কি কাজ হয়? অনেক পাতা আমি পোড়েছি, ঘুর থামলো না, নির্ণয় কিছুই হলো না। পাতালে যাব মনে কোচ্ছিলেম, এমন সময় তুমি এলে। বোসো—বোসো!—অশ্লেষার যোগে চন্দ্রাবতীর বিবাহ। বাসরঘরে আমি ছিলেম; তারা আমাকে চিনতে পারে নি। তোমাকে চিনতে পেরেছে তো?"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাগলের ঐ সব কথা আমি শুনলেম। পাগল একবার খিল খিল কোরে হেসে উঠলো; হাসতে হাসতে বোল্লে, "মেঘের আড়ালে থেকে ইন্দ্রজিৎ যখন যুদ্ধ কোত্তো, গ্রহ-নক্ষত্র গণনা করবার জন্য ইন্দ্রজিতের পশ্চাতে তখন আমি লুকিয়ে থাকতেম; মেঘের উপর দাঁড়ালে অনেক নূতন নূতন নক্ষত্র দেখা যায়। আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম, নক্ষত্রেরা দাঁড়ালো না। পুঁথিখানা আমি জলে ফেলে দিয়েছি।"

সেই সব কথা শুনতে শুনতে আমি ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে যেতে লাগলেম। পাগল যোগাসনে বোসেছিল, আমারে ধরবার জন্য আসন ছেড়ে উঠলো না, আমি তার চক্ষের অন্তর হয়ে গেলেম; মনে মনে স্থির কোল্লেম, এটা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পাগল।

আর একদিন একটা বৃক্ষগাত্রে আর একটা পাগলকে আমি দেখলেম। সে পাগল আপন মনে ইংরাজী বেলুন-যন্ত্রের আলোচনা কোচ্ছিল, কত রকম গ্যাসের নাম কোচ্ছিল। অদূরেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম, সে আমারে দেখতে

পেয়েছিল কি না, জানি না, কিন্তু সে বোলছিল, গ্যাসের জোরে বেলুন-পাখী আকাশপথে উড়ে যায় ; গ্যাসের জোরে মানুষ কেন উড়ে না ? মানুষের পাখা নাই, সেই জন্যই কি উড়ে না ? মানুষ তবে সমুদ্র সাঁতার দেয় কিরূপে ? জলের সাগরও সাগর, বাতাসের সাগরও সাগর। হাতেরা পাখার কাজ করে। মুখের ভিতর গ্যাস রেখে, হাত তুলে তুলে, মানুষেরাও উড়ে যেতে পারে। আকাশেই উড়ে যায়। আকাশে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে বসে।"

ঐ সব কথা বোলতে বোলতে পাগলটা দুই হস্ত বিস্তার কোরে আকাশ-পথে উড়ে যাবার চেষ্টা কোচ্ছিল, একটা লম্ফও দিয়েছিল, ঢিপ কোরে পোড়ে গিয়ে ভূতলে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। আমি মনে কোল্লেম, এ লোকটা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পাগল।

আর একদিন আর এক জায়গায় দুটি লোক আমি দেখি। একটা বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে আমি তাদের অঙ্গভঙ্গী দর্শন কোত্তে লাগলেম। কত রকম ভঙ্গীই যে তারা দেখাচ্ছিল, বোলে জানানো যায় না। একজন একবার অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীর নখ-সংযোগে কি যেন উড়িয়ে দিলে, এইরূপ বোধ হলো ; আবার বামকরতলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্র স্থাপন কোরে, জোরে জোরে কি বস্তু যেন পোষণ কোত্তে লাগলো, এইরূপ বুঝলেম। একটু পরে সেই লোক আবার উপরদিকে মুখ তুলে সশব্দে একটা ফুৎকার দিলে, গীত গাইলে। গীতটা এই রকম—

"এসো গাজা আমার বাবী, ও বাপধন !
ছাগোলে কামরালে সীতে, মোলো রাজা দুর্য্যোধন।
গোলাপফুলের পাপরী চিরে, দোক্তা ডাকে মাণিকপীরে,
হনুমানের মাথার কিরে, বলির আকাশে গমন।"

গীতের সুর থামতে না থামতে দ্বিতীয় লোকটা হাত দুলিয়ে দুলিয়ে, নূতন সুরে গাইতে লাগলো ঃ—

"আকা'শ উঠিল চাঁদ তৃণবৎ হৈয়া,
হরবতী গায় গুণ হরের লাগিয়া, ভালা !
তোর এক কথা কেন ? আক্কা—"

উভয়েরই শুধু হাত, সম্মুখেও কোন প্রকার উপকরণ ছিল না, কিন্তু হস্তভঙ্গীতে প্রক্রিয়া ঐরূপ, গীতও ঐরূপ। কি প্রকৃতির পাগল তারা, অনুমান কোরে নিতে আমার অধিক সময় লাগলো না। অনুমান কেন বলি, অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাবে আর গান-দুটির অর্থের ভাবে নিশ্চয় স্থির কোল্লেম, এ দুটো লোক গাঁজার পাগল। অনেক কারণেই অনেক লোক পাগল হয়। কোম্পানী বাহাদুরের দয়ার কার্য্য অনেক প্রকার। পাগলকে আশ্রয় দিবার জন্য—আরাম করবার জন্য স্থানে স্থানে বাতুলালয় আছে। বর্ষে বর্ষে ফলাফলের এক এক বিজ্ঞাপনী বাহির হয়। এক বৎসরের বিজ্ঞাপনীতে আমি পাঠ কোরেছিলেম, গাঁজার পাগল শতকরা ৭৩ জন। অপরাপর বহুবিধ কারণে অবশিষ্ট ২৭ জন

পাগল। সরকারী হিসাবেই প্রকাশ পায়, আবকারীর অপরাপর পরিবারের মধ্যে গাঁজার পরাক্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

একমাসের মধ্যে আরো অনেক রকমের অনেক পাগল আমি দেখেছিলেম, নির্ঘণ্ট কোরে সকল পাগলের স্বরূপ স্বরূপ বর্ণনা দিতে ক্লান্তিবোধ হয়, কষ্টও বোধ হয়, অতএব সে সমুদায় বর্ণনায় আমি ক্ষান্ত থাকলেম। একমাস অতীত হয়ে গেল। পাগলা-বাগানে বেড়াতে যাবার অনুমতি পাবার অগ্রে আটদিন, তার এই পূর্ণ একমাস, সর্ব্বশুদ্ধ একমাস আটদিন আমার পাগলা-গারদে বাস। এই সময় আমার ভাগ্যে নূতন এক অপ্রিয় ঘটনা ঘোটে দাঁড়ালো।

বাতুলাশ্রমে আমার আহারের ব্যবস্থা যে প্রকার, পেটুক লোক হোলে আগেই সে কথা বোলে ফেলতো ; একমাসের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে হয় তো তাদৃশলোক চলচ্ছক্তিহীন হয়ে যেতো। আমি সে রকম হই নাই, কিন্তু কষ্ট অতিশয়। প্রথম প্রথম চারি-পাঁচ দিন আমি কেবল নামমাত্র আহার কোরেছিলেম, ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই, পিত্তরক্ষা হয়েছিল, এইরূপ বলা যায়। সে রকম আহারে বেশী দিন প্রাণধারণ করা যায় না, তজ্জন্য দিনকতক আমি ক্ষুধাশান্তির উপযুক্ত কিছু কিছু বেশী আহার কোরেছিলেম। বন্দোবস্ত নিতান্ত মন্দ। এক-প্রকার বস্তুই প্রায় নিত্য ভোজ্য ;—বিস্বাদু, অলবণ, দুর্গন্ধ, কাজেই একপক্ষের মধ্যে অরুচি দাঁড়ালো, আর আমি রীতিমত আহার কোত্তে পাল্লেম না ; মাঝে মাঝে এক একদিন উপবাস দিতে বাধ্য হয়েছিলেম। পূর্ব্বে বোলেছি, উদ্যান-ভ্রমণের শেষদিন পর্য্যন্ত গণনায় গারদবাস আমার একমাস আটদিন। এই সময় অনাদি আর চিতোরী তাদের উপরওয়ালার কাছে দশখানি কোরে বাড়িয়ে আমার নামে চুকলী গাইলে কিম্বা জলদান্তরালে গা-ঢাকা থেকে অদৃশ্য রঙ্গ-ভূমির চতুর গন্ধর্ব্ব-নটেরা তাদের গাওয়ালে স্পষ্ট বুঝা গেল না। একদিন এক-জন সাহেব আমার সম্মুখে এসে গর্জ্জন কোরে বোল্লেন, "তোমার নামে নালিশ আছে। যে সকল লোকের উপর তত্ত্বাবধানের ভার, তুমি তাদের অবাধ্য ; তাদের কোন কথাই তুমি শুনতে চাও না ; নিজের ইচ্ছাতেই তুমি সকল কাজ কোত্তে চাও। তোমার মত অবস্থায় যারা যারা এখানে আসে, তাদের অনেকে ঐ রকম অবাধ্য হয় বটে সেই অপরাধে তারা সাজাও পায়। এখানকার আহারাদির বন্দোবস্তে নিত্য তুমি অসন্তোষ প্রকাশ কর, আহার কোত্তে চাও না ; উপ-বাসে রোগ বাড়ে, বুঝিয়ে দিলেও সেটা তুমি বুঝতে চাও না। সাবধান হও ! এখন অবধি ঐ রকম অবাধ্যতার বজ্জাতী আর দেখিও না ; যদি দেখাও, এখানকার নিয়মানুসারে শাস্তি পাবে।"

সাহেবের কথা আমি বুঝলেম, কোন সূত্র থেকে ঐরূপ কথার উৎপত্তি, সেটাও বুঝলেম নিরুত্তর থাকলেম না। যদিও বুঝলেম, সেই সাহেব একজন উপরওয়ালা, তথাপি স্পষ্ট স্পষ্ট জবাব কোল্লেম, "অভিযোগ মিথ্যা ; এখান-কার কাহারো কাছে আমি অবাধ্যতা দেখাই না। আহারের কথা আপনি বোল-ছেন, দেহধারণ কোল্লেই আহার কোত্তে হয়, তা আমি জানি কিন্তু যে সকল খাদ্যদ্রব্য নিত্য আমার কাছে হাজির হয়, সে সকল দ্রব্য একপ্রকারে মানুষের

অখাদ্য। অখাদ্য বলাতে যদি কিছু দোষ ঘটে ? তবুও আমি সাহস কোরে বোলতে পারি, মানুষের কুখাদ্য। নিত্য নিত্য সে প্রকার দ্রব্যভক্ষণে রুচি থাকে না, বস্তুতঃ পীড়া জন্মে। সেই কারণে এক একদিন আমি আহারে অপ্রবৃত্তি জানাই, এই আমার অপরাধ। এই অপরাধে আপনি আমারে শাস্তি দিবেন বোলে ভয় দেখাচ্ছেন, শাস্তির আর আমার বাকী কি ? বোধ হয়, বিশেষ অবস্থা আপনি জানেন না, কিন্তু জানা উচিত। আমি পাগল নই ; এখানকার ডাক্তারেরা একদিনও পরীক্ষা করেন নাই ; সুতরাং তাঁদের মুখেও আপনি বোধ হয়, আমার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা পরিজ্ঞাত হোতে পারেন নাই। অকারণে আমি এই বাতুলালয়ে বন্দী হয়ে আছি ! আমার কথায় যদি বিশ্বাস হয়, আপনি যদি ডাক্তার হন, আমারে পরীক্ষা করুন ; যে প্রকার আহার-সামগ্রী আমারে দেওয়া হয়, তাও আপনি একদিন পরীক্ষা করুন। দুই পরীক্ষায় আমার অপরাধ যদি সপ্রমাণ হয়, এই অবৈধ অবরোধের অতিরিক্ত আর যে প্রকার শাস্তি দিতে আপনি ইচ্ছা করেন, দিতে পারেন। আপনাদের অধিকারে আমি এসেছি, ধরা-বাঁধা রয়েছি, যে কোন প্রকার শাস্তিই হোক, গ্রহণ কোত্তে আমি বাধ্য।"

পিংগলনেত্র বিঘূর্ণিত কোরে সাহেব ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে আমি বুঝলেম, ওষ্ঠপ্রান্তে যেন একটু একটু হাসি আছে, দৃষ্টিতে পরিস্ফুট রোষভাব। রাগের সময় এক একজনের মুখে এক রকম হাসি দেখা যায়, সে হাসিতে বিদ্রূপ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না ; রোষ-বিদ্রূপ-মিশ্রিত-স্বরে সাহেব আমারে বোল্লেন, "কিছুই বাকী নাই, কিছুই বাকী নাই, তোমার অপরাধটা ঠিক ঠিক সাব্যস্ত হোচ্ছে, নিজেই আমি পরীক্ষা কোল্লেম, সকলের কাছেই তুমি অবাধ্য। আমি এসেছি, আমার কাছেও অবাধ্য, চোটপাট জবাব। আচ্ছা, থাকো,—তোমার অবাধ্যতা যাতে ছাড়ে, তার উপায় আমি কোচ্ছি।"

পরীক্ষা হয়ে গেল ; সুস্থিরকর্ণে পরীক্ষার ফল আমি শ্রবণ কোল্লেম। সাহেবের কথাগুলি আর শ্রবণে যেন মধুবর্ষণ কোল্লে, আর আমি কিছু উত্তর কোল্লেম না। ঘূর্ণিতনেত্রে আমার দিকে চাইতে চাইতে দ্রুতপদে সাহেবটি প্রস্থান কোল্লেন, আবার আমার ভাগ্যে কি প্রকার নূতন শাস্তি আছে, তাই আমি ভাবতে লাগলেম।

যেটি যে প্রকৃতির আশ্রম, সে আশ্রমে প্রায় সকল কার্য্যেই সেই প্রকৃতির খেলা হয়। সাহেবটি প্রস্থান করবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে নেপথ্যে একটি সুর শ্রুতিগোচর হলো : বামাস্বর। সুর বুঝলেম, বামাকণ্ঠে একটি গীত। সেই গীতটি গাইতে গাইতে একটি স্ত্রীলোক সে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। চিতোরী নয়, নূতন স্ত্রীলোক। তার পশ্চাতে দুটি পুরুষ ; অনাদি নয়, হিংগন নয়, সাহেব নয়, দুটি নূতন লোক। লোকদুটি নির্ব্বাক। স্ত্রীলোকের মুখের এই গীত ঃ—

"কবে আমার ফুটবে বিয়ের ফুল।
বিয়ের জন্যে ভেবে ভেবে পেটে হলো গুল্মশূল॥"

মুখের সুর মুখেই থাকলো, স্ত্রীলোকটা আমার সম্মুখে জানু পেতে বোসে আমার গলদেশে একছড়া মালা পরালে ; হস্তে, পদে, কটিদেশে শৃঙ্খল লাগালে ; আবার গাইতে লাগলো—

"বেঁধে দিলাম প্রেম-শিকলে, বরমালা দিলাম গলে,
পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে, তোমায় দিলাম জাতিকুল॥"

এই গীত গেয়ে সেই স্ত্রীলোক আমার সম্মুখ থেকে উঠে গেল ; আমি বাঁধা পোড়লেম। জানছিলেম আমি বন্দী, বোলছিলেম আমি বন্দী, কিন্তু এত-দিন বন্ধনদশায় বন্দী ছিলেম না, এই দিন সত্য সত্য বন্দী হোলেম!

লোকদুটি সেই স্ত্রীলোকের মোতা'য়ন হয়ে এসেছিল ; যদি আমি কোন প্রকার হাঙ্গামা করি, লোকেরা আমারে ধোরবে, এই তাদের মতলব ছিল কিম্বা তাদের প্রতি ঐ প্রকার আদেশ ছিল। তারা ইচ্ছা কোল্লে আপনারাই আমারে বেঁধে রেখে যেতে পাত্তো ; কিন্তু তা তারা কোল্লে না, স্ত্রীলোকের হাত দি'য়েই শিকল পরালে ; পোরিয়েই তিনজনে একসঙ্গে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

আমি বাঁধা থাকলেম। শক্ত বন্ধন! বোল্লেম স্ত্রীলোক আমার গলায় মালা দিলে ; মতির মালা নয়, ফুলের মালা নয়, লোহমালা,—অসহ্য শৃঙ্খল! হস্ত-পদের শৃঙ্খলের সঙ্গে কটিদেশের শৃঙ্খল আবদ্ধ, কটিদেশের শৃঙ্খলের সঙ্গে গললগ্ন শৃঙ্খলের সংযোগ। সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি থাকলো না, পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকবারও স্বাধীনতা গেল! তখন আমি সম্পূর্ণ পরাধীন।

চতুর্থ কল্প

মুক্তিলাভ!

বন্ধনদশায় তিনদিন। সে তিনদিনের কষ্ট বর্ণনাতীত। তিনদিন তিনরাত্রি অসীম যন্ত্রণায় আমি যাপন কোল্লেম! কি অপরাধে যে সে যন্ত্রণা আমারে সহ্য কোত্তে হলো, তা আমি জানতে পাল্লেম না ; যন্ত্রণার বিধানকর্ত্তা যাঁরা, তাঁরা অবশ্যই জানতে পাল্লেন।

চতুর্থ দিবসের শেষভাগে দুটি ভদ্রলোক আমার সেই গারদঘরে উপস্থিত হোলেন। দর্শনমাত্রেই একটি লোককে আমি চিনতে পাল্লেম ; দ্বিতীয় লোকটি আমার অপরিচিত। গৃহে প্রবেশ কোরেই প্রথম লোকটি সবিস্ময়ে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ কোরে, করুণবচনে বোল্লেন, "এ কি হরিদাস! তোমার এ

অবস্থা কেন? এ নরকে তুমি কেন এসেছো? কারা তোমাকে এখানে এনেছে?"

আমি উত্তর কোত্তে পাল্লেম না, বাষ্পবেগে তখন যেন আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চেয়ে দুটি চক্ষের জলে আমি ভেসে গেলেম। আমার শয্যাপার্শ্বে দুখানি চৌকী পাতা ছিল, তাঁরা দুজনে সেই চৌকীর উপরে উপবেশন কোল্লেন। প্রথমে যিনি কথা কয়েছিলেন, সদয়ভাবে তিনি আমারে পুনরায় বোল্লেন, "কেঁদো না হরিদাস! কেঁদো না! অনেক দিন তোমার কোন সংবাদ না পেয়ে, আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেম, অনেক দিন পরে তোমার একখানি পত্র পাই, প্রাপ্তিমাত্রেই প্রত্যুত্তর প্রেরণ কোরেছিলেম, সে পত্র অনেক বিশেষ বিশেষ কথা লেখা ছিল, বোধ করি, সে পত্র তুমি পাও নাই। যা হোক, প্রাণগতিক তুমি ভাল আছ, এই এখনকার মংগল। অনেক কথা আমার বলবার আছে, সে সব কথা এখনকার নয়: আগে তোমাকে উদ্ধার করি, তার পর সব কথা তুমি জানতে পারবে।"

শুনলেম, সে সব কথা এখনকার নয়, তথাপি আমি ধৈর্য্য রাখতে পাল্লেম না। অশ্রুবেগ সংবরণ না কোরে শীঘ্র শীঘ্র সেই দয়ালু বন্ধুটিকে আমি এককালে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লেম:—আপনারা কেমন আছেন? পশুপতি-বাবু কেমন আছেন? বাড়ীর আর আর সকলে কে কেমন আছেন, অমরকুমারী কেমন আছেন? অমরকুমারী কোথায় আছেন? বহরমপুরের মোকদ্দমার ফলা-ফল কিরূপ? বাকী ডাকাতেরা ধরা পোড়েছে কি না? শান্তিরাম দত্তের বাড়ীর সমাচার কিরূপ? মণিভূষণ বাবু বাড়ী গিয়েছেন কি না? উপর্য্যুপরি এই প্রকার অনেক প্রশ্ন।

আমার চিত্ত অত্যন্ত অধীর হয়েছিল, ধৈর্য্যধারণে আমি অক্ষম হয়ে-ছিলেম: বিশেষতঃ অমরকুমারীর কুশল সমাচার অবগত হবার নিমিত্ত আমার উদ্বেগের পরিসীমা ছিল না, সেই কারণে এককালে অত কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। ভদ্রলোকটি ধৈর্য্যহারা হন নাই, তিনি তখন আমার একটি প্রশ্নেরও উত্তর না দিয়ে সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র বোল্লেন, "সমস্তই মংগল, সমস্তই মঙ্গল, উতলা হয়ো না, রোদন সংবরণ কর; অবিলম্বেই সকল কথা তুমি জানতে পারবে। এখন এখানকার যেরূপ বন্দোবস্ত প্রয়োজন, সমস্তই আমি ঠিক কোরে এসেছি, অবিলম্বেই—"

কথা হোচ্ছিল, এমন সময় একটি সাহেব আর তিনজন হিন্দুস্থানী লোক সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত। চারি জনেরই বদন গম্ভীর, সাহেবের মুখখানি কিছু শুষ্ক শুষ্ক। যে দুটি ভদ্রলোক ইত্যগ্রে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের কিঞ্চিৎ পরিচয় এই স্থানে আবশ্যক। যিনি আমার সংগে কথা কোচ্ছিলেন, তিনি আমার অসময়ের আশ্রয়দাতা পরম উপকারী বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দীন-বন্ধু চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি গুর্জরের বরদারাজ্যের রাজকুমার শ্রীমান রণেন্দ্ররাও বাহাদুরের বিশ্বস্ত বিন্ধু সদাশিব মহান্ত। পাটনায় উপ-স্থিত হয়ে বরদার রাজকুমারকে আমি যে পত্র লিখেছিলেম, রাজকুমার সেই পত্রের প্রত্যুত্তর পাঠিয়েছিলেন, সেই প্রত্যুত্তরপত্রের কোন উত্তর না পেয়ে,

রাজকুমার বাহাদুর অগ্রে ঐ প্রতিনিধিকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। দীন-বন্ধুবাবুকে তিনি জানতেন ; প্রতিনিধি সদাশিব সর্বপ্রথমে মুর্শিদাবাদের দীনবন্ধুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। দীনবন্ধুবাবুও আমার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, সদাশিবকে সঙ্গে নিয়ে আমার অন্বেষণের নিমিত্ত তিনি পাটনায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।

দীনবন্ধুবাবু সেই নবাগত সাহেবটিকে সেলাম দিলেন না। সাহেব কি কি কথা বলবার নিমিত্ত ভূমিকা কোচ্ছিলেন, ধমক দিবার ভঙ্গীতে উগ্রস্বরে দীনবন্ধুবাবু তাঁরে বোল্লেন, "ও সব কথা পরে শুনা যাবে, অগ্রে তুমি হরি-দাসের বন্ধন মোচন কোরে দাও, তার পর তোমার সকল কথা আমি শুনিছি। যে সব কাজ তোমরা কোরেছ, তার উচিত মত পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া তোমাদের উচিত ছিল, অবস্থাগতিকে সেরূপ পুরস্কার-দানে আমি এখন ক্ষান্ত থাক-লেম। হরিদাস পাগল নয়, জানতে পেরেও তোমরা এই বালককে প্রকৃত পাগলের মত আটক কোরে রেখেছ, পাগলের মত যন্ত্রণা দিয়েছ, বিনা অপ-রাধে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন কোরেছ, এত বড় গুরুতর অপরাধ তোমাদের ; তোমাদের সে অপরাধ আমি ক্ষমা কোল্লেম। বেশী কথা কোয়ো না, হাকিমত্ব দেখিও না, এখনই তুমি স্ব হস্তে হরিদাসকে বন্ধনমুক্ত কর।"

দ্বিরুক্তি না কোরে কিম্বা দ্বিরুক্তি করবার সাহস না পেয়ে, সাহেব নত-বদনে শীঘ্র শীঘ্র আমার বন্ধনশৃঙ্খল খুলে দিলেন, আমি বন্ধনমুক্ত হোলেম।

অতঃপর সাহেবকে সম্বোধন কোরে দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পরোয়ানা তুমি পেয়েছ?" মৃদুস্বরে সাহেব উত্তর কোল্লেন, "পেয়েছি : আপনি এই বালকের অভিভাবক, স্বচ্ছন্দে আপনি এই বালককে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারেন।" এই কথা বোলেই দীনবন্ধু-বাবুকে সেলাম কোরে সাহেব অধোবদনে প্রস্থান কোল্লেন। সেই তিনটি হিন্দু-স্থানী লোক বিস্মিতনয়নে আমাদিগের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো। অব্যবহিত পরেই হিঙ্গন সিংহ, অনাদি আর চিতোরী সেইখানে এসে দেখা দিল ; তাদেরও মুখের ভাব তখন অন্যপ্রকার ; পূর্ব্বের সেই তেজস্বিতা, রহস্যপ্রিয়তা, ক্ষমতাপরিজ্ঞাপক দাম্ভিকতা কোথায় যেন দূর হয়ে গেল। দীনবন্ধুবাবুর অনুমতিক্রমে আমি উঠে দাঁড়ালেম। আশ্রমের লোকেরা অগ্রে অগ্রে চোল্লো, আমরা তিন জনেই সগৌরবে তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই নরকসদৃশ আশ্রয় থেকে বাহির হোলেম ; ফটক পার হয়ে ঊর্দ্ধ-মুখে সূর্য্যদেবকে নমস্কার কোরে আমি একটি নিশ্বাস ফেল্লেম। একমাস কাল পাগলা-গারদের পাগলা-বাগানে খানিক খানিক আমি হাওয়া খেয়ে-ছিলেম, সে হাওয়া আমার অঙ্গে শীতল বোধ হয় নাই, বুকের ভিতর বরং প্রচণ্ড হতাশন জেবালে জেবালে উঠেছিল, প্রকৃতিদেবীকে নমস্কার কোরে বাহিরের শীতল বায়ুস্পর্শে এই সময় আমি স্বাধীনতা-সুখ অনুভব কোত্তে লাগলেম। ফটকের সম্মুখেই গাড়ী ছিল, সেই গাড়ীতে আরোহণ কোরে আমরা বাতুলালয়ের সীমা অতিক্রম কোল্লেম ; সহরে প্রবিষ্ট হোলেম।

কদিন দীনবন্ধুবাবু পাটনায় এসেছেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার আমার অবকাশ হয় নাই। গাড়ীখানা যেখানে এসে লাগলো, সেইখানে একখানি সুন্দর বাড়ী; গাড়ী থেকে নেমে আমরা সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। বেলা তখন অধিক ছিল না, প্রসঙ্গাধীন বাক্যালাপে বেলাটুকু শেষ হয়ে গেল, সন্ধ্যার পর আহারাদির আয়োজন। আমরা আহার কোল্লেম; গারদের খাদ্যে আমার অরুচি জন্মেছিল, অনেক দিনের পর সুস্বাদু ভক্ষ্য-পানীয়ে আমার পরম পরিতোষ।

আহারান্তে তিনজনে আমরা একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপবেশন কোল্লেম। শুনলেম, পাঁচ দিন হলো, তাঁরা পাটনায় এসেছেন, অবস্থানের নিমিত্ত ঐ বাড়ীখানি ভাড়া লওয়া হয়েছে। রাজা মোহনলালের সংগে দীনবন্ধুবাবু দুই তিন দিন সাক্ষাৎ কোত্তে গিয়েছিলেন, একদিন একবারমাত্র সাক্ষাৎ হয়েছিল, আমার কথা তিনি রাজা বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, সত্য উত্তর প্রাপ্ত হন নাই।

দীনবন্ধুবাবু বোল্লেন, "রাজা মোহনলাল সকল কথাই অস্বীকার করেন। তৃতীয় দিবসে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে যেন একটু ধর্ম্মভাব মনে এনে তিনি বোলেছিলেন, "হরিদাস এখানে এসেছিল বটে, দিনকতক এখানে ছিল বটে, তার পর কোথা গিয়েছে, বোলেও যায় নাই, জানি না।" রাজার মুখে এই কথা। তোমার পত্রে লেখা ছিল, মোহনলালের বাড়ীতেই তুমি আছ, পত্রের খামের উপরেও পাটনার ডাকঘরের মোহর অংকিত ছিল, সেই ঠিকানাতেই আমি উত্তর লিখেছিলেম, সে পত্র তুমি পাও নাই, মোহনলালের ব্যবহার দেখে সেটি আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। যা হোক, মোহনলালের কাছে তোমার সন্ধান না পেয়ে আমি এক প্রকার হতাশ হয়েছিলেম। এখানে আমাদের জানাশুনা লোকজন কেহই নাই; তোমাকে জানে, এমন কোন লোকও এখানে পাওয়া গেল না, আমি অতিশয় ভাবিত হোলেম। মোহনলালের আমলাবর্গ, পারিষদবর্গ, ভৃত্যবর্গ, সকলেরই এক রায়। তোমার সন্ধানের কথা কেহই কিছু বোল্লে না, সকলেই বোল্লে কেহই কিছু জানে না। যেমন দেবতা, তদনুরূপ ভূষণবাহন হয়, এ কথা যাথার্থ; কর্ত্তা মোহনলাল যে কথা অস্বীকার কোল্লেন, তাঁর ভূষণ-বাহনেরা সে কথার বিপরীত কথা বোলবে, এমন আশা করাই ভুল; তথাপি আমি অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হোলেম না। সদাশিববাবুকে বাসায় রেখে আমি একাকী এক এক সময়ে মোহনলালের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে গতিবিধি আরম্ভ করি; দৈবগতিকে একটি লোক সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল, দেখলেম, তার মুখে চক্ষে নিতান্ত ভালমানুষের লক্ষণ; লক্ষণে বুঝলেম, লোকটির বুদ্ধিও কম, চতুরতাও কম। লোকটি চোল্লো, আমিও তার পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম। রাজবাড়ীর লোকেরা দেখতে পায়, তেমন সম্ভাবনা যখন থাকলো না, তখন আরো একটু তফাতে গিয়ে সেই লোকটিকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, 'হরিদাস নামে একটি বালক ঐ বাড়ীতে এসেছিল, সে বালকটি কোথায় গেল?' ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে খানিকক্ষণ

আমার মুখপানে চেয়ে থেকে, সেই লোক উত্তর কোল্লে, 'পাগল হয়েছে, রাজ-বাড়ীর ডাক্তারেরা তাকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিয়েছে।' সে লোকের মুখে আর কোন কথা শুনবার আমার আবশ্যক হলো না ; লোক চোলে গেল। বেলা তখন প্রায় আড়াই প্রহর হবে। তৎক্ষণাৎ আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে উপস্থিত হয়ে দস্তুরমত দরখাস্ত কোল্লেম ; দস্তুরমত তদন্তের পরোয়াণা জারী হলো ; তদন্তে পাগল না থাকা প্রকাশ পেলে, অবিলম্বে খালাসের হুকুম। গারদের লোকেরা কিরূপ তদন্ত কোরেছিল, তুমি বোলতে পার। আমি বোধ করি, সত্য অবস্থা তারা সমস্তই জানতো, তদন্ত করে নাই, পরোয়ানা পেয়ে ভয় পেয়েছিল, তাতেও আমি সন্দেহ রাখি না। গত কল্য আমি এই সকল কার্য্য কোরেছি। আদালতের পেয়াদার সঙ্গে আজ একবার আমি পাগলা-গারদের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়েছিলেম, তখন তোমার সঙ্গে দেখা করি নাই, পরোয়ানা পেয়ে ভিতরে ভিতরে আশ্রমের লোকেরা কিরূপ বন্দোবস্ত কোরে রেখেছিল, তারাই তা জানে, আমরা যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাই, তৎপূর্ব্বে সেখানকার অধ্যক্ষ সাহেবের সঙ্গে দেখা কোরেছিলেম, তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল। তার পর যা যা হয়েছে, সমস্তই তুমি জ্ঞাত আছ।"

আমি চমৎকৃত হোলেম না ; দীনবন্ধুবাবুর চরণধূলি মস্তকে ধারণ কোরে, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, সাশ্রুনয়নে আমি বোল্লেম, "আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম। আপনি যদি দয়া কোরে আমারে উদ্ধার না কোত্তেন তা হোলে কত দিন যে আমারে সেই নরকাগ্নিতে দগ্ধ হোতে হতো বোলতে পারি না।" সেই সময় সদাশিব মহান্ত অনেকগুলি কথা বোলেছিলেন ; বর-দায় তাঁরে আমি দেখি নাই, পরিচয় পেয়ে এইখানে তাঁরে আমি সমাদর কোরেছিলেম ; মহারাজের, রাজকুমারের, রাজসংসারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, সদুত্তর প্রাপ্ত হয়ে সন্তোষলাভ কোল্লেম। সদাশিব বোল্লেন, "আর কিছু বেশী ঝঞ্ঝাট সহ্য কোত্তে পাল্লে, পাগলা-গারদের দুটি একটি লোককে,—মোহনলালের দুটি একটি ডাক্তারকে ফৌজদারী এজ্‌লাসে হাজির করা যেতে পাত্তো ; মোহনলালটিও হয় তো ফৌজদারী আইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে বাধ্য হোতেন।"—কথা শুনে আমি হাস্য কোল্লেম। কথাগুলি শুনবার সময় সদাশিবের মুখের দিকে আমি চেয়ে ছিলেম, বাক্যাবসানে চক্ষু ফিরিয়ে দীনবন্ধুবাবুর মুখপানে চাইলেম।

পঞ্চম কল্প

প্রিয় বার্ত্তা!

দারুণ যন্ত্রণাগার থেকে আমি মুক্তিলাভ কোল্লেম ; রাজা মোহনলাল এ সংবাদ পেলেন কি না, সেটা আর আমার চিন্তার বিষয় থাকলো না। অনু-

মানে আমি নিশ্চয় জানলেম, আমার মুক্তিলাভের অগ্রেই তাঁর গুপ্ত বার্ত্তা-বহেরা তাঁর কর্ণে সে সংবাদটা বহন কোরেছে। হয় তো বার্ত্তাবহের প্রমুখাৎ বার্ত্তা অবগত হবার পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং সে তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এখন আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি আর এখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎও কোচ্ছি না, আর তাঁর কোন প্রকার নূতন ছলনাতে ভুলতে যাচ্ছি না ; সাবধান ছিলেম, আরো অধিক সাবধান হোলেম।

দীনবন্ধুবাবু, সদাশিববাবু, আমি, তিন জনে একস্থানে বোসে ছিলেম, শয়ন করবার বিলম্ব ছিল ; কি তখন আমি ভাব ছিলেম, ঠিক যেন সেইটি বুঝতে পেরে, ঠিক আমার মনের কথার সঙ্গে মিলিয়ে, দীনবন্ধুবাবু বোল্লেন, "আমার স্মরণ হোচ্ছে, মোহনলালের ব্যবহারের কথা মুর্শিদাবাদে তুমি একদিন আমার কাছে গল্প কোরেছিলে। মোহনলালকে তখন আমি জানতেম না, তবুও কিন্তু লোকটার উপরে তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল ; এখন দেখলেম, ঠিক তাই। টাকাই থাকুক, রাজাই হোক দশজন চাটুকারের কাছে প্রশংসাই লাভ করুক, মোহনলাল একজন বিলক্ষণ খেলোয়াড় লোক, পাকা শীকারী। তুমি পাটনায় এসেছ, মোহনলালের বাড়ীতেই ছিলে, কোথায় গিয়েছ, বারম্বার সেই কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, উত্তর পেয়েছিলেম, কিছুই তিনি জানেন না। তুমি আমাকে পত্র লিখেছিলে, ঠিক ঠিকানায় আমি সেই পত্রের উত্তর পাঠিয়েছিলেম, সে পত্র তিনি গোপন কোরেছেন। সদাশিববাবুও বোলছেন, কুমার রণেন্দ্র বাহাদুরও ঐ ঠিকানায় তোমাকে পত্র লিখেছিলেন সে পত্রও তুমি প্রাপ্ত হও নাই। পত্র পৌঁছিবার অগ্রেই তিনি তোমাকে সোরিয়ে ফেলেছিলেন ; কোন প্রকাশ্য স্থানে রাখেন নাই, এককালে পাগলা-গারদে !"

কথাগুলি শ্রবণ কোরে আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা না, ও রকম হেতুবাদ নয়। যে সকল পত্র আমি লিখেছিলেম, তা কেবল আমি জানি ; রাজার কোন আমলা অথবা ভৃত্যবর্গ কেহই জানেন না। পত্রের উত্তর আমি না পাই, সে উদ্দেশ্যে রাজা আমারে পাগলা-গারদে দেন নাই, অন্য কোন প্রকার মতলব ছিল। সে মতলব আমার অজ্ঞাত ! সময় যদি উপস্থিত হয়, তখন সে রহস্যভেদে বোধ হয়, আমি সমর্থ হোতে পারবো।"

দীনবন্ধুবাবু বোল্লেন, "ফন্দীবাজ লোকের ফন্দী-ফিকির শীঘ্র জানতে পারা বড়ই কঠিন। তোমাকে আর আমি মোহনলালের কাছে যেতে দিচ্ছি না। তোমার অন্বেষণে আমি এসেছি, এ কথা সত্য ; কিন্তু জানো তুমি আমাকে, তীর্থ-যাত্রায় আমার একান্ত অনুরাগ ; এ বারেও আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি, শ্রীবৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি তীর্থদর্শনের অভিলাষ আছে ; বুঝলে হরিদাস ? তোমাকেও সঙ্গে লওয়া আমার ইচ্ছা।"

আমি একটু বিমনস্ক হোলেম। তীর্থযাত্রায় আমারও অভিলাষ আছে সত্য, কিন্তু আপাততঃ যে সংবাদ শ্রবণ কোত্তে আমার কর্ণ একান্ত ব্যগ্র, সেই সংবাদটি শ্রবণ করা আর সংবাদ যদি আমার পক্ষে অনুকূল হয়, তা হোলে

অমরকুমারীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা, এই দুটি বিষয়ে আমার বিশেষ আকিঞ্চন। সেই আকিঞ্চনটি জানাই জানাই মনে কোচ্ছি, জানাতে হলো না ; দীনবন্ধুবাবু নিজেই সেই প্রসঙ্গের সূত্র ধারণ কোল্লেন।

আমারে অন্যমনস্ক দেখে দীনবন্ধুবাবু প্রশান্তবদনে বোল্লেন, "গারদের মধ্যে তুমি আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলে, সংক্ষেপে আমি বোলেছি, 'সমস্তই মঙ্গল।' বুঝতে পাচ্ছি, সংক্ষিপ্ত সমাচারে তোমার তৃপ্তি-লাভ হয় নাই। এখন তোমার তৃপ্তিশান্তির নিমিত্ত বিশেষ বিবরণ বোলছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ মোকদ্দমার কথা ;—বহরমপুরে মোকদ্দমা দায়ের রেখে, অমরকুমারীর অন্বেষণের জন্য তোমরা মাণিকগঞ্জে এসেছিলে, অমরকুমারীকে উদ্ধার কোরে ঢাকায় এনেছিলে, ঢাকা থেকে হঠাৎ তুমি নিরুদ্দেশ হও। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ঢাকার মোকদ্দমার সঙ্গে তোমার কোন বিশেষ সংস্রব ছিল না, তুমি কেবল একজন সাক্ষী ছিলে মাত্র। তোমার অনুপস্থিতিতে সে মোকদ্দমা নিস্পত্তি হয় ; মণিভূষণের মুখে সমস্তই আমি শুনেছি। মাণিকগঞ্জেও রমণীবল্লভ, ধনঞ্জয় ঘটক আরাবংশী পোদ্দার, অপরিচিতা বালিকা-বিক্রয়ের যোগাড় করা অপরাধে উচিতমত দণ্ড প্রাপ্ত হয়েছে। যে সকল জলদস্যু ধৃত হয়েছিল, তারাও আইনমত সাজা পেয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অমরকুমারীকে মণিভূষণের হস্তে সমর্পণ কোরে ছিলেন। মণিভূষণের সঙ্গে রীতিমত পাহারায় অমরকুমারী মুর্শিদাবাদে পোঁছেছেন। কুমারী-বরণের সর্দ্দার আসামীটা আজ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই।"

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ কোরে উৎসাহের সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে, সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অমরকুমারী কি তবে এখন শান্তিরাম দত্তের বাড়ীতেই আছেন ? সেখানে তো আর এখন কোন প্রকার উপদ্রব হোচ্ছে না ? প্রবল দুরন্ত আসামীরা খালাস আছে, তারা ভয়ঙ্কর লোক, তাদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই, তারা তো এখন আর অমরকুমারীর সন্ধানে সন্ধানে মুর্শিদাবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে না ?"

দীনবন্ধুবাবু উত্তর কোল্লেন, "বেড়াচ্ছে কি না বেড়াচ্ছে, তা আমি ঠিক জানতে পারি নাই ; ধূর্ত্তলোকের গুপ্তচক্র জানাও অসম্ভব ; তথাপি আমি সাবধান হয়েছি। শান্তিরাম গরিব লোক ; শান্তিরামের বাড়ীতে অমরকুমারীকে রাখি নাই। কি জানি, সেই সকল কুচক্রী লোক কোন কৌশলে আবার যদি অমরকুমারীকে চুরী কোরে লয়ে যায়, সেই আশঙ্কা-নিবারণের জন্য অমরকুমারীকে আমি আমার নিজ বাড়ীতে রেখে দিয়েছি ; মাণিকগঞ্জে আসবার সময় তুমিও আমাকে সেই কথা বোলে এসেছিলে ; তোমার পরামর্শ-মতেই আমি কাজ কোরেছি। দুষ্টেরা সেখানে আর কোন প্রকার দৌরাত্ম্য কোত্তে সাহস কোরবে না। পশুপতিকেও আমি বিশেষরূপে সাবধান কোরে আবশ্যকমত উপদেশ দিয়ে এসেছি। অমরকুমারী ভাল আছেন, কেবল তোমার অদর্শনে বিষাদিনী। যে দিন আমি তোমার পত্রখানি পাই, পাঠ কোরে সর্বাগ্রে

অমরকুমারীকে তোমার সমাচার জানাই ; তুমি শারীরিক ভাল আছ, সেই শুভসংবাদে অমরকুমারী এখন অনেকদূর প্রবোধ প্রাপ্ত হয়েছেন।

বহরমপুরের আদালতে মণিভূষণ ফরিয়াদী, ঢাকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পর মণিভূষণ দত্ত বহরমপুরের আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন, ঘেরাটোপ-ঢাকা শিবিকারোহণে অমরকুমারীও আদালতের নিকটস্থ একটি নির্জন স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উকীল রজনীবাবু সেখানকার যথাকর্ত্তব্য সওয়ালজবাব কোরে অমরকুমারীকে সনাক্ত কোরিয়ে হাকিমের হৃদ্বোধ জন্মান। কাশিমবাজারের কাননস্থ গুপ্ত সুড়ঙ্গে কুঞ্জবিহারী সান্যাল প্রভৃতি যে কয়েকজন দস্যুকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের মধ্যে যারা যারা ডাকাতী করা অপরাধে অভিযুক্ত, পূর্বেই তারা সাজা পেয়েছিল ; অমরকুমারী-হরণব্যাপারে যারা লিপ্ত ছিল, অমরকুমারীর উদ্ধারের পর তারাও গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছে। মূল আসামীদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, আসামীরা ধরা পড়ে নাই।”

মোকদ্দমার আনুপূর্বিক বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করা আমার দরকার ছিল না, যে পর্য্যন্ত শুনলেম, তাতেই আমি তুষ্ট থাকলেম। যারা আমার জাত-শত্রু, কিছুতেই তারা ধরা পোড়ছে না ; তারা যতদিন ধরা না পড়ে, তত-দিন আমি নিরাপদ হোতে পাচ্ছি না। সর্বানন্দবাবুর উইলে যারা সাক্ষী ছিল, তাদের মধ্যে দুজন তো কারাগারে গেল বাকী থাকলো—সাক্ষীর মধ্যে একজন, আর রক্তদন্ত, ঘনশ্যাম। এই তিনজন দণ্ডপ্রাপ্ত হোলেই শাখাপল্লব বিলুপ্ত হয়। শেষকালে যা হবার, সে কথাটা আমি নিশ্চয় কোরে বোলতে পাচ্ছি না। দীনবন্ধুবাবু আমারে নূতন নূতন তীর্থদর্শনে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ কোচ্ছেন, আমারো ইচ্ছা যাওয়া,—যাওয়াই কর্ত্তব্য ; কিন্তু একটিবার মুর্শিদা-বাদ থেকে ফিরে না এসে স্থানান্তরে যেতে আমার মন সোরলো না। বিশেষ আগ্রহ জানিয়ে দীনবন্ধুবাবুকে আমি বোল্লেম "আপনার আজ্ঞা আমার শিরো-ধার্য্য, আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট কৃপা, শ্রী-বৃন্দাবন-দর্শনে যাত্রা করা আমার নিতান্ত অভিলাষ, কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা এই যে, তীর্থযাত্রার অগ্রে একটিবার আমি অমরকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো। অনেকদিন দেখি নাই, আমার অদর্শনে অমরকুমারী উদ্বিগ্ন, একটিবার দেখা কোরে, সান্ত্বনা দিয়ে আমারও উৎকণ্ঠিত চিত্তকে কিঞ্চিৎ শান্ত করা আমার ইচ্ছা।”

ঈষৎ হাস্য কোরে দীনবন্ধুবাবু বোল্লেন, "আচ্ছা, তোমার ইচ্ছাই সফল হোক ; অগ্রে তবে মুর্শিদাবাদেই চল। রজনীপ্রভাতে এখানে আর তিলমাত্রও বিলম্ব করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয় না। রাজা মোহনলাল ক্ষমতাশালী লোক, অত্যন্ত চতুর লোক, তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার পক্ষে সুসাধ্য হবে না। তিনি যদি ইতিমধ্যে অন্য কোন প্রকার কৌশলজাল বিস্তার কোরে তোমাকে এখানে আটক রাখবার চেষ্টা পান, তা হোলে সহজে তোমাকে আমি রক্ষা কোত্তে পারবো, এমন বিবেচনা হয় না। গোলযোগ ঘটবার সম্ভাবনা। কাজ কি অত

শত ফ্যাঁসাদে, ঊষার আবরণ থাকতে থাকতেই এ স্থান পরিত্যাগ কোরে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ।"

আনন্দে আনন্দে আমি সম্মতি দান কোল্লেম। এই সময় সদাশিববাবু আমারে বোল্লেন, "আমার একটি কথা আছে। বরদারাজ্যে তুমি গিয়েছিলে, ডাকাতের হস্তে বন্দী হয়েছিলে, বন্দী অবস্থায় আমাদের রাজসংসারের একটি বিশেষ উপকার তুমি সাধন কোরেছ, রাজকুমার রণেন্দ্র বাহাদুর তোমাকে পরম-প্রিয়বন্ধু বোলে স্বীকার কোরেছেন, সে সব আমি শুনেছি ; কিন্তু যখন তুমি বরদায় ছিলে, তখন তোমার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ ঘটে নাই। এই যাত্রায় তোমাকে বিপদমুক্ত কোরে, তোমাকে দর্শন কোরে, আমি সুখী হোলেম। রাজকুমারের আদেশ,—না,—আদেশ বলা আমার অনুচিত,—রাজকুমারের অনুরোধ, তিনি তোমার গুণের পুরস্কার-স্বরূপ সেই সময় কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রদান কোরেছিলেন, এখন আবার আমার হস্তে আর কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রেরণ কোরেছেন, গ্রহণ কর। কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপরে দশ হাজার টাকার একখানি চেক।"

ভূমিকাযোগে ঐ সকল কথা বোলে সদাশিববাবু তাঁর অঙ্গবস্ত্রের ভিতর থেকে একখানি চেক বাহির কোরে আমার সম্মুখে ধোল্লেন। গ্রহণে অস্বীকার কোরে বিনীতভাবে আমি বোল্লেম, "ও চেক আপনিই রাখুন ; মহারাজকুমার পূর্ব্বে আমারে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়েছিলেন, সে সকল মুদ্রা আমার সঞ্চিত আছে, এখন আর আমার অর্থে প্রয়োজন নাই। তিনি আমারে মনে রাখেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ রাখেন, চিহ্নিত লোকের নাম স্মরণের সময় এক একবার আমার নামটি স্মরণ করেন, তা হোলেই আমি চরিতার্থ হব। আপনাকে ধন্যবাদ, কুমারবাহাদুরকে আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন অর্পণ কোরে, আমার এই সকল কথা তাঁরে আপনি জানাবেন।"

সদাশিববাবু আমার সে সকল কথায় সন্তুষ্ট হোলেন না, বিশেষ আগ্রহে অনুরোধ জানিয়ে, চেকখানি আমার হাতে গোঁছিয়ে দিলেন ;—বোল্লেন, "রাজ-কুমারের আদেশ, আমি তাঁর আজ্ঞাবহ, তুমি এখনি গ্রহণ কর!"

দীনবন্ধুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে অগত্যা আমি চেকখানি গ্রহণ কোল্লেম ; পুনর্ব্বার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লেম, "স্বচক্ষেই আমার অবস্থা আপনি দেখে গেলেন, স্বকর্ণে কষ্টকর ঘটনাবলী আপনি শুনে গেলেন, অনুগ্রহ কোরে কুমার বাহাদুরকে আপনি বোলবেন, এই প্রকার বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ ঘটনাবশে নানা বাধা-বিঘ্নে জড়িভূত হয়ে পূর্ব্ব অঙ্গীকারপালনে আমি অক্ষম হয়েছি। অঙ্গীকার কোরেছিলেম, শীঘ্র পুনরায় বরদারাজ্যে উপস্থিত হয়ে, রাজদর্শনে কৃতার্থ হব। অঙ্গীকার ছিল, ঐ সকল কারণে এই দীর্ঘকালের মধ্যে পালন কোত্তে পারি নাই, তিনি যেন দয়া কোরে আমার এ অপরাধ ক্ষমা করেন। ভগবান যদি শুভ দিন দেন সমীপস্থ হয়ে সমস্ত মনের কথা নিবেদন কোরবো।"

বাবু সদাশিবের সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত কথোপকথন। দীনবন্ধুবাবুর মুখে কাঙ্ক্ষিত প্রিয়বার্ত্তা আমি শ্রবণ কোল্লেম, সদাশিবের মুখে বরদার

রাজসংসারের কুশল-বিজ্ঞাপন প্রিয়বার্ত্তাও শ্রবণ কোল্লেম। আহা! এই সকল প্রিয়বার্ত্তার উপসংহারে দীনবন্ধুবাবুর মুখে একটি অভাবনীয় অপ্রিয়বার্ত্তা আমারে শ্রবণ কোত্তে হলো। বিবাহের দুইমাস পরে বালিকা কৃষ্ণকামিনী বিষ-পানে বাল্যজীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন! হায় হায়! অভাগিনী কৃষ্ণকামিনী! অজ্ঞানে অজ্ঞানবালিকা আমার প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিল, আমি ভয় পেয়ে-ছিলেম, অভিভাবকেরা অপর পাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ কোরেছিলেন, কৃষ্ণকামিনী সে বিবাহে সুখী হয় নাই! হায় হায়! মনের দুঃখেই অভাগিনী অচিরাৎ সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মঘাতিনী হয়ে গেল! সে পাপের ভাগী কি আমি হব?—এক প্রকারে তাই যেন বোধ হয়; কিন্তু পরমেশ্বর জানেন, আমি নিষ্পাপ; কৃষ্ণকামিনী ব্রাহ্মণকন্যা, আমি কোন জাতি, তখন আমার জানা ছিল না। জয়শঙ্কর যদি মিথ্যাবাদী না হন, তা হোলে মোহন-বাবু তাঁর কাছে আমারে কায়স্থ বোলে পরিচয় দিয়েছেন, এখন মোহনবাবু সেটি স্বীকার করুন আর নাই করুন, জয়শঙ্করের কথার প্রমাণে আমি বুঝেছি, আমি কায়স্থসন্তান। কৃষ্ণকামিনীর সঙ্গে যখন আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তখন যদি এ পরিচয় আমি জানতেম, তা হোলেও ব্রাহ্মণকুমারীকে পত্নী বোলে গ্রহণ কোত্তে পাত্তেম না। আমার কি দোষ? কৃষ্ণকামিনীর আত্ম-হত্যাতে ধর্ম্মতঃ আমি নিমিত্তের ভাগী হব না;—পাপের ভাগী হব না বটে, কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর কথাগুলি মনে কোরে কি জানি কেন, আমার নেত্র দুটি অবিরল অশ্রুধার পরিবর্ষণ কোল্লে!

রাত্রি দুই প্রহরের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের আশায় আমরা শয়ন কোরে-ছিলেম, অল্প অল্প তন্দ্রা এসেছিল ঊষা আগমনের পূর্ব্বে তন্দ্রাভঙ্গে গাত্রো-ত্থান কোল্লেম, ঊষার আবরণ থাকতে থাকতেই আমাদের পাটনা-সহর পরি-ত্যাগ।

ষষ্ঠ কল্প

আমি আর অমরকুমারী!

বাবু সদাশিব মহান্ত স্বদেশযাত্রা কোল্লেন, দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে আমি যথাসময়ে মুর্শিদাবাদে পোঁছিলেম। মনে মনে ইচ্ছা ছিল, অমরকুমারীর সঙ্গেই আগে সাক্ষাৎ করা, কাজে কিন্তু সেটি ঘোটলো না, ভালও দেখায় না। বাড়ীর অপরাপর লোকগুলির সঙ্গে অগ্রে দেখা কোরে সকলের সহিত সময়োচিত প্রিয়সম্ভাষণ কোল্লেম। আমারে দর্শন কোরে সকলেই সন্তুষ্ট হোলেন। পশুপতিবাবু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। সকলের আনন্দ হলো, কিন্তু মাণিকগঞ্জে যাত্রা করা অবধি এত দিন পর্য্যন্ত কোথায় কখন কি অবস্থায় আমি ছিলেম, মণিভূষণ অগ্রে ফিরে এসেছেন, আমার এত বিল-

ম্বের কারণ কি, সে কথাটি আমাকে কেহই জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। ইতি-পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে যে চারিখানি পত্র আমি লিখেছিলেম, আমি পাটনায় আছি, কেবল এই কথাটি ভিন্ন অপরাপর স্থানের অবস্থাটিতে কোন কথাই সেই সকল পত্রে লেখা ছিল না ; তথাপি বিলম্বের কারণ প্রসঙ্গে কেহই সে সকল কথা জানতে চাইলেন না। ভাসা ভাসা আলাপ-পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলেও নিঃসম্পর্কীয় লোকের ততটা সহানুভূতির আশা করা যায় না ; সুতরাং আমার প্রত্যাগমনে তথাকার পরিচিত লোকগুলির হর্ষপ্রকাশই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

সময়ক্রমে আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লেম। পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ কোরে, তাঁদেরও মৌখিক সন্তোষ-প্রকাশে আপ্যায়িত হয়ে, শেষকালে অমরকুমারীর সঙ্গে আমি দেখা কোল্লেম। এক ঘরে অমরকুমারী একাকিনী ছিলেন ; আমি গিয়ে সম্মুখে দাঁড়ালেম। অমরকুমারী বোসে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। কি আশ্চর্য্য! দেখা হোলে কত কথাই অমরকুমারীকে আমি বোলবো, পথে পথে এইরূপ ভেবে এসেছিলেম, বাড়ীতে উপস্থিত হয়েও বক্তব্যগুলি স্থির কোরে রেখেছিলেম, চক্ষে চক্ষে মিলন হওয়া মাত্র সে কল্পনা যেন সব আমি ভুলে গেলেম, মুখ দিয়ে একটি কথাও নির্গত হলো না ;—আমারো না, অমরকুমারী'রা না ; আমার চক্ষেও জল, অমরকুমারীর চক্ষেও জল। কেবল চক্ষের জলেই আমাদের প্রথম সম্ভাষণ। চক্ষের জল কথা হয়, এ কথায় কেহ অবিশ্বাস কোরবেন না : অবস্থাবিশেষে অনেক লোকেই সেটা অনুভব কোরে থাকেন। প্রথমত কেবল নির্ব্বাকে অশ্রুবর্ষণই অভিনব-সম্ভাষণ। আনন্দের অশ্রু, সত্যের অনুরোধে এখানে এ কথাটিও আমার বলা উচিত।

"চক্ষের জল মুছতে মুছতে অমরকুমারী একটি বিছানার উপরে বোসলেন চক্ষের জল মুছতে মুছতে আমিও তাঁর নিকটে গিয়ে বোসলেম। সেই সময়ে আমাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি ; অল্পেক্ষণ গদগদ-সম্ভাষণ, তার পর স্পষ্ট স্পষ্ট বাক্য। আমার একখানি হস্ত ধারণ কোরে, স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টবচনে অমরকুমারী বোল্লেন, "হরিদাস! আমারে কি তোমার মনে ছিল? এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? ঢাকার ডেপুটিবাবুর বাসায় আমারে রেখে যে দিন তুমি মেলা দেখতে বেরিয়ে-ছিলে, সে রাত্রে আর ফিরে এলে না, সে দিন যে আমার—সে রাত্রে আমার কত ভাবনা, কত মর্ম্মবেদনা, সে কথা আর বোলে জানাবার নয়। কোথায় গিয়ে-ছিলে? আমারে ভুলে—আমি চিরদুঃখিনী, আমারে ভুলে এত দিন তুমি কি অবস্থায় কোথায় ছিলে? যত দিন আমরা—"

বোলতে বোলতে থেমে গিয়ে, দুঃখিনী অমরকুমারী এই সময় আবার বাষ্পবেগে অশ্রুমতী। নেত্রমার্জ্জন কোরে পুনরায় তিনি বোলতে লাগলেন, "যত দিন আমরা ঢাকায় ছিলেম, তুমি ছিলে না, মণিভূষণ জানেন, তোমার ভাবনায় তিন দিন তিন রাত্র আমি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ কোরেছিলেম ; তার পর অর্দ্ধাশনে অনিদ্রায় আমার দিনযামিনী গত হয়েছিল। মোকদ্দমা হয়ে

গেল, মণিভূষণ আমারে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলেন। বহরমপুরে শীঘ্র আসা প্রয়োজন, সেই জন্য সে সময় হরিহরবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয় নাই, তাঁর নামে একখানি পত্র লিখে মণিভূষণ ঢাকার ডাকঘরে প্রদান কোরে এসেছেন। এখানে এসে পেঁছেও মণিভূষণ আর একখানি পত্র মাণিকগঞ্জে প্রেরণ কোরেছেন, কোন উত্তর পাওয়া যায় না। হাঁ, বোলছিলেম, এখানে এসেও তোমার ভাবনায় আমি এক দণ্ডের তরে সুখী ছিলেম না। তার পর তোমার পত্র আসে, তখন জানতে পারি, তুমি পাটনায় আছ ; মন কিঞ্চিৎ শান্ত হয়েছিল। বোল্লেম বটে মন কিঞ্চিৎ শান্ত হয়েছিল, কিন্তু কেন তুমি পাটনায়, সেখানে তোমার কি কাজ, কেন তুমি মুর্শিদাবাদে ফিরে আসছো না, সে সব কথা জানতে না পেরে সম্পূর্ণরূপে উদ্বেগের শান্তি হয় নাই। আরো এক কথা, দীনবন্ধুবাবু তোমার পত্রের উত্তর লিখেছিলেন, কত দিন অতীত হলো, সে পত্রের আর কোনো উত্তর এলো না, উদ্বেগ আরো বাড়লো। দীনবন্ধুবাবুকে বোলতে পারি না, আপনি হরিদাসের অনুসন্ধান করুন ; বলাতে দোষ কিছু হতো না, তবুও আমার কেমন লজ্জা আসতো। এইবার গুজরাট থেকে একটি লোক আসেন, তাঁরে তুমি দেখেছ, তিনিই সঙ্গে কোরে দীনবন্ধুবাবুকে পাটনায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে না গেলে তুমি আসতে না, তোমারে দেখে তাই যেন আমার মনে হোচ্ছে। কেন? তোমার হয়েছিল কি?"

বন্ধুজনের অদর্শনে স্নেহকাতর প্রাণে যে প্রকার যন্ত্রণা হয়, তা আমি বুঝি ; আমার অদর্শনে অমরকুমারী সেইরূপ যন্ত্রণাভোগ কোরেছিলেন, তাও আমি বুঝলেম ; উত্তর কোল্লেম, "জানোই তো সংসারে আমার কেহ নাই ; যদি কেহ থাকেন, আমি সেটি অজ্ঞাত। পাঠশালা পরিত্যাগ করার পর অবাধ সংসারে আমি কেবল বিপদক্ষেত্রে বিচরণ করি ; নারীবেশে মাণিকগঞ্জের রমণীবল্লভের বাড়ীতে তোমার সন্ধান জেনে, আদালতের সাহায্যে তোমারে উদ্ধার কোরে ঢাকায় নিয়ে গিয়েছিলেম, ফিরে আসবার সময় পদ্মানদীর উপর বোম্বেটের হাতে বিপদে পোড়েছিলাম, তার পর আবার ঢাকায় ফিরে গিয়েছিলেম, সেখানে ডেপুটিবাবুর বাসায় তোমারে রেখে আমি মেলা দেখতে যাই। সেই অবধি আমার ভাগ্যে কি কি ঘোটেছিল সে সব তুমি জান না, দীনবন্ধুবাবুকেও সব কথা আমি বলি নাই, একে একে সব কথা তোমারে যদি বলি, তিন দিনেও ফুরাবে না।"

অমরকুমারী বোল্লেন, "একদিনেই বল, এক ঘণ্টার মধ্যেই বল। যখন তুমি ফিরে এসেছ, তখন আর সে সব কথা শুনে আমি ভয় পাব না, এক ঘণ্টার মধ্যেই সে সব কথা তুমি আমারে শীঘ্র শীঘ্র বল।"

বালিকার আগ্রহ দেখে আমার হাসি পেয়েছিল, হাসলেম না, কুমারীর কৌতূহল-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত অশ্বারোহী দস্যুকবলে পতিত হওয়া, ত্রিপুরা জেলায় অজ্ঞান অবস্থায় জয়শঙ্করের বাড়ীতে উপনীত হওয়া, সেখান থেকে পাটনায় মোহনবাবুর বাড়ীতে যাওয়া অবধি পাগলা গারদে প্রবেশ ও মুক্তি-

লাভ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে সংক্ষেপে সমস্ত কথা অমরকুমারীকে আমি শুনালেম। বিস্ফারিত-নেত্রে চেয়ে সুস্থির-কর্ণে সেই সকল কথা শ্রবণ কোরে অমরকুমারী শিউরে শিউরে উঠলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর অমরকুমারীর সংগে আমি সাক্ষাৎ কোরেছিলেম. রাত্রি ৮টা বাজলো ; বাহিরবাড়ীতে আসবার জন্য আমি অমরকুমারীর অনুমতি চাইলেম। অমরকুমারী বোল্লেন, "আর একটু বোসো, আর কিছু আমার বলবার আছে।"

বলবার শুনবার অনেক কথা ছিল, তা আমি জানতেম ; কিন্তু মণিভূষণ আমাদের প্রত্যাগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সন্ধ্যার পর বাড়ীতে তাঁর আসবার কথা, সদরবাড়ীতে আমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, কিন্তু অমরকুমারীর অনুরোধ আমি এড়াতে পাল্লেম না. আর কিছুক্ষণ বোসে থাকতে বাধ্য হোলেম। যেন কি চিন্তা কোরে অমরকুমারী বোল্লেন. "বাবু মোহনলালের কথা পূর্ব্বে তুমি আমারে বোলেছিলে। সর্ব্বানন্দবাবুর খুনের পর মোহনলালবাবু তোমার সংগে যেরূপ ব্যবহার কোরেছিলেন, সেই কথা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলেম, তিনি লোক ভাল নন ; আমার অপেক্ষা তুমিই আরো বেশী বুঝেছিলে ; তবে কেন তুমি বার বার তাঁর সাক্ষাৎ কর ? তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করবার জন্য কেন তুমি পাটনায় গিয়েছিলে ?"

বুদ্ধিমতীর সরল প্রশ্নের উত্তরে আমি বোল্লেম, "কোন সূত্রে আমি জানতে পারি, মোহনলালবাবু আমার জাতিকুলের পরিচয় জানেন। যে পরিচয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদা আমি আকাশ-পাতাল ভাবি. সেই পরিচয়টি যদি মোহনবাবুর নিকট শুনতে পাওয়া যায়. সেই আশাতেই পাটনায় আমি গিয়েছিলেম বিপরীত হয়ে গেল !"

অমরকুমারী।—তোমার বেশ বুদ্ধি আছে ; কিন্তু এক একটা কাজ তুমি যে রকম কর, তাতে যেন বোধ হয়, তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই ! মোহনলালবাবু যে প্রকৃতির লোক, তোমার প্রতি তাঁর যে প্রকার ব্যবহার, তাতে কোরে তাঁর মুখে তোমার সম্বন্ধে কোন সত্যকথা বাহির করা কতদূর সম্ভব, পাটনায় আসবার সময় সেটি তুমি ভুলে ছিলে। জাতিকুলের পরিচয় জানবার বাসনায় তোমারে পাগলা-গারদে বাস কোত্তে হয়েছিল। সে ঘটনাটা ভাবলে আমার যেন মনে হয়, তুমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ।

আমি।—সত্য, তোমার এই তিরস্কারে সত্যই আমি লজ্জা পেলেম ; কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের মনেরও পরিবর্ত্তন হয়, এইরূপ আমার ধারণা। মোহনলালবাবু এখন রাজা হয়েছেন, আরো অনেক টাকা উপস্বত্বের বিষয় পেয়েছেন, কমলার প্রসন্নতায় এখন যদি তিনি ভালমানুষ হয়ে থাকেন, তাই ভেবেই আমি—

অমর।—তাই ভেবেই তুমি পাগলাগারদের পথ পরিষ্কার কোরেছিলে ! মানুষের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হোতে পারে ; কিন্তু স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। অজ্ঞানে যে লোকটাকে আমি বাবা বোলতেম, যে লোকটাকে তুমি রক্তদন্ত

বল, সেই লোকটার সঙ্গে যে মোহনবাবুর গুপ্ত যোগাযোগ, অনেক প্রমাণে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার যত কিছু কষ্ট, যত কিছু যন্ত্রণা, তৎসমস্তেরই মূল মোহন বাবু, আর তাঁর সেই গুপ্ত তাঁবেদার রক্তদন্ত, এইরূপ আমার বিশ্বাস।

আমি।—সে বিশ্বাস আমারো আছে। রক্তদন্তকে একবার ধোত্তে পাল্লে, পুলিসের পীড়নে অথবা আদালতের জেরায় অনেক কথা বাহির হোতে পারে। তুমি যে দিন বহরমপুরের আদালতে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলে, সে দিন কি রক্তদন্তের নামটা উঠেছিল ?

অমর।—সে নামটা কোথাও উঠে না · সে নামটা তুমি দিয়েছ, যখন তখন তোমার মনেই উঠে থাকে। আদালতে লেখা আছে, জটাধর তরফদার। সেই নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়াণা, সেই নামেই পুলিসের অন্বেষণ।

আমি।—হাঁ, তা তো জানি। মাণিকগঞ্জে আবার সে নামটাও ঢাকা পোড়েছিল, সেখানে নাম হয়েছিল, চণ্ডেশ্বর। রক্তদন্তের দ্বিতীয় সঙ্গী ঘনশ্যাম। মাণিকগঞ্জে চণ্ডেশ্বরের সঙ্গে সে লোকটারও নূতন নাম হয়েছিল, গণেশ্বর। তুমিই সে কথা আমারে বোলেছিলে। দুরন্ত ধড়ীবাজ লোকেরা ঘন ঘন নাম বদলায়, দেশ বদলায়, ঠিকানা বদলায়, শীঘ্র ধরা পড়ে না।

অমর।—কেন ?—তুমি বোলেছিলে, পরোয়াণাতে জটাধরের চেহারা লেখা আছে, সে রকম চেহারা বদল হয় না ! বানর, ভল্লুক, রাক্ষস, কতক কতক মানুষ : নাম বদল কোরে সে চেহারা লুকিয়ে রাখা দূরে থাক, যে বিধাতা মানুষ গড়েন, সে বিধাতাও জটাধরের তুল্য লোকের চেহারা বদল কোরে দিতে অক্ষম, তবে কেন জটাধরটা ধরা পড়ে না ?

আমি।—কাজের কথাও বটে, হাসির কথাও বটে। চেহারা লেখা থাকলেই শীঘ্র শীঘ্র আসামী ধরা পড়ে, তেমন দৃষ্টান্ত আমি জানি না। বড় বড় অপরাধে অপরাধী পলাতক আসামী মাত্রেরই ওয়ারীণে হুলিয়া লেখা থাকে ; তথাপি এক একটা আসামীকে গ্রেপ্তার করবার সুবিধা শীঘ্র ঘটে না। রক্তদন্তের চেহারার কথাটা স্বতন্ত্র বটে : লোকালয়ের মানুষের সে প্রকার অদ্ভুত চেহারা হয় না : লোকালয়ের কথা কেন, সচরাচর বনমানুষেরও সে রকম চেহারা থাকে না ; তথাপি সে লোকটা যে কেন ধরা পোড়ছে না, পুলিসের লোকেরাই বোলতে পারে। রক্তদন্ত ধরা পড়ে না, এ কথা শুনলে ইংরেজী পুলিসের কার্য্যপটুতার তারিফ করা যায় না।

পাটনার বাতুলালয় থেকে আমি মুক্ত হয়ে এসেছি, অনেক দূরে—মুর্শিদাবাদে এসেছি, পাটনায় আমি মিথ্যা পাগল ছিলেম, এখানে আজ রাত্রে যেন সত্য বাতুলতা আমারে আশ্রয় কোল্লে। বালিকা, বঙ্গকুমারীর কাছে, আইন আদালতের যে সকল কথা সহজ মানুষে বলে না আমি অম্লানবদনে বাতুলের মত অমরকুমারীর কাছে সেই সব কথা বোলে ফেল্লেম ! তখনো আমার সকল কথা

ফুরায় নাই, আরো কিছু বোলবো বোলবো মনে কোচ্ছি. এমন সময় বাড়ীর একজন কিঙ্করী এসে আমারে ডাকলে ;—বোল্লে, "মণিবাবু এসেছেন, ছোট-বাবু তোমারে ডাকছেন।"

আর আমি বিলম্ব কোত্তে পাল্লেম না. অমরকুমারীর মুখপানে চেয়ে ব্যস্ত-ভাবে গাত্রোত্থান কোরে সদরবাড়ীতে আমি চোলে এলেম।

সপ্তম কল্প

শ্রীবৃন্দাবন

অধীর হয়ে মণিভূষণ আমার অপেক্ষা কোচ্ছিলেন, সেই সময় আমি গিয়ে বৈঠকখানায় উপস্থিত হোলেম। প্রথামত স্বাগতপ্রশ্নোত্তরের পর মণিভূষণ আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার একখানি পত্র প্রাপ্ত হয়ে অবিলম্বেই আমি উত্তর লিখেছিলেম. সে পত্রের প্রত্যুত্তরপ্রতীক্ষায় নিত্য আমি এখানকার ডাকঘরে যাতায়াত কোরেছি. প্রত্যুত্তর আসে নাই. আমার সে পত্র কি তুমি প্রাপ্ত হও নাই ?"

পাটনায় উপস্থিত হয়ে পত্রের প্রসঙ্গে দীনবন্ধুবাবু আমারে যে কথা বোলে-ছিলেন, সদাশিব বাবু যে কথা বোলেছিলেন, মণিভূষণও তাই বোল্লেন। আমার পূর্ব্বস্বাধীনতা বিফল হয়ে গিয়েছিল. আমার প্রেরিত পত্রগুলির একখানির উত্তরও আমি প্রাপ্ত হই নাই। মণিভূষণকে আমি বোল্লেম, "তোমার পত্র যদি হস্তগত হতো, সেই দিনেই আমি উত্তর লিখে পাঠাতেম ; কিন্তু উত্তর প্রাপ্ত হবার বিঘ্ন ঘোটেছিল," এই পর্য্যন্ত বোলে. মোহনলালের ছলনায় আমার পাগলা-গারদে বাস. পাগলের খেলা, অবরুদ্ধ অবস্থায় আমার যন্ত্রণাভোগ, দীন-বন্ধুবাবুর গমনে মুক্তিলাভ ইত্যাদি সকল কথা তাঁরে আমি খোলসা কোরে বোল্লেম। মণিভূষণ বিস্তর আক্ষেপ প্রকাশ কোল্লেন।

উভয় স্থানের মোকদ্দমায় ফলাফলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দীনবন্ধুবাবুর মুখে আমি শ্রবণ কোরেছিলেম, বিশেষ বিবরণ মণিভূষণ জানেন ; উভয় স্থানেই তিনি উপস্থিত ছিলেন, উভয় স্থানের মোকদ্দমাতেই তিনি ফরিয়াদী ; বিশেষ বিবরণ মণিভূষণকেই আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম।

মণিভূষণ বোল্লেন, "বহরমপুরের মোকদ্দমা যতদূর পর্য্যন্ত তুমি শুনে গিয়েছিলে তার পর অনেক প্রকার রহস্য হয়েছিল। ঢাকার আদালতে রমণী-বল্লভ, ধনঞ্জয় ঘটক ও বংশী পোদ্দারের তিন তিন বৎসর কারাবাসদণ্ডের আজ্ঞা হবার পর আমরা বহরমপুর আসি। বোম্বেটে নৌকার আসামীরা ঢাকার জেল-খানায় হাজতে থাকে, সে মোকদ্দমার শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করার নিমিত্ত ঢাকায় আমরা থাকি নাই। বহরমপুরের ডাকাতী মোকদ্দমার আসামীরা অগ্রেই সাজা

পেয়েছিল, বাকী ছিল. নফর ঘোষাল, আর কুঞ্জবিহারী সান্যাল। যদিও তারা কাশিমবাজারের সুড়ঙ্গে ধরা পড়ে, কিন্তু ডাকাতী মোকদ্দমায় তারা আসামী ছিল না, বালিকাহরণ মোকদ্দমায় তারা যোগের আসামী। আমি যখন অমরকুমারীকে নিয়ে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসি, তখন সেই মোকদ্দমার পুনরায় ডাক হয়। সর্দ্দার আসামী জটাধর তরফদার। পুলিসের লোকেরা এতদিনও জটাধরকে গ্রেপ্তার কোত্তে পারে নাই. জনার্দ্দন মজুমদার অনেক দিন পরে ধরা পোড়েছিল। কুঞ্জবিহারীকে আর নফর ঘোষালকে অমরকুমারী চিনেছিলেন। আমার পিতা আর পশুপতিবাবু, বিচারপতির সম্মুখে অমরকুমারীকে সনাক্ত কোরেছিলেন। এই কুমারী. অমরকুমারী. আসামীরা এই কুমারীকে হরণ কোরে মাণিকগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে এই কুমারীকে দুই হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করবার বন্দোবস্ত কোরেছিল ; সে সকল আসামী ধরা পড়ে নাই। যে লোকের বাড়ীতে অমরকুমারীকে তারা রেখেছিল, ঢাকার আদালতে সে লোকের তিন বৎসর, যে লোকটা সেই বিক্রয়ের ঘটকালী কোরেছিল, তারও তিন বৎসর, যে লোকটা অমরকুমারীকে খরিদ কোরে বিবাহ করবার চুক্তি কোরেছিল, সে লোকটারও তিন বৎসর মেয়াদ হয়ে গিয়েছে। আদালতের কাগজপত্র মোলাহেজায় সমস্ত প্রকাশ হওয়াতে সেখানকার বিচারপতি, ন্যায়বিচারে নফর ঘোষালের চারি বৎসর কারাবাস ১০০০৲ টাকা জরিমানা, কুঞ্জবিহারী সান্যালের তিন বৎসর কারাবাস. ৫০০৲ টাকা জরিমানা, জনার্দ্দন মজুমদারের দুই বৎসর কারাবাস, ৫০০৲ টাকা জরিমানার আদেশ দেন। জরিমানার টাকা আদায় হয় নাই, হারহারি মতে মেয়াদবৃদ্ধি হয়েছে।"

বর্ণে বর্ণে কর্ণ কোরে মণিভূষণের কথাগুলি আমি শ্রবণ কোল্লেম। জরিমানার টাকা আদায় হয় নাই, সে কথাটা আমার কর্ণে যেন আশ্চর্য্য বোধ হলো। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাকতে পারে বর্দ্ধমানে সর্ব্বানন্দবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর বৈঠকখানায় লৌহ-সিন্দুকে যে উইল পাওয়া যায়, ঐ কুঞ্জবিহারী, ঐ নফর ঘোষাল. ঐ জনার্দ্দন মজুমদার সেই উইলে সাক্ষী ছিল। উইলখানি মোহনলালবাবুর সম্পূর্ণ অনুকূলে লিখিত থাকা প্রকাশ : সেই তিনটি সাক্ষী জরিমানার দায়ে আদালতে বিপদগ্রস্ত, মোহনলালবাবু যদি সে সংবাদ পেতেন, নিশ্চয়ই তিনি জরিমানার টাকা প্রেরণ কোত্তেন। সংবাদ তিনি পান নাই. সেই জন্যই আসামীদের মেয়াদবৃদ্ধি।

মোকদ্দমার কথা এই পর্য্যন্ত। ঢাকায় ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর অবধি পাটনার বাতুলালয়ে বাস পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আমি মণিভূষণকে বোল্লেম। অমরকুমারীর ন্যায় মণিভূষণও আমারে ভর্ৎসনা কোল্লেন ; সে ভর্ৎসনায় আমি কোন উত্তর দিতে পাল্লেম না। রাত্রি ১০টার সময় মণিভূষণ বাড়ী গেলেন, রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমি যেতে পাল্লেম না. পরদিন প্রত্যূষে গিয়ে বৃদ্ধ শান্তিরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। আমারে দেখে তিনি হর্ষ প্রকাশ কোল্লেন। অমরকুমারীর উদ্ধারসাধনে বিস্তর কষ্ট আমি পেয়েছিলেম, এই কথা উত্থাপন কোরে আমার মস্তকে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক তিনি আমারে আশীর্ব্বাদ

কোল্লেন। মোকদ্দমার শেষ ফল আমি শুনেছিলেম, সে সম্বন্ধে তাঁরে আর আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। পাটনায় তিনি আমার নামে যে পত্র লিখেছিলেন, তার উত্তর পান নাই, সেই প্রসঙ্গে দুটি একটি কথা তিনি বোলেছিলেন, বেশী কথা বোলতে হলো না যে উত্তরে দীনবন্ধুবাবুকে আমি নিরুত্তর কোরেছিলেম, সেই উত্তরে তাঁরেও প্রবোধ দিলেম।

বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীতে ফিরে এসে, আশু কর্ত্তব্য কয়েকটি কার্য্য সমাধা কোরে আমি স্নানাহার কোল্লেম। বৈকালে অমরকুমারীর সঙ্গে নির্জ্জনে আমার অনেকগুলি কথাবার্ত্তা হলো। এক সপ্তাহের মধ্যে দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে আমারে বৃন্দাবনযাত্রা কোত্তে হবে, সেই অবসরে সেই কথাটি অমরকুমারীকে আমি জানালেম। বেশ হাসিখুসী চোলছিল, কথাটি শ্রবণ করবামাত্র অমরকুমারীর প্রফুল্ল বদন সহসা ম্লানভাব ধারণ কোল্লে। বিরহব্যাকুল ভয়াতুরা কুমারী ম্লাননয়নে আমার মুখপানে চেয়ে কম্পিতস্বরে বোল্লেন, "আবার যাবে? আবার তুমি আমারে একাকিনী ফেলে এত শীঘ্র দূরদেশে চোলে যাবে? আবার আমি তোমার অদর্শনে বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন কোরে দিন দিন আশায় আশায় দিন গণনা কোরবো? আবার নিত্য নিত্য তোমার অমঙ্গল আশঙ্কায় মনের উদ্বেগে দিন-যামিনী যাপন কোত্তে থাকবো? —না হরিদাস! না ভাই! আর তুমি যেয়ো না! দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে এখন আমি কথা কোইতে শিখেছি; মিনতি কোরে তাঁরে আমি বোলবো তোমারে তিনি যেন সঙ্গে কোরে নিয়ে না যান।"

সরলার মনের ভাব আমি বুঝলেম, মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দিয়ে, বিশেষ বিশেষ হেতু প্রদর্শন কোরে তাঁরে আমি বোল্লেম, "অমন কর্ম্ম কোরো না. আমার নাম কোরে দীনবন্ধুবাবুকে তুমি কিছু বোলো না, ভগবানের দ্বাপরাবতারের লীলাক্ষেত্রটি দর্শনে আমার অভিলাষ হয়েছে. বাধা দিও না। আরো কি জান, এখনো আমার অনেক কার্য্য বাকী, মূল কার্য্যই বাকী; তোমার পরিচয় তুমি জানো না, আমার পরিচয়ও আমি জানি না। আমার মন বলে, আমাদের উভয়েরই পরিচয় মোহনলালবাবু জানেন। যে প্রকৃতির লোক তিনি, কোন গতিকেই তাঁর মুখ থেকে সত্যকথা আমি বাহির কোত্তে পারবো না। এখন তিনি রাজা, তাঁর সাক্ষাতে বেশী কথা বলা,—কোন বিষয় জানবার জন্য জেদ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা;—ধৃষ্টতা-প্রকাশেও ইষ্টসিদ্ধি হবে না। মোহনলালের বিশ্বস্ত লোক অনেক; তাঁর কথা জানে, তাঁর মন্ত্রণার কথা জানে, অথচ আমার কথা জানে না, এমন লোকও অনেক। দেশের নানা স্থানে রাজা মোহনলালের বন্ধুলোক, পরিচিত লোক, অনুগত লোকও অনেক আছে, এক একটা গুপ্তচরও না আছে, এমন না। তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষে অনেক স্থানে আমাদের বেড়াতে হবে, অনেক জায়গায় অনেক রকম লোকের সঙ্গে দেখা হবে, যদি কোন সূত্রে কোন লোকের মুখে আমাদের পরিচয়ের কথাটা জানতে পারি,

সংশয়ের অন্ধকার ঘুচে যাবে, সংসারের এক একটি পরিচিত প্রাণী আমরা, লোকে এইরূপ জানতে পারবে, পরিচয় পেলে অপরাপর লোকেরও আমাদের বংশবৃত্তান্ত জানতে পারবে, আমরাও মুখ ফুটে লোকের কাছে পরিচয় দিতে পারবো ; সহায়সম্পদবিহীন গরিব হয়েও অন্তরে একটা আনন্দ আসবে, মনে মনে সর্ব্বদা আমার এইরূপ আশা জাগে। তুমি বাধা দিও না! অল্পদিনের জন্য বাবুর সঙ্গে আমি তীর্থ-দর্শনে যাব, অল্পদিনের মধ্যেই আবার ফিরে আসবো।"

ম্লানবদনে সজলনয়নে আমার মুখপানে চেয়ে অমরকুমারী বোল্লেন, তবে যাও তীর্থ-দর্শনের মন হয়েছে, তীর্থদর্শনে যাও ; কিন্তু দেখো, আবার যেন কোন প্রকার নূতন মোহনলালের মোহ-চক্রে আটকা পোড়ে অন্য কোন প্রকার নূতন গারদের অতিথি হোতে না হয়!"

সেই সময় আমি চেয়ে দেখলেম, অমরকুমারীর নেত্রপ্রান্তে অশ্রুধারা প্রবাহিত। শশব্যস্তে নিকটস্থ হয়ে নিজ হস্তে স্নেহকাতরার অশ্রুমার্জ্জন কোরে দিয়ে, সস্নেহ বচনে আমি বোল্লেম, "এ কি অমরকুমারী! তীর্থ-গমনের এখনো দিনস্থির হয় নাই ; শুনেছি মাত্র সপ্তাহের মধ্যে যাত্রা করা হবে ; এখনি তুমি কাঁদো কেন? শুনেছি ইতিমধ্যে একবার তুমি আমারে বোলেছ, তোমারে একাকিনী ফেলে আবার আমি দূরদেশে চোলে যাব, সেটা তোমার কি প্রকার কথা? একাকিনী তুমি কারে বল? এ বাড়ীর পরিবারেরা—বিশেষতঃ গৃহিণী ঠাকুরাণী তোমারে আপন কন্যার ন্যায় ভালবাসেন, সকলেই তোমারে আদর করেন, সকলেই তোমারে যত্ন করেন, তাঁদের কাছেই তুমি থাকবে, একাকিনী কেন বল? পশুপতিবাবু থাকলেন, মণিভূষণ থাকলেন, যাঁরে তুমি পিতৃতুল্য ভক্তি কর, সেই স্নেহবৎসল শান্তিরামবাবু থাকলেন, প্রতিদিন তাঁরা এসে তোমারে দেখে যাবেন, একাকিনী কেন থাকবে? চিন্তা কি? শীঘ্রই আমরা ফিরে আসবো, কোন ভয় নাই!"

অমরকুমারী একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। আমি তখন সেখান থেকে উঠে এলেম ; বৈঠকখানায় এসেই দেখি, রজনীবাবু জাজিমের একধারে একটি তাকিয়ার কাছে কাত হয়ে বোসে আছেন · পশুপতিবাবুর সঙ্গে চুপি চুপি তিনি কি পরামর্শ কোচ্ছেন। বড়বাবু বৈঠকখানায় নাই।

রজনীবাবু এসেছেন। কোন রজনীবাবু?—পাঠকমহাশয় স্মরণ কোত্তে পারবেন, এই রজনীবাবুটি বহরমপুর আদালতের উকীল। মেয়েচুরি মোকদ্দমায় এই রজনীবাবু মণিভূষণের পক্ষে উকীল ছিলেন।

ছোটবাবুর সঙ্গে রজনীবাবুর পরামর্শ হোচ্ছিল ; ছোটবাবুর মুখের দিকে রজনীবাবুর মুখ ছিল ; পশ্চাদ্দিকে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম। প্রথমে তিনি আমারে দেখতে পেলেন না, ছোটবাবু দেখলেন, প্রফুল্লবদনে একটু উচ্চকণ্ঠে বোলে উঠলেন, "এই যে হরিদাস!"

পশ্চাতে মুখ ফিরিয়ে, আমারে দেখে, সহাস্যবদনে রজনীবাবুও পূর্ব্ব-বাক্যের প্রতিধ্বনি কোরে বোল্লেন, "এই যে হরিদাস ! এসো হরিদাস ! বোসো, তোমার জন্য আমি একটা খোসখবর এনেছি।"

উকীলবাবুকে অভিবাদন কোরে অনতিদূরে আমি বোসলেম ; খোস-খবরটা কি রকম, শ্রবণের কৌতূহলে অনিমেষ-নেত্রে উকীলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেম। কথাটা যেন চাপা পোড়ে থাকলো। মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে রজনীবাবু আমারে বোল্লেন, "দেশ দেখতে গিয়েছিলে, কত দিন পরে ফিরে এলে, আমার সঙ্গে দেখাও কোল্লে না। কাজের সময় আমি তোমাদের হয়েছিলেম, এখন আমি পর, খুব ভাল !"

লজ্জা পেয়ে আমি বোল্লেম, "সবে মাত্র কল্য আমরা ফিরে এসেছি, দেখা কর-বার সময় ফুরায় নাই। আগামী কল্য নিশ্চয়ই আমি যেতেম ; ইতিমধ্যে আপনি স্বয়ং এসেছেন, যথেষ্ট অনুগ্রহ। খবরের কথাটা কি আজ্ঞা কোচ্ছি-লেন ?"

রজনীবাবু সোজা হয়ে বোসলেন, হাস্য কোরে বোল্লেন, "খোসখবর। দুই নামে দুখানা ওয়ারীণ ছিল,—জটাধর আর ঘনশ্যাম। সম্প্রতি একটা লোক ধরা পড়েছে, হুলিয়া মিলিয়ে পুলিসের লোকেরা কৃষ্ণনগরের এক বেশ্যালয়ে সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার কোরেছে। পুলিস বলে, তারি নাম ঘনশ্যাম বিশ্বাস। তুমি কি ঘনশ্যাম বিশ্বাসকে স্বচক্ষে দেখেছ ? ঘনশ্যাম হাজতে আছে, সনাক্ত করা আবশ্যক ; সনাক্তের জন্য অন্ততঃ দুটি লোক দরকার। তুমি যদি চিনতে পার, তথাপি আর একজন চাই। আছে কি তোমার সন্ধানে ?"

আমি উত্তর কোল্লেম, "আমি তারে বেশ চিনি, বিপদক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে আমারে নিক্ষেপ করবার মূল সেই ঘনশ্যাম বিশ্বাস। আমি তারে বেশ চিনি ; কিন্তু আর একজন ঘনশ্যামকে চিনতে পারে, এখানে সে রকম আর একজন প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট।"

উকীলবাবু বোল্লেন, "দুর্ঘট বোল্লে তো চোলবে না, আদালতের উকীল, মোক্তার অথবা আদালতের পরিচিত কোন সম্ভ্রান্ত লোক যদি কোন ব্যক্তিকে সনাক্ত করেন, তা হোলে দুজনের দ্বারাই কাজ হয়, তোমার মত বালক একাকী ঘনশ্যামকে সনাক্ত কোরে মঞ্জুর হোতে পারে না। আর একজন চাই।"

মনে কিঞ্চিৎ আঘাত পেয়ে আমি বোল্লেম, "একান্তই যদি চাই, এখানে মিলবে না, হুগলী জেলায় সপ্তগ্রামে লোক পাঠাতে হয়। সেখানে ঘনশ্যামের লীলাখেলা বিস্তর, ওখানকার অনেক লোক তাকে ভাল জানে। বর্দ্ধমানের নিকটে একটা কারখানাবাড়ী আছে, ঘনশ্যাম সেখানকার কর্ত্তা সেজে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড কোরেছিল। একটি ব্রাহ্মণ সেই কারখানাবাড়ীতে ঘনশ্যামের বিনা বেতনের দেওয়ান ছিল, সেই ব্রাহ্মণটিকে যদি পাওয়া যায়, তা হোলে উত্তম সনাক্ত হোতে পারে।"

ভ্রূযুগল বিকুঞ্চিত কোরে, একটু উপরদিকে চক্ষু তুলে, কি একটু চিন্তা কোরে রজনীবাবু তখন বোল্লেন, "এত খবর তুমি রাখো, তবে বোধ হয়, তুমি

একাকী তাকে সনাক্ত কোল্লেই হাকিম তুষ্ট হোতে পারেন। আগামী কল্য সোমবার, কল্য বেলা ১১টার সময় আদালতে তুমি যেয়ো ; সমস্তই ঠিক হবে।”

উত্তেজিত হয়ে আমি বোল্লেম, “আমি একাকী সনাক্ত কোল্লে হাকিম তুষ্ট হোতে পারেন, এইরূপ আপনার বোধ হয় ?—হাঁ, আপনার বোধ হোতে পারে ; কিন্তু ঘনশ্যামের সঙ্গে যখন আমার দেখা হবে, আমার মুখে ঘনশ্যাম যখন ছাঁকা ছাঁকা কথা শুনবে, তখন আর ঘনশ্যামের মুখে বাক্য থাকবে না। আমার কথা শুনে আপনারও তাক লেগে যাবে, হাকিমটিও চমৎকৃত হবেন। দেখুন রজনীবাবু ! যে রকম সুযোগ উপস্থিত, এই সুযোগে আসল মোকদ্দমা মূল আসামী জটাধর তরফদারকে গ্রেপ্তার করবার সুবিধা হবে। বর্দ্ধমানের নূতন আশ্রয় থেকে আমারে হরণ করবার মূল সেই জটাধর ; শান্তিরামের বাড়ী থেকে অমরকুমারীকে হরণ করবার মূলও সেই জটাধর। কেবল তাই নয়, জটাধর আমার সমস্ত কষ্টের সমস্ত বিপদের মূল। ঘনশ্যামের মুখে—সহজ কথায় নয়, পুলিসের মধুমাড়ায় ঘনশ্যামের মুখে জটাধরের সন্ধান পাওয়া যাবে ; জটাধর এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে, কোথায় কোন নাম বোলে পরিচয় দিচ্ছে, সেই নিগূঢ় কথাও জানতে পারা যাবে। শীকারী ! ঠাঁই ঠাঁই নাম ভাঁড়ায়। সেই জটাধর মাণিকগঞ্জে একবার চণ্ডেশ্বর নাম ধোরেছিল, ঐ ঘনশ্যামটাও সেখানে গণেশ্বর হয়েছিল। ধন্য জগদীশ্বর ! সেই ঘনশ্যাম এখন পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বহরমপুরে হাজির। কল্যকার কথা আপনি কেন বোলছেন, আজই আমি আপনার সঙ্গে বহরমপুরে যাব, ঘনশ্যামকে দেখবো, রক্তদন্তের তত্ত্ব পাব। যদি অসাধ্য না হয়, রক্তদন্ত যদি শীঘ্র ধরা পড়ে, রক্তদন্তের মুখে রাজা মোহনলালের আসল অভিসন্ধিও হয় তো জানতে পারবো ; আমার হৃদয়ের গুরুভার পাষাণটা অনেকদূর নেমে যাবে। আজই আমি আপনার সঙ্গে বহরমপুরে যাব।”

কে রাজা মোহনলাল, রজনীবাবু সে পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন না, আমারও পরিচয় দিবার আবশ্যক হলো না, ঘনশ্যামের প্রসঙ্গে আরো পাঁচ প্রকার কথার পর একটু হাস্য কোরে রজনীবাবু বোল্লেন, “দেখ হরিদাস ! প্রথমে তোমার সঙ্গে আমি একটু রহস্য কোরেছিলেম ; তুমি মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছ, আজ এইখানে এসে পশুপতিবাবুর মুখে সংবাদ আমি শ্রবণ কোল্লেম। আমার সঙ্গে তুমি দেখা কর নাই, আমাকে তুমি ভেবেছ, রহস্য কোরে এই কথা তোমাকে আমি বোলেছিলেম, সে জন্য তুমি কিছু কোরো না। এখানে আজ আমি তোমার তত্ত্বে আসি নাই, একটা নূতন আসামী পোড়েছে, ফরিয়াদীকে একবার প্রয়োজন, তজ্জন্য মণিভূষণ দত্তকে সংবাদ দিতে এসে স্বয়ং আসবার কারণ, একটু আত্মীয়তা দেখানো।”—আমারে এই কথাগুলি যে পশুপতিবাবুর দিকে চেয়ে, তিনি বোল্লেন, “মণিভূষণকে আপনি একবার ডেকে পাঠান।”

একখানি ক্ষুদ্র চিঠি নিয়ে একজন দরোয়ান গেল, অল্পক্ষণ পরে মণি-

ভূষণকে সঙ্গে কোরে ফিরে এলো। নূতন আসামী গ্রেপ্তারের কথা রজনীবাবু মণিভূষণকে বোল্লেন, আদালতে একবার হাজির হোতে হবে, এইরূপ অনুরোধ কোল্লেন, মণিভূষণ আমার মুখের দিকে চাইলেন, মস্তক সঞ্চালন কোরে আমি হাস্য কোল্লেম।

পূর্ব্বে আমি যে কথা বোলেছিলেম, উকীলের মুখে সেই কথা শুনে, মণিভূষণের প্রস্তাবেই সম্মত হোলেন। উকীলের সঙ্গে সেই দিন আমরা দুজনেই বহরমপুরে দেখা কোল্লেম, পরদিন ঠিক সময়ে আদালতে উপস্থিত হয়ে ঘনশ্যামকে দেখলেম।

ঘনশ্যামের সন্ন্যাসীবেশ। মাথাটা নেড়া কোরেছে, গৈরিক বাস পরিধান কোরেছে যখন আমরা দেখলেম, তখন অঙ্গে ভস্ম ছিল না, বোধ হলো, ভস্ম-লেপন আরম্ভ কোরেছে নূতন ঢং। এই সেই সপ্তগ্রামের ঘনশ্যাম কি না, হঠাৎ দেখলে চিনতে পারা যায় না ; আমি কিন্তু চিনলেম ; হাকিমের সাক্ষাতে সনাক্তও কোল্লেম ; পূর্ব্বকার কতকগুলি নোঙরা নোঙরা কাজের কথাও বোল্লেম। আমার সনাক্ত মঞ্জুর হলো, আমি ছুটি পেলেম :—ছুটি পেলেম বটে, কিন্তু আদালত থেকে বেরুলেম না। রজনীবাবুকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে বোল্লেম, হাকিমের অনুমতি গ্রহণ কোরে ঘনশ্যামের প্রতি তিনি কতকগুলি সওয়াল কোল্লেন।

প্রথম প্রশ্ন—"বীরভূমের জটাধর তরফদারকে তুমি চেনো কি না ?"—ঘনশ্যাম সরপট অস্বীকার কোল্লে। দ্বিতীয় প্রশ্ন—"বর্দ্ধমানের সর্ব্বানন্দবাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু (এখন রাজা) মোহনলাল ঘোষকে তুমি জানো কি না ?"—ঘনশ্যাম উত্তর কোল্লে, "মধ্যে মধ্যে তাঁকে আমি দেখেছি, কিন্তু বিশেষরূপ জানাশুনা নাই।"—তৃতীয় প্রশ্ন—(আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) "এই হরিদাস যখন ছোট, তখন তুমি এই হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে, এই হরিদাস তোমার ছেলে, এইরূপ মিথ্যাপরিচয় দিয়ে, বর্দ্ধমানের সর্ব্বানন্দবাবুর বাড়ীর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে, বাবুর কাছে তুমি ভিক্ষা চেয়েছিলে কি না ?"—ঘনশ্যাম উত্তর কোল্লে, "ভিক্ষা করা আমার অভ্যাস নয়, আমি কারবারী লোক, ভিক্ষা কথাটা যদি রাষ্ট্র হয়ে থাকে, সেটা মিথ্যাকথা।"

উত্তরে ভাবভঙ্গীতে আমি বুঝলেম, সহজে সত্যকথা বাহির করা যাবে না। নয়নভঙ্গী কোরে উকীলের দিকে আমি ইসারা কোল্লেম। রজনীবাবু পুনরায় প্রশ্ন আরম্ভ কোল্লেন।

প্রশ্ন।—এখনো কি তুমি কারবারী লোক ?

উত্তর।—না।

প্রশ্ন।—এখন তুমি কি ?

উত্তর।—পরিচয় দিতে নাই। বেশ-দর্শনে—

প্রশ্ন।—হাঁ, হাঁ, বেশ-দর্শনে বেশ তোমারে চিনতে পাচ্ছি ; সন্ন্যাসী হয়ে কত দিন ?

উত্তর।—আড়াই বৎসরের কিছু বেশী, তিন বৎসরের কিছু কম।

প্রশ্ন।—সন্ন্যাসাশ্রমের কোন কোন ব্রত তুমি পালন কর?

উত্তর।—শিক্ষার অবস্থায় ব্রত স্থির বলা যায় না।

প্রশ্ন।—কত দিনে তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হবে?

উত্তর।—গুরুদেবের আজ্ঞায় পাঁচ বৎসরে।

প্রশ্ন।—কে তোমার গুরুদেব?—জটাধর তরফদার?

উত্তর।—জটাধর তরফদার গৃহী লোক, তিনি আমার গুরু নহেন, তিনি আমার একজন বন্ধু।

প্রশ্ন।—হাঁ. তিনি তোমার একজন বন্ধু! এই একটু পূর্ব্বে তুমি বোলেছ, জটাধর তরফদারকে তুমি চেনো না, এখন বোলছো. বন্ধু ; কোন কথাটা সত্য?

উত্তর।—আমি যখন গৃহী ছিলেম. তখন তিনি বন্ধু ছিলেন, এখন আমার এ আশ্রমে এক দীনবন্ধু ভিন্ন আর কেহ বন্ধু নাই। এখন আর আমি কোন মানুষকে বন্ধু বলি না. সেই জন্যই বোলেছিলেম, সে লোকটির নাম তুমি বোলছো, তাকে আমি চিনি না।

আদালতের সমস্ত লোক নিঃশব্দে হাস্য কোল্লেন, অবনতবদনে বিচার-পতিও মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেন। পূর্ব্বে আমি উকীলবাবুর কাছে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরেছিলেম, এই সময় সেই ভাবটা আমার মনে এলো ; দস্তুর-মত মধুমাড়া ব্যতিরেকে এ দুরাত্মার মুখে সত্যকথা বাহির করা যাবে না। পরোয়াণার হুলিয়ার সঙ্গে চেহারা মিলেছে. অমিল কেবল নেড়া মাথা, দাড়ী আর গেরুয়া-বসনের। হাকিম সে লোকটাকে অপরাধী বোলেই মনে মনে বুঝ-লেন। পূর্ব্ব আদেশ বলবৎ রেখে পুনর্ব্বার তিনি ঘনশ্যামকে হাজতে রাখবার হুকুম দিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে উকীলবাবুর সঙ্গে আমরা তাঁর বাসায় গেলেম। ঘনশ্যামের বজ্জাতি সম্বন্ধে রাত্রিকালে তিনি আমাদের কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা বোল্লেন। শীঘ্র ঐ লোকটার "একবার" পাওয়া কঠিন, রজনীবাবুর এইরূপ সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্তটি আমি উলটে দিলেম। আমি বোল্লেম. "বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু একবার করানো কঠিন হবে না। সেই যে কারখানাবাড়ীর কথা পূর্ব্বে আমি বোলেছি, সেই কারখানার দেওয়ানজীকে আর সেখানকার আরো জনকতক লোককে এইখানে হাজির কোত্তে পাল্লেই, ঐ বেশধারী বদমাসের সমস্ত বুজ-রুকী প্রকাশ হয়ে পোড়বে ; তা হোলেই যত কিছু পেটের কথা, তৎসমস্তই ঐ পাপাত্মাকে নিজমুখে স্পষ্ট স্পষ্ট স্বীকার কোত্তে হবে। কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়াও ভাল ; ঘনশ্যাম আপনার পাপ স্বীকার কোরবে, রক্তদন্ত ধরা পোড়বে. মোকদ্দমার বিচারে বেশ ঘটা হবে. উপস্থিত থেকে সেই ঘটা আমি স্বচক্ষে দর্শন কোরবো, এই আমার অভিলাষ। কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়াই ভাল। দীন-বন্ধুবাবুর সঙ্গে আমি একবার তীর্থদর্শনে যাব, এইরূপ স্থির আছে। ফিরে আসতে কত দিন লাগবে, তা আমি বোলতে পাচ্ছি না। আপনি ইতিমধ্যে ঘন-

শ্যামকে দোষ কবুল করাবার সব যোগাড়যন্ত্র ঠিকঠাক কোরে রাখবেন। যত শীঘ্র হয়, তত শীঘ্র আমরা ফিরে আসবার চেষ্টা পাব।"

এই সব কথা বোলে সেই কারখানাবাড়ীখানার ঠিকানা রজনীবাবুর একখানা খাতার পৃষ্ঠায় আমি স্বহস্তে লিখে দিলেম। রাত্রে আমরা রজনীবাবুর বাসাতেই থাকলেম ; পরদিন আহারাদির পর রজনীবাবু আদালতে গেলেন, আমরা নৌকাযোগে চোলে এলেম। আদালতে অভিনব নাট্যাঙ্কের যেরূপ অভিনয় হয়ে গেল, বাবুদের কাছে আমি সেই কথা গল্প কোল্লেম, অবশেষকালে অমরকুমারীকেও সকল কথা শুনালেম।

রবিবার অমরকুমারীকে আমি বোলেছিলেম, সপ্তাহের মধ্যে তীর্থযাত্রা করা হবে, সপ্তাহের মধ্যে হলো না। মঙ্গলবার বহরমপুর থেকে আমি বাড়ী এলেম, —দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীই তখন আমার বাড়ী, সুতরাং বাড়ী আসার কথাই বোলতে হয়,—মঙ্গলবার আমি বাড়ী এলেম, তার পর এক সপ্তাহ অতীত হয়ে গেল। অনন্তর একটি শুভদিন দেখে, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা কোল্লেম। সঙ্গে থাকলো দুজন চাকর আর একজন ব্রাহ্মণ।

অষ্টম কল্প

তীর্থ ভ্রমণ।

যে সময়ের কথা, সে সময়ে এ দেশে রেলওয়ে হয় নাই ; দেশপ্রচলিত অপরাবিধ যানবাহনে আমাদের যাত্রা। প্রথমে আমরা অগ্রবনে উপস্থিত হোলেম। অগ্রবন শব্দের অপভ্রংশ আগরা। যমুনানদী এখানে প্রবাহিত। প্রাকৃতিক শোভা মনোহারিণী। এক সময়ে এইখানে আকবর শাহের রাজপাট ছিল ; আকবরের নামানুসারে আগরার আর এক নাম আকবরাবাদ। মোগল-সমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন এখানে বিদ্যমান আছে। তাজমহল নামে প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইংরেজেরা জগতের সপ্ত আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে তাজমহলকে একটি আশ্চর্য্য পদার্থ বোলে গণনা করেন। যবনপ্রবাদে তাজমহলের দ্বিতীয় আখ্যা তাজবিবির রওজা। সম্রাট শাহজাহাঁর বেগমের নাম তাজবিবি ; সেই তাজবিবির সমাধিমন্দিরের নাম তাজমহল। তদানীন্তন সরকারী বিজ্ঞাপনীতে বর্ণিত আছে, তাজমহল নির্ম্মাণে ভারতরাজস্বের প্রায় বাইশ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। পৃথিবীর নানাস্থানের মহামূল্য প্রস্তর ও মণিমাণিক্যাদি রত্নে তাজমহল সুশোভিত। এখানকার লোকের মুখে শুনা গেল, পূর্ব্বে এই শোভাময় সমাধিমন্দিরের ভিতর বাহিরে যে সকল অকৃত্রিম মণিরত্ন খচিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে সে সকল আদিরত্নের অনেক অভাব দৃষ্ট হয় ; সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন, কিংবদন্তী এইরূপ। তাজমহল দর্শনে আমরা পরম প্রীতিলাভ কোল্লেম।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৃন্দাবনের পথের অগ্রবন এই আগরা। তিন দিন আগরায় বাস কোরে আমরা মথুরায় যাত্রা কোল্লেম। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা একটি মনোহর সহর। এখানে বিস্তর সুন্দর সুন্দর দেবালয় আছে। কোন কোন ইতিহাসে দৃষ্ট হয় ভারতের মুসলমান-দৌরাত্ম্যের সময় আর্য্যধর্ম্ম-বিদ্বেষী দুরন্ত মুসলমানেরা গোরক্তপ্রক্ষেপে মথুরার অনেক দেবালয় অপবিত্র বিগ্রহসহ অনেকগুলি দেবালয় ভেঙ্গে দিয়েছিল, পুরোহিতগণের নিগ্রহ কোরেছিল, নগরলুণ্ঠন এবং নগরবাসিগণের প্রতি অশেষ-বিধ দৌরাত্ম্য কোত্তেও ত্রুটি করে নাই ; তথাপি এখনো মথুরার শোভাদর্শনে চমৎকৃত হোতে হয়। ইতিহাস-প্রসঙ্গে শেঠবংশীয়েরা এখানকার প্রধান ধনী। মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এখানে খুব সস্তা ; বিশেষতঃ মালপোয়া। ময়দার প্রচলন এখানে অল্প, আটাতেই লুচি প্রস্তুত হয়। লুচি এখানে দুই রকম, —ভিতরে সুস্বাদু পুর দেওয়া লুচি একরকম, দেশপ্রচলিত সাধারণ ব্যবহার্য্য লুচি একরকম ; দুই প্রকার লুচিই তিন আনা সের ; ওজনের পরিমাণও কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী, ১২০ সিক্কায় সের এখানে প্রচলিত। দধি এখানে অত্যন্ত সস্তা ; আট-দশ সের-পূর্ণ বড় বড় হাঁড়ী খাসাদধির মূল্য ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই আনা।

মথুরায় আমরা সাধু-সন্ন্যাসী অনেক দেখলেম ; কতগুলি আসল, কতগুলি নকল, কতগুলি সাধু, কতগুলি ভণ্ড, বাহ্যলক্ষণ দর্শনে নিশ্চয় করা গেল না ; কিন্তু দেশের অবস্থা স্মরণে মনে করা গেল, ভণ্ডের সংখ্যাই অধিক। যাত্রিগণের প্রতি পাণ্ডাদের কোন প্রকার দৌরাত্ম্য নাই ; সামাজিক লোকেরাও সর্ব্বদা ফুল্লবদন, প্রিয়ম্বদ। মথুরাতেও আমাদের তিন দিন তিন রাত্রি বাস ; অনন্তর বৃন্দাবন।

দেশে আমি কোন কোন লোকের মুখে শুনেছিলেম, মথুরা থেকে যমুনা পার হয়ে বৃন্দাবনে যেত হয়, সেটা ভুল কথা ; যমুনাপারে গোকুল। যমুনার যে পারে মথুরা, সেই পারেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবন থেকে অক্রুরের রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণের মথুরার আগমন এ বিষয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ; যমুনার উপর দিয়ে রথ চলে নাই, এ কথাটা কোন লোককেই বুঝিয়ে দিতে হবে না।

আমরা বৃন্দাবনে প্রবেশ কোল্লেম। বৃন্দাবনের কুঞ্জ, দেবালয়, দেববিগ্রহ, বিবিধ বন, আর আর দর্শনীয় বস্তু, একে একে সমস্তই দর্শন করা হলো। একজন ব্রজবাসী একে একে নাম নির্দ্দেশ কোরে সমস্ত স্থান আমাদের দেখালেন। যমুনা কেলিকদম্ব, বংশীবট, রাসকুঞ্জ, নিধুবন, আমরা দর্শন কোল্লেম। বৃন্দাবনের যেরূপ মহিমা ও যেরূপ শোভা ছিল শুনা যায়, দর্শন কোরে সেরূপ আমরা কিছুই বুঝলেম না। বীরভূম থেকে যখন আমি প্রথমে কলিকাতায় আসি, সেই সময় আমার এক নূতন আশ্রয়দাতার বাড়ীতে পঞ্চ সন্ন্যাসীর মুখে যে একটি গীত আমি শ্রবণ কোরেছিলেম, সহসা সেই গীতটির গুটিকতক কথা আমার মনে এলো। বলা আছে, সেই সন্ন্যাসীরা ছিলেন কৃষ্ণ-সন্ন্যাসী ; গীত-

টিও কৃষ্ণ-মঙ্গল—উদ্ধার কৃষ্ণ-সংবাদ। কংসবধের পর কৃষ্ণভক্ত উদ্ধার বৃন্দাবন দর্শন কোরে মথুরায় ফিরে গিয়ে কৃষ্ণকে বোলেছিলেন,—

(কবির সুর)

"দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম,
কেবল নাম আছে।
সেথায় বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই ভ্রমর নাই,
জলে কমল নাই ;—
তোমার নিধুবন আঁধার হয়ে রয়েছে ॥

গীত এই রকম। এই গীতটি অনেক পরের রচনা। গোকুলের দুর্দ্দশার বিশেষ বিবরণস্থলে উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণকে বোলেছিলেনঃ—

"শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পায় ন স্পন্দতে,
মূকঃ কোকিলপঙ্ক্তয়ঃ শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
সর্ব্বে ত্বদ্‌বিরহানলেন সততং হা কৃষ্ণ! দৈন্যং গতাঃ,
করেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না-নেত্রাম্বুভির্বর্দ্ধিতে ॥"

অর্থ এই যে, গোকুলমণ্ডলী শীর্ণা, পশুকুল তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করে না, কোকিলেরা নীরব, ময়ূরেরা প্রেমানন্দে নৃত্য করে না, হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহানলে সকলেই দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণদৈন্য প্রাপ্ত, কেবল একমাত্র যমুনা কুরঙ্গাক্ষী গোপাঙ্গনাকুলের নয়নাম্বুধারে পরিবর্দ্ধিতা হইয়া উচ্ছ্বলিত হইতেছে।

গীতটিও যেমন, শ্লোকটিও সেইরূপ গোকুলমণ্ডলীর দৈন্যভাব প্রকাশ। বৃন্দাবন দর্শন কোরে গীতের আর শ্লোকের সার্থকতা আমি অনুভব কোল্লেম। বৃন্দাবনে আছে কেবল গুটিকতক পাষাণপ্রতিমা আর অন্ধকার বন! বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, বৃন্দাবন তখন সজীব ছিল, নির্ম্মল চন্দ্রালোকে আলোকিত ছিল, সেই বৃন্দাবন এখন কৃষ্ণশূন্য—বন অন্ধকার, সমস্তই যেন নির্জ্জীব! এখনকার বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের সেই বাল্যলীলার বৃন্দাবন বোলে অনুমান করা যায় না।

বৃন্দাবনের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীগোবিন্দজী। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, ঔরঙ্গজেবের ভয়ে গোবিন্দজী বৃন্দাবন পরিত্যাগ কোরে জয়পুরে আশ্রয় লয়েছেন। জয়পুরের মহারাজ আপন রাজধানীমধ্যে বিচিত্র নূতন মন্দির নির্ম্মাণ কোরে গোবিন্দজিকে ভক্তিভাবে প্রতিষ্ঠা কোরেছেন।

বৃন্দাবনে গোবিন্দের মন্দির আছে। মন্দিরের গঠন আমাদের দেশের শিবমন্দিরের ন্যায় ; সম্মুখে প্রশস্ত নাটমন্দির : উভয়ই প্রস্তরনির্ম্মিত ; মন্দিরে নিত্য পূজা হয়, ভোগ হয়, আরতি হয়, বন্দোবস্ত ভাল। অপরাপর দেবালয়েও নিত্য পূজা হয়ে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আরতির সময় দেবা-

লয়গুলির বড় শোভা হয়, বিস্তর নরনারীর সমাগম হয়ে থাকে। ব্রজবাসিনীরা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে না, যুবতীরাও অনাবৃতবদনে দেবালয়ে প্রবেশ করে। যাত্রী লোকেরা তাদের সঙ্গে আলাপ কোরে তুষ্ট হন।

দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভক্তিমান বড়লোকের এক একটি কুঞ্জ বৃন্দাবনে বিদ্যমান। লালাবাবুর কুঞ্জ তন্মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ। কুঞ্জে কুঞ্জে উৎসব হয়, বিবিধ সুস্বরে বাদিত্র বাদিত নয়, ব্যবস্থানুসারে অতিথিসেবাও হয়।

একটা কথা শুনা যায়, বৃন্দাবনে একক বাস নিষিদ্ধ ; স্ত্রীপুরুষের যুগলরূপে বাস কোত্তে হয়। এমন কি, একজন পুরুষ আপন কুঞ্জে রাত্রিকালে একাকী শয়ন কোরে আছে, এক একটি ব্রজবাসিনী বৈষ্ণবী লীলাচ্ছলে সেই কুঞ্জে প্রবেশ কোরে, সেই পুরুষের পার্শ্বে শয়ন করে। কুঞ্জশায়ী পুরুষ সেই বৈষ্ণবীর পরিচর্য্যায় প্রীত হয়। যাত্রীদলের মধ্যে কেহ কেহ এমন কথাও বলেন, আমি কিন্তু স্বচক্ষে সেরূপ লক্ষণ কিছুই দর্শন কোল্লেম না। অনেক কথাই অতিরঞ্জিত।

বৃন্দাবনে বানর অনেক। কিছু কিছু আহার না দিলে যাত্রী লোকের উপর বানরেরা বিশেষ উপদ্রব করে, জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে যায় ; অধিক কথা কি, কোন অদাতা যাত্রীর সঙ্গে টাকার তোড়া থাকলে, অতুষ্ট বানর সেই সকল তোড়া নিয়ে গাছে উঠে ; কখনো বা যমুনাকূলে বসে, টাকার থলির মুখ খুলে এক একটি টাকা দেখায়, যমুনাজলে নিক্ষেপ করবার ভয় দেখায় ; খাদ্যসামগ্রী প্রদান না কোল্লে এক একজনের দুই একটি টাকা যমুনার জলে ফেলেও দেয় ; খাবার দিলে আর কোন উৎপাত করে না। অল্পে সন্তুষ্ট ; দুটি ছোলা, দুই একটি কলা অথবা দুই একটি ফুলুরী কিম্বা দুটি দুটি কড়াইভাজা প্রদান কোল্লেই বানরগুলি বেশ বশীভূত থাকে।

সাহেবেরা বড় দয়ালু। সাধারণ লোকের মুখে বৃন্দাবনে বানরের দৌরাত্ম্যের কথা শ্রবণ কোরে জনকতক শীকারী সাহেবের হৃদয় বিগলিত হয়েছিল ; দয়াবশে যাত্রীলোকের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাঁরা বৃন্দাবনের বনে বনে বানর বধ কোত্তে আরম্ভ কোরেছিলেন। একে তাঁরা বীরপুরুষ, তার উপর প্রচন্ড আগ্নেয় অস্ত্রের প্রভাব, অনেকগুলি বানর তাঁদের বীরত্বপ্রভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। বৈষ্ণবতন্ত্রের বহুলোকের বিশ্বাসে বানরেরা রামদাস ; শীকারীর হস্তে রামদাসের অকালমৃত্যু-দর্শন ব্রজবাসিগণের অসহ্য হয়েছিল ; পাইকপাড়ার লালাবাবু সংসার পরিত্যাগ কোরে যখন বন্দাবনে কুঞ্জপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি বৈষ্ণবসন্ন্যাসীবেশে বৃন্দাবনেই বাস কোরেছিলেন ; সাহেবের হস্তে বানরবিনাশের কথা ব্রজবাসীরা তাঁকে জানায়, উচ্চক্ষমতাপ্রাপ্ত হাকিম লোকের কাছে দরখাস্ত কোরে, বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে, লালাবাবু বৃন্দাবনে বানরবধপ্রতিষেধক হুকুম বাহির করান ; তদবধি শীকারীগণের লোকহিতৈষিতায় বাধা পড়ে, রামদাসগুলির প্রাণরক্ষার উপায় হয়।

ঠাকুরদর্শন, গোবর্দ্ধনদর্শন, বনভ্রমণ, যমুনা-পূজা, যমুনা-স্নান এবং অপরাপর নিয়মিত কার্য্যগুলি আমরা যথারীতি সমাপন কোল্লেম। যমুনায় কচ্ছপ অসংখ্য; কচ্ছপের ভয়ে নূতন যাত্রীরা যমুনাস্নানে ভয় পান; যমুনা-স্নানের সময় আমাদের কোন প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই।

মথুরা-বৃন্দাবন দর্শনের পর আমরা জয়পুরে যাত্রা কোল্লেম। জয়পুর সহর অতি সুন্দর; অধিকাংশ স্থান রাজবাড়ীর সীমার অন্তর্গত। সহরের চতুর্দ্দিক প্রাচীরবেষ্টিত, প্রাচীরে সুবৃহৎ ফটক, রাত্রিকালে ফটক বন্ধ হয়। রাজবর্ত্মগুলি সুপ্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত সম্পূর্ণ ঋজুভাবে সংস্থিত। বর্ত্মের উভয়-পার্শ্বে শ্রেণীবন্ধ সমশীর্ষ অট্টালিকা; অতি রমণীয় শোভা! রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগে গোবিন্দজীর মন্দির। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজী জয়পুরে নব-প্রতিষ্ঠিত; নিত্য পূজা, নিত্য মহোৎসব। রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ফোয়ারা; গ্রীষ্মকালে সেই সকল ফোয়ারায় পৌরবর্গের জলকেলি হয়। প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে হাওয়া-মহল; রাজারানী প্রভৃতি সেই মহলে বায়ুসেবন করেন। গোবিন্দজীর মন্দিরের পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী, সেই পুষ্করিণীতে অনেকগুলি কুম্ভীর। সহরের শোভা দর্শনে দর্শকবর্গের নয়ন-মন বিমোহিত হয়ে থাকে। দূরে হোতে সহরটিকে যেন একখানি সুচিত্রিত ছবি বো'ল বোধ হয়; আগম-নির্গমের পথ গোলকধাঁধা সদৃশ। সমস্ত ইমারত ও মন্দিরাদি সুরঞ্জিত প্রস্তরনির্ম্মিত। কারুকার্য্য অতি চমৎকার। স্থপতিবিদ্যার এমন সুন্দর নিদর্শন প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। উদ্যানে উদ্যানে অসংখ্য ময়ূর; আকাশে মেঘোদয়ে সেই সকল ময়ূর যখন শিখা-কলাপ বিস্তার কোরে প্রেমপুলকে নৃত্য করে, তখনকার শোভা অতি অপরূপ। পশ্চিমের অনেক স্থানে বানর অনেক, কিন্তু জয়পুরে কিছু কম। তার মধ্যে মুখপোড়া হনুমান নাই।

জয়পুরের তিন ক্রোশ দূরে পর্ব্বতের উপর অম্বর সহর; এই সহরটি গিরিদুর্গে পরিবেষ্টিত, অম্বর সহরে মহারাজ মানসিংহের রাজধানী ছিল। এখানে যশোরেশ্বরী দেবীর এক মন্দির আছে, দেবী চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি। কিংবদন্তী এইরূপ যে, রাজা মানসিংহ যখন বাঙ্গালায় এসে রাজা প্রতাপাদিত্যকে বন্দী কোরে, বাদশাহ জাঁহাগীরের দরবারে দিল্লীতে নিয়ে যান, সেই সময় যশোরের যশোরেশ্বরী প্রতিমাখানিও আপন রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। আজিও সেখানে যশোরেশ্বরীর নিত্যপূজা হয়।

জয়পুরের পর আজমীর। আমরা আজমীরেই উপনীত হোলেম। জয়পুরের ন্যায় আজমীরসহরও প্রাচীরবেষ্টিত; এখানকার অট্টালিকাগুলিও অতি সুন্দর সুন্দর; এখানেও কারুকার্য্য-বৈচিত্র্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আজমীরে কতকগুলি জৈনমন্দির আছে। আজমীরের পাঁচক্রোশ দূরে পুষ্করতীর্থ; পুষ্করের চারিদিকে পাহাড়; দৃশ্য মনোহর। পুষ্করে কোটেশ্বর শিব ও ব্রহ্মাজীর দুটি মন্দির আছে; কোটেশ্বরকে কেহ কেহ কোতোলেশ্বর বলে; দ্বিতীয় নামটি প্রকৃত নামের অপভ্রংশ বোলেই বোধ হয়। ব্রহ্মা-

কুণ্ড নামে এখানে একটি কুণ্ড আছে, যাত্রীরা সেই কুণ্ডে স্নান কোরে দেব-দর্শন করেন ; আমরাও তাই কোল্লেম।

অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে সাবিত্রীপাহাড় ; পাহাড়ের উপর সাবিত্রীর মন্দির ; মন্দিরে সাবিত্রীদেবীর প্রতিমা ; মথুরার ধ্রুবমূর্ত্তির ন্যায় সেই প্রতিমাখানি ক্ষুদ্র ও সুন্দর। পাহাড়ের উপর সাবিত্রী-মন্দির। সাবিত্রী-মন্দিরে উপস্থিত হয়ে. চতুর্দ্দিক দর্শন কোরে, আমার বোধ হোতে লাগলো, আমরা যেন পর্ব্বত-মালা-বেষ্টিত এক গহ্বরমধ্যে প্রবেশ কোরেছি।

সাবিত্রী-পাহাড়ের পরেই আবু পাহাড়। সেই স্থান থেকেই আবুজী পর্ব্বত-শ্রেণী আরম্ভ। আবুপর্ব্বতের সংস্কৃত নাম অর্ব্বুদাচল। সে পর্ব্বতে বুদ্ধ-দেবের মন্দির আছে, জৈন-দেবতার বিগ্রহও অনেক আছে শুনা গেল ; সময়া-ভাবে আমরা আবু-শোভা দর্শনে গমন কোত্তে পাল্লেম না। নৈমিষারণ্য-দর্শনে দীনবন্ধুবাবুর অভিলাষ জন্মিল. পুষ্কর থেকে আমরা নৈমিষারণ্যে যাত্রা কোল্লেম।

গোমতীতীরে নৈমিষারণ্য। পুরাকালে এই স্থানে মুনি-ঋষিগণের আশ্রম ছিল ; ঋষির মুখে ঋষিগণ এই স্থানে ধর্ম্মকথা শ্রবণ কোত্তেন। একজন পাণ্ডা একটি স্থান নির্দ্দেশ কোরে আমাদের বোল্লে, "এই স্থানটি ব্যাসাশ্রম।" ব্যাসা-শ্রমের নিদর্শন-স্থানটিকে আমরা প্রণিপাত কোল্লেম। বাস্তবিক কোথায় কি ছিল. নিঃসংশয়ে এখন সেগুলি জানবার কোন উপায় নাই।

স্থানের আয়তন প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ। বহুদূরব্যাপী সুদৃশ্য প্রান্তর ; সেই প্রান্তরে নানা বর্ণের নানাজাতি কুরঙ্গ বিচরণ করে ; কুরঙ্গীগণের দূরে নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকেরা নেচে নেচে খেলা কোরে বেড়ায়। দৃশ্য অতি মনোহর। মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাদের আবাসকুটীর অনেক ; কতিপয় ইষ্টকালয়ও দৃষ্ট হয়। চতুর্দ্দিকে আম্রকানন ; আম্রবৃক্ষ অসংখ্য। দেখে দেখে আমি মনে কোল্লেম, নৈমিষকাননকে এখন প্রকৃতপক্ষে আম্রকানন বলা যেতে পারে। নৈমিষারণ্যে একটি দেবীমূর্ত্তি আছেন ; দেবীর নাম ললিতাদেবী ; শ্বেতপ্রস্তরের গঠন, দ্বিভুজা মূর্ত্তি। এখানকার সাধারণ লোকে ললিতাদেবীকে "ললতে মায়ী বলে। স্থানে স্থানে দুটি চারিটি সাধু-সন্ন্যাসী নয়নগোচর হয়।

নৈমিষারণ্য-দর্শনের পর আমরা যথাক্রমে লক্ষ্মৌ, হস্তিনা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পবিত্র পবিত্র পুণ্যক্ষেত্রগুলি দর্শন কোল্লেম।

যদিও তখন আমার বয়স অল্প, তথাপি পুরাণপ্রসিদ্ধ ঐ সকল পুণ্যস্থান সন্দর্শনে আর লোকমুখে বর্ণনা শ্রবণে আমার মনে এক প্রকার শোচনীয় ভাবের উদয় হলো। ভারতে এখন ইংরেজের অধিকার ; এই অধিকারের পূর্ব্বে যবনেরা প্রবলপ্রতাপে আমাদের এই আর্য্যবর্ষে রাজত্ব কোরে গিয়েছেন। যবনাধি-কারে দেশের অনেক দুর্দ্দশা হয়েছিল, কেবল রাজধানীগুলি ভিন্ন অন্য স্থানের শোভাবর্দ্ধনে অথবা পূর্ব্বশোভা-সংরক্ষণে মুসলমানেরা যত্নশীল ছিলেন না, অনেক লোকে এই কথা বলেন, এখনকার ইতিহাসেও ঐরূপ লেখা আছে। ইংরেজরা জগতের মধ্যে এখন সর্ব্বোচ্চ সভ্যজাতি, ভারতের মঙ্গলের নিমিত্ত

ভারতে ইংরেজের আগমন ; ঐশ্বর্য্যে, শোভায়, সভ্যতায় ভারত এখন সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী। ইংরাজরাজপুরুষেরা আমাদের এই রত্নপ্রসবিনী জননী ভারতভূমিকে দরিদ্রভূমি বোল্লেও, ইতিহাসের কথা অপ্রামাণ্য বোলে স্বীকার করা যায় না ; শোভাসমৃদ্ধিতে ভারতবর্ষ এখন অনেক পরিমাণে উন্নত, এইটি এখনকার ইতিহাসের কথা। বাস্তবিক ইংরেজের প্রসাদে এখন কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষ উন্নত, সেটি একটু চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যতগুলি স্থান আমরা দর্শন কোল্লেম, সেই সেই স্থানের প্রাচীন প্রাচীন লোকের মুখে শুনলেম, সেই সকল স্থানের পুর্ব্বশোভা ও পুর্ব্বগৌরব এখন কিছুই নাই ; সমস্তই বিমলিন, সমস্তই ধ্বংসপ্রায় ; কোথাও কেবল ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, কোথাও মহানগরী মহারণ্যে পরিণত, কোথাও কোথাও শোভাময়ী অট্টালিকার ভগ্নস্তূপে স্থানগুলি শোভাশূন্য, দুর্গম। প্রকৃতি যেন কি বিষাদে ম্রিয়মাণা ! দেশের রাজা যদি দেশের শোভাসংরক্ষণে অথবা পরিবর্দ্ধনে যত্নবান, তবে এ প্রকার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় কেন ? আমি বালক, আমি এই কথা বোলছি, এটা আমার ধৃষ্টতা, এমন যেন কেহ বিবেচনা না করেন। আরবের, পারস্যের, চীনের এবং পাশ্চাত্যজগতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারীরা ভারতভ্রমণে বহির্গত হয়ে, ভারতের অবস্থা দর্শন কোরে, ভারতের লোকমুখে পুর্ব্বাপর বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরে মর্ম্মান্তিক দুঃখপ্রকাশ কোরেছেন, ইহারও প্রমাণ বর্ত্তমান কালের ইতিহাস।

এ দেশে এখন সাধারণ কথার মধ্যে—উপমার মধ্যে—পরিতাপের কারণের মধ্যেই লোকমুখে উক্ত হয়ে থাকে, "সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই !"—এই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল, বাস্তবিক এই প্রকার অনেক। শ্রীকৃষ্ণবিরহে মথুরা শ্রীহীনা বৃন্দাবন শোভাশূন্য, দ্বারাবতী মলিন, যুধিষ্ঠিরবিরহে হস্তিনাপুরী অন্ধকার।

যে যে স্থানের গৌরবের প্রাচীন প্রসিদ্ধি, সেই সেই স্থানেরই আজকাল অবসন্ন দশা। বেশী দূর যেতে হয় না, সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীনগরের যেরূপ শোভাসমৃদ্ধি ছিল, আকবর-বিরহে সেই দিল্লীর এখন কিরূপ পরিণাম, যাঁরা দর্শন কোরেছেন, তাঁরাই তার সাক্ষী। স্থানগুলি আছে, স্থান কোথাও উড়ে পুড়ে যায় নাই ; কিন্তু অশোভার জন্য সেই সেই স্থানের গৌরব, সে শোভা আর নাই।

তবে একটা কথা আছে। কথায় কথায় কালের দোহাই দিতে হয় ; ভাঙ্গা-গড়া যেমন বিধাতার কার্য্য, কালের কার্য্যও সেই প্রকার। কাল সর্ব্বদা সর্ব্বগ্রাসী হয় না ; মহাপ্রলয়কালে সর্ব্বগ্রাস, অপরাপর সময়ে পতন আর উত্থান। এক সময়ে একটি স্থান সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠে, অন্য স্থান ধ্বংসে পরিণত হয়। বর্ত্তমানকালে ইংরেজ আমলে কলিকাতা নগরী শোভাসমৃদ্ধিশালিনী, পূর্ব্বে এই কলিকাতা অরণ্যময়ী ছিল। অধুনা ভারতের মধ্যে বাহ্য-শোভায় কলিকাতাই শ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডে রোম, গ্রীস, ইটালী, আর এখনকার ইংলণ্ড, এ বিষয়ের এক প্রমাণ।

কালের কার্য্য, আর প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যালোচনায় অধিক বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন মনে কোল্লেম। তীর্থদর্শনে যাওয়া হয়েছিল, অনেকগুলি তীর্থ দর্শন করা হলো, এই সময় আমাদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের অভিলাষ। সে অভিলাষ তখন পূর্ণ হলো না। দীনবন্ধুবাবু বোল্লেন, অযোধ্যানগরী একবার ভাল, কোরে দর্শন করা তাঁর ইচ্ছা, অতএব কুরুক্ষেত্রদর্শনের পর পুনরায় আমরা অযোধ্যায় যাত্রা কোল্লেম।

সরযূতীরে অযোধ্যা। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান। পাণ্ডারা এক একটি নিদর্শনস্থান আমাদের দর্শন করালে, একে একে আমরা স্থানগুলি দর্শন কোল্লেম, কিন্তু প্রাচীন আট্টালিকাদির কোন চিহ্ন নাই, সমস্তই নতুন। ভ্রাতৃচতুষ্টয় যে স্থলে ভূমিষ্ঠ হন, সেই সকল সূতিকাগার এবং রাবণবধের পর অযোধ্যায় প্রত্যাগত হয়ে রামচন্দ্র যে দিন হনুমান-ভোজন করান, সেই দিন সীতাদেবী স্বহস্তে রন্ধন-কার্য্য নির্ব্বাহ কোরেছিলেন, স্বহস্তে মসলা পেষণ কোরেছিলেন, সেই শিলখানি পর্য্যন্ত পাণ্ডারা আমাদের দেখালে ; দেখালে বটে, কিন্তু সমস্তই নূতন। পাণ্ডাদের মুখে শুনা গেল, প্রাচীন অট্টালিকার মধ্যে কেবল একখানি অট্টালিকা বিদ্যমান আছে, সেই অট্টালিকাখানি ত্রেতাযুগের নির্ম্মিত। হনুমানজী সেইখানে রাজা। হনুমানের প্রাসাদ অতি সুন্দর ; সমুচ্চ একতালাপ্রমাণ সোপানাবলী, তাহার উপর চকবন্দী মন্দির ; মন্দিরের চারিদিকে বারান্দা। মন্দিরমধ্যে রাজসিংহাসনে রাজবেশে হনুমানজী উপবিষ্ট ; অঙ্গে রাজভূষণ, মস্তকে রাজ-কিরীট। হনুমান-মন্ত্রে দীক্ষিত, উপাসক লোকেরা যখন হনুমানের পূজা করে, তখন সেই সকল লোকের দন্তে দন্তপেষণ ও অঙ্গভঙ্গী দর্শনে দর্শকমাত্রেরই পরম কৌতুক জন্মে। অযোধ্যায় বানর অসংখ্য ; হনুমানজীর প্রাসাদে লক্ষ লক্ষ বানর। আর একটি কৌতুক আছে। যখন কোন অথর্ব্ব বৃদ্ধ যষ্টি অবলম্বনে হনুমানদর্শনে যায়, কিঞ্চিৎ খাদ্যলাভের আশায় এক একটি বানর তখন সেই যষ্টির অগ্রভাগ ধারণপূর্ব্বক বৃদ্ধকে হনুমানজীর সমীপে নিয়ে উপস্থিত করে। খাদ্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হোলে বানরেরা দিব্য শান্তভাবে যাত্রীলোকের বশীভূত হয়ে থাকে।

সরযূনদী অতি প্রশস্তা : কলিকাতাবাহিনী ভাগীরথীর প্রায় তিনগুণ প্রসার। জল অগাধ ; কিন্তু তীর-ভূমি থেকে প্রায় অর্দ্ধমাইল পর্য্যন্ত অল্পজল ; সে জলে পূর্ণাবয়ব লোকের কটিদেশ পর্য্যন্ত মগ্ন হয়, স্নান করবার বিশেষ সুবিধা ; কর্দ্দমপরিশূন্য, উচ্চ নিম্ন অনুভূত হয় না, সমতল বালুকা স্তর ; যতদূর যাওয়া যায়, ততদূর বালী। সরযূ তীরেও বানরবানরী বিস্তর। যাত্রীরা হাতে কোরে খাদ্য-সামগ্রী দেখায়, বানর বানরীরা নির্ভয়ে মানুষের হাতে হাতেই সেই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে। বানরীদের কোলে ছোট ছোট শাবক থাকে, কেহ যদি দৈবাৎ সেই সকল শাবকের গাত্র স্পর্শ করে, তার আর নিস্তার থাকে না ; নখ-দন্তাঘাতে বানরীরা তার জীবনান্ত পর্য্যন্তও কোরে দেয়।

অযোধ্যাপুরী পরিদর্শনের পর আমরা ফৈজাবাদে উপস্থিত হই। ফৈজাবাদ সদর জেলা; জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হাকিমেরা ফৈজাবাদেই কাছারী করেন। ফৈজাবাদে দীনবন্ধুবাবুর কতিপয় পরিচিত লোক ছিলেন, তাঁদের অনুরোধে সেইখানে আমাদের কিছু বেশী দিন বিলম্ব হয়। তিন চারি মাস আমরা ফৈজাবাদে থাকি। তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ।

দশম কল্প

অরাজক উপদ্রব

পথে আসবার সময় একদিন আমরা একটা সরাইখানায় আশ্রয়গ্রহণ করি। সেই পান্থনিবাসে তখন অনেকগুলি লোক ছিলেন। কথায় কথায় তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। একজন আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা কোথায় যাবেন?" দীনবন্ধুবাবু উত্তর দেন, "কলিকাতায়।"

যিনি জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, তিনি বাঙালী; আলাপ-পরিচয়ে বুঝা হয়েছিল, লোকটি অতি ভদ্র। আমরা কলিকাতায় আসবো, সেই কথা শুনে একটু চিন্তা কোরে, তিনি বোল্লেন, "সাবধান, সাবধান!—পথ আজকাল বড় দুর্গম! লক্ষ্ণৌয়ের দিক দিয়ে যাবেন না; লক্ষ্ণৌ আজকাল মহা বিপদ-ক্ষেত্র! কোম্পানীর পলটনের সমস্ত সিপাহীই ক্ষেপে উঠেছে! সমস্ত শ্বেত মনুষ্য নির্ম্মূল করা তাদের সংকল্প! যদিও বাঙালীর উপর তাদের কোপ নাই, যদিও বাঙালীকে তারা শত্রু মনে করে না, কিন্তু বিশ্বাস কি? এখন তারা মোরিয়া। কোম্পানীর দলে যারা যারা থাকে, অনুদেশী হোলেও উন্মত্ত সিপাহীরা সহজেই তাদের ছেড়ে দিবে, এমন বোধ হয় না; অনেক বাঙালী ইংরেজ কোম্পানীর চাকরী করে; চাকরীর খাতিরে তারা হয় তো গুপ্তচরের কার্য্য কোত্তে পারে, সেই সন্দেহে বাঙালীর উপরেও তাদের নজর আছে। আপনারা লক্ষ্ণৌয়ের পথে যাবেন না!"

দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সে কি মহাশয়? অকস্মাৎ এমন কাণ্ড কেন ঘোটলো? অনেক দিন আমরা তীর্থভ্রমণ কোচ্ছি, এ কথা তো কোথাও শুনি নাই; সিপাহীরা অকস্মাৎ সাহেবের উপর ক্ষেপে উঠলো কেন? সাহেবের বেতনভোগী বিশ্বাসী সৈন্য তারা, সাহেবের মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিতেও তারা প্রস্তুত, অনেক যুদ্ধে অনেক সিপাহী প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েওছে, এ দেশী সিপাহীর বীরত্বে সাহেবেরা এদেশের অনেক যুদ্ধে জয়লাভ কোরেছেন, তাদৃশ প্রভুভক্ত সিপাহীরা অকস্মাৎ সাহেবের শত্রু হয়ে উঠেছে, হেতু কি?"

ভদ্রলোকটি বোল্লেন, "হেতু বড় অদ্ভুত! পলটনে এত দিন যে সকল বন্দুকের ব্যবস্থা ছিল, সে সকল বন্দুকের বদলে সাহেবেরা সম্প্রতি নূতন এক প্রকার বন্দুকের সৃষ্টি কোরেছেন ; সে বন্দুকের নাম রাইফেল বন্দুক ; আওয়াজ করবার সময় সেই সকল বন্দুকে চর্বী-সংযুক্ত টোটা ব্যবহার করা হবে, এই প্রকার এক জনরব। জনরবটা সত্য কি মিথ্যা, ঈশ্বর জানেন, কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্তী দমদমার বারিকের সিপাহীরা কার মুখে কি প্রকারে সেই জনরবটা শুনতে পায়, শুনেই এককালে জাতিনাশের ভয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠে। হিন্দু মুসলমান এককাট্টা। উভয় জাতিই একসঙ্গে ক্ষিপ্ত হবার হেতু এই যে, জনরবে প্রচার, হিন্দুর ব্যবহার্য্য টোটায় গভীর চর্ব্বী আর মুসলমানের ব্যবহার্য্য টোটায় শূকরের চর্ব্বী মিশ্রিত থাকবে, আওয়াজের সময় সেই সকল টোটা সিপাহীগণকে দন্ত দ্বারা ছেদন কোত্তে হবে। এই এক কথা। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু মুসলমানের আহার্য্য রুটীর আটাতে শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করা হোচ্ছে, এটাও এক জনরব। এই দুই কারণেই দুই জাতি সিপাহীই কোম্পানীর উপর ভক্তিশূন্য! ভয়ঙ্কর ব্যাপার! প্রথমে দমদমায়, তার পর বারাকপুরে অশান্তির উৎপত্তি। দাবানল যেমন বায়ু-সংযোগে প্রবল হয়ে দূরদূরান্তরে অরণ্যে অরণ্যে প্রজ্বলিত হয়, এই অশান্তি-হুতাশনও সেইরূপে চতুর্দ্দিকে প্রবল হয়ে উঠেছে। বারাকপুরের পর এককালে মিরাটে মহা বিদ্রোহ! ক্রমশঃ বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রবল-স্রোতে নরশোণিত প্রবাহিত হোচ্ছে। খবরদার, আপনারা লক্ষ্ণৌয়ের পথে যাবেন না। আমরা শুনেছি, কাণপুর এখনও ঠাণ্ডা আছে ; আপনারা অন্য পথ দিয়ে ঘুরে শীঘ্র শীঘ্র কাণপুরে গিয়ে উপস্থিত হোন, কাণপুরের গঙ্গায় তরণী আরোহণে গন্তব্য স্থানে গমন করুন ; বোধ হয়, সে পথে কোনপ্রকার বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হোতে পারে।"

শুনে আমাদের মনে মহাভয়ের সঞ্চার হলো ; ভয়ে ভয়ে উদ্বেগে উদ্বেগে সেই সরাইখানায় আমরা সে রাত্রি অতিবাহিত কোল্লেম ; পরদিন প্রভাতে আমাদের কাণপুর যাত্রা। সেই ভদ্রলোকটির পরামর্শানুসারে আমরা ক্রমাগত বক্র বক্র পথেই যেতে লাগলেম। তিন দিন পরে আমরা একটি স্থানে উপস্থিত হোলেম, স্থানের নাম কল্যাণপুর। সেখানকার কোন কোন লোককে জিজ্ঞাসা কোরে জানা গেল, ব্যাপার বড় ভয়ঙ্কর। যদিও কাণপুরে এখনো বিদ্রোহানল প্রবল হয়ে প্রজ্বলিত হয় নাই, কিন্তু আর বড় বিলম্বও নাই। একদিন আমরা কল্যাণপুরে থাকলেম ; একদিনের জন্যই নূতন বাসা। সেই বাসাতে একটি বৃদ্ধ লোক ছিলেন, রাত্রিকালে নির্জ্জনে দীনবন্ধুবাবু তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "একটা জনরবের উপর বিশ্বাস কোরে সিপাহীরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সাহেবেরা কি তাদের শান্ত করবার নিমিত্ত কোন উপায় অবলম্বন কোচ্ছেন না ?"

বৃদ্ধ উত্তর কোল্লেন, "শান্ত করবার চেষ্টা দূরে থাক, আত্মরক্ষার ব্যপদেশে তাঁরা বরং আরো প্রধূমিত অনলে আহুতি দান কোত্তে আরম্ভ কোরেছেন। উভয় পক্ষই মোরিয়া গ্রামদাহ, পল্লীদাহ, গৃহদাহ, অনবরত গোলাগুলীবৃষ্টি, চতু-

দিকে নররক্তপাত, হুলস্থূল কাণ্ড! কেহই প্রায় নিরাপদ নয়। তবে বাঙ্গালীর প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচারের সমাচার আমরা শুনি নাই।"

বৃদ্ধের মুখে আরো ভয়ানক ভয়ানক কথা আমরা শুনলেম ; পথে আসবার সময় স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভস্মস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, সেই সকল স্তূপ ঐ প্রকার গৃহদাহের সাক্ষী, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস দাঁড়ালো, ক্রমশই ভয় বাড়তে লাগলো ; কল্যাণপুরে নিরাপদে থাকবার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ স্থির কোরে দীনবন্ধুবাবু অতিশয় চিন্তাকুল হোলেন। একদিন একরাত্রি আমাদের কল্যাণপুরে বাস। সে রাত্র আমাদের নিদ্রা হয় নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। ঊষাকালে কি একটি কথা স্মরণ কোরে দীনবন্ধুবাবু আমাদের বোল্লেন, "আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়, প্রভাত হবার অগ্রেই এস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"

একদিনের বাসাভাড়া অগ্রেই শোধ কোরে দেওয়া হয়েছিল, ঊষাকালেই আমরা কল্যাণপুর পরিত্যাগ কোল্লেম। নবাবগঞ্জে উপস্থিত ; কাণপুরের অদূরেই নবাবগঞ্জ। সে সময় কাণপুরে যিনি কমিসেরিয়েট গোমস্তা ছিলেন, তাঁর বাসা ছিল নবাবগঞ্জে. দীনবন্ধুবাবুর সেটি জানা ছিল ; গোমস্তাবাবুর সঙ্গে দীনবন্ধুবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। নবাবগঞ্জে আমরা সেই বাবুর বাসায় উপস্থিত হোলেম। বাবু তখন বাসায় উপস্থিত ছিলেন না। অল্পমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হয়ে বাসার লোকেরা আমাদের অভ্যর্থনা কোরে বসালে। বাবু যখন বাসায় এলেন তখন আমরা আশামত আদরযত্ন প্রাপ্ত হোলেম। গোমস্তাবাবুর মুখেও আরো ভয়ংকর ভয়ংকর বৃত্তান্ত আমরা অবগত হোলেম। ভয় অবশ্যই বৃদ্ধি হয়েছিল, কিন্তু গোমস্তাবাবু আমাদের অভয় দিয়ে বোল্লেন. "কাণপুর এখনো অনেক পরিমাণে ঠাণ্ডা আছে, তাদৃশ ভয়ের বিষয় উপস্থিত নাই।" তিনি আরো বোল্লেন, "বৃদ্ধ হুইলর সাহেব এখন কাণপুরের সেনাদলের সেনাপতি ; পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল তিনি ভারতবর্ষে আছেন, সাময়িক বিভাগের কার্য্যে তাঁর বহুদর্শিতা বিলক্ষণ ; পলটনের অধিকাংশ সিপাহীই তাঁর বাধ্য আছে। সেই ভরসায় তিনি কাণপুরের গোরা সৈনিকগণকে নিরাপদরক্ষা কোত্তে পারবেন, এইরূপ বিশ্বাস রাখেন। সেনাপতি নীল এলাহাবাদে বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত সেনাগণের চিকিৎসায় ব্যতিব্যস্ত, নিজেও পীড়িত, শীঘ্র তিনি কাণপুরে উপস্থিত হোতে পাচ্ছেন না, হুইলরের উপরেই সমস্ত ভার। সাহেব-বিবিগুলিকে কোন নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা হুইলর সাহেবের ইচ্ছা। গঙ্গাতীরে ইংরাজ কোম্পানীর অস্ত্রাগার, ধনাগার এবং কারাগার ; সেনাপতির সহচরেরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, অস্ত্রাগারেই সপরিবার সাহেবদিগকে রক্ষা করা উচিত ; হুইলর সাহেব সে পরামর্শ সঙ্গত বোধ করেন নাই, গঙ্গার প্রায় এক মাইল দূরস্থিত এক প্রান্তরমধ্যে মাটির প্রাচীর দিয়ে ছাউনী প্রস্তুত করা হয়েছে ; ছাউনীর কতকগুলি ঘরে খড়ের চাল ; সৈনিকপুরুষের ইংরাজ-মহিলারা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-বালিকারা সেই ছাউনীমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কোরেছে, কেহই কিন্তু নিশ্চিন্ত নয়, সকলেই প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল। অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বারাণসী

প্রভৃতি স্থানে সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছিল. এ পর্য্যন্ত কোন স্থান থেকেই সাহায্য এসে পেঁছে নাই ; অল্প-সংখ্যক সৈন্য সাহায্যে হুইলর সাহেব আপাততঃ শান্তি-রক্ষার উপায়বিধানে বাধ্য। এ দিকে স্থানে স্থানে অবাধে অগ্নি-কাণ্ড চোলছে, সন্দেহে অসন্দেহে হিন্দুস্থানী লোকদিগকে গাছে গাছে লোটকিয়ে দিয়ে প্রাণবিনাশ করা হোচ্ছে, অধিবাসী লোকের গৃহলুণ্ঠন, নিধনসাধন করা হোচ্ছে, অশান্তির বিরাম নাই! সিপাহীরা তখনো পর্য্যন্ত কাণপুরে সৈনিক নিবাস আক্রমণে উদ্যত হয় নাই। আকাশে মেঘসঞ্চয় হয়েছে, কখন প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হবে সশঙ্ক-হৃদয়ে সকলেই আকাশপানে চেয়ে আছে ?”

এই প্রকার লোমহর্ষণ কাণ্ডের সমাচার আমরা শ্রবণ কোল্লেম। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ত্রয়োবিংশ দিবস। সে দিন আমরা নবাবগঞ্জেই অতিবাহিত কোল্লেম, পরদিন (২৪-এ মে) মহারাণী ভিকটোরিয়ার জন্মদিন। সেনাপতি হুইলর সেই উৎসবদিবসে দস্তুরমত তোপ-ধ্বনি বন্ধ কোরে দিলেন, কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বরে উৎসবের অনুষ্ঠান হলো না, সকলেই নীরবে মুহ্যমান অবস্থায় মহা-রাণীর জন্মোৎসবের দিবা-রজনী যাপন কোল্লেন। সেই উৎসবে সকলেই স্ফুর্ত্তিশূন্য।

কাণপুরের রণক্ষেত্র অথবা বিপদক্ষেত্র দর্শনের নিমিত্ত আমাদের কৌতূহল জন্মিল ; বাঙালীর প্রতি অত্যাচার হয় না, সেই ভরসায় আমরা কাণপুর-দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ কোল্লেম। গোমস্তাবাবু বোল্লেন, “ধৈর্য্য আবশ্যক।” দুই দিন আমরা ধৈর্য্য ধারণ কোরে থাকলেম। সেই সময় শুনা গেল. চতুর্দ্দিক থেকে দলে দলে বৈরনির্য্যাতনার্থী সিপাহীরাও কাণপুরে এসে জমা হোতে লাগলো, ইংরেজের অস্ত্রনিবাসের চারিদিকে দিবা-রাত্রি গোলাগুলী বর্ষিত হোতে লাগলো, “মার মার কাট কাট” শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ প্রায় শ্রুতিগোচর হলো না ; সকলেই বিপন্ন।

সেই বিপদসময়ে আর একটা নূতন কাণ্ড। মহারাষ্ট্রীয় বীর বাজীরাও পেশবার দত্তক পুত্র ধুন্ধুপন্থ নানা ; লর্ড ডালহৌসি বাহাদুর নানা সাহেবকে বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র বোলে স্বীকার করেন নাই, নানা সাহেব পেশবারপদ অধিকার কোত্তে পারেন নাই, তিনি মনে মনে অতিশয় ক্ষুন্ন ছিলেন, তথাপি বাহ্য-ব্যবহারে ইংরেজের সহিত বন্ধুত্বরক্ষণে তিনি বিরত ছিলেন না ; বিঠুরে নানা সাহেব রাজ-সম্মান প্রাপ্ত হোতেন, সময়ে সময়ে ইংরেজের সাহায্য কোত্তেন, ইংরেজেরা মধ্যে মধ্যে নানা সাহেবের প্রাসাদে আতিথ্যগ্রহণ কোরে বিশ্বস্তভাবে আপ্যায়িত হোতেন। উপস্থিত বিপদসময়ে নানা সাহেব সদলবলে কাণপুরে আসেন। কাণপুরের ইংরেজ ধনাগার তিনি নিরাপদে রক্ষা কোরবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। নানা সাহেবের কুটিল মন্ত্রী আজিমউল্লা খাঁ সে সময় নানা সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। গোপনে গোপনে তিনি নানা সাহেবকে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা দিতে থাকেন, বিদ্রোহী সিপাহীদলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করবার অনু-রোধ করেন ; নানা সাহেব প্রথমে আজিমউল্লার পরামর্শে সম্মত হন নাই, শেষে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। নানা সাহেবের ক্ষমতা অপেক্ষা

আজিমউল্লার ক্ষমতা অধিক ছিল। আজিমউল্লার হস্তে নানা সাহেব একটি ক্রীড়াপুতুল, এই কথাই প্রকাশ। দ্বিতীয় মন্ত্রী জোয়ালাপ্রসাদ। তিনিও সেই সময় কাণপুরে এসে যোগ দেন। নানা সাহেবের এক বাল্যসখা তাঁতিয়া তোপী ; তিনিও সেনাপতি টীকাসিংহের সহিত সেই ক্ষেত্রে মিলিত হন। নানা সাহেবের একদল সৈন্য আর দুটি কামান কাণপুরে এসে উপস্থিত হয়। হুইলর সাহেব জানতেন, নানা সাহেব ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বন্ধু। মনের ভিতর বিরাগানল প্রচ্ছন্ন থাকলেও বাস্তবিক নানা সাহেব ইংরেজের সঙ্গে সমান বন্ধুত্ব রেখে আসছিলেন ; আজিমউল্লার মন্ত্রণায় সেই বন্ধুত্ববন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হোতে তিনি বাধ্য হন। সাহেবেরা তখনো পর্য্যন্ত তার সে ভাবটা জানতে পারেন নাই।

মে মাস অতীত হয়ে গেল। জুন মাসের প্রথমে বিদ্রোহী সিপাহীরা একাংশে সংহারমূর্ত্তি ধারণ কোল্লে। মৃন্ময়-প্রাচীর-বেষ্টিত অভিনব আশ্রয় শিবির সিপাহী কর্তৃক আক্রান্ত ; দিবারাত্রি সেই শিবিরের উপর গোলাগুলী বৃষ্টি! ও দিকে ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়ে গেল! অস্ত্রাগারে অগ্নি-সংযোগ, কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটন, কারাগার ভগ্ন! কয়েদীরা কারামুক্ত হয়ে সিপাহী পক্ষে যোগ দিল। মহামারী ব্যাপার! সিপাহীরা বিদ্রোহী, এই কথায় অবিশ্বাস না কোল্লেও, সত্যের অনুরোধে বিশ্বাস কোত্তে হয় সমস্ত সিপাহীই সমভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হয় নাই। যে সকল বৃদ্ধ সিপাহীর হৃদয়ে অচল প্রভুভক্তি, নিমকের গুণস্মরণে যে সকল সিপাহীর হৃদয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ, সে সকল প্রভুভক্ত সিপাহী নিমকহারাম হয় নাই, অন্নদাতার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্রধারণ করে নাই। অধিক কি, উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতৃগণকে সৎপরামর্শ প্রদান কোত্তে গিয়ে, কেহ কেহ বা কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হয়ে, বিদ্রোহী সিপাহীর হস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছে। কোম্পানীর বেতনভোগী এতদ্দেশীয় অপরাপর কর্ম্মচারী, এমন কি, আয়ারা পর্য্যন্তও অবিচ্ছেদে প্রভুভক্ত ছিল ; সাহেবেরা কিন্তু বিপদকালে বিবেকপরিশূন্য হয়ে ভৃত্যবর্গের দোষগুণ বিচারের অবসর গ্রহণ করেন নাই ; কে দোষী, কে নির্দ্দোষ, বিচার না কোরে, দোচোখে ব্রতে কৃষ্ণবর্ণের উপর গুলীবর্ষণ কোরেছেন, খড়্গাঘাত কোরেছেন, প্রকাশ্য পথপার্শ্বে নিরীহ প্রাণিগণকে ফাঁসী দিয়েছেন। অপর পক্ষে, উদ্‌ভ্রান্ত সিপাহীরাও তদনুরূপ নিষ্ঠুর আচরণে বিরত হয় নাই। মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত ছাউনীতে অগ্নিদান কোরে নিরপরাধিনী ইংরেজকামিনীগণকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-বালিকাগুলিকে পশুর ন্যায় বলিদান কোরেছে!

মহামারী ব্যাপার! ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাণপুরের ভীষণ হত্যাকাণ্ড! এ সকল কাণ্ড স্মরণ কোত্তেও হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়। এই সময় এক প্রকার সন্ধির প্রস্তাব। আজিমউল্লা, জোয়ালাপ্রসাদ আর তাঁতিয়া তোপীর পরামর্শে নানা সাহেব ইংরেজ-সেনাপতিকে বোলে পাঠান, "লর্ড ডালহৌসির পররাজ্যগ্রাস ব্রতের পক্ষপাতী যাঁরা নন, সে কার্য্যে যাঁরা তাঁর সহায়তা করেন নাই, সেই সকল সাহেব আর উপস্থিত ব্যাপারে নৃসংশাচরণে যাঁরা নির্লিপ্ত আছেন, সেই সকল

সাহেব যদি কলিকাতায় যেতে ইচ্ছা করেন, সপরিবারে তাঁরা স্বচ্ছন্দে চোলে যেতে পারেন ; আমি তাঁদের নৌকা দিব ; উন্মত্ত সিপাহীরা তাঁদের উপর কোন অত্যাচার না করে, তৎপক্ষে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা যাবে।"

ইংরেজ-সেনাপতি সেই বাক্যের উপর বিশ্বাসস্থাপন কোরে স্থানীয় সিবিল মিলিটারী সাহেবদিগকে সেই কথা জানান ; প্রস্থানের জন্য অনেকেই প্রস্তুত হন ; উত্তেজিত সিপাহীরাও সাহেবের উপর গুলীবর্ষণে ক্ষান্ত থাকে। আমরা সেইদিন ঐরূপ শান্তি-সংবাদ অবগত হয়ে গোমস্তা মহাশয়ের সঙ্গে কাণপুর সহরে গমন করি। গঙ্গায় নৌকা আরোহণ কোরে আমরা কলিকাতায় যাব, দীনবন্ধুবাবুর এইরূপ অভিপ্রায়।

গঙ্গার দক্ষিণতীরে কাণপুর। প্রাচীন ইতিহাসে কাণপুরের নাম উল্লেখ নাই, কাণপুরের ততটা প্রসিদ্ধিও ছিল না। প্রবাদে শুনা যায়, পূর্ব্বে, কাণপুরের নাম ছিল অনুপসহর। অনুপচাঁদ নামে এক রাজা ছিলেন, সেই রাজার নামানুসারেই ঐ নাম। মোগলাধিকার সময়ে কাণপুর নাম প্রকাশ ; তদবধি কাণপুর একটি বাণিজ্যবন্দর হয়ে উঠে ; সেই কাণপুরে এই সময় ঐরূপ মহা-বিপ্লব! আমরা স্বচক্ষে উভয় পক্ষের ভীষণতর কাটাকাটি রক্তা-রক্তি দর্শন করি। যত নিকটে থাকলে বিপদের আশঙ্কা, তত নিকটে আমরা ছিলেম না, গোমস্তা মহাশয়ের আশ্রয়ে তফাতে তফাতেই আমরা অবস্থিতি কোরেছিলাম। গঙ্গার সতীচৌরঘাটে সাহেব যাত্রীদের জন্য নৌকা প্রস্তুত হয়েছিল ;—চল্লিশখানা নৌকা। খানকতক নৌকার ছত্রী প্রস্তুত ছিল, বাকী কয়েকখানার জন্য নূতন ছত্রী প্রস্তুত হোচ্ছিল। সাহেব-বিবিরা দলে দলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হোচ্ছিলেন, আমরাও সেই সময় আর এক ঘাটে আর একখানা নৌকা ভাড়া কোরে প্রস্থানের নিমিত্ত প্রস্তুত হই। সাহেবদের সমস্ত নৌকার ছত্রী সজ্জিত হবার পর, তাঁরা স্ত্রী-পুত্রাদি সমভিব্যাহারে সেই সকল নৌকায় আরোহণ করেন ; আমরাও আমাদের নৌকায় আরোহণ করি। আমরা পাঁচজন ;—দীন-বন্ধুবাবু, আমি, আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ আর দুই জন চাকর। আমাদের সঙ্গে দুই বস্তা নূতন কাপড় ছিল, সেই বস্তাদুটিও নৌকার উপর তুলে লওয়া হয়।

যে স্থানে আমাদের নৌকা সে স্থান থেকে সতীচৌরঘাট বেশ দেখা যায়। সাহেব-বিবিরা আরোহণ কোল্লেন, শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তাঁদের নৌকাগুলি গঙ্গার জলে ভাসলো, তফাৎ থেকে আমরা দর্শন কোল্লেম। গঙ্গায় তখন অধিক জল ছিল না ; ঠাঁই ঠাঁই বড় বড় চড়া ; চোলতে চোলতে এক একখানা নৌকা চড়ায় ঠেকে আটকে আটকে যায়, মাঝি-মাল্লারা ঠেলাঠেলি কোরে আবার ভাসায় ; এই প্রকার গতি। আমাদের নৌকাখানি তখনো ছাড়া হয় নাই। সাহেব-দের নৌকা খানিক দূরে গিয়েছে, আর কোন ভয় নাই বিবেচনা কোরে আরো-হীরা এক প্রকার আশ্বস্ত হয়েছেন তীরে জনকতক দর্শকলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারাও আশ্বস্ত, এমন সময় একদল সিপাহী হঠাৎ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে নৌকার উপর গুলীবর্ষণ আরম্ভ করে। ধূমে ধূমে ধূমাকার! নৌকার ভিতর পরিত্রাহি চীৎকার! রক্তস্রোতে গঙ্গা অনেকদূর পর্যন্ত রক্তবর্ণ দেখাতে

লাগলো। বৃদ্ধ, রুগ্ণ অসমর্থ আরোহিগণ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা আর বালক-বালিকারা প্রাণভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ কোল্লেন ; সমর্থ লোকেরা গঙ্গা-জলে ঝাঁপ দিতে আরম্ভ কোল্লে, তাঁদের উপরেও অবিশ্রান্ত গুলীবৃষ্টি! আর রক্ষার উপায় নাই, সব যায়, এই বিপদসময়ে গঙ্গাজলে সাঁতার দিতে দিতে গুটীকতক বিবি আর দুটি সাহেব আশ্রয়প্রাপ্তির আশায় আমাদের নৌকায় এসে উঠলেন। আমরা বাঙালী, আমাদের কাছে তাদের বিপদের আশঙ্কা ছিল না, সেটি তারা জানতে পেরেছিলেন, আমরাও যত্ন পূর্ব্বক আশ্রয় দিয়েছিলেম। দিনমানে হয় তো আমরা তাঁদের কোন উপকারে আসতে পাত্তেম না ; এই সব কাণ্ড যখন হয়, তখন সূর্য্যদেব অস্তে গিয়েছিলেন, সন্ধ্যা হয়েছিল ; সিক্ত-বস্ত্রাঙ্গ সাহেব-বিবিগুলি আমাদের নৌকায় এসে উঠলেন। অন্ধকারে রণো-ন্মত্ত সিপাহীরা হয় তো তাদের দেখতে পেলে না কিম্বা আমাদের নৌকা দূরে ছিল, বাঙালীর নৌকা, কতিপয় সিপাহী একবার সেখানে আমাদের দেখেও গিয়েছিল ; সুতরাং সে দিকে আর তারা ততটা লক্ষ্য রাখলে না ; আশ্রয়ার্থীরা এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে আমাদের নৌকায় আশ্রয় পেলেন। সিক্তবস্ত্রে বিবিগুলি কম্পিতকলেবরা, সাহেবরাও কম্পিত। কম্পের দুই কারণ ;—শীত আর ভয়।

দুই বস্তা কাপড় আমাদের সঙ্গে ছিল ; অন্য প্রয়োজনে সেই বস্ত্রগুলি দীনবন্ধুবাবুর খরিদ কোরে রেখেছিলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় তার কয়েকখানি অন্য কাজে লেগে গেল । ভালই হলো। বিলাতী পোষাকে কোন গতিকে ধরা পড়বার আশঙ্কা, সেই আশঙ্কা-নিবারণের আশায় প্রত্যুৎপন্নমতিপ্রভাবে দীনবন্ধুবাবু ধুতি-চাদর ও শাড়ী পোরিয়ে সেই আশ্রিত সাহেবগুলিকে বাঙালী সাজালেন। বেশ বিবর্ত্তনে শীঘ্র শীঘ্র ধরা পড়বার ভয়টা থাকলো না বটে ; তথাপি সাবধানতার জন্য দীনবন্ধুবাবু মাঝি-মাল্লাদের প্রতি সেই নৌকা-খানি বিপরীত দিকে চালাবার হুকুম দিলেন। নৌকা বিপরীত দিকে চোল্লো। ওদিকে সাদায় কালোয় মহাযুদ্ধ ; গোলাগুলী বর্ষণ কোত্তে কোত্তে তারা আমাদের চক্ষের অদৃশ্য হয়ে গেল।

অধিক রাত্রে আমাদের সেই নৌকাখানি আবার তীরে এসে গন্তব্যপথে বাহিত হোতে লাগলো। যে দুটি সাহেব জল মজ্জনের পর আমাদের নৌকায় এসে উঠেছিল, তাদের মুখে বিদ্রোহসংক্রান্ত আরো অনেক নূতন কথা আমরা শ্রবণ কোল্লেম। কথায় কথায় আমাদের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হোতে লাগলো। অরাজক অপদ্রব! রাজ্যেশ্বরী ভিকটোরিয়া সমুদ্রপারে দূরদেশে, ভারত ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইজারা, কোম্পানীর "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি বাহাদুর ভারতীয় অনেক রাজার রাজত্ব কোম্পানীর অধিকারভুক্ত কোরেছিলেন, কোম্পানীর নিকটে যশস্বী হয়েছিলেন ; কিন্তু সেই যশের পরি-ণামফল ভারতে উপস্থিত থেকে তিনি দর্শন-কোল্লেন না, আমাদের নৌকাস্থিত সেই সাহেব দুটি সেই কথা বোলে আক্ষেপ প্রকাশ কোল্লেন, দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন! বস্তুতঃ সেই খণ্ডপ্রলয়ের আসল হেতু যেখানেই থাকুক, টোটা-

কাটা জনরব আর আটা-ময়দায় হাড়ের গুঁড়া মিশাবার জনরব, এই উপস্থিত বিপদের উপলক্ষ্যে হেতু, সেইটিই সকলে সিদ্ধান্ত কোল্লেন। সেই সাহেব-দুটি আরো বোল্লেন সিপাহীদের বিজয়নিনাদ অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়েছিল, আজ দিল্লী গেল, আজ মিরাট গেল, আজ বারণাসী যায়, আজ এলাহাবাদ বিপদগ্রস্ত, সিপাহীমুখে এইরূপ আস্ফালন। মুসলমান সিপাহীরা মোগল-বংশের শেষ বাদশাহ বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারতেশ্বর বোলে ঘোষণা কোত্তে উদ্যত; তাঁতিয়া তোপীপ্রমুখ হিন্দু সিপাহীরা বিঠুরের নানা সাহেবকে ভারতের অধীশ্বর বোলে বিজয়পতাকা উড়াতে প্রমত্ত; শেষফল কি রকম দাঁড়াবে, সে তত্ত্ব কেবল সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্ববিধাতা পরিজ্ঞাত।

আমাদের নৌকা চোলেছে, অবিশ্রান্ত চোলেছে, বিপদক্ষেত্র অতিক্রম কোরে আমরা অনেক দূরে এসে পোড়লেম। দীনবন্ধুবাবুর ইচ্ছা ছিল, প্রত্যাবর্ত্তন-কালে একবার বৈদ্যনাথ তীর্থ দর্শন করা; যে স্থানে অবরোহণ কোল্লে বৈদ্য-নাথে যাওয়া যায়, সেই স্থানে আমরা নামলেন; সাহেব-বিবিরা সেই নৌকা-তেই কলিকাতাভিমুখে আসতে লাগলেন। আমরা তাঁদের জীবনরক্ষার হেতু হয়েছিলেম, তজ্জন্য তাঁরা, আমাদের ধন্যবাদ দিলেন; আমরা তাদের জীবন রক্ষা কোত্তে পেয়েছিলেম, তজ্জন্য আমরাও জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান কোল্লেম।

একাদশ কল্প

বৈদ্যনাথ

উপযুক্ত যানবাহনে নানা স্থান অতিক্রম কোরে আমরা বৈদ্যনাথ তীর্থে উপ-স্থিত হোলেম। বৈদ্যনাথের মন্দির অতি চমৎকার; আয়তনেও বিস্তৃত, উচ্চ-তাতেও শতাধিক হস্ত; তৃণভূমি প্রস্তরনির্ম্মিত, মন্দিরে অর্দ্ধহস্তপরিমিত লিঙ্গরূপী বৈদ্যনাথজী বিরাজিত। প্রধান মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ আরো অনেক মন্দির, মন্দিরে মন্দিরে অনেক ঠাকুর। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়। বৈদ্য-নাথের মন্দিরের অতিনিকটেই শিবগঙ্গা, চারিদিকেই পাথরে বাঁধা সোপানাবলী, সকলেই সেই সোপানে বোসে স্নানাহ্নিক করে।

বৈদ্যনাথের অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটি ভদ্রলোকের একখানি বাড়ীতে আমরা বাসা গ্রহণ কোল্লেম। সে বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর, ভাড়াটিয়া বাড়ী, আমরা তিনটি ঘর ভাড়া নিলেম। অপরাপর ঘরগুলিতে তখন অন্যান্য লোক ছিল, তারাও যাত্রী। পাঁচ দিন আমরা বৈদ্যনাথে থাকলেম। আমাদের বাসাঘরের পার্শ্বে একটি ঘরে দুটি ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হলো; আমিও তাঁদের ঘরে যাই, তারাও আমাদের ঘরে আসেন। একদিন তাঁদের দু-জনকে আমি নিমন্ত্রণ কোল্লেম; রাত্রিকালে নিমন্ত্রণ, সন্ধ্যার পর তাঁরা এলেন,

দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে পূর্ব্বেই পরিচয় হয়েছিল, ভোজনের পূর্ব্বে নানা প্রসঙ্গের গল্প চোলতে লাগলো। যে দিন আমরা সেই বাসায় যাই, তার পূর্ব্বদিন তাঁরা এসেছিলেন। কোথায় তাদের বাড়ী, ইত্যগ্রে জানা হয় নাই, সেই দিন—যে দিন আমাদের বাসায় তাদের নিমন্ত্রণ, সেই দিন সে পরিচয়টিও আমরা জানলেম। তাঁরা বাকিপুরে থাকেন। একজনের নাম কৃষ্ণলাল দত্ত, একজনের নাম সুশীল-চন্দ্র বসু ; উভয়েই কায়স্থ।

নানা প্রকার গল্প হোচ্ছিল, মানুষের মরা-বাঁচার কথা উঠেছিল, আত্মহত্যা, অপঘাত মৃত্যু, অকস্মাৎ মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক চোলছিল, সেই সময় মুখখানি একটু কাঁচু-মাচু কোরে সুশীলবাবু হঠাৎ বোলে উঠলেন, "আহা ! লোকটি বড় ভাল ছিল। গ্রহের ফেরে কখন কি রকমে কার কি দশা ঘটে, কিছুই বলা যায় না, সমস্তই বিধাতার ইচ্ছা ; অকস্মাৎ অপমৃত্যু !"

একটু যেন চমকিতভাবে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে সসংশয়ে কৃষ্ণলাল বোল্লেন, "হয়ে গিয়েছে না কি ? আহা হা ! বড়ই দুঃখের বিষয়, বড়ই দুঃখের বিষয় ! ঠিক তুমি শুনেছ না কি ?—কৈ, আমাকে তো বল নাই ? কবে হয়ে গেল ?"

সুশীলবাবু বোল্লেন, "না, না, অমন অমঙ্গলের কথা বোলো না, আছেন এখনো, কিন্তু সসেমিরা ; ডাক্তারেরা বোলছেন, জীবন সঙ্কটাপন্ন। মুখে এখনো কথা আছে, কিন্তু গতিক ভাল নয়।"

বাবু-দুটির মুখপানে চেয়ে, সন্দেহক্রমে দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কে মহাশয় ! কার কথা আপনারা বোলছেন ? কার অপমৃত্যু ?"

সুশীলবাবু বোল্লেন, "আপনারা চিনবেন না,—সে একটি লোক,—খুব বড়-লোক, সম্প্রতি রাজা হয়েছিলেন, বেশ লোক, বর্দ্ধমানে নিবাস, পাটনাতেই থাকতেন, আমাদের সঙ্গে আলাপ ছিল, বেশ লোক।"

"সম্প্রতি রাজা হয়েছিলেন, বর্দ্ধমানেই নিবাস, পাটনাতেই থাকতেন," এই তিনটি কথা শুনে কি জানি কেন, আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ এলো, কি জানি কেন, হঠাৎ আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হলো, কি জানি কেন, উতলা হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "লোকটির নাম কি মহাশয় ?"

"মোহনলাল ঘোষ।"—সবে মাত্র সুশীলবাবু ঐ নামটি উচ্চারণ কোরেছেন, আমি বোসে ছিলেম, বাবুদের মুখের দিকে চাইতে চাইতে চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেম ; দাঁড়িয়েই আবার তখনি দীনবন্ধুবাবুর মুখের দিকে চাইলেম ;—দেখলেম, তাঁর মুখেও বিলক্ষণ বিস্ময়লক্ষণ। আমি যেন বিভ্রান্ত হোলেম ; অর্দ্ধ-অবরুদ্ধ স্বরে সুশীলবাবুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি হয়েছে মহাশয় ? ঘটনাটি কিরূপ ? জীবন সঙ্কটাপন্ন বোলছেন, রকমটা কি ?"

আমার মনের ভাব সুশীলবাবু কিছুই বুঝলেন না, তাঁদের কাছে আমি নূতন পরিচিত সংবাদটা শুনে আমি কেন তেমন উতলা হয়ে ঘটনা জানতে চাই, সে দিকে মনোযোগ না রেখে তিনি বোলতে লাগলেন, "ঘটনাটা দৈব-ঘটনা।

কোন ব্যারাম ছিল না, সুস্থ শরীর, অকস্মাৎ প্রাণ যায়। তিনি একটা স্ফূর্ত্তি-খেলার টিকিট কিনেছিলেন, গুটিকাপাতে তাঁর নাম উঠেছে, বাজীতে তাঁর জিত হয়েছে—লক্ষ টাকা লাভ। একদিন বৈকালে একখানা ডাকের চিঠিতে সেই সংবাদ তিনি পান ; চিঠিখানা হাতে কোরে মহোল্লাসে বৈঠকখানার সম্মুখের ছাদে ঘন ঘন পদবিক্ষেপে তিনি পাইচারী কোচ্ছিলেন, আহ্লাদে অন্যমনস্ক, যে ধারে তাঁর পরিক্রমণ, ছাদের সে ধারে আলসে ছিল না। পাইচারী কোত্তে কোত্তে অসাবধানে পা-পিছলে এককালে তিনি দশহাত নীচে পতিত হন। নীচে কতকগুলো প্রস্তরখণ্ড কাঁড়ি করা ছিল, সেই পাথরের উপরেই তিনি পড়েন, পোড়েই অজ্ঞান। লোকেরা ধরাধরি কোরে তারে তুলে নিয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হয়, ডাক্তারেরা পরীক্ষা কোরে বলেন, 'ঠাঁই ঠাঁই অস্থি ভগ্ন হয়েছে, পাকস্থলীতে আঘাত লেগেছে, প্রাণরক্ষা হওয়া ভার। শরীরের ঠাঁই ঠাঁই ক্ষত-বিক্ষত, রক্তপাত, মাথার একটা ধার ফেটে গিয়েছে, সাংঘাতিক আঘাত।' দশ-দিনের কথা। যে অবস্থা আমি দেখে এসেছি, বাঁচবার সম্ভাবনা নাই, উইল পর্য্যন্ত লেখাপড়া হয়ে গিয়েছে।"

কথাগুলি শুনতে শুনতে সহসা আমার চক্ষে জল এলো, বুকের ভিতর কম্প এলো। আমার চক্ষের জল কেহ দেখতে না পান, সে জন্য সাবধান হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, হস্তদ্বারা নেত্র মার্জ্জন কোল্লেম ; কারণ বুঝতে পাল্লেম না, রাজা মোহনলালের জন্য আমার প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হয়, মনে মনে সেই চিন্তা কোল্লেম : সাবধান হোলেম বটে, তথাপি আমার মুখের ভাব দেখে সুশীলবাবু ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থাকলেন—কি তিনি বুঝলেন, বোলতে পারি না, কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ কোরে আমারে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "রাজা মোহনলাল ঘোষ বাহাদুরকে কি তুমি জানতে ? তাঁর সঙ্গে কি তোমার দেখা শুনা ছিল ? তাঁর সঙ্গে তোমার কি কোন সম্পর্ক আছে ? তাঁর বিপদের কথা শুনে তোমার মুখের ভাব এমন হলো কেন ?"

শুষ্কনয়নে সুশীলবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে সম্ভবমত শান্ত-স্বরে আমি উত্তর কোল্লেম, "না, এমন কিছু নয়, তবে কি না, তাঁরে আমি দেখেছিলেম, তাঁরে আমি জানি, সম্পর্ক এমন কিছুই না ; তবে কি না, লোকের বিপদবার্ত্তা শ্রবণ কোল্লে আমার মন ব্যাকুল হয় ; এই রকম আমার স্বভাব ; পরের বিপদে আমি বড়ই কাতর হই ; সেই জন্যই আমার—"

আর আমি কিছু বোলতে পাল্লেম না, অন্য দিকে মুখ ফিরালেম। সেই সময় দীনবন্ধুবাবু যেন চমকিতনয়নে আমার মুখপানে চাইলেন। তাঁর মনের ভাবটাও আমি কতক কতক বুঝতে পাল্লেম। সে প্রসঙ্গে তখন আর কোন কথা উপস্থিত না হয়, এইরূপ ভাব দেখিয়ে তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন কোল্লেন। কথাটা চাপা পোড়ে গেল। তাঁদের মনে চাপা পোড়ে যেতে পারে, আমি চাপতে পাল্লেম না, আমার মনের ভিতর কিন্তু ধিকি ধিকি আগুন জ্বোলতে লাগলো।

আধঘণ্টা পরে আহারের আয়োজন। সকলে আহার কোল্লেন ; আমিও তাঁদের সঙ্গে আহার কোত্তে বোসলেম, কিন্তু আমার আহার করা কেবল নাম মাত্র। চিত্ত কেমন উদাস। কেন এমন হলো, ঠিক আমি কিছু অবধারণ কোত্তে পাল্লেম না।

আহারান্তে অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর বাবু দুটি আপনাদের বাসাঘরে প্রবেশ কোল্লেন. বিষন্নবদনে আমি দীনবন্ধুবাবুর কাছে বোসে থাকলেম।

দ্বাদশ কল্প

প্রায়শ্চিত্ত ;—ভয়ংকর রহস্যভেদ!

ঘরে তখন কেবল আমি আর দীনবন্ধুবাবু ; চাকরেরা পর্য্যন্ত নিকটে ছিল না। কিঞ্চিৎ উত্তেজিতস্বরে দীনবন্ধুবাবুকে আমি বোল্লেম, "জয় বাবা বৈদ্যনাথ! প্রভাতে আর বৈদ্যনাথ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘোটবে না! রাজা মোহনলালের আসন্নকাল ; এখনো তিনি বেঁচে আছেন শুনলেম, এখনো তাঁর রসনায় বাক্য আছে শুনলাম, যত শীঘ্র পারি এই সময় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার নিতান্ত আবশ্যক। তারে আমি যত দূর জানতে পেরেছি, তিনি আমার জীবনের সমস্ত কষ্টের মূলাধার, সেই জানাতেই তাও আমি বেশ বুঝেছি ; যদিও বুঝেছি, তথাপি দেখবার জন্য একান্ত বাসনা হোচ্ছে। তিনি মরুন এমন কামনা আমার নয়, তবুও ডাক্তারেরা বোলেছেন, জীবনের আশা নাই। আমার মনে হোচ্ছে, এই দেখাই আমার শেষ দেখা। আসন্নকালে একবার দেখা কোরে তাঁর মুখে শেষকথাগুলি আমি শুনবো, এই আমার অভিলাষ। কে যেন আমারে বোলে দিচ্ছে, এইবার শেষদর্শনেই আমার একটি আশা পূর্ণ হবে ;— আমার প্রকৃত পরিচয় আমি জানতে পারবো। আপনি পঞ্জিকার দিনক্ষণের নিতান্ত পক্ষপাতী, আমিও তাই ; ঘটনাগতিকে সর্ব্বদা কিন্তু আমি পঞ্জিকার সঙ্গে পরামর্শ করবার অবকাশ পাই না ; এবারেও ঘোটলো না। ঊষাযাত্রায় দিনক্ষণ গণনা করবার প্রয়োজন হয় না, আজ ঊষাকালেই আমাদের যাত্রা করা কর্ত্তব্য। উজানে যাত্রা ; বৈদ্যনাথের উত্তরে পাটনা ; পাটনায় ফিরে যাব।"

দীনবন্ধুবাবু বোল্লেন, "আমিও তাই মনে কোরেছি। মোহনলাল যদি মুমূর্ষুকালে কপটতা পরিত্যাগ করেন, তোমার আশা পূর্ণ হোতে পারে, এইরূপ আমার অনুমান ঊষাকালেই যাত্রা করা স্থির।

একপক্ষের বাড়ীভাড়া অগ্রে জমা দিয়ে বাসা লওয়া হয়েছিল, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আর প্রয়োজন হলো না, বাসার লোকগুলির মধ্যে শেষরাত্রে যাঁরা জাগরণ কোরে ছিলেন, হঠাৎ প্রয়োজনের কথা তাঁদের জানিয়ে রেখে,

উষাকালেই আমরা দেওঘর পরিত্যাগ কোল্লেম। দেওঘরের বিশুদ্ধ নাম দেবগড়। দেবগড়ের দেবপ্রধান বাবা বৈদ্যনাথ ; উদ্দেশে বৈদ্যনাথকে প্রণাম কোরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা দেবগড়ের সীমা ছাড়িয়ে পোড়লেম। যথাসময়ে পাটনায় উপস্থিত।

রাজা মোহনলালের বাড়ী। পূর্ব্বে যখন আমি এই বাড়ীতে এসেছিলেম, বাড়ীর শোভা তখন হাস্যময়ী ছিল। সে শোভা এখন তিরোহিত, সে হাস্যও এখন তিরোহিত। বাহিরে দাঁড়িয়েই আমি দেখলেম, দেয়ালে দেয়ালে, স্তম্ভে স্তম্ভে, গবাক্ষে গবাক্ষে, বর্ণে বর্ণে ঘোর বিষাদমাখা!—বাড়ীখানা যেন কাঁদছে! আমার সর্ব্বগাত্র কণ্টকিত!

আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। বাড়ীখানা নীরব। লোকেরা এ দিকে ওদিকে, মন্দগতিতে যাওয়া আসা কোচ্ছে, সকলেই ম্রিয়মাণ, প্রায় সকলেই নিস্তব্ধ; দুই একজন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ফুস্‌ফুস্‌ কোরে দুটি একটি কথা কোচ্ছে, এক একবার যেন ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ বিষণ্ণনেত্র সঞ্চালন কোচ্ছে। কোন ঘরে রাজা, কাহাকেও আমরা সে কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেম না ; নীরবে ধীরে ধীরে বারান্দাপথে অগ্রসর হোচ্ছি, সম্মুখে সেই দেওয়ানজী। একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আর একটা ঘরের দিকে তিনি আসছিলেন, সম্মুখে আমাদের দেখেই হঠাৎ তিনি দাঁড়ালেন : চকিতনয়নে আমার মুখের দিকে চেয়েই তিনি চোমকে উঠলেন। দেখা হোলেই কিছু বোলতে হয়, ম্লাননয়নে আমার ম্লাননয়ন নিরীক্ষণ কোরে, ম্লানবদনে তিনি আমারে বোল্লেন, "এসো হরিদাস! কতক্ষণ?"—ম্লানবদনে আমিও অতি সংক্ষেপে উত্তর কোল্লেম, "এই মাত্র।"

অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে দেওয়ানজী মহাশয় স্তম্ভিতবচনে পুনরায় আমারে বোল্লেন, "বড় বিপদ! রাজা বাহাদুর শয্যাগত!"

এই অবসরে দীনবন্ধুবাবু তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কোন ঘরে?"—মুখে কোন উত্তর না দিয়ে, আমাদের সঙ্গে কোরে তিনি একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ঘরে প্রবেশ কোরেই আমি কেঁপে উঠলেম! একখানি খট্টার উপরে রাজা বাহাদুর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত, কেবল মুখখানি জাগছে। পার্শ্বে পাঁচটি লোক বিমর্ষবদনে নিঃশব্দে বোসে আছে।

খট্টার পার্শ্বে শতরঞ্চ ঢাকা একখানি চৌকী, শতরঞ্চের উপর আমি বোসলেম। একটি তাকিয়া আমি সম্মুখদিকে সোরিয়ে দিলেম, দীনবন্ধুবাবু বোসলেন রাজার পার্শ্বে যে পাঁচটি লোক উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি বুঝলেম, সে সকল মুখ পূর্ব্বে আমি দেখি নাই। তাঁদের মধ্যে দুজন ডাক্তার, তাও আমি অনুভবে অবধারণ কোল্লেম। কেন না, রাজার মুখের কাছে হেঁট হয়ে অঙ্গুলীর দ্বারা তাঁরা এক একটি স্থান টিপে টিপে দেখছিলেন, একজন একবার এক জায়গার একখানি পটি তুলে অন্যপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থার কথা তাঁর সঙ্গী লোকটিকে বোলছিলেন ; তাতেই আমি বুঝলেম, তাঁরা ডাক্তার। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা আমার নীরোগ শরীরের—নীরোগ-

চিত্তের অদ্ভুত চিকিৎসার ভূমিকা কোরেছিলেন, যাঁরা আমারে অদ্ভুত চিকিৎসালয়ে রেখে এসেছিলেন, সে দুটি ডাক্তারকে সেখানে আমি দেখলেম না।

রাজার মুখখানি ঠাঁই ঠাঁই ফুলেছিল। কপালের দক্ষিণ দিকটা অত্যন্ত স্ফীত। দক্ষিণ চক্ষুটি প্রায় দেখা যায় না। সেই দিকে আমি চেয়ে আছি, রাজার বাম-চক্ষুটি সেই সময় আমার দিকে নিক্ষিপ্ত। ঠোঁট দুখানি অল্প অল্প কেঁপে উঠলো ; কি যেন বোলবেন বোলবেন ইচ্ছা, ভাবে আমি এইরূপ বুঝলেম ; কিন্তু একটি কথাও তিনি বোলতে পাল্লেন না। বামচক্ষে কপালবাহীয়া অশ্রু ; দক্ষিণ চক্ষুটি প্রায় অদৃশ্য, সেই চক্ষের কোণেও অশ্রুধারা। দেখে আমার বড় কষ্ট হলো।

পার্শ্বের পাঁচটি লোকের দিকে একরকম চক্ষুভঙ্গী কোরে, ধীরে ধীরে রাজা একবার একখানি হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক বক্র অঙ্গুলীগুলি সঞ্চালন কোল্লেন। ভাবটা আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পাল্লেম না। অব্যবহিত পরেই লোকগুলি সেখান থেকে উঠে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ; তখন আমি বুঝলেম, সেই জন্যই ঐরূপ সঙ্কেত। একজন চাকর সেই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। তার দিকে চেয়েই রাজাবাহাদুর আর এক প্রকার সঙ্কেত কোল্লেন। চাকর হয় তো সে সঙ্কেতের মর্ম্ম বুঝতে পাল্লে, নীরবে প্রবেশ কোরেছিল, নীরবেই বেরিয়ে গেল। একটু পরেই দেওয়ানজীর প্রবেশ। রাজার বামহস্তের নিকটে দেওয়ানজী উপবিষ্ট। রাজা তখন বামচক্ষুটি আমার দিকে ফিরিয়ে আহ্বানের সঙ্কেতে দক্ষিণহস্তের পঞ্চাঙ্গুলী কম্পিত কোল্লেন। দীনবন্ধুবাবুর দিকে চেয়ে রাজার বিছানায় গিয়ে আমি বোসলেম : অতি নিকটে গিয়েই বোসলেম। আমার বুক কাঁপতে লাগলো। রাজার চক্ষেও জল, আমার চক্ষুও সজল। রাজার চক্ষু একবার দেওয়ানজীর দিকে ঘুরে এলো। নিজের লোকগুলিকে তিনি সোরে যাবার ইঙ্গিত কোরেছিলেন, তাঁরা গেলেন ; দীনবন্ধুবাবু থাকলেন, তাঁরে তিনি দেখতে পেলেম কি না, সে দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল কি না, বোলতে পারি না ; কিন্তু একনয়নে রাজা কেবল আমার মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন। দীনবন্ধুবাবুকে তিনি চিনতেন না, দীনবন্ধুবাবুও তাঁকে চিনতেন না ; আমি যখন বাতুলালয়ে ছিলেম, আমার অন্বেষণের জন্য দীনবন্ধুবাবু যখন এই বাড়ীতে এসেছিলেন, সেই সময় একবার উভয়ে উভয়কে দেখেছিলেন, সে কেবল দেখা মাত্র, পরিচয় হয় নাই ; চিনতে পারা অসম্ভব।

দীনবন্ধুবাবু সেই ঘরে থাকলেন। রাজা আর একবার দেওয়ানজীর দিকে চেয়ে কি একপ্রকার ইঙ্গিত জানালেন ; দেওয়ানজী মহাশয় শয্যার উপর থেকে নেমে এসে, গৃহের সমস্ত দ্বারগবাক্ষ বন্ধ কোরে দিলেন, গৃহ অন্ধকার না হয়, সেই জন্য কেবল একটি গবাক্ষ খোলা থাকলো। দেওয়ানজী পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে এসে বোসলেন।

সজলনয়নে রাজার মুখপানে আমি চেয়ে আছি রাজা কষ্টে একবার বামকর্ণে ভর রেখে, অতি কষ্টে একটু কাত হোলেন। বোধ হয়, কোন প্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হলো, যন্ত্রণাব্যঞ্জক একপ্রকার অস্ফুটধ্বনি কোরে বামচক্ষুটি

তিনি মুদিত কোল্লেন। মুদিত নেত্রে বিগলিত অশ্রুধারা! "অল্পক্ষণ সামলে, সেই চক্ষুটি উন্মীলন কোরে, আমার মুখপানে চেয়ে, অতি কষ্টে—অতি ক্ষীণ —অতি ধীরস্বরে থেমে থেমে তিনি বোলতে লাগলেন, "হরি—এসে—আঃ— তুমি—হরিদা—তোমার—"

কাটা কাটা ভাঙা ভাঙা ঐ কটি কথা বোলতে বোলতে রাজা একবার হাঁ কোল্লেন; দেওয়ানজী সেই দিকে চেয়ে ছিলেন, আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরে, পাশের তাকের উপর থেকে একটি শিশি পেড়ে, কি একপ্রকার আরক তাঁর মুখে প্রদান কোল্লেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে রাজাবাহাদুর নিশ্বাস টেনে টেনে পুনর্ব্বার বোলতে আরম্ভ কোল্লেন, "হরিদাস! তোমাকে—তুমি—অনেক—উঃ —আমি — বৎস — কষ্ট — উঃ — বড় — কষ্ট — তুমি — আমি ; আর— বোলতে—তুমি—না,—সব—উঃ—"

আগ্রহ অনুভব কোরে, অবস্থা বুঝতে পেরে, দেওয়ানজী মহাশয় ব্যগ্রভাবে ব্যগ্রস্বরে বোল্লেন, "না মহারাজ! আপনি এখন অধিক কথা কবেন না ; ডাক্তারের নিষেধ : সব কথা আমি লিখে নিয়েছি।" —রাজাকে এই সব কথা বোলতে বোলতে একটু থেমে, আমার দিকে চেয়ে, দেওয়ানজী মহাশয় তৎসময়োচিত অনুচ্চকণ্ঠে আমারে সম্বোধন কোরে বোল্লেন ,"দেখ বাবা! তোমাকে আমি চিনেছি, এই দুর্ঘটনা হবার পর মহারাজ আমাকে তোমার সম্বন্ধে সকল কথা বোলেছেন, সব কথা আমি লিখে লিখে নিয়েছি, যদিও সব কথা না হোক, অনেক কথা আমি জানতে পেরেছি, সব আমার কাছে লেখা আছে, সময়ে সে সব আমি তোমাকে দেখাবো। রাজাবাহাদুর কি কি কথা তোমাকে বোলতে ইচ্ছা কোচ্ছেন, বোলতে পাচ্ছেন না। বড় দুর্ব্বল, বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা! আমি যখন—"

রাজা আবার এই সময় বড় বড় নিশ্বাস ফেলে আরো কি কি কথা বলবার উপক্রম কোচ্ছিলেন, নিষেধ কোরে দেওয়ানজী মহাশয় বোল্লেন, "না মহারাজ, আর আপনাকে এখন কিছু বোলতে হবে না, আপনি চুপ করুন, ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন ; হরিদাসকে যা কিছু বলবার থাকে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে আর এক সময়ে বোলবেন।" এই কথা বোলে রাজাকে তিনি আর এক পাত্র ঔষধ খাওয়ালেন। রাজার যেন তখন অল্প অল্প তন্দ্রার আবির্ভাব হয়ে এলো। নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে এসে, হস্তসঙ্কেতে আমারে ডেকে, দেওয়ানজী নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুলেন : সঙ্গে সঙ্গে আমি আর দীনবন্ধুবাবু। বারান্দায় আমাদের উভয়কে দাঁড় কোরিয়ে রেখে, "এখনি আমি আসছি" এই কথা বোলে, তিনি দ্রুতপদে আর একদিকে চোলে গেলেন, অল্পক্ষণ পরে দুজন চাকর আর একজন দাসীকে সঙ্গে কোরে ফিরে এলেন। অতঃপর আমাকে আর দীনবন্ধুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্ত্তী আর একটি গৃহে তিনি প্রবেশ কোল্লেন, দাসী-চাকরেরা রাজার কাছে থাকলো। যে ঘরে আমরা গিয়ে বোসলেম, সে ঘরের দরজা খোলা ছিল, একটু পরে আমি দেখলেম, সম্মুখের বারান্দা দিয়ে আমা-

দের দিকে চাইতে চাইতে দুটি ভদ্রলোক রাজার ঘরের দিকে চোলে গেলেন। দেখেই আমি স্থির কোল্লেম, তাঁরা ডাক্তার।

দেওয়ানজী মহাশয়ের সঙ্গে দীনবন্ধুবাবুর পরিচয় ছিল না, অল্প কথায় পরিচয় হলো। সে পরিচয়টি আমিই দিয়ে দিলেম। দেওয়ানজী মহাশয় তাঁকে প্রণাম কোল্লেন। অতঃপর আমার সঙ্গে দেওয়ানজীর কথা। আমার অঙ্গে—কপালের দক্ষিণ দিকে একটি জড়ুল ছিল; বাল্যাবধি আমার মাথায় লম্বা লম্বা চুল, জড়ুলটি সেই চুলঢাকা থাকতো, দেওয়ানজী মহাশয় আমার কপালের চুলগুলি সোরিয়ে সোরিয়ে সেই জড়ুল চিহ্নটি নিরীক্ষণ কোল্লেন, বিস্ময়ের সহিত আনন্দ প্রকাশ কোরে স্মিতবদনে আমারে তিনি, বোল্লেন, "হরিদাস! তুমিই সেই হরিদাস! আমাদের রাজাবাহাদুর তোমার উপর অনেক অত্যাচার কোরেছেন, তোমার পরিচয়টি পর্য্যন্ত তোমাকে জানতে দেন নাই; অকিঞ্চিৎকর বিষয়লোভে তাঁর দুর্জ্জয় কপটতা! আগাগোড়া তোমার সঙ্গে তার ষোল আনা চাতুরী।—মনিব তিনি, মনিবের দুরাচরণের কথা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে উচিত ছিল না, সকল কথা এত দিন আমি জানতেমও না, এখন—এই আসন্নকালে, তিনি নিজমুখে আমার কাছে সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ কোরেছেন। তার আজ্ঞানুসারে সেই সকল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা আমি লিপি-বন্ধ কোরে রেখেছি। সময়ে সেই পত্রিকাখানি আমি তোমাকে দেখাব। তুমি আশ্বস্ত হও। তুমি চিরনিরীহ, নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, অকপট ধর্ম্মভাবে তোমার হৃদয় অলঙ্কৃত; এত গুণ তোমার, তবু তুমি তোমার আপন—হাঁ, তবু তুমি এত বয়স পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও সুখী হোতে পার নাই। বোলতে হয় গ্রহবৈগুণ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার সমস্ত কষ্টের মূল তোমায়—হাঁ, আমাদের রাজাবাহাদুর!"

ভূমিকা। যদিও ভূমিকা, তথাপি দেওয়ানজীর কথার ভাবে আমি বুঝলেম, আমার পূর্ব্ব অনুমান যথার্থ; কথাগুলি আমার পক্ষে অনুকূল। রোমাঞ্চিত-কলেবরে, পলকশূন্যনয়নে তাঁর প্রসন্নবদনখানি আমি নিরীক্ষণ কোল্লেম। দেওয়ানজী পুনর্ব্বার বোলতে লাগলেন, "পূর্ব্বে যখন তুমি পাটনায় এসেছিলে, তখন তোমাকে আমি চিনতেম না; পরিচয়ও জানতেম না। এই বাড়ীতে তুমি ছিলে, রাজার কাছে আদর যত্ন পেয়েছিলে, তা আমি দেখেছি; তখন বুঝতে পারি নাই, এখন বুঝেছি, রাজার সে সব কেবল কপটতা-পূর্ণ মৌখিক আদর। সে আদরের পরিণাম কি হয়েছিল, তা তুমি জানো। বিষয়লোলুপ রাজার অনুচিত স্বার্থপরতাই তোমার সমস্ত কষ্টের হেতু।"

এখনো পর্য্যন্ত ভূমিকা। তাদৃশ দুঃখের সময় আমার মনে একটু একটু উৎসাহ আসছিল, আবার কেমন একপ্রকার সংশয়ের আবরণে সেই উৎসাহটি হঠাৎ যেন ঢাকা পোড়ে গেল। আমারে বাতুলালয়ে প্রেরণ করবার অগ্রে ডাক্তার নীলাম্বর আর ডাক্তার রঘুনাথ সুকৌশলে যে ভাবে আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ কোরেছিলেন, দেওয়ানজীর এই নতুন কথাগুলির ভিতরে সেই ভাবের কতক-গুলি কথা আমি যেন বুঝলেম মুমূর্ষুকালেও রাজা মোহনলাল কি আবার

আমার জন্য কোন নূতন মন্ত্রণা কল্পনা কোরেছেন ? আমার মনোমধ্যে তখন সেই তর্কের আন্দোলন উপস্থিত। আমার সমস্ত কষ্টের মূল রাজা মোহনলাল, আমার সমস্ত কষ্টের হেতু রাজা মোহনলালের কপটতা, বার বার দেওয়ানজী মহাশয় এ সকল কথা কেন বলেন ?

আমি এইরূপ ভাবছি, দেওয়ানজী মহাশয় পুনরায় আরম্ভ কোল্লেন, "আমাদের রাজাবাহাদুরের বিষয়লোভ দুর্দ্দম। রাজা যখন রাজা হন নাই, তখনো আমি তার জমিদারীর সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কোত্তেম। মধ্যে মধ্যে তিনি আমাকে নিকটে ডাকতেন, তার হাতে একখানি না একখানি ইংরেজী কেতাব থাকতো ; পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্গুলী অর্পণ কোরে তিনি আমাকে বোলতেন, 'কি কি উপায়ে শীঘ্র শীঘ্র অতুল ধনপতি হওয়া যায়, এই পুস্তকে সেই সব কথা লেখা আছে। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শাহ্‌ মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী, পঞ্চনদসিংহ, রণজিৎসিংহ, দিল্লীশ্বর আলমগীর শাহ, পারস্যসর্দ্দার নাদির শাহ, এই সকল ভাগ্যবান লোক কি প্রকার উপায়ে চিরস্মরণীয় বড়লোক হয়েছিলেন ; কাপ্তেন ক্লাইব লর্ড ক্লাইব হবার পর ইংরেজরা কোন কোন উপায়ে ভারতের ধনাধিকারী হয়েছে, এই পুস্তকে কেবল এই পুস্তকে কেন আরো অনেকানেক পুস্তকে সেই সকল বিবরণ লেখা আছে। আমি তত বড় হোতে না পারি, কতক পরিমাণে সর্ব্বজনমান্য অগ্রগণ্য হয়ে স্বদেশে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হোতে পারি সাধ্যমত যত্নে সেই চেষ্টা করা আমার একান্ত অভিলাষ, সেই অভিলাষ সিদ্ধকরণকল্পে আপনি আমার সহায় থাকবেন, এই আমার অনুরোধ।' এইসব কথা তিনি আমারে বোলতেন, সাধ্যানুসারে নিজেও সেই মনোরথসিদ্ধির চেষ্টা কোত্তেন। সৎ অসৎ উভয়বিধ উপায়েই তিনি আপনার সম্পত্তি বৃদ্ধি কোরেছেন। পরমেশ্বর না করুন, তাঁর কোন অমঙ্গল না ঘটুক, অর্জ্জিত ধনরাশি তিনি নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করুন ; আমার অন্নদাতা তিনি, আমার এইরূপ কামনা থাকা—"

কথা সমাপ্ত হলো না। একজন আরদালী সেই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরে রাজাবাদুরের আহ্বান বিজ্ঞাপন কোল্লে। তখন সন্ধ্যা হয়েছিল, সকল ঘরে বাতী জ্বালেছিল ; আমাদের বোসতে বোলে, সেই আরদালীর সঙ্গে দেওয়ানজী মহাশয় শীঘ্র শীঘ্র সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ; অনুচ্চকণ্ঠে দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে আমি উপস্থিত কথোপকথনের ভাবীফল আলোচনা কোত্তে লাগলেম।

আধঘণ্টা পরে দেওয়ানজী ফিরে এলেন ; রাজা একটু ভাল আছেন, ঘন ঘন ঔষধসেবনে কথার জড়তা কিছু কোমে এসেছে, আর একবার আমারে নিকটে যেতে বোলেছেন, দেওয়ানজীর মুখে এই কথা আমি শুনলেম। আমি একাকী যাব কিম্বা দেওয়ানজী আমার সঙ্গে যাবেন, এই কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম। তিনি উত্তর কোল্লেন, "একাকী যেতে পার, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। এই বাবুটি এখানে একা বোসে থাকবেন, সেটাই বা কেমন দেখায়, তাই আমি ভাবছি।"

দেওয়ানজীর ভাবনা আমি দূর কোরে দিলেম,—বোল্লেম, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন। রাজা যদি আপনাকে সেখানে থাকতে বলেন, তা হোলে অন্য একজনকে বরং এই ঘরে পাঠাবেন, নতুবা আমারে সেইখানে রেখে আপনি আবার এইখানে ফিরে আসবেন।" সেই কথাই ধার্য্য হলো, দেওয়ানজীর সঙ্গে আমি রাজগৃহে প্রবেশ কোল্লেম ; আমাদের উভয়কেই সেইখানে থাকতে হলো। দেওয়ানের একজন মুহুরী দীনবন্ধুবাবুর নিকটে প্রেরিত হোলেন।

রাজার ইঙ্গিতে তাঁর নিকটেই আমি বোসলেম, আমার অতি-নিকটে বাম-দিকে দেওয়ানজী। সজল উত্তাননয়নে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে অল্পে অল্পে রাজাবাহাদুর বোলতে লাগলেন, "হরিদাস! — তুমি — প্রবোধ — তোমাকে— হাঁ,—প্রবোধ—এসেছো ; আমি—উঃ—বড় কষ্ট!—আমাকে—"

ডাক্তারেরা নিকটে ছিলেন, নিষেধ কোরে একজন সেই সময় রাজাবাহাদুরকে বোল্লেন, "আপনি চুপ কোরে থাকুন, এ সময় অধিক কথা কইলে যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি হবে। হরিদাসকে যা কিছু বোলতে হয়, আমরা তো সব কথা শুনেছি, আমরাই সকল কথা বলছি। দেওয়ানজী মহাশয় সমস্তই জানেন, দেওয়ানজীর মুখেও হরিদাস সে সব কথা শুনতে পাবে।"

রাজার চক্ষে জলধারা গড়ালো। দীর্ঘ এক নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে সবিষাদে তিনি এবার উচ্চারণ কোল্লেন, "সব কথা।—পরমেশ্বর!"

এই পর্য্যন্ত কথা। রাজাবাহাদুর চুপ কোল্লেন ; আমার দিকে ফিরে দেওয়ানজী বোলতে লাগলেন, "কুমা—হরিদাস!—তুমি এতদিন জেনেছিলে, তুমি পর ; আমরাও জানতেম, তুমি অপরিচিত বালক ; এখন জানো, তা তুমি নও ; তুমি আমাদের মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র,—মহারাজের জ্যেষ্ঠ সহোদরের একমাত্র পুত্র। তুমি হরিদাস নও, তোমার প্রকৃত নাম আছে। এখন অবধি তুমি রাজপুত্রের মত এই বাড়ীতে বাস কর। বর্ত্তমানে—"

এই সময় আমি একবার রাজাবাহাদুরের মুখের দিকে চাইলেম ; আমার সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হোতে লাগলো ; রাজার চক্ষে জলধারা, আমার চক্ষেও দরদর ধারে জলধারা প্রবাহিত।

ডাক্তারের নিষেধ বিস্মৃত হয়ে রাজাবাহাদুর সেই সময় আর এক নিশ্বাস ফেলে কেমন এক প্রকার শুষ্ককণ্ঠে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বোলে উঠলেন, "বাড়ী— বাড়ী—বাড়ী। হরিদাস! এ বাড়ী তোমার—"

ডাক্তারেরা পুনরায় নিষেধ কোল্লেন, আমারেও সেখান থেকে উঠে আসতে বোল্লেন রাজাও নীরব হোলেন, তাঁর চক্ষের জল দেখতে দেখতে নিজেও অশ্রু-বর্ষণ কোত্তে কোত্তে আমি সেখান থেকে উঠলেম। সেই সময় দেওয়ানজীর প্রতি রাজা কি একরকম ইসারা কোল্লেন, দেওয়ানজীও আমার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পূর্ব্বে আমরা যে ঘরে ছিলেম, দীনবন্ধুবাবু যে ঘরে আছেন, আবার আমরা দুজনে সেই ঘরে এলেম। আমার কম্প ; পিপাসা ছিল না, তথাচ অকস্মাৎ আমার কণ্ঠ বিশুষ্ক! কতক কতক প্রমাণে পূর্ব্বেই আমি জানতে পেরেছিলেম, আমার সমস্ত কষ্টের মূল এই রাজা

মোহনলাল, তথাপি তাঁর আসন্নদশা দর্শনে আমি অতিশয় কাতর হোলেম রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র আমি! ওঃ! সেই জন্যই এত কাতরতা! এ পরিচয় যখন আমি শুনি নাই, ব্যাধিশয্যায় সর্ব্ব প্রথমে ভগ্নাঙ্গ, স্ফীতাঙ্গ, ব্যাধিশয্যা-শায়ী রাজাকে দেখেই আমি অশ্রু-সংবরণে সমর্থ হই নাই! ওঃ! কারণটা এখন আমি বুঝলেম, রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র আমি! এই কথাই কি ঠিক? আমার মন বোলছে, হাঁ, এই কথাই ঠিক! ওঃ! এই পাটনার পুষ্পোদ্যানে যে দিন আমি ঐ রাজাকে আমার পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম রাজার সে দিন উদাসীনভাব কেমন! রাজা আমারে সে দিন কতই তিরস্কার কোরে-ছিলেন। ওঃ! সেই রাজা এই!

ভাবতে ভাবতে দীনবন্ধুবাবুর কাছে গিয়ে আমি বোসলেম, দেওয়ানজীও বোসলেন, মুহুরীটি উঠে গেল। আর কোন প্রকার ভূমিকা না কোরে দেওয়ানজী মহাশয় বোলতে লাগলেন, "এখনো আমি তোমাকে হরিদাস বোলেই সম্বোধন করি; আমাদের কাছে এখনো তুমি হরিদাস, উপযুক্ত অব-সরে তোমার প্রকৃত নামটি তুমি জানতে পারবে। হরিদাস। তুমি আমাদের রাজাবাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র,—"

এইটুকুমাত্র শ্রবণ কোরেই দীনবন্ধুবাবুর নেত্র অকস্মাৎ পলকশূন্য, ঘন ঘন যেন তিনি শিউরে শিউরে উঠলেন। দেওয়ানজী পুনরায় বোলতে লাগলেন, "হাঁ তুমি আমাদের রাজাবাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। পতনের পর পঞ্চম রজনীতে রাজাবাহাদুরের অল্প অল্প জ্বর হয়েছিল, ডাক্তারেরা ভয় পেয়েছিলেন, রাজার তখন জ্ঞান ছিল, লক্ষণে তিনি ডাক্তারের ভয়ের কারণ বুঝতে পেরেছিলেন। সেই রজনীতে বাড়ীর সকল লোককে তফাৎ কোরে দিয়ে তিনি আমাকে অনেকগুলি ভয়ানক ভয়ানক গুহ্যকথা বলেন; একে একে সকল কথাই আমি লিখে রেখেছি; ঐ দুজন ডাক্তার নিকটে ছিলেন, তাঁরাও যে সব কথা শুনেছেন; সেই জন্যই তাঁরা এইমাত্র বোল্লেন, 'সব কথা আমরা জানি।' জানাজানির কথা এখন থাকুক, যখন অনুমতি হবে কিম্বা যখন—" এইখানে একবার সাশ্রুনয়ন পরিমার্জ্জন কোরে, একটু থেমে দেওয়ানজী পুনরায় আরম্ভ কোল্লেন, "কিম্বা যখন প্রকৃত অবসর উপস্থিত হবে, সেই সময় আমি আমার লেখা সেই খাতাখানি তোমাকে দেখাব, পাঠ কোল্লেই তোমার জীবনের প্রকৃততত্ত্ব পূর্ণাংশে তুমি অবগত হোতে পারবে। প্রকাশের উপযুক্ত সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই। এখন অবধি তুমি রাজপুত্রের ন্যায় রাজ-গৌরবে এই বাড়ীতে বাস কর, রাজাবাহাদুর নিজমুখেই বোলেছেন, এ বাড়ী তোমার, আমিও বোলছি, এ বাড়ী তোমার; বর্দ্ধমানের পৈতৃক ভদ্রাসন বাড়ীখানিও তোমার; রাজ-সম্পদ, রাজ-সম্পত্তি, রাজ-ঐশ্বর্য্য, সমস্তই তোমার; পরিবারবর্গ, দাস-দাসী, লোক-লস্কর, সমস্তই তোমার; আমরাও তোমার।"

স্থিরকর্ণে দেওয়ানজীর কথাগুলি আমি শ্রবণ কোল্লেম; চক্ষু এতক্ষণ সজল ছিল, কি জন্য জানি না, হঠাৎ তখন আমার দুই চক্ষু জলশূন্য,—বোধ হলো যেন ভিতর বাহির বিশুষ্ক; আনন্দের উদয় কিম্বা বিষাদের আবির্ভাব,

ক্ষণকাল সেটা অনুভব কোত্তেই পাল্লেম না। একবার মনে হলো, স্বপ্ন ; আমি যেন নিদ্রিত অবস্থায় সুখ-স্বপ্ন দর্শন কোচ্ছি, এইরূপ জ্ঞান হলো ; বাস্তবিক তখন আমি নিদ্রিত কি জাগরিত, ক্ষণকাল সে ভাবটা জানতেই পাল্লেম না। দীনবন্ধুবাবু বাক্যশূন্য ; চৈতন্য-সত্ত্বেও আমরা উভয়েই যেন চৈতন্যহারা ; শেষে যখন আমি একটু প্রকৃতিস্থ হোলেম, চৈতন্য যেন ফিরে এলো, তখন বুঝলেম; স্বপ্ন নয়, সত্য।

দেওয়ানজীর মুখের কথায় যে প্রকার শুনলেম, ব্যবহারেও তার পরিচয় পেলেম। আমাদের সেবার নিমিত্ত দাস-দাসীরা নিয়ত ব্যস্ত হয়ে বেড়াতে লাগলো, উত্তম উত্তম সজ্জিত গৃহে আমাদের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো, উপবেশনগৃহও স্বতন্ত্র, রাজভোগ আহার, রাজ-পর্য্যঙ্কে শয়ন, রাজ-সম্মানে সম্মানলাভ, সর্ব্বাংশেই আমরা বাহ্যসুখে সুখী থাকলেম ; আমার আদরে দীনবন্ধুবাবুরও সমান আদর-যত্ন। দীনবন্ধুবাবুর চাকর-দুটি আর পাচক ব্রাহ্মণটি যথোপযুক্ত গৃহে স্থান পেলে. তাদের আহারাদির ব্যবস্থাও সম্ভবমত উত্তম।

আষাঢ় মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে আমরা পাটনায় এসেছিলেম, ১৪ই শ্রাবণ সমাগত। পূর্ণ একমাস। প্রতিদিন আমি রাজাবাহাদুরের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হই. এক একদিন দুই তিনবারও সেই ঘরে যাই. দুই তিন ঘণ্টা সেখানে থাকি, রাজার মুখে দুটি একটি কথাও শুনি, দেখে শুনে বড় কষ্ট হয়। ক্রমশই যাতনা-বৃদ্ধি ; ভগ্নস্থান, ক্ষতস্থান ক্রমশই ভয়ঙ্কর! নিত্য দুই তিনবার ক্ষতস্থান পরিষ্কার হয়, তথাপি দুর্গন্ধ ; এত দুর্গন্ধ যে, অনাবৃত নাসিকায় ঘরের ভিতর তিষ্ঠান ভার! ধুনা-গুল্‌গুলাদি গন্ধদ্রব্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তথাপি সে দুর্গন্ধ যায় না। ক্রমশই যত দিন গত হয়, ক্ষতস্থান ততই পচে, ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ পচা ধরে, বহির্ভাগ সর্ব্বদা পরিষ্কার কোরে দিলেও ভিতরের দুর্গন্ধ নিবারণ করা যায় না। দক্ষিণ উরু, দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে পরীক্ষা কোরে ডাক্তারেরা জানতে পাল্লেন, সেই দুই স্থানের ক্ষত-সংযোগে শরীরের সমস্ত স্থান নষ্ট হওয়া সম্ভাবনা। শেষে তাঁরা গোপনে পরামর্শ কোরে স্থির কোল্লেন, ঐ দুটি অঙ্গ ছেদন কোরে না দিলে সে আশঙ্কা-নিবারণের উপায় নাই। রাজাকে সে কথাটা জানানো হলো না। দেওয়ানজীর সঙ্গে পরামর্শ কোরে ডাক্তারেরা কলিকাতায় লোক পাঠালেন, কলিকাতা থেকে দুজন ভাল ভাল অস্ত্রচিকিৎসক নিয়ে যাওয়া হলো, দুজনেই সাহেব। ২৫এ শ্রাবণ বেলা দশটার সময় ডাক্তার সাহেবেরা পাটনায় উপস্থিত হোলেন। পরীক্ষা কোরে তাঁরাও স্থানীয় ডাক্তারদের মতে মত দিলেন ; কিন্তু একদিনে উভয় অঙ্গচ্ছেদনে প্রাণ যাবে, সেই ভয়ে একে একে অস্ত্র করাই পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয় ; প্রথমদিন দক্ষিণ হস্ত। যে প্রকার ঔষধে মানুষকে অজ্ঞান করা যায়, সেই প্রকার ঔষধ প্রয়োগে রাজাকে চৈতন্যশূন্য কোরে একজন সাহেব রাজার একখানি হাত কেটে দেন ; বিচক্ষণতার সহিত বাহুমূলচ্ছেদন।

২৬এ শ্রাবণ প্রাতঃকালে বাহুচ্ছেদন, সেই দিন রাত্রে রাজার ভয়ানক জ্বর ; পর দিন ঘোর বিকার! ২৭এ শ্রাবণ রাত্রিকালে বিকারের বৃদ্ধি। ডাক্তার সাহেবেরা শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হোলেন না. তাঁদের বাসোপযুক্ত স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, সেইখানেই তাঁরা থাকেন, আবশ্যকমত এসে দেখেন. নূতন নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় ডাক্তারেরাও সর্ব্বদা যন্ত্রণাশান্তির উপায়বিধানে ক্ষান্ত থাকেন না। পরদিন রাত্রে যন্ত্রণাও বেশী, বিকারও বেশী। রাত্রি যখন অনেক, তখন একজন বাঙালী ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, দেওয়ানজী ছিলেন, আমি ছিলেম. আর পাঁচজন চাকর সেই ঘরে ছিল। রাজার অবস্থা দর্শনে সকলের মনেই ভয় হয়েছিল। রাত্রি যতই বাড়তে লাগলো, রোগী ততই অস্থির হোতে লাগলেন ; সর্ব্বশরীরে বেদনা, হাতখানি কাটা, ছটফট কোত্তে পারেন না, এ পাশ ও পাশ কোত্তে পারেন না, নিদারুণ যন্ত্রণা! মুখের কাছে আমি বোসে আছি, দেওয়ানজী আমার কাছে আছেন. এক পাশে ডাক্তার, আশে পাশে চাকরেরা। একজন চাকর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছোট একখানি হাত-পাখা দিয়ে বাতাস কোচ্ছিল, কাহারো মুখে কথা ছিল না ; সকলেই বাক-শূন্য। ডাক্তারটি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিকার-শান্তি ঔষধ দিচ্ছিলেন, সকলবারের ঔষধ উদরস্থ হোচ্ছিল না, বৃথা চেষ্টা!

অকস্মাৎ যেন কেমন একপ্রকার আতঙ্কে রোগীর মুখে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রলাপ! রাজা বোলছেন, "ঐ—ঐ—ঐ! —দাদা! —দাদা! —দাদা! —আমি! —না! —সাপ! ঐ—ধরো! —ধরো! —আমি! —সাপ! —না! —না! —আমি! —বিষ, বিষ! —রক্ত! —এলো! —এলো! —উঃ! —কে? —হরি! —হা—হা—হা! —সাপ নয়! আবার! —ওঃ—ও কে! —উঃ—গলা! —রক্ত! —শ্বশুর! —ধরো না! —কে আছো? সর্ব্বানন্দ! —আমি! —রক্তগঙ্গা! —চাবী! —ধরো —ধরো! —শ্বশুর! —আমি! —না! জটা! —কালা! —ধর! —ঘনা! —চাবী! —সিন্দুক! —উঃ—হুঃ—হুঃ! —ঐ গেল! —ঐ গেল! —আবার! —আমি কেন! —বিছানা! —আমাকে! —না না! —না, আমি না! জটা! —উঃ! —রক্ত! —রক্ত! —রক্ত—সর্ব্বনাশ!"

সকলেই আমরা চমকিত, ডাক্তার মহাশয় মহাব্যস্ত, মুখের কাছে সোরে এসে আর একবার তিনি একমাত্রা ঔষধ রোগীর মুখে দিলেন, রোগী যেন বিছানার উপর উঁচু হয়ে উঠবার ভঙ্গী জানালেন. অতি সাবধানে ডাক্তার তাঁকে চেপে ধোল্লেন, রাজার মুখে তখন একবার অতি কষ্টে উচ্চারিত হলো, "আঃ!"

সমস্তই প্রলাপ! ভীষণ প্রলাপ! ভাবার্থ সকলে হয় তো বুঝে উঠতে পাল্লেন না. সকল কথার অর্থ আমিও ঠিক বুঝলেম না, কিন্তু জটা, ঘনা, কালা, শ্বশুর, এই কথাগুলির তাৎপর্য্য অনুমানে আমি কতক কতক বুঝলেম।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, অবস্থা দেখে ডাক্তারটিও ভয় পেলেন ; সাহেব ডাক্তারেরা যেখানে ছিলেন, তাড়াতাড়ি সেইখানে তিনি ছুটে গেলেন, অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ কোরে তাঁদের দুজনকেই তিনি রোগীর ঘরে নিয়ে এলেন।

ঊষাকাল। সাহেবেরা বিকারলক্ষণ দর্শন কোরে তৎক্ষণাৎ তদুপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা কোল্লেন ; ঔষধালয় নিকটেই ছিল, ঔষধ এলো, দুই তিনবার সেই নূতন ঔষধসেবনের পর রাজা একটু চুপ কোল্লেন ; মুখে তখন আর কোন প্রকার প্রলাপ থাকলো না, নয়ন মুদিত কোরে রাজা খানিকক্ষণ যেন আচ্ছন্ন থাকলেন। বোধ হলো যেন, নিদ্রার ঔষধ, নিদ্রার আবির্ভাব।

এইখানে আমি একটু আমার নিজের কথা বোলে রাখি। রাজার মুখের প্রলাপবাক্যগুলি আমি ঠিক ঠিক স্মরণ কোরে রেখেছিলেম, রাজাকে একটু সুস্থ দেখে, আপনার ঘরে, এসে সেই প্রলাপ-বাক্যগুলি একখণ্ড কাগজে আমি লিখে রাখলেম। সময়ে তথ্য জেনে ভগ্নপদগুলি পূর্ণ করা আমার আশা।

প্রভাতে রাজা অনেক সুস্থ। তীব্র তীব্র ঔষধে পাঁচ দিনে বিকারের লক্ষণ প্রায়ই থাকলো না, জ্বরও কম হয়ে এলো। সাহেব ডাক্তারেরা নিত্য নিত্য হাজার টাকা দর্শনী গ্রহণ করেন, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা নিত্যই প্রায় নূতন প্রকার হয়। অষ্টাহ পরে ডাক্তারেরা পরীক্ষা কোরে বোল্লেন, "নাড়ী বিজ্বর, নূতন কর্ত্তিত ক্ষতস্থান শুষ্ক হবার উপক্রম ; বলকর ঔষধ, বলকর সুরুয়া নিত্য ব্যবস্থা।" আরো তিন দিন অতীত হবার পর ডাক্তারেরা পরামর্শ কোরে স্থির কোল্লেন, উরুদেশ কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ; সর্ব্বশরীর না পচে, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখা চাই ; দুই একটি অঙ্গচ্ছেদনে যদি প্রাণরক্ষা হয়, সেটাও অনেক মঙ্গল বোলতে হবে।"

পরামর্শ স্থির। পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়ায় রাজাকে অজ্ঞান কোরে একজন ডাক্তার সাহেব রাজার উরুমূল ছেদন কোরে দিলেন। অতি অল্পমাত্র রুধির নির্গত হলো। দুই দিন পরে আবার জ্বর, আবার বিকার, আবার প্রলাপ ! এবারের প্রলাপের সকল কথার মর্ম্মভেদ কোত্তে আমি অক্ষম হোলেম ; দেওয়ানজী কিছু কিছু বুঝতে পাল্লেন কি না, তা আমি জানতে পাল্লেম না, তিনিও কিছু বোল্লেন না।

১১ই ভাদ্র। এই দিন রাজার বাকরোধ। থেকে থেকে বিহ্বল, থেকে থেকে আচ্ছন্ন, থেকে থেকে যেন তন্দ্রার আবির্ভাব ; সম্পূর্ণ বিকার ; ঔষধ আর তলায় না ; মুখে ঔষধ দিলে কস বেয়ে পড়ে, পিচকারী দিয়ে নাকে কাণে ঔষধ প্রক্ষেপ করা হয়, তাও থাকে না। আর আশা নাই !

দুঃখের সময় হঠাৎ একটা কথা আমার স্মরণ হলো। অল্পদিন পূর্ব্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তের একখানি কাব্য প্রকাশ হয়েছিল ; সেই কাব্যমধ্যে একটি উপমাস্থলে আমি পাঠ কোরেছিলেম,—

"ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র-রণে।"

রাজা মোহনলাল ঘোষের উরুভঙ্গ হয়েছিল—রণে নয়, পতনে। সেই উরু-দেশ ডাক্তারের অস্ত্রে কর্ত্তিত হয়ে গেল। রাজার এখন প্রাণ যায় ! হস্তপদ বিচ্ছিন্ন, দেহ ক্ষতবিক্ষত, বাক্য বিরহিত, বড়ই শোচনীয় অবস্থা ! ১১ই ভাদ্র সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত চঞ্চলচিত্তে—চঞ্চল অথচ উত্তেজিতচিত্তে হঠাৎ আমি রাজার গৃহমধ্যে প্রবেশ করি। পুরুষ তখন সেখানে কেহই ছিল না, প্রবেশ কোরেই

আমি দেখলেম, কেবল তিনটি স্ত্রীলোক। আমি প্রবেশ করবামাত্র একটি স্ত্রীলোক সহসা চপলাগতিতে অন্যদিকের দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটি পরমা সুন্দরী। কে সে ?—কিছুই আমি বুঝতে পাল্লেম না। আকাশের চপলা যেমন অতি অল্পক্ষণ মাত্র দীপ্তি বিকাশ কোরে, অতি অল্পক্ষণমধ্যেই লুকিয়ে যায়, সেই ভূমি-চপলাটিও সেইরূপ দেখতে দেখতে লুকিয়ে গেল। কে সে ?—রাজা মোহনলালের ধর্ম্মপত্নীকে আমি দেখেছি, তিনি নন। তবে কে ? যারা সেখানে থাকলো, তারা দুজন দাসী। তাদের আমি চিনেছিলেম দেখেই চিনলেম ; কিন্তু যে চপলা পালালো, তার কথা তাদের আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেম না, মনের মধ্যে ভয়ানক একটা সন্দেহ থেকে গেল।

রাজার যে অবস্থা তখন আমি দেখলেম, তাতে আর সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পাল্লেম না, ছুটে বেরিয়ে এসে দেওয়ানজীকে ডাকলেম, তিনি শীঘ্র শীঘ্র আমার সঙ্গে রোগীর ঘরে উপস্থিত হোলেন, তিনিও সেই অবস্থা দর্শন কোল্লেন। অবিলম্বে ডাক্তারগণকে সংবাদ দেওয়া হলো. ডাক্তারেরা এলেন ; বামহস্তের নাড়ী পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত হোলেন। আর পরীক্ষা! শরীরের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্পন্দন রহিত, কার্য্য রহিত, জীবনদীপ নির্ব্বাপিত !

সকলে নির্ব্বাক হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেন, দেওয়ানজীর নাসিকায় দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস, আমার চক্ষে অবিরল জলধারা ! হস্তে নয়ন আবরণ কোরে দাসীরা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লে ; বাড়ীর ভিতর কিন্তু কোন প্রকার রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হলো না। আমি রোদন কোল্লেম. রোদনে কিন্তু আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না। অহো! যে মোহনলাল আমার সমস্ত দুঃখের. সমস্ত কষ্টের, সমস্ত বিপদের হেতুভূত, সেই মোহনলালের মৃত্যুতে রোদন সংবরণে আমি অসমর্থ আমার কক্ষঃস্থল দুর দুর কোরে কেঁপে উঠলো, নেত্রনীরে আমার গাত্রবস্ত্র অভিষিক্ত হয়ে গেল। আশ্চর্য্য নয় ; নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় লোকের মৃত্যু দর্শনে চক্ষে যখন জল আসে মোহনলালের এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যু দর্শনে স্বভাবতই আমার শোক উপস্থিত হবে, এটা আশ্চর্য্য নয় ! এত দিন জানতেম না, সম্প্রতি জেনেছি, রাজা মোহনলাল আমার পিতৃব্য, জন্মদাতা পিতাঠাকুরের সহোদর। তাঁর সেই প্রকার শোচনীয় মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন কোল্লেম, শোকে আমি অধীর হোলেম। সর্ব্বাঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হোচ্ছিল, দাঁড়িয়ে থাকতে পাল্লেম না, কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মেঝেতে নিরাসনে বোসে পোড়লেম।

সেই সময় আরো চার পাঁচজন লোক সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লে। ঘর তখন শবাগার, স্ত্রীলোক পরিশূন্য : স্ত্রীলোক উপস্থিত থাকলে ক্রন্দনধ্বনিতে শবাগার পরিপূর্ণ হয়ে যেতো ; সকলেই পুরুষ ; যদিও সকলে শোকাকুল, তথাপি সকলেই নিস্তব্ধ,—গভীর নিস্তব্ধ ! শব যেমন নিস্তব্ধ, শবাগারও তদ্রূপ !

লোকগুলির সঙ্গে দীনবন্ধুবাবুও তখন সেই ঘরে এসেছিলেন। রাজা মোহনলালের বিয়োগে তাঁর তাদৃশ শোক-প্রকাশের কোন কারণ ছিল না,

তথাপি তিনিও অধোবদনে নীরবে দুই তিনবার অশ্রুমার্জ্জন কোল্লেন ; তাঁর চক্ষু-দুটিও রক্তবর্ণ ধারণ কোল্লে।

১২৬৪ সালের ১১ই ভাদ্র রাত্রি ৮টা। সেই সময় রাজা মোহনলাল ঘোষ বাহাদুর সমস্ত মায়ামোহ বিসর্জ্জন দিয়ে এই মায়ার সংসার পরিত্যাগ কোরে গেলেন! চেনা যায় না! পূর্ণদেহের দুটি অঙ্গ ছিল না, অবশিষ্ট সর্ব্বাঙ্গ অসম্ভব পরিস্ফীত! মুখ, বুক, পেট ফুলে যেন ঢোল! চেনা যায় না! একমাস পূর্ব্বে থেকেই সর্ব্বশরীর ফুলেছিল, অস্ত্র-চিকিৎসার পর অবধি আরো অধিক ফুলে ফুলে উঠেছিল, দেখে বোধ হোতে লাগলো যেন, বৃহৎ একটা গলিত মাংসপিণ্ড শয্যার উপর নিপতিত!

জন্মাবধি রাজা মোহনলালের কোন কার্য্যই আমি করি নাই ; ১২৬৪ সালের ১১ই ভাদ্র রজনীযোগে পাটনার গঙ্গাতীরে রাজা মোহনলালের সমস্ত শেষকার্য্য আমাকেই নির্ব্বাহ কোত্তে হলো। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অবসানে কৌলিক প্রথামত শোকবস্ত্র পরিধান কোরে, সঙ্গী লোকজনের সঙ্গে ঊষাকালে আমি বাড়িতে ফিরে এলেম। যত দিন আমি পৃথিবীতে এসেছি তত দিন আমি বাড়ী জানতেম না, বাড়ী বোলতেম না, সেই দিন বোল্লেম, "লোকজনের সঙ্গে আমি বাড়ীতে ফিরে এলেম।" এতদিন কিছু বলেন নাই, অন্তকালে রাজা মোহনলাল আমারে বাড়ী চিনিয়ে দিয়ে গেলেন ; আসন্নকালে নিজমুখেই বোলে গিয়েছেন, "এ বাড়ী তোমার।"

বাড়ীর সমাচার কি?—বাড়ীর কর্ত্তা শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত, বর্দ্ধমানের বাড়ীতে কি এ সমাচার প্রেরিত হয় নাই? বর্দ্ধমানের কেহই এখানে উপস্থিত নাই, রাজা মোহনলালের সহধর্ম্মিণীও এখানে আসেন নাই, এ রহস্যের কারণ কি? আমার নিজের বুদ্ধিতে এ সমস্যার কোন মীমাংসা এলো না রাজার মৃত্যুর তিন দিন পরে দেওয়ানজীকে আমি এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করি, দেওয়ানজী বলেন, "কথা হয়েছিল খবর দিবার, কিন্তু রাজা বাহাদুর নিষেধ কোরেছিলেন। তাঁর মুখেই শুনা হয়েছিল, তিনি পুনরায় এক দারপরিগ্রহ কোরেছেন, সেই পরিবার সঙ্গে আছেন, তিনি এখানে নূতন রাণী নামে পরিচিতা ; বড় রাণীকে এ সংবাদ জানানো হবে না, সেই কারণেই বর্দ্ধমানে সংবাদ পাঠানো হয় নাই।"

আমার চমক লাগলো! পুনরায় দারপরিগ্রহ!—এ কথার অর্থ কি? কাশীর পথে তিনি আমার সাক্ষাতেও একবার বোলেছিলেন, নূতন বিবাহ, নূতন পরিবার ; কাশীধামেও সেই নূতন পরিবারকে আমি দেখেছিলেম,—চেহারার মিলনে সেই নূতন পরিবারকে আমি অমরকুমারী ভেবেছিলেম। সে পরিবারের তো কাশীপ্রাপ্তি হয়েছে। পরিবারও নয়। অমরকুমারীর মুখে যে যে কথা আমি শুনেছি, পাঠক মহাশয় সে সব অবগত আছেন, তবে আবার এখানকার সে নূতন পরিবার—নূতন রাণীটি কে? ঠিক কথা। কাশীতেই আমি শুনেছিলেম সমরকুমারীর মৃত্যুর পর কাশীর একটি বাইজীকে নিয়ে মোহনবাবু কাশী ছেড়ে চোলে এসেছেন, তখন আসেন নাই, পরে এসেছিলেন, সেই বাইজীই এই

পাটনায় নূতন রাণী। ঠিক কথা ; রাজা যে রাত্রে রাজলীলা সংবরণ করেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর রাজগৃহে যে চপলা মূর্ত্তি আমি দর্শন কোরেছিলেম, আমারে দেখে চপলাগতিতে যে চপলা গৃহান্তরে প্রবেশ কোরেছিলেন, সেই চপলাই—কাশীর সেই বাইজীই এই নূতন রাণী।

মনে হলো সব কথা ; কিন্তু দেওয়ানজীকে কিছু বোল্লেম না। দশদিনে শদাহকার্য্য সমাধা কোরে আমরা বর্দ্ধমানে আসবার আয়োজন কোত্তে লগালেম ; দীনবন্ধুবাবুকেও আমাদের সঙ্গে আসবার অনুরোধ কোল্লেম। আমার প্রতি স্নেহবশে দীনবন্ধুবাবুও সে অনুরোধে সম্মত হোলেন। মুর্শিদাবাদের বাড়ীতে পশুপতিবাবুর নামে পত্র লিখে, তিনি তার চাকর ও ব্রাহ্মণকে বাড়ীতে পাঠালেন, নিজের বিলম্বের কারণও সেই পত্রে লিখে দিলেন। ব্রাহ্মণ ও চাকরেরা বিদায় হয়ে গেল। দীনবন্ধুবাবু থাকলেন।

আরো পাঁচ দিন। আর দুদিন পরেই আমাদের বর্দ্ধমানে যাত্রার দিনস্থির। যে দিন যাত্রা করা হবে, সেই দিন প্রাতঃকালে আমি শুনলেম, গত রাত্রে হঠাৎ সেই বাইজীটি অদৃশ্য। কি কারণে বাইজীর পলায়ন, কেহ কিছু স্থির কোত্তে পাল্লেন না, দেওয়ানজীও বিস্মিত হোলেন। আমি তাকে বোল্লেম, "বিস্মিত হবার কোন কারণ নাই।" বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়ে আসল কথা তাঁকে আমি জানাব, এইরূপ অঙ্গীকার কোরে রাখলেম।

আমার মনে একটা বিওম উদ্বেগ ; উদ্বেগের সঙ্গে বিষম কৌতূহল। আমার পরিচয়-সম্বন্ধে রাজাবাহাদুর কি কি কথা বোলে গিয়েছেন, দেওয়ানজী মহাশয় কি কি কথা লিখে রেখেছেন, সেটি জানবার জন্যই উদ্বেগ,—সেই জন্যই কৌতূহল। দেওয়ানজী বোলেছিলেন, খাতা আছে, সে খাতাখানি এ পর্যন্ত তিনি আমারে দেখালেন না, নিজে পাঠ কোরেও শুনালেন না। বোলেছিলেন, উপযুক্ত অবসর ; সেই অবসর হয় তো এখনো উপস্থিত হয় নাই, সেইটি স্থির কোরে, মনের উদ্বেগ মনের মধ্যেই চাপা দিয়ে রাখলেম।

আমরা বর্দ্ধমানে এলেম। সর্ব্বানন্দবাবুর বাড়ীতে নয়, রাজা মোহন-লালের। আমার নিজের উপরত পিতৃব্য মহাশয়ের নিজবাড়ীতে। দারুণ শোক-সমাচার বাড়ীর পরিবারমধ্যে প্রচার হওয়াতে অন্তঃপুরে হৃদয়ভেদী চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত! সমবেত রোদনধ্বনিতে প্রায় এক প্রহরকাল বাড়ীখানি যেন প্রতি-ধ্বনিত হোতে লাগলো! নূতন উচ্ছ্বাস যতটা প্রবল হয়, দিনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই অল্প হয়ে আসে, ক্রমে ক্রমে আর ততটা প্রবল থাকে না। তিন দিন আমরা বর্দ্ধমানে। সপ্তদশ দিবসান্তে পাটনা পরিত্যাগ, পথে পাঁচ দিন, বর্দ্ধমানে তিন দিন, এই পাঁচ দিন। এই তিন দিন আমি একবারও অন্তঃপুরে প্রবেশ করি নাই। আমার শোকবস্ত্র পরিধান বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা সেটা দর্শন করেন নাই।

অন্দরে আমি যাই নাই। সদরবাড়ীর লোকেরা আমারে দেখে, তাদের কাছে আমি অপরিচিত, চাকরদের কাছেও অপরিচিত। তারা আমারে দেখে, তাদের কর্ত্তার বিয়োগে আমি শোকচিহ্ন ধারণ কোরেছি, দেখে দেখে তারা ঠারাঠারি করে, কাণাকাণি করে, বিস্ময় প্রকাশ করে, সেটা আমি বুঝতে পারি ; কিন্তু কেহ

আমারে কিছু জিজ্ঞাসাও করে না, আমিও কোন লোককে কোন কথা বলি না। এই ভাবে সেই তিন দিন কেটে গেল। পরদিন রাত্রিকালে সদরবাড়ীর একটি ঘরে কম্বলাসনে আমি, সম্মুখের স্বতন্ত্র আসনে দেওয়ানজী আর দীনবন্ধুবাবু। আমাদের উভয় আসনের মধ্যস্থলে দুটি সেজ ; প্রত্যেক সেজে যোড়া যোড়া বাতী প্রজ্জ্বলিত, গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ। সেই সময় সেই খাতাখানি বাহির কোরে দেওয়ানজী মহাশয় আমার সম্মুখে খোল্লেন। একবারমাত্র সেই খাতার প্রথম পৃষ্ঠার গুটিকতক অক্ষরে দৃষ্টিদান কোরে আমার নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হলো, পাঠ কোত্তে পাল্লেম না ; দেওয়ানজীকে বোল্লেম, "আপনিই পাঠ করুন।" দুটি নিশ্বাস ফেলে একবার অশ্রুমার্জ্জন কোরে দেওয়ানজী পাঠ কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন।

পোষ্টৃবর শ্রীযুক্তবাবু ত্রিলোচন দত্ত
দেওয়ান মহাশয় সুচরিতেষু—

আমার আসন্নকাল। আপনারা জানেন আমাদের বংশে আমার পুরুষ উত্তরাধিকারী কেহ নাই। যাহা আপনারা জানেন, তাহা অসত্য। ইতিপূর্ব্বে হরিদাস নামে যে বালকটি এখানে আসিয়াছিল, যাহাকে কৌশলক্রমে বাতুলালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেই বালক আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ; তাহার নাম হরিদাস নয় তাহর নাম আছে। আপনারা সেই বালকের অনুসন্ধান করুন। কাশীধামে রমেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটীতে তাহাকে একবার আমি দেখিয়াছিলাম, সেখানেও তত্ত্ব লইবেন। মুর্শিদাবাদের এক জমীদার দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বাটীতেও হরিদাস কিছু দিন ছিল, সেখানেও তত্ত্ব লইবেন। ঠিকানা যদি না পান, বহরমপুরের উকীল [illegible]কে জিজ্ঞাসা করিলেই সন্ধান জানিতে পারিবেন। সন্ধান পাইলেই হরিদাসকে এই বাটীতে লইয়া আসিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিবেন। উদ্দেশে হরিদাসের নামেও আমি একখানি পত্র লিখিব ; আপনিই লিখুন, আমি বলিয়া যাইতেছি। হরিদাসের অন্বেষণে আপনারা আলস্য করিবেন না, বিরত থাকিবেন না। ইতি সন ১২৬৪, ৫ই আষাঢ়।

শ্রীমোহনলাল ঘোষ।

এই পত্রখানি অপর হস্তের লেখা, স্বাক্ষর মোহর রাজাবাহাদুরের নিজের। আমার নামে যে পত্র সেখানি দেওয়ানজী মহাশয়ের নিজের হাতের লেখা, রাজাবাহাদুরের নিজের হাতে দস্তখত। পাঠক-মহাশয়েরা সেই পত্রের নির্ঘণ্ট দর্শন করুন।

রাজা মোহনলালের পত্র

"হরিদাস ! এ সময় আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, অন্তরের কষ্ট অন্তরে রহিল। তোমার পরিচয়টি জানিবার নিমিত্ত তুমি আমাকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলে কিছুই আমি বলি নাই। দুর্জ্জয় বিষয়-লোভ আমাকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। অর্থের নিমিত্ত স্নেহ, ভক্তি, দয়া, মমতা, ধর্ম্মজ্ঞান

সমস্তই আমি বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম ; অধিক কথা কি, ত্রিলোকের সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকেও ভুলিয়াছিলাম ! অর্থ-সংগ্রহের সময়, অর্থ-সঞ্চয়ের সময় আমার কেবল অর্থজ্ঞান উজ্জ্বল থাকিত, অপরাপর সমস্ত বিষয়ে আমি জ্ঞানশূন্য থাকিতাম। সংসার অনিত্য, বিষয় অনিত্য, জীবন অনিত্য, এত দিন এ জ্ঞান আমার ছিল না। এখন—সেই জ্ঞানময় জ্ঞানদাতা জগদীশ আমাকে সংসারের অনিত্যতা জানাইয়া দিতেছেন ; আমার জীবন যায় ! আমি বুঝিতে পারিতেছি, ইহ-সংসারে আর আমি বাঁচিয়া থাকিব না। হরিদাস ! এই আমার আসন্নকাল ; আসন্নকালে তোমার মুখখানি দেখিতে পাইলাম না, ইহা আমার মহাপাপের প্রতিফল ! হরিদাস ! এখন আমি সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি ; ক্ষেমঙ্কর জগদীশ্বর যদি আমাকে ক্ষমা করেন, সেই আশায় আমার এই প্রায়শ্চিত্ত। বৎস ! তুমিও আমাকে ক্ষমা করিও !

হরিদাস ! তোমার হরিদাস নামটি বড় মিষ্ট। হরিনামের মধুরতা এত দিন আমি অনুভব করিতে সমর্থ হই নাই, এখন—এই অসময়ে সেই হরিনাম আমি সার করিয়াছি। তুমিই হরিদাস ; হরিনামের কি মাহাত্ম্য, তুমিই তাহা বুঝিয়াছ। যথার্থই তুমি হরিদাস। হরি তোমাকে মহা মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া দয়াময় নামের পরিচয় দিয়াছেন। জগতে যত দিন তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, —আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দীর্ঘজীবী হও,—যত দিন তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, দয়াময় হরি তোমাকে তত দিন নিরাপদে রক্ষা করিবেন ; সর্ব্বত্র তোমার মঙ্গল হইবে।

হরিদাস ! আমি তোমাকে হরিদাস বলিয়াই সম্বোধন করি, এখন তুমি নিজের পরিচয় পরিজ্ঞাত হও ; রাজ্য-সুখ-সম্পদে চিরসুখী হইয়া ইহসংসারে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর পবিত্র ক্রোড়ে বিরাজ কর ! পরিচয় শ্রবণ কর।

বর্দ্ধমান জেলার মনোহরপুর গ্রামে আমাদের পৈতৃক নিবাস। স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ ঘোষ মহাশয়ের দুই পুত্র ;—জ্যেষ্ঠ দয়ালচাঁদ ঘোষ, কনিষ্ঠ এই হতভাগ্য আমি, শ্রীমহোনলাল ঘোষ। পিতা বর্ত্তমানে আমাদের উভয় সহোদরের বিবাহ হয়। শৈশবে যাঁহার ধর্ম্মের সংসারে কিছুদিন তুমি আশ্রয় লাভ করিয়াছিলে, সেই সর্ব্বানন্দ বসু মহাশয়ের দুটি কন্যাকে আমরা দুই সহোদরে বিবাহ করি। জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী ; আমার অগ্রজ দয়ালচাঁদ ঘোষ মহাশয় সেই শ্যামাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠা শ্রীমতী উমাকালী দাসী আমার সহধর্ম্মিণী। যথাসময়ে আমার পূজনীয়া জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। অন্নপ্রাশনের পর সেই পুত্রের নামকরণ হয়, প্রবোধকুমার। আমার পুত্র-কন্যা কিছুই জন্মে নাই। প্রবোধকুমারের মুখদর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে নিদারুণ হিংসার সঞ্চার হয়। পিতামহের পরম আদরের ধন প্রবোধকুমার, পিতা-মাতার পরম আদরের ধন প্রবোধকুমার। হিংসাবশে সেই প্রবোধকুমারকে সংসার হইতে বিদায় করিবার নিমিত্ত আমার নির্ম্মম হৃদয়ে নিদারুণ বাসনা, আবির্ভাব হইয়াছিল। পিতামহ বর্ত্তমান পিতামাতা বর্ত্তমান,

শীঘ্র আমি সেই দুর্ম্মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি নাই। প্রবোধকুমারের বয়স যখন দুই বৎসর কিম্বা কিছু কম দুই বৎসর, সেই সময় আমাদের দেশে ছেলে-ধরার অতিশয় ভয় হইয়াছিল ; ছোট ছোট বালক-বালিকাকে পথে নিঃসহায় দেখিতে পাইলেই ছেলেধরারা তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত। আমার মনের ভিতর নিয়ত দুশ্চেষ্টা খেলা করিতেছিল, আমি একটা সুযোগ পাইলাম। চৈত্র-মাসে চড়কপূজার সময় আমাদের গ্রামে মেলা হয়, মেলাতে অনেক লোক জমে, দাসী-চাকরের সঙ্গে ভদ্র ভদ্র গৃহস্থের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও মেলা দেখিতে যায়। সেই বৎসরের মেলার সময় প্রবোধকুমারও একজন দাসীর কোড়ে উঠিয়া মেলা দেখিতে গিয়াছিল। দাসী তাহাকে একটা দোকানে বসাইয়া পুতুল কিনি-বার জন্য অন্য একটা পুতুলের দোকানে যাইবে বলিয়া ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রবোধকুমার সেই সময় একাকী পূর্ব্বোক্ত দোকান হইতে বাহির হইয়া ভিড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সময় তাহাকে ছেলেধরারা লইয়া যায়।

হরিদাস ! মনে করিয়া লও, ছেলেধরা আর কেহই নহে, ছেলেধরা আমি। আমার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বাহিরে বাহিরে আমার জনকতক চাকর ছিল ; তাহাদের মধ্যে প্রধান একজন জটাধর তরফদার। সেই জটাধর তরফদার আমার উপদেশে আমাদের প্রবোধকুমারকে হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে মাধবাচার্য্যের গৃহে লইয়া লুকাইয়া রাখে। পরিচয় কিছুই দেয় নাই বলিয়া-ছিল, পিতৃ-মাতৃহীন বালক ; মাসে মাসে ইহার ভরণ-পোষণের জন্য টাকা আসিবে, বালক যেন কোথাও যাইতে না পারে। মাধবাচার্য্য গরিব ব্রাহ্মণ, মাসে মাসে টাকা পাইবার লোভে শিশুটিকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। মাসে মাসে বেনামী চিঠিতে আমি তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইয়া দিতাম। দুই বৎসরের শিশু, কোন জ্ঞান ছিল না, কিছুই জানিত না, আচার্য্যের গৃহেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এদিকে সেই দাসীটি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বাড়ীতে সংবাদ দিয়াছিল, খোকাটি হারাইয়া গিয়াছে, কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বাটীতে ক্রন্দনের কোলাহল উঠিল, অন্বেষণের জন্য চতুর্দ্দিকে লোকেরা ধাবিত হইল ; আমা-দের বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে খুঁজিতে বাহির হইলেন ; আমার জ্যেষ্ঠ সহো-দর দয়ালচাঁদ ঘোষও পুত্রের অন্বেষণে ছুটিয়া চলিলেন, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আমিও অন্বেষণে বাহির হইলাম। খুঁজিয়া গ্রামখানা তোলপাড় করা হইল, কোথাও শিশুটিকে পাওয়া গেল না। শিশুর গর্ভধারিণী শোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ! সকলেই সেই শিশুটিকে বড় ভালবাসিত, সকলেই শোকে বিহ্বল।

হরিদাস ! বৎস ! তুমিই সেই অপহৃত শিশু, তুমিই সেই আদরের ধন প্রবোধকুমার, তুমিই আমাদের একমাত্র বংশধর। একমাস গেল ; তোমার নিরুদ্দেশে, তোমার শোকে তোমার পিতামহ—আমাদের বৃদ্ধপিতা প্রেমচাঁদ ঘোষ মহাশয় উদরাময়রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অশৌচান্ত

হইবার অগ্রেই তোমার জন্মদাতা পিতা—আমার! স্নেহাস্পদ জ্যেষ্ঠভ্রাতা দয়াল-চাঁদ ঘোষ মহাশয় অকস্মাৎ বাটীর মধ্যে সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

হরিদাস! এখনো আমি তোমাকে হরিদাস বলিব ;—হরিদাস! তোমার শোকে তোমার পিতামহের মৃত্যু, সর্পবিষে তোমার জন্মদাতার মৃত্যু,......... কিছুই তুমি জানিতে পার নাই। তাঁহাদের উভয়েই মৃত্যুর কারণ এই হতভাগ্য আমি! এই পত্রখানি পাঠ করিবার সময় তুমি আমাকে ক্ষমা করিও! তোমাকে আমি তফাৎ করিলাম, আমার পিতা লোকান্তরে গমন করিলেন, তোমার পিতাও অকালে সংসারত্যাগ করিয়া গেলেন ; আমার পিতার জমিদারী ছিল, সমস্ত বিষয়ের অধিকারী আমি একাকী হইলাম। আমার দুর্দ্দমনীয় বিষয়লোভই—আমার পাপমুলিনী দুষ্প্রবৃত্তিই আমার অধঃপতনের প্রধান হেতু।

পৈতৃক বিষয়ের ষোল আনার অবিরোধী অধিকারী হইয়াও আমার লোভের শান্তি হইল না ; ছলে কৌশলে আরও কতকগুলি লোকের পরিবারবর্গকে কাঁদাইয়া, নিরাশ্রয় করিয়া, আমি আপনার বিষয়-বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট রহিলাম। হুগলীজেলার আমার একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি জমীদার ; তাঁহার নাম রাম-লোচন মিত্র। বিষয়কার্য্যে আমার নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল ; রামলোচন মিত্র তাদৃশ বুদ্ধিমান ছিলেন না, সময়ে সময়ে বিষয়কার্য্য-সম্বন্ধে—মামলা-মোকদ্দমা-সম্বন্ধে তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাটীতে আমি যাই-তাম, তিনিও আমাদের বাটীতে আসিতেন। পরস্পর ঘনিষ্ঠতায় বন্ধুত্বভাবটা আরও পাকাপাকি হইয়াছিল। হরিদাস! তুমি অপহৃত হইবার তিন বৎসর পরে সেই রামলোচন মিত্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, দুটিমাত্র ছোট ছোট কন্যা ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে রুগ্নশয্যাশায়ী হইয়া রামলোচন মিত্র আমাকে সংবাদ দেন। আমি উপস্থিত হই ; আমার সাক্ষাতেই তাঁহার পত্নীর নামে তিনি উইল করেন। সেই উইলে আমাকে তিনি অছি নিযুক্ত করিয়া যান ; তাঁহার পত্নীও আমার নামে আমমোক্তারনামা লিখিয়ে দেন। উভয় ক্ষমতার ক্ষমতা-শালী হইয়া আমি তাঁহার বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধান করি। লোভ অতি ভয়ঙ্কর রিপু! অনেক টাকার বিষয়, লোভরিপুর একান্ত বশম্বদ আমি ; বন্ধুর মূল্য-বান সম্পত্তির লোভসংবরণে আমি অক্ষম হইলাম। জমীদারীর সদর মালগুজারী বাকী ফেলিয়া আমি নিজেই বেনামীতে সেই সকল জমীদারী নীলামে ডাকিয়া খরিদ করিয়া লই ; ছোট ছোট দুটি কন্যার সহিত রামলোচনের পত্নীকে স্থানান্তরে সরাইয়া ফেলি। ভয় দেখাইয়া বন্ধুর পত্নীকে বলিয়া দিয়াছিলাম, 'এ সকল কথা যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে তোমার মহা বিপদ ঘটিবে। তোমার স্বামীর অনেক টাকা ঋণ আছে, আরও তাঁহার গোপনীয় দুষ্কার্য্য অনেক আছে, তুমি তাহার পত্নী, লোকে এ কথা জানিতে পারিলে, মহাজনেরা তোমার স্বামীর দ্বারা যাহারা অপকৃত হইয়াছে, তাহারা তোমাকে ক্ষমা করিবে না ; অতএব কাহারও নিকটে তুমি তোমার পরিচয় দিও না।' সরলা অবলা বিধবা তাহাতেই ভয় পাইয়া সম্মত হইয়াছিলেন : কন্যা দুটির সহিত তাঁহাকে

আমি বীরভূমে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। সেই ষড়যন্ত্রের মূলও উক্ত জটাধর তরফদার ; জটাধরের বাড়ীতেই তাঁহারা থাকেন রামলোচন মিত্রের পত্নী এবং কন্যাদুটি জটাধরেরই পত্নী এবং জটাধরেরই কন্যারূপে পরিচিতা হন।

আমি এখানে তাঁহাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া নিরুদ্বেগে ভোগ করিতে থাকি। জটাধর তরফদার হীনবংশীয় কায়স্থ, অত্যন্ত গরিব, অত্যন্ত পাপাসক্ত ; আমার দত্ত মাসিক বেতনে তাহার সংসার চলিত পাপ-প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হইত। রামলোচনের পত্নীর সহিত তাহার অন্য সংস্রব কিছুই ছিল না, মুখের কথায় লোকে জানিত, কেবল পরিচয়ে পতি-পত্নী সম্পর্ক।

হরিদাস! তোমার স্মরণ হইতে পারিবে, যে রাত্রে ভেলুয়াচটিতে একখানা ঘরে আগুন লাগে, সেই রাত্রে আগুনের মুখ হইতে তুমি একটি যুবতীকে উদ্ধার করিয়াছিলে। আমি বলিয়া ছিলাম, সেটি আমার নতুন পরিবার ; বস্তুতঃ সে কথা মিথ্যা, আমি তাহাকে বিবাহ করি নাই। সেই কন্যাটি পূর্ব্ব-কথিত রামলোচন মিত্রের জ্যেষ্ঠ কন্যা, জটাধর তরফদারের গৃহে পালিতা। তুমি তাহাকে অমরকুমারী মনে করিয়াছিলে, অমরকুমারী বলিয়া ডাকিয়া ছিলে, আমি তখন তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। রামলোচন মিত্রের কন্যাদুটির নাম আমি জানিতাম না, শেষে জানিয়াছিলাম, বড়টির নাম সমরকুমারী ; সেইটিকে আমি পরিবার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। তাহার বিবাহ হয় নাই, কুমারী অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার নিকটে তাহার কুমারীধর্ম্ম রক্ষিত হয় নাই। রামলোচনের ছোট মেয়েটির নাম অমরকুমারী ; জটাধরের বাড়ীতেই সেই মেয়েটি ছিল, জননীর মৃত্যুর পর কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। যদি বাঁচিয়া থাকে, যদি তুমি তাহার পিতার সম্পত্তি—যাহা আমি অধর্ম্ম বুদ্ধিতে অপহরণ করিয়াছিলাম, আমার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া তুমি অমরকুমারীর সেই পৈতৃক-সম্পত্তি সেই কুমারীকে প্রত্যর্পণ করিও।

এই স্থানে আমার শ্বশুরালয়ের কথা। আচার্য্যের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার শ্বশুরের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলে। আমার শ্বশুর, এ পরিচয়টা তোমার পক্ষে কিছু দূর-সম্পর্ক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ; অতএব কিছু স্পষ্ট করিয়া বলি পূর্ব্বে যেরূপ পরিচয় দিয়া আসিয়াছি, সর্ব্বানন্দবাবুর দুটি কন্যাকে আমরা দুই সহোদরে বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার গর্ভে তোমার জন্ম, সর্ব্বানন্দবাবু তোমার মাতামহ ; উপযুক্ত স্থলেই তুমি আশ্রয় পাইয়াছিলে। তাঁহার নিকট হইতে তোমাকে আমি আমার নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার আকিঞ্চন পাইয়াছিলাম, তাহাও হয় তো তোমার মনে আছে, তুমি যাইতে সম্মত হও নাই। তোমার জননী আমার মনোহরপুরের বাটীতেই রহিয়াছেন, তাঁহাকে আমি মাসিক এক-শত টাকা করিয়া প্রদান করিয়া থাকি। সর্ব্বানন্দবাবুর মৃত্যুর পর বর্দ্ধমানের বাটীতে তাঁহাকে তুমি দেখিয়াছ ; কিন্তু চিনিতে পার নাই, তিনিও হয় তো তোমাকে চিনিতে পারেন নাই। এইবার তুমি বর্দ্ধমানে গেলেই জননীকে দর্শন

করিয়া চিনিতে পারিবে। হায়! হায়! সর্ব্বানন্দবাবুকে * * * ডাকাতেরা কাটিয়া ফেলিয়াছে! হায়! হায়! এইখানে তুমি আর একটি মূলকথা জানিয়া রাখ। খুনের পর সর্ব্বানন্দবাবুর বৈঠকখানার লৌহসিন্দুক হইতে যে উইল খানি বাহির হইয়াছিল সে উইলখানি জাল-উইল। পূর্ব্বে আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, উইলে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তিন কন্যার নামে সমান সমান অংশে দানের কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কথাই সত্য। আসল উইলখানি কোথায় আছে, তাহা আমি বলিতে পারিলাম না, আমার বাক্য প্রমাণে সেই আসল উইলের মর্ম্মানুসারে তুমি কার্য্য করিও। জাল-উইলখানি যদি তোমার হস্তগত হয়, অনলে দগ্ধ করিয়া ফেলিও। বিষয়লোভে আমি * * * অনন্ত পাপ করিয়াছি! ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন কি না, জানি না! আমার পত্নী শ্রীমতী উমাকালী দাসী তোমার মাসী, তাহা তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ; তাহাকে বিষয়াধিকারিণী না করিয়া তোমা-কেই আমি সমস্ত সম্পত্তির দান করিলাম, তোমার মাসীর প্রতি তুমি সদ্ব্যবহার করিও। উপযুক্ত পাত্রের সহিত আশালতার বিবাহ হইয়াছে, আশালতা এখন শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। তোমার মাতামহী জীবিত, তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া আশালতার পৈতৃক বিষয়ের পূর্ণ তৃতীয়াংশ আশালতাকে তুমি প্রদান করিও। তুমি আমাদের একমাত্র বংশধর,—সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত, তোমাকে আর অধিক অনুরোধ করা বাহুল্য পাঠ মাত্র।

আমার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহার উপর আমি অনেক বৃদ্ধি করিয়াছি; আমার বিশ্বস্ত দেওয়ান শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন দত্ত মহাশয় সমস্তই জ্ঞাত আছেন, খাতাপত্র কোথায় কি আছে, সমস্তই তিনি জানেন, সমস্তই তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন। সম্প্রতি আমি লণ্ডনের এক স্ফূর্ত্তি খেলাতে লক্ষটাকা জিতিয়াছিলাম, সে টাকার মুখ আমি দেখিতে পাইলাম না, হয় তো দেখিতেও পাইব না, তুমি সেই টাকাগুলি আদায় করিয়া লইও।

আমি কৃপণ; ধনাগম-তৃষ্ণা আমার চিরদিন অত্যন্ত প্রবল! ধর্ম্মের পূজা আমি করি নাই, চিরদিন অধর্ম্মের সেবা করিয়াছি; পৈতৃক বিষয় ব্যতীত যাহা কিছু আমার স্বোপার্জ্জিত, তৎসমুদায়ই প্রায় অধর্ম্মার্জ্জিত। সে ধনে আমার মায়া ছিল সেই জন্যই আমি কৃপণ। শৈশবাবধি পাপকার্য্যে আমার অত্যন্ত অনু-রক্তি; পাপকার্য্য সাধনের সময় আমি কৃপণ ছিলাম না, কেবল সৎকার্য্যেই আমি কৃপণ; দুষ্ক্রিয়া সাধনার্থ নিরন্তর আমি অপব্যয়-স্রোতে সন্তরণ দিয়াছি। লোকের মন্দ করিবার মৎলবে অপব্যয়ে অপব্যয়ে আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া ছিলাম।

আমার দুঃস্বভাব দর্শন করিয়া পিতা আমার হস্তে টাকা দিতেন না। বড়-লোকের পুত্র আমি, মহাজনগণের নিকট খৎ লিখিয়া অবাধে টাকা কর্জ্জ করি-তাম, শোধ করিতে পারিতাম না, সেইজন্য শ্বশুর মহাশয়ের তহবিল হইতে বারম্বার অধিক টাকা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম; তদুপলক্ষে শেষ-কালে শ্বশুর মহাশয়ের সহিত আমার মনোবাদ ঘটে। * * * জাল-উইল প্রস্তুত করিবার হেতুও তাহাই। হরিদাস! প্রায় সকল কথাই আমি তোমাকে

খুলিয়া লিখিলাম ; এই পত্রিকাখানি যখন তোমার হস্তগত হইবে, এই পত্রিকাখানি তুমি যখন পাঠ করিবে, ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে, বর্ণে বর্ণে, আমার চরিত্রের প্রকৃত ছবি তখন তুমি স্পষ্ট স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। তোমার প্রতি আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, তোমাকে আমি বিস্তর কষ্ট দিয়াছি, তোমাকে আমি মহা মহা বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি, এই আসন্নকালে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তাহা আমি স্বীকার করিতেছি, ক্ষমা পাইলে পাপের লাঘব হয়, অতএব পুনর্ব্বার বলিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

ইংরাজের অনুগ্রহে আমি রাজা উপাধি পাইয়াছিলাম ; আমার বংশে যিনি আমার উত্তরাধিকারী হইবেন, সেই উপাধি তিনি প্রাপ্ত হইবেন, ইংরাজ বাহাদুর আমার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার জীবনান্তে তুমি রাজা উপাধি ধারণ করিবে, তোমার পুত্র-পৌত্রেরাও রাজা হইবে। আমি দুষ্ক্রিয়াসক্ত, আমি কৃপণ, আমি পাতকী, কি প্রকারে আমার রাজা উপাধি লাভ হইয়াছিল, তাহাও তুমি অবগত হও। দেশের লোকের উপকারের নামে এবং বড় বড় সাহেবলোকের মরণান্তে স্মরণস্তম্ভ নির্ম্মাণে সাহেবলোকের চাঁদার খাতায় মোটা মোটা দান দস্তখৎ করিয়া কোম্পানী লোকের হস্তে দিনকতক আমি অনেক টাকা অর্পণ করিয়াছিলাম। আমার অন্তর সাগরে যে সকল পাপতরঙ্গ প্রবাহিত হইত, সাহেবেরা তাহা দেখিতে পাইতেন না, চাঁদার টাকার আবরণে তাহাদিগের নিকটে আমার সকল দোষ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের নিকটে আমি একজন দাতালোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলাম, সেই সুপারিসেই আমি রাজা।

জটাধর তরফদার আর তাহার সমধর্ম্মা লোকেরা আমার নিকট বেতন প্রাপ্ত হইত, আমার নাম লুকাইয়া আমার জন্যই তাহারা বড় বড় দুষ্কার্য্য সাধন করিত। সম্প্রতি প্রায় সাতমাস হইল, বালেশ্বর জেলার একটা বড় জমিদারী বিক্রীত হইবার ইস্তাহার আমি পাঠ করি, বায়নাস্বরূপ দশ হাজার টাকা সেই জটাধরের হস্তে আমি প্রদান করিয়াছিলাম। জটাধর বালেশ্বরে যায় নাই। আমি শুনিয়াছি, সে জমিদারী অন্য লোকে খরিদ করিয়াছে, তদবধি আমার সেই টাকাগুলির সহিত জটাধর তরফদার অদৃশ্য। আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহার নামে আমি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছি। জটাধরের গ্রেপ্তারের সংবাদ আমাকে শুনিতে হইল না। জটাধর ধৃত হইলে তুমি সেই পাপিষ্ঠের উপযুক্ত দণ্ড দর্শন করিয়া সন্তোষলাভ করিতে পারিবে, আমি সেইরূপ আশা করি।

বড় বড় কথা যতদূর স্মরণ করিতে পারিলাম, এই পত্রিকায় তাহা লিখিয়া দিলাম ; যেগুলি আমি বলিতে পারিলাম না, যেগুলি এখন আমার স্মরণপথে আসিল না, আমার বিশ্বস্ত দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিলোচন দত্তজ মহাশয়ের প্রমুখাৎ যথাসময়ে তৎসমস্ত তুমি শ্রবণ করিতে পারিবে। ইতি।

সন ১২৬৪ সাল, তারিখ ৫ই আষাঢ়। — আশীর্ব্বাদক শ্রীমোহনলাল ঘোষ

পত্রপাঠ সমাপ্ত হবার পর দেওয়ানজী মহাশয় সজল-নয়নে আমার মুখপানে চাইলেন, দীনবন্ধুবাবু স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। আমার অন্তরে বাহিরে স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, বিস্ময়, আনন্দ, বিষাদ একত্র! যতক্ষণ আমি পত্রিকাখানি শ্রবণ কোল্লেম, যদিও ততক্ষণ আমার মন অন্যদিকে ছিল না, তথাপি আমি যেন ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেম। রাজা মোহনলাল ঘোষ আমার পূজনীয় পিতৃব্য, সংসারের মহা মহা পাপে তাঁহার অন্তরাত্মা কলুষিত, সেইটি স্মরণ কোরে নিমেষ-শূন্য নয়নে দেওয়ানজীর মুখের দিকে আমি চেয়ে থাকলেম। এত কথা আমি জানতেম না, তথাপি ডাক্তারের হস্তে যখন তাঁর ভগ্ন উরু বিকর্ত্তিত হয়, সেই সময় অভাবনীয়রূপে মাইকেলের সেই কবিতাটি আমার মনে হয়েছিল—

"ভগ্ন উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে।"

ঠিক মনে হয়েছিল! রাজা দুর্য্যোধন এক বিশাল রাজ্যের রাজা ছিলেন, সে তুলনায় বাবু মোহনলাল একজন সামান্য তালুকদার মাত্র। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডুপুত্রগণকে দেশত্যাগী—বনবাসী কোরে বিধিসিদ্ধ পৈতৃক রাজ্য-সম্পদে বঞ্চিত করবার অভিপ্রায়ে কত খেলা খেলেছিলেন, ভারতযুদ্ধে প্রায় সমস্ত ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল কোরেছিলেন, তুলনায় অযোগ্য হোলেও বাবু মোহনলাল অনেকাংশে মহামান্য রাজা দুর্য্যোধনের প্রকৃতিপ্রাপ্ত ছিলেন এই কথাই তখন আমার মনে হলো। লোভারপুর বশংবদ রাজা মোহনলাল নিজ পত্রে কেবল এই কথাটি স্বীকার কোরেছেন; কিন্তু আগাগোড়া পর্যালোচনা কোরে আমি দেখলেম, বাস্তবিক তিনি কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর কৃতদাস হয়েই ধরাতলে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন পত্রিকাখানি শ্রবণ কোরে আমার এই এক মহোপকার হলো যে, যে সকল ভয়ানক ভয়ানক গুহ্য-তত্ত্ব ইহজন্ম আমার পরিজ্ঞাত হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, সেই সকল তত্ত্ব আমি অবগত হোতে পাল্লেম; যেগুলি পাল্লেম না, যেগুলি এখনো ভাল কোরে বুঝলেম না, পত্রের যে যে স্থলে অপ্রকাশ চিহ্ন অঙ্কিত, সে সকল স্থলের কি কি কথা, যদিও সেগুলি আমি অনুমানে আনয়ন কোত্তে পাল্লেম না তথাপি, পত্রিকার শেষে লেখা আছে, দেওয়ানজীর মুখে সেই-গুলি আমি শ্রবণ কোত্তে পারবো, তা হোলেই সমস্ত কূট সমস্যার পূরণ হবে, এই আমার আশা।

চিত্ত মহা উদ্বিগ্ন; প্রাচীরান্তরালে এই বাড়ীর অন্দরমহলে আমার গর্ভধারিণী জননী; জননীর পাদপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্তই চঞ্চল। জন্মা-বধি আমি জননী দর্শন করি নাই! না না, সে কি কথা? একটিবার মাত্র সে পাদপদ্ম আমি দর্শন কোরেছি। চিনতেম না, তবুও কিন্তু সে পাদপদ্ম একবার আমি দর্শন কোরেছি। সর্ব্বানন্দবাবুর খুনের পরমপিতৃশোকাতুরা রোদনমুখী অশ্রুমতী পিত্রালয়ে আগমন কোরেছিলেন, তারে আমি দেখেছি, তিনি আমারে দেখেছেন; আমারে দেখে দেখে দুই তিনবার তাঁর চক্ষে জল এসেছিল, অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি অশ্রুমার্জ্জন কোরেছিলেন, তাও আমার মনে আছে।

তখন আমি কিছু বুঝতে পারি নাই, তিনিও হয় তো নিঃসংশয়ে আমারে চিনতে পারেন নাই ; এইবার তাঁর চরণতলে নিপতিত হয়ে সমস্ত দুঃখের অবসান কোরবো, মা মা বোলে নয়ননীরে সেই যুগল পাদপদ্ম অভিষিক্ত কোরে ইহসংসারে আমি চরিতার্থ হব ! কিন্তু কখন ?—কতক্ষণে সেই শুভ অবসর উপস্থিত হবে ?

ভাবতে ভাবতে আমার মনে আর একটা তর্কের উদয় হলো। সর্ব্বানন্দ-বাবুর খুনের পর মোহনলালবাবু বেলা দুই প্রহরের মধ্যে সস্ত্রীক সেই বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন, জ্যেষ্ঠা কন্যাটি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসেন। সেরূপ অগ্র-পশ্চাৎ আগমনের হেতু কি ছিল ? উভয় ভগ্নীই যখন এক বাড়ীতে থাকেন, এক বাড়ীতেই ছিলেন, তখন স্বামীর সঙ্গে একজন এলেন সকালবেলা, দ্বিতীয়টি একাকিনী এলেন সন্ধ্যাবেলা। কারণ কি ? মোহনবাবুর পত্রে যেরূপ আমি অবগত হোলেম, তাতেই প্রকাশ, তাঁর হৃদয়গত মতলব, মনোগত ফন্দী সাধারণ মনুষ্যের নিতান্ত দুর্ব্বোধ ছিল। পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদে দুটি কন্যা একসঙ্গে উপস্থিত হোলেন না, সেটাও হয় তো মোহনবাবুর কোন প্রকার কূটবুদ্ধির ফল। সংবাদটি হয় তো তিনি এক সময়ে উভয় ভগ্নীকে জানান নাই, কি মতলবে হয় তো আমার জননীকে ঠিক সময়ে কিছু না জানিয়ে আপনারা অগ্রে চোলে গিয়েছিলেন, তার পর বাড়ীর লোকের মুখে সংবাদ পেয়ে হয় তো আমার জননী শেষকালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেটা আমার আনুমানিক সিদ্ধান্ত ; প্রকৃত কারণ এখন নির্ণয় করবার উপায় নাই।

হরিদাসের গুপ্তকথা

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম কল্প

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান

রজনী প্রভাত হলো। দেওয়ানজীকে আমি বোল্লেম, "সমস্তই তো আপনি অবগত আছেন, যা কিছু অজ্ঞাত ছিল, ঐ পত্রলিখন সময়ে তাও আপনি পরিজ্ঞাত হয়েছেন। আমার জননী ঠাকুরাণী এই বাড়ীতেই উপস্থিত আছেন, বিধাতার ইচ্ছায় এখন আমি এই বাড়ীতে উপস্থিত। এই বাড়ীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, পূর্ব্বে আমি জানতেম না, কখনো এ বাড়ীতে আমি আসিও নাই. এই আমার নূতন আসা জননীর শ্রীচরণ দর্শন কোরে জীবন সার্থক করি, এই আমার অভিলাষ, আপনি অনুমতি করুন।"

দেওয়ানজী বোল্লেন, "এখন না ; তুমি এখানে এসেছ, তোমার পরিচয় তুমি জ্ঞাত হয়েছ, তোমার জননী এ কথা এখনো শ্রবণ করেন নাই। তাঁরা এখন শোকাতুরা, এখনই তুমি গিয়ে উপস্থিত হোলে হয় তো শোকতরঙ্গ প্রবল হবে ; আর দুই একদিন ধৈর্য্য ধারণ কর, অন্য লোকের দ্বারা অগ্রে তোমার জননীকে আমি এ সংবাদ জানাই, তার পর তুমি গিয়ে সাক্ষাৎ কোল্লেই ভাল হবে।"

আশাভঙ্গের উপক্রমে অন্তরে বেদনা অনুভব কোরে তাঁরে আমি বোল্লেম, "আপনি বিজ্ঞ, এমন আশঙ্কা আপনি কেন কোচ্ছেন ? আমি সন্তান, দুই বৎসর বয়সে জননীক্রোড় শূন্য কোরে আমি অদৃশ্য হয়েছিলেম ; এত দিনের পর আমি এসেছি, জননীকে দর্শন কোরবো. নিরুদ্দিষ্ট সন্তানকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর শোকতরঙ্গ প্রবল হয়ে উঠবে, এটা আপনার কেমন কথা ? আপনি বোলছেন, অন্য লোকের দ্বারা সংবাদ দিয়ে তার পর আমারে জননী-দর্শনে পাঠাবেন ; আচ্ছা ভাবুন দেখি, জননী তা হোলে কি মনে কোরবেন ? অন্য কোন জাতিকুটুম্ব নয়, অপর কোন নিঃসম্পর্কীয় লোক নয়, আমি তাঁর গর্ভজাত পুত্র, তিনি আমার গর্ভধারিণী জননী, দীর্ঘকাল অদর্শনের পর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সংবাদ দিয়ে সাক্ষাৎ করা কেমন দেখায়, কেমন শুনায়, সেটি এবার আপনি ভাবুন দেখি ! কোন সংবাদ ছিল না, এখন এই দৈবসংঘটন, অগ্রে সংবাদ দিয়ে জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, এটি আপনার কিরূপ পরামর্শ ?"

আমার এ প্রশ্নে দেওয়ানজী আর কোন প্রকার উত্তর দিতে পাল্লেন না, কাজেই তখন তাঁরে সম্মতি দান কোত্তে হলো। আমি অন্দরমহলে জননী দর্শনে যাব ; কিন্তু কার সঙ্গে যাব ? একাকীই যেতে পাত্তেম, কিন্তু অন্দরের পথ আমার জানা ছিল না ; কোন দিকে অন্দর, কোন দিক দিয়ে যেতে হয়, তাও আমি জানি না। একটি সঙ্গী চাই ; কে আমার সঙ্গী হয় ? দাসী-চাকরেরা

দুই মহলেই যাওয়া আসা করে ; একজন বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে আমি অন্দরে প্রবেশ কোল্লেম। বেলা প্রায় ছয় দণ্ড।

পূর্ব্বে বোলেছি, জননীকে পূর্ব্বে আমি দেখেছিলেম মাসীমাকেও দেখে-ছিলেম, দেখলেই চিনতে পারবো। কোন ঘরে তাঁরা আছেন, কোন্ দিকে তাঁরা আছেন, প্রবেশ কোরে অগ্রে আমি কিছু নির্ণয় কোত্তে পাল্লেম না। চতুর্দ্দিকে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, স্ত্রীলোকও ছিল, মাঝে মাঝে দুই এক-জন পুরুষও ছিল, আমার কাচা পরা ; সকলের চক্ষেই আমি অচেনা, কাচা গলায় দিয়ে আমি অন্দরে প্রবেশ কোরেছি, বিস্মিত নয়নে সকলেই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরে সেই বৃদ্ধা কিঙ্করীর সঙ্গে আমি সরাসর একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। সেই ঘরেই আমার গর্ভ-ধারিণী, সেই ঘরেই তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী উমাকালী, আমার মাসীমা, এ বাড়ীর সম্পর্কে কাকীমা। অশ্রুনেত্রে অগ্রে জননীচরণে, তৎপর কাকীমার চরণে আমি প্রণিপাত কোল্লেম ; তাঁরা উভয়েই চমকিত-নয়নে আমার মুখ পানে চেয়ে থাকলেন। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কোরেছিলেম, উঠে দাঁড়ালেম। দর দর কোরে আমার দুটি চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত। জননীর মুখের দিকে চেয়ে গদগদ স্বরে আমি বোল্লেম, "মা ! আমি হরিদাস, আমি তোমার সেই স্তন্য পায়ী শিশু প্রবোধকুমার।"

অল্পক্ষণ অনিমেষে শুষ্কনেত্রে আমার বদন নিরীক্ষণ কোরে জননী চক্ষের জলে ভেসে গেলেন, কাকীমাও অশ্রু সংবরণ কোত্তে পাল্লেন না। অতি ধীরপদে আমার নিকটবর্ত্তিনী হয়ে জননী আমার কপালের চুলগুলি অল্পে অল্পে কাণের কাছে সোরিয়ে দিয়ে তিনি যেন দর্শন কোল্লেন, সেই সময় তাঁর অশ্রুধারা কপোল-দেশ প্লাবিত কোরে বক্ষের বস্ত্র অভিষিক্ত কোরে দিল। শোকব্যঞ্জক, স্নেহব্যঞ্জক, অস্ফুট স্বরে তিনি তখন কি কতকগুলি কথা বোলতে বোলতে সস্নেহে আমার কেশাগ্র চুম্বন কোল্লেন। কথাগুলি আমি স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝতে পাল্লেম না, আমার মুখেও তখন আর একটি কথাও নির্গত হলো না, আমার কাকীমা সজল-নেত্রে আমাদের উভয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন, মুখেও তখন বাক্য নাই। সেই সময়ের কিরূপ অভিনয়,—শোকের সঙ্গে আনন্দ, আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়, বিস্ময়ের সঙ্গে স্নেহবিকাশ ! শোকাশ্রু, আনন্দ শ্রু, স্নেহাশ্রু এক সঙ্গে পরিবর্ষিত ! সে অভিনয়ের সেই স্বাভাবিক দৃশ্য বর্ণনা কোরে বুঝবার নয়, যাঁরা ভুক্তভোগী, সেরূপ অভিনয় যাঁরা দর্শন কোরেছেন, তাঁরাই সেটি অনুভবে বুঝে নিতে পারবেন।

বঙ্গের কবিগণের বর্ণনায় এক এক স্থলে দেখা যায়, হরিষে বিষাদ। হরিষ কথাটা কবিতায় চলে। জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে, অশ্রুপাত কোরে, দুটি চারিটি কথা কোলেম, আমিও যেন তখন কবিদের মত কল্পনা কোল্লেম, বিষাদে হরিষ ! জননীর বদনে নয়নে অশ্রু থাকলেও—জননীর বদনে তো হর্ষ-চিহ্ন ছিলই, নববিধবা শোক-সন্তপ্তা খুড়ীমার মুখেও তখন আমি হর্ষচিহ্ন দর্শন কোল্লেম।

জননীর সঙ্গে তখন আমার কি কি কথা হয়েছিল, তিনিই বা কি বোলেছিলেন, আমি বা কি বোলেছিলেম, সে সব কথা এখন আমি বোলতে পাল্লেম না। আমার খুড়ীমা আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন, মুখখানি একটু প্রফুল্ল দেখলেম, কিন্তু সে মুখে তখন একটি বাক্যও নিঃসৃত হলো না।

বাহিরবাটীতে আমি চোলে আসছিলেম, সস্নেহে আমার একখানি হাত ধোরে সস্নেহ বচনে জননী বোল্লেন, "আর কেন তুমি বাহিরে যেতে চাও? তুমি আমার বুকের ধন, প্রাণের ধন, স্নেহের ধন, বংশের তিলক, ঘরের মাণিক, তুমি কেন বাহিরে যেতে চাও? বাহিরে আর যেয়ো না। ঘরের মাণিক ঘর আলো করে আমার কাছেই তুমি থাকো; আমার শূন্য ঘরখানি আলো কর।"

আমার খুড়ীমাও সস্নেহে সেই বাক্যগুলির প্রতিধ্বনি কোল্লেন। মাথা হেঁট কোরে সদরবাড়ীতে আমি চোলে আসছিলেম, মুখ তুলে চেয়ে দেখি, কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উভয়ের নেত্রেই পূর্ব্ববৎ অশ্রুধারা। স্নেহের বন্ধন বড় শক্ত;—শক্ত অথচ অতি কোমল। বাৎসল্যের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ। তখন আর আমার সদরবাড়ীতে আসা হলো না, অন্দরেই আমি থাকলেম।

আমি কে, বাড়ীর লোকেরা কেহই সে পরিচয় জানতো না, সেই দিন মুখে মুখে ক্রমে ক্রমে সকলেই জানতে পাল্লে। বিষাদের সময় সকলের মুখেই বিস্ময়ানন্দ-লক্ষণ লক্ষিত হোতে লাগলো, শোকের বেগ যেন অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়ে এলো। অন্দরেই আমি থাকলেম; সেই দিন অবধি অন্দরেই আমার শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো; এক একবার সদরবাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি। অশৌচান্তের দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছিল, দেওয়ানজীর সঙ্গে পরামর্শ কোরে সময়োচিত বন্দোবস্তে মনোযোগ দিই, অবশ্যকমত জিনিস-পত্রের ফর্দ্দ হয়, সকল লোকেই ব্যস্ত। প্রতিবাসী ভদ্রলোকেরা ক্রমে ক্রমে আমার পরিচয় পেলেন, লৌকিক ব্যবহারে তাঁরা অনেকেই আমাদের বাড়ীতে আসতে লাগলেন, বিস্ময়ভাবে গোপন রেখে মিষ্টবাক্যে সকলেই আমারে আপ্যায়িত কোল্লেন, আমি যেন তখন সকলের কাছেই চির-পরিচিতের ন্যায় আদরের সামগ্রী হয়ে উঠলেম।

দিন সমাগত। আমাদের বংশের যেরূপ নাম, যেরূপ মান-সম্ভ্রম, বিশেষতঃ ইদানীং রাজোপাধিলাভের পর খুড়া মহাশয়ের যেরূপ প্রতিপত্তি হয়েছিল, তদনুরূপ সমারোহে আদ্যশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করা হলো। সহস্র সহস্র নিমন্ত্রিত লোক সমাগত হয়ে উপস্থিত ক্রিয়া সম্পাদন করালেন, মর্য্যাদানুরূপ তৈজসপত্রাদি দানে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বিদায় করা হলো, দেওয়ানজী মহাশয়ের সুবন্দোবস্তে কাঙ্গালী-ভোজন ও কাঙ্গালী-বিদায়ের ব্যাপারটাও সুপ্রণালীক্রমে সমাধা হয়ে গেল; সকলের মুখেই ধন্য ধন্য রব। নিজমুখে আমার নিজের গৌরবপ্রকাশের নিমিত্ত না হোক, উপরত রাজাবাহাদুরের গৌরবস্মরণার্থে এইখানে আমি বোলে রাখি, এই শ্রাদ্ধে দানসাগর হয়েছিল।

আমার বয়স তখন একবিংশতি বর্ষ। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুরুগৃহ থেকে দূরীভূত হয়ে আমি নানাস্থানী হয়েছিলেম, ক্রমাগত সাত বৎসরকাল যে যে অবস্থায় যে যে স্থানে আমি ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি, পাঠক মহাশয় তৎসমস্ত পরিজ্ঞাত আছেন ; এখন আমি জননী-স্নেহের সুকোমল ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হয়ে নিজ পৈতৃক ভদ্রাসনে রাজসম্মানে সম্মানিত।

শ্রাদ্ধের পর একমাস অতীত। দীনবন্ধুবাবু স্বদেশে গমনের নিমিত্ত ব্যস্ত হোলেন, আমি তাতে বাধা দিতে পাল্লেম না। সেই সঙ্গে আমিও একবার মুর্শিদাবাদে যাই, এইরূপ আমার ইচ্ছা হয়েছিল, স্নেহময়ী অমরকুমারীকে দর্শন করবার জন্য অধীর হয়েছিলেম, দেবীরূপিণী অমরকুমারী অবিচ্ছেদে অহরহ আমার হৃদয়মন্দিরে জাগছিলেন, কিন্তু সে যাত্রা দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে আমার যাওয়া হলো না। বিষয় আশয়ের নূতন বন্দোবস্তে বাড়ীতে আমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, অনেক কার্য্যই বাকী, কাজে কাজে আমারে নূতন সংসারে আবদ্ধ থাকতে হলো। আশু কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সমাধা কোরে শীঘ্রই আমি যাব, এইরূপ অঙ্গীকার কোরে রাখলেম ; আমার কাছে সমুচিত কৃতজ্ঞতা ও সম্ভ্রমোচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়ে দীনবন্ধুবাবু দেশে গেলেন।

আর এক পক্ষ অতিক্রান্ত। একদিন নিশাকালে দেওয়ানজী মহাশয়কে আমার বৈঠকখানায় আহ্বান কোরে তাঁরে আমি কতকগুলি মনের কথা বোল্লেম : যে সকল তত্ত্ব আমি জানতে পেরেছি, তার অতিরিক্ত কতকগুলি নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হবার নিমিত্ত আন্তরিক আগ্রহ জানালেম। বিশেষতঃ রাজাবাহাদুরের শেষ পত্রিকার মধ্যে মধ্যে যে কয়েকটি স্থান শূন্য আছে, সেই কয়েকটি স্থানের উহ্য পাঠের মর্ম্ম কিরূপ, সেইগুলি জানবার জন্যই আমার অধিক আগ্রহ, বিশেষ নির্ব্বন্ধে এ কথাও তাঁকে বোল্লেম। পত্রিকার শেষভাগে লেখা আছে "যে-গুলি আমি বলিতে পারিলাম না, আমার বিশ্বস্ত দেওয়ান শ্রীযুক্তবাবু ত্রিলোচন দত্তজ মহাশয়ের প্রমুখাৎ তৎসমস্ত তুমি শ্রবণ করিতে পারিবে।"—এখন আমি সেই বিষয় আপনাকে স্মরণ কোরিয়ে দিচ্ছি। সমস্তই আপনি জ্ঞাত আছেন : অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই গুহ্য গুহ্য উহ্য কথাগুলি প্রকাশ কোরে আপনি আমার মহা উদ্বেগজনক কৌতূহলের শান্তি করুন।"

ঘরে আমরা উভয়ে ছিলেম, দুই একজন চাকর মাঝে মাঝে যাওয়া আসা কোচ্ছিল, দুই একজন আমাদের কাছে উপস্থিত ছিল, তাদের বিদায় কোরে দিয়ে দেওয়ানজী মহাশয় সেই ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। রাজার পত্রিকাখানি আমি রাখি নাই, তখনো পর্য্যন্ত দেওয়ানজীর কাছেই ছিল ; সেই রাত্রে কোন প্রকার নিগূঢ় কথার প্রসঙ্গে উপস্থিত হবে, অগ্রে সেটি অনুমান কোরে সেই পত্রিকাখানি তিনি সঙ্গেই এনেছিলেন, অঙ্গবস্ত্রের ভিতর থেকে বাহির কোরে বিছানার উপর রাখলেন। সেইখানি আমি তাঁরে পুনরায় পাঠ কোত্তে অনুরোধ কোল্লেম, তিনি পাঠ কোল্লেন। যেখানে যেখানে আমার সন্দেহ, সেই সেই স্থান নির্দ্দেশ কোরে তাঁর কাছে আমি ব্যাখ্যা চাইলেম।

পত্রিকাখানি দেওয়ানজীর হস্তে। আমি দেখলেম, আমার কথা শুনে তাঁর হাতখানি কাঁপলো, পত্রখানিও কাঁপলো, তাঁর ঠোঁট দুখানিও অল্পে অল্পে কাঁপলো। কেবল তাই নয়, একবার যেন তাঁর সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠলো। ভাব দেখে আমি স্থির কোল্লেম, ব্যাপার বড় ভয়ঙ্কর! অধিকতর আগ্রহে পুনর্ব্বার আমি ব্যাখ্যা চাইলেম। অবশেষে কম্পিত কণ্ঠে দেওয়ানজী বোলতে লাগলেন, ভয়ঙ্কর!—ভয়ঙ্কর!—অতিশয় ভয়ঙ্কর! বোলতে আমার গাত্র কম্পিত হয়, না বোল্লেও নয়; বোলতেই হবে। উত্তেজিত হয়ো না, অধীর হয়ো না, কোন প্রকার আতঙ্কে চাঞ্চল্য দেখিও না; হৃদয়কে দৃঢ় কর; ধৈর্য্য ধারণ কোরে, অবিচলিতচিত্তে সুধীর শান্ত হয়ে, সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলি শ্রবণ কর।"

বারম্বার আমারে হৃদয় দৃঢ়করণের উপদেশ দিয়ে দেওয়ানজী আরম্ভ কোল্লেন, "শাস্ত্রমতে অন্নদাতা পিতৃতুল্য। রাজা মোহনলাল আমার প্রভু ছিলেন, অবশ্যই তিনি আমার পিতৃস্থানীয়; কিন্তু তাঁর কার্য্যকলাপ বড় ভয়ঙ্কর ছিল। পূর্ব্বে আমি ততটা জানতেম না, যে দিন তিনি আমাকে তোমার নামে এই পত্রিকাখানি লিপিবন্ধ করবার আদেশ প্রদান করেন, সেই দিন আমাকে পত্রাতিরিক্ত অনেক কথা বোলেছিলেন। তোমার সাক্ষাতে বোলতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তথাপি আমি বাধ্য। প্রথমতঃ তোমার পিতার মৃত্যু। লোকে জেনেছিল, সর্পাঘাতে বাবু দয়ালচাঁদ ঘোষের জীবনান্ত। বাবু মোহনলাল ঘোষ ঐ কথাই প্রচার কোরেছিলেন; প্রকৃতপক্ষে তা নয়, সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় নাই। বাহুচ্ছেদনের পর রাজা বাহাদুরের মুখে বিকারঘোরে যে সকল প্রলাপ-বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল। সেই সকল প্রলাপের মধ্যে তুমি শুনেছিলে—দা—দা—দা, সাপ—সাপ—সাপ; —সাপ নয়,—রামচাঁদ, —আমিই সাপ' —সেই সকল কথার অর্থ এই যে, বাবু মোহনলাল নিজেই তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরকে এক প্রকার পেয় পদার্থের সঙ্গে সর্পবিষ পান কোরিয়েছিলেন। সর্পাঘাত ঘোষণা কোরে, কপট কাতরতা জানিয়ে তিনি সর্পাঘাতের চিকিৎসা করান। ঝাড়ান মন্ত্রে চিকিৎসা কোরেছিল রামচাঁদ ওঝা, চিকিৎসার ফল আশু প্রাণান্ত।

শীতকাল। দেওয়ানজীর মুখে ঐ নির্ঘাত সংবাদ শ্রবণ কোরে, সেই শীতকালের রাত্রে আমার সর্ব্বশরীরে দর দর ঘর্ম্মধারা! শুনতে শুনতে ক্ষণকাল যেন আমি জ্ঞানহারা হয়েছিলেম, ভোঁ ভোঁ কোরে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল; চেয়ে ছিলেম দেওয়ানজীর মুখপানে, কিন্তু ক্ষণকাল তাঁর মুখখানি আমি দেখতেই পাই নাই! আমার মুখের দিকে না চেয়েই, ঘন ঘন কম্পিত হয়ে, তিনি আবার বোলতে লাগলেন, "সর্ব্বানন্দবাবুর বাড়ীতে ডাকাত পোড়েছিল, বিছানার উপর সর্ব্বানন্দবাবুকে কেটে রেখে গিয়েছিল। ডাকাত পড়া মিথ্যা। সর্ব্বানন্দবাবুকে খুন করবার মতলবেই ঐরূপ রটনা। খুনের কর্ত্তা মোহনলাল বাবু। তিনি স্বহস্তে খুন করেন নাই। প্রলাপেই প্রকাশ হয়েছিল, তিন জন;—জটা—কালা—ঘনা।—জটা মানে জটাধর তরফদার, কালা মানে কালকিঙ্কর চণ্ড,* ঘনা মানে ঘন-

* চণ্ড—এক শ্রেণীর চণ্ডালেরা আপনাদের নামের সঙ্গে চণ্ড শব্দ ব্যবহার করে।

শ্যাম বিশ্বাস। মোহনবাবুর আদেশেই বাড়ী মেরামতের ভারা বেয়ে সেই তিন-জন দস্যু প্রথমে অন্দরমহলে প্রবেশ কোরেছিল। অন্দরে সর্ব্বানন্দবাবুর শয়নগৃহের দ্বার খোলা ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ কোরে দস্যুরা তাদের নিয়োগ-কর্ত্তার আদেশ পালন করে। তিনজনে খুন করে নাই, গলায় ছোরা দিয়ে বাবুকে খুন কোরেছিল জটাধর তরফদার।"

এই সময় আলোকোজ্জ্বল গৃহের চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখতে দেখতে আমি যেন মূর্চ্ছা যাই যাই, এইরূপ উপক্রম হয়েছিল ; দেওয়ানজী মহাশয় তৎক্ষণাৎ আমাকে ধারণ না কোল্লে তৎক্ষণাৎ আমি শয্যার উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পোড়তেম ; তিনি কোলে কোরে ধোরেছিলেন, তথাপি ক্ষণকাল আমার চৈতন্য ছিল না। মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পর যখন আমি একটু সুস্থির হয়ে বোসলেম, সেই সময় দেওয়ানজী-মহাশয় পুনরায় বোলতে লাগলেন, "রাজা বাহাদুরের পত্রিকাতেই লেখা আছে, সর্ব্বানন্দবাবুর উইলখানা জাল। আসল উইল কোথায় আছে, তা তিনি বোলতে পারেন নাই, জেনে শুনেও বলেন নাই ; সে উইল তাঁরই কাছে ছিল, তাঁর নিজের একটি বাক্সের মধ্যে এখনো সেখানি আছে, আমি তোমাকে দেখাব।

জাল উইল কিরূপে প্রস্তুত হয়েছিল, সর্ব্বানন্দবাবুর বৈঠকখানার লৌহ-সিন্দুকে কি রকমে গিয়েছিল, সে কথাও বলি বাবু মোহনলাল স্বহস্তেই সেই জাল উইল লিখেছিলেন। অন্যলোকের অক্ষর জাল করবার তাঁর বেশ ক্ষমতা ছিল, তিনিই লিখেছিলেন। ইসাদীস্থলে লেখা ছিল, কুঞ্জবিহারী সান্যাল নবীসিন্দা। সে নামটাও মোহনবাবুর হাতের লেখা। কুঞ্জবিহারী তাঁর টাকার গোলাম, সেই লেখাই সে মঞ্জুর কোরেছিল ; বাকী সাক্ষীরা তাদের নিজের নিজের নাম তারা আপনারাই দস্তখৎ কোরেছিল ; নফরচন্দ্র ঘোষাল আর জনা-র্দ্দন মজুমদার। তারাও মোহিনীবাবুর টাকার গোলাম।"

উইলের কথা আর সাক্ষীদের কথা আমার কর্ণে নূতন বোধ হলো না, কথা শুনে আমি বিস্ময়ও প্রকাশ কোল্লেম না। দেওয়ানজী বোলতে লাগলেন, "সিন্দুকের চাবীগুলি সর্ব্বানন্দবাবু সর্ব্বদা তাঁর নিজের কাছেই রাখতেন, রাত্রিকালে সেইগুলি তাঁর বালিশের নীচেই থাকতো ; মোহনবাবু সেটি জান-তেন ; জটাধরকে সেই সন্ধান তিনি বোলে দিয়েছিলেন ; খুনের কার্য্য সমাধা কোরে বালিশের নীচে থেকে চাবীর তাড়া বাহির কোরে নিয়ে সদর বাড়ীর বৈঠকখানায় গিয়ে, জটাধর একটি লৌহসিন্দুক খুলে জাল উইলখানি তন্মধ্যে রেখে আসল উইলখানি বাহির কোরে নিয়েছিল ; তার পর সিন্দুকে চাবী বন্ধ কোরে, চাবীর তাড়াটা পূর্ব্বস্থানে রেখে দিয়ে তারা তিন জনে পলায়ন কোরেছিল ; পুলিশ তদন্তের রিপোর্টে লেখা হয়, বাড়ীতে ডাকাত পোড়েছিল, ডাকাতের দ্বারাই কর্ত্তার খুন।"

দেওয়ানজী নিস্তব্ধ হোলেন। নূতন শোকে, বিস্ময়ে, মনস্তাপে, আমিও নিস্তব্ধ। মনে মনে আমি ভাবতে লাগলেম, "কি ভয়ঙ্কর লোক! উঃ!—নর-চর্ম্মাবৃত ভয়ঙ্কর পিশাচ! আমার পিতৃহন্তা, মাতামহহন্তা, মহা ভয়ঙ্কর

পিশাচ! ও! সেই লোক আমার পিতৃব্য ছিল!—মান গৌরবে সেই লোক শেষকালে রাজা উপাধি পেয়েছিল, ওঃ! আমি এখন সেই উপাধির উত্তরাধিকারী! পরমেশ্বর করুন, পরলোকে সেই পাপাত্মার আত্মা কিছুদিন শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করুক; পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ছিল শীঘ্র আমি যেন সেটা বিস্মৃত হোতে পারি, স্বপ্নেও যেন সে পাপমূর্ত্তি আমি না ভাবি, ঈশ্বরে আমার মতি যেন চিরদিন সমভাবে অটল থাকে।"

এই সময় আর একটি চিন্তা আমার মনে সমুদিত হলো। কালকিঙ্কর চঙ্গ। কে সেই কালকিঙ্কর চঙ্গ? জটাধর তরফদার আর ঘনশ্যাম বিশ্বাস, এ দুটো লোক আমার জানা, অনেকবার চক্ষে চক্ষে দেখা, কিন্তু সেই কালকিঙ্কর চঙ্গটা কে?—সন্দেহে সন্দেহে দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কালকিঙ্কর চঙ্গ কোথাকার লোক? তার কোন পরিচয় কি আপনি জ্ঞাত আছেন?"

দেওয়ানজী উত্তর কোল্লেন, "ভারী বদমাস; বিশেষ পরিচয় আমি কিছু জানি না, কিন্তু ভারী বদমাস; সে লোকটা যে কতরকম ভোল ধরে,—কত রকম ভেকধারী সাজে, সে সব কথা বলবার নয়। কখনো ঝাঁকা-মুটে হয়ে বাজারের পথে বাজারের লোকের মোট বয়, কখনো গোপীযন্ত্র ধারণ কোরে বৈষ্ণব সেজে ভিক্ষা করে, কখনো সাদা পাগড়ী মাথায় দিয়ে হাঁটু পর্য্যন্ত চাপকান পোরে, রাজ-ভাটের বেশে সভায় সভায় স্তুতিগীত গায়; কখনো ঘণ্টা বাজিয়ে, সাতপেয়ে গরু দেখিয়ে হট্টলোকের কাছে পয়সা আদায় করে; কখনো ডাকাতের দলে মিশে দেশে বিদেশে ডাকাতী কোরে বেড়ায়; কখনো শ্মশানঘাটে ছাই-ভস্ম মেখে সন্ন্যাসী সাজে; কখনো বা তসবীমালা গলায় দিয়ে চামর হাতে কোরে, লোকের বাড়ী মাণিকপীরের গীত গায়, কখনো হিন্দু, কখনো মুসলমান।"

হঠাৎ আমার একটা পূর্ব্বকথা মনে পোড়ে গেল। প্রথমে যখন আমি বর্দ্ধমানে আমার অজ্ঞাত মাতামহের আশ্রমে আশ্রয় প্রাপ্ত হই, তখন নূতন নূতন এক একদিন নগরভ্রমণে বাহির হোতেম। একদিন সেই যে একটা কদাকার লোক ঘণ্টা বাজিয়ে, অদ্ভুত অদ্ভুত মন্ত্র পোড়ে, সাতপেয়ে গরু দেখাবার জন্য লোক ডাকছিল, সেই লোকটাই হয় তো ঐ কালকিঙ্কর চঙ্গ। দুষমন চেহারা! সত্যই যেন কবিবাক্যে নরকবর্ণনার কালকিঙ্কর! অহো! আবার যেন আর একটা মনে হয়। মাণিকগঞ্জে অমরকুমারীকে উদ্ধার কোরে যে দিন আমরা নৌকাযোগে পদ্মানদীতে যাত্রা করি, সেই দিন পদ্মাবতীতীরে একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আমি দেখেছিলেম; চেহারায় মুসলমান বোলেই বোধ হয়েছিল। অমরকুমারীর মুখে শুনেছিলেম, মাণিকগঞ্জে জটাধর যখন চণ্ডেশ্বর সাজে, সেই সময় তার সঙ্গে একটা মুসলমান ছিল, তার নাম মিঞাজান। পদ্মাতীরে সেই মূর্ত্তি দেখে একবার আমার মনে হয়েছিল, সেই লোকটাই হয় তো মিঞাজান; তখন বুঝতে পারি নাই, কে সেই মিঞাজান, এখন যেন একটু একটু বুঝতে পারি, সেই মিঞাজানটাই হয় তো ঐ কালকিঙ্কর। কেন না, জটাধরের সঙ্গে যখন যোগাযোগ, সে যখন বর্দ্ধমানেই থাকতো, সে যখন হিন্দু মুসলমান উভয়ই সাজতে

পারে, তখন সেই লোকটাই হয় তো কালকিঙ্কর। দেখা যাক, পরিণাম কি রকম দাঁড়ায়। খুনের আসামী, নিশ্চয়ই একদিন ধরা পোড়বে, নিশ্চয়ই তখন সত্য-পরিচয় প্রকাশ পাবে।

এই সকল আমি ভাবছি, আমার মুখের দিকে চেয়ে দেওয়ানজী হঠাৎ বোলে উঠলেন, "কি ভাবছো রাজকুমার? তোমাকে ভাবনাযুক্ত দেখলেই আমার প্রাণ কেমন ব্যাকুল হয়। প্রথমবার পাটনায় তোমাকে এই রকম ভাবনাযুক্ত দেখে বার বার তোমার মুখে একরকম কথা শুনে শুনে রাজার লোকেরা তোমাকে পাগলা-গারদে রেখে এসেছিল। অহো! ভালকথা। যে রাত্রে রাজার মুখে শুনে শুনে তোমার নামে আমি এই পত্রখানি লিখি, কেমন একরকম অনুতাপের স্বরে সেই রাত্রে রাজাবাহাদুর একবার বোলেছিলেন, হায় হায়! হরিদাসকে বাতুলালয়ে না পাঠিয়ে লোকেরা যদি আমাকেই বাতুলালয়ে পাঠাতো, তা হোলেই ঠিক হতো! যথার্থই আমি পড়েছিলেম!"—কথাটা বড় মিথ্যা নয়। যা হোক, এখন তুমি ভাবছো কি?"

অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে আমি বোল্লেম, "খুড়া মহাশয়ের চরিত্রকাহিনী সর্ব্বদা আমার মনে আসছে, সেই সব কথাই আমি ভাবছি।"—একটি নিশ্বাস ফেলে দেওয়ানজী বোল্লেন "ভাবনার বিষয় বটে!"

খুড়ামহাশয়ের পত্রের নির্ঘণ্ট আমি শ্রবণ কোরেছিলেম, তার পর এই রাত্রে দেওয়ানজীর মুখে আরো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা শ্রবণ কোল্লেম। ক্ষণে ক্ষণে গাত্র কণ্টকিত হোতে লাগলো। কিছুই আমি জানতেম না, এখন আমার সম্মুখে বৃহৎ একখানা স্বচ্ছদর্পণ। শুনলেম সব, সমস্তই আমার মনে মনে থাকলো, কাকেও কোন কথা বোল্লেম না, জননীকে, খুড়ীমাকে এই রাত্রের শেষকথাগুলির কিছু-মাত্র আভাস জানতে দিলেম না।

আরো একমাস। এই একমাসের মধ্যে বিষয়কার্য্যের সমস্ত কাগজপত্র, হিসাবপত্র, দেওয়ানজী আমারে বিশেষরূপে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, জমীদার হয়ে আমি জমীদারী কার্য্যের ভারগ্রহণ কোল্লেম। এই একমাসের মধ্যে একদিন আমি আমার মাতৃমহাশ্রমে গমন কোরেছিলেম। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোরেই সমস্ত যেন অন্ধকারময় বোধ হয়েছিল। কর্ত্তা নাই, সমস্তই অন্ধকার! মাতামহী ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেম, পরিচয় দিয়ে তাঁর চরণবন্দনা কোরে, উপস্থিত ঘটনা সংক্ষেপে তাঁরে আমি জানালেম; তারেও কাঁদালেম, আপনিও কাঁদলেম।

"সেই হরিদাস তুমি? হরিদাস! এই জন্যই তোমারে দেখে আমার প্রাণ তখন কেমন এক প্রকার নূতন আহ্লাদে পুলকিত হতো! হরিদাস! আমার পুত্র নাই। তুমিই আমাদের বংশধর; তুমি আমার পুত্রিকা পুত্র; রাজা হও, চির-জীবী হয়ে সংসারে চিরদিন সুখে থাকো!" কোলের কাছে বোসিয়ে এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কোরে মাতামহী ঠাকুরাণী বারবার আমার মস্তক চুম্বন কোল্লেন।

আরো তিনি বোল্লেন "হরিদাস! তোমারে দেখে আজ আমি সমস্ত সুখ দুঃখ বিস্মৃত হোল্লেম!"

বাড়ীর আর আর সকলেও আমার পরিচয় প্রাপ্ত হয়ে পরমানন্দ প্রকাশ কোল্লেন। পুরাতন চাকরেরা আমারে অভিনন্দন কোরে আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। আদরে, গৌরবে, যত্নে, স্নেহে, পাঁচ দিন আমি মাতামহাশ্রমে বাস কোল্লেম। কর্ত্তার খুনের ভয়ংকর গুহ্যকথা সে বাড়ীতেও কাহারো কাছে আমি কিছুমাত্র প্রকাশ কোল্লেম না। "খুনী আসামী নির্ণয় করা হয়েছে, শীঘ্রই তারা ধরা পোড়বে," মাতামহী ঠাকুরাণীকে কেবল সেই কথাটিই আমি জানিয়ে রাখলেম। পাঁচ দিন সেই বাড়ীতে থেকে, ঠাকুরাণীর কাছে বিদায় নিয়ে, মনোহরপুরের বাড়ীতে আমি ফিরে গেলেম।

বড় বড় ভয়ানক কথাগুলো জননীকে আমি বলি নাই, কিন্তু ছেলেধরার গল্পটা তাঁর কাছে আমি প্রকাশ কোরেছিলেম। তাঁর দেবরের আজ্ঞাক্রমে ছেলে-ধরা হয়েছিল জটাধর তরফদার। জটাধর আমারে সপ্তগ্রামে রেখে এসেছিল, সপ্তগ্রামে আমার শৈশব কাল অতিবাহিত হয়েছিল, সেই স্থানটিকে আমি জন্মস্থান জ্ঞান কোত্তেম। এখনকার জ্ঞানে সেটি যথার্থ আমার জন্মস্থান না হোলেও সপ্তগ্রাম আমার পালনস্থান—শিক্ষাস্থান। সেই স্থানটি দর্শনের নিমিত্ত নিত্য আমার অভিলাষ জন্মে, এক একটা বাধা জুড়ে, অবসর ঘটে না। মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমীর পর জননীর অনুমতি গ্রহণ কোরে, দেওয়ানজীকে বোলে, একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে, আমি সপ্তগ্রামে যাত্রা কোল্লেম।

গুরুপত্নী যখন আমারে বিদায় কোরে দেন, সেই সময় বোলেছিলেন, সপ্ত-গ্রামে তিনি থাকবেন না, ঘরবাড়ী বিক্রয় কোরে মেয়েটি নিয়ে তিনি কাশীধামে চোলে যাবেন। কথাটা আমার সত্য বোলেই বিশ্বাস হয়েছিল, তথাপি সপ্ত-গ্রামে উপস্থিত হয়ে, সর্ব্বপ্রথমে সেই গুরুগৃহটি আমি অন্বেষণ করি। জন্ম-ভূমির প্রতি স্বভাবতঃ সকলের যেমন মায়া জন্মে, যে স্থানে আমার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছিল, সে স্থানে আমি পাঠাভ্যাস কোরেছিলেম, যে স্থানে আমি অবিচ্ছেদে শৈশবকালে স্নেহ-যত্ন পেয়েছিলেম, সেই স্থানের প্রতি আমার সেই-রূপ মায়া বোসেছিল। সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে আমি দেখলেম, যেমন পাঠ-শালা, তেমনি আছে, ছাত্র নাই, অধ্যাপক নাই, সংস্কারাভাবে ঘরগুলি জীর্ণ; কিন্তু ঠাট বিদ্যমান। সেই দুই মহল; সেই বকুলগাছ, সেই পুষ্করিণী, সেই সব। মায়ার সঙ্গে, কাতরতার সঙ্গে, সন্দেহের সঙ্গে মনে আমার বিস্ময়ের উদয়। বকুলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে, খানিকক্ষণ আমি ভাব-লেম, "গুরু-পত্নী কি এই বাড়ীতেই আছেন? কাশীধামের কথাটা কি তবে মিথ্যা?" ভাবলেম, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে কাহারো কোন সাড়া-শব্দ পেলেম না। আমার গাড়ীখানা আমি একটু তফাতে রেখে এসেছিলেম, কালাচাঁদ সেই গাড়ীর মধ্যেই ছিল, একাকী আমি পদব্রজে বকুলতলায় উপস্থিত হয়েছিলেম। আমার সঙ্গী চাকরটির নাম কালাচাঁদ।

বকুলতলায় দাঁড়িয়ে চারিদিক আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি, মনে মনে কত কি ভাবছি, প্রায় আধঘণ্টা ; বেলা অপরাহ্ন একটি শূন্যকুম্ভ কক্ষে লয়ে একটি বালিকা সেই বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে বকুলতলার দিকে এলো। বোল্লেম বালিকা ; কিন্তু অংগলক্ষণে সেটি যেন যুবতী। পূর্ব্বে আমি যে বেশে যে বয়সে এই বাড়ীতে ছিলেম, এখন আমার সে বেশ নয়, সে বয়সও নয়, বালিকাটিরও বয়স বেশী ; সম্মুখে আমারে দেখেই সেই বালিকা যেন হঠাৎ সভয় লজ্জায় চঞ্চলা হয়ে অস্থির-চরণে সেখান থেকে ফিরে যাবার উপক্রম কোল্লে। মুখ দেখেই আমি চিনেছিলেম অপরাজিতা, আমার গুরুদেবের সেই স্নেহ-ময়ী কন্যা।

অপরাজিতাকে তাদৃশ ভাবাপন্না দর্শনে দ্রুতপদে সম্মুখে গিয়ে সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভগিনি ! দিদি ! অপরাজিতে ! আমারে চিনতে পার ?"

হঠাৎ যেন চমকিত হয়ে, সলজ্জ নতবদনে বক্রদৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চেয়ে, অপরাজিতা কেমন একরকম জড়সড় হয়ে দাঁড়ালো, দ্বিতীয়বার আর আমার মুখের দিকে চাইতে পাল্লে না। দ্বিতীয়বার আমি সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তোমার মা কি এই বাড়িতেই আছেন ?"

পূর্ব্ববৎ একবার আমার দিকে সলজ্জ কটাক্ষপাত কোরে ভীরু বালিকা চঞ্চল গতিতে বাড়ীর দিকে ফিরে চোল্লো ; নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমিও তার সংগে সংগে চোল্লেম। জল আনতে গিয়ে শূন্যকুম্ভ কক্ষে কন্যা ফিরে এলো, পশ্চাতে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ, তদ্দর্শনে গৃহিণী ঠাকুরাণী অবাক হয়ে রইলেন ; আমারেও কিছু জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন না, মেয়েকেও কিছু জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেন না ; সে একরকম বিস্ময় মিশ্রিত স্তম্ভিত ভাব !

আমি অগ্রবর্ত্তী হয়ে গুরুপত্নীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক উঠে দাঁড়িয়ে বিনম্র-বচনে তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মা ! আপনি কি আমারে চিনতে পাচ্ছেন না ? অপরাজিতাও আমারে চিনতে পারে নাই। আপনারা কি আমারে সত্য সত্যই ভুলে গিয়েছেন ?

আমি তাঁরে মাতৃসম্বোধন কোল্লেম, অপরাজিতার নাম আমি জানি, তাও তিনি শুনলেন। বিস্ফারিত-নেত্রে খানিকক্ষণ আমার বদন নিরীক্ষণ কোরে, শেষে তিনি বিস্মিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বোল্লেন ; "আপনি দেখছি বাবু মানুষ, জ্ঞান হোচ্ছে যেন রাজার ছেলে ; আমরা গরিব, আপনাকে আমরা কেমন কোরে চিনবো ? কোথা থেকে কি মনে কোরে এই গরিবের বাড়ীতে আপনি এসে উপ-স্থিত হয়েছেন ?"

আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, সেই পরিবর্ত্তনের সংগে আমার চেহারার পরিবর্ত্তন হয়ে থাকবে ; কিন্তু এদেশের রাজারা সচরাচর যেরূপ পোষাকের আড়ম্বর দেখান, আমার পরিচ্ছদে সে রকম আড়ম্বর কিছুই ছিল না। পরিধান একখানা শান্তিপুরে ধুতি, তার উপর একটি সাদা চাপকানের

উপর একটি শ্বেতবর্ণ চোঘা, এই পর্য্যন্ত। মাথায় টুপিও ছিল না, পাগড়ীও ছিল না, বুকে চেন-আঁটা সোণার ঘড়ীও ঝকমক কোচ্ছিল না, গজদন্তমণ্ডিত ছড়ীও হস্তে ছিল না, জাঁকজমক কিছুই না ; স্থূলাঙ্গও নই ; তথাপি গুরুপত্নী আমারে চিনতে পাল্লেন না। সাত বৎসর অদর্শন ; মাথায় কিছু উঁচু হয়েছিলেম, ওষ্ঠে অল্প অল্প গোঁপের রেখা দিয়েছিল, এই পর্য্যন্ত কথা। আকৃতির এই প্রভেদে গুরুপত্নী আমারে চিনতে পাল্লেন না ; আমার যেন কিছু আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো।

কক্ষের কুম্ভটি নামিয়ে, একধারে রেখে অপরাজিতা মন্থরগতিতে আর একখানি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে ; গুরুপত্নীর সম্মুখে আমি দাঁড়িয়ে থাকলেম। অনেকক্ষণ আমারে দেখেও গুরুপত্নী কিছু স্মরণ কোত্তে পাল্লেন, তেমন লক্ষণ কিছুই বুঝা গেল না। কি হয় ভেবে চিন্তে আত্মপরিচয় দিয়ে, অবশেষে আমি বোল্লেম, "মা! আমি সেই হরিদাস ; শৈশবে যারে আপনি পুত্রবৎ স্নেহ কোত্তেন, আচার্য্য মহাশয়ের লোকান্তর গমনের পর যারে আপনি বাড়ী থেকে বিদায় কোরে দিয়েছিলেন, আমি সেই হরিদাস।"

আমার মুখে এই কটি কথা নির্গত হবামাত্র অপরাজিতা ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এসে, সজলনয়নে আমার নিকটে দাঁড়ালো ; স্নেহ-গদগদকণ্ঠে বোলতে লাগলো, "দাদা! দাদা! সেই তুমি—সেই তুমি? এত দিনের পর তুমি আমাদের মনে কোরেছ! আমি তোমারে চিনতে পারি নাই, গলার আওয়াজ শুনে কতক কতক অনুমান কোরেছিলেম, কিন্তু চিনতে পারি নাই ; সেই জন্য ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছিলেম। এত দিন তুমি কোথায় ছিলে দাদা? এখন তুমি কোথায় আছ দাদা? এখন তুমি কেমন আছ দাদা? আর কি তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকবে না?"

অপরাজিতার দীর্ঘ দীর্ঘ নয়ন-দুটি সলিলপূর্ণ। অপরাজিতার শেষের প্রশ্ন শ্রবণে আমার চক্ষুদুটি অশ্রুপূর্ণ। অপরাজিতার জননী কিন্তু কেমন এক প্রকার নূতন লজ্জায় অধোমুখী। মিথ্যাকথা বোলে আমারে তিনি একজন দুষ্টলোকের হাতে সোঁপে দিয়েছিলেন ; "যাব না যাব না" বোলে আমি রোদন কোরেছিলেম, সে রোদনে তাঁর প্রাণে বিন্দুমাত্রও দয়ার সঞ্চার হয় নাই ; সমস্ত মায়া-দয়া কাটিয়ে তিনি আমারে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই সব তাঁর মনে পোড়লো, সেই জন্যই তিনি অধোমুখী ; দুঃখে নয়, লজ্জা পেয়ে অধোমুখী। মুখখানি শুকিয়ে গেল, দুটি শুষ্কনেত্রে দর দর কোরে জল পোড়তে লাগলো।

অপরাজিতা তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর থেকে একখানি ছোট মাদুর বাহির কোরে এনে উত্তরের ঘরের দাওয়ায় পেতে দিলে, "দাদা! দাদা!" বোলে ডেকে সেই মাদুরে আমারে বোসতে বোল্লে ; গুরুপত্নীও সেই সময় সেই দিকে একটি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ কোল্লেন। "আপনিও আসুন" এই বোলে তাঁরে আহ্বান কোরে আমি সেই মাদুরে গিয়ে বোসলেম ; সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গুরুপত্নীও আমার

পার্শ্বে একটু তফাতে বোসে নীরবে অশ্রুপাত কোত্তে লাগলেন। আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে দরমার বেড়া ঠেস দিয়ে অপরাজিতা দাঁড়িয়ে থাকলো।

অশ্রুমুখী গুরুপত্নীকে সম্বোধন কেরে তখন আমি বোল্লেম, "মা! পূর্ব্বের সে সব কথা আর আপনি এখন মনে কোরবেন না; আমার ভাগ্যে যা ছিল, সে সময় তাই ঘোটেছিল, আপনার দোষ কি? এখন আমি মাতা-পিতার পরিচয় পেয়েছি, এখন আমি সুখে আছি, এখন আমি আর আমারে অজ্ঞাতকুলশীল সংসারে নিঃসম্পর্ক অনাথ বালক বোলে বিবেচনা করি না: বিধাতার ইচ্ছায় আমার অবস্থার এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে। পাঁচ মাস পূর্ব্বে আমি আমার বংশপরিচয় সমস্ত পরিজ্ঞাত হয়েছি; তবুও মা! তবুও আপনার কাছে আমি যে হরিদাস সেই হরিদাসই আছি। কাজের ঝঞ্ঝাটে এই পাঁচ মাসের মধ্যে আমি আপনার চরণদর্শনের অবকাশ পাই নাই। আপনি বোলেছিলেন এ দেশে থাকবেন না, কন্যাটি নিয়ে কাশীবাসিনী হবেন; যাওয়া হয়েছে কি না, তাও আমি জানতে পারি নাই, জানবার জন্য উতলা হয়েছিলেম, তন্নিমিত্তই সন্দেহে সন্দেহে আজ আমার এখানে আসা।

দুই হস্তে অশ্রুমার্জ্জন কোরে, আরো অল্পক্ষণ নীরবে থেকে, অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে গুরুপত্নী বোল্লেন, "না বাছা! যাওয়া হয় নাই; ভাগ্যে কাশীদর্শন আমার হলো না। বিশ্বেশ্বর আকর্ষণ না কোল্লে কাহারো ভাগ্যে কাশীদর্শন ঘটে না, কাশীবাস হয় না, কাজে কাজেই এই বাড়ীতে আমাকে থাকতে হয়েছে। বড় কষ্ট! পাড়ার একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আমি রন্ধন করি, অপরাজিতা সেই বাড়ীতে ছোট ছোট কাজকর্ম্ম করে; সেই বাড়ীতেই আমরা আহার করি, রাত্রিকালে মেয়েটি নিয়ে এই ঘরেই শুয়ে থাকি, ঘটি বাটি পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিসপত্র বেচে ফেলেছি, জল খাবার জন্য কেবল ছোট একটি পিতলের ঘটি আছে, কিছুমাত্র সম্বল নাই, বড় কষ্ট!"

এইরূপ পরিচয় দিতে দিতে গুরুপত্নী পুনরায় অশ্রুবর্ষণ কোল্লেন। বসনা-ঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা কোরে পুনরায় তিনি বোলতে লাগলেন, "হরিদাস! বড় কষ্ট! বড় কষ্ট! তুমি সুখে আছ, তুমি তোমার পরিচয় পেয়েছ, তোমার মুখশ্রী দিব্য সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখে আমার আহ্লাদ হলো। জানো তুমি, তোমারে আমি পেটের ছেলের মত ভালবাসি, দুঃখের সংসারে থাকলে তোমার কষ্ট হবে, সেই জন্য তখন তোমারে আমি একজন ভদ্রলোকের হাতে সমর্পণ কোরেছিলেম; তখনি বোলেছিলেম, খুব ভদ্রলোক, তাঁর কাছে থাকলে তুমি সুখী হোতে পারবে, ঠিক তাই হয়েছে; দেখে আমি বড় তুষ্ট হোলেম। সেই লোকটি—তোমার সেই মনিবটি এখন ভাল আছে তো?"

মনে মনে হেসে আমি উত্তর কোল্লেম, "খুব ভাল আছে! অল্পদিন পরেই আপনি শুনতে পাবেন, সেই ভদ্রলোকটি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে আপন প্রায়শ্চিত্ত কোরেছে কিম্বা হয় তো কোন জেলার জেলখানায় পোচে পোচে মোরেছে। সেই ভদ্রলোকটির লীলাখেলা অনেক প্রকার, সময়ে সব কথা আপনি জানতে পারবেন।"

আমার মুখে এই কথা শুনে আমার গুরুপত্নী বিস্ময়-বিকসিত অনিমেষনয়নে.. ক্ষণকাল আমার মুখপানে চেয়ে থাকলেন ; কি যেন বোলবেন, সেইরূপ লক্ষণ বুঝতে পেরে, প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে, আর কিছু তারে বোলতে না দিয়ে, সহসা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "অপরাজিতার বিবাহ হয়েছে কি ?"—প্রশ্ন শুনেই লজ্জা পেয়ে অপরাজিতা সুট কোরে সেখান থেকে সোরে গেল। ললাটে সিন্দুর-বিন্দু ছিল না, মুখখানি ম্লান, তাই দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলেম, অপরাজিতার বিবাহ হয় নাই ; বুঝতে পেরেও—পাছে ঘনশ্যামের লীলা প্রসঙ্গে কিছু বেশী কথা বোলতে হয়, তাই ভেবে, বুঝতে পেরেও অপরাজিতার বিবাহের প্রশ্ন আমি উত্থাপন কোরেছিলেম।

কপালে করার্পণ কোরে সজলনয়নে গুরুপত্নী বোল্লেন, "হা পরমেশ্বর ? আমার কি সেই রকম ভাগ্য ! ভাল ভাগ্য যদি হবে, তবে অকস্মাৎ কেনই বা তিনি আমাদের অকূলে ভাসিয়ে সংসার থেকে পালিয়ে যাবেন ? কেনই বা আমি তোমারে পরের হস্তে সোঁপে দিব ? মেয়েটি অত বড় হয়েছে, বিবাহ দিতে পারি নাই, জাতিকুল রক্ষা হওয়া ভার। মেয়ের মুখ দেখে দেখে দিন রাত আমি কেবল ভাবি আর কাঁদি ! বিবাহ দিতে পারি নাই। কোথা থেকে দিব ? আমার আছে কি ? অল্প টাকায় আমাদের ঘরের মেয়ের বিয়ে হয় না, হোলেই বা সে অল্প টাকা আমি কোথায় পাব ? কেই বা ঘর বর দেখে দিবে ? ভেবে ভেবে আমার পেটের ভাত হজম হয় না।

একটু চিন্তা কোরে আমি বোল্লেম, "অত বড় মেয়েকে কুমারী অবস্থায় রাখা এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিরুদ্ধ, এ কথা সত্য ; কিন্তু এখন আর আপনি ভাবিত হবেন না, শীঘ্র আমি অপরাজিতার শুভবিবাহে মনোযোগী হব। লোকের বাড়ীতে পাচিকাবৃত্তি কোরে আপনারা দিন নির্ব্বাহ কোচ্ছেন, সেই নীচ-বৃত্তি আপনি পরিত্যাগ করুন ; কিছুদিন এইখানে থাকুন, এইখানেই অপরাজিতার বিবাহ হোক ; তার পর আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমি আপনারে বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়ে আমার নিজবাড়ীর নিকটে আপনার জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী কোরে দিব, নিরুদ্বেগে আপনি সেখানে বাস কোত্তে পারবেন।"

আমার সঙ্গে টাকা ছিল, দশটাকার দশখানি নোট গুরুপত্নীর হাতে দিলেম। "বেঁচে থাকো, রাজা হও" বোলে তিনি আমারে আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। আমার জলখাবার সংগ্রহের জন্য তিনি ব্যস্ত হোচ্ছিলেন, নিষেধ কোরে আমি বোল্লেম, "প্রয়োজন নাই, সন্ধ্যা হয়ে এলো, আজ আর আমি অধিকক্ষণ এখানে থাকছি না, বারান্তরে একবার এসে আবশ্যকমত বন্দোবস্ত কোরে যাব।"

ঠাকুরাণী বোল্লেন, "সন্ধ্যা হয়, সম্মুখে রাত্রিকাল, অন্ধকারে কোথায় যাবে, হেঁটে যেতে কষ্ট হবে, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো, এখানে তোমার অযত্ন হবে না, যেখানে যেতে হয়, কল্য প্রাতঃকালে যেয়ো।"

আমি বোল্লেম, "হেঁটে যেতে হবে না, সদররাস্তার ধারে মন্দিরের কাছে আমার গাড়ী আছে, কোন কষ্ট হবে না, আজ আমি বিদায় হোলেম।"—গুরু-

পত্নীকে প্রণাম কোরে, অপরাজিতাকে নিকটে ডেকে, মিষ্টকথা বোলে তার হাতে দশটি টাকা দিয়ে, সে দিনের মত আমি বিদায়গ্রহণ কোল্লেম। বকুলতলায় যখন এলেম, তখন নানা প্রকার পূর্ব্বস্মৃতি আমার মনোমধ্যে উদিত হোতে লাগলো, বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হলো, বকুলগাছের নিম্নাবধি অগ্রভাগ পর্যন্ত কাতর নয়নে একবার দর্শন কোল্লেম। বকুলগাছটি বৃদ্ধ হয়েছিল, পাতাগুলি ছোট হয়ে এসেছিল, তাই দেখে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের একটি অংশ আমার মনে এলো। বৃদ্ধ তরুবরকে নমস্কার কোরে সরাসর পূর্ব্বদিকে এসে আমি শকটা-রোহণ কোল্লেম। গাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে কালাচাঁদ পূর্ব্ববৎ কোচবাক্সে বোসলো, গাড়ী দ্রুতবেগে চোলতে লাগলো।

সে রাত্রে আমি আর বর্দ্ধমানে ফিরে যাবার ইচ্ছা কোল্লেম না, হুগলীর এক-জন উকীলের সহিত আমার নূতন আলাপ হয়েছিল, তাঁরই বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে নিশাযাপন কোল্লেম। বাড়ীখানি প্রতাপনগরে। উকীলের নাম বরদাপ্রসাদ রায়। সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক রকম কথা। কথায় কথায় তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এইখানে রামলোচন মিত্র নামে একটি লোক ছিলেন, তিনি একজন জমীদার, তাঁর বাড়ীখানি কোথায় ছিল ?"

বরদাবাবু উত্তর কোল্লেন, "এই বাড়ী সেই রামলোচন মিত্রের ছিল, অনেক-দিন হলো, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আপনার পিতৃব্য মোহনলালবাবু এই বাড়ীর অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁরই কাছে আমি এই বাড়ীখানি খরিদ করি। কেন ? রামলোচনের বাড়ীর ঠিকানায় আপনার কি প্রয়োজন ?"

উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বোলতে হয়, সে সব কথা উত্থাপন না কোরে সংক্ষেপে কেবল আমি এইমাত্র বোল্লেম, "রামলোচনের পত্নী আর তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার এক জায়গায় সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁরা নিরাশ্রয় হয়ে অন্য লোকের বাড়ীতে অতিকষ্টে বাস কোচ্ছিলেন, সম্প্রতি তাঁর সেই পত্নীটির পরলোক-প্রাপ্তি হয়েছে, কন্যাটি নিরাশ্রয়। সেই জন্যই ঐ কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলেম, অন্য কারণ কিছুই ছিল না, নাইও কিছু।"

বরদাবাবু বোল্লেন, "রামলোচনের স্ত্রী-কন্যা ছিল বটে, সে কথা আমি শুনেছিলেম, কিন্তু তাঁরা কোথায় গিয়েছেন, কোথায় আছেন বিষয় আশয় বিক্রয় হয়ে গিয়েছে তা তাঁরা জানেন কি না, কিছুই আমি জানতেম না ; বাড়ীখানি খরিদ কোরে অবধি অনেক দিন আমি এইখানেই আছি। তাঁদের কোন সন্ধান আমি পাই নাই। রামলোচনের কন্যা যদি দেশে ফিরে আসেন, বাড়ীর মূল্য যদি তিনি আমাকে প্রদান কোত্তে পারেন, আহ্লাদ-পূর্ব্বক এ বাড়ী আমি তাঁরে ছেড়ে দিব।"

কথা বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন ; সে প্রসঙ্গে কোন কথাই আর আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। বরদাবাবুর সদাশয়তার প্রশংসা কোরে তাঁরে আমি কেবল এইমাত্র বোল্লেম, "আপনি খরিদ কোরেছেন, বাস কোচ্ছেন, এ বাড়ী আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে না, কন্যাটি এসব কথা কিছু জানেন না, ভাল ঘরেই তাঁর বিবাহ

হবে, বিবাহের পর স্বামীগৃহে আশ্রয় পেয়ে তিনি একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।”

বরদাবাবুর সঙ্গে আমার আরো অনেক কথা হয়েছিল ; সে সব কথার সহিত পাঠক-মহাশয়ের কোন সংস্রব নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমি বিরত থাকলেম। রজনী প্রভাত হলো। বরদাবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে আমি বর্দ্ধমানে যাত্রা কোল্লেম। যথাসময়ে মনোহরপুরে পৌঁছিলেম।

হুগলী-ভ্রমণের ফল অনেকাংশে সন্তোষকর। গুরুপত্নী কাশীবাসিনী হন নাই, তাঁর ঘরগুলিও বিক্রীত হয় নাই, অপরাজিতার বিবাহ দিয়ে গুরুঋণ থেকে আমি মুক্ত হোতে পারবো, এই আমার আশা। রামলোচন মিত্রের বাড়ীর ঠিকানা পেলেম, বাড়ী হস্তান্তর, অমরকুমারী সে বাড়ীর অধিকারিণী হবেন না, তা আমি বুঝতে পাল্লেম। তাতেই বা কি ? অমরকুমারী একটি উপযুক্ত আশ্রয় প্রাপ্ত হন, আমি তার উপায় কোরে দিব, মনে মনে এইরূপ সংকল্প কোরে রাখলেম।

আমি এখন বিষয়কর্ম্ম করি, নূতন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি, সর্ব্বদা নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকি ; কিন্তু সর্ব্বক্ষণ মনে জাগেন অমরকুমারী কত দিনে আমি অমরকুমারীর দর্শন পাব, কত দিনে আমি অমরকুমারীর কাছে তাঁর বংশ-পরিচয় প্রকাশ কোরবো, সেই কল্পনায় আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হয়। “অবসন্ন হয়ো না, আশার উপদেশে আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ কোত্তে যেয়ো না, সম্পদে গর্ব্ব-প্রকাশ কোরো না” এইগুলি মহাজনের উপদেশ। সম্পদের সুখ জন্মাবধি আমি জানতেম না, এখন আমি রাজ-সম্পদের অধিকারী, তথাপি আমি যে হরিদাস, সেই হরিদাস। অহঙ্কার আমার অন্তরে স্থান পায় নাই।

সম্পদ আমারে অত্যানন্দে উন্মত্ত কোত্তে পারে নাই, বাহ্যাড়ম্বরে আমার কিছু মাত্র প্রবৃত্তি জন্মে নাই। দুঃখের সময়, বিষাদের সময়, কখনো আমি অবসন্ন হোতেম না, অসম্ভব উচ্চ আশাকে কখনো আমি মনোমধ্যে স্থান দান কোত্তেম না, নীতিমার্গের নেতা মহাজনগণের বাক্য চিরদিন আমি পালন কোরে এসেছি, এখনো আমি মহাজন-বাক্যের অনুগামী। উপাধিতে এখন আমি রাজা ; সম্পদের স্বামী হোলেও বাহ্যাভ্যন্তরে আমি যে হরিদাস, সেই হরিদাস। বিশেষতঃ হরিদাস নামটি আমার বড় প্রিয় ; নূতন নামের তত্ত্ব অবগত হোলেও নূতন লোকের কাছে আমি পরিচয় দিই, আমার নাম হরিদাস ; পুরাতন বন্ধুবান্ধবগণের নিকটেও নিজ মুখের পরিচয়ে আমি হরিদাস।

মাঘ মাস অতীত। ফাল্গুন মাসের দশম দিবসে দেওয়ানজীর সহায়তায় লণ্ডনের সেই সুর্ত্তিখেলার জিতের লক্ষ টাকা আমি প্রাপ্ত হই ; দেওয়ানজীর সহায়তায় বিষয়-কার্য্যের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অবগত হই ক্রমেই দিন গত হয়। দেওয়ানজী একদিন আমারে জিজ্ঞাসা করেন, “পাটনার রাজবাড়ীতে যে সুন্দরী রমণীটিকে আমরা নূতন রাণী বোলে জানতেম, রাজার মৃত্যুর পর হঠাৎ এক-

রাত্রে যিনি অদৃশ্য হন, সময়ান্তরে যাঁর কথা তুমি আমাকে বোলবে বোলে আভাষ দিয়ে রেখেছিলে, বাস্তবিক সে রমণীটি কে?"

আমি এখন সংসারের কর্ত্তা হয়েছি, উত্তরাধিকারক্রমে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েছি, তথাপি দেওয়ানজী আমারে "তুমি তুমি" বাক্যে সম্ভাষণ করেন, তাতে আমি সন্তুষ্ট থাকি; একে ত বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি, তাতে আমার স্বভাব, তুমি সম্ভাষণ আমি বড় ভালবাসি। দেওয়ানজীর প্রশ্নের আমি উত্তর দিলেম, "আপনাদের রাজচরিত্র বড় অদ্ভুত ছিল! আমার অপেক্ষা সে চরিত্র আপনি অনেক বেশী জানেন, আমি আর বেশী পরিচয় কি দিব? যখন তিনি প্রয়াগযাত্রা করেন, আমিও সেই সময় কাশীযাত্রা কোরেছিলেম; পথের এক চটিতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়; সেই সময় একটি যুবতী তাঁর সঙ্গে ছিল। আমার কাছে তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই যুবতীটি তাঁর নূতন পরিবার। কাশীতে সেই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। তার পর আমি জানতে পারি, নূতন পরিবার নয় নূতন পুরাতন কিছুই নয়, সেটি একটি অবিবাহিত কুমারী। কুমারীধর্ম্ম নষ্ট কোরে বাবু সেটিকে পরিবার বোলে পরিচয় দিয়েছিলেন। কুমারীর মৃত্যুর পর কাশীর একটি বাঈজীকে নিয়ে তিনি পাটনায় আসেন, সেই বাঈজীকেই আপনারা নূতন রাণী বোলে জেনেছিলেন; রাজাই সেই পরিচয় জানিয়েছিলেন। বাস্তবিক পূর্ব্বোক্তা কুমারী যেমন নূতন পরিবার, কাশীর সেই বা জাটী ও সেইরূপ নূতন রাণী।"

দেওয়ানজী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লেন। সমরকুমারীকে আমি কেবল কুমারী বোলেই রাখলেম, পরিচয় ভাঙলেম না। দরকার কি? অভাগিনী সংসার ত্যাগ কোরে চোলে গিয়েছে, পরিচয় প্রকাশ কোরে একটি ভদ্রলোকের কলঙ্ক ঘোষণা করা উচিত হয় না, সেই কারণেই দেওয়ানজীর কাছে আসল পরিচয় আমি দিলেম না। ফাগুন মাস প্রায় শেষ। অমরকুমারীর দর্শন নিমিত্ত নিত্য নিত্য আমার নূতন পিপাসা। মাসের পাঁচ দিন থাকতে জননীর কাছে বিদায় নিয়ে, দেওয়ানজীর প্রতি সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ কোরে, আমি মুর্শিদাবাদে যাত্রা কোল্লেম। অপর কাহাকেও সঙ্গে নিলেম না, সঙ্গে থাকলো, কেবল সেই কালাচাঁদ।

পথের ঠাঁই ঠাঁই কিছু কিছু বিলম্ব হয়েছিল. চৈত্রমাসের প্রথম সপ্তাহে আমি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হোলেম। প্রথমে বহরমপুর। রজনীবাবুর বাসায় উপস্থিত হয়ে সংবাদ জানলেম, মেয়েচুরী মোকদ্দমার আসামীরা তখনো হাজতে আছে, রক্তদন্ত তখনো ধরা পড়ে নাই। আমি মনে কোল্লেম "মেয়েচুরি মামলাটা হালকা হয়ে পোড়েছে; গ্রন্থির উপর গ্রন্থি ক্ষুদ্র গ্রন্থির উপর বৃহৎ গ্রন্থি। রক্তদন্ত এখন খুনী আসামী; তার সহকারী ঘনশ্যাম খুনী মামলায় অভিযুক্ত; তাদের শেষবিচার বহরমপুরে হবে না।" রজনীবাবুকেও সে কথা আমি বোল্লেম: আমার নিজের পরিচয় আমি জানতে পেরেছি, সেই পরিচয় দিয়ে তাঁর আনন্দবর্দ্ধন কোল্লেম। এক রাত্রি বহরমপুরে বাস কোরে, গঙ্গা

পার হয়ে আমরা যদুপুরে উপস্থিত হোলেম। দীনবন্ধুবাবুর বাড়ী। আমার সৌভাগ্যের অবস্থা সকলেই অবগত হয়েছিলেন, কাহারো কাছে আর নতুন পরিচয় দিতে হলো না। সকলের সঙ্গে প্রিয়সম্ভাষণ কোরে, আহারাদির পর অমরকুমারীর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কোল্লেম। একটি কক্ষ্যে অমরকুমারী একাকিনী ছিলেন, আমি গিয়ে সম্মুখে দাঁড়ালেম। এবারে অমরকুমারীর কিছু নতুন ভাব। অন্য অন্য বারে আমারে দেখলেই পদ্মনেত্র-দুটি সজল হয়ে আসতে, এবারে সেই নেত্রদুটি প্রভাত কমলের ন্যায় প্রফুল্ল ; মুখখানি সর্ব্বদা ম্লান হয়ে থাকতো, এবারে সেই পদ্মমুখখানিও প্রফুল্ল ; পূর্ব্বাপেক্ষা অমরকুমারীকে এবারে আমি কতই সুন্দর দেখলেম।

একখানি কৌচের উপর আমরা উভয়েই মুখামুখি কোরে বোসলেম। অমরকুমারীর মুখে অল্প অল্প হাস্য ক্রীড়া কোচ্ছিল, চক্ষুদুটি সলজ্জ, অথচ আমি সেই মুখে মৃদু মৃদু হাস্যরেখা অনুভব কোল্লেম। সলজ্জভাবে অমরকুমারী অল্পে অল্পে বোলতে আরম্ভ কোল্লেন, “তুমি—তুমি, তুমি—কেমন আছ ? আমারে তুমি—”

আমি দেখলেম, কথাগুলি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসতে লাগলো ; ভাব কিছু আশ্চর্য্য, সম্বোধন নাই, প্রথম কথাতেই “তুমি তুমি”। কি কারণে সম্বোধনশূন্য, তাও আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পাল্লেম। দীনবন্ধুবাবু অনেক কথাই প্রকাশ কোরে দিয়েছেন, অমরকুমারী সে সব কথা শুনেছেন, সেই কারণেই লজ্জাশীলা সুশীলা কুমারীর সম্বোধনে ইতস্ততঃ ; হরিদাস বোলতেও পারেন না, রাজা বোলে সম্বোধন কোত্তেও স্বভাবতঃ সংকোচ আসে, সেই জন্যই সেই ভাব। হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, “আজ তোমার এমন উদাসীনভাব কেন দেখছি ? আমার নামটি যেন তুমি ভুলে গিয়েছ, সেই রকম আমি অনুমান কোচ্ছি। কেন অমর ? আমারে হরিদাস বোলতে তোমার রসনা প্রস্তুত নয় কেন ? বুঝতে পেরেছি, এতদিনের পর আমার পরিচয় তুমি শুনেছ। সত্যই আমি এখন সেই পরিচয়ে পরিচিত ; কিন্তু তাতে তোমার ইতস্ততঃ ভাবটি কেন ? তোমার কাছে আমি হরিদাসই আছি ; আমার নূতন নামে, নতুন উপাধিতে, নতুন পরিচয়ে, তোমাতে আমাতে কোন ভিন্নভাব ঘটে নাই। তুমি আমারে হরিদাস বোলেই ডেকো, আমিও জানছি, আমি সেই হরিদাস ; অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদের পরস্পর সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তুমি এত দিন এখানে কেমন ছিলে ? এখন তুমি কেমন আছ ?”

অমরকুমারী উত্তর কোল্লেন, “তোমার অদর্শনে যা কিছু অসুখ, তদ্ভিন্ন এখানে আমি ভালই ছিলেম, ভালই আছি ; তোমারে দেখে আজ আরো বেশী ভাল হোলেম। তুমি কেমন আছ ?”

আমি উত্তর কোল্লেম “তোমার উত্তরই আমার উত্তর। তুমি ভাল আছ, তুমি আমার জীবনদায়িনী, তোমার ভালতেই আমার ভাল। অমর ! তুমি আমার পরিচয় পরিজ্ঞাত হয়েছ, তোমার নিজের পরিচয় অবগত হোতে পার নাই,

আমার মুখে আর সেইটি অবগত হও।" এ কথা আমি কেন বোল্লেম, পাঠক-মহাশয় হয় তো বুঝতে পেরে থাকবেন। আমাদের দেওয়ানজীর লিখিত পঠিত পত্রিকার যে যে অংশে অমরকুমারীর পরিচয়ের আভাষ আছে, আমি ভিন্ন সে আভাষের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া অপরের সাধ্য নাই। দেওয়ানজী নিজেও বুঝতে পারেন নাই, দীনবন্ধুবাবুর তো না বুঝবারই কথা। এইখানে অমর-কুমারীর পরিচয় অমরকুমারীকে আমি বোল্লেম।

সেই পত্রিকাখানি আমার সঙ্গেই ছিল। নানা কথা-পূর্ণ তত বড় পত্রিকা অমরকুমারীকে পাঠ কোরে শুনান অনাবশ্যক বিবেচনা কোরে মুখে মুখেই আমি বোল্লেম, অমর! তোমার পরিচয় তুমি পরিজ্ঞাত হও। তুমি একজন কুলীন কায়স্থের কন্যা ; তোমার পিতার নাম রামলোচন মিত্র ; নিবাস প্রতাপ-নগর—হুগলী। এখন তুমি এই পর্য্যন্ত জেন রাখো. সময়ে বিশেষ পরিচয় জানতে পারবে। আমি যেমন আমার জাতি-জন্ম বংশপরিচয় কিছুই জানতেম না, তুমিও সেইরূপ তোমার বংশপরিচয় কিছুই জানতে না। বিধাতার ইচ্ছায় সে অন্ধকার এখন ঘুচে গেল. এখনকার কর্ত্তব্য কার্য্য অবধারণের আমরা উপ-যুক্ত সময় পেলেম।"

অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ. প্রসঙ্গাধীন বিবিধ কথোপকথনের পর আমি সদরবাড়ীতে চোলে এলেম। পশুপতিবাবুর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হলো। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদরে সে দিন সে রাত্রি সেই বাড়ীতে আমি বাস কোল্লেম। ইতিপূর্ব্বে সেই বাড়ীতে আমি একজন অপ-রিচিত অনাথ বালক ছিলেম. সামান্য একজন চাকর ছিলেম, এখন আমার সেই বাড়ীতে রাজসমাদর!

পরদিন প্রাতঃকালে পশুপতিবাবুকে সঙ্গে কোরে আমি শান্তিরাম দত্তের বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। বৃদ্ধ শান্তিরাম যথাযোগ্য সমাদরে আমার অভ্যর্থনা কোল্লেন ; মণিভূষণ আমারে আলিঙ্গন কোরে পরমানন্দ প্রকাশ কোল্লেন, শান্তি-রামের নিকটে যোগ্য আসনে আমি উপবেশন কোল্লেম। দীনবন্ধুবাবুর মুখে আমার সম্বন্ধে কি কি কথা তাঁরা শুনেছিলেন, সেগুলি জানবার কিম্বা উত্থাপন করবার অবকাশ গ্রহণ না কোরে শান্তিরামকে আমি বোল্লেম, "মহাশয়! আপনার অনুগ্রহে অমরকুমারী কাশী থেকে আপনার সঙ্গে এখানে এসেছিলেন. কন্যার ন্যায় স্নেহ-যত্নে নিজ বাড়ীতে অমরকুমারীকে আপনি রক্ষা কোরেছিলেন ; পরিচয় জানতেন না. তথাপি আপনারা যেন আপন ভেবে অমরকুমারীর অভিভাবক হয়ে-ছিলেন ; ভগবানের কাছে আপনি সেই যত্নের পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন। এখন আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অমরকুমারীর প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছি। হুগলী প্রতাপনগরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভূম্যধিকারী রামলোচন মিত্র অমরকুমারীর পিতা। অমরকুমারী যখন—"

বিস্ময়ে উভয়নেত্র বিস্ফারিত কোরে, বৃদ্ধ শান্তিরাম আকাশপানে মুখ তুলে, এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোলে উঠলেন, "অ্যাঁ? রামলোচন মিত্র?—প্রতাপনগরের

রামলোচন মিত্র ?—ধন্য জগদীশ ! এত দিনের পর কি সমাচার আমি শ্রবণ কোল্লেম ! ওঃ ! সেই জন্যই প্রথম দর্শনাবধি অমরকুমারীর প্রতি আমার তাদৃশ স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল ! আমি পশ্চিমদেশে চাকরী কোত্তেম ; সেই সময় এখানে আমার একটি ভগ্নীর জন্ম হয়, সেই ভগ্নীর নাম সর্ব্বমঙ্গলা। জন্মের পর সর্ব্বমঙ্গলাকে আমি দেখি নাই ; দেশে এসে শুনেছিলেম, প্রতাপনগরের রামলোচন মিত্রের সঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ হয়েছিল ; গ্রহবশে বিধবা হবার পর সর্ব্বস্বহারা হয়ে, ছোট ছোট কন্যা নিয়ে, সর্ব্বমঙ্গলা কোথায় চোলে গিয়েছে ; কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই। তার পর যখন আমি বীরভূমজেলার শিউড়ী-নগরে চিকিৎসকের কার্য্য করি, সেই সময় একটি স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে আমাকে যেতে হয়। যে স্ত্রীলোকটির চিকিৎসা আমি কোরেছিলেম, সেটি যে আমার নিজের ভগিনী, তা তখন আমি জানতে পারি নাই। সেইখানে অমরকুমারীকে আমি প্রথম দেখি। এত দিনের পর জানলেম, অমরকুমারী আমার ভাগিনেয়ী। হায় ! হায় ! সর্ব্বমঙ্গলার অসাধ্য রোগ জন্মেছিল অভাগিনী আমার চক্ষের উপরেই ইহ সংসার ত্যাগ কোরে চেলে গিয়েছে !”

এই সব কথা বোলতে বোলতে শান্তিরাম দত্ত বারম্বার আপনার সিক্তনেত্র মার্জ্জনা কোল্লেন ; মণিভূষণ স্তম্ভিত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ সেইখানে থেকে, আমি বিদায় হবার জন্য গাত্রোত্থান কোল্লেম, অমরকুমারীকে দেখবার নিমিত্ত সপুত্র শান্তিরামও আমার সঙ্গে দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীতে এলেন। পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হলো। আমার মুখে অমরকুমারী যখন নিজের পরিচয় শ্রবণ করেন, তখন তাঁর মুখে আমি হর্ষ-বিষাদের কোন লক্ষণই দর্শন করি নাই, হর্ষ বিস্ময়োচিত একটি বাক্যও শ্রবণ করি নাই, সে সময় অমরকুমারীর মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়েছিল, তাও আমি বুঝতে পারি নাই ; কিন্তু এই সময় শান্তিরাম দত্তের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের পরিচয় অবগত হয়ে, অমরকুমারীরা ক্ষণকাল নীরবে অশ্রুপাত কোল্লেন। শান্তিরামের নয়নে অশ্রু, মণিভূষণের নয়নে অশ্রু, অমরকুমারীর নয়নেও অশ্রু ! স্বর্গবাসিনী জননীর নাম শ্রবণে শোকাশ্রু, নূতন মিলনানন্দে আনন্দাশ্রু, অমরকুমারীর নয়নে দুই প্রকার অশ্রু একসঙ্গে মিশ্রিত। অমরকুমারীকে নিজাগারে নিয়ে যাবার নিমিত্ত শান্তিরাম দত্ত আগ্রহ প্রকাশ কোল্লেন, কিন্তু দীনবন্ধুবাবুর অনিচ্ছায় দত্ত মহাশয়ের অভিলাষ পূর্ণ হলো না। দীনবন্ধুবাবু বোল্লেন, “এইখানেই থাকা ভাল ; মধ্যে মধ্যে এক একদিন দিবাভাগে আপনি নিয়ে যাবেন, সন্ধ্যাকালে আবার এইখানেই পাঠাবেন। অমরকুমারীর প্রধান শত্রু এখনো খোলসা আছে, রাত্রিকালে আপনার অরক্ষিত বাড়ীতে অমরকুমারীকে রাখা হবে না।” আমিও সেই বাক্যে সায় দিলেম। চক্ষের জল মুছতে মুছতে পুত্র-সমভিব্যাহারে শান্তিরাম স্বগৃহে ফিরে গেলেন।

অষ্টাহ যদুপুরে অবস্থান কোরে ভৃত্য-সমভিব্যাহারে আমি কাশীযাত্রা

কোল্লেম। চৈত্রমাস অবসান ; ১২৬৪ সাল বিদায় ১২৬৫ সালের আরম্ভ। দ্রুত-গামিনী তরুণী, দাঁড়ী অনেকগুলি, বৈশাখমাসের একাদশ দিবসে আমরা কাশীতে উপনীত হোলেম। বাবু রমেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ী। রমেন্দ্রবাবু প্রথমে আমাকে ঠিক চিনতে পাল্লেন না, পরিচয় পেয়ে আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন, বাড়ীর পরিবারেরাও আমারে দেখে সন্তুষ্ট হোলেন। পূর্ব্বে যা ছিলেম, এখন আমি তা নই. সেই পরিচয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা আমার আদর-বৃদ্ধি হলো। সপ্তাহ আমি কাশীবাস কোল্লেম ;—শুনলেম. রামশংকরবাবু পরিবারের সংগে কলহ-কোরে সেই যে বাহির হয়ে গিয়েছেন, তদবধি আর প্রত্যাগত হন নাই ; ছোটবাবু মতিলাল,—ছোটবাবুটি বাড়ীতেই আছেন, অগ্রজের সহিত তাঁর পূর্ব্বসদ্ভাব অক্ষুণ্ণ আছে।

একদিন অবকাশকালে বড়বাবুকে আমি মোহনবাবুর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ জানালেম, শুনে তিনি দুঃখ প্রকাশ কোল্লেন। পূর্ব্বে তিনি বোলেছিলেন, মোহনবাবু ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, পরোপকারী ; আমি সে কথার প্রতিবাদ কোরে-ছিলেম ; সেই সময় মোহনবাবু হঠাৎ উপস্থিত হয়ে আমারে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিয়েছিলেন। আমার কথা সত্য কি না, সেইটি প্রতিপন্ন করবার নিমিত্ত মোহনবাবুর দস্তখতী সেই সুদীর্ঘ পত্রিকাখানি বড়বাবুকে আমি দেখালেম : পাঠ কোরে তিনি বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার নাম স্মরণ কোরে মহাবিস্ময় প্রকাশ কোল্লেন।

লালা বুল চাঁদ আর সেই সিদ্ধেশ্বরবাবু কাশীতে আছেন কি না দুই তিন দিন অনেক সন্ধান কোরেছিলেম কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। আর এক-দিন বাড়ীর চাকর যজ্ঞেশ্বরকে নির্জ্জনে ডেকে চুপি চুপি তারে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "পাশের বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি ছিল এখনো কি সেই বাড়ীতে সে আছে? যজ্ঞেশ্বর উত্তর কোল্লে, "সে ভারী মজা হয়ে গিয়েছে! তার নামে কি একটা খুনীমামলা ছিল পুলিশ এসে সেই স্ত্রীলোককে ধোরে নিয়ে গিয়েছিল ; আর একজন কে.—কি জানি, নাম তার জয়হরি বড়াল. বাইজী মহাল থেকে সেই জয়হরি বড়ালকেও পুলিশ গ্রেপ্তার কোরেছিল ; আর সেই বুড়ী দাসীটা চাকরী ছেড়ে সেই বুড়ী মির্জাপুরে পালিয়ে গিয়েছিল, পুলিশের লোকেরা খুঁজে খুঁজে তাকেও ধোরে এনেছিল—তিনজনকেই কলি-কাতায় চালান কোরে দিয়েছে।"

যজ্ঞেশ্বরকে আর আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। তিনদিন পরে রমেন্দ্রবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে আমি গুজরাট যাত্রা কোল্লেম।

বরদারাজ্যে আমি দ্বিতীয়বার উপস্থিত। কুমার রণেন্দ্ররাও বাহাদুর সমা-দরে আমার অভ্যর্থনা কোল্লেন, তাঁর নিজের বিরাম মন্দিরেই আমি স্থান প্রাপ্ত হোলেম। অবকাশকালে আমার প্রকৃত পরিচয় রাজপুত্রকে আমি প্রদান কোল্লেম, আমারে আলিঙ্গন কোরে তিনি সানন্দ অভিনন্দন কোল্লেন। বিংশতি দিবস আমার বরদায় অবস্থান, তন্মধ্যে পাঁচদিন রাজকুমার আমারে মহারাজের নিকটে উপস্থিত কোরেছিলেন ; কুমার বাহাদুরের মুখে আমার বিশেষ পরিচয় শ্রবণ

কোরে মহারাজ বাহাদুর হর্ষ প্রকাশ কোল্লেন ; মহারাজের নিকটেও আমি বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হোলেম।

রাজকুমারের উপবেশনকক্ষে একমাত্র আমি সদাশিব ঠাকুরকে দর্শন কোল্লেম। আমার অন্বেষণের নিমিত্ত যিনি মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন, দীনবন্ধুবাবুর সহিত যিনি পাটনায় উপস্থিত হয়ে আমারে বাতুলালয় থেকে উদ্ধার কোরেছিলেন, সেই সদাশিব ঠাকুর। এখন আমি নিজালয় জেনেছি, নিজ পরিচয় পেয়েছি, সেই সংবাদে তিনিও আমারে অভিনন্দন কোল্লেন।

পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয় নাই, এইবারের ঘনিষ্ঠ আলাপে আমি জানতে পাল্লেম, তিনি সদাশয়, সুপণ্ডিত এবং বন্ধু-বৎসল। সদাশিব ঠাকুরের সঙ্গে নানাপ্রসঙ্গে আমি কথোপকথন কোচ্ছিলেম, রাজকুমার তখন সেখানে ছিলেন না, একটু পরে তিনি উপস্থিত হোলেন। বাঙ্গালাদেশ-সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন কথা সেই সময় উত্থাপিত হলো। বাঙ্গালা দেশে প্রথমে সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত, তার পর ক্রমে ক্রমে ভারতের নানাস্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত, খানিকক্ষণ সেই সব কথার আলোচনা হলো। বিদ্রোহের শান্তি হয়ে এসেছে, সেইখানে আমি সেই কথা শুনলেম, কাণপুরের অনেক কথা তখন আমার মনে পোড়লো ; স্বচক্ষে যা যা আমি দেখেছিলেম, তার কতকগুলি তাদের কাছে আমি গল্প কোল্লেম ; অনেক রাত্রে সদাশিব ঠাকুর বিদায় হোলেন। রাজপুত্রের কাছে আমি একাকী।

কথায় কথায় একটু হাসতে হাসতে রাজকুমার আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সেই রঙ্গিণী এখন কি অবস্থায় আছে, তা কি তুমি জানতে পেরেছ ?" আমি উত্তর কোল্লেম, "রঙ্গিণী আপনার কাছে থাকলো, আমি চোলে গেলেম ; রঙ্গিণী কেমন আছে, তার কি অবস্থা হয়েছে, আপনিই জানেন, আমি কিরূপে জানবো ?"

রাজকুমার বোল্লেন, "রঙ্গিণী আমার কাছে থাকলো না, দিন দিন আমি তার কেমন একরকম উদাস উদাস ভাব দর্শন কোল্লেম, আমার যেন ভাল বোধ হলো না। রঙ্গিণীর বয়স অল্প, কুসঙ্গে দেশছাড়া হয়ে এই রাজ্যে ডাকাতের হাতে পোড়েছিল, তা তুমি জানো ; আমি তারে যত্ন কোরে রাখবো ভেবেছিলেম, কিন্তু রঙ্গিণী তাতে তুষ্ট থাকলো না। ভাবগতিক দেখে একজন মারহাট্টা যুবকের সঙ্গে আমি তার বিবাহ দিয়ে দিয়েছি, রঙ্গিণী এখন বেশ আছে। তার নূতন স্বামীর নাম বামদেব। অল্পদিন হলো, বামদেবের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল, পরিবারের মধ্যে তার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী কেহই নাই। রঙ্গিণীকে বিবাহ কোরে বামদেব এখন নূতন সংসারী হয়েছে। বামদেবের ঔরসে রঙ্গিণীর একটি পুত্র-সন্তান জন্মেছে। সংসারে বামদেবের আর কেহই নাই, কোন দেশের কাহার কন্যাকে সে এখন বিবাহ কোরেছে, সে কথা কেহই জিজ্ঞাসা করে না, স্বজাতির মধ্যে কেহই কোন দোষ ধরে না, কোন উৎপাত নাই। তোমার মুখে

আমি শুনেছিলেম, রঙ্গিণী একজন ব্রাহ্মণের কন্যা, বামদেবটিও ব্রাহ্মণ ; বামদেবের হস্তে রঙ্গিণীকে সমর্পণ কোরে আমিও এক প্রকার নিশ্চিন্ত হয়েছি।"

অবনত-বদনে আমি মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেম, ভাল মন্দ কোনরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কোল্লেম না ; ভাবলেম, কুলকলঙ্কিনীর যা হোক একটা কিনারা হয়ে গেল, তাকে বাজারে বেশ্যাবৃত্তি কোত্তে হলো না, একপ্রকার ভালই হলো। কাণকাটা কানাই সেই বিবাহের কথা শ্রবণ কোরে কি মনে কোরবে, সে কথা আমি কিছুই মনে আনলেম না। কোথায় কানাই, কোথায় রঙ্গিণী ? এ সংবাদ হয়তো বঙ্গদেশের কেহই জানবে না ; যদি জানে, তাতে কোরে রঙ্গিণীর জাতিতে কোন খোঁটা হবে না।

বহুদিনের পর অল্পদিন মাত্র দর্শন কোরে মুর্শিদাবাদ থেকে আমি চোলে এসেছি, অমরকুমারীর জন্য চিত্ত আবার অস্থির হলো, স্বদেশযাত্রার নিমিত্ত আমি প্রস্তুত হোলেম। বিদায়ের দুইদিন পূর্ব্বে রাজকুমার আমারে আর একবার রাজদরবারে পেস কোল্লেন ; মহারাজ সেই দিন আমার হস্তে একখানি সনন্দ প্রদান কোল্লেন ; বরদ রাজ্যমধ্যে আমি একটি বিস্তৃত জমিদারীর মালিক হোলেম। বার্ষিক উপস্বত্ব লক্ষ টাকা ; করযোড়ে মহারাজকে আমি অভিবাদন কোল্লেম। অল্পক্ষণ সেখানে থেকে বিদায় গ্রহণ কোরে রাজকুমারের সঙ্গে আমি বাহির হয়ে এলেম।

সেই রাত্রে আমার একটি নূতন চিন্তা। গুজরাটে আমার জমিদারী ! আমার নিবাস হলো বঙ্গদেশের বর্দ্ধমানে ; ততদূর থেকে এ জমিদারীর তত্ত্বাবধান করা সহজ সাধ্য হবে না, কি করা যায় ? ভেবে চিন্তে শেষে একটা উপায় অবধারণ কোল্লেম। পরদিন রাজকুমার বাহাদুরের সঙ্গে যুক্তি কোরে, পূর্ব্বকথিত সদাশিব ঠাকুরকে সেই জমিদারীটি আমি ইজারা দিলেম। উপস্বত্ব লক্ষ টাকা ; তন্মধ্যে বিংশতিসহস্র নিজের লাভ রেখে, অবশিষ্ট অশীতিসহস্র মুদ্রা বর্ষে বর্ষে ইজারাদার আমার নিকটে বর্দ্ধমানে প্রেরণ কোরবেন এইরূপ বন্দোবস্ত। জমিদারী বন্দোবস্তের পর রাজসম্মান প্রাপ্ত হয়ে আমি স্বদেশযাত্রা কোল্লেম। সঙ্গে থাকলো কালাচাঁদ আর একজন মারহাট্টা ব্রাহ্মণ। রন্ধনকার্য্যে সেই ব্রাহ্মণটি সুনিপুণ, সেই নিমিত্ত রাজকুমার তাঁরে আমার সঙ্গে দিলেন। ব্রাহ্মণের নাম রঘুজী।

প্রত্যাগমনপথে আমরা নাগপুরে উপস্থিত হোলেম। সেই নাগপুর সাধারণতঃ বড় নাগপুর নামে প্রসিদ্ধ। নাগপুর একটি সহর ; সেই সহরে যখন আমরা পোঁছিলেম, তখন রাত্রি হয়েছিল ; রাত্রিকালে সেই সহরে অবস্থান করাই আমি যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা কোল্লেম। অনুসন্ধানে জানলেম, সহরে একটি ভদ্রলোকের বসোপযোগী দিব্য সরাইখানা আছে, ভদ্র ভদ্র পথিকলোকেরা আর দূর-পথগামী মহাজনেরা সময়ে সময়ে সেই পান্থনিবাসে নিশাযাপন করেন। আশ্রয়লাভ আশায় সেই পন্থশালাতেই আমরা উপস্থিত হোলেম ;—দেখলেম, অনেকগুলি লোক সেইখানে গোলমাল কোচ্চে ; ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পোষাকপরা, ভিন্ন

ভিন্ন বর্ণের পাগড়ী মাথায়, মহাজনের সংখ্যাই বেশী। সরাইওয়ালাকে জিজ্ঞাসা কোরে অবগত হোলেম, সমস্ত ঘরই প্রায় পরিপূর্ণ, কেবল দুটি ঘর খালি আছে মাত্র ; একটি অপেক্ষাকৃত কিছু বড়, আর একটি ছোট। এক ঘরে পাঁচজনের সঙ্গে আমি থাকবো না, আমার নিজের জন্য একটি ঘর প্রয়োজন, বড় ঘরটিই আমি মনোনীত কোল্লেম। সে ঘরে শয্যাপত্র প্রস্তুত ছিল, আসবাবপত্রও পরিষ্কার, সেই ঘরটি হোলেই আমার ঠিক হবে, রঘুজী আর কালাচাঁদ দরদালানে শয়ন কোরবে; এইরূপ স্থির করা গেল। ঘরের ভিতর আমার জিনিসপত্র রেখে বাহিরে যেখানে দশজন ভদ্রলোক বোসে গল্প কোচ্ছিলেন, সেইখানে গিয়েই আমি বোসলেম। গল্পটা হোচ্ছিল সিপাহী বিদ্রোহের! একজন বোল্লেন, "মহাপ্রলয় কাণ্ড, কাণপুর-সহর তোলপাড় ; রাজপথ রক্তময়! চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত বিভীষণ শব্দ! দম দম দমাদম গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কর্ণ বধিরপ্রায়! বজ্রগর্জ্জনের ন্যায় কামানগর্জ্জন! জলদগর্জ্জনের ন্যায় বন্দুকধ্বনি! কামান-বন্দুকের গর্জ্জনে ক্ষণে ক্ষণে যেন ভয়ানক ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল! সহরের প্রকৃতি যেন করাল-মূর্ত্তি ধারণ কোরেছিল! উভয় পক্ষের কত প্রাণী অকালে নির্দ্দয়রূপে নিহত হয়েছে, সংখ্যা পাওয়া যায় না। আর একটা ভয়ানক কাণ্ড!

একজন বড়দরের সাহেব তাঁর একটি উপপত্নীকে একটা বাড়ীতে রেখে দিয়েছিলেন, সেই বাড়ীর নাম বিবিগড়। উপস্থিত উপদ্রবের সময় অনেকগুলি বিবি আর অনেকগুলি বালকবালিকা সেই বিবিগড়ে আশ্রয় লয়েছিল। একদা নিষ্ঠুর সিপাহী সেই বাড়ীতে প্রবেশ কোরে সুশাণিত তরবারিপ্রহারে তাদের প্রায় সকল-গুলিকেই খণ্ড খণ্ড কোরে ফেলে! নির্দ্দোষ প্রাণিপুঞ্জের শোণিতপাতে বাড়ীখানা রক্তময়! হায় হায়! শুনলেম, এলাহাবাদ থেকে সেনাপতি নীলসাহেব এই সময় কাণপুরে উপস্থিত হয়ে কোন কোন সিপাহীকে সেই রক্ত চেটে খেতে বাধ্য কোরেছিলেন। সেই নীলের শেষে কি গতি হয়েছে, সে কথা শুনা যায় নাই। একজন সাহেব বোলেছেন, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নৃশংসাচারে কলিকাতায় যে অন্ধকূপহত্যা সাধিত হয়েছিল ; কাণপুরের বিবিগড়ের হত্যাকাণ্ডও তদপেক্ষা শতগুণে ভয়ঙ্কর! পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এখন শান্তিবারি প্রক্ষেপে সেই কালাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়েছে। শুনা যাচ্ছে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার ফুরালো, মহারাণী ভিকটোরিয়া এখন অবধি স্বহস্তে ভারতরাজ্যের শাসনভার পরিগ্রহ কোচ্ছেন।"

আর একজন বোল্লেন "এ বিদ্রোহটার মূল কি? কেহ কেহ বলে, টোটাকাটা ; কেহ কেহ বলে, আটা ময়দায় হাড়ের গুঁড়া ; সেটা বাস্তবিক জনরবমাত্র। অনেকে অনুমান করেন, লর্ড ডালহৌসী এ দেশের অনেক রাজার রাজ্য গ্রাস কোরে গিয়েছিলেন, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলীকে কলিকাতার মুচিখোলায় বন্দী কোরে রেখেছিলেন, ঘোর অনলকুণ্ড প্রধূমিত হয়েছিল, লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের আগমনে সেই অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের শান্তিময়ী নীতিপ্রভাবে সেই প্রচণ্ড অনল নির্ব্বাপিত হলো। ডালহৌসী বাহাদুর এ

সময়ে ভারতবর্ষে বিদ্যমান থাকলে এ বিদ্রোহের পরিমাণ কি রকম দাঁড়াতো অনুমান করা যায় না। এখন ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই শান্তির শীতলতা অনুভূত হোচ্ছে, নানা সাহেব অদৃশ্য, বিঠুরের রাজবাড়ী ভগ্নস্তূপে পরিণত, রাজ-সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত, রাজপরিবারের মূল্যবান অলঙ্কার নদীগর্ভে সমাহিত, বিঠুরের আর পূর্ব্বচিহ্ন কিছুই নাই। তাতিয়া পলায়ন কোরেছে, আজিম উল্লা খাঁর উদ্দেশ নাই, জোয়ালাপ্রসাদ লুক্কায়িত, সমস্তই ছাড়িভঙ্গ! ইংরেজ-প্রতাপে অধুনা সমস্তই শীতল ; শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ!"

ঘটনাগুলি আমি শ্রবণ কোল্লেম। দুর্ভাবনা দূরে গেল। মহারাণী ভিকটোরিয়া নিজাধিকৃত রাজ্য আপন হস্তে গ্রহণ কোল্লেন, পরম সুখের বিষয়। লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের মস্তকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করুন, ডালহৌসীর বন্ধুগণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করুন, মহারাণীর শান্তিময় শাসনে ভারতভূমি সুখশান্তি উপভোগ করুক।"

গল্প শুনতে শুনতে উপস্থিত লোকগুলির মুখের দিকে আড়ে আড়ে এক একবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেম। দূরস্থ আসনের তিনজন লোক এক-দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে ছিল, দুই তিনবার তাদের সেই তীক্ষ্মদৃষ্টি আমি দর্শন কোরেছিলেম। কেন তাদের সে প্রকার কুটিল ভাব, তা তখন আমি বুঝতে পারি নাই। লোকেরা গল্প কোত্তে লাগলো, আমি একবার সেখান থেকে উঠে আমার নির্দ্দিষ্ট গৃহের দিকে চোল্লেম।

ঘরের দিকে আমি যাচ্ছি, সম্মুখে কালাচাঁদ। কালাচাঁদের হাতে একটা ব্যাগ ছিল, ব্যাগটা সেইখানে নামিয়ে রেখে নাকমুখ বাঁকিয়ে কালাচাঁদ বোলতে লাগলো, "উঁ হুঁ, উঁ হুঁ—হবে না। না মহারাজ! ও ঘরে আপনি থাকতে পার-বেন না। দুর্গন্ধ,—বেজায় দুর্গন্ধ! দরজার ধারে গেলেই যেন বমি আসে! ও ঘর আপনার যোগ্য নয়। সরাইওয়ালাকে এই কথা আমি বোলেছি, অনপ্রকার সুবিধাও হয়েছে। মহারাজ যখন গল্প শুনছিলেন, সেই সময় এখানে আর একটি নূতন লোক এসেছে, সে একজন সদাগর ; সরাইওয়ালা সেই সদাগরকে সেই ঘরে স্থান দিবার বন্দোবস্ত কোরেছে ; পাশের ছোট ঘরটি আমি মহা-রাজের জন্য পরিষ্কার কোরে রেখেছি।"

ছোট ঘরে থাকবার কিছু অসুবিধা হবে, বুঝতে পেরেও সেই ঘরটি আমি দেখতে গেলেম ;—দেখলেম, শয্যাপত্র মন্দ নয়, সুগন্ধি দ্রব্যাদি প্রক্ষেপে ঘরটি বেশ সৌরভময় হয়ে আছে, একরাত্রি সেখানে অক্লেশেই যাপন করা যেতে পারে। মনে মনে কালাচাঁদের প্রভুভক্তির প্রশংসা কোরে সেই ছোট ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম। আহারাদির পর রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় সকলে স্ব স্ব স্থানে শয়ন কোত্তে গেল, আমি সেই ছোট ঘরেই শয়ন কোল্লেম। কোন ঘরের দ্বার অবরুদ্ধ থাকলো না, আমার গৃহদ্বারও সমান উন্মুক্ত ; সম্মুখের দরদালানও সমান উন্মুক্ত। দরদালানে অন্যলোক কেহই ছিল না, কেবল রঘুজী আর কালাচাঁদ।

শয়নের পর সকল ঘরে আলো ছিল কি না তা আমি জানলেম না, আমার ঘরের আলোটি কিন্তু সমস্ত রাত্রি জ্বেলেছিল। ভোরে একটা ভয়ানক গোলমাল। জনকতক লোক ভোরে ভোরে বেরিয়ে যাবে, শীঘ্র শীঘ্র আয়োজন কোচ্ছে, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কোরে মুটে ডাকবার বন্দোবস্ত কোচ্ছে, গোলমালে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সেইরূপ আমি বুঝলেম। বিছানা থেকে উঠলেম না, প্রভাতের প্রতীক্ষায় চুপ কোরে শুয়ে থাকলেম। একটু পরে সরাইখানার চাকরদের মুখে ভয়ানক চীৎকার! —"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! —খুন! —খুন! —খুন!"

বিস্ময়ে, সন্দেহে, আতঙ্কে, ব্যস্তভাবে শয্যাত্যাগ কোরে আমি বারান্দায় এলেম। তখনো ফরসা হয় নাই। সকলেই জেগেছে, চাকরেরা আলো জ্বেলেছে, আমার শয়নঘরের পাশের কামরার দরজায় লোকের ভিড়। সেই সকল লোকের মুখেই ঐ প্রকার ভীতিবিজ্ঞাপক সভয় চীৎকার! খুন! আমার ঘরের পাশের ঘরেই খুন! আমার শয়নের জন্য যে ঘরটি পূর্ব্বে নির্দিষ্ট হয়েছিল, সেই ঘরেই খুন! রাত্রিকালে নবসমাগত সেই সদাগরটিই খুন! কে খুন কোল্লে, নির্ণয় হোচ্চে না। সদরদরজায় বড় বড় তালাবন্ধ, বাহিরের লোক খুন কোত্তে আসে নাই, সরাইখানার লোকের মধ্যেই কোন না কোন লোক সেই সদাগরকে খুন কোরেছে, সেটা নিশ্চয় ; কিন্তু ঠিক নির্ণয় হোচ্ছে না ; একজন কি পাঁচজন, তাও ঠিক জানা যাচ্ছে না। ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

সরাইওয়ালা মহাভয়ে বিকম্পিত! সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হয়ে প্রস্থানের জন্য যারা ব্যতিব্যস্ত হোচ্ছিল, তখনো তারা প্রস্থানের জন্য সমান ব্যস্ত ; খুনের কথায় তাদের যেন ভ্রূক্ষেপই নাই। তারা চারিজন। সরাইওয়ালা সভয়বাক্যে সকলকেই বোলতে লাগলো, "কেহ কোথাও যেতে পাবে না ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিস এসে উপস্থিত না হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিসের তদারক শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলকেই এখানে উপস্থিত থাকতে হবে।"

সেই চারিজনের মধ্যে একজন সম্মুখবর্ত্তী হয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোলতে লাগলো, "সে কি কথা? —সে কি কথা? তোমার বাড়ীতে খুন হয়েছে, জবাবদিহী তোমার, আমরা থেকে কি কোরবো? এখনি আমাদের মালগাড়ী এসে পোঁছিবে, এখনি আমাদের সমস্ত মালামাল বুঝে নিতে হবে, কিছুতেই আমরা থাকতে পারবো না ; এক ঘণ্টা দেরী হোলে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতি ; আমাদের আটক কোরে রাখলে সে ক্ষতির দায়ী কি তুমি হবে? কিছুতেই আমরা থাকতে পারবো না ; প্রভাত হবার অগ্রেই আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।"

সরাইওয়ালা সে সব কথায় কাণ দিলে না ; "সকলকেই থাকতে হবে, সকলকেই থাকতে হবে" বার বার এই কথা বোলতে বোলতে উপর থেকে নেমে দেউড়ীর দিকে চোল্লো। সরাইটা নিতান্ত ছোট ছিল না, দেউড়ীতে তিনজন দরোয়ান ছিল। খবরদারী রাখতে বোলে, দরজার চাবী খুলে, সে স্বয়ং পুলিসে খবর দিতে গেল, দরোয়ানদের বোলে গেল, "কেহ যেন বাহিরে যেতে না পায়।"

প্রভাত। বাড়ীর মধ্যে নানা লোকের মুখে নানা প্রকার কথা। সমস্ত লোক কত কথা বলাবলি কোত্তে কোত্তে এ দিক ও দিক ছুটাছুটি কোত্তে লাগলো সেই চারিজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যস্ত, সর্ব্বাপেক্ষা তাদের মুখেই অধিক উচ্চ চীৎকার। সেই সময় আমি তাদের চারিজনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেম। পোষাকের বৈচিত্র্য থাকলেও মুখ চারিখানা যেন আমার চেনা চেনা বোধ হলো। গতরাত্রে বিদ্রোহের গল্পের সময় যে তিনজন সর্ব্বক্ষণ আমার দিকে দৃষ্টি রেখে-ছিল, ঐ চারিজনের মধ্যেই সেই তিনজন, এইরূপ আমি অনুমান কোল্লেম।

পুলিশের লোকেরা এসে উপস্থিত হলো ; তদারক আরম্ভ হয়ে গেল। তখনো পর্য্যন্ত সেই চারিজন পাশ কাটিয়ে পালাবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে উদ্যত। পূর্ব্বরাত্রে সরাইওয়ালার নিকটে কালাচাঁদ আমার পরিচয় দিয়েছিল, পুলিসের নিকটেও সরাইওয়ালা আমার সেই পরিচয় প্রকাশ কোল্লে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তদারক শেষ না হয়, কার্য্যক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সেখানে উপস্থিত থাকবো, পুলিসের সাক্ষাতে আমি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কোল্লেম। নানা বাহানায় বাহির হবার জন্য যারা গণ্ডগোল বাধিয়েছিল, পুলিসের দারোগা আমার দিকে নয়ন নির্দ্দেশ কোরে সেই সকল লোককে বোল্লেন, "এই রাজা বাহাদুর যখন এখানে হাজির থাকতে কোন আপত্তি কোচ্ছেন না, তখন তোমরা কেন অকুস্থান পরিত্যাগ কোত্তে এত ব্যস্ত হও ? কেহই যেতে পাবে না। কি অভিপ্রায়ে খুন করা, টাকা-কড়ির সম্বন্ধ আছে কি না, খুন হওয়া লোকটির সঙ্গে এখানকার কাহারো কোন শত্রুতা ছিল কি না, অগ্রে আমি সেই বিষয়ের তদন্ত কোত্তে চাই।"

মৃত সদাগরের সঙ্গে একজন ভৃত্য ছিল। সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দারোগাকে সেলাম দিয়ে সেই ভৃত্য বোল্লে, "আমার মনিবের সঙ্গে পাঁচহাজার টাকার নোট ছিল, একটা সোণার ঘড়ী ছিল, একছড়া সোণার হার ছিল আর কতকগুলি দরকারী কাগজপত্র ছিল ; একটি চামড়ার ব্যাগে সেইগুলি রেখে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। ব্যাগটি তিনি বিছানার উপর আপনার মাথার কাছেই রেখেছিলেন, সে ব্যাগ পাওয়া যাচ্ছে না।"

চাকরের মুখের দিকে চেয়ে সকলের সাক্ষাতে দারোগা বোল্লেন, "তবে তো অকু-নির্ণয়ের সুবিধা আছে ; আইনানুসারে আমি এখানকার উপস্থিত লোক-গণের জিনিসপত্র দর্শন কোরবো।"

এই কথা বোলে দারোগা একবার আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কোল্লেন। আমি বুঝলেম, সে দৃষ্টিপাতের কি তাৎপর্য্য। আমি একজন মানী লোক, আমার জিনিসপত্র তল্লাস করা বোধ হয় তিনি কিছু সঙ্কোচের বিষয় বিবেচনা কোচ্ছিলেন, সেই জন্যই অগ্রে ঐ ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত। বুঝলেম, বুঝেই অযাচিত হয়ে অগ্রে তাঁরে আমি বোল্লেম, "অবশ্যই আপনি আইনসিদ্ধ কার্য্য কোত্তে বাধ্য ; আমার সঙ্গের জিনিস পত্র অগ্রে আপনি দর্শন করুন।"

দারোগা বোল্লেন, "আপনি সম্ভ্রান্ত লোক, আপনার জিনিসপত্রে হস্তার্পণ

করা আমি উচিত বিবেচনা করি না কিন্তু আপনি যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত, তখন অপরলোকের আপত্তিভঞ্জনের জন্য আপনার আদেশ-পালনে আমি সম্মত হোলেম।"

দারোগা স্বয়ং কালাচাঁদের হাতের ব্যাগটি তন্ন তন্ন কোরে অন্বেষণ কোল্লেন, মৃত সদাগরের ভৃত্যের কথিত কোন প্রকার দ্রব্য তন্মধ্যে দেখতে পেলেন না; তাঁর মুখে সন্তোষচিহ্ন প্রকাশ পেলে. তিনি আমারে প্রফুল্লবদনে অভিবাদন কোল্লেন। তার পর অপরাপর লোকের দ্রব্যাদি-দর্শন। কাহারো নিকটে কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না, কেবল একজনের পেটিকামধ্যে পূর্ব্বকথিত সমস্ত জিনিস প্রাপ্ত হওয়া গেল। অন্বেষণ কোত্তে কোত্তে সরাইখানার রন্ধনগৃহের এককোণে সেই চামড়ার ব্যাগটিও পাওয়া গেল। ব্যাগটির চাবী ভাঙা।

ব্যাগ শূন্যগর্ভ, চাবী ভাঙ্গা। দারোগার সমভিব্যাহারী প্রহরিগণের নিকটে হাতকড়ী ছিল, যে লোকের পেটিকায় অপহৃত দ্রব্য. তৎক্ষণাৎ সেই লোকের হাতে হাতকড়ী বাঁধা হলো। সেই লোকের জবাবে প্রকাশ, তার সঙ্গী অপর তিনজন সেই অপরাধে যোগের আসামী। তারাও দস্তুরমত লৌহভূষণ পরিধান কোল্লে। প্রকাশ হলো, পেটিকাওয়ালা ঐ তিনজনের যোগে সরাইখানার একখানা কাতান দিয়ে সেই নিদ্রিত লোকটির গলা কেটেছে।

আসামী চারিজন। অঙ্গাবরণবস্ত্র উন্মোচিত হবার পর, অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তি দেখে সেই চারিজনকেই আমি চিনলেম। একজন কাশীধামের রমণবাবুর মধ্যম-ভ্রাতা রামশঙ্কর মিত্র, দ্বিতীয় জন সেই বীরভূমের কানাইবাবু,—ত্রিপুরায় প্রকাশিত কাণকাটা কানাই. তৃতীয় ব্যক্তি বারাণসীর জুয়ারী মহাজন লালা বুলকচাঁদ, চতুর্থ ব্যক্তি ঐ লালা বুলকচাঁদের জুয়াচোর দালাল সিদ্ধেশ্বরবাবু বা ঐ চারিজনই একযোগ। ঐ চারিজনই হিন্দুস্থানী সদাগরের বেশ পরিধান কোরে এসেছিল, ঐ চারিজনই ভোরে ভোরে সরাইখানা থেকে পলায়ন করবার জন্য উদযোগ কোরেছিল।

তখন আমার ঠিক মনে হলো, কানাই ছাড়া বাকী তিনজন গত রাত্রে অনেক-ক্ষণ অনিমেষে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। মনে হবামাত্র দারোগা মহাশয়কে আমি বোল্লেম. "আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে. তা হোলে আপনার এই আসামী চারিটিকে আমি গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করি।" দারোগা বোল্লেন, "স্বচ্ছন্দে।"

প্রথমেই রামশঙ্কর। রামশঙ্করকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তুমি মহাজন সেজেছ কত দিন? আশুতোষ তুল্য অগ্রজ সহোদর রমেন্দ্রবাবুর সংসার পরি-ত্যাগ কোরে, সংসারের একধারে আগুন জেলে, কাশী ছেড়ে তুমি পালিয়ে-ছিলে; একা পালাও নাই একটি কুলকন্যাকে সহচারিণী কোরেছিলে। বোল্লেম আমি সহচারিণী, বস্তুতঃ সেই কুল-কামিনীকে তুমি ব্যভিচারিণী কোরেছিলে। এখন তুমি মহাজন! পোষাকে তুমি মহাজন, কিন্তু কাজে এখন খুনী মোক-দ্দমার আসামী। অকারণে তুমি আমার শত্রু হয়েছিলে, আমি কিছু বলি নাই,

বিচারপতি ধর্ম্ম,—ধর্ম্মের চক্ষে কেহই এড়ায় না, ধর্ম্মবিচারে তুমি এখন লৌহ-শৃঙ্গলে বন্দী।"

রামশঙ্কর মাথা হেঁট কোরে থাকলো, আমার কথার একটিও উত্তর দিতে পাল্লে না। অনন্তর বুলকচাঁদ আর সিদ্ধেশ্বর। তাদের উভয়ের দিকে চেয়ে আমি বোল্লেম, "কাশীতে তোমরা আমার দেড়হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিলে, ধরা পোড়লে হয় তো কিছুদিন ইংরেজের কারাগারে বাস কোত্তে হতো, তার চেয়ে এটা ভাল প্রতিফল! হয় তো জন্মশোধ তোমাদের জুয়াচুরীলীলা এইবার সাঙ্গ হয়ে যাবে।" অতঃপর কানাইলাল। সেই কাণকাটা-কানাইকে নূতন সম্বোধনে সম্বোধন কোরে কিঞ্চিৎ শ্লেষোক্তিতে আমি বোল্লেম, "কি গো পায়রাবাবু! এই কি তোমার শেষলীলা? তুমি আমারে চিনবে না, আমি তোমারে চিনি; কলিকাতায় একবার মাত্র তোমাকে আমি দেখেছিলেম; কাশীতে রসিক পিতুড়ীর বাড়ীতে তুমি যখন বীরভূমের জমীদার সেজে কুমারীভোজনে মুক্তহস্ত হয়েছিলে, পাঁচ মিনিটের জন্য সেই সময়েও তোমাকে আমি দেখেছিলেম; ত্রিপুরায় পায়রাবাবু হয়ে যখন তুমি কুকুর ভূতের রাজা হয়েছিলে, তখনো তোমারে একবার আমি দেখেছিলেম। সন্ন্যাসীর কথা মনে হয়? শিবের মন্দিরে যে সন্ন্যাসী তোমারে রাধারাণীর মরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবার উপদেশ দিয়েছিল, সেই সন্ন্যাসী আমি। তোমরা চারিজনেই জেনে রাখ, আমি সেই হরিদাস। ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে এখন আমি রাজা, ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে এখন তোমরা গুরুতর ফৌজদারী অপরাধে বন্দী। ধর্ম্মের বিচার এইরূপ!"

কেহই দ্বিরুক্তি কোল্লে না। দারোগার দিকে নেত্রপাত কোরে পুনরায় আমি বোল্লেম, "কেন এরা সেই নিরীহ সদাগরটিকে খুন কোরেছে, অনুমানে সেই উদ্দেশ্যটা আমি যেন কতক কতক বুঝতে পাচ্ছি। রামশঙ্কর, বুলকচাঁদ আর সিদ্ধেশ্বর, এই তিনজন গতরাত্রে আমারে চিনতে পেরেছিল; আমি বেঁচে থাকলে ওদের কোন প্রকার বিপদ ঘোটতে পারে, এইরূপ হয় তো ওরা ভেবেছিল; রাত্রিকালে গোপনে আমারেই খুন করা ওদের হয় তো মত্‌লব ছিল। ভগবান আমারে রক্ষা কোরেছেন। সরাইওয়ালা আমার শয়নের জন্য যে ঘরখানি প্রথমে নির্দ্দিষ্ট কোরে দিয়েছিলেন, কোন কারণে সে ঘরে আমি থাকি নাই; নূতন সদাগর সেই ঘরে শয়ন কোরেছিলেন। আপনার এই আসামীরা সে খবর রাখে নাই; এরা ভেবেছিল, আমি সেই ঘরে আছি; তাই ভেবেই আমারে খুন কোত্তে গিয়ে ভুলে সেই নূতন সদাগরটিকেই কেটে ফেলেছে, এইরূপ আমার বিশ্বাস।"

দারোগার পুনঃ পুনঃ সওয়ালে আসামীরাও সেই কথা স্বীকার কোল্লে। আর কোন প্রমাণ-প্রয়োগ আবশ্যক হলো না, পরিষ্কার একবার। তদারক সমাপ্ত। আসামীদের সঙ্গের জিনিসপত্র পুলিসের বাজেয়াপ্ত হলো, চোরা জিনিসগুলি পুলিসের জিম্মায় থাকলো। উপস্থিত সমস্ত লোকের দুর্ভাবনা দূরে গেল।

নিহত সদাগরের ভৃত্যের নাম ভুক্ষণ কাহার, সদাগরের নাম গজপৎ দাস।

ভুক্ষণের এজাহারে গজপতের পরিবারবর্গের ঠিকানা অবগত হয়ে দারোগা আপনার তদারকী রিপোর্টে সে নামগুলি লিখে নিলেন ; তার পর প্রহরী মোতায়েনে বন্দীগণকে সঙ্গে নিয়ে থানায় চোলে গেলেন। সরাইখানায় আমি আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা কোল্লেম না, পাপী লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় কি রকমে হয়, সেই বিষয় মনে মনে আলোচনা কোত্তে কোত্তে বেলা একপ্রহরের পর সরাই থেকে আমি বেরুলেম। কাঁলাচাঁদ একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী ডেকে আনলে ; সেই গাড়ীতে আমি আরোহণ কোল্লেম, কোচমানের পার্শ্বে কালাচাঁদ কোচবাক্সে বোসলো, গাড়ীর ছাদের উপর রঘুজী।

পথের যেখানে যেখানে যে প্রকার যান-বাহনের সুবিধা, সেই সেই স্থলে সেই প্রকার ব্যবস্থায় উপযুক্ত সময়ে আমরা বর্দ্ধমানে পৌঁছিলেম। ১২৬৫ সালের গ্রীষ্ম, বর্ষা বিগত ; শরৎকাল আগত। যে আনন্দ আমার মনে ছিল না, ভাগ্যে ছিল, সেই আনন্দ ; সুসময় আশ্বিন মাসে, সুসময় শরৎঋতুতে আমার নিজ-বাটিতে আমি শারদীয়া মহামায়ার অর্চ্চনা কোল্লেম। ভাদ্রমাসে আমার কাকীমার কালাশৌচ গত হয়ে গিয়েছিল, কাকীমার নামেই দুর্গোৎসবের সঙ্কল্প। কাকীমা আর মাসীমা, একমূর্ত্তিতে উভয়েই আমার তিনি। প্রবোধের নিমিত্ত, শান্তির নিমিত্ত, মানবর্দ্ধনের নিমিত্ত কাকীমাকে আমি মাতৃসম ভক্তি করি ; তিনিও আমারে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। আমাদের উভয়ের স্নেহ-ভক্তি দর্শনে আমার জননী পরম সুখী ; বাড়ীতে আনন্দময়ীর আগমনে ছোট বড় সকলেই পরম সুখী। দুর্গোৎসব-উপলক্ষে আমার মাতামহী-ঠাকুরাণী আর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আশালতাকে নিমন্ত্রণ কোরে বাড়ীতে আমি আনালেম। আমারে দেখে আমার পরিচয় শুনে, আশালতা সবিশেষ আমোদিনী হোলেন। সর্ব্বানন্দবাবু বিদ্যমানে রক্তদন্ত যে দিন আমারে ধোরে নিয়ে যাবার জন্য গণ্ডগোল বাধিয়েছিল, আশালতা সেই দিন স্বভাবসিদ্ধ মধুরতা প্রদর্শন কোরে যেরূপ স্নেহ প্রকাশ কোরেছিলেন, সেই কথা উত্থাপন কোরে তাঁরে আমি বোল্লেম, "মাসীমা ! তুমি আমার মাসীমা, তখন আমি জানতেম না, তুমিও তখন বালিকা ; তথাপি তখনকার সেই স্নেহ মনে কোরে এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি, মা আনন্দময়ী সেই সময় তোমার ক্ষুদ্র-হৃদয়ে আমাদের পরস্পরের এই সেই-সম্বন্ধটা উদিত কোরে দিয়েছিলেন।" আশালতা বোল্লেন, "আমিও যেন তাই ভেবেছিলেম ; এখনো তাই ভেবে মা আনন্দময়ীকে আমি ভক্তিভাবে প্রণাম কোচ্ছি।" আশালতার সঙ্গে আমার আরো অনেক প্রকার কথোপকথন হলো ; প্রত্যেক কথাতেই আমি বুঝলেম, আশালতা বাস্তবিক একটি স্নেহলতা, আশালতায় সেই বালিকাসুলভ সরলতা তখনো সমভাবে বিকসিত আছে।

কুল-প্রথামত ষষ্ঠীতিথিতে মা দুর্গার বোধন ও অধিবাস। যথাযোগ্য সমারোহে, যথাযোগ্য ভক্তিভাবে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, তিনদিন দিনরাত্রি আমি মা দুর্গার অর্চ্চনা কোল্লেম ; নিমন্ত্রিত লোকেরা সকলেই পরিতোষ প্রাপ্ত হোলেন। দশমীতে নিরঞ্জন। দশমীর রজনীতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেম। "দুর্গা-

নন্দ কখনো আমারে পরিত্যাগ কোরে যাবে না," অষ্টমবর্ষীয়া, রক্তবসনা একটি শশিমুখী গৌরী কন্যা যেন আমার শিয়রে বোসে এই আশীর্ব্বাদ কোরে গেলেন।

আনন্দে আশ্বিনমাস বিগত, কার্ত্তিকমাস আগত। ১২৬৫ সাল। ১৪ই কার্ত্তিক। ইংরেজী ১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বর। সেই দিন ভারতবর্ষের ব্রিটিসাধিকৃত প্রধান প্রধান নগরে মহারাণী ভিকটোরিয়ার ঘোষণাপত্র-পাঠ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিদায়, ভারতরাজ্য মহারাণীর খাস। সিপাহী-বিদ্রোহের শান্তি, বিদ্রোহের এই পরিণাম !! পরিণামের সঙ্গে আর একটি কথা। বিদ্রোহের গুহ্য-কারণ যা কিছু থাকুক, কতকগুলি রাজপুরুষ শেষকালে অবধারণ কোল্লেন, মোগলবংশের শেষবাদশাহ বাহাদুর শাহ ঐ বিদ্রোহের উত্তেজক।" সাহেবেরা যে কথা বলেন, সে কথা খণ্ডন করবার লোক পাওয়া যায় না, সুতরাং বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বন্দী কোরে রেঙ্গুনে চালান করা হয়, সেইখানেই তাঁর শেষজীবনের অবসান। সেই উপলক্ষে তখনকার বঙ্গ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত প্রভাকর পত্রে লিখেছিলেন,—

"মুষিকে প্রহার করে পারীন্দ্রের ঘাড়ে।
দিল্লীশ্বর বিলীশ্বর ম্যাও ম্যাও ছাড়ে ॥"

শান্তিপ্রিয় উদার নীতিজ্ঞ লর্ড ক্যানিং বাহাদুর মহারাণীর খাস আমলে প্রথম রাজ-প্রতিনিধি। অগ্রহায়ণমাসের প্রথম সপ্তাহে আমার বাড়ীতে এক মহোৎসব। বর্দ্ধমান-বিভাগের কমিশনর, বর্দ্ধমানের জজ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং অনেকগুলি সাহেব-বিবি সুসজ্জিত সভামণ্ডপে উপস্থিত হয়ে আমারে দস্তুরমত খেলোয়াত প্রদান কোরে রাজা উপাধি প্রদান কোল্লেন। দেশস্থ মান্যগণ্য অনেক মহোদয় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, যথোচিত শিষ্টাচারে আমি তাদের সকলেরই মর্য্যাদানুরূপ গৌরববর্দ্ধন কোল্লেম। আমার রাজোপাধিতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নিজমুখে আত্মগৌরব প্রকাশে আমি লজ্জিত হই, অতএব সে সভার কার্য্যবিবরণ বর্ণনে আমি বিরত থাকলেম।

এইখানে আর একটি বিশেষ কথার উল্লেখ করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করি। উপকারের স্মৃতি-সংরক্ষণে সম্বংশজাত ইয়োরোপীয়গণের বিলক্ষণ যত্ন দৃষ্ট হয়। কাণপুর থেকে নৌকাযোগে যখন আমরা বৈদ্যনাথতীর্থে যাত্রা করি, সেই সময় বিদ্রোহী সিপাহীলোকের গোলাগুলীবর্ষণে প্রপীড়িত হয়ে যে কয়েকটি সাহেব-বিবি আমাদের নৌকায় এসে আশ্রয় চেয়েছিলেন, বাঙ্গালী সাজে সাজিয়ে যত্নপূর্ব্বক যাঁদের আমরা আশ্রয় দিয়েছিলেম, তাঁদের মধ্যে যে দুটি সাহেব ছিলেন, সে দুটি সাহেবের একজন বঙ্গ সিবিলিয়ান ; তিনিই এখন বর্দ্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট। উৎসব সভায় তিনি আমারে চিনতে পেরেছিলেন, পূর্ব্ব-কথা তাঁর মনে ছিল ; এতদিনের পর আমার নিকট পূর্ব্বোপকারের জন্য কৃত-জ্ঞতাপ্রকাশের অবসর পেয়ে সভাভঙ্গের পর তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁর পত্নীও সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা উভয়েই আমার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ

কোরে বার বার আমারে ধন্যবাদ দিলেন, আমিও তাঁদের সৌজন্যে তুষ্ট হয়ে, উপযুক্ত মানরক্ষা কোরে তাঁদের উভয়কেই আপ্যায়িত কোল্লেম।

অগ্রহায়ণমাস বিদায় হয়ে গেল। একদিন আমি আমার নিজের শকটারোহণে বর্দ্ধমান-সহরের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি, পথিমধ্যে "বাবু একটি পয়সা—বাবা একটি পয়সা, দোহাই রাজাবাবা—কাঙালিনী বাবা!—বড় গরীব বাবা!—তিন দিন পেটে অন্ন নাই,—দয়া কোরে কাঙ্গালিনীকে—একটি পয়সা—দিয়ে যাও বাবা!" বোলতে বোলতে ছিন্নবসনা, রুক্ষকেশা, একটি স্ত্রীলোক আমার ঘোড়ার সম্মুখ দিয়ে গাড়ীর দরজার দিকে ছুটে আসছিল; "ঐ—ও মাগি!—ঐ—ও মাগি!—হট্টো—হট্টো—তফাৎ যাও—, তফাৎ যাও," বোলে গাড়ীর পশ্চাতের চোপদারেরা বার বার চীৎকার কোত্তে লাগলো, কোচম্যান চাবুক নাচিয়ে নাচিয়ে ভয় দেখাতে লাগলো। গাড়ী থামাবার হুকুম দিয়ে, ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে, সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোককে আমি দেখতে লাগলেম।

গাড়ী দাঁড়ালো। পূর্ব্বরূপ আর্ত্তনাদ কোত্তে কোত্তে সেই স্ত্রীলোক এসে আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়ালো। অল্পক্ষণ দেখেই আমি তাকে চিনতে পাল্লেম। আশ্চর্য্য! ভগবানের বিচার চমৎকার! কাঙালিনীকে দেখে অগ্রে আমার একটু দয়ার সঞ্চার হয়েছিল, শেষে সে ভাবটা ফিরে দাঁড়ালো। স্ত্রীলোককে সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, নবীনকালি! এই দশা তোমার? আমারে তুমি চিনতে পাচ্ছো? ঢাকার জঙ্গলে তুমি আমারে মাদকসরবৎ পান কোরিয়ে অজ্ঞান কোরে ফেলেছিলে, ডাকাতের হাতে সোঁপে দিয়েছিলে, অজ্ঞানাবস্থায় ডাকাতেরা আমারে ত্রিপুরাজেলায় নিয়ে ফেলেছিল; আমারে তুমি চিনতে পাচ্ছো?—আমি সেই হরিদাস। অভাগিনী! ভদ্রলোকের কুলে কালি দিয়ে রামশঙ্করের সঙ্গে তুমি কুলের বাহির হয়েছিলে; তোমার সেই রামশঙ্কর এখন এক দূর-দেশে খুনের দায়ে বন্দী! পাপের ফল এই রকমেই ফলে! যাও—যত দিন পৃথিবীতে থাকো এই রকমে পাপের ফলভোগ কর, পৃথিবীতেই পৃথিবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।"

পাঠকমহাশয় বুঝতে পাল্লেন, কাশীর রমেন্দ্রনাথ মিত্রের পিসীমার কনিষ্ঠা কন্যা নবীনকালী, রমেন্দ্রবাবুর মধ্যম ভ্রাতা রামশঙ্কর মিত্রের সঙ্গে রাত্রিকালে পলায়ন কোরেছিল, এই সেই পলাতক নবীনকালী। আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে, পরিতাপিনী পাপিনী নবীনকালী ভেউ ভেউ কোরে কাঁদতে লাগলো। একটি টাকা তার সম্মুখে ফেলে দিয়ে আমি গাড়ী চালাবার হুকুম দিলেম, টাকাটী কুড়িয়ে নিয়ে নবীনকালী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার গাড়ীর দিকে চেয়ে থাকলো।

আমি আর সে দিকে চাইলেম না; মনে কোল্লেম, প্রতিফল ঠিক হয়েছে; মনে কোল্লেম বটে, কিন্তু কিছু সন্দেহ থাকলো। নবীনকালী যুবতী, যৌবনে কুলত্যাগিনী। নিজের দোষেই হোক কিম্বা রামশঙ্করের দোষেই হোক, যৌবনে নবীনকালী কুলত্যাগিনী। বেশীদিনের কথাও নয়, বয়স এখনো অল্প; এ বয়সে বেশ্যাবৃত্তি না কোরে দুশ্চারিণী এখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কোরেছে,

ভাব কি? রূপ ছিল, রূপ নাই; অবয়ব জীর্ণ-শীর্ণ; ডাকাতেরা যখন ধোরে রেখেছিল, তখন দেখেছিলেম হৃষ্টপুষ্ট, এখন সে ভাবের তিরোভাব! রামশঙ্কর তারে পরিত্যাগ কোরে গিয়েছিল কিম্বা হয় তো পরিত্যাগ কোত্তে বাধ্য হয়েছিল, ডাকাতের ঘরণী হয়ে ঐ নবীনকালী দিনকতক বনবাসিনী হয়েছিল; ডাকাতেরা হয় তো তাড়িয়ে দিয়েছে কিম্বা পাপিনী হয় তো নিজেই পালিয়ে এসেছে; শরীরে কোন প্রকার উৎকট রোগ জন্মেছিল, সেই রোগেই বিশ্রী হয়ে গিয়েছে। বেশ্যাবৃত্তিতে সুবিধা ছিল না, চেহারা দেখে লম্পট লোকের অরুচি জন্মে, সে কাজে আর সুবিধা হয় না, সেই জন্যই পাপীয়সী এখন ভিখারিণী। পাপের উপযুক্ত দণ্ডই এই! ইহকালে ইহলোকের পাপের উপযুক্ত দণ্ড হওয়াই বিধাতার সুবিচার। সকলের হয় না, সে দৃষ্টান্তটা বড় মন্দ। ইহলোকের ফল ইহলোকে ভোগ হোলেই লোকশিক্ষার একটা উপায় হয়।

যে পথে আমি যাচ্ছিলেম, সে পথে আর অধিক দূর গেলেম না; পাপ পুণ্যের ফলাফল ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যাকালে আমি বাড়ী ফিরে এলেম।

পৌষমাস। পাঠকমহাশয়কে আর কোন নূতন কথা শুনাই, পৌষমাসের মধ্যে তেমন ঘটনা কিছুই হলো না। মাঘমাস আগত। মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন উপযুক্ত সমারোহে নিজ বাড়ীতে আমি সরস্বতীপূজা কোল্লেম। শৈশবাবধি সকল অবস্থাতেই আমি সরস্বতীদেবীর সেবা কোরেছি, অবস্থা-বৈগুণ্যে পূজা করাটি আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, মনে মনে বাসনা ছিল; সৌভাগ্যোদয়ে এই বৎসর সেই বাসনা পূর্ণ হলো।

আমার সরস্বতীপূজায় গ্রামস্থ সমস্ত লোকের আনন্দ। দেওয়ানজী ত্রিলোচনবাবু আমারে একখানি সামাজিক নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ দিলেন, সেই ফর্দ্দ দৃষ্টে অন্যন অর্দ্ধসহস্র নিমন্ত্রণপত্র বিলি করা হলো। অর্দ্ধসহস্রাধিক লোকের সমাগম; আহূত, অনাহূত, রবাহূত, এই তিন প্রকারে প্রায় সহস্র লোক সমুপস্থিত। সভাস্থলে পরিক্রমণ কোত্তে কোত্তে সমস্ত লোকগুলির হর্ষপূর্ণ মুখগুলি আমি দর্শন কোল্লেম; কতকগুলি মুখ আমি চিনলেম, অনেকগুলি চিনলেম না। মুখগুলির মধ্যে একখানি মুখ দেখে আমার মনে হঠাৎ এক স্মৃতি জাগরিত হলো, লোকটির নিকটে আমি দাঁড়ালেম; স্থিরনেত্রে অল্পক্ষণ ভাল কোরে নিরীক্ষণ কোল্লেম;—ঠিক সেই। নয়নসঙ্কেতে, হস্তসঙ্কেতে সেই লোকটিকে আমি আমার সঙ্গে আসতে ইঙ্গিত কোল্লেম। লোকটি ব্রাহ্মণ। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তিনি দাঁড়ালেন; তাঁরে সঙ্গে কোরে আমি আমার বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেম, যত্ন কোরে বসালেম; তিনি আমারে চিনতে পারেন কি না, একদৃষ্টে তাঁর মুখপানে চেয়ে সেই কথা তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। যেন কিছু বিস্ময় প্রকাশ কোরে অনেকক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন; ভাবে বুঝলেম, চিনতে পাল্লেন না।

চিনতে পাল্লেন না, চিনতে পারবেন, তাঁর মুখ দেখে তেমন কোন লক্ষণও বুঝা গেল না। তখন আমি তাঁরে পরিচিতের ন্যায় মিষ্টসম্ভাষণে বোল্লেম,

"মিশ্রমহাশয়! আপনি কি আমারে ভুলে গিয়েছেন? আমি আপনাকে চিনেছি। স্মরণ করুন, আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলেম, সেই সময় একটা কারখানা-বাড়িতে আপনাকে আমি দেখি; ঘনশ্যাম বিশ্বাস নামে এক জুয়াচোর আপনাকে সেই কারখানার মালিক বোলে পরিচয় দিতো, স্মরণ করুন। সেই লোকের হাতে আমি তখন মহা বিপদাপন্ন, আপনি আমারে অভয় দিয়েছিলেন, মনে হয় কি সে কথা? স্মরণ করুন, আমি সেই হরিদাস। যখন আপনি আমারে দেখে-ছিলেন, তখন আমার কোন পরিচয় ছিল না, ভগবানের কৃপায় এখন আমার নূতন অবস্থা। এই বাড়ীখানি আমার নিজের পৈতৃক ভদ্রাসন; আমি এখন এই বাড়ীতে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, আমার প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার দাস ঘোষ। এই বাড়ীর অধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র আমি।"

পাঠকমহাশয় মনে করুন, সেই কারখানাবাড়ীতে এই ব্রাহ্মণটি তখন ঘনশ্যাম বিশ্বাসের সরকার ছিলেন, নাম গয়ারাম মিশ্র। আমার পরিচয় পেয়ে গয়ারাম মিশ্রের যেমন বিস্ময়, তেমনি আনন্দ। বিস্ময়ের চিহ্ন আর আনন্দের চিহ্ন কেবল তাঁর মুখেই ব্যক্ত, মুখের বচনে তিনি তখন কিছুই প্রকাশ কোত্তে পাল্লেন না। না পারুন, আত্মীয়তা জানিয়ে তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি এখন কোথায় থাকেন? কিসে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়?"

একটি নিশ্বাস ফেলে ব্রাহ্মণ উত্তর কোল্লেন, "থাকবার স্থান ক্ষুদ্র একখানি পর্ণকুটীর; জীবিকা একপ্রকার ভিক্ষা। আমার একটি পুত্র আছে, সেইটিকে নিয়ে সেই কুটিরেই আমি বাস করি, সকল দিন দুই বেলা আহার হয় না। ভগবানের ইচ্ছায় আপনি এখন পদস্থ হয়েছেন, ভগবান করুন, আপনি রাজা হোন। আমার কষ্টের অবধি নাই।"

আমি কাতর হোলেম। আমার অন্তরে সহানুভূতির উদয়; সহানুভূতি জানিয়ে "ভগবান আপনার কষ্ট নিবারণ কোরবেন," এই কথা বোলে আশ্বাস দিয়ে পুনরায় তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনার সেই পুত্রটি কোথায়?"

"পুত্রটি আমার সঙ্গেই আছে। এই বাড়ীতে সরস্বতীপূজার ঘটা, লোক-মুখে সেই বার্ত্তা শ্রবণ কোরে ছেলেটি নিয়ে বিনা নিমন্ত্রণে এখানে আমি উপ-স্থিত হয়েছি। অশ্রুপূর্ণলোচনে গয়ারাম মিশ্রের এই প্রকার উত্তর। আমার মনে তখন আর এক ভাবের উদয়। ভাব ব্যক্ত না কোরেই ব্রাহ্মণকে আমি বোল্লেম, "আপনার পুত্রটিকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসুন, সেটিকে আমি এক-বার দেখতে চাই।"—গয়ারাম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান কোল্লেন, দ্রুতপদে নীচে নেমে গিয়ে, ছেলেটিকে সঙ্গে কোরে, অবিলম্বে ফিরে এলেন।

দিব্য ছেলে! দিব্য সুশ্রী, সুন্দর যুবাপুরুষ। বয়স বোধ হলো, পঞ্চবিং-শতির অধিক নয়; নাম শুনলেম সুধার্ণব। চেহারা সুন্দর, কিন্তু দুঃখের দশায় কিছু কাহিল, শরীর লাবণ্যশূন্য। ইত্যগ্রে যে ভাবটি আমার মনে উদিত হয়েছিল, সে ভাবটি অন্তরে গোপন রেখে, সুধার্ণবের লেখাপড়ার পরিচয় আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। উত্তর পেলেম, গ্রাম্য পাঠশালায় সম্ভবমত বাঙ্গালা শিক্ষা

জমীদারী সেরেস্তায় কিছুদিন কিতাবকর্ত্য কার্য্যে শিক্ষানবিসী কোরেছিল ; সংস্কৃত অথবা ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা ঘটে নাই।" একটু চিন্তা কোরে তৃতীয়-বার আমি মিশ্রঠাকুরের বংশপরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুনলেম, মিশ্র উপাধি কার্য্যগত, বংশগত নয়। বংশপরিচয়ে তাঁরা ভদ্রনারায়ণবংশ সম্ভূত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায় ; কৌলীন্য-মর্য্যাদায় গয়ারাম একজন ভঙ্গ কুলীন। বৃদ্ধ প্রপিতামহে ভঙ্গ, গয়ারাম পঞ্চম পুরুষ, সুধার্ণব ষষ্ঠ।

ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন হলো, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ব্রাহ্মণেরা ভোজনাসনে উপবিষ্ট হোলেন, সপুত্র গয়ারামও ব্রাহ্মণের পংক্তিতে স্থান প্রাপ্ত হোলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অপরাপর জাতির ভোজনের ব্যবস্থা করা হলো। আমি এক একবার সকল শ্রেণীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পরিবেশনের সুবন্দোবস্তের তত্ত্বা-বধান কোল্লেম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভোজের কার্য্য সমাপ্ত হয়ে গেল। গয়ারামকে আমি বিদায় হোতে দিলেম না, সুধার্ণবও পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকলো।

রাত্রিকালে নৃত্যগীতাদির উৎসব। শ্রোতারা সকলেই সমস্ত রজনী জাগরণ কোল্লেন। প্রভাতে স্নানাহারের পর গয়ারামকে নিকটে ডেকে আমি কতকগুলি সাংসারিক তত্ত্ব অবগত হোলেম। তাঁরা পিতা পুত্রে আপাততঃ আমার বাড়ীতেই থাকলেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন আমি সপ্তগ্রামে যাত্রা কোল্লেম। সেই আমার পাঠশালা, সেই আমার গুরুপত্নী, সেই আমার গুরুকন্যা অপরাজিতা। সুধার্ণবের সঙ্গে অপরাজিতার বিবাহ দেওয়াই আমার মনোভাব।

আমার গুরুদেব কুলীন ছিলেন না, তাঁদের ঘরের কন্যাগণকে কুলীন-পাত্রে সম্প্রদান কোত্তে অনেক খরচপত্র আবশ্যক হতো, অল্প খরচে সুধার্ণবকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে, এইটিই আমি স্থির কোল্লেম। গুরুপত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে দুটি পাঁচটি কথার পর আমি অপরাজিতার বিবাহের কথা উত্থাপন কোল্লেম ;— বোল্লেম, "বিনা সন্ধানে একটি সুপাত্র আমি প্রাপ্ত হয়েছি, এই মাসের শেষে কিম্বা ফাল্গুনমাসের প্রথমে সেই পাত্রের সঙ্গে অপরাজিতার বিবাহ দেওয়া আমার ইচ্ছা। আপনি অমত কোরবেন না ; পাত্রটি গরিব, লেখাপড়াও কিছু কম জানে, কিন্তু বংশ ভাল, কুল ভাল, পাত্রটিও বেশ সুন্দর, বয়স অল্প ; যথার্থই সুপাত্র ; সেই পাত্রেই আপনি কন্যা দান করুন। আর দেখুন, বিবাহের পর পাত্রটিকে ঘরজামাই কোরে রাখা যাবে, খরচপত্রের ভার আমার উপর। কেবল একটা কথা এই যে, এ বাড়ীতে বিবাহ দেওয়া হবে না, আমার বাড়ীতেই বিবাহ হবে। আপনাকেও আমি আর এ বাড়ীতে রাখছি না, আমার বাড়ীতেই আপনি চলুন ; অপরাজিতাও আমাদের সঙ্গে আসুন। আমার ভদ্রাসনের সন্নিকটে ছোট একখানি নূতন বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতেই আপনারা থাকবেন, জামাইটিও সেইখানে থাকবে। তার জন্য আমি একটা চাকরি স্থির কোরে দিব ; চাকরীর টাকায় যদি সঙ্কুলান না হয়, আমি নিজেই সমস্ত অকুলান পূরণ করবার ব্যবস্থা কোরবো। আপনারা আমার সঙ্গেই চলুন। আর দেখুন, পুত্রকন্যার বিবাহো-পলক্ষে অনেকে অনেক প্রকার সৎকার্য্য করেন, অপরাজিতার বিবাহোপলক্ষে

আপনিও একটা সৎকার্য্য করুন। এখানে যখন আপনার আর থাকা হোচ্ছে না, তখন এ বাড়ীর মায়া পরিত্যাগ কোরে পল্লীর একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বাড়ীখানি দান করুন ; বাড়ীর সংলগ্ন জমীজমা-বৃক্ষাদিও সেই ব্রাহ্মণের নামে দানপত্র লিখে দিন ; ইহ পর উভয়লোকেই মঙ্গল হবে।”

কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপরাজিতা আমার ঐ সকল কথা শুনছিলেন ; বিবাহের নামে পুত্রকন্যার মনে স্বভাবতঃ একপ্রকার আনন্দ জন্মে, অথচ লোকের কাছে লজ্জা দেখায় : সেই রকমে একটু লজ্জা দেখিয়ে অপরাজিতা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে, অর্দ্ধ অবনতবদনে আমাদের সম্মুখ দিয়ে বাহির-দিকে চোলে গেলেন। খানিকক্ষণ মৌনবতী থেকে গুরুপত্নী ঠাকুরাণী আহ্লাদ পূর্ব্বক আমার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান কোল্লেন। কন্যার বিবাহের পর আর একবার সপ্তগ্রামে এসে কোন ব্রাহ্মণকে ঘরবাড়ী দান করবার ব্যবস্থা করা হবে, এইরূপ পরামর্শ দিয়ে, সেই দিনেই আমি তাঁদের উভয়কে সপ্তগ্রাম ত্যাগ করালেম। বকুলতলায় আমার গাড়ী ছিল, ভাড়াটিয়া গাড়ী ; গুরুপত্নীর সঙ্গে একগাড়ীতে আরোহণ করা ভাল দেখায় না, সঙ্গে আমার দুজন চাকর ছিল, তাদের একজনকে দিয়ে আর একখানা গাড়ী আনালেম। আমার গাড়ীতে আমি, দ্বিতীয় গাড়ীতে দুটি মাতাপুত্রী ; আমার কোচবাকসে একজন চাকর, দ্বিতীয় গাড়ীর কোচবাকসেও একজন চাকর। গাড়ী দুখানি সন্ধ্যার পূর্ব্বে দ্রুতগতিতে গন্তব্যপথে প্রধাবিত।

পথে ঠাঁই ঠাঁই গাড়ী বদল, একটু একটু বিশ্রাম, পরদিন বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে আমরা মনোহরপুরে উপস্থিত। মাতাপুত্রী আমার অন্দরমহলে প্রবেশ কোল্লেন, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জননীর নিকটে—কাকীমার নিকটে, আমি তাঁদের পরিচয় দিয়ে দিলেম ; যত্ন কোরে রাখতে বোলে আমি সদরবাড়ীতে চোলে এলেম। সে দিন আর গয়ারামকে কোন কথা বোল্লেম না। রাত্রিকালে আমি একাকী পঞ্জিকার সঙ্গে পরামর্শ কোরে স্থির কোল্লেম, ২৭এ মাঘ শুভদিন ; সেই দিনেই বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। পরদিন প্রাতঃকালে গয়ারাম মিশ্রকে আমি সেই শুভসংবাদ বিজ্ঞাপন করি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোল্লে তিনি আনন্দিত হন। সেই দিন অবধি বিবাহের আয়োজন হয়। ২৫-এ মাঘ গাত্রহরিদ্রা, ২৭-এ মাঘ শুভবিবাহ। আমার বাড়ীতেই বিবাহ : আমার সম্ভ্রমানুরূপ সমারোহ, সুধার্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার গুরুকন্যার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। পূর্ব্বে আমি যে বাড়ীখানির কথা বোলেছিলেম, আবশ্যকমত জিনিসপত্রে সেই বাড়ীখানি সাজিয়ে দেওয়া হলো ; কন্যা-জামাতার সহিত আমার গুরুঠাকুরাণী সেই বাড়ীতেই বাস কোত্তে লাগলেন ; আপাততঃ মিশ্র-মহাশয়ও সেই বাড়ীতে থাকলেন।

ফাল্গুনমাসে আমি কলিকাতায় এলেম। নরহরিবাবু যে বাড়ীতে আমার চাকরী কোরে দিয়েছিলেন, সেই বাড়ীতেই অগ্রে আমি উপস্থিত। আমার সঙ্গে তখন সেই কালাচাঁদ আর কেহই নয়। বাবু প্রতাপচাঁদ মৈত্র আমারে দর্শন কোরে

সন্তুষ্ট হোলেন, পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে আরো অধিক সন্তোষ প্রকাশ কোল্লেন। হরিদয়ালবাবু, শ্যামধনবাবু উভয়েই আমারে আলিঙ্গন কোরে মিত্রভাবে অভিনন্দন কোল্লেন।

অগ্রে মুর্শিদাবাদে যাবার জন্য আমি সংকল্প কোরেছিলেম, সে সংকল্প সিদ্ধ না কোরে হঠাৎ কলিকাতায় এলেম কেন, সেই কথাটি এইখানে বলা আবশ্যক। কাশীতে শুনে এসেছিলেম, সৌদামিনী, জয়হরি, কামিনীর মা, তিনজনেই কলিকাতায় চালান হয়েছে ; চালান হবার পর কলিকাতায় সেই খুনের বিচারফল কি রকম দাঁড়িয়েছে, সেইটি জানবার জন্যই আমার আকিঞ্চন। হরিদয়ালবাবুকে সেই কথা আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম। তিনি বোল্লেন, কেবল সেই তিনজন নয়, কাশীর একজন বাইজীও সেই সঙ্গে এসেছিল ; বাইজীর নাম চন্দ্রকলা। সেই চন্দ্রকলাও সৌদামিনীর মুখে রমাই সন্ন্যাসীর খুনের গল্প শুনেছিল ; কাশীর পুলিস সেখানে চন্দ্রকলার জবানবন্দী নিয়ে তাকেও একসঙ্গে এখানে পাঠিয়েছিলেন। যখন তারা আসে, তার একমাস পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়েছিল, বৃদ্ধকে তাঁর কন্যার চরিত্রের কথা শুনে অধিক কষ্ট পেতে হয় নাই। বিচারে জয়হরি বড়ালের আইনের উচ্চদণ্ডবিধান হয়ে গিয়েছে, সৌদামিনী বাড়ীতেই আছে, কামিনীর মাও পূর্ব্ববৎ সেই বাড়ীতে জায়গা পেয়েছে। হরিবিলাসবাবু আসল ঘটনা কিছুই জানতেন না, সৌদামিনীকে বাড়ীতে স্থান দিতে তিনি কোন প্রকার দ্বিধা রাখেন নাই। কাশীর বাইজী কাশীতে ফিরে গিয়েছে।

রমাই সন্ন্যাসীর প্রাণ গেল, প্রাণহন্তা জয়হরি বড়ালেরও প্রাণ গেল, উভয়েরই প্রায়শ্চিত্ত ঠিক। ধর্ম্মের কল বাতাসে চলে, এ কথা সার্থক। কাশীধাম পরিত্যাগ করবার সময় আমি যখন ডাকবাক্সে পুলিসের নামে বেনামী চিঠি প্রদান করি, তখন ভেবেছিলেম, আমারো হয় ত সন্ধান হবে ; সে রকম কিছুই হয় নাই। বেনামী চিঠি কে দেয়, কোথা থেকে দেয়, সর্ব্বদা সে বিষয়ে অনুসন্ধান হোতেই পারে না। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ; যোদ্ধাকে দেখা যায় না, বাণবর্ষণ অব্যর্থ হয় ; সেই রকমে আমার চিঠির অব্যর্থ সন্ধান।

আট দিন আমি কলিকাতায় থাকলেম। সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা পেলেম না. কামিনীর মার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু হলো না, কামিনীর মা বাড়ীতে ছিল না ; উদরীরোগ জন্মেছে, চিকিৎসার জন্য সৌদামিনী তারে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে, পটলডাঙ্গার হাসপাতালে। যোড়াসাঁকোর রোগী পটলডাঙ্গায় কেন ? তৎকালে পাথরেঘাটার গঙ্গাতীরে মেয়ো-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই জন্যই পটলডাঙ্গায়।

কামিনীর মা আমার অনেক উপকার কোরেছিল ; আমার উপকার না হোক, আমার সাক্ষাতে ধর্ম্মকথা বোলেছিল, হাসপাতালে গিয়ে একবার দেখে আসি, এইরূপ ইচ্ছা হলো ; ইচ্ছার কথাটা বড়বাবুকে বোল্লেম। তিনি বোল্লেন, হানি কি ?

আমিও ভাবলেম, হানি কি ? হাসপাতালের নিয়ম বেলা চতুর্থ ঘটিকার মধ্যে রোগীর আত্মীয়-লোকেরা দেখা কোত্তে যেতে পারেন। একদিন বেলা চতুর্থ ঘটিকার পূর্ব্বে আমি কামিনীর মাকে দেখতে চোল্লেম। ফটকের ভিতর প্রবেশ কোরে সম্মুখ প্রাঙ্গণে গাড়ী থেকে আমি নামছি, দেখি একখানা ডুলী আসছে। কি আছে সে ডুলীতে, দর্শনের কৌতূহলে সেইখানে আমি দাঁড়ালেম। বেহারারা সেই ডুলীখানা সেইখানে নামালো। কাপড় ঢাকা দিল, ঢাকাটা খুলে ফেলবামাত্র আমি দেখলেম, একটা রোগী। দেখেই আমি চোমকে উঠলেম। ডুলীতে রোগীটা শুয়ে আছে, তার সর্ব্বাঙ্গে আমলকী ফলের মত গোল গোল চাকাচাকা ডুমোডুমো :— আমবাত নয়, নারাঙ্গা নয়, বসন্ত না বিষফোড়া নয়, নূতন রকম ব্যাধি। সমস্ত শরীরটা বেজায় ফুলে উঠেছে। চেনা যায় না ; পৃষ্ঠে কুঁজ আর মুখের বিকৃতি না থাকলে আমিও চিনতে পাত্তেম না ; মুখ দেখে আর কুঁজ দেখে আমি ঠিক চিনলেম। কে ?—আমার সমস্ত কষ্টের মূল—দুরাচার দস্যু নরহন্তা সেই জটাধর তরফদার, ওরফে রক্তদন্ত, ওরফে চণ্ডেশ্বর।

ধন্য পরমেশ্বর ! এই লোকের অন্বেষণে ভারতবর্ষের সমস্ত পুলিস হায়রাণ ! পটলডাঙ্গার হাসপাতালে সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস আজ আমার চক্ষের উপর ! পাপের ফল কত রকম হয়, কে বোলতে পারে ? এই মহাপাপীর অঙ্গে এই রকম পাপের ফল ফলেছে ! এটা কি রকম রোগ ? বোধ হয় মহাব্যাধি !—মহাব্যাধিতে মানুষ শীঘ্র মরে না ; এ রোগে রক্তদন্ত মোরবে না ;—না মোলেই ভাল হয়। এই লোকের সঙ্গে সংসারের অনেক খেলার সম্বন্ধ ; এই লোকের মুখে আমার অনেক তত্ত্ব জানবার আছে—আমারো আছে, ধর্ম্মের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যের বিচারাসনে যে সকল মহাপুরুষের অধিষ্ঠান, তাঁদেরও জানবার অনেক আছে। শেষকালে যমরাজের অধিকার।

হাসপাতালের লোকেরা ধরাধরি কোরে লোকটাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ডুলীর সঙ্গে একটা লোক এসেছিল হাসপাতালের নিয়মে রোগীর পরিচয়াদি যে সকল কথা লিখে নিতে হয়, সেই লোকের মুখে শুনে শুনে একটি বাবু সেই সব কথা লিখে নিলেন, ডুলী-বেহারার সঙ্গে সেই লোক বিদায় হয়ে গেল। ঘরটি জেনে রেখে, কামিনীর মা কোন ঘরে আছে, তত্ত্ব জেনে, সেই ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম, কামিনীর মাকে দেখলেম। কামিনীর মা তখন অনেকটা ভাল হয়েছিল। সংক্ষেপে আমি আমার পরিচয় দিয়ে, তারে আমি অনেক প্রকার আশ্বাস দিলেম, তার সেবার জন্য যে দুজন ধাত্রী নিযুক্ত ছিল, গোপনে তাদের হাতে কিছু বকসীস দিয়ে, যত্ন পূর্ব্বক সেবা-শুশ্রূষা করবার উপদেশ দিয়ে এলেম।

যে ঘরে জটাধর, ফিরে আসবার সময় সেই ঘরে আমি প্রবেশ কোল্লেম ;— দেখলেম, একজন সাহেব সেইখানে উপস্থিত থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা বোলে বোলে দিচ্ছেন। নিকটে গিয়ে আমি দাঁড়ালেম। বয়সের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তনে পোষাক-পরিচ্ছদে আমার চেহারার পরিবর্ত্তন, রক্তদন্ত বোধ হয় আমাকে

চিনতে পাল্লে না। ব্যবস্থা কোরে দিয়ে সাহেবটি যখন বেরিয়ে আসেন, সঙ্গে সঙ্গে এসে তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ রোগ কি আরাম হবে?"—আমার পরিচয় পেয়ে সেলাম দিয়ে সাহেব উত্তর কোল্লেম, আরাম হোতে পারে, কিন্তু কিছু বিলম্বে।"—আমি বোল্লেম, "যখন আরাম হবে, তখন যেন পুলিসে সংবাদ না দিয়ে ঐ লোককে ছাড়া না হয়; ঐ লোক অনেক প্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধী, নরহত্যা পর্য্যন্ত অপরাধ, অনেক ওয়ারীণ আছে, অনেক দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আরাম হবার পর পুলিসের হস্তে উহাকে সমর্পণ করা আবশ্যক। এই কথাগুলি যেন আপনার স্মরণ থাকে।"

সাহেব সম্মত হোলেন। আমি চোলে এলেম; প্রতাপবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দুই জায়গায় দুইখানা চিঠি লিখলেম;—কলিকাতার পুলিস-আফিসে কমিশনার সাহেবের নামে একখানি, আর বর্দ্ধমান-পুলিসে একখানি। দুখানা চিঠিতেই রক্তদন্তের সন্ধানের কথা। বর্দ্ধমানে চিঠি লিখবার কারণ এই যে, সে যাত্রায় বর্দ্ধমানে আমি গেলেম না, অন্যস্থানে যেতে হলো। কোথায়?

মন ধায়। যেখানে মন ধায়, সেইখানেই যেতে হয়। সর্ব্বদা মন যেখানে পোড়ে থাকে, সেখানে আবার মন ধায়, এটা কি প্রকার কথা?

কি প্রকার কথা, তার উত্তর আমি দিতে পারি না। মুর্শিদাবাদের দিকে আমার মন ধাবিত হলো, আমি মুর্শিদাবাদে চোল্লেম। হাসপাতালে রক্তদন্তকে আমি দেখেছি, প্রতাপবাবুকে সে কথা বোল্লেম না, তাঁর পুত্রেরাও আমার মুখে সে কথা কিছু শুনলেন না। রক্তদন্তকে তাঁরা জানেন না; কোন বৃহৎ অবতরণিকার ন্যায় রক্তদন্তের আমূল বৃত্তান্ত তাঁদের কাছে প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন; অতএব সে পরিচয় সেখানে অপ্রকাশ রেখে আমি মুর্শিদাবাদে চোল্লেম।

বহরমপুর। রজনীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ কোরে তাঁরে আমি জানালেম, রক্তদন্তের সন্ধান হয়েছে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে সে এখন আছে, পীড়া শক্ত; সাংঘাতিক নয়, শুনলেম আরাম হবে। আরাম হবার পর তাঁরে একবার বহরমপুরে উপস্থিত করা যাবে। যোগের আসামীরা মেয়েচুরী মোকদ্দমায় এখানে সাজা পেতে পারে, কিন্তু রক্তদন্তের বিচার এখানে হবে না, বর্দ্ধমানে হবে। কেন না, বর্দ্ধমানের এলাকায় বৃহৎ একটা খুনী মোকদ্দমায় রক্তদন্ত ওরফে জটাধর তরফদার প্রধান আসামী। আর সেই সন্ন্যাসিবেশধারী ঘনশ্যাম বিশ্বাস, যে লোকটা সম্প্রতি এক গণিকাগৃহে গ্রেপ্তার হয়ে এসেছে, সে লোকটারও বিচার বর্দ্ধমানে হবে। সে লোকটাও সেই খুনী মোকদ্দমার দ্বিতীয় আসামী। বিশেষ বিবরণ—বিচারের ফলাফল শেষে আপনি জানতে পারবেন।"

যদুপুর। রজনীবাবুর নিকট বিদায় লয়ে সেই দিনেই আমি যদুপুরে উপস্থিত হোলেম। যত দিনের সংবাদ দীনবন্ধুবাবু প্রাপ্ত হন নাই, ততদিনের জ্ঞাতব্য সমস্ত কথা সংক্ষেপে সংক্ষেপে তাঁরে আমি জানালেম; পশুপতিবাবুও সে সব কথা শুনলেন। সেই দিন মনে আমার কেমন একপ্রকার খেয়াল উপ-

স্থিত হলো, আমাদের মিশ্রিত কৌতুকের খেয়াল.—যে মুখখানি দর্শনের নিমিত্ত চিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল, সে দিন সে মুখখানি দর্শন কোল্লেম না, ইচ্ছা কোরেই সে দিন সে রাত্রি সদরবাড়ীতেই আমি অবস্থান কোল্লেম। পরদিন প্রত্যুষে বরাকুলী গ্রামে যাত্রা।

বাবু শান্তিরাম দত্ত আমারে দেখে হর্ষ প্রকাশ কোরে বোল্লেন, "এসেছো বাবা! আমি বড় উতলা হয়েছিলাম ; চিঠি লিখবো লিখবো মনে কোরেছিলেম। এসেছো ভালই হয়েছে! থাকো, স্নান আহার কর ; তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে ; বিশেষ পরামর্শ।"

এই সব কথা তিনি যখন বলেন, মণিভূষণ তখন ঘরের দরজার কাছে ভিতরদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন. সেই দিকে আমার নয়ন নিপতিত হবামাত্র মণিভূষণ একপ্রকার নেত্রসঙ্কেত কোল্লেন। সে সঙ্কেতের ভাব আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পাল্লেম ; অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধের নিকট থেকে উঠে গিয়ে মণিভূষণের সহিত মিলিত হোলেম। যে ঘরে আমি পূর্ব্বে এক নিশাকালে অমরকুমারীর সজীব মূর্ত্তিকে প্রেতমূর্ত্তি মনে কোরে ভয় পেয়েছিলেম, সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে মণিভূষণ আমারে বসালেন। কালাচাঁদ আমার সঙ্গে যদুপুরে এসেছিল, বরাকুলীতে আসে নাই ; আমি বরাকুলীতে এসেছি কালাচাঁদ জানে না। প্রভাতে বরাকুলীতে আমি আসবো. কেবল ছোটবাবু সেই কথাটি জানতেন, আর কেহই না। সে বাড়ীর পরিবারেরা আমার অদর্শনে উদ্বিগ্ন হবেন না ছোটবাবুই তাঁদের উদ্বেগ দূর কোরবেন. তাই ভেবেই আমি নিশ্চিন্ত থাকলেম। মণিভূষণ আমারে অনেক রকমে অনেক কথা বোল্লেন ; আমার সঙ্গে তাঁর পিতার যুক্তি-পরামর্শ কি. তার কিঞ্চিৎ আভাষও তিনি দিলেন। সেই আভাষে সহসা আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হলো। বৃদ্ধের অনুরোধে সেইখানেই আমি স্নান আহার কোল্লেম। অপরাহ্নে শান্তিরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অপরাহ্নেই আমার সঙ্গে শান্তিরামের বিশেষ পরামর্শ।

অল্প আড়ম্বরের পর শান্তিরাম আমারে বোল্লেন, "দেখ বাবা! অমরকুমারীর পরিচয় আমি জানতেম না. কিন্তু অমরকুমারীকে আমি ঠিক যেন কন্যার তুল্য ভালবেসেছিলেম। আসল পরিচয়টি তুমিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছ। আমার কন্যা নয়, আমার অদৃষ্টপূর্ব্বা সহোদরা ভগিনীর কন্যা। অমরকুমারীর বয়স হয়েছে, বিবাহকাল উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে উপায় ছিল না বোলেই এত বিলম্ব ; এখন আর অমরকুমারীকে পাত্রস্থা না কোরে কিছুতেই তো রাখা যায় না। ভগবানের কৃপায় তুমি এখন মান্যপদস্থ, সমাজের দশজনের সঙ্গে তোমার আলাপপরিচয় হয়েছে, শীঘ্র যাতে অমরকুমারীর বিবাহ হয়, সযত্ন হয়ে তুমিই তার একটি সদুপায়বিধান কর ; এই আমার অনুরোধ। পদে পদে তুমি অমরকুমারীকে রক্ষা কোরেছ, চোরের হাত থেকে তুমি অমরকুমারীকে উদ্ধার কোরেছ, অমরকুমারীকে বিবাহের জন্য তোমাকে আমার অনুরোধ করা বাহুল্য, তবুও আমার এই অনুরোধ।"

মণিভূষণের মুখে আভাষ মাত্র শ্রবণ কোরে আমার শরীরে রোমাঞ্চ হয়েছিল,

শান্তিরামের এই সকল কথায় এই সময় পুনরায় রোমাঞ্চ ; তিনি আমারে অনুরোধ কোল্লেন, তদুত্তরে আমিও তাঁরে অনুরোধ কোল্লেম, "সদুপায় আপনারই হস্তে ; আপনি একটি সুপাত্র অন্বেষণ কোরে মনোনীত করুন, ব্যয়ভার বহন কোত্তে আমি প্রস্তুত আছি।"

শান্তিরামের শান্তবদনে একটু যেন চিন্তারেখা সমঙ্কিত হলো। চিন্তার সময় সচরাচর মানুষের মুখ কিছু বিষণ্ণ দেখায়, কিন্তু সে চিন্তায় শান্তিরামের মুখ দিব্য প্রফুল্ল। প্রফুল্লবদনে তিনি বোল্লেন, "সুপাত্র আমি অন্বেষণ কোরেছি, তুমি সেই নির্ব্বাচনে অনুমোদন কোল্লেই আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়।"

ফুল্লনয়নে বৃদ্ধের বদন নিরীক্ষণ কোরে আমি বোল্লেম, "মনোনীত কোরেছেন ? কে মহাশয় ?—কোথায় মহাশয় ?—কাহাকে আপনি নির্ব্বাচন কোরেছেন ?"

শান্তিরাম উত্তর কোল্লেন, "এইখানেই ; বিনা অন্বেষণে এইখানেই আমি —এই ঘরে বোসেই আমি সেই সুপাত্র প্রাপ্ত হয়েছি। সুপাত্র, সৎপাত্র, যোগ্যপাত্র, একাধারে এই তিনের সম্মিলন।"

বৃদ্ধের কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম কোত্তে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না, তথাপি কিছুই যেন বুঝলেম না, সেইরূপ ভাব জানিয়ে সকৌতুকে আমি পুনঃ প্রশ্ন কোল্লেম, "ঘরে বোসে সৎপাত্র নির্ব্বাচন, সেটি কি প্রকার মহাশয় ? অমরকুমারীর পাণিগ্রহণে অধিকারী, এমন ভাগ্যবান সৎপাত্র কে ?"

হর্ষবিকসিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ উত্তর কোল্লেন, "তুমি।"

সলজ্জ বিনম্রবদনে আমি নিরুত্তর। কেন আমি নিরুত্তর, কেন আমার লজ্জা, তা তখন আমি অনুভব কোত্তে পাল্লেম না। আমার মনের কথা বৃদ্ধের মুখে ব্যক্ত হলো, অথচ আমার লজ্জা ;—লজ্জায় আমি সঙ্কুচিত। আমারে নিরুত্তর দেখে বৃদ্ধ পুনরায় বোল্লেন, "হাঁ, সৎকুলসম্ভূতা পিতৃমাতৃহীনা অমরকুমারীর উপযুক্ত পাত্র সৎকুলসম্ভূত পবিত্রস্বভাব এই হরিদাস—রাজসম্মানপ্রাপ্ত শ্রীমান রাজা প্রবোধকুমার ঘোষ বাহাদুর। রূপে, গুণে, কুলে, সম্ভ্রমে, ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বাংশেই তুমি অমরকুমারীর উপযুক্ত পাত্র।"

অমরকুমারীর মাতুলমহাশয়ের মুখে ঐ প্রকার শ্লাঘাপূর্ণ আত্মগৌরব শ্রবণ কোরে আমি আর তখন তাঁর মুখের দিকে চাইতে পাল্লেম না, পশ্চাদ্দিকে একবার মুখ ফিরালেম ; দেখলেম, পার্শ্ব গৃহের দরজার ধারে মণিভূষণ। মণিভূষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন চক্ষের পলক ফেলতে ফেলতে মৃদু মৃদু হাস্য কোচ্ছিলেন। মণিভূষণের পশ্চাতে যেন দুটি স্ত্রীলোক ছিলেন ; আমি সেই দিকে নেত্রপাত করবা মাত্র তাঁরা যেন শশব্যস্তে গাঢাকা হয়ে একটু কোরে দাঁড়ালেন, এইরূপ অনুমান কোল্লেম।

বেলা শেষ হয়ে এলো ; যদুপুরে ফিরে যাওয়া আবশ্যক। সসম্ভ্রমে দত্তমহাশয়কে আমি বোল্লেম, "কল্য আমি এসেছি, কাহাকেও না বোলে আজ প্রাতঃকালে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, ফিরে যেতে বিলম্ব হোলে দীনবন্ধুবাবু

উদ্বিগ্ন হবেন, বাড়ীর পরিবারেরাও ভাবিত হবেন, এখন আমি বিদায় হোলেম, অচিরেই আর একদিন সাক্ষাৎ হবে। আপনি যেরূপ আজ্ঞা কোল্লেন, সে সম্বন্ধে আমার মতামত এখন আমি প্রকাশ কোত্তে অক্ষম। অমরকুমারী বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ এখন আর অমরকুমারী বালিকা নন, এখন তাঁর ভালমন্দ বিবেচনার শক্তি জন্মেছে ; অমরকুমারী যদি আপনার প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন, তা হোলে—"

যেন আমার মুখের কথা লুফে নিয়েই কে একজন পাশের ঘরের ভিতর থেকে সহর্ষ-গম্ভীরস্বরে বোলে উঠলেন, "তা হোলে—

মাথায় মুকুট দিয়ে বসিবে দম্পতি, কৌতুকে যৌতুক দিবে যতেক যুবতী।"

যে দিক থেকে সে আওয়াজ এলো, চমকিতনয়নে সেই দিকে আমি চেয়ে দেখি, রঙ্গভূমির নান্দীগায়ক সূত্রধারের ন্যায় পুনরায় পূর্ব্বস্বরে ঐ গীতটি গাইতে গাইতে একটি বাবু আমাদের সম্মুখে চোলে আসছেন ; দেখতে দেখতে সম্মুখে উপস্থিত। পুনরায় তাঁর মুখে সেই গীত—

"মাথায় মুকুট দিয়ে বসিবে দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দিবে যতেক যুবতী॥"

বাবুটি কে ?—আমার সুললিত রহস্যপ্রিয় প্রিয় বন্ধু পশুপতিবাবু। তাঁর মুখপানে চেয়ে আমি অবাক হয়ে থাকলেম। কখন কোথা দিয়ে কি প্রকারে তিনি এই বাড়ীতে প্রবেশ কোরেছেন, কিছুই আমি জানতে পারি নাই। গীতটি গেয়েই তিনি করতালি দিয়ে 'হো হো' শব্দে হেসে উঠলেন। শান্তিরাম দত্তের হাস্যবিকসিত মুখমণ্ডল হর্ষরাগে সুরঞ্জিত ; পিতৃসন্নিধানে মণিভূষণও অনুচ্চ হাস্যে আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন।

চমৎকার অভিনয় হয়ে গেল ! সূর্য্যদেব তখনো আকাশে ছিলেন, তিনিও ঐ আনন্দাভিনয়ের সাক্ষী থাকলেন। আমরা বিদায় হোলেম। অশ্বারোহণে এসে-ছিলেম, পশুপতিবাবুও অশ্বারোহণে এসেছিলেন, ফিরে যাবার সময় উভয়েই আমরা অশ্বারোহী। অশ্বেরা দ্রুতগামী, পথে অধিক বিলম্ব হলো না।

ঠিক সন্ধ্যার পর আমরা যদুপুরে পোঁছিলেম। বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সর্ব্বাগ্রে আমি দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। তাঁর অজ্ঞাতে প্রভাতে আমি বরাকুলী গ্রামে শান্তিরাম দত্তের ভবনে গিয়েছিলেম, সেখানে আমাদের যেরূপ কথোপকথন হয়েছিল, কতক কতক চেপে রেখে, সে কথাগুলিও আমি তাঁরে বোল্লেম। স্পষ্ট কিছু বুঝতে না পেরেও কথার ভাবে তিনি আনন্দ প্রকাশ কোল্লেন। বাড়ীতে সেদিন পাঁচ সাত জন নূতন লোক এসেছিলেন, বোধ হয়, বাবুর সঙ্গে তাঁদের কোন বিশেষ কথাবার্ত্তা ছিল, অতি অল্পক্ষণ আমার কথাগুলি শুনে তিনি সেই সকল লোকের সঙ্গেই কথোপকথন আরম্ভ কোল্লেন। আমি বুঝলেম, বিষয়কর্ম্মের কথা। সেখানে আমার অধিকক্ষণ উপস্থিত থাকা উচিত হয় না, সোরে এসে ছোটবাবুর সঙ্গে ছোটবাবুর বৈঠকখানাতেই খানিক-ক্ষণ আমি বোসে থাকলেম। রাত্রি যখন নবম ঘটিকা, সেই সময় আমি অন্দর-মহলে প্রবেশ করি।

কত দিনের পর আবার আমার অমরকুমারীর সঙ্গে দেখা। অমরকুমারী যে ঘরে থাকেন, পূর্ব্বযাত্রায় এসে সেই ঘরটি আমি দেখে গিয়েছিলেম, সেই ঘরেই প্রবেশ কোল্লেম। সে ঘরে অমরকুমারী তখন ছিলেন না, অন্যঘরে ছিলেন। আমি প্রবেশ কোল্লেম দেখে, অমরকুমারী ধীরে ধীরে এসে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। দর্শনে উভয়ের মনে অবশ্যই আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু দেখলেম, অমরকুমারীর মুখখানি কিছু ভারী ভারী। কারণ কি, আমি তৎক্ষণাৎ বুঝলেম। পূর্ব্বদিন উপস্থিত হয়ে একটিবারও দেখা না দিয়ে, কোন কথা না বোলেই ঐ দিন প্রাতঃকালে আমি স্থানান্তরে গিয়েছিলেম, সেই জন্যই কিছু অভিমান।

থাকে থাক অভিমান, সে অভিমান অধিকক্ষণ থাকবে না, সেইটি স্থির জেনে একখানি কোচের উপর আমি বোসলেম, অমরকুমারী দাঁড়িয়ে থাকলেন। মৃদু হেসে আমি যখন তারে বোসতে বোল্লেম, আমার কৌচে না বোসে নিকটে আর একটি শয্যার উপর নীরবে অমরকুমারী বোসলেন। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার অগ্রে প্রথমেই আমি বোল্লেম, "রক্তদন্ত ধরা পোড়েছে ; এখনো পুলিসের হাতে ধরা পড়ে নাই, একটা উৎকট রোগাকান্ত হয়ে কলিকাতার কলেজ-হাসপাতালে আটক আছে।"

মুখের ভাব যেমন ছিল, সেইরূপ থাকলো, কিন্তু চক্ষে আনন্দভাব প্রকাশ কোরে অমরকুমারী অনিমেষে আমার গম্ভীর বদন নিরীক্ষণ কোল্লেন। পুনরায় আমি বোল্লেম, হাঁ, রক্তদন্ত এখন হাসপাতালে। তুমি যারে পিতা বোলে জানতে, সেই রক্তদন্ত এখন সংসার সম্বন্ধে আমাদের অপরিচিত। তোমার পরিচয় আমি জেনেছি, তোমার পিতার নামটিও আমি পেয়েছি ; আমার মাতা-পিতার পরিচয়ও আমি অবগত হয়েছি, এ কথা তুমি আমার মুখেই শুনেছ। বীরভূমে তোমার জননীর অন্তকালে শান্তিরাম দত্ত চিকিৎসা কোরেছিলেন ; তোমার জননীর স্বর্গারোহণের পর শান্তিরাম দত্ত তোমারে কাশীধামে নিয়ে গিয়েছিলেন ; কি কারণে, তা তুমি তখন জানতে না, তিনিও জানতেন না, তথাপি তিনি তোমারে কন্যার ন্যায় ভালবেসে ছিলেন। এত দিনের পর সত্য সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে ; শান্তিরাম দত্ত তোমার মাতুল। আজ প্রাতঃকালে তোমার মাতুলালয়ে আমি গিয়েছিলেম, প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেম ; আজ তাঁর সঙ্গে আমার অনেক প্রকার বিশেষ বিশেষ কথা হয়েছে। একটি প্রধান কথা এই যে, প্রস্তুত হও অমরকুমারী !—আনন্দের সমাচার ; শ্রবণ কোত্তে তোমার কর্ণকে প্রস্তুত রাখো ;—আজ আমি তোমারে একটি শুভ-সংবাদ দিই। প্রধান কথা এই যে, তোমার মাতুল মহাশয় তোমার বিবাহের নিমিত্ত যত্নবান, একটি সুপাত্র অন্বেষণের নিমিত্ত আমি তাঁরে অনুরোধ কোরে এসেছি। কেমন ? তোমার পক্ষে এটি শুভসংবাদ কি না ?"

এতক্ষণের পর অমরকুমারীর মুখে কথা ফুটলো। মুখে পূর্ব্বের অভিমানলক্ষণ সমভাবে বিদ্যামান, অথচ মুখখানি সহসা আরক্ত ; কুমারীসুলভ লজ্জার আবির্ভাব। আরক্ত বদনে, সলজ্জ-ভঙ্গীতে, সলজ্জ স্বরে, যেন একটু

উদাসভাবে অমরকুমারী বোল্লেন, "যাও,—আর কি তোমার কোন কথা নাই? ও কথা আমি শুনবো না; ও রকম কথা আমার কাছে তুমি কেন বল? আমার আবার বিবাহ কি? বিবাহের কি আর সময় আছে? ও কথা আমি স্বপ্নেও আর ভাবি না, সে দিন অনেক দিন অতীত হয়ে গিয়েছে; আমার বয়স—"

বাধা দিয়ে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "বয়সের কথা কেন মনে কর? স্মরণ কোরে দেখ, কত দিন পূর্ব্বে—সেই বীরভূমের অজ্ঞাতনিবাসে যে রাত্রে তুমি আমারে নারীবেশে সাজিয়ে রাক্ষসকবল থেকে রক্ষা কোরেছিলে, বিদায়কালে সেই রাত্রে তুমি আমারে বোলেছিলে, 'ভগবান যদি দিন দেন, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হবে; ভগবান করুন, তোমার মঙ্গল হোক।'—অমরকুমারী! ভগবান দিন দিয়েছেন, পুনর্ব্বার আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মঙ্গলও হয়েছে, তবু এখনো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। অমরকুমারী! তোমারে এখন তোমার মনোমত পতি-পার্শ্ববর্ত্তিনী দর্শন কোল্লেই সেই মঙ্গল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।"

পূর্ব্বরূপ সলজ্জভাবে যেন কিছু রুক্ষস্বরে অমরকুমারী বোল্লেন, "আবার সেই কথা? ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। বিবাহের নাম শুনলে আমার যেন এখন স্বপ্নরাজ্য মনে হয়; ও সব কথা ছেড়ে দাও। বিধাতা সদয় হয়েছেন, তুমি তোমার পরিচয় পেয়েছ, তুমি এখন রাজা হয়েছ, তুমি বিবাহ কর। তুমি যেমন সুন্দর, ঐরূপ একটি সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ কোরে সুখে তুমি রাজ্যসম্পদ ভোগ কর, তা হোলেই আমি সুখে থাকবো। আমার বিবাহে—"

পুনরায় বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "কেন অমর! বার বার তুমি অমন কথা কেন বল? বিবাহকে স্বপ্নরাজ্য কেন মনে কর? বয়স কিছু অধিক হয়েছে, এই কথা? হাঁ, বয়স কিছু অধিক হয়েছে! আজকাল আমাদের এই বঙ্গদেশে এই বর্ত্তমান যুগে যাজ্ঞবল্ক্য রচনানুসারে যে বয়সে কন্যাগণের বিবাহ হওয়া উচিত, সে বয়সের সীমা তুমি অতিক্রম কোরেছ, সে কথা সত্য; কিন্তু অমর! যেরূপ বিমল চরিত্র তোমার, যেরূপ অকপট দয়া ধর্ম্ম তোমার হৃদয়ের অলঙ্কার, তাতে আমি মনে করি, তুমি এই কলিযুগের কুমারী নও, সত্যই যেন তুমি সত্য-যুগের অবতার। এরূপ স্থলে কলিযুগের বৈবাহিক, ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ সীমা লঙ্ঘন কোল্লে বাস্তবিক নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হবে না। তুমি সম্মত হও; তোমার স্নেহময় মাতুলমহাশয়ের অন্তরে বেদনা দিও না। আমার অনুরোধ, যন্ত্রণাদায়ক নৈরাশ্যকে তফাৎ কোরে দিয়ে তুমি তোমার মাতুলের আশা পূর্ণ কর। কেবল তাই নয়, শাস্ত্রমত বিবাহই সংসারে নারীজীবনের প্রধান সুখ। বিশেষতঃ সমাজ-সংসারে নিয়ম-লঙ্ঘনেও পাপ হয়; এ জীবনে কোন প্রকার পাপ তোমাকে স্পর্শ করে নাই, তুমি পবিত্রা; পবিত্রা সতী-সাধ্বীর পবিত্রা কুমারী; আমার একান্ত ইচ্ছা, সর্ব্ববিষয়ে তুমি পবিত্রতা রক্ষা কর। সত্য যদি তুমি সেই দুরাচার রক্তদন্তের কন্যা হোতে, তা হোলে আমি তোমারে এ সব কথা বোলতেম না। এখন তুমি জানতে পেরেছ, আমিও বিশেষরূপে

জেনেছি, রক্তদন্তের কন্যা তুমি নও, পবিত্র কুলীন কায়স্থকুলে তোমার জন্ম। সম্মত হও, বিবাহ কর। আর দেখ, যে দিন আমি বীরভূমে তোমারে আর তোমার জননীরে প্রথম দর্শন করি, সেই দিন যেন একটি দৈববাণী আমার কর্ণে প্রবেশ কোরেছিল, 'তাদৃশী সুলক্ষণা সুন্দরী রমণী কখনই রক্তদন্তের বনিতা নয়, তোমার তুল্য সুলক্ষণা সুন্দরী কুমারী কখনই সেই রাক্ষসসদৃশ নরপিশাচ রক্তদন্তের কন্যা নয়।' যথার্থই সেই দৈববাণী এখন সফল হয়েছে। পূর্ব্বকালের পূর্ণবয়স্কা রাজকন্যাদের মত স্বয়ংবরা হয়ে তুমি স্বচ্ছন্দে আপন মনোনীত পাত্রে পাণিদান কর।"

লজ্জায় অমরকুমারী এইবার নতমুখী—মৌনবতী। সেই পরম সুন্দর আনত বদনে আমি তখন সম্পূর্ণ হর্ষলক্ষণ নিরীক্ষণ কোল্লেম। "চিন্তা কর, বিবেচনা কর, মনস্থির কোরে আমার এই উপদেশবাক্যগুলি আলোচনা কর," মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে এই শেষ কথাগুলি বোলে অমরকুমারীর লজ্জাবনত প্রফুল্ল মুখ-খানি সতৃষ্ণনয়নে দর্শন কোত্তে কোত্তে আমি তখন সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম।

পরদিন প্রাতঃকালে সপুত্র শান্তিরাম দত্ত সেই বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দীন-বন্ধুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেন। অমরকুমারীর পরিণয় সম্বন্ধে পূর্ব্বদিন আমার কাছে তিনি যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরেছিলেন আমার এক অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যের শেষাংশ পশুপতিবাবু যেরূপে সমাপ্ত কোরেছিলেন, দীনবন্ধুবাবুর সাক্ষাতে সেই কথাগুলিও তিনি প্রকাশ কোরে বোল্লেন। দীনবন্ধুবাবুর পরমা-নন্দ ; পরমানন্দে অনুমোদন। পশুপতিবাবুও শুনলেন, বাড়ীর পরিবারেরাও শুনলেন ; ক্রমে ক্রমে প্রতিবাসী বন্ধুবান্ধবেরাও শুনলেন সকলেরই পরমানন্দ। অবশেষে অমরকুমারী। সকলের আনন্দপ্রদ পরিণয়-সম্বন্ধ শ্রবণে অমরকুমারীর মনোভাব কিরূপ হয়ে দাঁড়ালো, আমি সেটি অবগত হোতে পাল্লেম না। আমি পাল্লেম না, কিন্তু আমার মন যেন পূর্ণচন্দ্ররূপে আমার হৃদয়সাগরকে উচ্ছ্বলিত কোরে তুল্লে।

যদুপুরে দশ দিন। প্রতিদিবস এক একবার অমরকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, দেশের কথা বলি, মোকদ্দমার কথা তুলি, আমার উপরত পিতৃব্য-ঠাকুরের দুটি পাঁচটি বড় বড় গুণের কথাও বলি, বিবাহপ্রসঙ্গ আর একবারও উত্থাপন করি না। অমরকুমারীর মুখের ভাব অন্যপ্রকার ; অভিমানের লক্ষণ আর দেখা যায় না, নৈরাশ্যভাবও প্রকাশ পায় না, যখনই দেখি, তখনি যেন সেই সুন্দর সলজ্জবদনে নূতন প্রকার হাস্যলহরী খেলা করে। একদিন আমি দীনবন্ধুবাবুর নিকটে আমার স্বদেশগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ কোল্লেম। কিয়ৎক্ষণ কি যেন চিন্তা কোরে তিনি বোল্লেন, "এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? অনেকদিনের পর এসেছ, আর কিছু দিন থাকো ; তুমি এখানে থাকলে আমি বড় সুখে থাকি। আর দেখ আমার একটি ইচ্ছা হোচ্ছে। শুভ বিবাহটি এইখানে সুসম্পন্ন হোলেই আমার পরম সন্তোষ জন্মে। তোমার প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ, তুমি হয় তো জানো না কিম্বা হয় তো জানো, তোমার মত অমরকুমারীও আমার স্নেহপাত্রী ; আমার

সাক্ষাতে তোমরা উভয়ে পবিত্র পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হও, এইটিই আমার ইচ্ছা।"

শিষ্টাচার প্রদর্শন কোরে আমি বোল্লেম, "আপনার নিকটে আমি বিস্তর উপকার-ঋণে ঋণী ; আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করা অবশ্যই আমার কর্ত্তব্য ; কিন্তু দেখুন, পূর্ব্বে আমি যেরূপ ছিলেম, এখন আমি আর তা নই। যদিও আমার জন্মদাতা পিতা স্বর্গারোহণ কোরেছেন, তথাপি এখনো আমি স্বাধীন নই ; আমার গর্ভধারিণী জননী আমার সমস্ত ইচ্ছাপূরণের কর্ত্রী, সংসারের কর্ত্রী, জননীর ইচ্ছাতেই আমারে এখন সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ কোত্তে হয়। এত দিন কিছুই জানতেম না, সে একরকম অবস্থা ছিল, এখন আর আমার স্বেচ্ছাচার চলে না। আমার বিবাহ-সম্বন্ধে পাত্রী-নির্ব্বাচন ব্যতিরেকে সমস্ত কার্য্যই জননীর ইচ্ছাধীন, পরিজনবর্গও এ বিবাহে সেখানে আমোদ আহ্লাদ কোরবেন, এইরূপ আশা রাখেন। আপনার স্নেহের অনুরোধ রক্ষা কোত্তে আমি অক্ষম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা কোরবেন।"

কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে, কি একটু চিন্তা কোরে, দীনবন্ধুবাবু একটি নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "তা বটে, তা বটে, তা আচ্ছা, তোমার বিবাহে আমরা উভয় সহোদরে বর্দ্ধমানে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কোরবো, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখবো না ; কিন্তু অমরকুমারী কি এই যাত্রায় তোমার সঙ্গে যাবেন ? আমি উত্তর কোল্লেম, "আজ্ঞা না, অমরকুমারী এখন যাবেন না, আমি একাকীই যাব। অমরকুমারী এখন আপনার কাছেই থাকলেন। আপনিই এ বিবাহের কর্ত্তা ; বিপদকালে আপনি আমারে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে উপকার এ জীবনে আমি কখনই বিস্মৃত হব না। আপনি আমার পিতৃতুল্য, পরম বন্ধু। অগ্রে আমি সংবাদ দিব অমরকুমারীকে নিয়ে আপনারা উভয় সহোদরে আমার আলয়ে পদার্পণ কোরবেন। কন্যাকর্ত্তা শান্তিরাম দত্ত। তাঁকে আর মণিভূষণকে আপনি অনুগ্রহ কোরে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমি বুঝতে পাচ্ছি, এ বিবাহে কিছু বিলম্ব হবে। যে মোকদ্দমাটা দায়ের আছে, ভারী গোলযোগের মোকদ্দমা ; যেমন গুরুতর, তেমনি জটিল। সে মোকদ্দমায় সাত ঘাটের জল এক ঘাটে একত্র কোত্তে হবে। অবশ্যই সময়সাপেক্ষ। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির অগ্রে বিবাহের দিনস্থির করা আমার ইচ্ছা নয়। আসামীরা জেনে যাবে, আমি কে, অমরকুমারীই বা কে। অমরকুমারী-হরণে তারা যে কি অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিল, বিচারফলে সেই অগ্নিপরীক্ষা তারা জানতে পারবে ; সেইটি আমার ইচ্ছা। মোকদ্দমার জন্যই অগ্রে আমি একাকী যাব।"

আবার কি একটু চিন্তা কোরে দীনবন্ধুবাবু বোলছিলেন, "প্রবোধ কু—"

তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে আমি বোল্লেম, "এ আপনি কি করেন ? ও রকম সম্বোধন আপনার মুখে শোভা পাবে না ; আপনি আমারে হরিদাস বোলেই ডাকবেন ; চিরদিন আমি আপনার কাছে হরিদাসই থাকবো ; হরিদাস সম্বোধনে আপনার স্নেহের পরিচয় চিরদিন ঠিক থাকবে ; কাগজপত্রে লেখা নামের কথা কাগজপত্রেই থাকুক, সে নামের কথা আপনি মনেও আনবেন না।"

ঈষৎ হাস্য কোরে দীনবন্ধুবাবু বোল্লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হোক ; দেখ হরিদাস! তোমার সেই দশ সহস্র মুদ্রা আমার কাছে জমা আছে। মাণিকগঞ্জে যাবার সময় রাহাখরচের স্বরূপ যা কিছু তোমারে আমি দিয়েছিলেম, সেটা তোমার হিসাবের মধ্যেই ধরা যাবে না। তোমার আমানতী দশহাজার টাকা ঠিক ঠিক মজুত আছে, এইবার সেগুলি তুমি নিয়ে যাও।"

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, অভিবাদন কোরে, বিনীতবচনে আমি বোল্লেম, "আপনার অনুগ্রহণ যথেষ্ট। মনে করুন, টাকা তো টাকা, টাকা অতি তুচ্ছ কথা, আমিই আপনার ; সে টাকা আপনার কাছেই থাকুক ; নিরাশ্রয় অবস্থায় আপনার বাড়ীতে আমি আশ্রয় পেয়েছিলেম, নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘোর বিপদে অমরকুমারীও আপনার বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছেন, আমাদের উভয়ের আশ্রয়স্থান—নিরাপদস্থান এই যদুপুর, এই যদুপুরে আমি আমাদের স্মরণচিহ্ন কিছু রেখে যেতে চাই। আমার প্রতি কৃপা কোরে আপনি একটি কাজ করুন। আমি দেখলেম, যদুপুরে একটিও বিদ্যালয় নাই, একটিও চিকিৎসালয় নাই, একটিও প্রশস্ত জলাশয় নাই। সেই দশহাজার টাকা আপনি ঐ তিন বিষয়ে বিনিয়োগ করুন। বিদ্যালয়ের নাম থাকবে অমরকুমারী বিদ্যালয় ; চিকিৎসালয়ের নাম থাকবে দীনবন্ধু-চিকিৎসালয় ; সরোবরের নাম থাকবে পশুপতিসরোবর। আর একটি অনুরোধ, সেই সরোবর-তীরে আপনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করুন। মন্দিরের নাম দিবেন অমরনাথ-মন্দির; অমরনাথ শিবলিঙ্গ সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। নিত্য পূজা হবে, ভোগ হবে, অতিথি অভ্যাগতের সেবা হবে। মন্দিরের নিকটে একটি সদাব্রত থাকবে; নিত্য সেখানে অতিথি-সেবার বন্দোবস্ত থাকবে, এই আমার ইচ্ছা। আপনি জেনেছেন, এখন আমার টাকার অভাব নাই ; ঐ সকল কার্য্যে যত টাকা ব্যয় হবে, ঐ দশহাজার টাকা বাদে আবশ্যকমত বাকী সমস্তই আমি প্রদান কোরবো। সদাব্রতের জন্য, দেবসেবার জন্য আমি একখানি জমীদারী দান কোরবো। আর দেখুন, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টিতে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হবে না, সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা হবে ; চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে চিকিৎসা চোলবে, এই আমার অভিলাষ। তবে সময়ানুগত চিকিৎসার সুবিধার নিমিত্ত সেই চিকিৎসালয়ে একজন ডাক্তার থাকবেন, ইংরেজী মতের ঔষধাদিও প্রস্তুত থাকবে। সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর একান্তে স্থানীয় বালকেরা বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা কোত্তে পারবে। তা হোলেই সকল দিকে ঠিক হবে। এইরূপ বন্দোবস্তই আমার বাঞ্ছনীয়।"

বিস্মিত-নয়নে আমার বদন নিরীক্ষণ কোরে, দীনবন্ধুবাবু আমারে সাধুবাদ দিয়ে বিস্তর আশীর্ব্বাদ কোল্লেন ; আমি তাঁর চরণে প্রণাম কোল্লেম। কিয়ংক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, কি যেন চিন্তা কোরে, পুনরায় তিনি আমারে বোল্লেন, "তোমার এই সাধু ইচ্ছা সফল হোক ; কিন্তু দেখ, শুভকার্য্যে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয় ; তোমার অভিলষিত সৎকার্য্যগুলি শীঘ্র আরম্ভ করা উচিত। আরম্ভকালে তোমার এখানে উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। স্বদেশগমনের নিমিত্ত

তুমি ব্যস্ত হোচ্ছো, শীঘ্রই যেতে চাচ্ছো, সেটি হোচ্ছে না। সম্মুখে চৈত্রমাস ; চৈত্রমাসে বিবাহ নাই ; দেবালয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, এই তিনটি আলয়ের পত্তন কোরে দিয়ে চৈত্রমাসের শেষে অথবা নূতন বৎসরের বৈশাখমাসের প্রথমে। তুমি নিজালয়ে যাত্রা কোরো। এ বিলম্বে কোন কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হবে, এমন আমি বিবেচনা করি না।"

আমি একটু ভাবলেম। রক্তদন্ত হাসপাতালে, যে প্রকার উৎকট রোগ তার, অল্পদিনে আরাম হবে না, হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবের মুখে এরূপ আমি শুনে এসেছি। চৈত্রমাসের শেষে কলিকাতায় উপস্থিত হোলে বোধ হয় রক্তদন্তকে নিরাময় দেখতে পাব। চৈত্রমাসের শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকলে তাদৃশ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, এ কথা যথার্থ ; তাই আমি থাকি। থাকতে কেবল কার্য্য-গুলিই আরম্ভ হবে, এমন নয়, অমরকুমারীর সঙ্গে দিনকতক একসঙ্গে বোসে তাঁর প্রকৃত মনোভাবটি আমি বিশেষরূপে পরীক্ষা করবার অবসর পাব। পরামর্শ মন্দ নয়, তাই আমি থাকি।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত কোরে দীনবন্ধুবাবুর অনুরোধের উত্তরে বিনম্র-ভাবে আমি বোল্লেম, "আজ্ঞা যা আপনি বোলছেন, অগ্রে তা আমি ভাবি নাই। আমি এখানে উপস্থিত না থাকলে গৃহপত্তন হোতে পারে না, সত্য সত্যই এমন কথা কিছু নয়, তথাপি আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা কোল্লেম। উপযুক্ত স্থপতিগণকে আহ্বান কোরে, একটি শুভদিন দেখে, কার্য্যগুলি আপনি আরম্ভ কোরে দিন। ফাল্গুনমাস প্রায় শেষ হয়, চৈত্রমাসের একপক্ষের মধ্যে পত্তন-কার্য্য শেষ হোলেই আমি যথেষ্ট সময় পাব ; অধিক লোক নিযুক্ত কোরে দিলেই শীঘ্র শীঘ্র আমি এখান থেকে বিদায় হোতে পারবো।"

দীনবন্ধুবাবু আহ্লাদিত হোলেন। শুভদিন দেখে কার্য্য আরম্ভ হবে, এইরূপ স্থির হয়ে থাকলো। নিত্য আমি যে সময়ে অমরকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করি, সে দিনও সেই সময়ে অন্দরে প্রবেশ কোরে সেইরূপে সাক্ষাৎ কোল্লেম। শীঘ্রই আমি দেশে যাব, অমরকুমারী সে কথা শুনেছিলেন, দুটি পাঁচটি কথার পর কিছু বিষণ্ণবদনে অমরকুমারী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কল্যই কি তুমি চোল্লে যাবে?"—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বিগলিতবাষ্পে স্নেহময়ীর চক্ষুদুটি ছল ছল কোরে এলো। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পদ্মিনী যেমন ম্লানমুখী হয়, অমরকুমারী তখন সেইরূপ ম্লানমুখী! আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর কোল্লেম, "যেতেম, মনে মনে সেই সংকল্পই ছিল, কিন্তু দীনবন্ধুবাবুর বিশেষ আকিঞ্চনে, একটি বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত চৈত্রমাসের অর্দ্ধেক দিন পর্য্যন্ত আমারে অপেক্ষা কোত্তে হলো।"

শুক্লপক্ষ-যামিনীতে চন্দ্রাবরণ তরলমেঘ অপসৃত হোলে উজ্জ্বলপ্রভায় চন্দ্র যেমন বিকাস পান, আমার ঐ উত্তর শ্রবণমাত্র অমরকুমারীর চন্দ্রমুখখানি সেই-রূপ বিমলপ্রভায় প্রভাসিত হলো। অমরকুমারী বোল্লেন, "দীনবন্ধুবাবুর মুখে দেবতা বোসেছিল ; দেবতা আমার মনের কথা জানতে পেরেছিলেন। চৈত্র-

মাসের অর্দ্ধেক দিন। বেশ ; আমার ইচ্ছা, চড়কপূজা পর্য্যন্ত তুমি এইখানে থাকো, বৈশাখমাসে—বৈশাখমাসে একটি ভাল দিন দেখে—হাঁ, আমিও তোমার—"

অমরকুমারীর মনের ইচ্ছা আমি বুঝলেম। এই যাত্রায় আমার সঙ্গেই অমরকুমারী বর্দ্ধমানে যেতে চান, এইরূপ যেন তাঁর মনোভাব। ভাবটুকু প্রকাশ হবার অগ্রেই আমি বোল্লেম, "তুমি কি সেই আসলকথাটা ভুলে যাচ্ছো ? রক্তদন্ত কলিকাতার হাসপাতালে, তাকে যদি আমার দরকার না থাকতো, বাঁচলো কি মলো, সে খবর জানবার কোন প্রয়োজন হতো না। তাকে আমার দরকার আছে। যে লোক আমার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করেছিল, হাসপাতালে সে লোক বাঁচুক, এখন আমি এইরূপ কামনা কোচ্ছি ; বাঁচলেই ভাল হয়। রক্তদন্ত আমারে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়েছে, কেবল সেই পর্য্যন্তই যদি তার অপরাধ হতো, সে সব যন্ত্রণার কথাও আমি ভুলে যেতে পাত্তেম ; কিন্তু সেই পর্য্যন্তই সে পাপাত্মার অপরাধের সীমা নয়। রক্তদন্ত তোমার জননীর অকালমৃত্যুর কারণ হয়েছে ; তোমার মাতুলাশ্রয় থেকে রক্তদন্ত তোমারে চুরি কোরেছিল ; মাণিকগঞ্জে রক্তদন্ত তোমারে একটা পোদ্দারের কাছে বিক্রয় করবার চেষ্টা কোরেছিল, সে পাপের ফল তারে ভোগ কোত্তে হবে। কেবল তাও নয়, রক্তদন্ত আমার আশ্রয়দাতা, তখনকার অজ্ঞাত, ধর্ম্মশীল মাতামহের গলায় ছুরী দিয়েছে, আরো হয় তো কত জায়গায় কত নির্দ্দোষ লোককে খুন কোরেছে। রক্তদন্তের বিচার আমারে দেখতে হবে, তার পাপের উচিতমত শাস্তি আমারে দেখতে হবে। সরাসর আমি বর্দ্ধমানে যেতে পারবো না, সেই জন্যই আপাততঃ তোমারে এখানে রেখে কিছু অগ্রে আমি যেতে চাই।"

যেন কেমন চঞ্চলা হয়ে অমরকুমারী বোল্লেন, "বোলো না, বোলো না, ও কথা তুমি আমার কাছে বোলো না। যে কদিন তুমি এখানে থাকো, সে কদিন তোমার মুখখানি দেখে দেখে আমি একটি মানসিক সুখভোগ কোরবো। সে সুখ না ফুরায়, এই আমার কামনা। যাবার কথা এখন তুমি বোলো না।"

ঈষৎ হাস্য কোরে আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, তাই। শুনে যদি তুমি মনে ব্যথা পাও, সে কথা তবে এখন আমি বোলবো না ; যাতে তুমি সুখে থাকো, যাতে তোমার মনে কোন দুশ্চিন্তা না থাকে, তাই করাই আমার কর্ত্তব্য।" এই সব কথা বোলে অমরকুমারীকে প্রবোধ দিয়ে আমি বৈঠকখানায় চোলে এলেম। রাত্রে আর অন্য কোন কার্য্যই কোল্লেম না, আহারাদি কোরে যথাস্থানে শয়ন কোল্লেম। প্রভাতে দীনবন্ধুবাবু প্রফুল্লবদনে আমারে বোল্লেন, "তিন দিন পরে ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সেই দিন শুভদিন। সেই দিন তোমার সংকল্পিত সদনুষ্ঠান আরম্ভ করা যাবে।" আমি সন্তুষ্ট হোলেম। পূর্ণিমার দিন প্রয়োজনমত কতক কতক উপকরণ সংগৃহীত হলো, আট দশজন রাজমিস্ত্রী আহূত হয়ে এলো, উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট কোরে, সিদ্ধিদাতা দেবগণের পূজা দিয়ে, আমি স্বয়ং মন্দিরাদি আশ্রমগুলির পত্তন দিলেম। সেই দিন থেকেই ইমারতের কার্য্য আরম্ভ হয়ে গেল। একজন দফাদার ডেকে কোঁড়া-মজুর আনিয়ে একটি সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে দীর্ঘায়তনে পুষ্করিণী-খননও করা হলো।

ফাল্গুনমাস সমাপ্ত। চৈত্রমাসের ষোড়শ দিবসে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, অমরকুমারীকে সম্ভাষণ কোরে, ভাগীরথীবক্ষে আমি তরণী আরোহণ কোল্লেম। সঙ্গে থাকলো, আমার সেই প্রিয় ভৃত্য কালাচাঁদ।

কলিকাতায় উপস্থিত হোলেম। নৌকা থেকে উঠে একখানা গাড়ী ভাড়া কোরে আমি যোড়াসাঁকোতে চোল্লেম। যে রাস্তা দিয়ে চোল্লেম, সে রাস্তার নাম রতন সরকারের গার্ডেন স্ট্রীট। সেই রাস্তার উপরে বীরভূমের বাগেশ্বর বাবুদের বাড়ী। সে বাড়ীতে প্রায় সর্ব্বদাই চাবী বন্ধ থাকে, সে দিন দেখলেম, সদরদরজা খোলা। কালাচাঁদকে গাড়ীতে রেখে সেই বাড়ীর সম্মুখে আমি নামলেম, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোল্লেম। একজন চাকর আমার দিকে চাইতে চাইতে আমার গা ঘেঁষে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল ; আমি তারে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না, সরাসর উপরে গিয়ে উঠলেম ; গিয়েই দেখি, সম্মুখের ঘরে নরহরিবাবু। চৌকাঠের কাছে আমি দাঁড়ালেম ; নরহরিবাবু খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকলেন ; বোধ হলো যেন চিনতে পাল্লেন না। আমার পরিচ্ছদ-দর্শনে সসম্ভ্রমে "আসুন, আসুন," বোলে তিনি আমারে অভ্যর্থনা কোল্লেন। ঘরের ভিতরে গিয়ে আমি বোসলেম। নরহরিবাবু কেবল চেয়েই আছেন, আমিও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি ; কি যেন তিনি জিজ্ঞাসা কোরবেন, এইরূপ ভাব বুঝতে পেরে অগ্রেই আমি আমার পরিচয় দিলেম, প্রণাম কোল্লেম। সেবারের পরিচয়ে আমার অনেক কথা,—সকল কথাই নূতন ; আমি কিন্তু অল্প কথায় সেই অনেক কথার স্থূল স্থূল মর্ম্ম পরিব্যক্ত কোল্লেম।

পূর্ব্বে আমি নরহরিবাবুর কাছে যেরূপ সমাদর পেয়েছিলেম, এবারে তদপেক্ষা অধিক সমাদর প্রাপ্ত হোলেম। আমার সৌভাগ্যে তিনি সানন্দে অভিনন্দন কোল্লেন। একবার আমার ইচ্ছা হলো, রঙ্গিণীর কথাটা উত্থাপন করি, কিন্তু কোল্লেম না। রঙ্গিণী যখন গুজরাট প্রদেশে পুনরায় নূতন বিবাহে আমোদিনী হয়ে আছে, তখন আর সে কথা উত্থাপন কোরে তার সহোদরের মনে বেদনা দিতে আমার ইচ্ছা হলো না। কানাইকে আমি দেখেছি, নাগপুরের পান্থশালায় খুনী মামলায় কানাই বন্দী হয়েছে, সেই কথাটি নরহরিবাবুকে আমি বোল্লেম। তিনি বোধ হয়, সেই গুণপুরুষের গুপ্তলীলা অবগত হোতে পেরেছিলেন, খুনী মামলায় বন্দী হয়েছে শুনে, আকাশপানে হাত তুলে গম্ভীরবদনে বোল্লেন, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

প্রায় আধ ঘণ্টাকাল সেই বাড়ীতে থেকে উপস্থিতমত অন্যান্য বিষয়ের কথোপকথন কোরে যথোচিত শিষ্টাচারে আমি বিদায়গ্রহণ কোল্লেম। আমাদের গাড়ী ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতাপবাবুর দরজায় গিয়ে পোঁছিল। প্রতাপবাবুর পুত্রেরা আমার প্রত্যাগমনে সন্তুষ্ট হোলেন ; সে রাত্রি আমি সেইখানেই যাপন কোল্লেন।

নিদ্রার সময় নিদ্রা আবশ্যক কিন্তু সে রাত্রে তা আমার হলো না, চিন্তাপথে কেবল মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল। উষাকালে শয্যাত্যাগ কোরে বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় আমি খানিকক্ষণ বেড়ালেম। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বড়বাবুর

সঙ্গে গঙ্গাস্নান কোরে এলেম ; দুই প্রহরের পূর্ব্বে আহারাদি সমাপ্ত হলো। অপরাহ্ন তৃতীয় ঘটিকার সময় একখানি শকটারোহণে আমি হাসপাতালে উপস্থিত হোলেম। কামিনীর মা যে ঘরে ছিল, আগেই আমি সেই ঘরে গেলেম। কামিনীর মা আরাম হয়েছে, আর দুদিন পরেই ঘরে যাবে, একজন যাত্রীর মুখে সেই কথা আমি শুনলেম। বুড়ীকে বোল্লেম, "আগে তুমি বাড়ীতে যাও, পাঁচ সাত দিন আমি কলিকাতায় আছি, সেইখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

এইবার জটাধর তরফদার। যে ঘরে জটাধর, সেই ঘরে গিয়ে আমি দেখলেম, লোকটার গায়ের মহাব্যাধি-ব্রণ প্রায় শুষ্ক হয়ে এসেছে, যজ্ঞডুম্বরের মত ফুলে-ছিল, প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য্য! যে লোকের গুপ্তদূত ছিল রক্তদন্ত, সেই লোকের বাম উরু কর্ত্তন করা হয়েছিল, রক্তদন্তের দক্ষিণ উরু কর্ত্তিত হয়েছে। কটমট চক্ষে রক্তদন্ত আমারে দেখলে ; চিনতে পাল্লে কি না, বুঝতে পাল্লেম না। সেই সময় ডাক্তার সাহেব এলেন, তিনি আমারে সেলাম কোল্লেন। ললাটে অঙ্গুলি স্পর্শ কোরে ইংরেজীতে তাঁরে আমি গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। তিনি উত্তর দিলেন, "নিরাপদ, প্রাণের আশঙ্কা নাই। পায়ের ভিতর পোকা হয়েছিল, সেই জন্য পাখানা কেটে দেওয়া গিয়েছে, কেটে না দিলে বাঁচতো না, এখন বাঁচবে।" আরো শুনলেম, উরু-কর্ত্তনের সময় প্রকাশ পেয়েছে, রক্তদন্তটা ক্লীব।

সাহেবের সঙ্গে আমি কথা কোচ্ছি, দীর্ঘপর্গশীর্ষ দণ্ডহস্ত একটা লোক চৌকাঠের বাহিরে এসে দাঁড়ালো, যেন কোন কার্য্যই নাই, কোন দিকেই যেন দৃষ্টি নাই, সেই ভাবে অতি অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ পাদসঞ্চালন কোরে সেই লোক তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিসের জমাদার। আমি অবগত হোলেম, প্রতি সপ্তাহে এক একবার ঐ লোক সেইখানে এসে দাঁড়ায় ; যে সপ্তাহে সে না আসে, সে সপ্তাহে তার একজন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। পুলিস-কমিশনরের নামে পূর্ব্বে আমি যে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেম, তারই এই ফল। রক্তদন্ত তারে দেখে, কিছু বুঝতে পারে কি না পারে, সেই জানে। যে লোকের মনে অহরহ দুর্জ্জয় দুর্জ্জয় অপরাধ জাগরুক থাকে, ঐ রকমের কোন লোক দেখলে, কেহ কোন কথা না বোল্লেও, আপনা আপনি তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে।

জমাদার বিদায় হয়ে গেল। একটি কথাতে ডাক্তার সাহেবকে আহ্বান কোরে চুপি চুপি আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আর কত দিন?" সাহেব উত্তর কোল্লেন, "দশ পনের দিন।" প্রথমেও রক্তদন্ত আমারে চিনতে পারে নাই, সে দিনও চিনলে না ; আমিই মনে কোল্লেম, চিনলে না, বাস্তবিক সে আমারে চিনেছিল কি না তা আমি জানি না, তার মুখের লক্ষণে পরিচিত ভাব কিছু বুঝা গেল না। আমি বাহির হয়ে এলেম। পনের দিন পরে আবার আমি হাসপাতালে গেলেম ; দেখলেম, রক্তদন্তের একখানা কাঠের পা, গায়ে কেবল চাকা চাকা কালো কালো দাগ। সেই দিন আমি ডাক্তার সাহেবকে আমার মনের কথা বোল্লেম। ডাক্তার সাহেবের চক্ষু আমার চক্ষুর

সঙ্গে কথা কোইলে। একটু পরেই দেখি, সেই জমাদার। সেই দিন জমাদারের সঙ্গে পুলিসের একজন সার্জ্জেন সাহেব আর দুজন প্রহরী। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে সার্জ্জেন সাহেবের কি কি কথা হলো, সব আমি শুনলেম না, তার পর পাশের ঘরে সার্জ্জেন সাহেবকে আহ্বান কোরে আমি আমার পরিচয় দিলেম, যে যে কথা আমার বলবার ছিল, সব কথা বোল্লেম ; সার্জ্জেন আমারে সেলাম কোল্লেন। আমি বোল্লেম, "আসামীকে একবার বহরমপুরে চালান করা কর্ত্তব্য। সেখানে এক মেয়েচুরী মোকদ্দমায় ঐ ব্যক্তি মূল আসামী ; আর তিনজন সেই অপরাধে সেখানকার জেলখানায় হাজতে আছে। বহরমপুরে এই লোকের শেষ বিচার হবে না, কলিকাতাতেও হবে না। আট বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে এই জটাধর তরফদার একজন জমীদারকে খুন কোরেছিল, সেখানেও এই লোকের দুজন সঙ্গী ছিল, সেই দুজনের মধ্যেও একজন বহরমপুরের হাজতে, দ্বিতীয় ব্যক্তির অন্বেষণ হয় নাই ; জটাধর তরফদার সব জানে। হাসপাতালে সে সকল কথা উহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় না। পুলিসে ঐ লোকের সঙ্গে আমি একবার সাক্ষাৎ কোত্তে চাই।"

সার্জ্জেন সম্মত হোলেন। সেই দিন রক্তদন্তকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হলো। সে দিন আর আমি গেলেম না, পরদিন অপরাহ্নে পুলিস-আফিসে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে আমি দেখা কোল্লেম ; ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সাক্ষাতেই তার কাছে আমি আমার পরিচয় দিলেম ; রাজা মোহনলালের মৃত্যু হয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতার দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা তিনি আর আদায় কোত্তে আসছেন না, সে সকল কথাও তারে আমি বোল্লেম। রক্তদন্ত কেঁপে কেঁপে উঠলো। সে তখন বুঝতে পাল্লে, পাপবৃক্ষে ফল ফলবার সময় উপস্থিত, তার প্রধান মরুব্বী ইহসংসারে নাই, নিরুপায়। তখন আর কোন প্রকার গুপ্ত অপরাধ গোপনে রাখতে তার সাহস হলো না, হাকিমলোকের সাক্ষাতে একে একে সমস্ত অপরাধ একরার * কোল্লে, কিছুই গোপন রাখলে না। সেই অবসরে পুলিস-কমিশনারের অনুমতি লয়ে আসামীকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কালকিঙ্কর চঙ্গের বাড়ী কোথায় ? সর্ব্বানন্দবাবুকে খুন করবার সময় কালকিঙ্কর তোমার সহকারী হয়েছিল, সেই সহকারীকে এখন কোথায় পাওয়া যায় ?"

এই প্রশ্নের পর দুই চক্ষু ঘূর্ণিত কোরে রক্তদন্ত আমার মুখপানে চাইলে। একে তো স্বভাবতই তার চক্ষু অতি ভয়ঙ্কর, তাতে আবার কলেজের হাসপাতালে চিকিৎসার সময় মাথাটা নেড়া কোরে দেওয়া হয়েছিল, লম্বা লম্বা চুলে চক্ষের কতকটা ঢাকা ঢাকা থাকতো, নেড়ামাথায় সেই সম্পূর্ণ গোলাকার চক্ষু অধিক ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কোন কদাকার মূর্ত্তি দেখলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা যেমন ভয় পায়, আমার মনেও যেন তখন সেইরূপ ভয়ের সঞ্চার হলো ; নিকটে ছিলেম, পশ্চাদ্দিকে একটু সোরে দাঁড়ালেম।

রক্তদন্তের আশা-ভরসা তখন আর কিছুই ছিল না। সে তখন নিশ্চয় ভেবে-

---

* একরার—আদালতী ভাষা। এ কথার অর্থ, পারস্যভাষায় কবুল। আমাদের ভাষায় অঙ্গীকার।

ছিল, অচিরে তার পাপ-জীবনের অবসান হবে, তার ক্রূরতা তখন কোন কার্য্যেই আসবে না, সুতরাং সে উত্তর কোল্লে, "কালকিঙ্কর চঙ্গ একটা ডাকাতী মোকদ্দমায় মানভূমের ফৌজদারী জেলখানায় কয়েদ আছে।"

রক্তদন্তের এজাহার সমস্ত সেই স্থানেই বর্ণে বর্ণে লিপিবদ্ধ করা হলো, পুলিস মোতায়েনে শীঘ্রই তাকে মুর্শিদাবাদে চালান করা হবে, এইরূপ স্থির হয়ে থাকলো, কমিশনার সাহেবকে সেলাম কোরে সে দিন আমি বিদায় হোলেম। প্রত্যাগমনকালে একবার আমি বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উপস্থিত হই। রক্তদন্ত-খালাসের অগ্রে কামিনীর মা হাসপাতাল থেকে খালাস হয়ে এসেছিল, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সদরবাড়ীতে প্রবেশ কোরে গঙ্গারামের দ্বারা কামিনীর মাকে আমি খবর দিলেম। কামিনীর মা এলো। কাশীতে পূর্ব্বে আমি তারে বোলেছিলেম, "আর তোমাকে কোন জায়গায় চাকরী কোত্তে হবে না, জীবনের অবশিষ্ট কাল যাতে কোরে তুমি সুখে থাকতে পার, আমি তার উপায় কোরে দিব।" আমার সেই অঙ্গীকার স্মরণ কোরিয়ে দিয়ে তারে আমি বোল্লেম, "আপাততঃ কিছুদিন এই বাড়ীতেই তুমি থাকো, তার পর বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়ে আমি তোমাকে আমার নিজবাড়ীতে রেখে প্রতিপালন কোরবো।" আমার সঙ্গে টাকা ছিল ; পঞ্চাশটি টাকা তার হাতে দিয়ে আমি বেরিয়ে আসছি, কপাটের আড়ালে সৌদামিনী এসে দাঁড়িয়ে ছিল. আমি রাজা হয়েছি, কামিনীর মার মুখে ইতিপূর্ব্বে সৌদামিনী সে কথা শুনেছিল, দ্রুতগতি বেরিয়ে এসে সৌদামিনী আমার সম্মুখে দাঁড়ালো ; স্তম্ভিতকণ্ঠে বোলতে লাগলো, "রাজা ! রাজা ! ভগবানের ইচ্ছায় সেই তুমিই এখন রাজা ; তুমিই সেই হরিদাস ; কাশীর ছাদের উপর থেকে তোমাকে আমি দেখেছিলেম, আর তোমাকে আমি দেখতে পাব না, এইরূপ আমি ভেবেছিলেম, তুমি আপনি এসে দেখা দিলে। হরিদাস ! আমি তোমাকে রাজা বোলে ডাকবো, এমন আমার মনে ছিল না ; ভগবান তোমারে রাজা কোরেছেন. এখন তুমি আমার একটা কিনারা কোরে যাও। চিঠি লিখে তোমাকে আমি জানিয়েছিলেম, ইহ-জন্মে আর আমার পাপকর্ম্মে মতি হবে না। সেই অবধি চিঠির সেই কথাই আমি পালন কোরে আসছি, যতদিন বাঁচবো, চিরদিন পালন কোরবো। এখানে আর আমি থাকতে পাচ্ছি না। জয়হরি বড়াল আপন পাপের ফলভোগ কোরেছে, আমার কিন্তু কলঙ্ক ঘুচলো না ; এখানকার সকলেই আমাকে ঘৃণা করে, সকলেই বলে, 'কলঙ্কিনী সৌদামিনী।' ইচ্ছা হয়, আত্মঘাতিনী হই। আত্মঘাতিনী হব না, কলিকাতায় আমি রব না, তুমি আমাকে কাশীধামে পাঠিয়ে দাও। বিশ্বেশ্বর কাশীতে ; আমার পাপ ক্ষমা কোরে বিশ্বেশ্বর আমারে বিশ্বেশ্বর-পুরীতে স্থান দিবেন, অন্তকালে আমার কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র দিবেন, আমি উদ্ধার হয়ে যাব, আমি কাশীবাসিনী হব। হরিদাস ! আমার আর কেউ নাই, তুমি আমার পরকালের মুক্তির উপায় কোরে দাও।"

সৌদামিনীর কাতরোক্তিতে তার প্রতি আমার দয়া হলো ; স্বীকার কোল্লেম, "সত্য যদি তুমি পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ কোরে থাকো, তবে আমি তোমার চির-

জীবন কাশীবাসের সুব্যবস্থা কারে দিব। সম্প্রতি আমি নানা কাজে ব্যস্ত, বারান্তরে কলিকাতায় এসে তোমারে কাশীধামে প্রেরণ করবার বন্দোবস্ত কোরবো।"

কামিনীর মা কেঁদে উঠলো। কামিনীর মা বোল্লে, "আমার কপালে কি তবে কাশীবাস ঘোটবে না ? আমি কি তবে এই শেষদশায় কেবল পাপের ভোগ ভুগবো ? বর্দ্ধমানে নিয়ে যাবে বোলছো, সেখানেও আমার মন স্থির হবে না ; আমার দিন নিকট হয়ে এসেছে, দয়া কোরে আমারেও তুমি কাশী পাঠাও। সৌদামিনীকে আমি বড় ভালবাসি ; সৌদামিনী যদি কাশী যায়, আগেকার মত যাওয়া নয়, বিশ্বেশ্বরের সেবার জন্য সৌদামিনী যদি কাশী যায়, আমিও সৌদামিনীর সঙ্গে যাব, শেষ কটাদিন অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের নাম কোরে কাশী-ধামেই আমি কাটাবো ; দয়া কোরে সৌদামিনীর সঙ্গে তুমি আমারে কাশী-পুরীতেই পাঠিয়ে দাও।"

প্রবোধ দিয়ে আমি বোল্লেম, "আচ্ছা, তাই হবে, এইবার ফিরে এসে আমি তোমাদের দুজনকেই কাশীপুরীতে পাঠিয়ে দিব। মাঝে মাঝে আমারও কাশী যাওয়া প্রয়োজন হবে, তোমাদের সঙ্গে দেখা কোরে, তোমাদের সুখশান্তির ব্যবস্থা কোরে দিয়ে আসবো।" গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে কামিনীর মা আমারে নমস্কার কোল্লে ; সৌদামিনী ব্রাহ্মণকন্যা, নমস্কার কোত্তে পাল্লে না, পরমেশ্বরের নাম কোরে আশীর্ব্বাদ কোল্লে।

বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে আসছি, সদরদরজার বাহিরেই দেখি, একজন স্ত্রীলোক। জীর্ণ-শীর্ণ দেহ, শতগ্রন্থি ছিন্নবাস পরিধান, মুখ বিশুষ্ক, চক্ষু কোটরান্তর্গত, সেই চক্ষে দরদর বারিধারা মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুক্ষকেশ। আমারে সম্মুখে দেখে, চক্ষের জল আরো বাড়িয়ে, অস্থিসার দশাঙ্গুলি সংযুক্ত কোরে, সেই স্ত্রীলোক বোলতে লাগলো, "দোহাই বাবু মশাই ! দোহাই বাবু মশাই ! দোহাই রাজা মশাই ! কাঙালের প্রতি দয়া কর। বড় কাঙাল আমি, ভিক্ষা কোরেও অন্ন যোটে না ; যে দোরেই যাই, সেই দোরেই তাড়া খাই ; অন্ন বিনে প্রাণ যায় ! দয়া কর বাবা ! দোহাই বাবা ! পৃথিবীতে আমার দয়া করবার কেহই নাই !"

আমি দাঁড়ালেম। কাঙালিনীকে দেখে আমার মন যেন হঠাৎ চোমকে উঠলো ; মুখখানা যেন চেনা চেনা। মরামানুষের মুখের মত মুখ হোলেও সে মুখ যেন পূর্ব্বে আর কোথাও আমি দেখেছি, হঠাৎ সেইরূপ মনে হলো। খানিকক্ষণ সেই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সবিস্ময়ে আমি বোলে উঠলেম, "রূপসী ? তুমি এখানে ? কলিকাতায় তুমি পথের ভিখারিণী ? আমারে তুমি চিনতে পার ? ত্রিপুরার চৌধুরীবাড়ীতে বিদেশী হরিদাস সেই বাড়ীর ছোট বৌমার গহনা চুরি কোরেছিল, সেই কথা তুমি রাষ্ট্র কোরে দিয়েছিলে, চোর বোলে সালিসী ডেকে হরিদাসকে তুমি ধোরিয়ে দিয়েছিলে, মনে হয় কি সে কথা ? আমিই সেই হরিদাস। মাথার উপর সর্ব্বসাক্ষী ভগবান। ভগবান আমারে সম্পদ দান কোরেছেন, ভগবান তোমারে ভিখারিণী কোরেছেন, ধর্ম্ম-

রাজ্যের বিচার এইরূপে! রূপসী! এখন কি তুমি আমারে চিনতে পাল্লে? পাপের ফল কি রকমে ভোগ হয়, তা কি এখন বুঝতে পাল্লে? রাধারাণীকে পায়রাবাবুর রাণী কোরে দেওয়ার ঘট্‌কী ছিলে তুমি, রাঙামামীর ঘরে তোমাদের বড়বাবুর রাসলীলার চতুরা দূতী ছিলে তুমি! রূপসি! মনে কোরে দেখ, একটা পাপ তোমার নয়, অনেক প্রকার পাপরঙ্গের রঙ্গিণী ছিলে তুমি, এখন তুমি আমার কাছে কি চাও?

লজ্জায়, ঘৃণায়, হতাশে, অনুতাপে, মনের দুঃখে রূপসীর শরীরে ঘন ঘন কম্প, বাকরোধ। পাপীয়সী আর আমার মুখের দিকে চাইতে পাল্লে না; ছুটে পালাবার শক্তি ছিল না, পালাবার চেষ্টা কোল্লে, পায়ে পায়ে জোড়িয়ে পোড়ে যেতে লাগলো। একটি টাকা তার সম্মুখে ফেলে দিয়ে আমি উত্তরমুখে প্রস্থান কোল্লেম; একবার পশ্চাদ্দিকে চেয়ে দেখলেম, যেখানকার রূপসী, সেইখানেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর আমি সে দিকে চাইলেম না, ধর্ম্মের গতি চিন্তা কোত্তে কোত্তে প্রতাপবাবুর বাড়ীতে এসে পেঁছিলেম।

রক্তদন্ত মুর্শিদাবাদে চালান হয়ে গেল, উপস্থিতমতো কলিকাতার অপরাপর কার্য্যও আমি শেষ কোল্লেম। আমার কার্য্যসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চৈত্রসংক্রান্তির চড়কপুজো সমাপ্ত হয়ে গেল। ১২৬৬ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে আমি বর্দ্ধমানে যাত্রা কোল্লেম। আমার অনুপস্থিতিকালে দেওয়ান ত্রিলোচন দত্ত সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সমস্ত বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ কোরেছেন, মনোহরপুরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সেই সকল সুশৃঙ্খলা আমি দর্শন কোল্লেম। দেওয়ানজীর প্রতি আমার পূর্ব্বশ্রদ্ধা আরো অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হলো। প্রবাসভ্রমণে যে সকল কার্য্য আমি সাধন কোরে এসেছি, দেওয়ানজীর কাছে একে একে সেই সকল কার্য্যের পরিচয় দিলেম, শুনে তিনি সন্তুষ্ট হোলেন। অমরকুমারীর বিবাহ। অমরকুমারী রামলোচন মিত্রের কন্যা, যোগ্য ঘরে, যোগ্য বরে, অমরকুমারী অর্পিতা হবেন। রাজা মোহনলাল রামলোচন মিত্রের সর্ব্বনাশ কোরেছিলেন, অবশেষে আমি সেই রামলোচনের কন্যার বিবাহের মধ্যস্থ থেকে শুভকার্য্য সম্পন্ন করাবো, তাই ভেবে দেওয়ানজী মহাশয় সন্তোষ প্রকাশ কোল্লেন। তার পর যখন আমার মুখে শুনলেন, আমার সঙ্গেই অমরকুমারীর বিবাহ, তখন তাঁর আনন্দ অসীম।

অন্দরে প্রবেশ কোরে আমি আমার স্নেহময়ী জননীর চরণে প্রণিপাত কোল্লেম; কাকীমাকে প্রণাম কোরে, বাড়ীর অপরাপর সকলের সহিত প্রিয়সম্ভাষণ কোল্লেম। রাত্রিকালে আমার মা আর কাকীমা যখন একটি ঘরে একসঙ্গে বোসে, আমার নাম কোরে নানাপ্রকার কথোপকথন কোচ্ছিলেন, সেই সময় পুনরায় আমি তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হই। যে সব কথা তাঁরা বলাবলি কোচ্ছিলেন, সেই সব কথার মধ্যে যেগুলি আমারে শুনানো তাঁরা আবশ্যক বোধ কোল্লেন, হাসতে হাসতে সেই কথাগুলি আমারে বোল্লেন, আমি মাথা হেঁট কোরে চুপ কোরে থাকলেম। জননী বোল্লেন, "রাজ্যপদ লাভ কোরে একদিনের জন্যও তুমি সুস্থির হোতে পাচ্ছো না, সুখী হোতে পাচ্ছো না, দশ-

দিনের জন্যও আমরা তোমার ঐ চন্দ্রমুখখানি ভাল কোরে দেখতে পাচ্ছি না। এবারে আর তুমি আমাদের এখানে ফেলে কোথাও যেয়ো না। মনের সাধে কিছুদিন আমরা তোমার আদর-যত্ন করি, বাড়ীতে বোসে তুমি আপনার বিষয়-কর্ম্ম দেখ ; গ্রামের লোকেরা—প্রজালোকেরা বাড়ীতে তোমাকে দেখুক, ভাল কোরে চিনুক, নিত্য নূতন নূতন উৎসব হোক, তা হোলেই আমরা সুখী হই।"

চিন্তাযুক্ত হয়ে আমি বোল্লেম, "শীঘ্র তা এখন ঘটে কৈ? মোকদ্দমার তদ্‌বিরের জন্য শীঘ্রই আবার আমারে মুর্শিদাবাদে যেতে হবে। মোকদ্দমা-গুলি নিষ্পত্তি না হোলে কিছুতেই আমি সুস্থির হোতে পাচ্ছি না। সেই সকল মোকদ্দমার সঙ্গে পদে পদেই আমার নিজের সংস্রব। হাকিমেরা অনেক বিষয়েই আমার মুখের কথা শুনতে চান, এ সময় কেমন কোরে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বাড়ীতে বোসে থাকি?

জননী বোল্লেন, "কেবল ঐ কথা,—কেবল ঐ কথা ; মোকদ্দমা,—মোকদ্দমা, মোকদ্দমা। দুধের বালক, এত মোকদ্দমা কিসের তোমার? সেই শিশুকাল থেকে, সেই ছেলেধরার হাঙ্গামা থেকে, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে, কি কোরে-ছিলে, কোথায় কোথায় বেড়িয়েছিলে কে কোথায় তোমারে খেতে দিয়েছিল, কোথায় কত লাঞ্ছনা ভোগ কোরেছ, কিছুই আমরা জানতেম না। বিধাতা যদি এত দিনের পর সদয় হয়ে আমাদের হারানিধি মিলিয়ে দিলেন, তবুও আমরা সুখী হোতে পাচ্ছি না, তুমিও স্থির হোতে পাচ্ছো না ; মায়ের প্রাণ কেমন হয়, কিছুই তুমি বুঝতে পাচ্ছো না ; এসে অবধি এখনো তুমি কেবল এ কাজে, সে কাজে, দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছো। সর্ব্বক্ষণ আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠে! চুলোয় যাক মোকদ্দমা, মোকদ্দমার কপালে আগুন লাগুক ; এখন আর তুমি কোথাও যেতে পাবে না। এত দিন দেখি নাই, ঘরে বোসে বোসে কেবল কাঁদতেম আর ভাবতেম, এখন একদণ্ড চক্ষে না দেখলে জগৎসংসার অন্ধকার দেখি। এবারে আর আমি তোমারে কোথাও যেতে দিব না। একটি রাঙা টুকটুকে বৌ এনে চক্ষু সার্থক কোরবো, তোমাদের দুটিরে এক জায়গায় বোসিয়ে নয়ন ভোরে দেখবো, ঘরসংসার আলো হবে, সর্ব্বক্ষণ তাই আমার বাসনা। কোথাও আর যেতে দিব না।"

মা বোল্লেন এই কথা, কাকীমাও সেই কথায় সায় দিলেন। তিনি বোল্লেন, "রাঙা বৌটি এসে, গহনা-বস্ত্র পোরে গুড় গুড় কোরে বেড়াবে, আদর কোরে আমরা সেটিকে 'রাঙারাণী বৌরাণী' বোলে ডাকবো, আমাদের নারীজন্মের সাধ মিটবে। কোথাও আর তোমারে যেতে দিব না।"

দেওয়ানজীকে যখন বোলেছিলেম, তখন আমার লজ্জা হয় নাই ; বিবাহের কথা নিজমুখে প্রকাশ কোত্তে জননীর সম্মুখে এখন আমার লজ্জা এলো, নত-বদনে খানিকক্ষণ আমি চুপ কোরে থাকলেম ; শেষকালে সলজ্জবদনে ধীরে ধীরে বোল্লেম, "শুনেছেন আপনারা ছেলেধরা রক্তদন্ত শিশুকালে একবার আমারে ধোরে নিয়ে গিয়েছিল, তার পর আপনাদের পিত্রালয়ে যখন আমি আশ্রয় পাই, তখনো সেই রক্তদন্ত আবার আমারে ধোরে নিয়ে গিয়ে বীরভূমে রেখেছিল। সেই-

খানে আমি একটি বালিকাকে দেখি। শুনেছিলেম, সেই বালিকাটি রক্তদন্তের কন্যা এখন জেনেছি, সে কথা মিথ্যা ; হুগলীজেলার রামলোচন মিত্র সেই কন্যার পিতা। কন্যার নাম অমরকুমারী। অমরকুমারীর মাতা-পিতা নাই ; অমরকুমারীর মাতুল মুর্শিদাবাদের শান্তিরাম দত্ত আমার হস্তে অমরকুমারীকে সম্প্রদান কোরবেন, এইরূপ স্থির কোরেছেন।"

মহোল্লাস প্রকাশ কোরে মা কাকীমা উভয়েই সমস্বরে বোলে উঠলেন, "অমর-কুমারী ! আহা হা ! দিব্য নামটি ! নাম শুনে মনে হোচ্ছে মেয়েটি পরম সুন্দরী। প্রজাপতির ইচ্ছায় অমরকুমারীটি আমাদের বৌমা হোলেই ঠিক শোভা পাবে, কিন্তু মুর্শিদাবাদে ?—মুর্শিদাবাদ অনেক দূর, সেখানে বিয়ে দেওয়া হবে না। অমরকুমারীকে আমরা বর্দ্ধমানে আনাবো ; শান্তিরামকেও আনাবো, এইখানেই এই বৈশাখমাসেই অমরকুমারীর সঙ্গে আমরা তোমার বিবাহ দিব।"

উত্তর দিবার আবশ্যক ছিল না, সে কথায় আমি কোন উত্তরই দিলেম না, অবনত-মস্তকে নীরব হয়ে থাকলেম। জননী আমারে সেই সময় আরো অনেক কথা বোল্লেন, আমি উচিতমত উত্তর দিলেম। আরো খানিকক্ষণ তাঁদের কাছে থেকে আমি সদরবাড়ীতে চোলে এলেম। জননীর নিষেধ, বহরমপুরে এখন আমার যাওয়া হবে না। রক্তদন্ত সেখানে চালান হয়ে গিয়েছে, সেখানে সে কি কি কথা বলে, সেগুলি আমার জানা আবশ্যক, ঘনশ্যাম সেখানে হাজতে আছে, উভয়েই মেয়েচুরি মোকদ্দমার আসামী। উভয়েই তারা খুনে লোক, বহরমপুরে সে কথা প্রকাশ নাই ; কলিকাতা-পুলিস রক্তদন্তের মোতায়েন আছে, কলিকাতা-পুলিসের পরোয়াণা আছে, এই উপলক্ষে প্রকাশ পাবে। আগে খুন, তার পর মেয়েচুরি। খুনী মোকদ্দমার বিচারের পর দ্বিতীয় অপরাধের বিচার হবে কিম্বা মেয়েচুরি মোকদ্দমার পর খুনী মোকদ্দমার বিচার হবে, হাকিমেরাই সে বিষয় অবধারণ কোরবেন। আমি মুর্শিদাবাদে না গেলে, আসামীরা বর্দ্ধ-মানে চালান হয়ে আসবে না, এমন কখনই সম্ভবে না ; আদালতে আদালতে লেখাপড়া কথা ; আদালতের কার্য্য আদালত জানেন ; আসামীরা অবশ্যই বর্দ্ধমানে চালান হবে ; তবে আর জননীর নিষেধ অমান্য কোরে আমার বহরম-পুরে যাওয়ায় কি ফল ? রাত্রে এই বিষয়টি আমি চিন্তা কোল্লেম ; পরদিন প্রভাতে দেওয়ানজীকে সেই সব কথা বোল্লেম, দেওয়ানজীও আমার মতে মত দিলেন।

বর্দ্ধমানজেলায় যাঁরা যাঁরা আমার উকীল ছিলেন, তাঁদের আমি উপদেশ দিয়ে রাখলেম, "জটাধর তরফদার আর ঘনশ্যাম বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ থেকে চালান হয়ে আসবামাত্র আমি যেন সংবাদ পাই।" কলিকাতা-পুলিসে আমার এজাহার আছে, জটাধর তরফদার খুনী আসামী, এ কথাও আমি আমার উকীল-গুলিকে জানিয়ে রাখলেম ; কয়েক দিন পরে জটাধর আর ঘনশ্যাম দস্তুরমত পুলিস মোতায়েনে বর্দ্ধমানের ফৌজদারী আদালতে চালান হয়ে এলো। এক-দিন পূর্ব্বে আমি বহরমপুরের উকীল রজনীবাবুর একখানি পত্র পেয়েছিলেম।

আসামীরা হাজতে নিক্ষিপ্ত হবার পর উকীলের দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে আমি এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত কোল্লেম, "বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারী বাবু সর্ব্বানন্দ মুস্তাফী মহাশয়কে খুন করা অপরাধে তিনজন আসামী। যে দুজন সম্প্রতি চালান হয়ে এসেছে, তদতিরিক্ত আর একজন কালকিঙ্কর চঙ্গ। সেই ব্যক্তি এক্ষণে মানভূমজেলার কারাগারে কয়েদ আছে, আদালতের রুবকারীর দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বর্দ্ধমানে হাজির করবার আদেশ হয়।"

দরখাস্তের প্রার্থনামতে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে কালকিঙ্করকে বর্দ্ধমানে আনয়ন করা হয়। যে দিন প্রথম শুনানী, দেওয়ানজীকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিন আমি আদালতে উপস্থিত হই। আসন্নকালে রাজা মোহনলাল যে পত্রখানি লিখে রেখে যান, সেই পত্রখানি আমার সঙ্গে থাকে, আমার উকীলেরাও আমার নিকটে উপস্থিত থাকেন। আমারে রাজা, উপাধি প্রদান করবার দিন অপরাপর হাকিমগণের সঙ্গে যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন, তিনিই তখন বর্দ্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট। কি উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘোটেছিল, পাঠকমহাশয় ইতিপূর্ব্বেই সে সূত্র অবগত হয়েছেন। সসম্ভ্রমে আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে অভিবাদন কোল্লেম, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রত্যভিবাদন কোরে তিনি আপন সমীপে যোগ্য আসনে আমারে উপবেশন কোত্তে বোল্লেন। উপবেশন কোরে আসামীদের প্রতি গুটি-কতক সওয়াল করবার অনুমতি আমি চাইলেম। অনুমতি পেলেম। জটাধর আর ঘনশ্যাম আমার পরিচিত, কালকিঙ্কর অপরিচিত। দেওয়ানজীর মুখে স্থূল স্থূল পরিচয় পেয়ে যতদূর আমি অবগত হয়েছিলেম, পরিচয় শুনে যা আমি পূর্ব্বে অনুমান কোরেছিলেম, সেই অনুমান যথার্থ। এই কালকিঙ্কর চঙ্গ বর্দ্ধমানের মাঠে কাপড়ের কানাত ফেলে, ঘণ্টা বাজিয়ে সাতপেয়ে গরু দেখিয়েছিল, চেহারা মিলিয়ে ঠিক তারে আমি চিনলেম। জটাধরকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কলিকাতার হাসপাতালে আমারে তুমি চিনতে পার নাই, এখন কি চিনেছ? বিনা দোষে বর্দ্ধমানের বাড়ীতে স্বহস্তে তুমি যে মহাপুরুষের গলা কেটেছিলে, যার বাড়ী থেকে বল পূর্ব্বক আমারে ধোরে বীরভূমে নিয়ে গিয়েছিলে, তাঁরে কি তোমার মনে হয়? বীরভূমের বাড়ীতে তুমি আমারে খুন করবার চেষ্টা পেয়েছিলে, সে কথা কি তোমার মনে পড়ে? বাবু মোহনলাল ঘোষ লোকান্তরে প্রস্থান কোরেছেন, তুমি তার বেতনভোগী চাকর ছিলে। খবরদার! আদালতের মধ্যে এই মোকদ্দমা-সম্বন্ধে মোহনলাল বাবুর নাম উল্লেখ কোরো না! প্রথম কথা, আমারে তুমি চিনতে পার কি না? আমি সেই হরিদাস। মোহনবাবুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, পূর্ব্বাবধি তুমি তা জানতে, এখনো পরিচয় পাও। তিনি আমার পিতৃব্য ছিলেন। খবরদার! এখানে একবারও তুমি তাঁর নাম উল্লেখ কোরো না! সর্ব্বানন্দবাবুর গলায় ছুরী দিয়ে, তাঁর বৈঠকখানার লৌহসিন্দুক থেকে উইল চুরি কোরে, একখানা জাল উইল তুমি সেই সিন্দুকে রেখেছিলে কি না?"

খুনের কথা রক্তদন্ত ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা-পুলিসে স্বীকার কোরেছিল, এখানেও আমার প্রশ্নে সমস্ত কথাই সত্য বোলে স্বীকার কোল্লে। সেই অবসরে আমার পকেট থেকে বাহির কোরে রাজা মোহনলালের দস্তখতী সেই দীর্ঘ পত্রিকাখানি আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দেখালেম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠ কোত্তে পাল্লেন না, তাঁর সেরেস্তাদার সেই পত্রিকাগর্ভস্থ খুনের অংশটুকু পাঠ কোরে শুনালেন, যে যে অংশে কিছু জটিলতা ছিল, ইংরেজীতে তর্জমা কোরে বুঝিয়ে দিলেন। আমার দেওয়ানজীবাবু ত্রিলোচন দত্ত সেই সেই কথার পোষকতা কোল্লেন। রাজার মুখে যেমন যেমন তিনি শুনেছিলেন, শুনে শুনে যেমন যেমন তিনি লিখেছিলেন, পরমেশ্বরের নামে শপথ পাঠ কোরে আনুপূর্ব্বিক সকল কথাই তিনি প্রকাশ কোল্লেন। সেরেস্তাদার সেইগুলি লিপিবন্ধ কোরে নিলেন। রক্তদন্তের একবার সাব্যস্ত হলো ; ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘনশ্যাম ও কালাকিঙ্করও খুনের কথা স্বীকার কোল্লে। প্রথম তদন্তসময়ে দারোগার রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়ে আদালত যে, পরোয়াণা জারী কোরেছিলেন, সেই পরোয়াণা আমি দেখেছিলেম। আসামী ধরবার পুরস্কার ঘোষণা।

সেই পরোয়াণায় লেখা ছিল, "কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণের দ্বারা বর্দ্ধমানের জমীদার সর্ব্বানন্দ বসু খুন হওয়া প্রকাশ : যে কেহ সেই আসামীগণের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে কিম্বা আসামীগণকে ধরিয়া দিতে পারিবে, হুজুর হইতে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।"—এত দিনের পর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ জ্ঞাত ব্যক্তিগণ হয়ে প্রকাশ পেলে। কেহই ধোরিয়ে দিলে না, কেহই পুরস্কার পেলে না ; ধর্ম্মই তাদের ধোরিয়ে দিলেন, উপলক্ষ্য হোলেম আমি। মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ হলো।

হাতকড়ী-বেড়ীবাঁধা আসামীরা জেলখানায় প্রেরিত হবার অগ্রে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সম্বোধন কোরে আমি বোল্লেম, "এই তিনজন আসামীর নামে আরো অনেক অভিযোগ আছে ; সকল অভিযোগের ফরিয়াদী বিদ্যমান নাই। মুর্শিদাবাদে এক বালিকা-হরণ মোকদ্দমায় অনেক আসামী ছিল। ইতিপূর্ব্বে যে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তারা সাজা পেয়েছে। বাকী ছিল এই তিন জন ; এই তিনজনেই সেই দায়েরী মোকদ্দমার আসামী। তৃতীয় আসামী এই কালাকিঙ্কর চণ্ড ঢাকাজেলার এলাকাধীন মাণিকগঞ্জ গ্রামে মুসলমান সেজেছিল ; (এইখানে কালাকিঙ্করকে আমি জিজ্ঞাসা করি, মাণিকগঞ্জে তুমি মিঞাজান নাম ধারণ কোরেছিলে কি না ?' মিঞাজান সে কথা স্বীকার করে।) প্রথম আসামী এই জটাধর তরফদার সেখানে চণ্ডেশ্বর নাম ধারণ কোরেছিল। দ্বিতীয় আসামী ঘনশ্যাম বিশ্বাসের নাম হয়েছিল, গণেশ্বর। বদমাসলোকের যত প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা, তৎসমস্তই প্রায় এই তিন জনের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। কালাকিঙ্কর এতদিন পুরুলিয়ার কারাগারে ডাকাতী অপরাধে কয়েদ ছিল, মেয়াদ চারি বৎসর ; তন্মধ্যে এক বৎসর আটমাস অতীত হয়েছে, বাকী আছে দুই বৎসর চারিমাস। সেই কথাগুলি এই মোকদ্দমার রায়ের সঙ্গে

লেখা থাকে, এই আমার অনুরোধ। দায়রার বিচারের পর এই তিন জন এক-বার বহরমপুরে চালান হয়, এই আমার প্রার্থনা, আইনানুসারে আদালতের কার্য্যও সেইরূপ।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার ঐ উক্তিগুলি সেরেস্তাদারকে লিখে নিতে বোল্লেন, সেরেস্তাদার লিখে নিলেন। আসামীরা জেলখানায় গেল। সে দিনের মত এজলাস ভঙ্গ হলো। ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিবাদন কোরে আমরা বিদায় হোলেম। আসামীদের ভাগ্যক্রমে সে সময় বর্দ্ধমানের ফৌজদারী সেসন বসবার বিলম্ব ছিল না, সাত দিন পরে সেসন আরম্ভ। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেসন আদালত লোকারণ্য। প্রথমেই ঐ খুনী মামলার বিচার। সেসনের বিচারের বিস্তৃত বিবরণ আমি এখানে প্রকাশ করা অনাবশ্যক বিবেচনা কোল্লেম। অপরাধ সাব্যস্ত, অধিকন্তু আসামীদের মুখেই সরাসর কবুল। বৈশাখমাসের দুর্য্যোগ-রজনীতে বাড়ী মেরামতের ভারা বেয়ে ঐ তিনজন আসামী সর্ব্বানন্দবাবুর অন্দরমহলে প্রবেশ কোরেছিল, বৃহৎ একখানা ছোরার আঘাতে জটাধর তরফদার সর্ব্বানন্দ-বাবুকে খুন কোরেছিল, ঘনশ্যাম আর কালকিঙ্কর সেইখানে উপস্থিত ছিল, তার পর তারা সদরবাড়ীর বৈঠকখানার সিন্দুক খুলে উইল চুরি কোরেছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, সমস্তই সপ্রমাণ। ইংরেজী আইনের কূট ;—স্পষ্ট স্পষ্ট এইরূপ প্রমাণ সত্ত্বেও নরহন্তা জটাধরের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হলো না, হত্যাকারীর সঙ্গী সহকারী ঐ দুইজন আসামী ছাড়া অপর কোন সাক্ষী স্বচক্ষে হত্যাকাণ্ড দর্শন করে নাই, হত্যাকারী নিজ মুখে স্বীকার কোল্লেও, সন্দেহমূলক সেই কূটতর্কে হত্যাকারীর ফাঁসীর হুকুম হলো না ; তিন জনেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা। দ্বীপান্তর প্রেরণের অগ্রে আসা-মীরা বহরমপুরে চালান হবে ; মেয়েচুরি মোকদ্দমায় তাদের যে প্রকার দণ্ড হয়, সেই দণ্ডভোগের কালাবসানে জটাধরকে আর ঘনশ্যামকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হবে ; কালকিঙ্কর চঙ্গ মানভূমের দণ্ডকালাবিশিষ্ট দুই বৎসর চারিমাস পুরুলিয়ার জেলে বাস করবার পর বহরমপুরের দণ্ডাজ্ঞা ভোগ কোরবে, তার পর দ্বীপান্তরে যাবে। সেসন জজ সাহেবের এইরূপ মীমাংসা, এইরূপ আদেশ।

আসামীরা বহরমপুরে চালান হয়ে গেল। মেয়েচুরি মোকদ্দমায় সেখানে তিনজনেরই চারি চারি বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হলো। বহরমপুরের জেল-খানায় তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কঠিন কঠিন শ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকলো।

আমার বহু দিনের, বহু কষ্টের, বহু শ্রমের শেষফল, এতদিনের পর ঐ আসামীদের বিচারফল। বৈশাখমাসের অল্পদিন মাত্র বাকী। আমার জননীর ইচ্ছা ছিল, বৈশাখমাসেই আমার পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অবস্থাগতিকে ঘোটে উঠলো না। জ্যৈষ্ঠমাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ। আমি মাতা-পিতার একমাত্র পুত্র, জ্যৈষ্ঠমাসে বিবাহ হোতে পারে না। "আষাঢ়ে ধনধান্য-ভোগ রহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে" এই কারণে ঐ দুই মাসেও বিবাহ স্থগিত

থাকলো। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, এ তিন মাসের তো কথাই নাই ; কাজে কাজেই অগ্রহায়ণমাসের পঞ্চদশ দিবসে শুভবিবাহের দিনস্থির।

চৈত্রমাসের শেষে মুর্শিদাবাদ থেকে আমি কলিকাতায় আসি, বৈশাখমাসে বর্দ্ধমানে। বৈশাখমাসে ফৌজদারী মোকদ্দমা সমাপ্ত। দীনবন্ধুবাবুকে বোলে এসেছিলেম, "শীঘ্রই আমি ফিরে আসবো।" কথাটা রক্ষা কোত্তে পাল্লেম না, জননী বাধা দিলেন, কার্য্যও বাধা দিল ; তার উপর আবার লজ্জার নিবারণ। "আমার বিবাহ, আপনারা চলুন, আমার বিবাহ, অমরকুমারী চলো ; তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ, তুমি আমার সঙ্গে চলো' এ কথা আমি কেমন কোরে বোলবো ? বোলতে পারবো না, সেই জন্যই মুর্শিদাবাদে গেলেম না। পূর্ব্ব-বৎসরের ন্যায় আশামত সমারোহে বাড়ীতে আমি শরৎকালে মহামায়ার অর্চ্চনা কোল্লেম। পূজার পর অবধি জননীর অনুমতিক্রমে ত্রিলোচনবাবু আমার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হোলেন। জননীর অনুমতিক্রমে জননীর নামেই আমাদের সমাজের নানাস্থানে নিমন্ত্রণপত্র লেখা হোতে লাগলো। আমার অনুরোধে কাশীধামে রমেন্দ্রনাথবাবু, বরদারাজ্যের রাজকুমার বাহাদুর, আমার বরদার ইজারাদার বাবু সদাশিব মহান্ত, বীরভূমের নরহরিবাবু, কলিকাতার প্রতাপচাঁদ বাবু, মাণিকগঞ্জের হরিহরবাবু এবং যদুপুরের দীনবন্ধুবাবু প্রভৃতির নামে কয়েকখানি পত্র লেখা হলো। সেই কখানি পত্রে আমার নামের পরিচয় থাকলো ; পত্রে আমি স্বাক্ষর কোল্লেম না, অপরাপর পত্রের ন্যায় সে কখানি পত্রেও আমার জননীর নাম। বাবু শান্তিরাম দত্তের নামে যে পত্রখানি লেখা হয়, সেখানি কিছু দীর্ঘ। কেন না, তিনি হোলেন, কন্যাকর্ত্তা। অমরকুমারীর পিতা নাই মাতুল হোচ্ছেন শান্তিরাম দত্ত, তিনিই সম্প্রদানের অধিকারী ; তাঁর নামে সাদাসিদা নিমন্ত্রণপত্র নয়, সগৌরব আমন্ত্রণপত্র। অগ্রহায়ণমাসের প্রথমে একটি শুভদিন দেখে শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু মণিভূষণ দত্ত এবং শ্রীমতী অমরকুমারীকে সমভিব্যাহারে লয়ে তিনি আমাদের বাসভবনে পদার্পণ করেন, শান্তিরাম দত্তের নামীয় পত্রে এই প্রকার পাঠ। এইখানে আর একটি কথা। আমাদের বর্দ্ধমানের ভদ্রাসন বাড়ীখানি সেকেলে-ধরনে নির্ম্মিত ছিল ; ঘর-গুলি ছোট ছোট, নীচু নীচু, মহলের সিঁড়িগুলি বাঁকা বাঁকা, ডাকাতের ভয়ে চাপা সিঁড়ি ঢাকা ; সুতরাং সে বাড়ীতে বহুলোক-সমারোহের মজলীস ভাল মানবে না, সেইজন্য পাটনার নূতন বাড়ীতেই পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ করা হবে, আমার জননীর অভিমতে, কাকীমার অভিমতে, দেওয়ানজীর অভিমতে এই-রূপ স্থির হয় ; নিমন্ত্রণপত্রগুলিতেও পাটনার বাড়ীতে আগমনের কথাই লেখা হয়। শান্তিরাম দত্তের পত্রে আর দীনবন্ধুবাবুর পত্রে এইরূপ একটি বিশেষ অনুরোধ থাকে যে, পুরবাসিনী স্ত্রীলোকগুলিকেও অনুগ্রহপূর্ব্বক যেন সঙ্গে কোরে আনা হয়। কার্ত্তিকমাসের শেষেই সমস্ত পত্র বিলি হয়ে গেল। তিন চারি ক্রোশের মধ্যে যতগুলি পত্র, সেগুলি ভাটের হাতে বিলি হলো, দূরের পত্রগুলি ডাকে গেল।

অগ্রহায়ণমাসের প্রথমেই আমরা পাটনার বাড়ীতে উপস্থিত হোলেম। অন্দর-মহলে চাবী বন্ধ থাকলো সদরবাড়ীতে কেবল তিনজন আমলা পাঁচজন পাইক আর চারিজন দারোয়ান থাকলো ; বিবাহের সময় দুই তিন দিনের জন্য তারাও পাটনায় যাবে, কেবল একজন দরোয়ান পাহারা থাকবে, এইরূপ কথা থাকলো। আমার মাতামহী ঠাকুরাণীকেও আমরা সঙ্গে নিলেম ; সে বাড়ীতে যে কয়েক-জন স্ত্রীলোক ছিলেন, যে সকল দাসদাসী ছিল, তাদের সকলকেই পাটনায় নিয়ে যাওয়া হলো। আশালতার শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণপত্র ব্যতীত আমি একখানা স্বতন্ত্র পত্র পাঠালেম। আশালতা আমার ছোটমাসী, আশালতা যখন খুব ছোট, তখন তিনি আমারে অপরিচিত জেনেও আপনার ভেবে ভালবেসেছিলেন ; তিনি আমার বিবাহের সময় উপস্থিত থাকবেন, সেই পত্রে এইরূপ আমার বিশেষ অনুরোধ। আমাদের সামাজিক বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব, উকীল-মোক্তার, জমীদারীর কর্ম্মচারী আর আমার পর্য্যটনকালের পরিচিত নিজের বন্ধুবান্ধব যিনি যেখানে ছিলেন, কাহাকেও আমি ভুল্লেম না, স্মরণ কোরে কোরে পত্র লিখে লিখে সকলকেই আমি নিমন্ত্রণ কোরে পাঠালেম। পরিচিতের মধ্যে নিমন্ত্রণ পেলে না কেবল কামরাবাসী দুসমন শত্রু—রক্তদন্ত আর ঘনশ্যাম।

আমরা পাটনায় উপস্থিত হোলেম। বিবাহের অগ্রে আমি আর অমরকুমারী এক বাড়ীতে থাকবো না, সমাজের সেরূপ পদ্ধতি নয়, এই কারণে বাড়ীর নিকটে আর একখানি প্রশস্ত অট্টালিকা ভাড়া লওয়া হলো। দেওয়ানজী মহাশয় যথার্থ বড়লোকের রুচিমত উত্তমরূপে বাড়ীখানা সাজালেন। বিবাহের অগ্রে সপরিবার বাবু শান্তিরাম দত্ত, সপরিবার দীনবন্ধু বাবু শ্রীমতী অমরকুমারীর সমভিব্যাহারে পাটনার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোলেন। যে বাড়ীখানা ভাড়া লওয়া হয়েছিল, অমরকুমারীকে নিয়ে দীনবন্ধুবাবুর পরিবারেরা সেই বাড়ী-তেই থাকলেন, সেই দিন কন্যাজামাতা সমভিব্যাহারে আমার গুরুপত্নী ঠাকুরাণী সমাগত হোলেন, গয়ারাম মিশ্রও সেই সঙ্গে এলেন ; অমরকুমারীর বাসভবনেই তাঁদের স্থান দেওয়া গেল।

উভয় বাড়ীর দ্বারে দ্বারে, তোরণে তোরণে, অলিন্দে অলিন্দে, উভয় বাড়ীর সম্মুখবর্ত্মে—মঙ্গলঘট, মঙ্গলবৃক্ষ, মঙ্গলপতাকা, মঙ্গলমাল্য স্থাপন করা হলো। নৃত্য, গীত, বাদ্য, মহোৎসব, অষ্টাহব্যাপী। বহুজন-সমাগমে মহা সমারোহ। নিজমুখে বলা নয়, অনেকের মুখেই শুনলেম, শোভা অতুল! সকল লোকের মুখেই আনন্দধ্বনি, সকলেরই বদন প্রফুল্ল!

বংশে আমি একমাত্র সন্তান। আমার কাকীমা শ্রীমতী রাণী উমাকালী, আমার জননীর মুখের কথা বাহির হবার অগ্রেই শুভকার্য্যে নারীসুলভ সাধ-আহ্লাদের সূচনা কোল্লেন। পুত্রের বিবাহে জননীর আহ্লাদ যত হয়, অপরের তত হয় না ; কিন্তু ভগিনীর মুখে সূচনা পেয়ে, আমার জননী ঠাকুরাণী মহাহ্লাদে মুক্তহস্তে দান ধ্যান আরম্ভ কোল্লেন ; মনোহরপুরে, বর্দ্ধমানে, হুগলীতে, পাটনাতে সমস্ত পরিচিত লোকের গৃহে গৃহে,—মূল্যবান বস্ত্র,

তৈজসপত্র, মিষ্টান্ন, তৈলহরিদ্রা, গুবাক তাম্বুলাদি সামাজিক বিতরণ করালেন। শুভানুষ্ঠানের কিছুই বাকী থাকলো না। নিত্য নিত্য সহস্র সহস্র লোক বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য প্রাপ্ত হয়ে পরম পরিতৃপ্তিলাভ কোত্তে লাগলো ; সকলের মুখেই ধন্য ধন্য রব !

১৫ই অগ্রহায়ণ সমাগত। বিবিধ মঙ্গলবাদ্যে ও জনকলরবে উভয় বাড়ী পরিপূর্ণ, বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত। নিমন্ত্রিত জনগণ দলে দলে সমবেত। আহারাদির সুবন্দোবস্তে নিয়োজিত পরিবেশকেরা সর্ব্বক্ষণ মহোৎসাহে নিযুক্ত আহূত, অনাহূত, রবাহূত, কেহই অভুক্ত থাকছে না. প্রচুর সুস্বাদু মিষ্টান্ন-ভোজনে সকলেই পরিতুষ্ট।

সন্ধ্যাকালে নানাবর্ণের লক্ষ লক্ষ আলোকমালায় সুসজ্জিত বাড়ী দুখানি যেন পূর্ণিমার রজনীর ন্যায় আলোকিত। সন্ধ্যার পর বরবেশে সজ্জিত হয়ে. সুন্দর সুসজ্জিত শিবিকারোহণে বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে আমি দ্বিতীয় ভবনে প্রবেশ কোল্লেম। চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য বাদিত হোতে লাগলো, অন্তঃপুরে নারীগণের কণ্ঠনিঃসৃত উলুধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক শঙ্খ এককালে ধ্বনিত হয়ে উঠলো ; বিবাহসভা পরিপাটিরূপে সজ্জিত। সর্ব্বস্থান সুন্দর সুন্দর কুসুম-শোভিত ! পুষ্পস্তম্ভ, পুষ্পভিত্তি, পুষ্পশয্যা, পুষ্পমাল্য, সমস্তই পুষ্পময় ! হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন সমস্ত বাড়ীখানি পুষ্পস্তবকে বিনির্ম্মিত ; চতুর্দ্দিক সুগন্ধে আমোদিত ! নানাস্থানের ঘটকমহাশয়েরা সভা-স্থলে দণ্ডায়মান হয়ে আমাদের বংশকীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠে বন্দীর কার্য্য কোত্তে লাগলেন ; সুন্দরী সুন্দরী নর্ত্তকীরা তালে তালে নৃত্য আরম্ভ কোল্লে. গায়কেরা বীণা-যন্ত্রাদিযোগে মধুরস্বরে সঙ্গীতালাপ কোত্তে লাগলো, সকলেই মহানন্দে বিমোহিত !

লগ্নকাল উপস্থিত। শুভলগ্নে শান্তিরাম দত্ত শাস্ত্রমতে আমার অর্চ্চনা কোরে, আমার হস্তে অমরকুমারীকে সম্প্রদান কোল্লেন। সাদরে সানুরাগে আমি অমরকুমারীর পাণি গ্রহণ কোল্লেম। আট বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে যে আশা আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল এই ১২৬৬ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ রজনীতে আমার সেই বহুদিনের মনের আশা পূর্ণ হলো। কুলস্ত্রীগণ উলুধ্বনি দিয়ে শঙ্খধ্বনি কোরে, মহানন্দে মঙ্গলাচরণ কোল্লেন ; গুরুজনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরে অমরকুমারীর সঙ্গে আমি বাসরে প্রবেশ কোল্লেম।

বাসরগৃহে চারি পাঁচটি স্ত্রীলোক খানিকক্ষণ ছিলেন, তারপর আমরা নির্জ্জন হোলেম, অমরকুমারীকে আমি বোল্লেম, "অমর ! এতদিনের পর বিধাতা শুভদিন দিলেন। যে দিন দর্শনের আশা আমি করি নাই, সে শুভ-দিন আজ সমুদিত, তোমারে আমি সহধর্ম্মিণীরূপে প্রাপ্ত হব, এ আশা আমার ছিল না, কিন্তু প্রথম দর্শনাবধি মনে মনে তোমারে আমি আত্মসমর্পণ কোরে রেখেছিলেম, বিধাতা আমার আশা পূর্ণ কোল্লেন। জীবনের মধ্যে সংসারে

আমার এই দিনটিই প্রথম সুখের দিন ; আজ আমি যেন নবজীবনে নূতন সুখের সংসারে প্রবেশ কোল্লেম। উভয়েই আজ আমরা সংসারধামে সংসারী।

অমরকুমারী মৃদু মৃদু হাস্য কোল্লেন ; সলজ্জবদনে তাদৃশ মধুর হাস্য অতি সুন্দর। পূর্ব্বে আমি এক একদিন অমরকুমারীর অধরে একটু একটু হাস্য দর্শন কোরেছি ; সে হাসিতে কিন্তু কিছুমাত্র রস ছিল না, মাধুর্য্য ছিল না, সৌন্দর্য্য ছিল না; আজ আমার অমরকুমারীর অধরে সুবিমল সুধাময় হাস্য! সেই সুধাময় হাস্যের সঙ্গে সুধাময় বচনে অমরকুমারী বোল্লেন, "আজ তুমি আমার মনের কথা বোলেছ। সে কথা আমার মুখে প্রকাশ পাওয়া ভাল হ'ত না, স্ত্রীজাতির মুখে সেরূপ কথা প্রকাশ হয়ও না। তোমার মুখে প্রকাশ হওয়াই ঠিক হলো! আট বৎসর পূর্ব্বে মনে মনে তুমি আমারে আত্মসমর্পণ কোরে-ছিলে, আমার মন বোলছে, সেটি হয় তো ঠিক নয় ; আটবৎসর পূর্ব্বে আমিই তোমারে মনে মনে আত্মসমর্পণ কোরে রেখেছিলেম। আটমাস পূর্ব্বে দীনবন্ধু-বাবুর অন্তঃপুরে যেদিন তুমি আমার সম্মুখে আমার বিবাহের কথা উত্থাপন কর, সে দিন আমি বোলেছিলেম, 'আমার বিবাহ হবে না।' কেন বোলেছিলেম, তা তুমি হয় তো বুঝতে পার নাই। তোমারে যদি আমি না পাই, তবে বিবাহ আমার পক্ষে বিড়ম্বনা হবে, এই ভাবটি আমার মনে ছিল। বিধাতা আজ শুভ-দিন দিলেন, সংসারে আমরা সুখী হোলেম, উদাসীন জীবনের সমস্ত কষ্টের কথা ভুলে গেলেম।"

সুখের প্রসঙ্গে আরো কতকগুলি নূতন কথা বোলতে বোলতে উষাপ্রমোদী পক্ষিকুল কলরব কোরে উঠল, আমাদের সুখরজনী সুপ্রভাত। বাহির-মহলে প্রভাতী মঙ্গলবাদ্য বাদিত হোতে লাগলো। হস্তমুখ প্রক্ষালন কোরে আমি বাহির-বাটিতে এসে বোসলেম। এই সময় ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়, ঘটক বিদায়, কাঙ্গালী বিদায়। অপরাপর যাচকবৃন্দ কেহ যেন বঞ্চিত না হয়, দেওয়ানজী মহাশয়কে আমি এইরূপ আদেশ প্রদান কোল্লেম। বেলা একপ্রহরের পূর্ব্বে শুভক্ষণে সুসজ্জিত যানারোহণে অমরকুমারীর সহিত আমি আমার নিজ ভবনে উপস্থিত হোলেম। এখানকার নিজ ভবন অর্থে পাটনার রাজভবন। অনুযাত্রী বন্ধুবান্ধবেরাও সেই বাটিতে সমবেত হোলেন। আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লেম। অমরকুমারীর সহিত আমি একাসনে উপবেশন কোল্লেম। আমার জননী সর্ব্বপ্রথমে যৌতুক দান কোরে আশীর্ব্বাদ কোল্লেন ; ভক্তিভাবে আমরা উভয়ে তাঁর চরণবন্দনা কোল্লেম। তার পর আমার মাতামহী ঠাকুরাণী, বুড়ীঠাকুরাণী, আর আর যাঁরা যাঁরা আমাদের ভক্তি পাত্রী, একে একে তাঁরা সকলেই যৌতুক দিয়ে দিয়ে আমাদের আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। অন্তঃপুর আনন্দ-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ! সম্বন্ধসূচনার সময় শান্তিরাম দত্তের বাড়ীতে সহসা উপ-স্থিত হয়ে পশুপতিবাবু বোলেছিলেন,—

"মাথায় মুকুট দিয়ে বসিয়ে দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দিবে যতেক যুবতী ॥"

সেই ভবিষ্যদবাণী আজ বর্ত্তমানে ফলিত হলো।

"মাথায় টোপর দিয়া বসিল দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দিল যতেক যুবতী॥"

সকলে সকল প্রকার যৌতুক দিলেন, আমি এখন অমরকুমারীকে কি যৌতুক দিই, মনে মনে চিন্তা কোল্লেম। পূর্ব্বেই চিন্তা কোরে রেখেছিলেম, মনোমধ্যে তথাপি একটু নূতন চিন্তা। চিন্তার ফলও আমার সঙ্গে ছিল, একখানি দান-পত্র। আমার মিত্রদ্রোহী, অর্থলোভী, পিতৃব্যমহাশয় অমরকুমারীর পিতার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ কোরেছিলেন, সেই সম্পত্তিগুলি আমাদের সম্পত্তি-ভুক্ত হয়েছিল ; সেইগুলি খারিজ কোরে, অমরকুমারীর নামে ঐ দানপত্রখানি আমি লিখেছিলেম। রামলোচন মিত্রের সমস্ত সম্পত্তি আমি অমরকুমারীকে দান কোল্লেম, কেবল ভদ্রাসন বাড়ীখানি দান কোত্তে পাল্লেম না। আমার খুড়া-মহাশয় ইতিপূর্ব্বে সেখানি হুগলীর একজন উকীলকে বিক্রয় কোরেছিলেন ; পাঠকমহাশয় সে সংবাদ জানেন ; সুতরাং সেখানি আমি ফিরিয়ে নিতে পাল্লেম না।

বিবাহের পর অষ্টাহকাল পাটনার বাড়ীতে নূতন নূতন উৎসব, নিত্য নিত্য বহু লোকের ভোজ, নিত্য নিত্য বহুসংখ্যক অনাথ নিরাশ্রয় লোকগুলিকে সাহায্য দান প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে অতিবাহিত হলো। বিবাহসভার নিমিত্ত যে বাড়ীখানি ভাড়া লওয়া হয়েছিল, আমাদের বর্দ্ধমান-যাত্রার পূর্ব্বদিন সেই বাড়ীর অধিকারী বিশ্বম্ভর গঙ্গোপাধ্যায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন, দেওয়ান ত্রিলোচন দত্ত আর গুরুপত্নীর বৈবাহিক গয়ারাম মিশ্র তখন আমার নিকটে ছিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয়ের মুখ দেখেই মিশ্রমহাশয় কেমন এক প্রকার ভ্রূকুটি ভঙ্গীতে আমার মুখপানে চাইলেন। ক্রোধের ভ্রূকুটি নয়। বিস্ময়ের ভ্রূকুটি। কি কারণে আমার প্রতি তাঁর ঐ প্রকার দৃষ্টিপাত, আমিও যেন সেটি কতক কতক বুঝতে পাল্লেম, কেন না, গাঙ্গুলী মহাশয়ের মুখখানি যেন আমার কিছু চেনা চেনা বোধ হলো ; তিনিও একটু একটু হাস্য কোল্লেন।

ভাব কি ? আগন্তুকের মুখখানি যেন চেনা চেনা। কোথায় চেনা ? কি রকমে চেনা ? কোন সময়ের চেনা ? নির্ণয় করা যেন একটা সমস্যা দাঁড়ালো। মিশ্রমহাশয় অবিলম্বে সে সমস্যার পূরণ কোরে দিলেন। ঘনশ্যাম বিশ্বাসের কারখানা বাড়ীতে যখন আমি আটক, সেই সময় জনকতক ব্যাপারী একদিন ঘনশ্যামের আফিসঘরে উপস্থিত হয়েছিল ; সেই সকল ব্যাপারীর মধ্যে একজন বাঙ্গালী বেশধারী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি তাঁর নাম বোলেছিলেন, "হরেরাম শুকুল ; নিবাস পাটনা খয়রাৎগঞ্জ।" বাঙ্গা-লীর বেশ, হিন্দুস্থানী নাম, তাই শুনে তখন আমার মনে একটু সন্দেহ হয়ে-ছিল ; গয়ারাম মিশ্র বোলেছিলেন, সে পরিচয় মিথ্যা। এখন জানা গেল, নাম-ধারী হরেরাম শুকুল বাস্তবিক এই বিশ্বম্ভর গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি তখন

হুগলীজেলার একটি থানার দারোগা ছিলেন। বদমাস ঘনশ্যামকে গ্রেপ্তার করবার সুবিধা অন্বেষণের মতলবে ছদ্মবেশে ছদ্মনামে সে দিন ইনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, ঘনশ্যামও হয় তো সেটা কতক কতক বুঝতে পেরেছিল। কেন না. সেই ঘটনার পরেই মিথ্যা দরখাস্ত কোরে আমারে তার ছেলে সাজিয়ে ভিখারীবেশে ঘনশ্যামের পলায়ন।

এ সকল কথা পাঠকমহাশয়ের হয় তো স্মরণ থাকতে পারে। গাঙ্গুলী-মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো. তিনি নিজমুখেও ঘনশ্যামের কারখানার রঙ্গের কথা গল্প কোল্লেন ; শেষে বোল্লেন, কোম্পানীর আমল বিলুপ্ত হবার পূর্ব্বেই তিনি সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ কোরেছেন, পাটনায় এখন আছেন. কিন্তু থাকবেন না ; সংসারে তাঁর স্ত্রী-পুত্রাদি কেহই নাই, তীর্থবাসী হবেন। যে বাড়ীখানা আমি ভাড়া নিয়েছিলেম, তার ভাড়া তিনি চাইলেন না, বাড়ীখানি আমিই খরিদ কোরে রাখি, এইটিই তাঁর অভিপ্রায়। বর্দ্ধমানের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে আমি তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ কোরবো. এইরূপ অঙ্গীকার কোল্লেম। আমারে আশীর্ব্বাদ কোরে তিনি বিদায় হোলেন।

নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবেরা বিদায় হয়ে গেলেন ; প্রিয়সম্ভাষণে মর্যাদানুরূপ পাথেয় প্রদানে তাঁদের সকলকেই আমি আপ্যায়িত কোল্লেম। তার পর আমাদের বর্দ্ধমান-যাত্রা। মনোহরপুরে উপস্থিত হয়েও একমাসকাল বিবিধ উৎসবে অতিবাহিত হলো, সকলেই আমোদিত হোলেন। বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে দীনবন্ধুবাবু সপরিবারে একমাস আমার বাড়ীতেই থাকলেন ; বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একমাসের পর তাঁরে আমি বিদায় দিলেম।

এখন আমি নিশ্চিন্ত। নিত্য রজনীতে নব নব আলাপে অমরকুমারীর সহিত আমি মানসিক সুখ উপভোগ করি ; দিনমানে বিষয়কার্য্যে আর গ্রামস্থ লোকের অবস্থা পরিদর্শনে. আমার চিত্ত আকৃষ্ট থাকে। নিজ মনোহরপুরে প্রায় বিশ পঁচিশ ঘর দরিদ্র পরিবারে বিধবা, অনাথ বালক-বালিকা, নির্ব্বান্ধব বৃদ্ধ ; আহারের সংস্থান নাই, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ; বিশেষ বিশেষ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট কোরে আমি তাঁদের কষ্টনিবারণের উপায় কোরে দিলেম। গ্রামে একটি দেবালয় আর অতিথিশালা স্থাপন কোল্লেম। নিকটে একটি বিদ্যালয় ছিল, সেই বিদ্যালয়ে উচিতমত অর্থদান কোরে. তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন কোল্লেম। সেই বিদ্যালয়ের নিকটে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বসালেম ; আরো যে যে কার্য্যে সাধারণ লোকের উপকার হয়, সে সকল কার্য্যেও সর্ব্বদা আমি মনোযোগী থাকলেম।

একটি আসল কার্য্য আমি ভুলেছিলেম। স[illegible] আসল উইল চুরি গিয়েছিল, খুনের পর একখানা জাল উইল বাহির হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে দেওয়ানজী আমারে বোলেছিলেন, আসল উইলখানি তাঁর কাছেই আছে, সময়ানুসারে তিনি আমারে দেখাবেন ; এই সময় সেখানি আমি দেখতে চাইলেম। আসল আর জাল, একসঙ্গে দুইখানি উইল তিনি আমারে দেখালেন।

বৈঠকখানায় যে রাত্রে শ্বশুর-জামায়ে নির্জ্জন কথোপকথন হয়, অনিচ্ছায় পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সেই সকল কথা আমি শুনি। সেই রাত্রে সক[illegible] মুখে যে কথা আমি শুনেছিলেম, আসল উইলে ঠিক ঠিক সেই সকল কথাই লেখা। জাল উইলখানা অনলে নিক্ষেপ করবার আদেশ দিয়ে আসল উইলের বয়ান অনুসারে কর্ত্তার ষোল আনা সম্পত্তি তাঁর তিনটি কন্যাকে আমি সমানাংশে বিভাগ কোরে দিলাম; ধর্ম্মতঃ একটি কর্ত্তব্যপালনে আমার অন্তঃকরণে বিমল আনন্দের সঞ্চার হলো।

কথায় কথায় একরাত্রে আমি অমরকুমারীকে বোল্লেম, "যারা তোমারে চুরি কোরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কিরূপ বিচার হয়েছে শুনেছো?" অমরকুমারী বোল্লেন, "কিছু কিছু শুনেছি, তারা সব জেলখানায় চোরের মত শাস্তি ভোগ কোচ্ছে।" পুনরায় আমি বোল্লেম, "তা তো কোচ্ছে, রক্তদন্তের কথা কিছু শুনেছো? হাসপাতালের ডাক্তারেরা রক্তদন্তের একখানা পা কেটে দিয়েছে, সে পায়ের বদলে ডাক্তারেরা তার একখানা কাঠের পা গোড়ে দিয়েছে।"

মুখখানি একটু উঁচু কোরে, আহ্লাদে করতালি দিয়ে, অমরকুমারী বোল্লেন, "বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। দেবতারা স্থানে থেকে, আমার জননীর রোদন-ধ্বনি কাণে শুনেছেন। পাপিষ্ঠ রক্তদন্ত বিনা দোষে আমার মাকে নিত্য নিত্য লাথি মাত্তো, আমারেও মাত্তো, সে পা খানা খোসে যাক, কেঁদে কেঁদে মা আমার সেই রকম শাপ দিতেন, আমিও শাপ দিতেম; ঠিক ফলেছে! পাখানা খোসে যায় নাই, ডাক্তারে কেটে দিয়েছে; আরো ভালো।" আমিও প্রতিধ্বনি কোল্লেম, "আরো ভালো।"

একটু পরে আবার আমি বোল্লেম, "রক্তদন্ত খুনী আসামী; বিচারে রক্ত-দন্তের ফাঁসী হলো না; দণ্ডাজ্ঞা হলো, চিরজীবন নির্ব্বাসন।" অমরকুমারী বোল্লেন, "এটাও বেশ হলো ফাঁসী হোলে তো সব ফুরিয়ে যেতো; জীবন্ত শরীরে পাপের ফল কিছুই ভোগ হতো না। দায়মালী আসামীরা যতদিন বাঁচে, ততদিন পাপের ফল ভোগ কোত্তে হয়, এই বিচারটাই খুব ভাল।" নানা ঘটনা স্মরণ কোরে আমি তখন বোল্লেম, "আমিও দায়মালের পক্ষপাতী। প্রাণঘাতক পাপাত্মাদের প্রাণদণ্ড অপেক্ষা দায়মালের ব্যবস্থাই উপযুক্ত দণ্ড।"

দেখে শুনে লোকে অনেক প্রকার শিক্ষালাভ করে; পদে পদে ভুক্তভোগী হয়ে যে শিক্ষা লাভ করা যায়, সেই শিক্ষাতেই অধিক ফল; বহুদর্শন অপেক্ষাও আমি সেইরূপ শিক্ষার প্রাধান্য স্বীকার করি।

নিত্য রজনীতেই অমরকুমারীর সঙ্গে আমার নানা প্রকার গল্প হয়; দুঃখের গল্প, বিপদের গল্প, সুখের গল্প, দেশভ্রমণের গল্প, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্ম-পরীক্ষার গল্প, এই প্রকার কত গল্পেই যে আমাদের অন্তরে সংসারচরিত্র সমু-জ্জ্বল হয়ে উঠে, এখানে মুখের কথায় সেসব জ্ঞানের কথা ব্যক্ত কোরে শেষ করা যায় না।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, অতীত হয়ে যেতে লাগলো, দিনদিন আমরা সংসারসুখে সুখী হোতে থাকলেম। সংসারে যখন আমি নিঃসম্পর্ক ছিলেম, নিরাশ্রয় অবস্থায় যখন আমি দেশে দেশে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছিলেম, নূতন নূতন বিপদের সঙ্গে যখন আমি সাক্ষাৎ কোরেছিলেম, তখনকার দিনগুলি, মাসগুলি, বর্ষগুলি, আমার পক্ষে কতই সুদীর্ঘ বোলে বোধ হোতো, এখনকার সময় কতই ছোট। সুখের দিন শীঘ্র যায়। বিপদের দিন দীর্ঘ হয়, এটা এক প্রকার সাধারণ প্রবাদের মধ্যেই গণ্য ; অনুভবেও যেন ঠিক সিদ্ধান্ত। দিন শীঘ্র শীঘ্র যেতে লাগলো।

কার্য্যক্ষেত্রে আমার অনেক কার্য্য। পূর্ব্বেও পূর্ব্বেও আমি অনেক কার্য্য কোরেছি, কিন্তু সেসকল কার্য্যের প্রকৃতি অন্য প্রকার। আমার নিত্য সহচরী ছিল দুশ্চিন্তা ; দুশ্চিন্তাতেই আমার অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে যেতো ; ধর্ম্মপথ থেকে বিচলিত হোতেম না, কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মসাধনের চিন্তাকেও মনে স্থান দিতেম না, তখন আমার নিজের নিরাপদের চিন্তাতেই আমি নিমগ্ন থাকতেম ; সেই চিন্তাকেই আমি দুশ্চিন্তা বোলে পরিচয় দিচ্ছি। সেরূপ চিন্তা এখন আমার নাই, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ; তথাপি সংসারে চিন্তাশূন্য মানুষ থাকতে পারে না, থাকেও না, নাইও কেহ, আমিও এখন সেইরূপ চিন্তার অধীন। দুঃখের চিন্তা ভুলে গিয়েছি, কিন্তু দুঃখের অবস্থায় কত কষ্ট, সে সব আমার মনে আছে। দুঃখী লোকের দুঃখমোচনে যথাসাধ্য সাহায্য করা এখন আমার এক প্রধান কার্য্য। নিয়তই সেই দিকে আমার মন থাকলো, দুঃখীলোক উপস্থিত হলেই সে পক্ষে আমি যত্নবান হই, অথচ নিজের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সাধনকল্পে আমি অমনোযোগী থাকি না।

আমার শৈশবের আশ্রয়স্থান সেই সপ্তগ্রামের টোলবাড়ী। গুরু-পত্নীর দেশের বাড়ীখানি একজন শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণকে দান করা গেল। বীরভূমের যে বাড়ীতে রক্তদন্ত থাকতো, দেওয়ানজীর মুখে অবগত হোলেম, সে বাড়ী আমার। বাড়ীখানি মেরামত কোরিয়ে সেই বাড়ীতে আমি একটি পাঠশালা স্থাপন কোল্লেম ; নাম দিলেম "অমরকুমারী-পাঠশালা।" পাটনার বিশ্বম্ভর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীখানি পঞ্চসহস্র মুদ্রায় আমি খরিদ কোল্লেম, গাঙ্গুলীমহাশয় তীর্থবাসী হোলেন। মনোহরপুরে আমি একখানি নূতন ধরনের নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করালেম, নিজ বর্দ্ধমান শহরেও একখানি প্রশস্ত অট্টালিকা খরিদ কোল্লেম। আমার পিতৃব্য-মহাশয় দুর্জ্জয় লোভরিপুর অত্যন্ত অনুগত দাস ছিলেন, কেবল আমারে বঞ্চনা করবার অভিপ্রায়ে, সর্ব্বানন্দবাবুর উত্তরাধিকারিণীগণকে বঞ্চনা করবার অভিপ্রায়ে অথবা রামলোচন মিত্রের উত্তরাধিকারিগণকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি নানাপ্রকার পাপজাল বিস্তার কোরেছিলেন, এমনিতেই তিনি একজন ক্ষমতা-শালী লোক ছিলেন, বিষয়বুদ্ধিতে সুপরিপক্ক তাদৃশ ক্ষমতাবান লোক বর্দ্ধমান অঞ্চলে তখন বড় অধিক ছিলেন না ; বিশেষতঃ পরের উপকারে তিনি যথার্থভাবে মাথা দিতেন, অনেক লোকে সেই কথাই জেনেছিল। নিকটবর্ত্তী

স্থানের কোনও ধনবান লোকের মৃত্যু হোলে, তাঁহার অবীরা পত্নী অথবা নাবালক পুত্রগণের স্বেচ্ছায় অছি হয়ে তিনি তাঁদের বিষয়াদি রক্ষা কোত্তেন. সেটি তাঁর সততার পরিচয়, বহু লোকের সেইরূপ বিশ্বাস ছিল ; বস্তুতঃ সেই সাধুতার গুপ্তনাম শয়তানী. সকলই তাঁর স্বার্থসাধনের ফল। এক দৃষ্টান্ত রামলোচন মিত্র। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্য এই প্রকার দৃষ্টান্ত অন্যূন পঁচিশটি। বাবু ত্রিলোচন দত্ত যদিও সেই স্বার্থপর স্বার্থান্বেষী লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাব সরল · তাঁরি মুখে আমি অনেক প্রকার গল্প শুনেছি। খুড়ামহাশয় সাধুতার আবরণে যে সকল পরিবারের সর্ব্বনাশ করার পর পরিবারের যে সকল উত্তরাধিকারী অথবা উত্তরাধিকারিণী নিতান্ত দৈন্যাবস্থায় পতিত হয়েছিলেন, স্থানে স্থানে অন্বেষণ কোরে আমি তাদের সকলকেই সেই সকল অপহৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ কোল্লেম।

পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ কোরে ইতিমধ্যে আমি একবার কলিকাতায় যাই ; বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা সৌদামিনী দেবীকে আর সেই প্রাচীনা কিঙ্করী কামিনীর মাকে কাশীধামে প্রেরণ করি ; কাশীতে তারা চিরজীবন গ্রাসাচ্ছাদন পেতে পারে, তদুপযুক্ত অর্থও আমি প্রদান করি। আমার খুড়ামহাশয় নিজের বুদ্ধিতে বিষয় বাড়িয়েছিলেন. কিন্তু কলিকাতায় কোন সম্পত্তি রাখেন নাই ; পটলডাঙ্গা অঞ্চলে আমি একখানি বাড়ী খরিদ কোল্লেম। সেই বাড়ীতে দরিদ্র বালকেরা অবস্থান কোরবে. খোর-পোষ পাবে. বিদ্যাশিক্ষার খরচাপত্র পাবে. এইরূপ ব্যবস্থা কোরে দিলেম। মধ্যে মধ্যে আমার কলিকাতায় থাকার প্রয়োজন, এজন্য বাহির মির্জ্জাপুর অঞ্চলের একটি ভদ্রপল্লীর মধ্যে আর একখানি বাড়ী আমি খরিদ কোরে রাখলেম।

বিবাহের পর সাত বৎসরকাল ঐ প্রকার কার্য্যে আমার অতিবাহিত হলো। শ্রীমতী অমরকুমারী এই সময়ের মধ্যে দুটি পুত্র আর একটি কন্যার জননী হোল্লেন। পুত্রকন্যার জন্মদিনে দীনদরিদ্রগণকে আমি প্রচুর অর্থ দান কোল্লেম। পরমেশ্বরের প্রসাদে আমার সমস্তই হয়েছিল. কিন্তু সর্ব্বদা আমি একস্থানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি নাই. অনর্থকারী স্বার্থান্বেষীরাও আমারে আক্রমণ করতে পারে নাই. আমার চালচলন সমভাবেই প্রকাশিত. আমি সামান্য হরিদাস ছিলেম. তখনো যে ভাব এখনো সেই ভাব। প্রভেদ শুধু দারিদ্র্যপীড়নের হস্তমুক্তি আর সংসারে সম্পর্কশূন্য উদাসীনত্ববিবর্জ্জিত। জননীর সঙ্কল্প সাধনের অনুরোধে কয়েক বৎসর আমি কেবল মনোহরপুরেই বাস কোল্লেম, মধ্যে কেবলমাত্র একবার কার্য্যানুরোধে পাটনায় আর কলিকাতায় যাওয়া আসা কোরেছিলেম. এই পর্য্যন্ত। অতঃপর সেরূপে আর একস্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকলেম না। কৃতজ্ঞ হৃদয় সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অভিলাষী। অসময়ে যাঁরা যাঁরা আমারে আশ্রয় দিয়েছিলেন, স্নেহ দিয়েছিলেন. সাহায্যদান কোরেছিলেন, সর্ব্বক্ষণ তাঁরা আমার মনে মনে জাগেন ; অমরকুমারীর অনুমতি গ্রহণ কোরে, কিছুদিনের জন্য অমরকুমারীর কাছে বিদায় নিয়ে দেওয়ান মহাশয়কে বিষয়কার্য্য-

নির্ব্বাহের ভার দিয়ে, আমি দেশভ্রমণে বহির্গত হোলেম। দেশভ্রমণে আমার বড় আমোদ। নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়, বিপন্ন উদাসীন, যখন আমার সেইরূপ অবস্থা ছিল্ল তখনও দেশভ্রমণে আমি আনন্দ অনুভব কোরেছি। সৌভাগ্যের সময় দেশভ্রমণে অধিকতর আনন্দ ; বেশী লোকজন সঙ্গে রাখলেম না, সঙ্গী কেবল সেই কালাচাঁদ, আর একজন ব্রাহ্মণ রঘুজী।

প্রথম দিন মুর্শিদাবাদে। সেখানে আমার সংকল্পিত বিদ্যালয়-চিকিৎসালয়-দেবালয় প্রভৃতির কার্য্য সমাপ্ত হয়েছিল, সম্ভবমত সমারোহে নামকরণ কোরে সেগুলির কার্য্য সমাপ্ত কোল্লেম ; বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ কোরে সকলের নিকটে আদৃত হয়ে গেলাম বারাণসী। অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শনের পর রমেন্দ্র-বাবুর বাড়ীতে আমি রইলাম। তাঁর বাড়ীতে আমার আদর-যত্ন যথেষ্ট। রাম-শঙ্করের পলায়নের পর বাড়ীতে সুখশান্তি বিরাজ কোচ্ছে। কনিষ্ঠ মতিলাল অগ্রজের অনুগত হয়ে আছেন, পরিবারেরাও সুখী ; ভাগ্যাদোষে কেবল রাম-শঙ্করের স্ত্রীটি সর্বদা বিবাদিনী। রামশঙ্করের কি দশা হয়েছে, নাগপুরের সরাইখানার পরিচয়স্থলে সে কথা আমি পাঠক মহাশয়কে জ্ঞাপন কোরেছি। বাড়ীতে আমারে দেখে সকলেই সন্তুষ্ট, যজ্ঞেশ্বরের সন্তোষ যেন আরো কিছু বেশী। যজ্ঞেশ্বরটি সেই বাড়ীর পুরাতন চাকর, এ পরিচয় বাহুল্য।

কাশীতে রসিক পিতুড়ী প্রভৃতি যে সকল লোকের সঙ্গে আমার পূর্ব্বে আলাপ হয়েছিল, গুহ্য-পরিচয় স্মরণ কোরে তাঁদের সঙ্গে আর আমি সাক্ষাৎ কোল্লেম না ; কিন্তু শুনলেম, রসিকের সেই মাতুলানীর গর্ভে রসিকের দুটি ফুটফুটে কন্যা জন্মগ্রহণ কোরেছে। কাশীবাসিনী হয়ে সৌদামিনী যে বাড়ীতে ছিল সে বাড়ীর ঠিকানা আমি জানতেম, সেইখানে গিয়ে সৌদামিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। কামিনীর মা আর সৌদামিনী উভয়েই আমারে দেখে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ কোল্লে। শুনলেম, তারা সেখানে বেশ সুখে আছে। সৌদামিনীর হস্তে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে আমি চোলে এলেম।

রমণবাবুর সঙ্গে পরামর্শ কোরে কাশীধামে একটি শিবপ্রতিষ্ঠা করা আমি স্থির কোল্লেম। একটি মন্দির হবে, মন্দিরের সঙ্গে ছোট একখানি বাড়ী থাকবে, প্রতিদিন আট দশটি অতিথির সেবা হবে এইরূপ ব্যবস্থা। রমণবাবুর হস্তে হাজার টাকার নোট দিলেম, আর যাহা আবশ্যক হয়, বাড়ীতে পেঁছে সমস্তই আমি পাঠাব, এইরূপ স্বীকার কোরে আমি গুজরাট যাত্রা কোল্লেম।

বরদার রাজকুমার পরম সমাদরে আমারে অভ্যর্থনা কোল্লেন, পরম সমাদরে সাতদিন আমি সেইখানে থাকলেম। সদাশিব মহান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমার সেখানকার জমীদারীর ইজারাদার, বর্ষে বর্ষে আমার মুনাফার টাকা তিনি বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন, একবারও কিস্তি খেলাপ হয় না, কোন বৎসর কোন কারণে কোন অংশ বাকী পড়ে না, তজ্জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলেম।

রাজকুমার রণেন্দ্র রাও বাহাদুর আমারে আর কিছুদিন বরদায় থাকবার জন্য অনুরোধ কোল্লেন, বিষয় কার্য্যের ঝঞ্ঝাটের হেতুবাদ দিয়ে সে অনুরোধ আমি

রক্ষা কোত্তে পাল্লেম না। আমার বিবাহের সময় আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ কোরেছিলেম, প্রতিনিধি সদাশিব মহান্ত পাটনায় গিয়েছিলেন, আমার বিদায়কালে সেই কথা উত্থাপন কোরে, আমার পত্নীর যৌতুকস্বরূপ যুবরাজ একছড়া মহামূল্য মুক্তাহার আমার হস্তে প্রদান কোল্লেন, তাঁরে আমি করযোড়ে প্রণিপাত কোল্লেম। আর দুই দিন পরে আমি বিদায় হোলেম। বিদায়কালে যুবরাজ আমারে মিত্রভাবে আলিঙ্গন কোল্লেন।

পরে আর কোথাও আমি অধিক বিলম্ব কোল্লেম না, সম্ভবমত সময়ের মধ্যেই নিজ বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোলেম। উপস্থিতমত সকল কার্য্যই এক প্রকার সমাপ্ত, আমিও এক প্রকার নিশ্চিন্ত। বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে সদালাপ, জননীর পূজা, কাকীমার সন্তোষবর্দ্ধন। অমরকুমারীর প্রতি পরিতোষসাধন, পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহপ্রদর্শন, বিষয়কার্য্য পরিদর্শন, এইরূপে সুখশান্তিময় সংসারে আমি বাস কোত্তে লাগলেম। পাঁচ বৎসর আর আমার বিদেশভ্রমণের কোন প্রয়োজন উপস্থিত হলো না। কার্ত্তিক-গণেশের তীর্থযাত্রার কথা আমার মনে হয়। ভগবতী একবার কার্ত্তিক গণেশ উভয়কেই তীর্থপর্য্যটনের আদেশ কোরেছিলেন। গণেশ স্থূলোদর স্থূলকায়, বাহন একটি মূষিকমাত্র, সুতরাং গণেশ তীর্থভ্রমণে অশক্ত হন, কৈলাসেই থাকেন। কার্ত্তিক ময়ূরারোহণে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন কোরে অল্পদিন মধ্যেই কৈলাসে প্রত্যাগত হন। এসেই দেখেন, গণেশ-ঠাকুর কৃতাঞ্জলিপুটে জননীসমীপে দণ্ডায়মান। জননীকে প্রণাম কোরে কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করেন, "মা! আমি সমস্ত তীর্থদর্শন কোরে এসেছি, গজানন কেবল কৈলাসেই উপস্থিত আছেন ; আমাদের উভয়ের মধ্যে অধিক পুণ্য কাহার?" ভগবতী উত্তর করেন। "গণেশের।" কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "কি হেতু?" ভগবতী বোল্লেন, "সংসারে জননী সর্ব্বতীর্থময়ী ; গণেশ প্রতিদিন সাতবার আমারে প্রদক্ষিণ কোরে, সাতবার প্রণিপাত কোরেছে ; অতএব তোমার তীর্থ-দর্শন ফলের সাতগুণ ফল গণেশের।"

এইটি ভগবতী-বাক্য। ঐ পাঁচবৎসরকাল আমি প্রতিদিন জননীকে প্রদক্ষিণ কোরেছি, প্রণিপাত কোরেছি, চরণামৃত পান কোরেছি, সাধ্যমত সেবা কোরেছি, মাতৃ-আজ্ঞা পালন কোরেছি। আমিই হরিদাস, আমিই ভাগ্যবান, আমিই পুণ্যবান।

উপসংহার

ইহ সংসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটি পন্থা। ধর্ম্মপথে বিচরণ কোরে কিরূপ ফল হয়, অধর্ম্মপথে ভ্রমণের কিরূপ পরিণাম, আমার এই জীবনকাহিনীতে কথায় কথায় সেগুলি আমি দেখালেম। এইখানে আমার জীবনের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হবার কথা, কিন্তু পাঠকমহাশয় আর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করুন। আর অতি অল্পমাত্র কথা আমার বলবার আছে। ১২৬৬ সালে আমার বিবাহ, ১২৬৯ সালে আমার প্রথম পুত্রের জন্ম। ১২৭২ সালে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম। ১২৭৩ সালে কন্যাটির জন্ম। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম শরৎকুমার দ্বিতীয়ের নাম ললিতকুমার, কন্যাটির নাম অমলকুমারী। বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহের বিরোধী আমি নই, ১২৮২ সালে নবমবর্ষীয়া অমলকুমারীকে আমি যোগ্যপাত্রে সমর্পণ কোল্লেম, ১২৯২ সালে শরৎকুমারের, তৎপরে ১২৯৫ সালে ললিতকুমারের বিবাহ দিলেম। এখন ১৩১০ সাল। শরৎকুমারের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। শরৎকুমারের দুই পুত্র এক কন্যা। ললিতকুমারের বয়ঃক্রম ৩৮ বৎসর। ললিতের এক পুত্র এক কন্যা। অমলকুমারীর কেবল একটিমাত্র পুত্র. কন্যা হয় নাই।

সংসারের সকলেই পরম সুখী। আমি মধ্যে মধ্যে নানাস্থান পরিভ্রমণ করি। মুর্শিদাবাদের যদুপুরে আমাদের দেবালয়াদি প্রস্তুত হয়েছিল, শাস্ত্রানুসারে সেইগুলি আমি প্রতিষ্ঠা কোরেছি, ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ কোরে দিয়েছি, সে পক্ষে আর আমার কোন উদ্বেগ ছিল না। কার্য্যানুরোধে কয়েকমাস আমি কলিকাতায় অবস্থান করি ; পরগৃহে নয়, বাহির-মির্জ্জাপুরে আমার নিজ বাড়ীতেই আমি থাকলেম। একমাস থাকতে থাকতেই অনেক লোকে আমার নাম শুনতে পেলো, নিত্য নিত্য প্রায়ই দুজন পাঁচজন ভদ্রসন্তান আমার বাড়ীতে আসতে লাগলেন। যাঁর যেরূপ প্রকৃতি. তদনুসারে তিনি আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা কোত্তে লাগলেন। আমি তাঁদের সকলের ব্যবহারে তুষ্ট হোতে পাল্লেম না ! কেহ কেহ আমায় অযথা তোষামোদ করেন, কেহ কেহ আমারে দাতা কল্পতরু বলেন, কেহ কেহ বন্দীর ন্যায় আমার গুণকীর্ত্তন কোরে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির পন্থা দেখেন। অনেকেরই কপটতা আমি বুঝতে পারি। একদিন বৈকালে আমি আমার সদরবাড়ীর বারান্দায় একাকী বোসে আছি, নিকটে পাঁচ-খানি চেয়ার পাতা আছে, একটি ভদ্রলোক সহসা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হোলেন। পরিধানে মলিন বসন. বদন অত্যন্ত ম্লান। তফাতে দেখে তখন আমি তাকে চিনতে পাল্লেম না, নিকটে এসে চিনলেম, মণিভূষণ দত্ত। সাদরে অভ্যর্থনা কোরে তাঁরে আমি বোসতে বোল্লেম। তিনি বোসলেন ; কিন্তু মুখে একটিও কথা বোল্লেন না। অতিশয় বিষন্ন। আমি ভেবেছিলেম, অনেক দূর থেকে এসে-ছেন, তাতেই বোধহয়, পথশ্রমে ঐরূপ ক্লান্তভাব। একজন চাকরকে ডেকে পদপ্রক্ষালনের জল দিয়ে জলখাবার এনে দিতে বোল্লেম। "কিছুই আবশ্যক নাই, কিছুই আবশ্যক নাই, আমাদের ভয়ানক বিপদ ! তোমার তত্ত্বে আমি পাটনায়

গিয়েছিলেম, বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেম ; মনোহরপুরে শুনলেম, তুমি কলিকাতায়। তোমার দেওয়ানজীর মুখে ঠিকানা জেনে এইখানে আমি আসছি। বড় বিপদ ! কোন উপায় নাই।"

মণিভূষণের মুখে ঐ কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কি রকম বিপদ ? বাড়ীর সকলে তো প্রাণগতিক ভাল আছেন।" মণিভূষণ বোল্লেন, "প্রাণগতিক ভাল, কিন্তু সে ভালোতে আর আমাদের মঙ্গল নাই ; সর্ব্বস্ব যায়। আমার পিতা যখন বীরভূমে কবিরাজি করেন, সেইসময় সেখানকার একজন মহাজনের কাছে অনেকগুলি টাকা কর্জ্জ কোরেছিলেন, বিষয় বন্ধক রেখে খত লিখে দিয়েছিলেন। মহাজনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁর ছেলেরা এখন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত কোরে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বেচে নিতে উদ্যত ; বাড়ী, ঘর, বাগান, পুকুর, জমিজমা সমস্তই ক্রোক হয়ে গিয়েছে। কিছুই আমাদের সংস্থান নাই। দীনবন্ধুবাবুর কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা আমি বোলেছিলেম, পিতার তাতে মত নাই। তিনি বলেন, 'সর্ব্বস্ব যায় যাক, দীনবন্ধুর সাহায্য লওয়া হবে না।' নিরুপায় হয়ে আমি এখন তোমার ভরসাতেই এখানে এসেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কত টাকা ?" মণিভূষণ বোল্লেন, "সুদে আসলে প্রায় সাত হাজার। তার উপর আদালতের খরচা।"

অভয় দিয়ে সান্ত্বনা কোরে আমি বোল্লেম, "ঠাণ্ডা হও, কিঞ্চিৎ জলযোগ কর, আজ এইখানে থাকো, কোন চিন্তা নাই, সব টাকা আমি দিব।"

আহ্লাদে আশ্বস্ত হয়ে মণিভূষণ সে রাত্রে আমার বাড়ীতেই থাকলেন। দীনবন্ধুবাবুর বাড়ীর পরিবারেরা কে কেমন আছেন, তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম ; শুভ সমাচার অবগত হয়ে সন্তুষ্ট হোলেম। রজনীপ্রভাতে আমার একটি চিন্তা ; তত টাকা আমার সঙ্গে ছিল না। মণিভূষণকে সে কথা আমি বোল্লেম না, অবিলম্বে সাহায্য দান আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ আমি একটি উপায় স্থির কোল্লেম।

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ থাকতে পারে, পাটনার পাগলাগারদ থেকে যখন আমি খালাস পাই, বরদারাজ্যের রাজপ্রতিনিধি সদাশিব মহান্ত সেই সময় আমারে রাজপ্রদত্ত দশহাজার টাকার একখানি চেক প্রদান করেন। কলিকাতার বেঙ্গলব্যাঙ্কের উপর বরাত। সময়ান্তরে সেই চেক্‌খানি আমি ব্যাঙ্কে প্রেরণ কোরেছিলেম, টাকা পাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে টাকা আমি গ্রহণ করি নাই, ব্যাঙ্কেই আমানত রেখেছিলেম ; তদবধি সে টাকার কোন অংশই বাহির করা হয় নাই। চেকবহি আমার সঙ্গেই ছিল, মণিভূষণকে আট হাজার টাকার চেক দিলেম। "আর যদি কিছু আবশ্যক হয়, পত্র লিখে জানিও, তৎক্ষণাৎ আমি প্রেরণ করবো," এইকথা বলে আমি যত্নপূর্ব্বক আহারাদি কোরিয়ে তাঁরে আমি বিদায় দিলেম। প্রসন্নবদনে মণিভূষণ পরমেশ্বরের নিকটে আমার মঙ্গল প্রার্থনা কোরে বিদায়গ্রহণ কোল্লেন। আমিও পরমেশ্বরকে নমস্কার কোল্লেম।

মফস্বলের কোন ধনবান লোক কলিকাতায় এসে উপস্থিত হোলে অনেকরকমের ধান্দাবাজ লোক অনেক রকমের চাঁদার খাতা হাতে কোরে সাহায্যলাভের

জন্য তাদের কাছে উপস্থিত হয় ; আমার কাছেও সেই রকমের লোক অনেক আসে। যে যে স্থানে সাহায্য করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করি, সেই সেই স্থানে সম্ভবমত দান করি, যেখানে কোন প্রকার প্রতারণা বুঝা যায়, সেখানে আমি মৌনাবলম্বন কোরে থাকি। মণিভূষণ বিদায় হবার একমাস পরে একদিন একটি বাবু এলেন। সাহেবলোকের মত হ্যাট-কোট-প্যাণ্টুলেন, বুকে শৃঙ্খল-বদ্ধ সোনার ঘড়ি, চক্ষে সোনার চশমা, মুখে চুরুট, দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁফদাড়ী। মুখের আকার দেখে লোকটিকে আমি 'বাবু' বোলে চিনলেন, নতুবা সহজে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সমাদর কোরে আমি তাঁরে বসালেম, নামধাম জিজ্ঞাসা কোল্লেম। লোকটি তাঁর নাম বোল্লে, "এচ. বাসু ; নিবাস বঙ্গদেশ।"

"কি অভিপ্রায়ে আগমন", আমি তাঁরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম। দীর্ঘ এক বক্তৃতা কোরে তিনি উত্তর কোল্লেন, "স্বগ্রামে একটি ব্রহ্মসভা, একটি বালিকাবিদ্যালয় আর একটি সমাজ-সংস্কারিণী সভা সংস্থাপন করা হয়েছে, আপনার তুল্য বড় লোকেরা সাহায্য দান কোরেছেন, আপনার নিকটেও কিছু সাহায্য প্রার্থনা।"

প্রার্থনা এইটুকু, কিন্তু বক্তৃতা বিশাল। বক্তৃতার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, "আজকাল সকল দিকে সকল বিষয়ে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি ; ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি, বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি এবং সমাজেরও শ্রীবৃদ্ধি। ইংরেজের রাজত্বে ভারতের মঙ্গল ভারতের মঙ্গলের নিমিত্তই ভারতে ইংরেজদের আগমন। যত দিকে যত কিছু উন্নতি দৃষ্ট হোচ্চে সমস্তই ইংরেজের প্রসাদে, ইংরেজের প্রসাদেই আপনারা ধনবান, ইংরেজের প্রসাদেই আপনারা বিদ্যাবান, ইংরেজের প্রসাদেই আপনাদের সম্মানলাভ। দেশের উপকারে আপনারা মুক্তহস্ত হন, উন্নতিকামুক ইংরেজ বাহাদুরের এইরূপ ইচ্ছা।"

একটিও উত্তর দান করা আমার ইচ্ছা ছিলনা, তথাপি দুই একটি উত্তর-দানে আমি বাধ্য হোলেম। বক্তার মুখপানে চেয়ে প্রথমে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "উন্নতি আপনারা কাহাকে বলেন? এদেশে ইংরেজী চর্চ্চার আধিক্য হয়েছে, একথা স্বীকার্য্য ; কেবল সেইটিই যদি উন্নতির নিদর্শন হয়, তবে আপনার কথাগুলিই ঠিক ; নতুবা আর কোন প্রকৃত উন্নতি আমি বুঝতে পাচ্ছিনা। ধর্ম্মের উন্নতি। আপনারা যাকে ধর্ম্মের উন্নতি বলেন, আমার মতের সহিত তার ঐক্য হয় না। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পবিত্রতা আপনারা ডুবিয়ে দিবার চেষ্টায় আছেন, দেশের আচার-ব্যবহার আপনারা উল্টে দিবার চেষ্টায় আছেন ; যে-গুলি এদেশের ধর্ম্ম, সেগুলিকে আপনারা বলেন কুসংস্কার। আপনাদের ব্রহ্মসভা ব্রহ্মনিরূপণে অক্ষম ; বিশেষতঃ রাজা রামমোহন রায় যে উদ্দেশে, যে মূলের উপর নির্ভর কোরে, কলিকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন কোরেছিলেন সে উদ্দেশ্য এখন বিফল, সে মূল এখন বিপর্য্যস্ত ; ব্রহ্মজ্ঞান যেন এখন বাজারের পণ্য-বস্তু—বালকের ক্রীড়ার বস্তু। হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার আজকাল স্বেচ্ছা-চারে পরিণত। আপনারা জাতিভেদ মান্য কোত্তে চাননা, হিন্দুর খাদ্যাখাদ্য

বিচার কোত্তে চাননা, জাতীয় পরিচ্ছদকে আপনারা ঘৃণা করেন, স্ত্রীজাতির সতীত্ব আর লজ্জাশীলতাকে আপনারা বিদায় দিতে চান। স্ত্রীস্বাধীনতার আদর করেন না। আমি বোধ করি, স্ত্রীস্বাধীনতা একটা কিছ্ন অদ্ভুত জিনিস নয়। স্ত্রীজাতির ভূষণ লজ্জা, সেই লজ্জা পরিত্যাগ কোত্তে পাল্লেই এ দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হয়; স্ত্রীলোকের সেই স্বাধীনতায় সমাজ-সংসার অধঃপাতে যায়! এইগ্নলি আপনাদের উন্নতি। আর একটি উন্নতি, অসবর্ণ বিবাহ। সের্প বিবাহে বর্ণ-সংকরের উৎপত্তি। হায়! মানী লোকের বংশমর্য্যাদা বিল্নপ্ত হবে, উত্তরোত্তর বিবিধ পাপের শ্রীবৃদ্ধি হবে, সেটি আপনারা ভাবেন না। আপনাদের উন্নতির তালিকার যে অংশে নেত্রপাত করা যায়, সেই অংশেই যেন এক একটা বিভীষিকা ম্নর্ত্তিমতী হয়ে আর্য্যসমাজকে ভয় প্রদর্শন করে। আপনি আপনাদের গ্রামে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা কোরেছেন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, সমাজ-সংস্কারিণী সভা প্রতিষ্ঠা কোরেছেন. শ্ননতে খ্নব ভাল ; কিন্তু যে প্রণালীতে আজকাল ঐ তিনকার্য্য সাধিত হয়, তাতে কোনপ্রকার বিশেষ উন্নতির আশা নাই।" এই পর্য্যন্ত বোলে সেই লোকটিকে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আপনি কি কেবল ঐ তিনটি সদন্নষ্ঠানের চাঁদা সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় এসেছেন কিম্বা কলিকাতায় আপনার থাকা হয়?" তাচ্ছিল্যভাবে ম্নখের চ্নর্নটে ধ্নম উদ্গীরণ কোরে, গাম্ভীর্য্য দেখিয়ে তিনি উত্তর কোল্লেন, "কলিকাতাতেই থাকা হয়।" প্ননরায় আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কলিকাতায় আপনি কি কাজ করেন?" প্নর্ব্ববৎ গম্ভীর ভংগীতে কিঞ্চিৎ দাম্ভিকতা প্রকাশ কোরে তিনি বোল্লেন, "কথ বার্টশন হায়পার কোম্পানীর বাড়ীতে আমি হেড ক্লার্কের কাজ করি।"

অন্তরে ঘৃণা, ম্নখে অল্প অল্প হাস্য আনয়ন কোরে তৎক্ষণাৎ আমি বোল্লেম, "এই দেখ্নন, ম্নচির বাড়ীতে চাকুরী কোরে আপনি সমাজ সংস্কারের ম্নর্নব্বী হতে চান। এটা কত বড় আশ্চর্য্য কথা। আপনার মত লোকের দ্বারা সমাজের উন্নতি এক প্রকার বিড়ম্বনা।" আমার ঐ কথা শ্রবণ কোরে, লোকটি চঞ্চল হস্তে আপনার দীর্ঘ শ্মশ্রুতে ঢেউ খেলাতে লাগলেন। পাছে কথায় কথায় কথা বাড়ে, সেই সন্দেহে আর কোন কথা আমি উত্থাপন কোল্লেম না। গৃহাগত সাহায্যার্থীকে র্নক্ষ হস্তে বিদায় করা নিষ্ঠ্নরতা, অতএব দশটাকার একখানি নোট তাঁর হস্তে আমি অর্পণ কোল্লেম। অপমানের ভয়ে শিষ্টাচার বিস্মৃত হয়ে গম্ভীরবদনে দ্রুতপদে তিনি প্রস্থান কোল্লেন। অপমানের ভয়ে শিষ্টাচার বোধ হয় তাদৃশ লোকের কাছে অগ্রসর হয় না।

লোকটি বিদায় হবার পর অনেক কথা আমার মনে উদয় হলো। দেশের উন্নতির নামে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! বংগবাসীর অংগে সাহেবী পরিচ্ছদ! নাম শ্ননলেম, এচ. বাস্ন, কথা শ্ননলেম শ্লাঘাম্নলক! চাকরী শ্ননলেম, ম্নচির বাড়ী ; এই প্রকৃতির লোক কলিকাতায় আজকাল অনেক। সাহেবী পরিচ্ছদে বাঙালীর সন্তানকে কেমন দেখায়, বোধ করি, তাঁরা দর্পণাগ্রে দণ্ডায়-

মান হয়ে নিজ নিজ মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দর্শন করেন না। কেবল পরিচ্ছদেও নয়, আহার বিহারাদি প্রায় সকল বিষয়েই সাহেবী অনুকরণে তাঁরা উন্মত্ত। দাড়ী-চসমা ধারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের নিদর্শন, অন্য কথায় সভ্যতার চিহ্ন। একজন কবি রঙ্গ একটি গীত রচনা কোরেছিলেন, লক্ষ্য ছিল বঙ্গযুবকদের দাড়ী-চসমার উপর। গীতটি অতি চমৎকার।

গীতটি এই রকম ;—

"চাঁপদাড়ী রাখা, চোকে চসমা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং চেগেছে বাংলাতে।
চেনা যায় না এখন হিন্দু মুসলমান আকার অবয়বে ঠেকে সব সমান,
বাঁড়ুয্যে কি রশুলবক্স মিঞাজান,
অনুমান করা কঠিন এক্ষণেতে ॥"

আত্মাভিমানী উন্নতিশীল বাঙালীচিত্র অনেকাংশে ঠিক ঐরূপ, আসল কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ অল্প ; অনুকরণে বাহ্যাঙ্গের শোভাই সভ্যতার পরিচায়ক। কলিকাতার রাজ পথে বহির্গত হোলেই বাহ্যশোভাবিশিষ্ট শত শত বঙ্গযুবা। নেত্রগোচর হয়। পূর্ব্বে আমি বারকতক এই কলিকাতা-নগরী দর্শন কোরে গিয়েছি. এখন দেখি যেন অনেক নূতন বাড়ী. গাড়ী, রাস্তা, বেশ্যা, বাবু, সমস্তই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; আর্য্যধর্ম্মের সম্মান-গৌরব এখন যেন অনেকের মুখে উপহাসে পরিণত। বক্তা অনেক, সভা অনেক, সভায় সভায় বক্তৃতার ঘনঘটায় আকাশ পর্য্যন্ত কম্পমান ; বক্তৃতার সঙ্গে কাজের মিলন অতি অল্প। দেশে কিম্বা বিদেশে কোন একজন বড়লোকের মৃত্যু হোলে, বঙ্গযুবকেরা এক এক সভা আহ্বান কোরে. দশজনে জড় হোয়ে একসঙ্গে ক্রন্দন করেন। সে সকল সভার নাম শোকসভা ; ক্রন্দনচ্ছলে বক্তৃতা ! "কাঁদো. স্মরণচিহ্ন রাখো, পরিবারের নিকট সান্ত্বনাপত্র পাঠাও, চাঁদা কর," সভায় সভায় এই সকল কার্য্য হয়, ফলে কি দাঁড়ায়, সকল সময় সকলে সেটি জানতেও পারেন না।

কালমাহাত্ম্যে কলিকাতায় এখন কেবল বাহ্যাড়ম্বর। সমস্তই অনুকরণের ফল। মুসলমান রাজত্বকালে এদেশের লোকেরা রাজভাষা-গৌরবে আরবী পারসী অধ্যয়ন কোত্তেন, কোন কোন সৌখীন লোক মুসলমানী কেতায় টুপী-চাপকান ব্যবহার কোত্তেন, মোগলাইখানার সৌরভে কাহার কাহার রসনা রসবতী হয়ে উঠতো ; কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে সাধারণতঃ মুসলমানী অনুকরণের এত ধুমধাম ছিল না ; এখন কেবল আচারানুষ্ঠানে পাশ্চাত্যানুকরণের একাধিপত্য।

বাঙালীরা কারবার জানেনা, কেবল চাকরী জানে, এই একটা দুর্নাম ছিল; এখন সেই দুর্নামমোচনের অভিলাষে বাঙালী সন্তানেরা এক একটা কারবারের নামে এক একটা দোকান খুলে বোসছেন, দোকানে দোকানে এক এক সাইনবোর্ড ঝুলছে। সব সাইনবোর্ডে প্রায় দোকানদারের নামের সঙ্গে "এণ্ড কোং" জোড়া। বাঙালীরা কোম্পানীবদ্ধ হয়ে কাজ কোত্তে জানেন, ঐ এণ্ড কোং শব্দ

তারি পরিচয় দেয়, ফলে কিন্তু কি সেটি নির্ণয় করা দুর্ঘট। অক্ষরেই কেবল এণ্ড কোং, এণ্ড কোং, এণ্ড কোং !

কেবল আড়ম্বর, কেবল বিকার। একটি নাম শুনলেম, "এচ. বাসু।" তাদৃশ নাম কলিকাতায় অসংখ্য। সি. ভট্টাচার্য্য, টি. পালিত. বি. বাইসাক, এন ব্যানার্জ্জী ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রীলোকের নামে ব্যাকারণের দুর্দ্দশা। যথা,—শ্রীমতী মিস চারুশীলা দত্ত, শ্রীমতী বিলাসকামিনী মুখোপাধ্যায়; শ্রীমতী মিসেস তরুবালা ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরুষের নামে একটি কি দুইটি ইংরেজী অক্ষর ; তাদর্শনে—তচ্ছ্রবনে মানুষের প্রকৃত নাম নির্ণয় করা অসাধ্য। কারে কি বোলে ডাকা যায়, সেটা চিন্তা কোত্তে হোলে মানুষের মাথা ঘোরে। পিতৃ-পিতামহাদির নামেও ঐরূপ ইংরেজী অক্ষর কেমন মানায়, বংশধরগণকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

কত দিকে কত প্রকারে ইংরেজী সভ্যতার নিদর্শন দৃষ্ট হয়, সংখ্যা করা যায় না। দেশের পূর্ব্বগৌরবের উদ্ধারবাসনায় কেহ কেহ অগ্রসর। মধ্যে কয়েক বৎসর আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল. এখন আবার কতকগুলি লোক,—বৈদ্যই হউন অথবা অন্য জাতিই হউন, আয়ুর্ব্বেদকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা কোচ্ছেন ; রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় সাইনবোর্ডে "আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়" অগণিত। আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধার অবশ্য বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু সাইনবোর্ড-ওয়ালারা প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধারসাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হোচ্ছেন, তেমন কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না। এক এক জনের ক্যাটেলগের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে প্রশংসাপত্র অসংখ্য। সেই সকল প্রশংসাপত্রই যদি আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধার সাধনে পর্য্যাপ্ত হয়, তা হোলে আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের "পূর্ব্বগৌরব" শীঘ্রই ফিরে আসবে, এমন আশা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।

চিকিৎসার আড়ম্বর অসীম ; চিকিৎসকের সংখ্যাও অসীম। ডাক্তার, কবি-রাজ, হাকিম, হোমিওপ্যাথ ইত্যাদি চিকিৎসক এই রাজধানীর সর্ব্বত্রই বিরাজ করেন। আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হাকিমি, বিজলী, পেটেণ্ট প্রভৃতি ঔষধও অনেক প্রকার ; সনাতন ঔষধাবলীর উপর নিত্য নিত্য আবিষ্কার। ইংরেজ বাহাদুর প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাস্থ্যবিধানের নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে অনেক টাকা ব্যয় করেন, স্বাস্থ্যবিভাগে উচ্চ উচ্চ বেতনে অনেক বড় বড় লোক রাখেন। আড়ম্বর দেখে বোধ হয়, সকল দিকেই মঙ্গল ; কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সঙ্গে —ঔষধবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—চিকিৎসকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—ক্রমশই নূতন নূতন রোগের বৃদ্ধি। শতবর্ষ পূর্ব্বে, এমনকি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে যেসকল রোগের নাম কেহ কখনও শুনে নাই, আজকাল সেই সকল অশ্রুতপূর্ব্ব রোগের নাম, রোগের অধিকার, দেশময় পরিব্যাপ্ত। দশমবার্ষিক লোকসংখ্যার তালিকার ন্যায় যদি রোগসংখ্যার তালিকা কেহ প্রস্তুত করেন, তা হোলেই সকলে জানতে পারবেন, আড়ম্বরের মহিমা কতদূর !

আড়ম্বরের বাজারে সকল দিকেই গোলেমালে চণ্ডীপাঠ। ধর্ম্মই বলুন, বিদ্যাই বলুন, বাণিজ্যই বলুন, সমাজপদ্ধতিই বলুন, সকল-দিকেই হট্টগোল। বাস্তবিক কে যে কিসের কর্ত্তা, বহু অন্বেষণেও কেহ তাহা নিরূপণ কোত্তে পারেন না। নবদ্বীপের একজন দার্শনিক পণ্ডিত কলিকাতার আড়ম্বর দর্শনে চমৎকৃত হোয়ে বোলেছিলেন, "সমস্তই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।" তাঁর একজন বুদ্ধিমান শিষ্য বোলেছিলেন, "ভূত অদৃশ্য, এখানকার আড়ম্বরের কর্ত্তারা দৃশ্য পদার্থ ; দৃশ্যে অতি ভয়ঙ্কর ; সুতরাং সহরের আড়ম্বরগুলির বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ বোল্লেই ঠিক হয়!" আমি কিন্তু এই দুই কথার সায় দিতে পারি না. অথচ শুনে বড় কষ্ট হয়!

সম্প্রতি এক নূতন হুজুগ উপস্থিত। অনেক জাতিই এখন যজ্ঞসূত্র ধারণ কোরে ব্রাহ্মণ হোতে চায়। সুবর্ণবণিক, সদগোপ, জুগী প্রভৃতি কতিপয় জাতি উপবীত ধারণে প্রয়াসী। জনকতক জুগী ইতিমধ্যে সূত্র ধারণ কোরে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোলে পরিচয় দিচ্ছে. তারা আর ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে না। এসকল লোকের খেয়াল বরং ক্ষমার যোগ্য। শুনা যায়, যশোহর জেলায় অনেক মুচি পৈতা ধারণ কোরে ব্রাহ্মণ সেজে বেড়াচ্ছে। সর্ব্বোপরি আর একটি বড় কথা—বড় হুজুগ। কলিকাতার কতকগুলি ভদ্রবংশীর কায়স্থ আজকাল যজ্ঞোপবীত ধারণে অভিলাষী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আঁদুলের কায়স্থ বংশীয় রাজা রাজনারায়ণ ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য যজ্ঞসূত্রধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। কাল তখন স্বেচ্ছাচার-স্রোতে এতদূর ভাসে নাই, সেইজন্য অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সেই খেয়ালের আগুন নির্ব্বাপিত হয়ে গিয়েছিল ; সেই নির্ব্বাপিত অনল এত দিন পরে আবার কলিকাতায় কায়স্থ-মহলের মহানলে প্রধূমিত! তজ্জন্য একটি সভাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সভার একজন সভ্য একদিন আমারেও সেই দলভুক্ত করবার জন্য আমার নিকট সমাগত হয়েছিলেন। জগদীশ্বর স্মরণে তাঁরে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় কোরে দিয়েছি ; মনে ভেবেছি. পৈতা এখন ভারী সস্তা ; উন্নতিশীল ব্রাহ্মণসন্তানেরা ব্রাহ্মণের মুর্দ্দন্যণটি কে খারিজ কোরে দিয়ে যজ্ঞোপবীতগুলি দূরে নিক্ষেপ কোরেছেন, এ বাজারে অপরাপর যে জাতির ইচ্ছা. সেই জাতিই যজ্ঞসূত্র ধারণে অগ্রসর হোতে পারে, সে ইচ্ছার স্রোত রোধ করে কে? কলিকাতার হুজুগ অনন্ত। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চিৎপুর সারস্বতাশ্রমের বৃক্ষবাসী হুতুমপ্যাঁচা মিষ্ট বচনে বোলেছিলেন ;—

"আজব সহর কোলকেতা!"
হেথা. ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে
বলিহারি একতা!
বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী. বদমায়েসীর
ফাঁদ পাতা॥

রাঁড়ী বাড়ী জুড়ী গাড়ী, শুঁড়ী সোণারবেনের কড়ি,
খানকী খেমটি খাসা বাড়ী, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা ॥
হুতুম দাসে, স্বরূপ ভাষে,
তফাৎ থাকাই সার কথা ॥"

ঐ ধুয়ায় আমিও মনে মনে স্থির কোল্লেম, তফাৎ থাকাই সার কথা, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কলিকাতা সহরে আর আমার বাস করা উচিত হয়না। জীবনের প্রথমকাল অজ্ঞাতাবাসে অতীত হয়েছে, মধ্যাবস্থা সাংসারিক বিষয়কার্য্যে অতিবাহিত হলো, শেষ অবস্থায় অর্থচিন্তার অবসর। এ সময় কলিকাতা সহরের ভোগবিলাসপূর্ণ নূতন নূতন হুজুগের বাজারে আমি শান্তিলাভ কোত্তে পারবো না। সহরের দৃষ্টান্তে প্রদেশে প্রদেশেও বিস্তর বাহ্যাড়ম্বর শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে ; অধিকন্তু যে উদারহৃদয়া ভাগ্যবতী পুণ্যবতী রমণীর আশ্বাসে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সুরক্ষিত হয়ে আসছিল, কালস্বরূপ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমাদের সেই জননীস্বরূপিণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহন কোরেছেন। এখন পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম—আর্য্যসমাজ কি অবস্থা প্রাপ্ত হবে, মনে চিন্তা কোল্লেও ভয় হয়। এই সকল স্মরণ কোরে আমি ভাবলেম, বঙ্গদেশে আমার মত লোকের আর শান্তি নাই, মুক্তিক্ষেত্র বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে প্রস্থান কোরে পরমার্থচিন্তায় কালহরণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

সংকল্প স্থির কোরে আমি বর্দ্ধমানে যাত্রা কোল্লেম ; সেখানে দুটি পুত্রের প্রতি বিষয়কার্য্যের ভারার্পণ কোরে, বহুদর্শী দেওয়ানজীকে অভিভাবক রেখে, জননী, মাতামহী, কাকিমা আর অমরকুমারী সমভিব্যাহারে আমি বারাণসী ধামে গমন কোল্লেম। চরমকাল পর্য্যন্ত কাশীবাসী হয়েই থাকবো, এইরূপ আমার অভিলাষ। পাঠকমহাশয়। এইখানে আমার জীবনকাহিনী সমাপ্ত। কাহিনীর বর্ণনায় কোন অংশে কোন প্রকারে যদি আপনাদের কিছুমাত্র চিত্তরঞ্জন কোত্তে পেরে থাকি,—ধর্ম্মের পুরস্কার, অধর্ম্মের প্রতিফল যদি আমি কোন অংশে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়ে থাকি, তবেই আমার সমস্ত শ্রম সুফল। দয়া রাখবেন, অনুগ্রহ রাখবেন, স্মরণ রাখবেন, আমি আপনাদের চিরানুগত, চিরানুগৃহীত ধর্ম্মদাস—হরিদাস।